একশো বছরের প্রিয় গল্প

সম্পাদনা
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
উজ্জ্বলকুমার দাস

একশো বছরের প্রিয় গল্প

সম্পাদনা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
উজ্জ্বলকুমার দাস

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
ছত্রিশ-এ, কলেজ রো, কলকাতা- ৭০০ ০০৯

EKSHO BACHARER
PRIYA GALPA
(Collection of Short Stories)
Edited by :
SHIRSENDU MUKHERJEE and UJJAL KUMAR DAS

Public Library
Fla. Gem No.
Fla. Gem. M.R. No.
58667

প্রকাশক
শ্রী বিজয়কৃষ্ণ দাস
৩৬এ, কলেজ রো,
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ :
প্রবীর আচার্য

বর্ণসংস্থাপনে :
অজিতকুমার মান্না
পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন,
কলকাতা - ৬

মুদ্রাকর :
স্বস্তিক
১৩ ডি আগফিরো
কলকাতা-

উৎসর্গ

তনিমা দাশগুপ্ত কে

ভূমিকা

আমাদের বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্পের স্থান নির্ণীত হয়েছে তার জন্মলগ্নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একক প্রতিভায় যে বীজকে মহীরুহে পরিণত করেছিলেন, সেই মহীরুহ আজ ডালপালায় এতটাই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, প্রথিতযশা সাহিত্য সমালোচককে যেমন, তেমনি সাহিত্যিকদেরও বোধহয় স্বীকার করতেই হবে যে, বাঙালির জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, যন্ত্রণা বেদনার যে প্রতিচ্ছবি তা কিন্তু একমাত্র বাংলা ছোটোগল্পেই বেশি করে ধরা পড়েছে।

বাংলা ছোটোগল্পের লেখক-লেখিকা অতি যত্নে বাঙালি জীবনকে অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে গড়ে তুলেছেন। যা পাঠক-পাঠিকার মনে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

বাংলা ছোটোগল্প নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখক-লেখিকা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, ভেঙেছেন ছোটোগল্পের ফর্ম। সেই কারণে বাংলা ছোটোগল্পের বৈচিত্র্যও অনেক।

সময় দ্রুত বদলে চলেছে, বদলে চলেছে আমাদের মানসিকতা ও মূল্যবোধ। বিশ্বরাজনীতিতে রয়েছে নানারকম অস্থিরতা। সেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আদিযুগ থেকে ছোটোগল্পর বিষয় বৈচিত্র্যও বদলে গেছে আজ অনেকখানি। ছোটোগল্পের ক্ষেত্রভূমি হয়েছে আজ অনেক বড়ো। ছোটোগল্প তার সংকীর্ণ পরিসর পেরিয়ে আজ এক উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছে।

বস্তুত বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাংলা সাহিত্যের অনায়াস সিদ্ধিই ছোটোগল্প। ছোটোগল্পর সেই অমূল্য ভাণ্ডার থেকে সংকলনে সংকলিত গল্পগুলির মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটোগল্পের এক বিবর্তনের আভাস পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সংকলনে একই সঙ্গে বাংলা ছোটোগল্পের সাধনা ও সিদ্ধি, উৎকর্ষ এবং বৈচিত্র্যের সামূহিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

এই সংকলনে হয়তো আপনাদের বেশ কিছু প্রিয় লেখকের লেখা বাদ পড়ে গেল। তা আগামী সংস্করণে সংকলিত হবে। আর সব শেষে জানাই এই বইয়ের প্রকাশক বিজয়কৃষ্ণ দাসকে আন্তরিক অভিনন্দন।

কলকাতা বইমেলা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
উজ্জ্বলকুমার দাস

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

অনধিকার প্রবেশ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ■ ৯
বউ চুরি— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ■ ১৩
বিলাসী— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □ ২৮
শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড— রাজশেখর বসু □ ৩৯
বেলোয়ারী টোপ— জগদীশ গুপ্ত □ ৫২
তারকনাথ তান্ত্রিকের গল্প— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৬০
রানুর প্রথম ভাগ— বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় □ ৭৫
অক্ষয়বটোপাখ্যান— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৮৫
দুধের দাম— বনফুল □ ১০৫
কামিনী— শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ■ ১০৮
মৃত্যুভয়— শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় □ ১১৩
মহাপুরুষের সিদ্ধি লাভ— শিবরাম চক্রবর্তী □ ১২০
হাতুড়ি— প্রমথনাথ বিশী □ ১২৫
নুরবানু— অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত □ ১২৯
মহানগর— প্রেমেন্দ্র মিত্র □ ১৩৬
রাজকবি— সতীনাথ ভাদুড়ী □ ১৪৪
আর না কান্না— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৫৭
রজনী হল উতলা— বুদ্ধদেব বসু ■ ১৬১
পশ্চিম দিগন্ত— গজেন্দ্রকুমার মিত্র ■ ১৭১
পেয়ালায় তুফান— লীলা মজুমদার □ ১৮১
ফসিল— সুবোধ ঘোষ □ ১৯৩
সব দিক বজায় রেখে— আশাপূর্ণা দেবী ■ ২০২
রানী সাহেবা— বিমল মিত্র ■ ২১৩
শ্বাপদ— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী □ ২২৭
তেইশ— কমলকুমার মজুমদার □ ২৫৩
রস— নরেন্দ্রনাথ মিত্র ■ ২৬৭
সাইমিয়া ক্যাসিয়া— অমিয়ভূষণ মজুমদার □ ২৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা

গন্ধরাজ— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ৩১৪

আত্মজা— বিমল কর ■ ৩২৫

ঝড়— শক্তিপদ রাজগুরু ❑ ৩৪১

আদাব— সমরেশ বসু ❑ ৩৪৮

ভারতবর্ষ— রমাপদ চৌধুরী ❑ ৩৫৪

দু'জনে— মহাশ্বেতা দেবী ❑ ৩৬২

পানিপিরের দরগায়— সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ■ ৩৭৪

এক ধরনের অসুখ— মতী নন্দী ❑ ৩৮৪

সামান্য ভুল— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ■ ৩৯১

যা হয়, তা হয়— সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ❑ ৩৯৯

অনুপ্রবেশ— প্রফুল্ল রায় ❑ ৪০৫

কাকচরিত্র— অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ■ ৪২৩

দিনশেষে— বুদ্ধদেব গুহ ❑ ৪৩১

আত্মপ্রতিকৃতি— শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ❑ ৪৩৯

খগেনবাবুর পড়শী— নবনীতা দেব সেন ■ ৪৪৯

বেঁচে থাকা— সমরেশ মজুমদার ❑ ৪৫৭

ঘৃণার চেয়ে বড়— সুচিত্রা ভট্টাচার্য ■ ৪৬৬

সেক্টর ফাইভ— উজ্জ্বলকুমার দাস ❑ ৪৭৩

লেখক পরিচিতি— ❑ ৪৮০

অনধিকার প্রবেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর-এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবীবিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না, ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল, "পারিব", আর একটি বালক বলিল, "কখনোই পারিবে না।"

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর-একটি বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবার স্ত্রী জয়কালী এই দেবী রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পত্নীর নিকটে এক দিনের জন্যও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিয়াছিল, কারণ, তর্ক এবং বাক্য সমস্তই তাঁহার পত্নীর অংশে পড়িয়াছিল, তিনি পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন কি নীরবে, অতি বড়ো প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাসা প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্তমানে তাঁহাদের দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমাসরহদ্দ-স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোটো কথা বা নাকি কান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লীবাসী ভদ্রপুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি একপ্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা-প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গিতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বিপদে-সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে সকলের প্রধান-পদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমেরই মতো ভয় করিত। পথ্য

বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালোবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মতো অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোনো প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়োটির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়-বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নবদম্পতির নব প্রেমোদ্‌গমদৃশ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে, এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জন করিতে আরম্ভ করুক, তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কারণ, পূজক ঠাকুরের আর-একটি পূজার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল; তাহার নাম ছিল নিস্তারিণী। গোপনে ঘৃত দুগ্ধ ছানা ময়দার নৈবেদ্য স্বর্গের নরকে ভাগাভাগি হইয়া যাইত। কিন্তু আজকাল জয়কালীর শাসনে পূজার ষোলো-আনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে, উপদেবতাগণকে অন্যত্র জীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তক্‌তক্‌ করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। এই পার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্ক পত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্বে লুকোচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক্ক কুক্কুটমাংস-লোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে

বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর-সর্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী, পত্নী, দাসী—ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী পুত্র তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন, যে বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভালো করিয়াই জানিত, তথাপি তাহার দুর্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রুতি আছে, বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল, নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চ শাখায় দুটি-একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্তি দেখিলেন, সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল, কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেইজন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরানীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে, বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্বার মালা হস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, "ঠাকুমার, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি।"

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্তী কুটিরের কক্ষ হইতে নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জনে পরিণত হইয়া উঠিল—অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর-একটি জীবের ভীত কাতরধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেইসঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের দূরবর্তী চীৎকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটি তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভূ-পর্যন্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন!"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন, অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোনোক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন, "নলিন।"

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টকপ্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ, যাহার বিকশিত কুসুম-মঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল!

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে-উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধ দ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস নে।"

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতিক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ ১৩০১

বউ-চুরি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে সময়ে নব্য-বঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার একটা ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

মহামায়া বর্দ্ধমান জেলার একটি সুনিবিড় পল্লীগ্রাম। সুনিবিড় অর্থাৎ রেলওয়ে স্টেশন হইতে কুড়ি মাইল এবং পোষ্ট অফিস হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যভাগে দেবী মহামায়ার একটি বিগ্রহ স্থাপিত আছে—সেই হইতেই ইহার নামোৎপত্তি।

এই ক্ষুদ্র গ্রামটির একটি ক্ষুদ্র জমিদার আছেন তাঁহার নাম বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মধ্যম পুত্র অনাথশরণ, বি. এ. পরীক্ষা দিয়া কয়েকদিন হইল বাটী আসিয়াছে। ছেলেটির বয়স বাইশ বৎসর হইবে, বেশ পারিপাট্য আছে, চেহারাটি মন্দ নহে। কিন্তু পিতা তাহার উপরে কয়েকটি কারণে অত্যন্ত চটা। প্রথমতঃ সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া থাকে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ গৃহে ষোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে না। তাহার কারণ কি জান? সে বলে, যাহাকে আমি ভালোবাসিয়া বিবাহ করি নাই, সে আমার স্ত্রী নহে ভগ্নী। যদি জিজ্ঞাসা কর, উহাকে বিবাহ করিলে কেন? সে বলিবে, যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আমার এ সমস্ত মতাদি ছিল না। বালিকার দশায় কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমরা উভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইব, তাহার পর ব্রাহ্মবিবাহের যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, সেই আইন অনুসারে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিব। ও তখন ভালোবাসিয়া আর যাহাকে ইচ্ছা স্বামিত্বে বরণ করিতে পারিবে।

বিবাহের পর কলিকাতায় গিয়া অনাথশরণের একটি প্রাণের বন্ধু জুটিয়াছিল—তাহার নাম হেমন্তকুমার সিংহ। সে দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তাহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রপাতের অল্পকাল পরেই অনাথের মনে ধারণা জন্মিল যে সে হেমন্তকুমারের দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী নগেন্দ্রবালাকে ভালোবাসে। মনের এই চপলতায় প্রথমে অনাথ অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু হেমন্তকুমার তাহাকে সান্ত্বনা দিল। সে বলিল, ভালোবাসা একটি ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ, কোনও অবস্থাতেই তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারে না। বিশেষতঃ হেমন্তকুমারের প্রবল বিশ্বাস, প্রেম-সম্পর্ক-বিহীন পূর্ব্বরাগ-বর্জ্জিত বিবাহ বিবাহই নয়। অনাথ মন্দাকিনীকে ভালোবাসিয়া বিবাহ করে নাই, সুতরাং সে তাহার স্ত্রী নহে ভগ্নী, এই অদ্ভুত মত হেমন্তই অনাথের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়াছে। নগেন্দ্রবালাও যে অনাথের প্রতি প্রণয়শালিনী ইহাও দুই বন্ধু অনুমান করিয়া লইল। এই বিবাহ হইলেই যথার্থ আদর্শ বিবাহ হয়, ইহাই হেমন্তকুমারের মত। কিন্তু অনাথের তথাকথিত স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহা অসম্ভব। নগেন্দ্রবালার প্রতি প্রণয় ব্যক্ত করিবার অধিকার পর্য্যন্ত অনাথের নাই। হেমন্ত প্রায়ই বলিত—প্রাণে প্রাণে যোগ, আত্মায় আত্মায় মিলন, ইহাই ভালোবাসার চরম সফলতা,—বিবাহ না-ই হইল। কিন্তু নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইন হইবার কথা উঠা পর্য্যন্ত তাহারা অন্যরূপ পরামর্শ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নকাল বিগত প্রায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের আম-পাকান রৌদ্র বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অনাথশরণ বহির্ব্বাটীর একটি কক্ষে ডেস্কের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট। এই কক্ষটি তাহার নিজস্ব। এইখানেই রাত্রে শয়ন করে। ভিত্তিগাত্রে কয়েকখানি বিলাতী ছবির সঙ্গে একটি একতারা টাঙ্গানো, প্রভাতে ও সায়াহ্নে এইটি বাজাইয়া সে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া থাকে। গৃহসজ্জার মধ্যে একটি ক্লক, একটি আলমারি, একটি আলনা এবং শয়নের খাট ছাড়া আর কিছুই নাই।

ডেস্কের ভিতর হইতে অনাথ হেমন্তকুমারের একখানি্ সদ্যঃপ্রাপ্ত চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার যেখানে যেখানে নগেন্দ্রবালার নাম ছিল, সেখানে সেখানে চুম্বন করিল। চিঠিখানি সম্মুখে রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কি যেন ধ্যান করিতে লাগিল। ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল।

অনাথ তখন ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া, পত্রখানি খামে বন্ধ করিল। এক টুকরো কাগজ লইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল ঃ—

"আজ রাত্রি বারটার পর সকলে নিদ্রিত হইলে তুমি একবার আমার ঘরে আসিও।"

লিখিয়া কাগজখানিকে পাকাইয়া পাকাইয়া ছোট করিল। পূর্ব্বকথিত খামসুদ্ধ চিঠিখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখে, অঙ্গন জনশূন্য। প্রথম কক্ষে, তাহার বউদিদি কয়েকজন সখীকে লইয়া তাস খেলিতেছেন। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পালঙ্কের উপর জননী নিদ্রামগ্না। কুলুঙ্গীর কাছে তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি দাঁড়াইয়া, চুরি করিয়া কুল আচার ভক্ষণ করিতেছে। কাকাকে দেখিয়া সে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিল। কাকা তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। তৃতীয়টি পূজার ঘর; নারায়ণ-শিলা আছেন। মূর্ত্তিবিদ্বেষবশতঃ ইদানীং অনাথশরণ এই কক্ষে প্রবেশ করিত না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী মেঝের উপর বঁটি পাতিয়া তেঁতুল কাটিতেছে। দক্ষিণ হস্তের কাছে কলার পাতার উপর কতকটা কাটা তেঁতুল; বঁটির নিম্নে একরাশি কাঁইবীচি ছড়ান। মন্দাকিনীর ওষ্ঠাধর তাম্বুলরাগরঞ্জিত; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম; অঞ্চলাগ্র গলায় জড়ান। মন্দা আপন মনে হেঁট হইয়া তেঁতুল কাটিতেছিল। স্বামীকে দেখিতে পাই নাই। অনাথ প্রায় এক মিনিটকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ত্রীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। বিবাহের পর এই সে প্রথম মন্দাকে ভালো করিয়া দেখিতেছে।

উঠানে আমগাছের শাখা হইতে একটা পাকা আম বাতাসে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে মন্দা চমকিয়া বাহিরের পানে চাহিল;—দেখিল বারান্দায় স্বামী দাঁড়াইয়া। তৎক্ষণাৎ সে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আধহাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া জানালার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবিগুলি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

অনাথ মৃদুপদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। মন্দাকিনীর পা লক্ষ্য করিয়া পাকানো কাগজখানি ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে মন্দা কাগজখানি কুড়াইয়া লইল। প্রথমতঃ দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার কাছে আসিয়া কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহার পর একবার বাহিরে চাহিল। একটা আমগাছে কাঁচা পাকা অসংখ্য আম ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার ভিতরে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। অনেক দূরে ঘুঘু ডাকিতেছে। আবার কাগজখানি পড়িল; আবার আমগাছের পানে চাহিল। গাছের ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। মন্দা কাগজখানিকে বুকে চাপিয়া ধরিল। গলবস্ত্র

হইয়া, নারায়ণ-শিলার সিংহাসনের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। উঠিয়া আবার জানালার কাছে গিয়া কাগজখানি পাঠ করিল।

আজ তাহার জীবনের কি দিন? বিবাহের পর এই প্রথম স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। জুরগায়ে মন্দার বিবাহ হইয়াছিল। ফুলশয্যা হইতে পাই নাই। যে তিনদিন শ্বশুরবাড়িতে ছিল, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন সে তেরো বৎসরের। মাঝে একবার আসিয়া কয়েক মাস ছিল, তখন অনাথের নূতন "মতাদি" হইয়াছে। পরিজনবর্গের বহু আকিঞ্চন সত্ত্বেও অনাথ অন্তঃপুরে শয়ন করে নাই। এবার রাগ করিয়া তাহাকে কেহ বাটীর ভিতর আনিবার চেষ্টা করে নাই। অনাথের মাতা প্রতিদিনই নবীনাগণকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেন। কেহ কর্ণপাত করিত না। এতদিনে স্বামীর কি মনে পড়িয়াছে? মন্দার এ জন্মটা কি তবে বিফল হইবে না? স্বামী থাকিতেও তবে কি তাহাকে বিধবার জীবন যাপন করিতে হইবে না? তাহার আত্মীয়াগণের, সখীদের স্বামীর ভালোবাসার কথা, সোহাগের কথা, শুনিয়া শুনিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। মনে হইত, কি পাপ সে করিয়াছে যাহার জন্য ঈশ্বর তাহাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছেন। এইবার কি সে সব দুঃখ তবে দূর হইবে?

হঠাৎ মন্দাকিনীর চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। অগলিত দুয়ারে বাহির হইতে কে গুম্ গুম্ করিয়া কিল মারিতেছে।

ব্যস্ত হইয়া মন্দাকিনী দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার ছোট ননদ হরিমতি। হরিমতি বালবিধবা। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহার এ দশা ঘটিয়াছে। হরিমতি মন্দার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়; তবু দুই জনে খুব ভাব। দুই জনে একত্র এক শয্যায় শয়ন করে। দুই জনে দুই জনের সকল সুখ-দুঃখের ভাগী।

মন্দাকে দেখিয়া হরিমতি চমকিয়া বলিল—"তোর কি হয়েছে লা?"

মন্দা ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"হবে আবার কি?"

"দোর বন্ধ করে কি করছিলি?"

মন্দা চুপ করিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হরিমতির ভারি সন্দেহ হইল। মন্দার গলাটি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বলবিনে ভাই?"

"বলব।"

"কখন বলবি?"

"রাত্তিরে।"

"না এখনি বল্।"

মন্দাও বলিবে না, হরিমতিও ছাড়িবে না। শেষে মন্দা বলিল।

শুনিয়া প্রথমটা হরিমতি চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"হাসছিস কেন ভাই?"

হরিমতি বলিল—"হাসছি তোর বরটির রকম দেখে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই। এবার এসে অবধি ছোড়দার উস্‌খুস্ করে বেড়ান হচ্ছে। বলেও ছিলাম বড় বউদিদিকে।"

"কি বলেছিলি?"

"বলেছিলাম, ওগো, এবার হয়ত ছোড়দার মন হয়েছে। এবার তোমরা চেষ্টা কর দেখি, এবার হয়ত ঘরে আসবেন। তা বউদিদি বল্লেন—মন হয়েছে ত আসুক না। আমি কি বারণ

করেছি নাকি? আমি বল্লাম—এতদিন আসেন নি, এখন আপনা হতে কি আসতে পারেন? লজ্জা করে হয়ত। তিনি বল্লেন—সে বার অমন ক'রে আমাদের অপমান করলে, আবার আমি সাধ্‌তে যাব। আমি তেমন মেয়ে নই। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। দু মাস ত এখন ছুটি আছে। ভুগুক, জব্দ হোক।"

মন্দা বলিল—"আমি কিন্তু ভাই যেতে পারব না।"

"কেন?"

"সে আমার ভারি লজ্জা করবে।"

হরিমতি হাত নাড়িয়া বলিল—"ওলো দেখিস! কচি খুকীটি কিনা; বরের কাছে যেতে লজ্জা করবে। কতক্ষণে যাবি, ঘণ্টা গুণছিস, তাই বল্। মুখে আর ন্যাকামো করতে হবে না।"

মন্দা বলিল—"না ভাই ঠাট্টা রাখ্। আমার ভারি ভয় হচ্ছে।"

"প্রথম দিনটে ভয় হতে পারে। তা, একদিন বই ত নয়।"

"রোজ রোজ আমি যাব বুঝি? তা হলে একদিন ধরা পড়তে হবে না?"

"ধরা না পড়লে আর উপায় কি ভাই? একদিন লজ্জা ত ভাঙ্গতেই হবে।"

"তার চেয়ে তুই বরং বউদিদিকে বল্‌গে আর একবার। তিনি যা হয় করবেন।"

"আচ্ছা তা বলব; কিন্তু আজকের দিনটে চুরি করেই তোদের দেখা হোক। দেখিস্ চুরির কাঁচা পেয়ারাটা আমটার মতন চুরির সব জিনিসই বড় মিষ্টি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"ছোট বউ, ও ছোট বউ, ঘুমুলি ভাই?"

রাত্রে শয্যায় হরিমতি মন্দাকিনীকে ডাকিল। মন্দাকিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"বারোটা হয়েছে?"

"বারোটা ছেড়ে এই একটা বাজল ছোড়দার ঘড়িতে।"

"তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"

"নাঃ—আমার চোখে কি আর ঘুম আছে? যত ঘুম তোর। যার বিয়ে তার হুঁস নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।"

এই কথা বলিয়া হরিমতি প্রদীপ জ্বালিল। আলনা হইতে একখানা ধোয়া দেশী শাড়ী পাড়িয়া বলিল—"নে এইখানা পর্।" মন্দা বলিল—"না ভাই,—আর অততে কাজ নেই।" হরিমতি বলিল— "দূর ছুঁড়ি, এই ময়লা কাপড় পরে কি যায়?" বলিয়া মন্দার আঁচল ধরিয়া টান দিল। তখন মন্দা হরিমতির আদেশ পালন করিতে পথ পাইল না।

কাপড় পরা হইলে হরিমতি বলিল—"বল্ এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে না কি?" মন্দাকিনী একটা প্রচলিত দেশীয় ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইল। কারণ এ সময় হরিমতিকে রাগানো সুবুদ্ধির কর্ম্ম হইবে না। সুতরাং বলিল—"নইলে আমি বউ মানুষ একা যাব নাকি?"

দুই জনে দুয়ার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রি। মন্দাকিনীর পায়ে মল ছিল, ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। হরিমতি সে শব্দে চমকিয়া বলিল—"আ মরণ। মল চারগাছা খুলিস্‌নি? ভাবে ভোর হয়েছিস্ যে।"

মন্দাকিনী মল খুলিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া আসিল। তারপর দুই জনে বৈঠকখানা অভিমুখে চলিল। কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়া হরিমতি মন্দাকিনীর কানে কানে বলিল—"দোর ভেজিয়ে রাখব; আস্তে আস্তে সাবধানে আসিস এখন।" বলিয়া সে ফিরিয়া গেল।

মন্দা ধীরে ধীরে সিঁড়ি চারিটি ভাঙ্গিয়া স্বামীর ঘরের বারান্দায় উঠিল। দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখিল, আলো জ্বলিতেছে। প্রবেশ করিতে তাহার অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। বুকটি দুড় দুড় করিতে লাগিল। পা আর উঠে না। শেষে সাহসে ভর করিয়া দুয়ারটি নিঃশব্দে খুলিয়া প্রবেশ করিল।

দেখিল, মাথার শিয়রে বাতি জ্বালিয়া স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন।

পিছু ফিরিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া মন্দাকিনী খিল দিল। বাতিটা নিবাইয়া দিল। ঘরে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, এখন তাহা যেন হাসিয়া উঠিল। স্বামীর বিছানায়, স্বামীর মুখে, জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। মন্দা দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ সেই সুপ্ত মুখখানি দেখিল। ভাবিল—ইনি আমার স্বামী। আমার স্বামী বড় সুন্দর।

এইরূপে এক মিনিট অতিবাহিত হইল। মন্দা মনে মনে বলিল—"বেশ মানুষ ত। লোককে ডেকে এনে নিজে দিব্যি করে নিদ্রা হচ্ছে।"

কি করিবে কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। শেষে স্থির করিল, কখনও ত পদসেবা করিতে পাই নাই; এই প্রথম সুযোগ ছাড়ি কেন?

তখন সে সন্তর্পণে স্বামীর পদতলে উপবেশন করিয়া, পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আরামে অনাথশরণের নিদ্রা গভীরতর হইল। জানালা দিয়া মিঠা মিঠা দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। এই ভাবে কিয়ৎকাল—প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিলে, মন্দা স্বামীর পার কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুইটা বাজিবা মাত্র অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চেতনা প্রাপ্তির প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত অনুভব করিল, তাহার মন যেন কিসের প্রতীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ক্রমে স্মরণ হইল, আজ মন্দাকিনীকে আসিতে বলিয়াছে; যতক্ষণ জাগিয়া ছিল, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন সাড়ে বারোটা হইয়া গেল তখন মন্দাকিনী আসিবে না বুঝিয়া শয়ন করিয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্ব পরিবর্তন করিল। অমনি তাহার পা মন্দাকিনীর গায়ে ঠেকিল। কোমল স্পর্শে অনাথ বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল মন্দাকিনী ঘুমাইতেছে। জ্যোৎস্না তখন সরিয়া গিয়াছে; মন্দাকিনীর মুখখানির উপর পড়িয়াছে। সেই আলোকে অনাথ সুপ্তিমগ্না নবযৌবনা পত্নীকে দেখিতে লাগিল। বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। ঠোঁট দুখানি এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে; মন্দা বুঝি তখন কোনও স্বপ্ন দেখিতেছিল।

স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া অনাথ ভাবিতে লাগিল, এ বড় সুন্দর ত। এ যেন নগেন্দ্রবালার চেয়েও সুন্দর। দুই তিন মিনিট এইভাবে কাটিলে অনাথ সহসা মুখ ফিরাইয়া লইল; চক্ষু বুজিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—হে ঈশ্বর, আমার হৃদয়ে বল দাও।

চন্দ্রালোক হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে ভাবিয়া অনাথ ঝটিতি বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিল। কেরোসিনের তীব্র আলোকে মনে হইল বুঝি স্বপ্নজড়িমা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীর পায়ে হাত দিয়া তাহাকে জাগাইল।

মন্দা উঠিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কাপড়চোপড়গুলা কিছুতেই যেন আর বাগ মানে না। অনেক চেষ্টার পর, রীতিমত ঘোমটা দিয়া অনাথের পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া, মুখ নত করিয়া বসিল।

অনাথ ডাকিল—"মন্দাকিনী।"

মন্দা নিমেষমাত্র কাল ঘোমটার ভিতর হইতে অনাথের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার চক্ষু নামাইল।

"মন্দাকিনী, আজ তোমায় কেন ডেকেছি জান?"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল সে জানে না।

অনাথ বলিল—"তবে শোন। আমার সঙ্গে তোমায় কলকাতায় যেতে হবে। যাবে?"

মন্দা উত্তর করিল না।

অনাথ বলিল—"যাবে কি?"

অতি মৃদুস্বরে মন্দা বলিল—"আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানে যাব।"

"আমার বাপ মার অমতে অজান্‌তে। যেতে পারবে?"

মন্দা কোনও উত্তর করে না। অনাথ বলিল—"কথা কও। এখন লজ্জার সময় নয়। যেতে পারবে? বল।"

মন্দা বলিল—"মা বাপের অজান্‌তে কেন? তাঁদের অনুমতি নাও না, এখন ত সকলেই বিদেশে স্ত্রী নিয়ে যাচ্চে।

"সে প্রস্তাব আমি হারু কাকাকে দিয়ে করিয়েছিলাম। বাবার মত নেই। বলেছেন—ওর এখন মতি গতির স্থিরতা কি? নিজে যে চুলোয় ইচ্ছে হয় সেই চুলোয় যাক্। বাড়ির বউটাকে যে জুতো মোজা পরিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে, সে আমি বেঁচে থাকতে দেখতে পারব না।"

"তুমি আমায় ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে সত্যি কি?"

"আমরা দুজনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হব।"

মন্দাকিনী প্রমাদ গনিল। স্বামী কি রহস্য করিতেছেন? বলিল—"আমি ঠাকুর দেবতা মানি, আমি কি করে ব্রহ্মজ্ঞানী হব?"

অনাথ রীতিমত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—"ও বিশ্বাস তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে। ও সব ভুল। আমি কি করে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি?"

"তুমি লেখাপড়া শিখেছ। আমার কি বুদ্ধি আছে?"

"তোমাকেও লেখাপড়া শেখাব। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেব। মেয়েদের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।"

মন্দাকিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"লেখাপড়া যদি শিখতে হয় তবে আমি তোমার কাছে শিখব। বুড়ো বয়সে আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

অনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"তুমি ভুল বুঝছ। আমরা দুজনে একত্র এক বাড়িতে থাকব না ত।"

মন্দাকিনী বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে আমি কোথায় থাকব?"

"সেই ইস্কুলেই; সেইখানে মেয়েরা পড়ে, থাকে, রীতিমত সকল বন্দোবস্ত আছে।"

মন্দা স্থির স্বরে বলিল—"তবে আমি যাব না।"

অনাথ দেখিল, যেখানে রোগ, সেখানে চিকিৎসা হইতেছে না। সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। বলিল—"কেন আমি এতদিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিনি তুমি কিছু শুনেছ?"

মন্দা বলিল—"শুনেছি, কিন্তু ভালো বুঝতে পারিনি।"

"তবে বুঝিয়ে বলি, শোন। প্রথমতঃ আমাদের বিবাহ্ ভালোবাসার ফল নয়। দ্বিতীয়তঃ, তার অনুষ্ঠানাদি পৌত্তলিক মত অনুসারে হয়েছে। এই দুটি কারণে, আমার মতে, আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ। সুতরাং তুমি আমার স্ত্রী নও, বোনের মত। বুঝ্‌লে?" "না।"

"তবে আর একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলি শোন। আমি তোমায় ভালোবাসিনে।"

মন্দা বলিল—"তা ত দেখতেই পাচ্ছি।"

"আমি আর একজনকে ভালোবাসি।"

"তবে আমায় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কি করবে?"

"দেখ মন্দা, আমি তোমায় ভালো না বেসে বিয়ে করেছি, তাই তোমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। তার ওপর বাকী জীবনটা নিষ্ফল করে দিয়ে আর সর্বনাশ করব না। আমরা দুজনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করলে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা যাবে। তখন তুমি স্বাধীন হবে, যাকে ইচ্ছে বিবাহ কোরো। এই জন্যে কলকাতায় গেলে আমাদের একত্রবাস অসম্ভব। সব কথা বুঝতে পারলে?"

মন্দাকিনী বেশি করিয়া ঘোমটা দিল। কোনও উত্তর করিল না, প্রশ্ন করিল না, কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনাথ জানিতে পারিল, মন্দা কাঁদিতেছে।

ইহাতে অনাথ মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ইচ্ছা করিল মন্দার মুখের আবরণ খুলিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। এই রাত্রে, নির্জ্জন গৃহে, যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং শুধু বলিল—"মন্দা, কাঁদ কেন? আমি তোমার মঙ্গলের জন্যেই ত বলছি।"

কিন্তু মন্দাকিনী কিছুই বলিল না, তাহার ক্রন্দনও থামিল না।

অনাথ ডাকিল— "মন্দা।"—এবার স্বর অন্যরূপ; এ যেন আদরের স্বর। এ স্বর শুনিয়া মন্দা বেশি কাঁদিতে লাগিল।

অনাথ বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এ কথায় মন্দার এত দুঃখ? এত ক্লেশ? একটা ভাবী পরিত্রাণের আনন্দ সে অনুভব করিল না? আমি ভালোবাসি না—ভালোবাসিতে পারি না,— তাহা জানে, এ বন্ধন ছিন্ন হইলে, জীবনের সুখময় পথে চলিবার অবসর পাইবে। তথাপি এ প্রস্তাবে এত দুঃখ কেন? তবে কি আমায় ভালোবাসে?

এই সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। মন্দা উঠিয়া বলিল—"আমি যাই।"

অনাথ মন্দাকে স্পর্শ করিল। তাহার হাতখানি ধরিল,—ধরিয়া বলিল—"তোমার মনের কথা আমায় খুলে বল মন্দা।"

মন্দা কম্পিত স্বরে উত্তর করিল—"আমার এখন মাথার ঠিক নেই।"

"তবে কাল এস। আসবে?"

"দেখব।"

"দেখব না মন্দা, কাল নিশ্চয় এস।" অনাথের কণ্ঠস্বরে একটা আগ্রহ ধ্বনিত হইল। মন্দা বলিল— "আচ্ছা।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন যখন অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। প্রথমেই মন্দাকিনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি ছবির মত তাহার মনে উদয় হইল।

অনাথ উঠিয়া বসিল। দেখিল চুলে পরিবার একটি সোনার কাঁটা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেটি তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রাতে সে প্রতিদিন সঙ্গীত ও উপাসনা করিয়া থাকে। কখনও বাদ যায় না। আজ আর তাহা হইয়া উঠিল না। আজ তাহার মনটা বড় উদ্‌ভ্রান্ত।

গ্রামের বাহিরে নদীতীরে গিয়া অনাথ পদচারণা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইল, বাটীর এক জন ভৃত্য মাখন সর্দ্দার ছুটিতে ছুটিতে তাহার অভিমুখে আসিতেছে।

হঠাৎ অমঙ্গল শঙ্কায় তাহার মন চমকিয়া উঠিল। কি হইয়াছে? ও কি আমারে ডাকিতে আসিতেছে? মন্দাকিনীর কিছু হয় নাই ত? অথবা সে কিছু করিয়া বসে নাই ত?

মাখন সর্দ্দার নিকটস্থ হইলে অনাথ দেখিল সে কাঁদিতেছে।

দ্রুতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি মাখন? কি হয়েছে?"

মাখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আর দাদা ঠাকুর, সর্বনাশ হয়েছে। রোজা ডাকতে যাচ্ছি। কাটি ঘা।"

কাটি ঘা অর্থে সর্পাঘাত। অনাথ ভাবিল, মন্দাকিনীকে সর্পে দংশন করিয়াছে। মাখন ততক্ষণ অনেক দূরে। কাহার এরূপ হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল না।

তখনি অনাথ বাড়ি ফিরিল। প্রথমে সহজ পদক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে গতির বৃদ্ধি করিল; পরে দৌড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় বাড়িতে আসিতে একটু ঘুরিতে হয়। বাগানের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিল। বাগানে বাগানে বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া কিয়দ্দূরে গাছের আড়ালে হরিমতি ও মন্দাকিনীকে দেখিতে পাইল। তাহারা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেছে। দেখিয়া অনাথ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। উভয়েরই মাথার কাপড় খোলা। মন্দাকিনীর মুখখানি বিষণ্ণতা মাখা, হরিমতির চক্ষু দুইটি কৌতুকপূর্ণ। প্রথমে হরিমতিরা অনাথকে দেখিতে পায় নাই। কাছাকাছি আসতে দেখিতে পাইল। মন্দাকিনী ত্রস্ত হইয়া ঘোমটা দিল। হরিমতি অনাথের প্রতি যেন গোপনে হাস্য করিতেছে, যেন তাহার চক্ষু দুইটি দাদাকে বলিতেছে—"আমি সব জানি গো, সব জানি।" অনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"হরি, কাকে সাপে কামড়েছে?" হরিমতি বিস্মিত হইয়া বলিল—"সাপে কামড়েছে? কই, কাকে তা তো জানিনে।

অনাথ বৈঠকখানায় গিয়া শুনিল, মাখন সর্দ্দারের স্ত্রীকে সর্পদংশন করিয়াছে। তখন সে মাখনের বাড়ির অভিমুখে চলিল। সেখানে গিয়া দেখিল, অনেক লোক জমিয়াছে, রোজাগণ উচ্চ স্বরে মন্ত্র পড়িতেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কিছুতেই বাঁচিল না। মাখন যখন রোজা লইয়া আসিল তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখিয়া মাখনের যে কান্না! পাঁচ বৎসরের বালকের মত ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অনেকে সেই শোকবহ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না, হায়, হায়, করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। অনাথও চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ি ফিরিল; অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, একজন কৃষকের অশিক্ষিত অমার্জ্জিত হৃদয়ে এত ভালোবাসা। ইচ্ছা করিল হেমন্তকুমারকে আনিয়া একবার এ দৃশ্য দেখায়। সে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে,

BIRCH... 13769 2/5/07 24 cm 484 p. Rs-125/-

পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, মন্ত্রপড়া-বিবাহে ভালোবাসা কিছুতেই জন্মিতে পারে না, তাহা একেবারেই অসম্ভব।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল হেমন্তকুমারের একখানি পত্র আসিয়াছে।

সত্যমেব জয়তে কলকাতা

১৭ই জৈষ্ঠ্য, সোমবার

প্রিয় ভ্রাতঃ

গত কল্য তোমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। অদ্য একটা সুসংবাদ আছে। কান্তপুরের রাজা শ্রীযুক্ত আশ্বিনীরঞ্জন বাহাদুর তাঁহার পুত্রের জন্য একটি শিক্ষক অন্বেষণ করিতেছিলেন; বৈকালে দুই ঘণ্টা পড়াইতে হইবে। বেতন পঞ্চাশ টাকা। আমি ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। তোমায় তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন। কিন্তু তাহা হইলে তোমায় এক সপ্তাহের মধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি পত্র পাঠমাত্র পূর্ব্ব পরামর্শ-মত শ্রীমতী মন্দাকিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিয়া আইস। তোমার উত্তর পাইলেই আমি মহিলা বিদ্যালয়ে তাঁহার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব।

আমার সহিত দেখা হইলেই নগেন্দ্রবালা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তোমার প্রতি তাহার প্রেম যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগ্নী মন্দাকিনীকে লইয়া আসা সম্বন্ধে তুমি কিছু মাত্র দ্বিধা বা শঙ্কা করিও না। যদি বাধা প্রাপ্ত হও ত স্মরণ করিও পৃথিবীতে অধিকাংশ শুভকার্য্য সম্পাদনেই বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; ঈশা স্বীয় প্রিয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সর্ব্বমঙ্গল বিধাতা তোমার সহায় হউন।

ভবদীয়

শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ

অনাথ হেমন্তকুমারের পত্রের কোনও উত্তর দিল না। মন্দাকিনীর অশ্রুমাখা মুখখানি কেবল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সম্মত নয়। সে যে ভারি দুঃখিত। কি করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে?

অদ্য প্রভাতে মাখন সর্দ্দারের ব্যাপার দেখিয়া তাহার মত ও বিশ্বাসে একটু আঘাত লাগিয়াছে। হয় ত মন্দাকিনী তাহাকে ভালোবাসে, তাই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রস্তাবে সে অত দুঃখাতুর। বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়সঞ্চার না হইলে, পরে যে তাহা হইবেই না, তাহার স্থিরতা সম্বন্ধে অনাথের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি আসিয়া তাহার হাতে একটি খাম দিয়া সবেগে পলায়ন করিল। খাম আঠা দিয়া বন্ধ, ভিতরে চিঠি রহিয়াছে, অথচ কোনও শিরোনামা নাই। অনাথ খামখানি ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল; তাহাতে লেখা আছে :—

প্রিয়তমেষু,

তুমি আমায় যেখানে লইয়া যাইবে, যাইতে প্রস্তুত আছি। যে দিন যে সময়ে বলিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব। আজ রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

চরণাশ্রিতা দাসী

শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী

এ পত্র পাইয়া অনাথ ভারি বিস্মিত হইল। যাইতে প্রস্তুত? বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে আর দুঃখ নাই?

কয় পংক্তি অনাথ বারম্বার পাঠ করিল। যদি দুঃখ নাই তবে ভালোবাসে না। অথচ লিখিয়াছে "প্রিয়তমেষু"—"চরণাশ্রিতা দাসী"—ইহার অর্থ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিল, ওগুলা বাঁধিগৎ, ওগুলার কোনও বিশেষ অর্থ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাহার মনে ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। মনকে সে দুই তাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে তোমাকে ভালোবাসে না বাসে তাহাতে তোমার কি? মন বলিল—নাঃ—তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই। নগেন্দ্রবালার মানসী প্রতিমাকে সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বুকে চাপিয়া ধরিল, ভাবিল আর এক দিনও বিলম্ব করা হইবে না। কল্যই মন্দাকিনীকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। রাত্রি একটার সময় বাহির হইবে। দুই ক্রোশ দূরে রতনপুর গ্রাম; সে অবধি পদব্রজেই যাইবে। সেখান হইতে গোরুর গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইবে। তারকেশ্বর দিয়া যাইলে আট ক্রোশ, পাণ্ডুয়া দিয়া যাইলে এগারো ক্রোশ; পাণ্ডুয়া দিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। গ্রামের লোকজনের সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। একটু দূর হইবে, বিলম্ব হইবে, তা আর কি হইবে? সারারাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক আয়োজনে তাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই মন্দাকিনীকে লিখিল :—

প্রিয় ভগ্নী,

আজ রাত্রি একটার সময় যাত্রা করিতে হইবে। ঐ সময় আমার ঘরে আসিও। জিনিসপত্রের মধ্যে দ্বিতীয় একখানি বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই লইও না।

শ্রীঅনাথশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রি একটার সময়, স্ত্রীকে চুরি করিয়া অনাথ পলায়ন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুইদিন পরে বেলা বারোটার সময় যখন পাণ্ডুয়ার বাজারে অনাথশরণ গোশকট হইতে মন্দাকিনীর সহিত অবতরণ করিল, তখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রচণ্ডভাবে ধারণ করিয়াছে। দুইজনে স্বেদাক্ত কলেবর। গাড়িভাড়া চুকাইয়া দিয়া অনাথ একটা দোকানে উঠিল। দোকানী অভ্যর্থনা করিয়া মাদুর বিছাইয়া তাহাকে বসাইল। একটা ঝি আসিয়া মন্দাকিনীকে আড়ালে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থানে লইয়া গেল।

সেই ঘরের সম্মুখেই বারান্দা। বারান্দার নিম্নেই একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। জল বড় নির্ম্মল; মন্দাকিনীর শরীর বড় উত্তপ্ত; পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ। ঝিকে বাজার করিতে পাঠাইয়া মন্দাকিনী স্নান করিতে নামিল। তখনও সে যথেষ্ট বিশ্রাম করে নাই; গায়ের ঘাম পর্যন্ত মরে নাই। যতক্ষণ ঝি ফিরিল না, ততক্ষণ—আধঘণ্টা হইবে,—মন্দা জলে পড়িয়া রহিল। ঝি আসিলে, উঠিয়া মাথা গা মুছিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

এই অত্যাচারের প্রতিফল পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। রন্ধন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মন্দা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল।

অনাথ স্নান করিয়া জল খাইয়া স্টেশনে গিয়াছিল গাড়ির খবর লইতে, এবং হেমন্তকুমারকে টেলিগ্রাম পাঠাইতে। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, এই ব্যাপার। মন্দার গায়ে হাত দিল, গা একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে। চক্ষু দুইটি জবার মত লালবর্ণ। শীতে হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

সঙ্গে না আছে বিছানা বালিস না আছে বাহুল্য বস্ত্র। মন্দা কিসেই বা শয়ন করে, কি বা গায়ে দেয়। অনাথ বলিল—"একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি কম্বল চেয়ে এনে বিছানা করে দিচ্ছি।"

মন্দাকিনী বলিল—"তুমি আগে খেতে বস। তোমাকে ভাত বেড়ে দিই, তারপর শোব এখন।"

অনাথ বলিল—"পাগল। এখন ভাত বাড়তে হবে না। তোমার এমন অসুখ, আমি কি খেতে পারি?"

মন্দা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আমার অসুখ তা কি? তা বলে তুমি উপবাসী থাকবে? দুদিনের কষ্টে তোমার মুখ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।"

অনাথ দোকানীর নিকট চাহিয়া একখানা বালাপোষ আর খান দুই তিন কম্বল লইয়া আসিল। সেইগুলি দিয়া বিছানা করিয়া মন্দাকে বলিল—"শোবে এস।" মন্দা বলিল,—"ও কি কথা? তুমি না খেলে আমি শোব না।"

অনাথ শুনিল না, মন্দাকিনীকে শয়ন করাইল। বিছানায় শুইয়া মন্দাকিনী দুই তিন বার বলিল—"ভাত বেড়ে নিয়ে খাও তুমি আপনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে কষ্ট হবে।" কিন্তু আর বেশিক্ষণ জিদ করিবার শক্তি তাহার রহিল না, অল্পে অল্পে জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

*　　　　*　　　　*

তিন দিন পরে যখন মন্দাকিনীর জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন সে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, বিছানার কাছে স্বামী বসিয়া।

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"মন্দা, কেমন আছ?"

মন্দা বলিল—"ভালো আছি। তুমি ভাত খেয়েছ?" বলিতে বলিতে আশে পাশে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, সে দোকান নহে, এ গৃহ; পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি। আমি এ কোথায় রয়েছি?"

অনাথ বলিল—"মন্দা, তোমাকে যে আর কথা কইতে শুনব, তা ভাবিনি। তিন দিন কেটে গেছে। এ এখানকার জমিদারের বাড়ি।"

মন্দা বলিল—"তিন দিন।"

"হ্যাঁ মন্দা, তিন দিন তুমি অচেতন হয়েছিলে। এখন তোমায় যদি বাঁচাতে পারি, তবেই সব সার্থক।"

মন্দা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলিল—"তোমায় একটা কথা বলব।"

অনাথ বলিল—"কি মন্দা?"

"আমাকে বাঁচিও না।"

এ কথা শুনিয়া অনাথের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিল—"ছি মন্দা, ও কথা কি বলতে আছে? তুমি ভালো হবে, তুমি বাঁচবে।"

মন্দার ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল। জলভরা চোখ দুইটি অনাথের পানে ফিরাইয়া বলিল—"কি হবে আমার বেঁচে? আমায় যেতে দাও।"

অনাথ বলিল—"না মন্দা, তোমাকে আমি যেতে দেব না।"

"কি করবে আমায় নিয়ে?"

"আমি তোমায় ভালোবাসব।"

রোগিণীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক চিন্তার ভার আর সহিতে পারিল না। চক্ষু মুদিয়া মন্দা যেন ঘুমাইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু আসিলেন। অনাথ সহাস্যমুখে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল,— "দুপুর বেলাকার ওষুধটায় বেশ ফল হয়েছে। জ্ঞান হয়েছে। এই কিছুক্ষণ আগে কথাবার্ত্তা কয়েছেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"তবে আর ভাবনা নেই। এ জ্বরটুকু দুদিনে সারিয়ে দেব। কিন্তু আপনি যে মারা গেলেন। এ তিন দিন ত এক রকম না খেয়ে আপনি ঠায় বসে আছেন। আপনার মত পত্নীপ্রেমিক স্বামী আমি খুব কম দেখেছি!"

অনাথ মনে মনে বলিল—"খুব কম বটে।" প্রকাশ্যে বলিল—"আমার স্ত্রী, আমি ত স্বভাবতঃই করব। কিন্তু আপনি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।"

প্রবীণ ডাক্তার বাবু, আত্মপ্রশংসায় সঙ্কুচিতচিত্ত হইয়া বলিলেন,—"আমি বেশি কি করেছি? আমি যা করেছি সেই ত আমার পেশা, জীবিকা।"

"আপনি যদি বাবুদের বলে বাগানবাড়ি খুলিয়ে না দিতেন, তাহলে দোকানের সে স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় কম্বলের ওপর শুয়ে আমার স্ত্রী কদিন বাঁচতেন?"

ডাক্তার বাবু কথা উল্টাইয়া লইয়া অন্য কথা পাড়িলেন। তাহার পর ঔষধ পথ্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন রাত্রি দশটায় মন্দার জ্বর মগ্ন হইল। সে সারারাত্রি সুনিদ্রা উপভোগ করিল। তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া অনাথও কয় দিনের পর খুব ঘুমাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে যখন ডাক্তার বাবু আসিলেন, তখন মন্দাকিনী তাঁহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিল। জ্বর ছাড়িয়াছে শুনিয়া ডাক্তার বাবু অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আর কিছু মাত্র ভয় নাই। এখন ইঁহাকে খুব প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে, অনাথ মন্দাকে নিয়মিত ঔষুধ পথ্যাদি সেবন করাইল। তাহার পর দুইজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

মন্দা বলিল— "এ কদিন কি খেলে?"

"ডাক্তার বাবুদের বাড়ি থেকে খাবার আসত।"

"তবে চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? একেবারে শুকিয়ে যে আধখানি হয়ে গেছ। আমিই তোমার যত কষ্টের মূল। আমার জন্যে কেন এত করলে?"

অনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল—"যদি আমার ব্যারাম হয়, তা হলে তুমি আমার জন্যে কর না?"

মন্দা বিছানার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"আর ব্যারামের প্রার্থনায় কাজ নেই।"

অনাথ মন্দার একখানি হাত ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—"প্রার্থনা নাই করলাম, হলে কর কি না?"

"করি না ত কি?"

"কেন?"

অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে মন্দা বলিল—"তুমি যে আমার স্বামী।"

অনাথ মন্দার হাতখানি চাপিয়া বলিল—"তুমি যে আমার স্ত্রী।"

মন্দা সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল—"কবে থেকে?"

"যে দিন তোমায় ভালোবেসেছি।"

মন্দাকিনী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল—"তুমি না ব্রাহ্ম? তুমি না মিছে কথা বল না?"

অনাথ বলিল—"আমি ব্রাহ্ম, আমি মিছে কথা বলিনে, আমি তোমায় ভালোবাসি।"

"তবে সে দিন বল্লে 'ভালোবাসব'। কেন বলনি 'ভালোবাসি'?"

অনাথ নিরুত্তর। বলিল—"তুমি ত আমায় ভালোবাস না।"

"কিসে জানলে?"

"তুমি ত আমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হতে দিতে সম্মত হয়েছিলে তাই ত কলকাতায় যাচ্ছিলে।"

মন্দা হাসিয়া বলিল—"তা বুঝি?"

"কি তবে?"

"আমি বুঝি আসতে চেয়েছিলাম? ঠাকুরঝিই ত আমাকে পাঠালে।"

"তার ভারি ইচ্ছে তোমার আর একটি বিয়ে হয়?"

"হ্যাঁ,—পাত্রও ঠিক করে দিয়েছিল।"

"কে?"

"যমরাজা।"

অনাথ হাসিতে লাগিল। মন্দা বলিল—"ঠাকুরঝি বলেছিল, তোকে যেমন দাদা বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্চে, তুইও তেমনি পথে তার মন ডাকাতি করবি। না যদি পারিস, তবে—"

অনাথ বাধা দিয়া বলিল—"তবে ঐ বিয়ের বন্দোবস্ত? তা ডাকাতিই করেছ বটে। এদিকে অন্য বিয়ের যোগাড়যন্ত্রটিও বেশ করে তুলেছিলে।"

মন্দা বলিল—"কিন্তু সে ভালোবাসার বিয়ে হচ্ছিল না। তাই ব্যাঘাত হল। ঠিক কখন আমি ডাকাতিটে করেছি, শুনতে পাইনে?"

"সে সব পরে বলব।"

"কখন করেছি, সেইটে বল।"

"কখন? যেদিন প্রথম আমার বিছানায় পার তলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন আরম্ভ করেছ আর কি। তার পর সারাপথে।"

চাণক্যপণ্ডিত বুধগণের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন, ঘৃতকুম্ভসমা নারী এবং তপ্তাঙ্গারসম পুরুষকে একত্র স্থাপন করিবে না, করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই নরনারী স্বামী স্ত্রী হইলে এবং তরুণ বয়স্ক হইলে কি আর রক্ষা আছে।

মন্দা অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল—"পথে তবে কেন আত্মসমর্পণ করনি?"

অনাথ কিছুই না বলিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল—"নগেন্দ্রবালা? আমার স্বামীকে নগেন্দ্রবালা নেবে, নগেন্দ্রবালার বড় সাধ্যি! চল একবার কলকাতায়, তাকে আমি দেখব।"

অনাথ বলিল—"কলকাতায় ত যাব না। পশ্চিম যাব, তোমার শরীর সারাতে।"

মন্দা এ কথা যেন কানে তুলিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি সে তোমায় ভালোবাসে? তা হলে তার ত ভারি দুঃখ হবে।"

"সে আমায় ভালোবাসে কি না, সেই জানে আর ঈশ্বরই জানেন।"

"বলেনি? জিজ্ঞাসা করনি?"

"তার সঙ্গে কখনও এ কথা হয়নি।"

"তুমি ভালোবাসতে তা সে জানে?"

"কি করে জানবে?"

মন্দা অভিমান ভরে বলিল—"সে না জানুক, তুমি ত বাসতে।"

অনাথ বলিল—"কই আর বাসতাম? তা হলে তুমি এত শীঘ্র এত সম্পূর্ণভাবে আমাকে জয় করলে কি করে? এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল আমি তাকে যথার্থ ভালোবাসতাম না। শুধু চোখের ভালোবাসা ছিল, অন্তরে প্রবেশ করেনি। তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, তার আচার ব্যবহারের সৌন্দর্য্য, এই সমস্ত আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল।"

দুইদিন পরে মন্দা পথ্য পাইল। দুইটি দিন দুই জনে বাগান বাড়িতে বড়ই আনন্দে যাপন করিল।

আজ সন্ধ্যায় ডাক্তার বাবুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইয়া, কল্য প্রভাতের গাড়িতে তাহারা মুঙ্গের যাত্রা করিবে। সমস্ত ঠিকঠাক।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া অনাথ হেমন্তকুমারের নিকট হইতে এই পত্র পাইল—

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্

কলিকাতা
২৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার

প্রিয় ভ্রাতঃ

ভগ্নী মন্দাকিনীর অসুস্থার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর শীঘ্র তাঁহার আরোগ্যবিধান করুন।

আজ তোমায় একটা দারুণ দুঃসংবাদ দিব, প্রস্তুত হও। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, নগেন্দ্রবালা তোমাকে ভালোবাসেন। আমারও বিশ্বাস তাহাই ছিল। কিন্তু কল্য সন্ধ্যাকালে আমার সে ধারণা চূর্ণ হইয়াছে। শুনিলাম, শরতের সঙ্গে নগেন্দ্রবালার বিবাহ স্থির। আরও, শুনিলাম, দুই বৎসর হইতে তাঁহারা পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ। সুতরাং নগেন্দ্রবালার ব্যবহারে তুমি যে অনুমান করিয়াছিলে তোমার প্রতি তিনি প্রণয়রতা, তাহা তোমার ভ্রান্তি মাত্র।

এখন তুমি কি করিবে? এ দুঃসহ শোক কেমন করিয়া বহন করিবে?

তোমার আর একটা ভুল হইয়াছে। হিন্দু মতে যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, নূতন ব্রাহ্ম-বিবাহ আইনের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং তোমরা উভয়ে ব্রাহ্ম হইলেও, সে বন্ধন ছিন্ন করিবার পথও বন্ধ।

তুমি কি কলিকাতায় আসিবে? চারি পাঁচ দিনের মধ্যেও যদি ভগ্নী আরোগ্য লাভ করেন, এখানে আসিতে পার, তাহা হইলেও পূর্ব্বকথিত রাজবাড়ির সেই কার্য্যটি হস্তান্তরিত হইবে না। কিন্তু আমার পরামর্শ, ভগ্নীকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া তুমি কিয়দ্দিন হিমালয়ের কোনও নিভৃত

প্রদেশে গমন করতঃ তপস্যা ও উপাসনায় চিত্তস্থির ও আত্মশান্তিবিধান করিবে।

ভবদীয়

শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ

রাত্রি নয়টার পর ডাক্তার বাবুর বাড়ি হইতে ফিরিয়া অনাথ স্ত্রীকে পত্রখানি দেখাইল। মন্দা পড়িয়া হাসিয়া বলিল,—"তবে আর নগেন্দ্রবালার ওপর আমার রাগ নেই। মুঙ্গেরে না গিয়ে কলকাতাতেই চল, নগেন্দ্রবালার বিয়েটা দেখতে হবে।"

অনাথ বলিল—"তাই চল। মুঙ্গেরে যাবার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমায় ভুলে যেতে নগেন্দ্রবালাকে অবসর দেওয়া।"

শুনিয়া মন্দাকিনী ভারি অভিমানের ভান করিল। বলিল—"তাই তখন মনের কথা খুলে বল্লেই ত হত। বলা হল তোমার শরীর সারাবার জন্যে পশ্চিম যাচ্ছি।"

বাহিরে অন্ধকার বকুলগাছে একটা কোকিল বসিয়াছিল, সে হয়ত মানবের ভাষা বুঝিতে পারে। বুঝি মন্দাকিনীর এ ছলনাময় মনকথা শুনিয়া সে ভারি আমোদ পাইল। তাই মুহুর্মুহু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। অনাথ স্ত্রীকে বক্ষের নিকট টানিয়া লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"না গো না,—তা নয়।"

ভারতী : বৈশাখ ১৩০৭

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে তাহার হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙ্গিতে হয়—চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘের জল ও পায়ের নীচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সে দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদরে যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন ভাবিয়া পান না।

তারপরে এই কৃতাবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান—তাঁদের চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দশা হয় না!

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে যাক, কিন্তু ঐ চার-ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকই যে ছেলেপুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলেপুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। ইস্কুলে যাই—দু'ক্রোশের মধ্যে এমন আরও ত দু'তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন্ বনে বঁইচি ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুর-মেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এইসব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসল যা বিদ্যা—কামস্কট্‌কার রাজধানীর নাম কী এবং সাইবিরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে—এ সকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলে না।

কাজেই এক্‌জামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারসিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্‌লক খাঁ।—এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় একরকমই আছে—তারপরে প্রোমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাশে পড়িত। কবে যে সে প্রথম থার্ড ক্লাশে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না—সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় —আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাশটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার ফোর্থ ক্লাশে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেণ্ড ক্লাশে উঠার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না; ছিল শুধু গ্রামের একপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা পোড়ো-বাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খেলে, এমনি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো,—ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভালো করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে, সেই দিনই দেখিয়াছি, মৃত্যুঞ্জয় ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়, কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে, ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ-কথাও কোন বাপ ভদ্র-সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালপাড়ার এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ-যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার অনেক মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সমুখেই তক্তপোশের উপর পরিষ্কার ধপধপে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বোঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসী ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে, ন্যাড়া?

বলিলাম হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, ব'সো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এই যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল, এই কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম আজও যাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কতবড় গুরুভার! দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য, কত রাত-জাগা! সে কত বড় সাহসের কাজ। কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আব একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙ্গা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছ সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মত বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখেব চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় কববে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত? সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা 'না' বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, বন-জঙ্গলের পথ, একটু দেখে দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়। এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী হইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় ত যে কোন মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত। কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত!

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি—বাটীতে ছেলেপুলে চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে, শুধু

তাঁর সদ্য বিধবা স্ত্রী আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই?

তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় ত পুলিশের লোক জানবে কি করিয়া? এমনি কত কি। কিন্তু আমার ত আর বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেওয়া চাই—অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই, যা হবার সে ত হইয়াছে, আর বাইরে গিয়ে কি হইবে? রাতটা কাটুক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।

তিনি বলিলেন, 'হোক কাজ, তুমি ব'সো।

বলিলাম, বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে, বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রেই তিনি চিৎকার করিযা উঠিলেন, ওরে বাপ্‌রে! আমি একলা থাকতে পারব না।

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি বা সহে, তাঁর মৃতদেহটা এই অন্ধকার বাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও স্ত্রীর সহিবে না। বুক যদি কিছুতেই ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীব কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আবও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্তব্য জ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোনো মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী এক শ' বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোনো সন্ধানই পায় না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয় যখন কোনো নরনারীর কাছে পাওয়া যায়; তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক যদি হয় ত হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোনো মতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে অত-বড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই? তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াসুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামের ছিল কি না, কিন্তু একালে ত

কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে, এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে যে গেল—গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার জো রহিল না—অকালকুষ্মান্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে! গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ এ কথা শুনিলে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে-বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা,—অ্যাঁ—এ হইল কি? কলি কি সত্যই উলটাইতে বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে, তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো! তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না! এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়! গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন, নালতের মিত্তির-বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এইজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো-বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙ্গা বারান্দার একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠিসোঁটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়ো ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোন খুড়া কোনকালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে, মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকে দিয়েছে জানো!

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীরদর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো—এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এতবড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নর-নারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপরে একেবারে চুপ করিয়া

গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে—রোগা-মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ-ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেননা আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি, সেও কিছুতে মনে করিলাম না। কিন্তু আমার কথা যাক।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত, তা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা—এ ত একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা। কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া! হোক না সে আড়াই মাসের রুগী, হোক না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়! ভাত খাওয়া যে অন্ন পাপ! সে ত আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না! তা নইলে পল্লীগ্রামের লোক সঙ্কীর্ণ-চিত্ত নয়। চার-ক্রোশ-হাঁটা-বিদ্যা যেসব ছেলের পেটে, তারাই ত একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়! দেবী বীণাপাণির বরে সঙ্কীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া!

এই ত ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা করে পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাইহোক্, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে, গ্রামের বারোয়ারী পূজা বাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদ্‌ব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি, পথে আসিতে অনেকেই দেশের এবং দশের কল্যাণের নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক, তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সব সদনুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন!

কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণবঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরেজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসর-খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ-দুই দূরের মাল পাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটা কুটীরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তার মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়। কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ-পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রান্স পাস করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভালো কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোন কালে সে কসাই ভিন্ন আর-কিছু ছিল। কিন্তু, সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাই ত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লীগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক। ঝোঁকের মাথায় হয়ত বা অনধিকার চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে এই যে, আমি কোনমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বুইজন নর-নারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ এবং সেইজন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, তুমি না আগলালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্যে কত মারই না জানি তুমি খেয়েছিলে।

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে, এ কথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম, আজ কোথায় নাকি সাপ-ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের উপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখরো কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ, এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস-খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ

করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ ধরার মন্ত্র এবং হিসেব শিখাইয়া দিল এবং কবজিতে ওষুধ-সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে—

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—
মনসা দেবী আমার মা—
ওলট্ পালট পাতাল-ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
—দুধরাজ, মণিরাজ!
কার আজ্ঞে—বিষহরির আজ্ঞে!

ইহার মানে যে কি, তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এই মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি ছিলেন—নিশ্চয়ই কেহ না কেহ ছিলেন—তাঁর সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য-মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল, ততদিন সাপ ধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এতবড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু যে, সে ত ভালো-মন্দ কোন কথাই বলিত না। কিন্তু, বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এ-সব ভয়ঙ্কর জানোয়ার একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙ্গা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সে-সব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপধরাও কঠিন নয়, এবং ধরা সাপ দুই-চারি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গাই হোক, আর নাই হোক কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবা মাত্র সাপ পালাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত, যে-সাপটা শিকড় দেখিয়া পালাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বারকয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপরে তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক আর একটা কাঠিই দেখান হোক, সে যে কোথায় পালাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে—এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছিমিছি লোক ঠকাতে যাই?

আর একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। সাপ-ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত—আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয়

উপস্থিত না থাকিলে সে তো একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার ত একরকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ক্রটি করিতাম না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথাও ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভালো করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়ি সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে-ঘরের মেঝে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে—সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয়, এক জোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশিও থাকতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখচ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনতে পারে!

বিলাসী কহিল, দুই-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলছি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল, এবং মর্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট-দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ—করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উলটা পিঠ দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা সবাই যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ, সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে একহাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার মাত্র দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরে আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উর্ধ্বে আর উঠিবে না। এবং আমার সেই 'বিষহরির আজ্ঞে' মন্ত্রটা সতেজে বারবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চর্তুদিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন, সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকেও সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সবভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের-কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া নাকে কথা কহিতে শুরু করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, আমার বিষহরির দোহাই বুঝি বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন, এবং আমরা কখনো-বা একসঙ্গে কখনো-বা আলাদা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভালো কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন রোজা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে

লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে, মৃত্যুঞ্জয় ত মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে, রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি, সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাতদিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর, আমার মাথার দিব্যি রইল, এ-সব তুমি আর কখনো করো না।

আমার মাদুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নয়, এবং সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয়ই নরকে গিয়াছে। কিন্তু, যেখানেই যাক, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোন একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি।

খুড়ামশাই যোল আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত মৃত্যু হবে, ত হবে কার? পুরুষমানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে ত তেমন আসে-যায়-না—না হয় একটু নিন্দাই হ'তো। কিন্তু, হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে ম'লো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে একফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হ'লো একটা ভূজ্যি উচ্ছুগ্যু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্ন-পাপ? বাপ্‌রে। এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে.

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটাও অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল; আমি প্রায়ই ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই ত মানুষ। তবু এত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা, কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্বপ্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাত করিয়া আজীবন কেবল ভালটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ-ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক contract তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী—অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি

জানি, কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও, মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এই হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি-ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তি লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু-এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

রাজশেখর বসু

মাঘ মাস ১৬২৬ সাল। এই মাত্র আরমানী গির্জার ঘড়িতে বেলা এগারোটা বাজিয়াছে। শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া জুডাস লেনের একটি তেতলা বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। বাড়িটি বহু পুরাতন, ক্রমাগত চুন ও রঙের প্রলেপে লালচর্ম্ম কলপিত কেশ বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীচের তলায় অন্ধকারময় মালের গুদাম। উপরতলায় সম্মুখভাগে অনেকগুলি ব্যবসায়ীর আপিস, পশ্চাতে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক পৃথক অংশে বাস করেন। প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই তেতলা পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের দেওয়াল আগাগোড়া তাম্বুলরাগচর্চিত—যদিও নিষেধের নোটিস লম্বিত আছে। কতিপয় নেংটে ইঁদুর ও আরশোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রমমৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক, সিঁড়ির যাত্রিগণকে গ্রাহ্য করে না। অন্তরালবর্তী সিন্ধী পরিবারের রান্নাঘর হইতে নির্গত হিঙের তীব্র গন্ধের সহিত নরদমার গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত করিয়াছে। আপিস-সমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া কেনা-বেচা তেজি-মন্দ আদায়-উসুল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন।

শ্যামবাবু তেতলায় উঠিয়া একটি ঘরের তালা খুলিলেন। ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে—ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনাল মার্চেন্ট্স। এই কারবারের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামলবাবু (শ্যামলাল গাঙ্গালী) এবং তাঁহার শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি. এস. সি.। ঘরে কয়েকটি পুরাতন টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি আপিস-সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নানা প্রকার খাতা, বিতরণের জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিরেক্টরি, একখণ্ড ইন্ডিয়ান কম্পানিজ অ্যাক্ট, কয়েকটি বিভিন্ন কম্পানির নিয়মাবলী বা articles এবং অন্যবিধ কাগজপত্র। দেওয়ালে সংলগ্ন তাকের উপর কতকগুলি ধুলিধূসর কাগজমোড়া শিশি এবং শূন্যগর্ভ মাদুলি৷ এককালে শ্যামবাবু পেটেন্ট ও স্বপাদ্য ঔষধের কারবার করিতেন, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ রূপ। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক, কিন্তু এ পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই, ই. বি. রেলওয়ে অডিট আপিসের চাকরিই তাঁহার জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে, কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরির অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন—এ বিষয়ে শ্যালক বিপিনই তাঁহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার ব্যবসায় পত্নী এবং শ্যালক সহ বাস করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হলেই চাকরি ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া নূতন উদ্যমে ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল নামে আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্যামবাবু ধর্ম্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর মত তান্ত্রিক

সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা—অর্থাৎ ক্ষুধা না থাকিলে—মাংসভোজন, এবং অকারণে কারণ পান করেন না। কোন্ সন্ন্যাসী সোনা করিতে পারে, কাহার নিকট দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে, এই সকল সন্ধান প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু, আজকাল মধ্যে মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন, এবং অচিরে এই নামে সর্বত্র পরিচিত হইবেন এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাঁহার আপিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি সাধত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—'বাঞ্ছা, ওরে বাঞ্ছা।' বাঞ্ছা শ্যামবাবুর আপিসের বেয়ারা—এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিতেছিল—প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন—'গঙ্গাজলের বোতলটা আন্, আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ, যা ধুলো হয়েছে।' বাঞ্ছা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দুর-চর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ এবং পেটেন্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।

উক্তপ্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্যামবাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া লইয়া সংশোধন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশমশ শব্দ করিতে করিতে অটলবাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন—'এই যে শ্যামদা, অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি? বড় দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদার-ইন-ল কোথায়?'

শ্যামবাবু। বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল বলে।

অটলবাবু চাপকান-চোগা-ধারী সদ্যোজাত অ্যাটর্নি, পিতার আপিসে সম্প্রতি জুনিয়ার পার্টনাররূপে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পরিপক্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন—'বুড়ো রাজী হ'ল? আচ্ছা, ওকে ধরলেন কি ক'রে?'

শ্যাম। আরে তিনকড়িবাবু হলেন গে শরতের খুড়শ্বশুর। বিপিনের মাসতুতো ভাই শরৎ। ঐ শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকড়ি বাবুকে ধরি। সহজে কি রাজী হয়? বুড়ো যেমন কঞ্জুস তেমনি সন্দিগ্ধ। বলে—আমি হলুম রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি, গভরমেন্টের কাছে কত মান। কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে কি শেষে পেনশন খোয়াব? তখন নজির দিয়ে বোঝালুম—কত রিটায়ার্ড বড় বড় অফিসার তো ডিরেক্টরি করছেন, আপনার কিসের ভয়? শেষে যখন শুনলে যে, প্রতি মিটিং-এ ৩২ টাকা ফী পাবে, তখন একটু ভিজল।

অটল। কত টাকার শেয়ার নেবে?

শ্যাম। তাতে বড় হুঁশিয়ার। বলে—তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে লুঠ করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভগ্নীপতি মিলে ম্যানেজিং এজেন্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে আমার টাকা কোথায় থাকবে? বললুম—মশায়, আপনার মত বিচক্ষণ সাবধানী ডিরেক্টর

থাকতে কার সাধ্য লুঠ করে। খরচপত্র তো আপনার চোখের সামনেই হবে। ফেল হ'তে দেবেন কেন? মন্দটা যেমন ভাবছেন, ভালোর দিকটাও দেখুন। কি রকম লাভের ব্যবসা। খুব কম করেও যদি ৫০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ড পান তবে দু-বছরের মধ্যেই তো আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বললে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নেব, কিন্তু বেশি নয়, ডিরেক্টর হতে হলে যে টাকা দেওয়া দরকার তার বেশি নেব না। আজ মত স্থির করে জানাবেন, তাই বিপিনকে পাঠিয়েছি।

অটল। অমন খুঁতখুঁতে লোক নিয়ে ভালো করলেন না শ্যাম-দা। আচ্ছা, মহারাজাকে ধরলেন না কেন?

শ্যাম। মহারাজাকে ধরতে বড়-শিকারী চাই, তোমার আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া পাঁচ ভূতে তাঁকে শুষে নিয়েছে, কিছু আর পদার্থ রাখে নি।

অটল। খোট্টাটি ঠিক আছে তো? আসবে কখন?

শ্যাম। সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই তো সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রসপেক্টসটা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়িবাবুকে আসতে বলেছিলুম, বাতে ভুগছেন, আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।

'রাম রাম বাবুসাহেব।'

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কাল বনাতের কোট, পায়ে বার্ণিশ করা জুতা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ করা মলমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যামবাবু বলিলেন—'আসুন, আসুন—ওরে বাঞ্ছা, আর একটা চেয়ার দে। এই ইনি হচ্ছেন অটলবাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া।'

গণ্ডেরি। নমস্কার, আপনের নাম শুনা আছে, জানপহচান হয়ে বড় খুশ হল।

অটল। নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা বসে আছি। আপনার মত লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কি?

গণ্ডেরি। হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের হিঞ্ছা। হামি একেলা কি করতে পারি? কুছু না।

শ্যাম। ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী। দেখ অটল, গণ্ডেরিবাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার তা মনে করো না। ইংরেজি ভালো না জানলেও ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রেও বেশ দখল আছে।

অটল। বাঃ, আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় সুখী হলুম। আচ্ছা মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখলেন কি করে?

গণ্ডেরি। বহুত বাঙালির সঙে হামি মিলা মিশা করি। বাংলা কিতাব ভি অন্‌হেক পঢ়েছি। বঙ্কিমচন্দ্‌, রবীন্দরনাথ, আউর ভি সব।

এমন সময় বিপিনবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ইনি একটু সাহেবী মেজাজের লোক, এককালে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিধানে সাদা প্যান্ট, কাল কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্টহ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্তে কামানো। শ্যামবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হল?'

বিপিন। ডিরেক্টর হবেন বলেছেন, কিন্তু মাত্র দু-হাজার টাকার শেয়ার নেবেন। তোমাকে অটলকে আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এই নাও চিঠি।

অটল। তিনকড়িবাবু হঠাৎ এত সদয় যে?

শ্যাম। বুঝলুম না। বোধ হয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই করে নিতে চান।

অটল। যাক, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরাণ্ডম আর আর্টিকেল্‌সের মুসাবিদা এনেছি। শ্যাম-দা, প্রসপেক্টসটা কি রকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম। হাঁ, সকলে মন দিয়ে শোন। কিছু বদলাতে হয় তো এই বেলা। দুর্গা—দুর্গা—

জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ
১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রিত
শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

মূলধন—দশ লক্ষ টাকা, ১০্ হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশপিছু ২্ প্রদেয়। বাকী টাকা চার কিস্তিতে তিন মাসের নোটিসে প্রয়োজন মত দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র

ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনও কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন—ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। এতদর্থে সদ্য সদ্য চতুবর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কিরূপ বিপুল আয় তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশের একটি দেবমন্দিরের দৈনিক যাত্রিসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোক পিছু চার আনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক, যথেষ্ট টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থে 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডারগণের অর্থে একটি মহান্‌ তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং জাগ্রত দেবী সম্বন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টের হস্তে কার্য নির্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনও প্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ারহোল্ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেণ্ড পাইবেন এবং একাধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ডিরেক্টরগণ।— (১) অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচক্ষণ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট রায়সায়েব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বিখ্যাত ব্যবসাদার ও ক্রোড়পতি শ্রীযুক্ত গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া। (৩) সলিসিটর্স দত্ত অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত, M.A.B.I. (৪) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি. সি. চৌধুরী, B. Sc., A. S. S. (USA) (৫) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ (ex-officer)।

অটলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'বিপিন আবার নতুন টাইটেল পেলে কবে?'

শ্যাম। আর বল কেন। পঞ্চাশ টাকা খরচ করে আমেরিকা না কানস্কটিক্কা কোথা থেকে তিনটে হরফ আনিয়েছে।

বিপিন। বা, আমার কোয়ালিফিকেশন না জেনেই বুঝি তারা শুধু শুধু একটা ডিগ্রী দিলে? ডিরেক্টর হতে গেলে একটা পদবী থাকা ভালো নয়?

গণ্ডেরি। ঠিক বাত্। ভেক বিনা ভিখ মিলে না। শ্যামবাবু, আপনিও এখনসে ধোতি উতি ছোড়ে লঙোটি পিনছন।

শ্যাম। আমি তো আর নাগা সন্ন্যাসী নই। আমি হলুম শক্তিমায়ের সাধক, পরিধেয় হল রক্তাম্বর। বাড়িতে তো গৈরিকই ধারণ করি। তবে আপিসে পরে আসি না, কারণ, ব্যাটারা সব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আর একটু লোকের চোখ-সহ্য হয়ে গেলে সর্বদাই গৈরিক পরব। যাক, পড়ি শোন—

মেসার্স ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল এই কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন— ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহারা লাভের উপর শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিশন লইবেন, এবং যতদিন না—

অটলবাবু বলিলেন—'কমিশনের রেট অত কম ধরলেন কেন? দশ পার্সেন্ট অনায়াসে ফেলতে পারেন।'

গণ্ডেরি। কুছ দরকার নেই। শ্যামবাবুর পরবস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশনের ইরাদা থোড়াই করেন।

এবং যতদিন না কমিশনে মাসিক ১০০০্ টাকা পোষায়, ততদিন শেষোক্ত টাকা অ্যালউয়েন্স রূপে পাইবেন।

গণ্ডেরি। শুনেন অটলবাবু, শুনেন। আপনি শ্যামবাবুকে কী শিখ্‌লাবেন?

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রামে "সিদ্ধেশ্বরী দেবী" বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন দেবত্র সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্প্রতি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন যে উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অধুনা সর্বপীঠের সমন্বয় হইয়াছে এবং মাতা তাঁহার মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী অবলা বিধায় এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগ বিধায়, উক্ত দেবত্র সম্পত্তি মায় মন্দির বিগ্রহ জমি আওলাত আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।

অটল। নিস্তারিণী দেবী আবার কোথা থেকে এলেন? সম্পত্তি তো আপনার বলেই জানতুম।

শ্যাম। উনি আমার স্ত্রী। সেদিন তাঁর নামেই সব লেখাপড়া করে দিয়েছি। আমি এসব বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে চাই না।

গণ্ডেরি। ভালো বন্দোবস্ত কিয়েছেন। আপনেকো কোই দুস্‌বে না। নিস্তাণী দেবীকো কোন্ পহ্‌চানে। দাম কেতো লিচ্ছেন?

অতপর তীর্থপ্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্মাণ, দেবসেবাদি কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং এতদর্থে কোম্পানি মাত্র ১৫,০০০্ টাকা পণে সমস্ত সম্পত্তি খরিদার্থে বায়না করিয়াছেন।

গণ্ডেরি। ছন্দ্ কিয়া শ্যামবাবু। জঙ্গল কি ভিতর পুরানা মন্দিল, উস্‌মে দো-চার শও ছুছুন্দর, ছটাক ভয় জমীন, উস্‌পর দো-চার বাঁশ ঝাড়—বস্, ইসিকা দাম পন্দ্র হাজার।

শ্যাম। কেন, অন্যায়টা কি হল? স্বপ্নাদেশ, একান্ন পীঠ এক ঠাঁই, জাগ্রত দেবী—এসব বুঝি কিছু নয়? গুড-উইল হিসেবে পনের হাজার টাকা খুবই কম।

গণ্ডেরি। আচ্ছা। যদি কোই শেয়ারহোল্ডার হাইকোর্ট মে দরখাস্ত পেশ করে—স্বপন-উপন সব ঝুট, ছক্‌লায়কে রূপয়া লিয়া—তব্?

অটল। সে একটা কথা বটে, কিন্তু এই সব আধিদৈবিক ব্যাপার বোধ হয় অরিজিনাল সাইডের জুরিস্‌ডিক্‌শনে পড়ে না। আইন বলে—caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা সাবধান। সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই কর নি কেন? যা হোক একবার expert opinion নেব।

শীঘ্রই নূতন দেবালয় আরম্ভ হইবে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দির, নহবতখানা, ভোগশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৃহাদিও থাকিবে। আপাতত দশ হাজার যাত্রী উপযুক্ত অতিথিশালা নির্মিত হইবে। শেয়ারহোল্ডারগণ বিনা খরচায় সেখানে সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। হাট বাজার যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন যথেষ্ট থাকিবে। যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধপ্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে। মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী সেবার ভার লইবেন।

যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আরও নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্‌ভিন্ন by-product recovery-র ব্যবস্থা থাকিবে। সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলীতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগলসমূহের চর্মট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।

গণ্ডেরি। বকড়ি মারবেন? হামি ইস্‌মি নহি, রামজী কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে দিন।

শ্যাম। আপনি তো আর নিজে বলি দিচ্ছেন না। আচ্ছা, না হয় কুমড়ো-বলির ব্যবস্থা করা যাবে।

অটল। কুমড়োর চামড়া তো ট্যান হবে না। আয় কমে যাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসায় একটা গতি করতে পার?

বিপিন। কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধ হয় ভেজিটেব্‌ল শু হতে পারে। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব।

গণ্ডেরি। জো খুশি করো। হমার কি আছে। হামি থোড়া রোজ বাদ আপ্‌না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে কোম্পানির বাৎসরিক লাভ অন্তত ১২ লক্ষ টাকা হইবে এবং অনায়াসে ১০০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ট দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলেই অ্যালটমেন্ট হইবে। সত্বর শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই সুবর্ণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গণ্ডেরি। লিখে লিন—ঢাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকী দেড় লাখ শ্যামবাবু বিপিনবাবু অটলবাবু সমান হিস্‌সা লিবেন।

শ্যাম। পাগল আর কি! আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না হয় বড়লোক আছেন।

গণ্ডেরি। হামি-শালা রূপয়া ডালবো আর তুমি লোগ মৌজ করবে? সো হোবে না। সব্‌কা

ঝোঁখি লেনা পড়েগা। শ্যামবাবু মতলব সমঝ্‌লেন না? টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতী থাকবে। মেনেজিং এজিন্ট মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেন্টস্‌দের কাছ থেকে কর্জ করে নিজের নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্ছি; আবার কোম্পানি ঐ টাকা ম্যানেজিং এজেন্টস্‌দের কাছে গচ্ছিত রাখছে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্ছেন না, টাকাটা কেবল খাতাপত্রে জমা থাকবে।

শ্যাম। তারপর তাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হলে আমি মারা যাই আর কি। বাকী কলের টাকা দেব কোথা থেকে?

গণ্ডেরি। ডরেন কোনো? শেয়ার পিছ তো অভি দো টাকা দিতে হোবে। ঢাই লাখ টাকার শেয়ারে সির্ফ্‌ পচাস হাজার দেনা হোয়। প্রিমিয়ম মে সব বেচে দিব—সুবিস্তা হোয় তো আউর ভি শেয়ার ধরে রাখবো। বহুত মুনাফা মিলবে। চিম্‌ড়িমল ব্রোকারসে হামি বন্দোবস্ত কিয়েছি। দো চার দফে হম লোগ আপ্‌না আপ্‌নি শেয়ার লেকে খেলবো, হাঁথ বাদলাবো, দাম চড়বে, বাজার গরম হোবে। তখন সব কোই শেয়ার মাংবে, দাম কা বিচার করবে না। কবীরজী কি বচন শুনিয়ে—

ঐসী গতি সন্‌সারমে যো গাড়র কি ঠাট।
এক পড়া যব গাঢ়মে সবৈ যাত তেহি বাট।।

মানি হচ্ছে—সন্‌সারের লোক সব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খাদ্দেমে গির পড়ে তো সব কোই উসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই জান। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার করে দাও মা—অধম সন্তানকে যেন মেরো না।'

গণ্ডেরি। শ্যামবাবু, মন্দিল-উন্দিলকা কোম্পানি যো কর্‌না হ্যায় কিজিয়ে। উস্‌কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কি চিজ?

গণ্ডেরি। ঘই জানেন না? ঘিউ হচ্ছে আস্‌লি চিজ—যো গায় ভঁইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নক্‌লি যো হ্যায় সো ঘই কহ্‌লাতা। চর্বি, চীনাবাদাম তল ওগায়রহ্‌ মিলা কর্‌ বনায়া যাতা। পর্‌ সাল হামি ঘই-এর কামে পঁচিশ হজার লাগাই, সাঢ়ে চৌবিশ হজার মুনাফা মিলে।

অটল। উঃ বিস্তর সাপ মেরেছিলেন বলুন।

গণ্ডেরি। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিল্‌বে? উ সব ঝুট বাত।

অটল। আচ্ছা গণ্ডারজী—

গণ্ডেরি। গণ্ডার নেহি, গণ্ডেরি।

অটল। হাঁ হাঁ, গণ্ডেরিজী। বেগ ইওর পার্ডন। আচ্ছা, আপনি তো নিরামিষ খান, ফোঁটা কাটেন, ভজন-পূজনও করেন।

গণ্ডেরি। কেনো করবো না? হামি হর্‌ রোজ গীতা আউর রামচরিতমানস পঢ়ি, রামভজন ভি করি।

অটল। তবে অমন পাপের ব্যবসাটা করলেন কি বলে?

গণ্ডেরি। পাঁপ? হামার কোনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকত্তা, ঘই বনে হাথরস্‌মে। হামি না আঁখসে দেখি, ন নাকসে শুঁখি—হনুমানজী কিরিয়া। হামি তো সির্ফ মহাজন আছি—রূপয়া দে কর্ খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাপ হোবে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কি? যদি ফিন কুছ দোষ লাগে—জানে রন্‌ছোড়জী—হামার পুন্‌ভি থোড়া-বহুত জমা আছে। একাদ্‌সী, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাঁস, দান-খয়রাত ভি কুছু করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া—লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে—

অটল। লিলুয়ার ধর্মশালা তো আশরফিলাল ঠুনঠুনওয়ালা করেছে।

গণ্ডেরি। কিয়েছে তো কি হইয়েছে? সভি তো ওহি কিয়েছে। লেকিন বানিয়ে দিয়েছে কোন্? তদারক কোন্ কিয়েছে? ঠিকাদার কোন্ লাগিয়েছে সব হামি। আশরফি হমার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্ দিয়েছি তব্ না রূপয়া খরচ কিয়েছে।

অটল। মন্দ নয়, টাকা ঢাললে আশরফি, পুণ্য হল গণ্ডেরির।

গণ্ডেরি। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রুপেয়া হর্ জগেমে খরচ দিয়া। জোড়িয়ে তো কেতনা হোয়। উস পর কম্‌সে কম সঁয়কড়া পাঁচ রুপয়া দস্তুরি তো হিসাব কিজিয়ে। হাম তো বিলকুল ছোড় দিয়া। আশরফিলালকা পুন্ যদি সোলহ্ লাখকা হোয়, মেরা ভি অস্‌সি হাজার মোতাবেক হোনা চাহ্ তা।

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা। পুণ্যেরও দেখছি দালালি পাওয়া যায়। আমাদের শ্যাম-দা গণ্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়।

গণ্ডেরি। অটলবাবু, আপনি দো চার অংরেজি কিতাব পঢ়িয়ে হামাকে ধরম কি শিখ্‌লাবেন? বঙালি ধরম জানে না। তিস রুপয়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুট দিবে। হামার জাত রূপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন্ ভি করে হিসাবসে। আপ্‌নেদের রবীন্দরনাথ কি লিখছেন—

বৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নহি।

হামি এখন চলছি, রেস খেলনে। কোন্ট্রি গেরিল ঘোড়ে পর্ আজ দো-চারশও লাগিয়ে দিব।

অটল। আমি উঠি শ্যাম-দা। আর্টিকেলের মুসাবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রস্‌পেক্টস তো দিব্বি হয়েছে। একটু-আধটু বদ্‌লে দেব এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার।

বাগবাজারে গলির ভিতর রায়সাহেব তিনকড়িবাবুর বাড়ি। নীচের তলায় রাস্তার সম্মুখে নাতিবৃহৎ বৈঠকখানা-ঘরে গৃহকর্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গল্পে নিরত, অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ রবিবার, তাড়া নাই, বেলা অনেক হইয়াছে।

তিনকড়িবাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তামাকের ধোঁয়ায় পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে—কথা কহিবার সময় আরসোলায় দাড়ার মত নড়ে। তিনি দৈব ব্যাপারে বড় একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু আজ কালীঘাট হইতে প্রত্যাগত সদ্যঃস্নাত শ্যামবাবুর অভিনব মূর্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধানে লাল চেলী, গেরুয়া রঙের আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার শিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজিমাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপানো, এবং কপালে মস্ত একটা সিন্দুরের ফোঁটা।

তিনকড়িবাবু তামাক-টানার অন্তরালে বলিতেছিলেন—'দেখুন স্বামীজী, হিসেবই হল ব্যবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোনও ভয় নেই।'

শ্যামবাবু। আজ্ঞে, বড় যথার্থ কথা বলেছেন। সেইজন্যেই তো আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে মধ্যে এসে বিরক্ত করব, হিসেব সম্বন্ধে পরামর্শ নেব—

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। আমি সমস্ত হিসেব ঠিক করে দেব। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন করবেন। না হয় ডিরেক্টর্‌স্ ফী বাবদ কিছু বেশি খরচ হবে। দেখুন, অডিটার-ফডিটার আমি বুঝি না। আরে বাপু, নিজের জমাখরচ যদি নিজে না বুঝলি তবে বাইরের একটা অর্বাচীন ছোকরা এসে তার কি বুঝবে? ভারী আজকাল সব বুক-কিপিং শিখেছেন। সে কি জানেন—একটা গোলকধাঁধা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি—রোজ কত টাকা এল, কত খরচ হল, আর আমার মজুদ রইল কত। আমি যখন আমড়াগাছি সাবডিভিজনের ট্রেজারির চার্জে, তখন এক নতুন কলেজ-পাস গোঁফকামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না, অথচ অহংকারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আস্পর্ধা। শেষে লিখলুম কোল্ডহাম সাহেবকে, যে হজুর, তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দিশী ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে আড়ালে ছোকরাকে ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন—ওয়েল তিনকড়িবাবু, তুমি হলে কতকালের সিনিয়র অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কি বুঝবে? তারপর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা-গোলার চার্জে বদলি করে। যাক সে কথা। দেখুন, আমি বড় কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম বলে আমার নাম ছিল। মন্দির টন্দির আমি বুঝি না, কিন্তু একটা আধলাও কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। রক্ত জল করা টাকা আপনার জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন—

শ্যাম। সে কি কথা! আপনার টাকা আপনারই থাকবে আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না—আমি আমার যথাসর্বস্ব পৈতৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে ফেলেছি। আমি না হয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থে প্রয়োজন নেই, লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেক পঞ্চাশ হাজার ফেলছেন। গণ্ডেরি এক লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছে। সে মহা হিসেবী লোক—লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনে আশ্বাস হচ্ছে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহাম সাহেবকে কনসাল্ট করলে হয় না? অমন সাহেব আর হয় না।

'ঠাঁই হয়েছে'—চাকর আসিয়া খবর দিল।

'উঠতে আজ্ঞা হক ব্রহ্মচারী মশায়, আসুন অটলবাবু, চল হে বিপিন।' তিনকড়িবাবু সকলকে অন্দরের বারান্দায় আনিলেন।

শ্যামবাবু বলিলেন—'করেছেন কি রায়সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই আপনি বসলেন না?'

তিনকড়ি। বাতে ভুগছি, ভাত খাইনে, দু-খানা সুজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম। আমি একটি ফেৎকারিণী-তন্ত্রোক্ত কবচ পাঠিয়ে দেব, ধারণ করে দেখবেন। শাক-ভাজা, কড়াইয়ের ডাল—এটা কি দিয়েছ ঠাকুর, এঁচোড়ের ঘণ্ট? বেশ, বেশ? শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ব কদলী আর গব্যঘৃত বাড়িতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে—পনসে কদলং

কদলে ঘৃতম্। কদলীভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলী শৈত্যগুণ দূর হয়। পুঁটিমাছ ভাজা—বাঃ। রোহিতাদপি রোচকাঃ পুন্টিকাঃ সদ্যভর্জিতাঃ। ওটা কিসের অম্বল বললে—কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি। অম্বল জিনিসটা আমারও সয়ও না—শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্‌প্, উস্‌প্, উস্‌প্। প্রাণীয় আপানায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে তু জনার্দনম্। আরম্ভ কর হে অটল।

অটল। (জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখছি তাতে বাড়ি গিয়ে ক্ষুন্নি বৃত্তি করতে হবে।

তিনকড়ি। আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোন প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা লোকের—ইয়ে—মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে?

শ্যাম। অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণবে—অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন তো?

তিনকড়ি। হাঃ হাঃ, সে একটা তুচ্ছ কথা কি জানেন, কোল্ডহাম সাহেব বলেছিলেন, সুবিধা পেলেই লাট সাহেবকে ধরে আমায় বড় খেতাব দেওয়াবেন। বার বার তো রিমাইণ্ড করা ভালো দেখায় না তাই ভাবছিলুম যদি তন্ত্রে-মন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবুও—

শ্যাম। মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত করব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এসব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে-সে হলে চলবে না। খরচ—তা আমি যথা সম্ভব অল্পেই নির্বাহ করতে পারব।

তিনকড়ি। হুঁ। দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের আপিসে তো বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা—আমার একটা শালীপো আছে, তার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারেন না? বেকার বসে বসে আমাব অন্ন ধ্বংস করছে, লেখাপড়া শিখলে না, কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে গেছে। একটা চাকরি জুটলে বড় ভালো হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাব-চরিত্রও বড় ভালো।

শ্যাম। আপনার শালীপো? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিবের হেড-পাণ্ডা করে দেব। এখনি গোটা-পনর দরখাস্ত এসেছে—তার মধ্যে পাঁচজন গ্র্যাজুয়েট। তা আপনার আত্মীয়ের ক্লেম সবার ওপর।

তিনকড়ি। আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়িতে একটি পুরনো কাঁসর আছে—একটু ফেটে গেছে, কিন্তু আদত খাঁটী কাঁসা। এ জিনিসটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? সস্তায় দেব।

শ্যাম। নিশ্চয়ই নেব। ওসব সেকেলে জিনিস কি এখন সহজে মেলে?

* * *

গণ্ডেরির ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ারই বিলি হইয়া গিয়াছে। লোকে শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচা-কেনা হইতেছে।

অটলবাবু বলিলেন—'আর কেন শ্যাম-দা, এইবার নিজের শেয়ার সব ঝেড়ে দেওয়া যাক। গণ্ডেরি তো খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দু-দিন পরে কেউ ছোঁবেও না।'

শ্যাম। বেচতে হয় বেচ, মোদ্দা কিছু তো হতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কি করে?

অটল। ডিরেক্টরি আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামায় থাকতে চাইনে। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় আপনার তো কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

শ্যাম। এই তো সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাট-বাজার সবই তো বাকী। তোমাকে কি এখন ছাড়া যায়?

অটল। থেকে আমার লাভ? পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন তো ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির মরসুম চলল। আমাদের এইখানে শেষ।

শ্যাম আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রায় কি পৃথক্ ফল হয়? সন্ধ্যেবেলা যাব এখন তোমাদের বাড়িতে,—গণ্ডেরিকেও নিয়ে যাব।

* * *

দেড় বৎসর কাটিয়ে গিয়াছে। ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির আপিসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে। সভাপতি তিনকড়িবাবু টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলিতেছিলেন—'আ— আ—আমি জানতে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার তো বাড়িতেই টেকা ভার,—সবাই এসে তাড়া দিচ্ছে। কয়লাওয়ালা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা. ইটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার. তার পর ছাপাখানাওলা. শার্পার কোম্পানি. কুণ্ডুমুখুজ্যে, আরও কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা কি তার ঠিক নেই—এর মধ্যে দু-লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভণ্ড জোচ্চোরটা গেল কোথা? শুনতে পাই ডুব মেরে আছে, আপিসে বড় - একটা আসে না।'

অটল। ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকছেন- -এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ তো মিটিং-এ আসবেন বলেছেন।

বিপিন বলিলেন - 'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন সার, এই তো ফর্দ রয়েছে, দেখুন না— জমি-কেনা, শেয়ারের দালালি, preliminary expense, ইট তৈরি, establishment, বিজ্ঞাপন, আপিসখরচ- -'

তিনকড়ি। চোপ রও ছোকবা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

এমন সময় শ্যামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন- -'ব্যাপার কি?'

তিনকড়ি। ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিসেব চাই।

শ্যাম। বেশ তো, দেখুন না হিসেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম তদারক করে আসুন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মরি আর কি। সে হবে না—আমার টাকা ফেরত দাও। কোম্পানি তো যেতে বসেছে। শেয়ারহোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করছে।

শ্যামবাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন—'সকলই জগন্মাতার ইচ্ছা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এতদিন তো মন্দির শেষ হওয়ারই কথা কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব কারণে খরচ বেশি হয়ে গিয়ে টাকার অনাটন হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের আর অপরাধ কি? কিন্তু চিন্তার কোনও কারণ নেই, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা call-এর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।'

গণ্ডেরি বলিলেন—'আউর টাকা কোই দিবে না, অপকো থোড়াই বিশোআস করবে।'

শ্যাম। বিশ্বাস না করে নাচার। আমি দায়মুক্ত, মা যেমন করে পারেন নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানছেন, সেখানেই আশ্রয় নেব।

তিনকড়ি। তবে বলতে চাও, কোম্পানি ডুবল?

গণ্ডেরি। বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম। আচ্ছা তিনকড়িবাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ তো, আমরা না-হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে, সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে, আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?

অটল। এইবার পাকা কথা বলেছেন।

তিনকড়ি। হ্যাঁঃ আমি বদনামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম। বেগার খাটবেন কেন? আমিই এই মিটিং-এ প্রস্তাব করছি যে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জি মহাশয়কে মাসিক ১০০০৲ পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা হোক। এখন উপযুক্ত কর্মদক্ষ লোক আর কোথা? আর, আমরা যদি ভুলচুক করেই থাকি, তার দায়ী তো আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি। তা—তা—আমি চট্ করে কথা দিতে পারিনে। ভেবেচিন্তে দেব।

অটল। আর দ্বিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম। যদি অভয় দেন তো আর একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেছি, অর্থ হচ্ছে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কোম্পানির যোল-শ খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সৎপাত্রে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়ম চাই না—আপনি কেনা-দাম ৩২০০৲ মাত্র দিন।

তিনকড়ি। হ্যাঁঃ, ভালো করে আমার ঘাড় ভাঙবার মতলব।

শ্যাম। ছি ছি। আপনার ভালোই হবে। না হয় কিছু কম দিন,—চব্বিশ-শ—দু-হাজার—হাজার—

তিনকড়ি। এক কড়াও নয়।

শ্যাম। দেখুন, ব্রাহ্মণ হতে ব্রাহ্মণের দান-প্রতিগ্রহ নিষেধ, নইলে আপনার মত লোককে আমার অমনিই দেবার কথা। আপনি যৎকিঞ্চিৎ মূল্য ধরে দিন। ধরুন—পাঁচ-শ টাকা। ট্রান্স্‌ফার ফর্ম আমার প্রস্তুতই আছে—নিয়ে এস তো বিপিন।

তিনকড়ি। আমি এ—এ—আশি টাকা দিতে পারি।

শ্যাম। তথাস্তু। বড়ই লোকসান হল, কিন্তু সকলই মায়ের ইচ্ছা।

গণ্ডেরি। বাহবা তিনকৌড়িবাবু, বহুত কিফায়ত হুয়া।

তিনকড়িবাবু পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যঃপ্রাপ্ত পেনশনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তর্পণে গনিয়া দিলেন। শ্যামবাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন—'তবে এখন আমি আসি। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা আছে। আপনিই কোম্পানির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু—মা-দশভূজা আপনার মঙ্গল করুন।'

শ্যামবাবু প্রস্থান করিলে তিনকড়িবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'লোকটা দোষে গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হাম্‌বগ, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির ঝক্কিটা তো এখন আমার ঘাড়ে পড়ল। ক-মাস বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলুম, কিছুই দেখতে পারি নি, নইলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক, উঠে-পড়ে লাগতে হল—আমি লেফাফা-দুরস্ত কাজ চাই, আমার কাছে কারও চালাকি চলবে না।'

গণ্ডেরি। অপ্‌নের কুছু তকলিফ করতে হোবে না। কম্পানি তো ডুব গিয়া। অপ্‌কোভি ছুট্টি।

তিনকড়ি। তা হলে কি বলতে চাও আমার মাসহারাটা—

গণ্ডেরি। হাঃ, হাঃ, তুম্‌ভি রুপয়া লেওগে? কাঁহাসে মিলবে বাতলাও। তিনকৌড়িবাবু, শ্যামবাবুকা কারবারই নহি সমঝা? নব্বে হাজার রুপয়া কম্প্‌নিকা দেনা। দো রোজ বাদ লিকুইডেশন। লিকুইডেটের সিকিণ্ড কল আদায় করবে, তব্ দেনা শুধবে।

তিনকড়ি। অ্যাঁ, বল কি? আমি আর এক পয়সাও দিচ্ছি না।

গণ্ডেরি। আলবত দিবেন। গবরমিন্ট কান পকড়্‌কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।

তিনকড়ি। আরও টাকা যাবে। সে কত?

অটল। আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ারপিছু ফের দু-টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যাম-দার ১৬০০ আজ নিয়েছেন। এই ১৮০০ শেয়ারের ওপর আপনাকে ছত্রিশ শ টাকা দিতে হবে। দেনা শোধ, লিকুইডেশনের খরচা—সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরত পেতে পারেন।

তিনকড়ি। তোমাদের কত গেল?

গণ্ডেরি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'কুছ্‌ভি নহি, কুছ্‌ভি নহি। আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার তো সব শ্যামবাবু লিয়েছিল—আজ আপ্‌নেকে বিক্‌কিরি কিয়েছে।'

তিনকড়ি। চোর—চোর—চোর। আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি—

অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আর শেয়ার নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরি।

তিনকড়ি। অ্যাঁ—

গণ্ডেরি। রাম রাম।

গড্ডলিকা
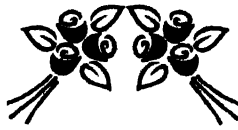
বেলোয়ারী টোপ

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

ঢেঁকির উপর বসিয়া চা খাইতেছিলাম।

চা জিনিসটা অপবিত্র, ম্লেচ্ছের খাদ্য, খাওয়াটা ম্লেচ্ছাচরণ এবং তৈরি চা অস্পৃশ্য জিনিস এই হৃদয়বিদারক নিদারুণ মিথ্যা অপবাদ দিয়া পিসিমা তাহাকে বাড়ি হইতে একেবারে বাহির করিয়া দিতে প্রাণপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার শ্লেষ্মা বৃদ্ধির ভয়ে নিতান্তই সে অসাধ্য সাধন করিতে না পারিয়া তাহাকে সরঞ্জাম সহ পঞ্চাশ হাত দূরবর্তী ঢেঁকিশালায় নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন। উপকরণ— চা, চিনি, দুধ, জল স্বতন্ত্র ভাবে যেখানে সেখানে রাখো, তাহাতে পিসিমার আপত্তি নাই, কিন্তু ঐ দ্রব্যগুলি মিশাইয়া সজল ও উষ্ণ করিয়া তুলিলেই সেটা 'খ্রেষ্টানী কাণ্ড'। নেহাৎ লাথি সহ্য করিতে হয় বলিয়াই বোধ করি পিসিমার হিন্দু ঢেঁকি আমার এই খ্রেষ্টানী কাণ্ডটা নীরবে সহ্য করিত; সে ক্রুদ্ধ হইয়া লেজ তুলিয়া গা-ঝাড়া দিলেই আমি আস্তাকুঁড়ে যাইয়া পড়িতাম।

যাই হোক, চা খাইতেছিলাম। সম্মুখের উঠানে বসিয়া পিরুদাস একদৃষ্টে বাছুরের ঘাস খাওয়া দেখিতেছিল। আমি তাহাকে সকৌতুকে প্রশ্ন করিলাম,—আচ্ছা, পিরু, আমাদের এই গ্রামের নাম পোড়াবৌ হল কেন? এমন সব ভালো ভালো নাম থাক্‌তে কিনা পোড়াবৌ।-- কাঞ্চনপুর, সুবর্ণগ্রাম, রতনপুর, রামচন্দ্রপুর, হরিহরনগর কেমন প্রাণভরা চমৎকার সব নাম; ভোরবেলা উঠে গ্রামের নাম করলেই কত পুণ্যি। সব থাকতে কিনা পোড়াবৌ; আর লোকে গ্রামের নাম করে না, বলে—হাঁড়ি ফাটে। বলিয়া হাসিযা মুখ তুলিয়া দেখিলাম, পিরুদাস আমার দিকে খানিকটা সরিয়া আসিয়া যেন থ হইয়া বসিয়া আছে।

পিরু বলিল,—এ গাঁয়ের নাম পূর্ব্বে পোড়াবৌ ছিল না, বাবু; কেন হল তা যদি শোনেন ত' নিবেদন করি।

আমি চায়ের পেয়ালার তিন-চারটা ঘন ঘন চুমুক দিয়া বলিলাম,—বল পিরু, শুনি।

পিরু নতচক্ষে খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া আমার দিকে চোখ তুলিয়া বলিতে লাগিল,—মানুষের মনের দিশে পেলাম না বাবু, এত বয়েস হল। মানুষ যে কি চায় আর কি না চায় তা আজও আমার ঠাহর হল না— বলিয়া পিরু ম্লানচক্ষে বাছুরটির দিকে চাহিয়া রহিল। আমি শ্রোতা হিসাবে খুবই সহিষ্ণু; পিরুর কথায় একটা হুঁ দিয়া পেয়ালা নামাইয়া বিড়ি দিয়াশলাই বাহির করিলাম।

পিরু বলিতে লাগিল,—এই যে বাছুরটা চর্‌ছে দেখ্‌ছেন, পেট ভরানো ছাড়া এর আর কোনো কাজ কি আছে? নাই; পেট ভরলেই এ নিশ্চিন্দি, কিন্তুক বাবু, মান্‌বের খাই-খাই আর মেটে না; ভরা পেটেও যেমন তার খাই-খাই, খালি পেটেও তেম্‌নি; একদণ্ড সে নিশ্চিন্দি না; কত-যে খাবে, তার কত সে ক্ষিদে তা' যেন সে নিজেই জানে না; সে জ্ঞাতির সর্ব্বস্ব খায়, নিজের মাথা খায়, পরের পরকাল খায়, তবু তার আশ মেটে না। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

আমি সংশয়ের সঙ্গে বলিলাম,—হ্যাঁ।

কিন্তুক আর একটা কথা ভাবুন বাবু, পেটের ক্ষিদেয় মানুষ যত পাগল না হয়, চোখের

ক্ষিদেয় আর মনের ক্ষিদেয় হয় তার চতুগ্গুণ। মানুষের এই মন নিয়েই ত' যত মারামারি, কাটাকাটি, পাপের কায্য। আবার এ কথাটাও ভাবুন বাবু, ভগমান চোখ আর মন দিয়েছেন—তাতে দিয়েছেন, ক্ষিদে; তেমনি আবার বুদ্ধি দিয়েছেন, বিবেচনা দিয়েছেন যে, মানুষ যেন র'য়ে স'য়ে কাজ করে। কিন্তু ক'জনে তা' করে বাবু?

আমি বলিলাম,—খুব কম লোকেই তা করে।

—তাই। তা' হলে দেখুন, মানুষ উঠ্তে বস্তে ভগবানকে একরকম অপমানই করে; ভগবান তাতে নারাজ হয়ে যান, মান্ষের তাতে ভালো হয় না। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

পিরু বলিল,—ভালো যে হয় না তারই প্রমাণ এই পোড়াবৌ গাঁ। বলিয়াই পিরু চম্‌কিয়া উঠিল; কর্কশ জিহ্বা বাহির করিয়া বাছুরটা তার পিঠের ঘাম চাটিতে শুরু করিতেছিল।

বাছুরটিকে ঠেলিয়া দিয়া পিরু বলিতে লাগিল, মান্ষের কথা আবারও বলি বাবু। আট আনা মন ধান দেখেছি, তখনো মানুষ যেমন ছিল, ছয় টাকা মণ এখন, এখনো মানুষ ঠিক তেম্‌নি আছে, তখনো লোকের হাহাকার ছিল, এখনো আছে। তখনকার দর আর এখনকার টাকা হ'লে তবেই হ'ত সুখ; তখন জিনিস ছিল বেশি, টাকা ছিল কম; তাই তখনো দেশে আঁকাল হ'ত, এখনো হয়। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠে যা পড়েছি, তা' যদি সত্যি হয় তবে সে-ও বড় কঠিন দিনই ছিল।

—ছিল বৈকি, কঠিনই ছিল; তখনো এমন লোক ছিল যে, খেতে পেত না। আমি বলছি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা—এ গাঁয়ের নাম তখন ছিল লক্ষ্মীদিয়া। এ গাঁয়ের লোক তখনো ক্ষিদেয় দুঃখু পেয়েছে। কিন্তুক একটা কথা আমি ভুল বলেছি বাবু, মাপ করবেন। তখন মান্ষের কষ্ট ছিল সত্যি, কিন্তুক সে কষ্ট সকলের না, আর রোজকার না; এখন যেন সকলেরই রোজই নাই-নাই। আর তখনকার দিনে গণ্ডগাঁয়ের কেমন একটা ছিরি ছিল, এখন তা' দেখ্‌তে পাইনে। তখনকার কেউ যদি আজ এ গাঁয়ে আসে তবে গাঁয়ের চেহারা দেখে, চিন্‌তেই পারবে না যে এই সেই লক্ষ্মীদিয়া কি পোড়াবৌ, যা-ই বলুন। সে ছিরি আর নাই। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় এ গ্রামের শ্রী ঋদ্ধি কিরূপ পরিবর্তিত বা অবনত অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা তখনকার লোকেই এখন বলিতে পারে। আমি মাত্র তেইশ বছর আগেকার মানুষ, তাই গ্রামের ষাট বছর আগেকার রূপটা ধ্যান করিয়া লইয়া আন্দাজের উপরেই বলিলাম,—হ্যাঁ, কই আর তেমন শ্রী। মাঠের, মান্ষের আর গরুর চেহারা ঠিক এক রকম দাঁড়িয়েছে, সবই যেন পোড়া-পোড়া।

—পোড়া-পোড়া বৈ কি, সে চেহারা আর নাই। তখনকার দিনে মান্ষের উঠোনে দুব্ব গজাত না বাবু, ধান মড়াইয়ের চোটে; এখন সব উঠানেই জঙ্গল। যাক্ সে কথা। আমি যখনকার কথা বল্‌ছি, তখন গাঁয়ের মানুষ বিদেশে বেরুতে কেবল লেগেছে। এখন যেমন সবাই বিদেশে, আর বিদেশ এসেছে কাছে, তখন ত এমন ছিল না; তখন বিদেশ ছিল দূর, আর বেরুত লোক কমই—একটা দুটো ক্বচিৎ ভবিষ্যৎ। তখন ত' রেল ছিল না যে হু হু শব্দে তিন দিনের পথ দিন ডণ্ডে নিয়ে ফেলবে একেবারে নিভ্‌ভয়ে। তখন নদী থাক্‌ত বারমাস বওতা, খাল-বিলেও বারমাসই জল থাক্‌ত, যাওয়া-আসা সবই চল্‌ত নৌকয় করে, আর ভয়ে

প্রাণটা হাতে করে;—ঝড় তুফান আর ডাকাত, এরাই ছিল নৌকর যম। ডাকাতের ভয়ে নৌক সব বহর বেঁধে চলত, দলছাড়া একলা নৌক পেলেই ডাকাতে তাকে মারত। তা যা হোক বাবু, এ কথা মিছে না যে মানুষের পয়সা তখন ছিল কম। এখনকার মত লোকে রোজই ভাতে না মলেও কাঁচা পয়সার মুখটা তেমন দেখ্‌তে পেত না। ঐ কাঁচা পয়সার লোভেই তখন মানুষে বিদেশে বেরুতে লেগেছে—দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি ঐ সব উত্তর অঞ্চলে। আমাদের এই লক্ষ্মীদিয়ার হরিশ ঠাকুর কাঁচা পয়সার লোভেই হঠাৎ নেচে উঠে একদিন বৌ ছেলে নিয়ে যাত্রা করে নৌকয় উঠল; তখন বর্ষাকাল। এই নদী দেখ্‌ছেন ময়না, সেউলি আর ঘাসে ভরা, ছোঁড়ারা লাফ্‌ দিয়ে দিয়ে এপার ওপার করে—তখন ময়নার এমন হাড়চাটা চেহারা ছিল না। আপনাদের ঐ চরের জমির মোট্‌টাই ময়নার পয়স্তি; ওপারের ঠিক্‌ অতখানি; নদী তাহলে কত চ্যাওড়া ছিল তা একবার ভেবে দেখুন। বর্ষাকালে তার জলের ডাকে কান পাতা যেত না, এমনি হু হু শব্দ। যা হোক্‌, কাঁচা পয়সার টানে হরিশ ঠাকুর বৌ-ছেলে নিয়ে নৌকয় উঠ্‌ল, বাড়িতে রেখে গেল বিধবা মেয়ে যোগেশ্বরীকে, যোগেশ্বরীর বছর তিনেকের একটা মেয়ে মিন্মই, আর তার বছর দেড়েকের একটা ছেলেকে।

হরিশ ঠাকুরের যাওয়ার সময় যোগেশ্বরী কেঁদে বল্‌ল,—বাবা আমাদের কি উপায় হবে?

হরিশ বল্‌ল,—তোমাদের উপায়? তোমাদের উপায় রেখে গেলাম ঐ গোলাবন্দী করে, আর ঐ ঢেঁকি থাক্‌ল, ধান ভান্‌বে আর খাবে। বলে সে মেয়েকে পায়ের ধূলো দিয়ে নিস্কাতরে যেয়ে নৌকয় উঠ্‌ল। কিন্তুক হরিশ ঠাকুরের মত মানুষ বোঝে না বাবু, যে যাবার সময় মানুষকে অমন করে গোলা দেখিয়ে যাওয়া তাকে অপমান করা। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—তা-ই। বিশেষ যখন কেবল যাচ্ছ বলেই কষ্টে আর একজনের বুক ফাটছে।...এদিকে মা আর মেয়ের কান্না আর শেষ হয় না। নৌক খোল্‌বার সময় বয়ে যায়, দাঁড়ি বেটা কাছি খুলে ফেলেছে, কিন্তুক মেয়ে মাকে আর ছাড়ে না,—হরিশ নৌকর উপর থেকে দাঁত খিচিয়ে তজ্জন করতে লাগল। মেয়েটা হালে বিধবা হয়েছিল। বাপ তাকে ফেলে রেখে বিদেশ যাচ্ছে দেখে তার সোয়ামীর শোকটাই উথ্‌লে উঠ্‌ল বেশি করে;— সোয়ামী যদি বেঁচে থাক্‌ত তবে ত এমন করে চ'খে আঁধার দেখ্‌তে হত না। হরিশ ঠাকুর কেমন যেন একটা দুস্মুখ চোয়াড় ধরনের লোক ছিল; চিরদিন একটা মিষ্টি কথা ভুলেও সে মেয়েকে বলে নাই, যাবার সময়ও দুখিনী মেয়েটাকে একটা মনবুঝান কথাও বলে গেল না। কাজটা কি তার উচিত হয়েছিল? বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—না, তার উচিত হয়নি।

—তা যাই হোক্‌, হরিশের বাস্তনী মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে ছেলে ভারতকে নিয়ে নৌকয় উঠ্‌ল। নৌক ছেড়ে দিল, হরিশ ঠাকুর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা করতে লাগল, জলের টানে নৌক তীরের মত ছুটে চল্‌ল; যোগেশ্বরী চোখের জল মুছে ছেলেটাকে কাঁখে করে মেয়েটার হাত ধরে ফিরে এল। কিন্তুক আমরা সেখানে দাঁড়িয়েই থাক্‌লাম সেই চলন্ত নৌকর দিকে চেয়ে, মনটা কেমন খালি হয়ে গেল। চলে যাওয়ার একটা দুঃখু আছে, বাবু, যা নিতান্ত নিস্পরেরও বাজে। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ, তা ত বাজেই।

—বাজে বৈকি। তারপর বর্ষার ঐ ভরা নদী। আমরা যেন বুঝ্‌তে পারলাম বাবু, নদীতে যেন জল ধরছে না, বিধবা এই মেয়েটির বুকের চার পাশ তেম্‌নি ভরা-জলের ধাক্কায় ভাঙছে। নদীর বাঁক ঘুরে নৌক চলে গেল, যখন আর একেবারেই দেখা গেল না তখন আমরা ফিরে এলাম, খানিক এসেই একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌লাম, নদীর ঘাট যেন খা-খা কর্‌ছে।

হরিশ বিদেশ গেল কি করতে তা' সে-ই জানে। মেয়েটা কিন্তুক ভাত-কাপড়ের দুঃখু কোনদিন পায় নাই। তখনকার দিনে মান্‌ষে মান্‌ষে আপন আপন একটা ভাব ছিল। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ, ছিল বলেই মনে হয়।

—ছিল বৈকি, কিন্তুক এখন তা নাই। নিজেরই মন দিয়েই বুঝ্‌তে পারি বাবু, তেমন আপন আপন যেন আর কাউকে লাগে না। যাই হোক্‌, যোগেশ্বরী ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে লাগল; গাঁয়ের দশজনই তাকে নিজের মা-বোনের মত চ'খে চ'খে রাখে, পাহারা দেয়, খোঁজ তল্লাস করে, বাজার-হাট ক'রে দেয়, দরকার হ'লে বদ্যি ডেকে আনে, ক্ষেতের আফর ঘরে তুলে দেয়; এম্‌নি ক'রে গাঁয়ের লোকই তাকে আগলে রাখে।... হরিশ ঠাকুর বর্ষার দিনে আসে, আবার বর্ষা থাক্‌তে থাক্‌তেই চলে যায়। আমরা হরিশের মুখে শুনি দেশ-বিদেশের গল্প, কবে কার নৌক কেমন করে ডাকাতে মেরেছিল তারই কথা, বিদেশী লোকের রীত-বেবীতেব কথা, আব লোকের মুখে শুনি হরিশের টাকাব কথা—হরিশের টাকার নাকি অন্ত নেই, শুন্‌লাম, হরিশ সেই বিদেশেই উত্তরেই পাকা ঘর-বাড়ি করেছে, সেইখানেই যে থাকবে; এখনও নাকি হবিশ বলেছে শুন্‌লাম যে, মেয়ের ছেলেটা যদি মানুষ হয়ে দেশের বাড়ি রাখ্‌তে পাবে বাড়ি থাক্‌বে, না পারে বাড়ি যাবে। শুনে আমার মনে বড় কষ্টই পেলাম। বাপ-ঠাকুদ্দার বাস্তুব মাযা কাটিয়ে হরিশ সেই মুলুকে থাকতে চায় কোন্‌ প্রাণে। কিন্তুক অবশেষ কালে হলও তাই।—প্রথম প্রথম সে বছর বছর আস্‌ত, তারপর দু'তিন বছর পর পর, তারপর একেবারেই আসা ছেড়ে দিল। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, হরিশ বলেই এমন কাজটা পার্‌ল, আর কেউ পার্‌ত না। কিন্তুক্‌ এখন দেখ্‌ছি বাবু, সবাই তা' পারে। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ। এখন ত বিদেশেই ঘব-বাড়ি করে আছে অধিকাংশ।

—আছে বৈকি বাবু, আছে; তা' না থাক্‌লে আর গাঁয়ের এমন অরাজক হা-দশা হবে কেন। তা' যাক্‌, এখন হরিশের কথাই শেষ করি। হরিশ আর গাঁয়ে আসে না, এম্‌নি করেই দিন যায়; হঠাৎ একদিন একপহর বেলা আছে, এমন সময় যোগেশ্বরীরই গলার মড়া কান্না শুনে আমরা দশে-বিশে দৌড়ে এলাম—বলি ব্যাপারটা কি। এসে শুন্‌লাম, হরিশ ঠাকুর মারা গেছে; সে যেদিন মারা গেছে তার একদিন পরেই তার বান্ডনীও মারা গেছে—দু জনেই ঐ এক কলেরাতেই; ছেলে ভারত ভালোই আছে। তখন গাঁয়ে গাঁয়ে ডাকের আপিস ছিল না, এ গাঁয়েও ছিল না; উ-ই নিধিরামপুর থেকে, আড়াই কোশ্‌ দূর থেকে, হরকরা এসে, মঙ্গলবারে মঙ্গলবারে ডাকের চিঠি দিয়ে যেত। আমরা চিঠি পড়ে হিসেব করে দেখ্‌লাম, হরিশ ঠাকুর মারা গেছে আজ দশ দিন।...

যা' হোক্‌, সেদিকে যা' হবার তা' হল।

কিন্তুক এর মধ্যে আর দুটো ঘটনা ঘটে গেছে—মিন্মই আর ভারতের বিয়ে। তখনকার দিনে, বাবু, বিয়ের ছেলে ছিল সস্তা, মেয়ে ছিল আক্রা, টাকা দিয়ে মেয়ে নিতে হত। এই টাকা

চাওয়া আর দেওয়া নিয়ে কথা-কাটাকাটি চল্‌তে চল্‌তে মিন্ময়ীর বয়েস দশ উৎরে এগার হয়ে গেল। এখন ঘরে ঘরে সতের আঠার বছরের আইবুড়ো মেয়েরা বেশ স্বস্‌ছন্দে আছে; বড় হয়েছে বলে তাদের বাপ মার কি তাদের নিজের কোনো ভাবনাই যেন নেই। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ। তা ত আছেই।

—আছে বৈকি। কিন্তুক তখন দশ উৎরে এগারোয় পড়লে মান্‌ষের হাত মাথায় উঠে যেত। আর তার গঞ্জনা ছিল কি কম! গঞ্জনার জ্বালায় লোকে গলায় দড়ি দিতে দৌড়ত। যোগেশ্বরী ছিল, বোকাসোকা আর বড়ায় ঢিলে মানুষ। বিধবা আর একা হলেও যে কাজটা সে পার্‌ত তা-ও যেন তার ভুল হয়ে যেত। ছেলের ঘর বাছ্‌তে বাছ্‌তে, মেয়ের দর কষ্‌তে কষ্‌তে, হবে হচ্ছে, এটা নয় ওটা করতে করতে মিন্ময়ী এগারোয় পড়ল; তখন লেগে গেল হুড়োহুড়ি তাড়াতাড়ি। লোকের গঞ্জনায় যেন পাগল হয়ে যোগেশ্বরী মিন্ময়ীর বিয়ে দিল এক সেকেলে বুড়োর সঙ্গে। তাতে দেশের লোকের মাথায় পোকা মরল, কিন্তুক দেশের লোকের আশীর্ব্বাদ পেয়েও বুড়ো বেশি দিন টিক্‌ল না; মিন্ময়ী বিধবা হয়ে মায়ের কাছে এল—তখন সে বারো উৎরে মাত্তর তেরোয় পড়েছে। আর একটা কথা, বাবু; তখনকার দিনে বিধবা হওয়াটা কেমন ধাত-সওয়া মত ছিল, কিন্তুক আজকাল সেটা যেন কারুরই ধাতে সয় না। বলুন, বাবু, হ্যাঁ কি না?

পূর্ব্বে বৈধব্য সকলেরই ধাতে সহ্য হইত, এবং এখনও পূর্ব্ববৎ সহ্য হয় কিনা তাহা সহসা অনুমান করিতে না পারিয়া পিরুর প্রশ্নের উত্তরে কিছুক্ষণ নিরুত্তরই রহিলাম। খানিক ভাবিয়া বলিলাম, —তা' হবে।

পিরু বলিল,—তা-ই। বুড়ো বুড়ো বিধবারও এখন বিয়ে হয় শুনি; কিন্তুক তখনকার দিনে আঁতুড়ে মেয়ে বিধবা হলেও তার আবার বিয়ের কথা লোকে মনে আন্‌তেও পার্‌ত না।

হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র এবং সনাতন প্রথার প্রতি আমার মনের টান নাই, তাদের বিরুদ্ধে আমার আক্রোশও নাই; বাহিরের জিনিস বলিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে ঐগুলিকে বাহিরেই রাখিয়া দিয়াছি। শাস্ত্রে প্রথার গরমিল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে পদে পদে গরমিল, কাজে কথায় গরমিল—চারিদিককার অসংখ্য সেই গরমিলের গোলোকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিবার অনিচ্ছাতেই আরও দশজনের মত আমিও হিন্দুর, এমন কি মানুষেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম আচার বিচার বিষয়ে একেবারে নিঃস্পৃহ। ধর্ম্ম মনে, আর যাহাতে মানুষের দুঃখের হ্রাস হয়, তাহাই কর্তব্য—এই শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া আমি বসিয়া আছি। পিরুর কথার উত্তরে অনেক কথাই বলিবার ছিল—বৈধব্য কেহ সহিতেছে না তারও হেতুর মর্ম্মের কথাটা বলিতে পারিতাম; কিন্তু পথে চলিতে চলিতে গুরুভার অথচ অনাবশ্যক যে বস্তুটিকে অক্লেশে এড়ান যায় তাহাকে ধাক্কা দিয়া দিয়া সঙ্গের সাথী করিয়া লওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা।

বলিলাম,—তারপর মৃন্ময়ীদের কি হ'ল?

পিরু কাঁধের গামছাখানা ডান দিক হইতে বাঁ দিকে আনিয়া বলিতে লাগিল,—তারপর অনেক দিন যোগেশ্বরী মন খুব খারাপ করে থাকল; মেয়ের মুখের দিকে চাইলেই তার চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে। কেঁদে কেটে ভারতকে সে চিঠি লিখ্‌ল—বৌটিকে নিয়ে একবার আয় ভাই; তাকে আমি দেখি নাই; যদি তোদের মুখ দেখেও আমার বুকের আগুনে নেবে।... বৌ নিয়ে ভারত দেশের

বাড়িতে এল। এসেই বল্‌ল, মাস ছয়েক থাক্‌ব—বেশিদিন থাকবার যো নেই; সেখানে কাজ বিস্তর, জোত্‌, জমা, তেজারতি, কত কি। দেখ্‌লাম ছেলেটি বেশ সুপুষে, তার বাপের মত ঘটখোট্রা হ্যাঙ্গামে নয়; বৌটাও চমৎকার লক্ষ্মী। বাড়িতে শুনলাম, বৌটার সন্তান হবে, এই তিন মাস। যোগেশ্বরী ভাই আর ভাজ পেয়ে যেন হাতে স্বগ্‌গ পেল, মিন্মইও তাই; মায়ে ঝিয়ে একেবারে অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল, তাদের কি খাওয়াবে, কেমন করে তুষ্ট করবে। রক্তের টান ত ছিলই, তার উপর তারা গরীবের বৌ ঝি, ওরা বড়লোক, ওদের অন্নেই মিন্মইর মা মানুষ; দয়া করে ওরা এসেছে যদি, কষ্ট পেয়ে না যায়।

ভারত সময়-মত খায়-দায় আর বৌটিকে নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে।

ভারতের ছ'মাসের দুটি মাস এমনি করেই কাট্‌ল, কিন্তুক তারপরই এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল; যার দুঃখু এখনো আমার যায় নাই, বাবু। কাণ্ডটা ঘট্‌ল সত্যিই, কিন্তুক না ঘট্‌লেও তা কারু কিছু হানি হ'ত না। যদি বলেন, ঘটালেন ভগবান—কিন্তুক সেটা বড় শক্ত কথা, বাবু; সে-কথার ফয়শালা আমরা করতে পারিনে।...

পিরু খানিক চোখের পলক ফেলা বন্ধ রাখিয়া নিঃশব্দ থাকিয়া বলিতে লাগিল,—যেদিন ঘটনাটা ঘট্‌ল, বাবু, সে দিন বড় বিষ্টি, সন্ধ্যে রাত, অন্ধকার, আর তেম্‌নি গলদ্‌ধারে বিষ্টি। যোগেশ্বরী তার হবিষ্যি ঘরে বসে জপ করছিল, তার ছেলেটি একধারে বসে ইস্কুলের পড়া করছিল। ভারতের বৌ গিরিবালা রান্নাঘরে মাছভাত রাঁধছিল; হঠাৎ কি দরকারে সে ভারতের শোবার ঘরে উঠে চৌকাঠে পা দিয়েই দেখ্‌ল—

পিরু থামিল। আমি সোৎসুকে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম; এবং পিরু আর কথা কহে না দেখিয়া উপরন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভারতের বৌ কি দেখ্‌লে?

উত্তরে পিরু অত্যন্ত বিষণ্ণ সুরে বলিল,—বাবু, আপনি আমার মনিব। আপনি ছেলেমানুষ, কিন্তুক গোখ্‌রোর বাচ্চা গোখ্‌রোই। মনিবের মুখের সামনে কথাটা উচ্চারণ করব কি না তাই ভাব্‌ছি।

আমি মুরুব্বির মত সদয় কণ্ঠে অভয় দিয়া বলিলাম,—বল।

পিরু সাবধানে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া গলা খুব খাটো করিয়া বলিল,—দেখ্‌ল ভারত মিন্মইর মুখখানা তুলে ধরে হেসে হেসে—

আমার কল্পনা ছুটিতেছিল; লাফাইয়া উঠিলাম,—বল কি?

পিরু কথা কহিল না।

বহুক্ষণ নতমুখে নিস্তব্ধ থাকিয়া যখন সে কথা কহিল, তখন তার কণ্ঠস্বর ক্লেশে যেন ভাঙা ভাঙা। বলিল,—মান্‌ষের মন কি যে চায় আজও তার দিশে পেলাম না, তা আগেই বলেছি। ভগবান ধম্ম দিয়েছেন, অধম্মও দিয়েছেন, আর মন দিয়েছেন বুঝে নেবার। কিন্তুক মানুষ তা' বুঝ্‌ল না, বাবু। সব ডুবিয়ে দিয়ে, সব ভাসিয়ে দিয়ে মানুষ ঐ কাজটিকে কেন বড় করে তুলেছে তা' অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারি নাই, বাবু। জিনিসটা আছে সত্যি, আর সে ছুটবেই, কিন্তুক তার ওজন নাই কেন তা' জানিনে। মানুষ ইচ্ছা কল্লেই জিনিসটাকে বশে আন্‌তে পারে—দুনিয়ার সব যদি মিছে হয় তবু এ-কথা মিছে নয়, বাবু, এ আপনাকে আমি বল্‌ছি। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—আপনারা ত' তা' বলবেনই ভদ্দরলোক, লেখাপড়া শিখেছেন; আমরা চাষামানুষ আমরাও তাই বলি।

—তারপর কি হল?

—বৌটি তাই দেখে যেমন গিয়েছিল তেম্‌নি শব্দটি না করে চুপ্‌চাপ্‌ ফিরে এল। কিছুক্ষণ পরেই ও-ঘরের বারান্দা থেকে যোগেশ্বরী ডেকে বল্‌ল,—ভাত পুড়ে যে ছাই হয়ে গেল বৌ, ঘুমুলি নাকি? অনেকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে যোগেশ্বরী ভারতকে ডেকে রান্নাঘরে তদারকে পাঠিয়ে দিল; ভারত এসে দেখ্‌ল, বৌ খালি খুঁটি ঠেস দিয়ে ঠায় বসে আছে, উনুনের উপর হাড়ি চাপান।...

মান্‌ষের মনের ভাব আমরা ভালো বুঝিনে বাবু, বৌটার তখন মনের কি ভাব হ'ল তাও জানিনে; আর কি করে যে ওদের অভিযোগ ঘট্‌ল তাও জানিনে। মিন্মই সোমত্ত মেয়ে; মামীর সুখ দেখে তার সুখের লোভ হতে পারে না এমন নয়। কিন্তুক ভারত তাকে গায়ে পড়ে টেনেছিল, এ নিশ্চয়। ছোঁয়া দিয়ে, ছুঁয়ে, চাউনি দিয়ে, হাসি কেড়ে সোমত্ত মেয়েকে পাগল করে তোলা কিছু কঠিন ত' না। বলুন বাবু, হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ।

—আমার মনে হয় কি জানেন বাবু? তাই-ই ঘটেছিল। আপ্‌না-আপ্‌নির মধ্যে গা ঘেঁষাঘেঁষিতে যাদের ধম্মজ্ঞান নেই আর আপন-পর হুঁস নাই তারা ত' ঐ কাজ করবেই—ইচ্ছে করেই ঘেঁষে আসবে। যোগেশ্বরী বুঝ্‌-সুঝের তালসামালী লোক ছিল না; সে এম্‌নিধারা আল্‌গা মানুষ ছিল যে, যা চোখে দেখ্‌ত তাও যেন তার মনের নাগাল পেত না; বাইরের হাবভাব লক্ষণ দেখে ভিতরের খবর পাওয়া ত তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।...

বৌয়ের ভাবগতিক দেখে ভারতের কেমন সন্দেহ হল; সে সাবধান হল, কিন্তুক সকল দিকে সাবধান হলে তবেই সব দিক বাঁচত।—মিন্মই হঠাৎ একদিন মামাকে মামা বলে ডাকা ছেড়ে দিল; তা ত দিলই, এমন কি সে ভারতের সাম্‌নে যেন আসতেই চায় না এমনি লজ্জা। তাই দেখে যোগেশ্বরী রেগে রুখে উঠে বল্‌ল,—মেনি, তোর হল কি লো? মামার সামনে বেরুস্‌নে যে?

যোগেশ্বরীর ভয় হল, মিন্মই এই হঠাৎ গুটিয়ে আসাতে অনাদর হল মনে করে ভারত রাগ না করে। কিন্তুক একেবারে ভুল বাবু, সব একেবারে ভুল। মিন্মইর এ লজ্জা যে কিসের লজ্জা তা বোঝবার সাদ্যি যোগেশ্বরীর ছিল না। এ লজ্জা তার পুরুষের কাছে প্রথম লজ্জা ত্যাগের লজ্জা। এরপর মিন্মইর মুখে মামা ডাক্‌টা আর তেমন করে ফুট্‌লই না। যোগেশ্বরী তাকে বক্‌তে লাগ্‌ল; বক্‌তে বক্‌তে হঠাৎ একদিন যোগেশ্বরীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়্‌ল, যার আগুনে তার ভিতর বা'র পুড়ে' একেবারে ছার হয়ে গেল। পাপ আর পারা বেরুবেই বাবু। মাস চার-পাঁচ পরে যোগেশ্বরী ধরে ফেল্‌ল যে—কথাটা স্পষ্ট করে না-ই বল্‌লাম বাবু। লোকে বলে মরার বাড়া বিপদ নাই; কিন্তুক এ বিপদ যে মরার বাড়া ও কত বড় বিপদ তা' যেন আমার শত্তুরকেও কখন না জান্‌তে হয় বাবু। যোগেশ্বরী কোণায় কোণায় কেঁদে বেড়াতে লাগ্‌ল, খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিল। নিজের মনেই ভেবে দেখুন বাবু, এই পাপ আর এই লজ্জা গোপন করতে কত বড় একটা পাপকায্যের দরকার। যোগেশ্বরী একেবারে পাগলের মত বেঠিক হয়ে উঠ্‌ল।

বাবু, কথাটা ভাবতেও যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।... সব্বনাশ যে এতদূর এগিয়ে গেছে বৌটা তখনই তা' জানতে পারে নাই; তবে খুব বেশিদিন অজানাও তার থাক্‌ল না।

ভারত ফাঁকে ফাঁকে বেড়ায়—ছিপ্ ফেলে মাছ ধরে, পাড়ায় পাড়ায় দাবা, পাশা খেলে—যেন সে কিছুর মধ্যেই নেই। মেয়ের মুখে সব জানতে পেরেও যোগেশ্বরী ভাইকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। কিন্তুক ভাবুন বাবু, এইটে যদি ঠিক্ উল্টো হয়ে ঘটত? খুন হোক্ না হোক্, ভারত তার বৌকে ত্যাগ করত কি না? বলুন বাবু, ত্যাগ করত্ কি না?

—করতই ত'। বলিয়া আমি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলাম। জোয়ান পুরুষ আমি এবং সেই হিসাবে ভারতেরই সমধর্ম্মী; ইহারই অকারণ একটি লজ্জা যেন জোর করিয়া আমার মুখ ঠেলিয়া অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল—পিরুর কণ্ঠস্বরে এমনি একটা ক্ষমাহীন আক্রোশের তেজ ছিল।

পিরু বলিতে লাগিল,—সোয়ামী এত বড় দাগাটা তাকে দিল, এমন অবিশ্বাসের ইতর কাজটা সোযামী করল; বৌটা শুধু কেঁদে কেঁদে চক্ষু দুটি অন্ধ করে ফেল্‌ল, একটি কথা সে বল্‌ল না যে তুমি এ কাজ করলে কেন, কি আর কিছু।

তারপর যে ব্যাপার ঘট্‌ল তা' আমি বল্‌ব আপনাকে, কিন্তুক তার আগে সেই সতীর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ করে নেব। বলিয়া পিরু উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সতীর পায়ে গভীর শ্রদ্ধার একটা প্রণাম নিবেদন করিল।

যখন সে মুখ তুলিল তখন তার চোখ ভিতরকার জলের ঝাপটায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। রক্তবর্ণ চক্ষে সোজা আমার দিকে চাহিয়া পিরু বলিতে লাগিল,—দু'তিন দিন চুপ করে থেকে চোখের জল ফেলে' ফেলে' আটমাস পোযাতী বৌটা একদিন দরজায় খিল এঁটে দিয়ে নিজেরই কাপড়ে আগুন লাগিয়ে দিল। তখনই কারো নজরে পড়ে নাই, আগুন কিছুক্ষণ জ্বলবার পর হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে ধোঁয়া আর ধোঁয়ার সঙ্গে মানুষ পোড়ার দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে দেখে, কি হ'ল, কি হ'ল দেখ্, দেখ্, করতে করতে এসে যখন দরজা ভেঙে লোকজন ঘরে ঢুক্‌ল তখন পোড়া শেষ—বৌটা খাবি খাচ্ছে।... সেই থেকে এ গাঁয়ের নাম পোড়াবৌ। বলিয়া পিরু নিশ্বাস ছাড়িয়া কাঁপিত কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; গামছা দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিতে বলিতে গেল,—বেশ করে—লোকে এ গাঁয়ের নাম করে না।...

'উত্তরা'

তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হইবার আর দেরি নাই। রাস্তায় পুরানো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু কিশোরী যেন আসিয়া বলিল—এই যে, এখানে কী? চল, চল, জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোন নি? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভালো জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কী? যা বলে তা সত্যি হয়? আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু'টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখনা বলতে পারে কিনা।

কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ির গায়ে টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছে—তারানাথ জ্যোতিবিনোদ—

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠিবিচার করা হয়।

গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি।

আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন।

বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ি।

হাসিয়া বলিলাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত, তার এই বাড়ি?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষী-মহাশয় বাড়ি আছেন?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কিনা দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে যাবে।

আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল—আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তাপোষের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিত মশাই আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশি হইবে না। রং টক্‌টকে গৌরবর্ণ, এ বয়সেও গায়ের রঙের জৌলুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নীচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তাব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড় বড়, উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল। উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশি, আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এখন তাহার যেন অনেকখানিই হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ-নিবিষ্ট মনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনেরই শ্রাবণ, তেরশ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনেরই শ্রাবণ। ঠিক? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে তো হয় না; আপনার হল কেমন করে? এরকম তো দেখিনি!

কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিন মনে ছিল এইজন্য যে, আমার জন্মদিন ও বিবাহ-দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু'বছরের, তাও এক ব্রীজ খেলার আড্ডায়। সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তার কোন অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন— মোটের উপর আপনার মস্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল তের বছর বয়সে।

কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল—বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থ নষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, এবং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে।

আমি আশ্চর্য হইয়া উহার দিকে চাহিলাম। মাত্র দু'দিন আগে কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটশুদ্ধ মানিব্যাগটি খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধ হয় থট্‌ রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে? এটুকু বোধ হয় ধাপ্পা। যাই হোক্, সাধারণ হাত-দেখা গণকের মত সব বুঝিয়া শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যে যাইতাম তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধনা করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে শুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোড়দৌড়, ফাটকা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মাড়োয়ারীর মোটর গাড়ির ভীড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ির গলি আটকাইয়া থাকিত, পয়সা আসিতে শুরু করিল অজস্র। যে পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সাও দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল—ঘোড়দৌড়, নারী ও সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথাসর্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ তো সামান্য গণৎকার ব্রাহ্মণমাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার পসার নষ্ট হইল। তবুও ধূর্ততা, ফন্দিবাজী, ব্যবসাদারী প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনটিরই অভাব তারানাথের চরিত্র না থাকাতে সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু বর্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ইবা কই?

আমার মত গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, এ কথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপর বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার সঙ্গে তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জমিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে—তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য করে রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কিনা। লোক পাইনি এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুল দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিৎ হয়ে শুয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নিচে একটা গাছের তলায় দু'টি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই বলে দেবে। ভালো করে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার কিছু অজানা থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোনা তো যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তাহা তো কোনদিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকালবেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজে পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—'চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন। দেখা করে আসি। খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি। তারানাথের স্বভাবই ভালো সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ান—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব কর্ম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম তিনি আমাকে যে কোন একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেল ফুলের নাম করতেই তিনি বলিলেন—পকেটে রুমাল আছে? বার কর দেখ।

রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা—সুতরাং হাত-সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিক শক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোন মূল্য দিই না। আতর বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ, লোকটা নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র সাধনা করেছে, তারই ফলে দু' একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই বা পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেই তো অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেও তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে, contact at a distance-এর গোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্‌নটিজম্, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার উপর ততক্ষণ কার্যকর হইতে পারে, যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার উপর হইতে যে হিপ্‌নটিজমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সে প্রভাবের মূলে কি আছে সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহারা বাড়িতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য হয়ে পড়লে, তবুও তো সত্যিকার তান্ত্রিক দেখনি। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র এক ধরনের জাদু, যাকে তোমরা বল ব্ল্যাক ম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও জিনিসের চর্চা যে না করেছি, তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কী। এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরনের লোক দেখেছ। সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্নধরনের তন্ত্রচর্চার শক্তি, ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া কিছুই নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।

কি হল জান? ছেলেবেলায় আমাদের দেশে বাঁকুড়াতে এক নামকরা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন। আমাদের বাড়ি এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে ভালো করে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস। মাস দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হল। মনে ভাবলাম চন্দ্রদর্শনের মত নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম—কী ধরনের জ্যোতি?—ঠিক নীল বিদ্যুৎ শিখার মত। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ির পিছনে পেয়ারাতলায় বসে সাধুর কথামতো নাকের উপর দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম,—সব দিন ঘটে উঠত না হপ্তার মধ্যে দু'তিন দিন বসতাম। মাস তিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হল নীল, লিকলিকে একটা শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির। মিনিট খানেক ছিল প্রথমদিন।

এইভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়িতে আর মন টেকে না, ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়নি, মন্দিরে আরতি চলছে, এমন সময় একজন লম্বা চওড়া চেহারা সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডুলু হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন একটা কিছু ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিল না। সাধু তো কতই দেখি। চুপ করে আছি, সাধুবাবাজী জল ভরে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন—বাবাজীর বাড়ি কোথায়?

আমি বললাম—বাঁকুড়া জেলায়, মালিয়াড়া—রুদ্রপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালো। বললো—মালিয়াড়া—রুদ্রপুর? তারপর কি যেন একটা ভাবলো, খুব অল্পক্ষণ, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। তারপর বললো—রুদ্রপুরের রামরূপ সান্ন্যালের নাম শুনেছ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান?

আমাদের গ্রামে সান্ন্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল; খুব বড় বাড়ি ঘর, দরজায় হাতি বাঁধা থাকত শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্ন্যালের নাম তো কখনও শুনিনি। সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন,—তোমার বয়স আর কতটুকু। তুমি জানবে কী করে। খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে তো?

খেয়াঘাট! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েছে কোন্ কালে। এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ গরু হেঁটে চলে যায়। তবে পুরনো নদীর খাতের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্ন্যালদেরই কোনও পূর্বপুরুষ ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি করে জানলেন?

বিস্ময় সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা অনেক জানেন দেখছি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলো, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধ পিতামহের মুখে দেখা যায়, তাঁর অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের কোন ছেলেমানুষি কথার জন্য। সত্যি বলছি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারিনি। খুব উঁচু না হলে অমন হাসি মানুষে হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস কেন? ধর্মকর্ম করবি বলে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ি ফিরে যা, সংসারধর্ম করগে যা। এ পথ তোর নয়, আমার কথা শোন্।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না। কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িসনি, ছাড়তে পারবিও নি। তুই ছেলেমানুষ, নির্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয়নি। যা বাড়ি যা। মা-বাপের মনে কষ্ট দিস্‌নি।

কথা শেষ করে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কী করে জানলেন বলবেন না? দয়া করে বলুন—

তিনি কোনও কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূরে গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন আসছিস?—আপনাকে ছাড়বো না। আমি কিছু চাইনে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এসে তোমার কোন লাভ হবে না। তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি-একটা শক্তি আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোন্ দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্ন্যালের কোন হদিশ মেলাতে পারলাম না। সান্ন্যালদের বাড়ির ছেলে-ছোকরার দল তো কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক শরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন। তিনি পেনশন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ি এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বললেন—ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি, তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব সখ ছিল, অনেক কষ্ট করে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি করে বংশের কুলজী জোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্ন্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেন নি। অন্তত দেড়শো বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিব মন্দিরটা ও রকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্রোত ছিল বড় বড় কিস্তি চলত। কোনও নৌকো একবার ওই মন্দিরের নিচের ঘাটে মারা পড়ে বলে ওর নাম লা-ভাঙার খেয়াঘাট।

প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলুম—খেয়াঘাট?

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, তাছাড়া আমাদের পুরানো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বলতো, এসব কথা তোমার জানবার কী দরকার হল? বই-টই লিখছ নাকি?

ওদের কাছে কোনও কথা বলিনি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোন অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়শো বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ি থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরুই। বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম নদীর ধারে শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়-চোপড় পরেন, তেমনি মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে অতি কষ্টে

চেপে বললাম—মা, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন, অনেক দূর থেকে এসেছি, দয়া করুন আমার ওপর।

পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বলল—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি, আঙুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শ্মশান, ভয় হল ওর মূর্তি দেখে, কি জানি মারবে-টারবে নাকি—পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেই চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পরদিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি?

বললাম—মা, আমাকে দয়া করো—

পাগলী বললে—দূর হ দূর হ, বেরো এখান থেকে—তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বললে—ফের যদি আসিস, তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান!

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। কি এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি কোন্ দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। সে চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখ, আমায় যেন বললে—লাথিটা খুব লেগেছে, না, রে? তা রাগ করিসনি, কাল যাস্ আমার ওখানে।

সকালে উঠেই আবার গেলাম। ওমা, স্বপ্ন-টপ্ন সব মিথ্যে, পাগলী আমায় দেখে মারমূর্তি হয়ে শ্মশানের একখানা পোড়া কাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরিয়া হয়েছি, বললাম—তুমি তবে আমাকে বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে? তুমিই তো আসতে বললে, তাই এলাম।—

পাগলী খিল খিল করে হেসে উঠল। তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে? তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম? হি-হি-হি-যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট করেছে, আমি বুঝলাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক, আমার মনে হল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে টানছে।

হঠাৎ সে বললে—বোস্ এখানে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে। তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুব রাজা জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মত—তার সে হুকুম পালন না করে যে উপায় নেই।

কাজেই বসতে হল।

সে বললে—কেন এখানে এসে এসে বিরক্ত করিস্ বলতো? তোর দ্বারা কি হবে, কিছু হবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে।

আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা, কিছু খাবি? আমার এখানে যখন এসেছিস তার ওপর আবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ানো দরকার। বল কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কতদূর দেখবার জন্য বড় কৌতূহল হল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেছি, যা চাওয়া যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে। কলকাতায় গন্ধবাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য বলে মনে হয়নি। বললাম—খাব অমৃতি, জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্তমান কলা।

পাগলী এক আশ্চর্য ব্যাপার করল। শ্মশানের কতকগুলো পোড়া কয়লা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমিও অবাক! ইতস্ততঃ করছি দেখে সে পাগলের মতো খিল খিল করে কি এক রকম অসম্বদ্ধ হাসি হেসে বললে—খা খা—ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হল এ তো দেখছি পুরো পাগল, কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায় মরা-পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ফেরার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলুম সেই কয়লা মুখে পুড়ে, যা থাকে কপালে। পরক্ষণেই থু থু সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার করে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিল্ খিল করে হেসে উঠল।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কী বোকামী করেছি এখানে এসে—পাগলই,—পাগল ছাড়া আর কিছু নয় বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েছে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রুপের সুরে বললে—খেলি রাবড়ি মর্তমান কলা? পেটুক কোথাকার। পেটের জন্য এসেছ শ্মশানে আমার কাছে? দূর হ জানোয়ার—দূর হ! আমার ভয়ানক রাগ হল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপর বলেনি। একটিও কথা না বলে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে বলছে—রাগ করিস নে। আসিস আজ, রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম।

যা হোক, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় জাদু করলে না কি!

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্তি ভারী প্রসন্ন। বললে—এসেছিস্ দেখছি। আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো তুই?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে? দিনে অপমান করে বিদেয় করে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এরকম হয়রান করে তোমার লাভ কী?

পাগলি বললে, পারবি তুই? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি? বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা করে। সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল্। গলা টিপে মেরে ফেল্। তারপর আমার মৃতদেহের ওপর বসে তোকে সাধনা করতে হবে। নিয়ম বলে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ করে বিকট চিৎকার করে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দু'টো চালভাজা দিবি। ভোর রাত পর্যন্ত এমনি মড়ার উপর বসে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাত্রে হয়তো অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় করিস না। ভয় পেলে সাধনা তো মিথ্যে হবেই, প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পারিস। কেমন, রাজী?

ও যে এমন কথা বলবে বুঝতে পারিনি। কথা শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—সব পারব, কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না। আর তুমিই বা আমার জন্য মরবে কেন?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিস্ কেন মুখপোড়া, বেরো দূর হ।

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগালি দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ খুব খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখিনে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বললাম—রাগ করছ কেন? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত করে বললে—ভদ্দর লোকের ছেলে? তবে এ পথে এসেছিস কেন রে? ও অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া? তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর পড়ে হৌসে চাকরি কর গিয়ে—বেরো।

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিশের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবছ না। আমি যখন ফাঁসি যাবো, তখন ঠেকাবে কে?

মনে মনে আবার সন্দেহ হল, না এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে এসে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া কিছুই নয়।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তন্ত্রের কথা শুনেছি। সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে ওকে বিদূষী বলে সন্দেহ হয়।

সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হল। বিকেলে যখন গেলাম তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না, তোকে ও বেলা গালাগালি দিয়েছি, কিছু মনে করিসনে, ও সব নিম্নতন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তিলাভ হয়। তাছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয়? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে, তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ মরে দেহ শূন্য হলে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশি। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাঁখিনী এইসব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ মরে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন্ বলে। এদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না করে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েছ, তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এ সব কথা আর কখনও শুনিনি। এর মত পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনছি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম্য শ্মশান, একটা বড় তেঁতুল গাছ আর একদিকে কতকগুলো শিমুল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনোদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও বলে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরনের কথা।

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া-মায়া বলে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মত সব। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশি হয় বলে যাদের বেশি দুঃসাহস, এসব তান্ত্রিকেরা হাঁকিনী-মন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হলে খুবই ভালো, কিন্তু বিপদেরও ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস নে, তাই রাগ করিস।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তাহলে হাঁকিনী মন্ত্রে সিদ্ধ, না? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাঁকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্বনাশ করে দিতে পারে। ওকে বেশি ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের কোনও লোক ওর কাছেও ঘেঁষে না। বিদেশি লোক, মারা পড়বেন শেষে?

মনে ভাবলাম, কী আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তারপরে একদিন যা হল, তা বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যের পরে পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখেব ভুল নয় মশায, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপসা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই তো! এ আবার কে এল? যাই, কি না যাই? দু'এক পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম—মা, তিনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে—কে?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

—মেয়েটি খিল্ খিল্ করে হেসে বললে—আ মবণ কে তার নামটাই বল্ না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে না কি?

আমি চম্‌কে উঠলাম। সেই পাগলীই তো! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গি। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে! সে এক অদ্ভুত আকৃতি,—ভেঁতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢলে পড়ে আর কি! বললে—এস না, বস না এসে পাশে—লজ্জা কী? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এস—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভালো বলে মনে হল না—তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল এ পাগলীই, আমায় কোন বিপদে ফেলবাব চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময় পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়ালাম, দেখি বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায়নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এস, বস।

বললাম—তুমি ও রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কী?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বক্‌ছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমায় কোনো ভয় দেখিও না। যখন তোমায় মা বলে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন্ তবে। তুই সে রকম নস্। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক, তোকে দু'একটা কিছু দেব, তাতেই তুই করে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগ্‌গির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর। কিন্তু যা বলে দেব, তাই করবি। রাজি আছিস? শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোনকালেই, তবুও কখনও মড়ার উপরে বসে সাধনা করব এ কল্পনাও করিনি। কিন্তু রাজী হলাম পাগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিশের-হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি চুপি এস।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ের মড়া বেধে আছে। কোনও ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধ হয়।

ও বললে— তোল্ মড়াটা —শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হালকা হবে। ওকে তুলে শেকড় রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কী করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে, আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হোলনা, অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর বসে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবি নে তো? পেয়েছ কি মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চীৎকার করে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা! অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ কোন তফাৎ নেই।

পাগলী বললে—চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন, আপদ।

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হল। মনে ভাবলাম এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গাঁয়ের লোক ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে, সন্ধ্যে থেকে আমাকে তা করতে হল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধ্যের পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন করে বসলাম।

পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র আমাকে বললে সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয়নি যে এতে কিছু হয়। এমন কি ও যখন বললে—যদি কোন বিভীষিকা দেখ, তবে ভয় পেও না, ভয় পেলেই মরবে—তখনও আমার মনে বিশ্বাস হয়নি।

রাত্রি দুপুর হল ক্রমে। নির্জন শ্মশান, কেউ কোনো দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারে দিক্‌বিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখিনি।

হঠাৎ একপাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে এক টাটকা মড়ার ওপর বসে সেই শেয়ালের ডাক আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা না-করা তোমার ইচ্ছে কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে বলে আমার কোন স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা তুমি আমায় এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল শ্মশানের নীচে নদী, জল থেকে দলে দলে সব বৌ-মানুষেরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা। জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা, দুটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো করে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নয় সব কর্‌রা পাখি,—বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়।

দু'-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মত।

এক মুহূর্তে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল—তাই বল। হরি হরি। পাখি!

চিন্তা সম্পূর্ণ শেষ হয়নি—পরক্ষণেই আমার চারপাশে মেয়ে গলায় কারা খল্‌ খল্‌ করে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সব অল্প বয়সী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে। আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরানো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনোটার মাথার খুলি ফুটো, কোনোটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় কেউ যেন তাদের বহুযত্নে তুলে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া করে রেখেছে, সে যেই ছেড়ে দেবে, অমনি কঙ্কালগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো নোনাধরা হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি প্রাণ নিয়ে যেন এ শ্মশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমার গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

সোজা দৌড় দেব ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে? যা হোক সব রকম ব্যাপারের জন্য আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে নামিনি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয় না?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের তো শুনেছি অনেক সাধনা করেও দেখা মেলে না, আর অত সহজে ইনি...বললাম আমার মহাসৌভাগ্য যে এসেছেন... আমার জীবন ধন্য হল।

মেয়েটি বললে তবে তুমি মহা ডামরি সাধনা করছ কেন?

—আজ্ঞে, আমি তো জানি নে কোন্ সাধনা কী রকম! পাগলী আমায় যেমনি বলে দিয়েছে, তেমনি করছি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা ছাড়। ও মন্ত্র জপ করো না। যখন দেখা দিয়েছি, তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহাডামরী ভৈরবী দেখনি অতি বিকট তার চেহারা...তুমি ভয় পাবে ছেড়ে দাও মন্ত্র।

সাহসে ভর করে বললাম—সাধনা করে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

আমার মনে হল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছু ঠিক করতে পারলাম না। বললাম—সন্দেহ হয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানি না কে আপনারা...যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথার জবাব যদি পাই।

বালিকা বললে—মহাডামরীকে চেন না? আমাকেও চেন না? তাহলে আর চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস করছ? দিব্যৌঘ পথের নাম শোননি তন্ত্রে? পাষণ্ড দলের জন্যে ঐ পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার মন্ত্রে দিব্যৌঘ পথের সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না, ভয়ে ভয়ে বললাম—তবে আমি কি খুবই পাষণ্ড?

বালিকা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

বললে, তোমার বেলা এসেছি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে অত ভয় কিসের? আমি না তোমাকে লাথি মেরেছি? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি? তোমাকে পরীক্ষা না করে কি সাধনার নিয়ম বলে দিয়েছি তোমাকে?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, বলে কী?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোমার যেমন ভয়, সে তুমি পারবে না—ও ছেড়ে দাও।

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলে?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল।

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোন তফাৎ নেই। একই মুখ, একই রঙ, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছ কী?

আমি কথার কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্রকাশ করে বললাম—কে আপনি? আপনি কি শ্মশানের পাগলী না কি? একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেড়ে চৌচির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কালগুলো হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকেবেঁকে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোন কঙ্কালের হাত

খসে পড়ল, কোনোটার মেরুদণ্ড, কোনোটার কপালের হাড়, কোনোটার বুকের পাঁজরাগুলো—তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল আর হাড়ে হাড়ে লেগে কী বীভৎস ঠক্-ঠক্ শব্দ।

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন জড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মত আর সেই ছিদ্রপথে যেন এক বিকট মূর্তি নারী উন্মাদিনীর মত আলু-থালু বেগে নেমে আসছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মরা পচার দুর্গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হল, পেছনে আকাশটা আগুনের মত রাঙা মেঘে ছেয়ে গেল, তার নীচে শকুনি উড়ছে সেই গভীর রাতে। শেয়ালের চীৎকার ও নর-কঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম!

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে! পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুঁটে আসছে! তার আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত দু'চোখে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মেশানো, সে কী ভীষণ ক্রুর দৃষ্টি! সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন-রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে —সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর বসে আছি—সে শবটা চীৎকার করে কেঁদে উঠে বললে—আমায় উদ্ধার করো, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন করে মেরে ফেলেছে বলে আমার গতি হয়নি—আমায় উদ্ধার করো। কতকাল আছি এই শ্মশানে। ছাপান্ন বছর কাকেই বা বলি? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পূবে ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হলে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী বসে মৃদু-মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে...সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু'জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না?

আমার শরীর তখনও ঝিম ঝিম করছে।

বললাম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন!

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়ে দিলি। দূর, ওসব হাঁকিনীর মায়া। ওরা সাধনার বাধা। তুই ষোড়শীকে চিনিস না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

'এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।'

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা। তুই আর জানিস কি? ও-সব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধ সুরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে। আরও এক বিকট মূর্তি পিশাচীর মতো চেহারার নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না। তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল—কী সেটা?

পাগলী বললে—তোর ভাগ্য ভালো। শেষকালে যে বিকট মূর্তি মেয়ে দেখেছিস, তিনি মহাডমরী মহাভৈরবী...তুই তার তেজ সহ্য করতে পারলি নে...আসন ছেড়ে ভাগলি কেন?

তারপর সে হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার। উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের। আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কারবার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে বসে আছিস বটতলায়। কোথা গিয়েছিলি তুই? সকাল কোথায় এখন, যে সারারাত সাধনা করে আসন ছেড়ে এলি? এই তো সবে সন্ধ্যে...

—অ্যাঁ!

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা হয় হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল ছ'টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙায় তোলা। শবসাধনা, নরকঙ্কাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিল্ল-শকুনির ঝাঁক,...সব আমার ভ্রম!

হতভম্বের মত বললাম—কেন এমন ভোলালে আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে?

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর মধ্যে যে জিনিস নেই, তোর কর্ম নয় তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবিনে।

বললাম—একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি তো অসাধারণ শক্তিধর। তুমি ভেল্কি নিয়ে থাক কেন? উচ্চতন্ত্রের সাধনা করো না কেন?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা, এঁর মহাবিদ্যা। ব্রহ্মশক্তির নারী রূপ। এঁদের সাধনা একজন্মে হয় না—আমার পূর্বজন্মও এমনি কেটেছে, এ জন্মও গেল; গুরুর দেখা পেলাম না। যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব বকে কী করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশিদিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাই নি, ভয়েই যাইনি। পাগলীর দেখাও পাইনি আর কোনদিন।

তখন চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারে কেউ ছিল না, সে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্য পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত, তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কী বুঝব? যাক্ সে সব কথা, শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারিনি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও? এস, চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে।

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাততঃ চন্দ্রদর্শন অপেক্ষাও গুরুতর কাজ বাকী। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহার আমি কোন জবাব দিব না।

রাণুর প্রথম ভাগ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমার ভাইঝি রাণুর প্রথম ভাগের গণ্ডি পার হওয়া আর হইয়া উঠিল না।

তাহার সহস্রবিধ অন্তরায়ের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—এক তাহার প্রকৃতিগত অকলপক্ক গিন্নীপনা; আর অন্যটি, তাহার আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাহার দৈনিক জীবনপ্রণালী লক্ষ্য করিলে, মনে হয় বিধাতা যদি তাহাকে একেবারে তাহার ঠাকুরমার মত প্রবীণা গৃহিণী এবং কাকার মত এম. এ. বি. এল. করিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহাকে মানাইতও ভালো এবং সেও সন্তুষ্ট থাকিত। তাহার ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পরবর্তী ভাবী নারীত্ব হঠাৎ কেমন করিয়া ত্রিশ চল্লিশ বৎসব পূর্বে আসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষুদ্র শরীর-মনটিতে আর আঁটিয়া উঠিতেছে না রাণুর কার্যকলাপ দেখিলে এই রকমই একটা ধারণা মনে উপস্থিত হয়। প্রথমত, শিশুসুলভ সমস্ত ব্যাপাবেই তাহার ক্ষুদ্র নাসিকাটি তাচ্ছিল্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠে—খেলাঘর সে মোটেই বরদাস্ত কবিতে পারে না, ফ্রক জামাও না, এমন কি নোলক পরাও নয়। মুখটা গম্ভীর করিয়া বলে, "আমার কি আর ওসবের বয়েস আছে মেজকা?"

বলিতে হয়, "না মা, আর কি—তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকল।"

রাণু চতুর্থ কালের কাল্পনিক দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মুখটা অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকে।

আব দ্বিতীয়ত—কতকটা বোধহয শৈশবের সহিত সম্পর্কিত বলিয়াই—তাহার ঘোরতর বিতৃষ্ণা প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার কাকার আইন-পুস্তক পর্যন্ত আর সবগুলির সহিতই তাহাব বেশ সৌহার্দ্য আছে এবং তাহাদের সহিতই তাহার দৈনিক জীবনের অর্ধেকটা সময কাটিযা যায় বটে, কিন্তু প্রথম ভাগের নামেই সমস্ত উৎসাহ একেবারে শিথিল হইয়া আসে। বেচাবীর মলিন মুখখানি ভাবিয়া মাঝে মাঝে আমি এলাকাড়ি দিই—মনে করি, যাকগে বাপু, মেয়ে—নাই বা এখন থেকে বই স্লেট নিয়ে মুখ গুঁজড়ে রইল, ছেলে হওয়ার পাপটা তো করেনি। নেহাতই দরকার বোধ করা যায়, আর একটু বড় হোক তখন দেখা যাবে'খন।

এই রকম দিনগুলো রাণুর বেশ যায়; তাহার গিন্নীপনা সতেজে চলিতে থাকে এবং পড়াশুনারও বিষম ধূম পড়িয়া যায়। বাড়ির নানা স্থানের অনেক সব বই হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হয়, তাহার খোঁজ দুরূহ হইয়া উঠে এবং উপরের ঘর নীচের ঘর হইতে সময়-অসময়ে রাণুর উঁচু গলায় পড়ার আওয়াজ আসিতে থাকে—ঐ ক-য়ে য-ফলা ঐক্য, ম-য়ে আকার ণ-য়ে হ্রস্বই ক-যে য-ফলা মাণিক্য, বা পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, অথবা তাহার রাঙা কাকার আইন মুখস্থ করার ঢঙে—হোয়ার অ্যাজ ইট ইজ, ইত্যাদি।

আমার লাগে ভালো, কিন্তু রাণুর স্বাভাবিক স্ফূর্তির এইরকম দিনগুলো বেশিদিন স্থায়ী হইতে পারে না। ভালো লাগে বলিয়াই আমার মতির হঠাৎ পরিবর্তন হইয়া যায় এবং কর্তব্যজ্ঞানটা সমস্ত লঘুতাকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া প্রবীণ গুরুমহাশয়ের বেশে আমার মধ্যে জাঁকিয়া বসে। সনাতন যুক্তির সাহায্যে হৃদয়ের সমস্ত দুর্বলতা নিরাকরণ করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ডাক দিই, "রাণু!"

রাণু এ স্বরটি বিলক্ষণ চেনে; উত্তর দেয় না। মুখটি কাঁদো-কাঁদো করিয়া নিতান্ত অসহায় ভালো মানুষের মত ধীরে ধীরে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়ায়, আমার আওয়াজটা তাহার গলায় যেন একটা ফাঁস পরাইয়া টানিয়া আনিয়াছে। আমি কর্তব্যবোধে আরও কড়া হইয়া উঠি; সংক্ষেপে বলি, "প্রথম ভাগ! যাও।"

ইহার পর প্রতিবারই যদি নির্বিবাদে প্রথম ভাগটি আসিয়া পড়িত এবং যেন-তেন-প্রকারেণ দুইটা শব্দও গিলাইয়া দেওয়া যাইত তো হাতেখড়ি হওয়া ইস্তক এই যে আড়াইটা বৎসর গেল, ইহার মধ্যে মেয়েটাও যে প্রথম ভাগের ও-কয়টা পাতা শেষ করিতে পারিত না, এমন নয়। কিন্তু আমার হুকুমটা ঠিকমত তামিল না হইয়া কতকগুলা জটিল ব্যাপারের সৃষ্টি করে মাত্র— যেমন, এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন বার দুই-তিন দিন পর্যন্ত রাণুর টিকিটি আর দেখা যায় না। সে যে কোথায় গেল, কখন আহার করিল, কোথায় শয়ন করিল, তাহার একটা সঠিক খবর পাওয়া যায় না। দু-তিন দিন পরে হঠাৎ যখন নজরে পড়িল, তখন হয়তো সে তাহার ঠাকুরদাদার সঙ্গে চায়ের আয়োজনে মাতিয়া গিয়াছে, কিংবা তাঁহার সামনে প্রথম ভাগটাই খুলিয়া রাখিয়া তাহার কাকাদের পড়ার খরচ পাঠানো কিংবা আহার্যদ্রব্যের বর্তমান দুর্মূল্যতা প্রভৃতি সংসারের কোন একটা দুরূহ বিষয় লইয়া প্রবল বেগে জ্যাঠামি করিয়া যাইতেছে, অথবা তাঁহার বাগানের যোগাড়যন্ত্রের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া সব বিষয়ে নিজের মন্তব্য দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার দিকে হয়তো একটু আড়চোখে চাহিল; বিশেষ কোন ভয় বা উদ্বেগ নাই—জানে, এমন দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, যেখানে সে কিছুকাল সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন।

আমি হয়তো বলিলাম, 'কই রাণু, তোমায় না তিন দিন হল বই আনতে বলা হয়েছিল?'

সে আমার দিকে না চাহিয়া বাবার দিকে চায়, এবং তিনিই উত্তর দেন, "ওহে, সে একটা মহা মুশকিল ব্যাপার হয়েছে, ও বইটা যে কোথায় ফেলেছে—"

রাণু চাপা স্বরে শুধরাইয়া দেয়, "ফেলিনি—বল, কে যে চুরি করে নিয়েছে—"

"হ্যাঁ, কে যে চুরি করে নিয়েছে, বেচারী অনেকক্ষণ খুঁজেও—"

রাণু যোগাইয়া দেয়, "তিন দিন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েও—"

"হ্যাঁ, তোমায় গিয়ে, তিন দিন হয়রান হয়েও, শেষে না পেয়ে হাল ছেড়ে—"

রাণু ফিসফিস করিয়া বলিয়া দেয়, "হাল ছাড়ি নি এখনও।"

"হ্যাঁ, ওর নাম কি, হাল না ছেড়ে ক্রমাগত খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যা হোক, একখানা বই আজ এনে দিও, কতই বা দাম!"

রাগ করে বলি, "তুই বুঝি এই কাটারী হাতে করে বাগানে বাগানে বই খুঁজে বেড়াচ্ছিস? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!"

কাতরভাবে বাবা বলেন, "আহা, ওকে আর এ সামান্য ব্যাপারের জন্যে গালমন্দ করা কেন? এবার থেকে ঠিক করে রাখবে তো গিন্নী?"

রাণু খুব ঝুঁকাইয়া ঘাড় নাড়ে। আমি ফিরিয়া আসিতে আসিতে শুনিতে পাই, "তোমায় অত করে শেখাই, তবু একটুও মনে থাকে না দাদু। কিঁ যেন হচ্ছ দিন দিন!"

কখনও কখনও হুকুম করিবার খানিক পরেই বইটার আধখানা আনিয়া হাজির করিয়া সে খোকার উপর প্রবল তম্বি আরম্ভ করিয়া দেয়। তম্বিটা আসলে আরম্ভ হয় আমাকেই ঠেস দিয়া,

"তোমার আদুরে ভাইপোর কাজ দেখ মেজকা। লোকে আর পড়াশুনা করবে কোথা থেকে?"

আমি বুঝি, কাহার কাজ। কটমট করিয়া চাহিয়া থাকি।

দুষ্টু ছুটিয়া গিয়া বামালসুদ্ধ খোকাকে হাজির করে—সে বোধ হয় তখন একখানা পাতা মুখে পুরিয়াছে এবং বাকিগুলার কি করিলে সবচেয়ে সঙ্গতি হয়, সেই সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে। তাহাকে আমার সামনে দপ করিয়া বসাইয়া রাণু রাগ দেখাইয়া বলে, "পেত্যয় না যাও, দেখ। আচ্ছা এ ছেলের কখনও বিদ্যা হবে মেজকা?"

আমি তখন হয়তো বলি, "ওর কাজ, না তুমি নিজে ছিঁড়েছ রাণু? ঠিক আগেকার পাঁচখানা পাতা ছেঁড়া—যত বলি, তোমায় কিচ্ছু বলব না—খান তিরিশেক বই তো শেষ হল!"

ধরা পড়িয়া লজ্জা-ভয়-অপমানে নিশ্চল নির্বাক হইয়া এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে যে, নেহাত নৃশংস না হইলে উহার উপর আর কিছু তাহাকে বলা যায় না, তখনকার মত শাস্তির কথা তুলিয়া তাহার মনের গ্লানিটুকু মুছাইয়া দিবার জন্য আমায় বলিতেই হয়, "হ্যাঁ রে দুষ্টু, দিদির বই ছিঁড়ে দিয়েছিস? আর তুমিও তো ওকে একটু-আধটু শাসন করবে রাণু? ওর আর কতটুকু বুদ্ধি বল!"

চাঁদমুখখানি হইতে মেঘটা সরিয়া গিয়া হাসি ফোটে। তখন আমাদের দুইজনের মধ্য হইতে প্রথম ভাগের ব্যবধানটা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং রাণু দিব্যি সহজভাবে তাহার গিন্নীপনার ভূমিকা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই সময়টা সে হঠাৎ এত বড় হইয়া যায় যে, ছোট ভাইটি হইতে আরম্ভ করিয়া বাপ, খুড়া, ঠাকুরমা, এমন কি ঠাকুরদাদা পর্যন্ত সবাই তাহার কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং স্নেহ ও করুণার পাত্র হইয়া পড়ে। এই রকম একটি প্রথম ভাগ ছেঁড়ার দিনে কথাটা এইভাবে আরম্ভ হইল—"কি করে শাসন করব বল মেজকা? আমার কি নিশ্বেস ফেলবার সময় আছে, খালি কাজ—কাজ —আর কাজ।"

হাসি পাইলেও গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "তা বটে, কতদিকে আর দেখব?"

"যে দিকটা না দেখেছি সেই দিকেই গোল—এই তো খোকার কাণ্ড চোখেই দেখলে। কেন রে বাপু, রাণু ছাড়া আর বাড়িতে কেউ নেই? খাবার বেলা তো অনেকগুলি মুখ; বল মেজকা। আচ্ছা, কাল তোমার ঝাল-তরকারিতে নুন ছিল?"

বলিলাম, "না, একেবারে মুখে দিতে পারি নি।"

"তার হেতু হচ্ছে, রাণু কাল রান্নাঘরে যেতে পারে নি—ফুরসৎ ছিল না। এই তো সবার রান্নার ছিরি। আজ আর সে রকম কম হবে না, আমি নিজের হাতে দিয়ে এসেছি নুন।"

আমার সখের ঝাল-তরকারি খাওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বলিলাম, "তুমি যদি রোজ একবার করে দেখ মা—"

গাল দুইটি অভিমানে ভারী হইয়া উঠিল।—"হবার জো নেই মেজকা, রাণু হয়েছে বাড়ির আতঙ্ক। 'ওরে, ওই বুঝি রাণু ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে—রাণু বুঝি মেয়েটাকে টেনে দুধ খাওয়াতে বসেছে, দেখ দেখ—তোকে কে এত গিন্নীত্ব করতে বললে বাপু?' হ্যাঁ মেজকা,এত বড়টা হলুম, দেখেছ কখনও আমায় গিন্নীত্ব করতে—ক-খ-নও—একরাত্তিও?

বলিলাম, "বলে দিলেই হল একটা কথা, ওদের আর কি!"

"মুখটি বুজে শুনে যাই। একজন হয়তো বললেন 'ওই বুঝি রাণু রান্নাঘরে সেঁধোল।' বেড়ালটা বলে, আমি পদে আছি। কেউ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে রাণু বুঝি ওর বাপের-

"আচ্ছা মেজকা, বাবার ফুলদানিটা আমি ভেঙেছি বলে তোমার একটুও বিশ্বাস হয়?"

এ ঘটনাটা সবচেয়ে নূতন; গিন্নীপনা করিয়া জল বদলাইতে গিয়া রাণুই ফুলদানিটা চুরমার করিয়া দিয়াছে, ঘরে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমি বলিলাম, "কই, আমি তো মরে গেলেও এক কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।"

ঠোঁট ফুলাইয়া রাণু বলিল, "যার ঘটে একটুও বুদ্ধি আছে, সে করবে না। আমার কি দরকার মেজকা, ফুলদানিতে হাত দেবার? কেন, আমার নিজের পের্‌থোম ভাগ কি ছিল না যে, বাবার ফুলদান ঘাটতে যাব?"

প্রথম ভাগের উপর দরদ দেখিয়া ভয়ানক হাসি পাইল, চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম, "মিছিমিছি দোষ দেওয়া ওদের কেমন একটা রোগ হয়ে পড়েছে।"

দুষ্টু একটু মুখ নীচু করিয়া রহিল, তাহার পর সুবিধা পাইয়া তাহার সদ্য দোষটুকু সম্পূর্ণরূপে স্খালন করিয়া লইবার জন্য আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া আরও অভিমানের সুরে আস্তে আস্তে বলিল, "তোমারও এ রোগটা একটু একটু আছে মেজকা,—এক্ষুনি বলছিলে, আমি পের্‌থোম ভাগটা ছিঁড়ে এনেছি!"

মেয়ের কাছে হারিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

বই হারানো কি ছেঁড়া, পেট-কামড়ানো, মাথা-ব্যথা, খোকাকে ধরা প্রভৃতি ব্যাপারগুলো যখন অনেক দিন তাহাকে বাঁচাইবার পর নিতান্ত একঘেয়ে এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে, তখন দুই-এক দিনের জন্য নেহাৎ বাধ্য হইয়াই রাণু বই শ্লেট লইয়া হাজির হয়। অবশ্য পড়াশুনা কিছুই হয় না। প্রথমে গল্প জমাইবার চেষ্টা করে। সংসারের উপর কোনো কিছুর জন্য মনটা খিঁচড়াইয়া থাকায় কিংবা অন্য কোন কারণে যদি সকলের নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে আমার মনটা বেশি সজাগ থাকে তো ধমক খাইয়া বই খোলে; তাহার পর পড়া আরম্ভ হয়। সেটা রাণুর পাঠাভ্যাস, কি আমার ধৈর্য, বাৎসল্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরীক্ষা তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। আড়াইটি বৎসর গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাণু 'অজ-আম'র পাতা শেষ করিয়া 'অচল-অধম'র পাতায় আসিয়া অচলা হইয়া আছে। বই খুলিয়া আমার দিকে চায়—অর্থাৎ বলিয়া দিতে হইবে। আমি প্রায়ই পড়াশুনার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র উপদেশ দিয়া আরম্ভ করি, "আচ্ছা রাণু, যদি পড়াশুনা না কর তো বিয়ে হলেই যখন শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে—মেজকাকা কি রকম আছে, তাকে কেউ সকালবেলা চা দিয়ে যায় কি না, নাইবার সময় তেল কাপড় গামছা দিয়ে যায় কি না, অসুখ হলে কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় কি না এসব কি করে খোঁজ নেবে?"

রাণু তাহার মেজকাকার ভাবী দুর্দশার কথা কল্পনা করিয়া মৌন থাকে, কিন্তু বোধহয় প্রথম ভাগ-পারাবার পার হইবার কোন সম্ভাবনাই না দেখিয়া বলে, "আচ্ছা মেজকা, একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়লে হয় না? আমায় একটুও বলে দিতে হবে না। এই শোন না—ঐ ক-য়ে য-

রাগিয়া বলি, "ওই ডেঁপোমি ছাড় দিকিন, ওই জন্যেই তোমার কিছু হয় না। নাও, পড় সেদিন কত দূর হয়েছিল? 'অচল' 'অধম' শেষ করেছিলে?"

রাণু নিষ্প্রভভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানায়, "হ্যাঁ।"

বলি, "পড় তা হলে একবার।"

'অচল' কথাটির উপর কচি আঙুলটি দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। আমার মাথার রক্ত গরম হইয়া উঠিতে থাকে এবং স্নেহ, করুণা প্রভৃতি স্নিগ্ধ চিত্তপ্রবৃত্তিগুলো বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। মেজাজেরই বা আর দোষ দিই কি করিয়া? আজ এক বৎসর ধরিয়া এই 'অচল' 'অধম' লইয়া কসরৎ চলিতেছে, এখনও রোজই এই অবস্থা।

তবুও ক্রোধ দমন করিয়া গম্ভীরভাবে বলি, "ছাই হয়েছে। আচ্ছা, বল—অ-চ-আর ল—অচল।"

রাণু অ-র উপর হইতে আঙুলটা না সরাইয়া তিনটি অক্ষর পড়িয়া যায়। 'অধম'ও ওই ভাবেই শেষ হয়; অথচ ঝাড়া দেড়টি বৎসর শুধু অক্ষর চেনায় গিয়েছিল।

তখন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, "কোন্‌টা অ?"

রাণু ভীতভাবে আমার দিকে চাহিয়া আঙুলটি সরাইয়া ল-এর উপর রাখে।

ধৈর্যের সূত্রটা তখনও ধরিয়া থাকি, বলি, "হুঁ, কোন্‌টা ল হল তা হলে?"

আঙুলটি চট করিয়া চ-এর উপর সরিয়া যায়। ধৈর্যসাধনা তখনও চলিতে থাকে, শান্তকণ্ঠে বলি "চমৎকার! আর চ?"

খানিকক্ষণ স্থিরভাবে বইয়ের দিকে চাহিয়া থাকে, তার পর বলে, "চ? চ নেই মেজকা!"

সংযত রাগটা অত্যন্ত উগ্রভাবেই বাহির হইয়া পড়ে পিঠে একটা চাপড় কষাইয়া বলি, "তা থাকবে কেন? তোমার ডেঁপোমি দেখে চম্পট দিয়েছে। হতভাগা মেয়ে—রাজ্যের কথার জাহাজ হয়েছেন, আর এদিকে আড়াই বৎসর প্রথম ভাগের আড়াইটে কথা শেষ করতে পারলে না। কত বুড়ো বুড়ো গাধা ঠেঙিয়ে পাস করিয়ে দিলাম, আর এই একরত্তি মেয়ের কাছে আমায় হার মানতে হল! কাজ নেই আর তোর অক্ষর চিনে। সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে বসে খালি অ—চ—আর ল—অচল; অ—ধ—আর ম—অধম এই আওড়াবি। তোর সমস্ত দিন আজ খাওয়া বন্ধ।"

বিরক্তভাবে একটা খবরের কাগজ কিংবা বই লইয়া বসিয়া যাই; রাণু ক্রন্দনের সহিত সুর মিশাইয়া পড়া বলিয়া যায়।

বলি বটে, সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়িতে হইবে; কিন্তু চড়টা বসাইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া যাই যে, সেদিনকার পড়া ওই পর্যন্ত। রাণু এতক্ষণ চক্ষের জলের ভরসাতেই থাকে এবং অশ্রু নামিলেই সেটাকে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজে লাগায়। কিচুক্ষণ পরে আর পড়ার আওয়াজ পাই না বলি, "কি হল?"

রাণু ক্রন্দনের স্বরে উত্তর করে, "নেই।"

"কি নেই?"—বলিয়া ফিরিয়া দেখি. চক্ষের জল 'অচল-অধম'র উপর ফেলিয়া আঙুল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কথা দুইটা বিলকুল উড়াইয়া দিয়াছে—একেবারে নীচের দুই-তিনখানা পাতার খানিকটা পর্যন্ত।

কিংবা আঙুলের ডগায় চোখের ভিজা কাজল লইয়া কথা দুইটিকে চিরান্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছে; এইরূপ অবস্থাতে বলে, "আর দেখতে পাচ্ছি না, মেজকা।"—এই রকম আরও সব কাণ্ড।

চড়টা মারা পর্যন্ত মনটা খারাপ হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন ওর ধূর্তামি দেখিয়া হাসিও পায়। মেয়েদের পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার থিওরিটা ফিরিয়া আসে, বলি, "না, তোর আর পড়াশুনা হল না রাণু; স্লেটটা নিয়ে আয় দিকিনি—দেগে দিই, বুলো। পিঠটায় লেগেছে বেশি? দেখি?"

রাণু বুঝিতে পারে, তাহার জয় আরম্ভ হইয়াছে, এখন তাহার সব কথাই চলিবে। আমার কাঁধটা জড়াইয়া আস্তে আস্তে ডাকে, "মেজকা!"

উত্তর দিই, "কি?"

"আমি, মেজকা, বড় হই নি?"

"তা তো খুব হয়েছ। কিন্তু কই, বড়র মতন—"

বাধা দিয়ে বলে, "তা হলে স্লেট ছেড়ে ছোটকাকার মত কাগজ-পেন্সিল নিয়ে আসব? চারটে উটপেন্সিল আছে আমার। স্লেটে খোকা বড় হয়ে লিখবে'খন।" হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলে, "ও মেজকা, তোমার দুটো পাকা চুল গো! সর্বনাশ! বেছে দিই?"

বলি, 'দাও। আচ্ছা রাণু, এই-তো বুড়ো হতে চললাম, তুইও দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ি চলবি। লেখাপড়া শিখলি নি, মরলাম কি বাঁচলাম, কি করে খোঁজ নিবি, আমায় কেউ দেখে-শোনে কি না, রেঁধে-টেঁধে দেয় কি না—"

রাণু বলে, "পড়তে তো জানি মেজকা, খালি পেরথোম ভাগটাই জানি না, বড় হয়েছি কিনা। বাড়ির আর কোন লোকটা পেরথোম ভাগ পড়ে মেজকা, দেখাও তো!"

দাদা ওদিকে ধর্ম সম্বন্ধে খুব লিবারেল মতের লোক ছিলেন, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞাতটা যেমন গভীর করিয়া রাখিয়াছিলেন, খ্রীষ্ট এবং কবেকার জরাজীর্ণ জুরুয়াস্থিয়ানবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানটা সেইরূপ উচ্চ ছিল। দরকার হইলে বাইবেল হইতে সুদীর্ঘ কোটেশন তুলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেন এবং দরকার না হইলেও যখন একধার হইতে সমস্ত ধর্মমত সম্বন্ধে সুতীব্র সমালোচনা করিয়া ধর্মমতমাত্রেরই অসারতা সম্বন্ধে অধার্মিক ভাষার ভুরি ভুরি প্রমাণ দিয়া যাইতেন, তখন ভক্তদের বলিতে হইত, "হ্যাঁ, এখানে খাতির চলবে না বাবা, এ যার নাম শশাঙ্ক মুখুজ্জে!"

দাদা বলিতেন, "না, গোঁড়ামিকে আমি প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজী নই।"

প্রায় সব ধর্মবাদকেই তিনি 'গোঁড়ামি' নামে অভিহিত করিতেন এবং গালাগাল না দেওয়াকে কহিতেন 'প্রশ্রয় দেওয়া'।

সেই দাদা এখন একেবারে অন্য মানুষ। ত্রিসন্ধ্যানা করিয়া জল খান না এবং জলের অতিরিক্ত যে বেশি কিছু খান বলিয়াই বোধ হয় না। পূজা পাঠ হোম লইয়াই আছেন এবং বাক্ ও কর্মে সূচিতা সম্বন্ধে এমন একটা 'গেল গেল' ভাব যে, আমাদের তো প্রাণ 'যায় যায়' হইয়া উঠিয়াছে।

ভক্তেরা বলে, "ও রকম হবে, এ তো জানা কথাই, এই হচ্ছে স্বাভাবিক বিবর্তন; এ একেবারে খাঁটি জিনিস দাঁড়িয়েছে।"

সকলের চেয়ে চিন্তার বিষয় হইয়াছে যে এই অসহায় লাঞ্ছিত হিন্দুধর্মের জন্য একটা বড় রকম ত্যাগস্বীকার করিবার নিমিত্ত দাদা নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং হাতের কাছে আর তেমন কিছু আপাতত না পাওয়ায় ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে ছোট কন্যাটির উপর।

একদিন বলিলেন, "ওহে শৈলেন, একটা কথা ভাবছি,—ভাবছি বলি কেন, একরকম স্থিরই করে ফেলেছি।"

মুখে গম্ভীর তেজস্বিতার ভাব দেখিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, "কি দাদা?"

"গৌরীদান করব স্থির করেছি, তোমার রাণুর কত বয়স হল?"

বয়স না বলিয়া বিস্মিতভাবে বলিলাম, "সে কি দাদা! এ যুগে- -"

দাদা সংযত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "যুগের 'এ' আর 'সে' নেই শৈলেন, ওইখানেই তোমরা ভুল করো। কাল এক অনন্তব্যাপী অখণ্ড সত্তা এবং যে শুদ্ধ সনাতনধর্ম সেই কালকে—"

একটু অস্থির হইয়া বলিলাম, "কিন্তু দাদা, ও যে এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু।"

দাদা বলিলেন, "এবং শিশুই থাকবে ও, যতদিন তোমরা বিবাহবন্ধনের দ্বারা ওর আত্মার সংস্কার ও পূর্ণ বিকাশের অবসর করে না দিচ্ছ। এটা তোমায় বোঝাতে হলে আগে আমাদের শাস্ত্রকাররা—"

অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, "সে তো বুঝলাম, কিন্তু ওর তো এই সবে আট বছর পেরুল দাদা, ওর শরীরই বা কতটুকু আর তার মধ্যে ওর আত্মাই বা কোথায়, তা তো বুঝতে পারি না। আমার কথা হচ্ছে—"

দাদা সেদিকে মন না দিয়ে নিরাশভাবে বলিলেন, "আট বৎসর পেরিয়ে গেছে! তা হলে আর কই হল শৈলেন? মনু বলেছেন, 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষেতুরোহিণী—জানি অতবড় পুণ্যকর্ম কি আমার হাত দিয়ে সমাধান হবে! ছোটটার বয়স কত হল?

রাণুর ছোট রেখা পাঁচ বৎসরের। দাদা বয়স শুনিয়া মুখটা কুঞ্চিত করিয়া একটু মৌন রহিলেন। পাঁচ বৎসরের কন্যাদানের জন্য কোন একটা পুণ্যফলের ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়ার জন্য মনুর উপরই চটিলেন, কিংবা অত পিছাইয়া জন্ম লওয়ার জন্য রেখার উপরই বিরক্ত হইলেন, বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আমিও আমার রুদ্ধশ্বাসটা মোচন করিলাম। মনে মনে কহিলাম, "যাক, মেয়েটার একটা ফাঁড়া গেল।"

দুই দিন পরে দাদা ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপস্থিত হইলে বলিলেন, "আমি ও-সমস্যাটুকুর এক রকম সমাধান করে ফেলেছি শৈলেন। অর্থাৎ তোমার রাণুর বিবাহের কথাটা আর কি। ভেবে দেখলাম, যুগধর্মটা একটু বজায় রেখে চলাই ভাল বইকি—"

আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, হর্ষের সহিত কহিলাম, "নিশ্চয়, শিক্ষিত সমাজে কোথায় যোল-সতেরো বছরে বিবাহ চলছে দাদা। এ সময় একটি কচি মেয়েকে—যার ন বছরও পুরো হয়নি—তা ভিন্ন খাটো গড়ন ব'লে—"

"ঝাঁটা মারো তোমার শিক্ষিত সমাজকে। আমি সে কথা বলছি না। বলছিলাম যে, যদি এই সময়েই রাণুর বিয়ে দিই, তা মন্দ কি? বেশ তো, যুগধর্মটা বজায় রইল, অথচ ওদিকে গৌরীদানেরও খুব কাছাকাছি রইল। ক্ষতি কি? এটা হবে যাকে বলতে পারা যায়, মডিফায়েড গৌরীদান আর কি।"

আমি একেবারে থ হইয়া গেলাম। কি করিয়া যে দাদাকে বুঝাইব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

দাদা বলিলেন, "পণ্ডিত মশায়েরও মত আছে। তিনি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখে বললেন, কলিতে এইটাই গৌরীদানের সমফলপ্রসূ হবে।"

আমি দুঃখ ও রাগ মিটাইবার একটা আধার পাইয়া একটু উষ্মার সহিত বলিলাম, "পণ্ডিত মশায় তা হলে একটা নীচ মিথ্যা কথা আপনাকে বলেছেন দাদা, আপনি সন্তুষ্ট হলে উনি এ

কথাও বোধহয় শাস্ত্র ঘেঁটেই বলে দেবেন যে, মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেও আজকাল গৌরীদানের ফল হবার কথা। কলিযুগটা তো ওঁদের কল্পবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন যে বিধানটা চাইবেন, পাকা ফলের মত টুক করে হাতে এসে পড়বে।"

দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। আমিই কথা কহিলাম, "যাক্, ওঁরা বিধান দেন, দিন বিয়ে। আমি এখন আসি, একটু কাজ আছে।"

আসিবার সময় ঘুরিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, শরীরটা খারাপ বলে ভাবছি, মাস চারেক একটু পশ্চিমে গিয়ে কাটাব; হপ্তাখানেকের মধ্যে বোধহয় বেরিয়ে পড়তে পারব।"—বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

অভিমানের সাহায্যে ব্যাপারটা মাস তিন-চার কোন রকমে ঠেকাইয়া রাখিলাম, কিন্তু তাহার পর দাদা নিজেই এমন অভিমান শুরু করিয়া দিলেন যে, আমারই হার মানিতে হইল 'ধর্মে'র পথে অন্তরায় হইবার বয়স এবং শক্তি বাবার তো ছিলই না, তবুও নাতনীর মায়ায় তিনি দোমনা হইয়া কিছুদিন আমারই পক্ষে রহিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে ওই দিকেই ঢলিয়া পড়িলেন। আমি বেখাপ্পা রকম একলা পড়িয়া গিয়া একটা মস্তবড় ধর্মদ্রোহীর মত বিরাজ করিতে লাগিলাম।

রাণুকে ঢালোয়া ছুটি দিয়া দিয়াছি। মায়াবিনী অচিরেই আমাদের পর হইবে বলিয়া যেন ক্ষুদ্র বুকখানির সমস্তটুকু দিয়া আমাদের সংসারটি জড়াইয়া ধরিয়াছে। পারুক, না পারুক—সে সমস্ত কাজেই আছে এবং যেটা ঠিকমত পারে না, সেটার জন্য এমন একটা সঙ্কোচ এবং বেদনা আজকাল তাহার দেখিতে পাই, যাহাতে সত্যই মনে হয়, নকলের মধ্যে দিয়া মেয়েটার এবার আসল গৃহিণীপনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। অসহায় মেজকাকাটি তো চিরদিনই তাহার একটা বিশেষ পোষ্য ছিলই; আজকাল আবার প্রথম ভাগ বিবর্জিত সুপ্রচুর অবসরের দরুণ একেবারে তাহার কোলের শিশুটিই হইয়া পড়িয়াছে বলিলে চলে।

সময় সময় গল্পও হয়; আজকাল বিয়ের গল্পটা হয় বেশি। অন্যের সঙ্গে এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে রাণু ইদানীং লজ্জা পায় বটে, কিন্তু আমার কাছে কোন দ্বিধা-কুণ্ঠাই আসিবার অবসর পায় না; তাহার কারণ আমাদের দুইজনের মধ্যে সমস্ত লঘুত্ব বাদ দিয়া গুরুগম্ভীর সমস্যাবলীর আলোচনা চলিতে থাকে। বলি, "তা নয় হল রাণু, তুমি মাসে দুবার করে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে আমাদের সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে গেলে। আর সবই করলে, কিন্তু তোমার মেজকাকাটির কি বন্দোবস্ত করছ?"

রাণু বিমর্ষ হইয়া ভাবে; বলে, "আমরা সব বলে বলে তো হয়রাণ হয়ে গেলাম মেজকা যে, বিয়ে কর, বিয়ে কর। তা শুনলে গরিবদের কথা? রাণু কি তোমার চিরদিনটা দেখতে-শুনতে পারবে মেজকা? এর পর তার নিজের ছেলেপুলেও মানুষ করতে হবে তো? মেয়ে আর কতদিন নিজের বল?"

তোতাপাখির মত, কচি মুখে বুড়োদের কাছে শেখা বুলি শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব, ঠিক করতে পারি না; বলি "আচ্ছা, একটা গিন্নীবান্নী কনে দেখে এখনও বিয়ে করলে চলে না? কি বল তুমি?"

এই বাঁধা কথাটি তাহার ভাবী শ্বশুরবাড়ি লইয়া একটি ঠাট্টার উপক্রমণিকা। রাণু কৃত্রিম অভিমানের সহিত হাসি মিশাইয়া বলে, "যাও মেজকা, আর গল্প করব না; তুমি ঠাট্টা করছ।"

আমি চোখ পাকাইয়া বিপুল গাম্ভীর্যের সহিত বলি, "মোটেই ঠাট্টা নয় রাণু; তোমার শাশুড়িটি বড্ড গিন্নী শুনেছি, তাই বলছিলাম, যদি বিয়েই করতে হয়—"

রাণু আমার মুখের দিকে রাগ করিয়া চায় এবং শেষে হাসিয়া চায়। কিছুতেই যখন আমার মুখের অটল গাম্ভীর্য বদলায় না, তখন প্রতারিত হইয়া গুরুত্বের সহিত বলে, "আচ্ছা, আমি তাই'লে—না মেজকা, নিশ্চয় ঠাট্টা করছ, যাও—"

আমি চোখ আরও বিস্ফারিত করিয়া বলি, "একটুও ঠাট্টা নেই এর মধ্যে রাণু; সব কথা নিয়ে কি আর ঠাট্টা করা চলে মা?"

রাণু তখন ভারিক্কি হইয়া বলে, "আচ্ছা, তা হলে আমার শাশুড়ীকে একবার বলে দেখব'খন, আগে যাই সেখানে। তিনি যদি তোমায় বিয়ে করতে রাজী হন তো তোমায় জানাব'খন; তার জন্য ভাবতে হবে না।" তাহার পর কৌতুকদীপ্ত চোখে চাহিয়া বলে, "আচ্ছা মেজকা পেরথোম ভাগ তো শিখি নি এখনও—কি করে তোমায় জানাব বল দিকিন, তবে বুঝব হ্যাঁ—"

আমি নানান রকম আন্দাজ করি; বিজয়িনী ঝাঁকড়া মাথা দুলাইয়া হাসিয়া বলে, "না হল না—কখ্‌খনও বলতে পারবে না, সে বড্ড শক্ত কথা।"

এই সব হাসি তামসা গল্পগুজব হঠাৎ মাঝখানে শেষ হইয়া যায়; রাণু চঞ্চলাতর মাঝে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলে, "যাক, সে পরের কথা পরে হবে; যাই, তোমার চা হল কি না দেখিগে।" কিংবা—"যাই, গল্প করলেই চলবে না, তোমার লেখার টেবিলটা আজ গুছোতে হবে, একডাই হয়ে রয়েছে—" ইত্যাদি।

এইরকম ভাবে রাণুকে নিবিড় হইতে নিবিড়তর ভাবে আমার বুকের মধ্যে আনিয়া দিতে দিতে বিচ্ছেদের দিনটা আগাইয়া আসিতেছে।

বুঝিবা রাণুর বুকটিতেও এই আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা তাহার অগোচরে একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। কচি সে, বুঝিতে পারে না; কিন্তু যখনই আজকাল ছুটি পাইলে নিজের মনেই স্লেট ও প্রথম ভাগটা লইয়া হাজির হয়, তখনই বুঝিতে পারি, এ আগ্রহটা তাহার কাকাকে সান্ত্বনা দেওয়ারই একটা নূতন রূপ; কেন না, প্রথম ভাগ শেখার আর কোন উদ্দেশ্য থাক্ আর না-থাক্, ইহার উপরই ভবিষ্যতে তাহার কাকার সমস্ত সুখ-সুবিধা নির্ভর করিতেছে—রাণুর মনে এ ধারণাটুকু বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এখন আর একেবারেই উপায় নাই বলিয়া তাহার শিশু-মনটি ব্যথায় ভরিয়া উঠে; প্রবীণার মত আমায় তবুও আশ্বাস দেয়, "তুমি ভেবো না মেজকা, তোমার পেরথোম ভাগ না শেষ করে আমি কখখনও শ্বশুরবাড়ি যাব না। নাও, বলে দাও।"

পড়া অবশ্য এগোয় না। বলিয়া দিব কি, প্রথম ভাগটা দেখিলেই বুকে যেন কান্না ঠেলিয়া উঠে। আবার প্রতিদিনই গৌরীদানের বর্ধমান আয়োজন। বাড়ির বাতাসে আমার হাঁফ ধরিয়া উঠে। এক-একদিন মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরি, বলি, "আমাদের কোন দোষে তুই এত শিগগির পর হতে চললি রাণু?"

বোঝে না, শুধু আমার ব্যথিত মুখের দিকে চায়। এক-একদিন অবুঝভাবেই কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠে; এক-একদিন জোর গলায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, "তোমার কষ্ট হয় তো বিয়ে এখন করবই না মেজকা, বাবাকে বুঝিয়ে বলব'খন।"

একদিন এইরকম প্রতিজ্ঞার মাঝখানেই সানাইয়ের করুণ সুর বাতাসে ক্রন্দনের লহর তুলিয়া

বাজিয়া উঠিল। রাণু কুণ্ঠিত আনন্দে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ কি রকম হইয়া গিয়া মুখটা নীচু করিল; বোধ করি তাহার মেজকাকার মুখে বিষাদের ছায়াটা নিতান্তই নিবিড় হইয়া তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

গৌরীদান শেষ হইয়া গিয়াছে; আমাদের গৌরীর আজ বিদায়ের দিন। আমি শুভকর্মে যোগদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি নাই, এ-বাড়ি সে-বাড়ি করিয়া বেড়াইয়াছি। বিদায়ের সময় বরবধূকে আশীর্বাদ করিতে আসিলাম।

দীপ্তশ্রী কিশোর বরের পাশে পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার-পরা, মালাচন্দনে চর্চিত রাণুকে দেখিয়া আমার তপ্ত চক্ষু দুইটা জুড়াইয়া গেল। কিন্তু ও যে বড্ড কচি-এত সকালে কি করিয়া বিদায়ের কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায়? ও কি জানে, আজ কতটুকু পর করিয়া ওকে বিদায় দিতেছি আমরা?

চক্ষে কোঁচার খুঁটি দিয়া এই পুণ্যদর্শন শিশুদম্পতিকে আশীর্বাদ করিলাম। রাণুর চিবুকটা তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, "রাণু তোর এই কোলের ছেলেটাকে কার কাছে—" আর বলিতে পারিলাম না।

রাণু শুনিয়াছি এতক্ষণ কাঁদে নাই। তাহার কারণ নিশ্চয় এই যে, সংসারের প্রবেশ-পথে দাঁড়াইতেই ওর অসময়ের গৃহিণীপনাটা সরিয়া গিয়া ওর মধ্যকার শিশুটি বিস্ময়ে কৌতূহলে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার কথার আভাসে সেই শিশুটিই নিজের অসহায়তায় আকুল হইয়া পড়িল। আমার বাহুতে মুখ লুকাইয়া রাণু উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কখনও কচি মেয়ের মত ওকে ভুলাইতে হয় নাই। আমার খেলাঘরের মা হইয়া ওই এতদিন আমায় আদর করিয়াছে, আশ্বাস দিয়াছে; সেইটাই আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যেন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল, ভালো মানাইত। আজ প্রথম ওকে বুকে চাপিয়া সান্ত্বনা দিলাম—যেমন দুধের ছেলেমেয়েকে শান্ত করে—বুঝাইয়া, মিথ্যা কহিয়া, কত প্রলোভন দিয়া।

তবুও কি থামিতে চায়? ওর সব হাসির অন্তরালে এতদিন যে গোপনে শুধু অশ্রুই সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া সে থামিল। অভ্যাসমতে আমার করতল দিয়াই নিজের মুখটা মুছাইয়া লইল; তাহার পর হাতটাতে একটু টান দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "এদিকে এস শোন মেজকা।"

দুইজনে একটু সরিয়া গেলাম। সকলে এই সময় মাতাপুত্রের অভিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাণু বুকের কাছ হইতে তাহার সুপ্রচুর বস্ত্রের মধ্যে হইতে লাল ফিতায় যত্ন করিয়া বাঁধা দশ-বারোখানি প্রথম ভাগের একটা বাণ্ডিল বাহির করিল। অশ্রুসিক্ত মুখখানি আমার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল, "পেরথোম ভাগগুলো হারাই নি মেজকা, আমি দুষ্টু হয়েছিলুম, মিছে কথা বলতুম।"

গলা ভাঙিয়া পড়ায় একটু থামিল, আবার বলিল, "সবগুলো নিয়ে যাচ্ছি মেজকা, খু-ব লক্ষ্মী হয়ে পড়ে পড়ে এবার শিখে ফেলব। তারপরে তোমায় রোজ রোজ চিঠি লিখব। তুমি কিছু ভেবো না মেজকা।"

অক্ষয়বটোপাখ্যানম্

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরগনা তিন ভুবনপুরের অন্তর্গত ঘাট ভুবনপুরের পত্তনীদারণী মহামহিম মহিমার্ণবা শ্রীল শ্রীযুক্তা গয়েশ্বরী ঠাক্‌রুনের পাল্লায় পড়ে ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে যে কি নাজেহাল হয়েছিলাম তা আগে বলেছি এর জের আজও চলছে, মেটেনি। ঘাট ভুবনপুরের ঘটনার জের টেনে এসে পড়ল আগয়া নদীর তটভূমিতে সেই বিশাল বটবৃক্ষের ঘটনা। অক্ষয় বট-উপাখ্যান্‌ম। এর জন্য ভূতভুবনপুরের ব্যাপারে যতখানি নাজেহাল হয়েছিলাম আমি; না, আমি না, নাজেহাল হয়েছিলেন রামকালীবাবু।

অবশ্য রামকালীবাবু আমারই ছদ্মনাম। ভূত সম্পর্কে গবেষণা করবার আগে ওই নামটা আমি গ্রহণ করেছিলাম।

যাক গে।

না, যাবেই বা কেন? ভাগ্যে নামটা নিয়েছিলাম—না হলে ওই রামনামটা ধরে কি লোকেরা অজ্ঞান অচেতন আমার কানের কাছে চিৎকার করে ডাকতেন? আর রামনাম না শুনলে কি গয়েশ্বরী ঠাকরুন তাঁর দামিনী ঝি এবং ঘাটভুবনপুরের সেই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধবাসরে সমবেত ভয়ংকর মূর্তি কেঁপে ওঠা এবং ধেই ধেই নৃত্যরত ভূতকুল পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপসে যেতো।

এখন জ্ঞান তো ফিরল। মানে মানে কলকাতায় ফিরে এলাম। এবং ভূতপুরাণটা লিখে ফেললাম। তাতে কিন্তু উলটো ফল হল। আমি আমার থিসিসে প্রমাণ করতে চাইলাম এক কিন্তু লোকে বুঝলে অন্য।

বলতে চাইলাম—ভয়ের মধ্যে ভূতের বাস—

লোকে বুঝলে—ভূত না-মানলে সর্বনাশ।

আমি বলতে চাইলাম—মানুষকে ভূত পারবে না।

লোকে বুঝলে—ভূত কখনও হারবে না। ঘাড়ের দখল ছাড়বে না। যাক—একথা আরও অনেক রকম করেই বলা যায়—কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। তবে ফ্যাসাদে পড়লাম তাতে সন্দেহ নেই; কারণ চিঠিপত্র সহযোগে নানান্ প্রশ্ন আসতে লাগল। বিশেষ করে রামাই ভূত আর কালীবাবুর বাড়ির সেই প্রেতটার খোঁজ নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসতে লাগল। একটি ছেলে তো আমাকে লিখলে—রামাইয়ের ঠিকানা দেবেন—আমি তার পেন-ফ্রেন্ড হতে চাই। এসব থেকেও নিষ্কৃতি আছে কিন্তু একটা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল যে মধ্যে মধ্যে কেউ যেন আশপাশে খসখস ফিসফাস করে ওঠে। কখনও বা ফিসফিসিনির মধ্যে শুনি—বলি—শুনছ!

বুক ঢিবঢিব করে ওঠে, চোখ পিটপিট করে, সামনে যেন সরষে ফুল ফোটে—মনে মনে বলি— "জয় রাম শিবরাম। সীতারাম হে! ভূতেদের হাত থেকে কর ত্রাণ হে।"

আশ্চর্য, যে নামে গয়েশ্বরী এবং তাঁর ভূতকুল পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপসে

গিয়েছিলেন প্রায় এক মুহূর্তে, সে নামেও এই ফিসফিসিনি এবং এই খসখসানি বন্ধ হয় না। বুঝতে পারি না ব্যাপারটা কি?

য-ম দত্তকে জিজ্ঞাসা করলাম। দত্তমশায় মালদার আমসীর মত লম্বা শুকনো মুখখানা নিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে গোটা মুখের মধ্যে অবশিষ্ট সাড়ে চারখানা দাঁত বের করে বললেন—ও সব গল্প লিখিয়েদের মাথায় আসবে না। মাথায় তো গোবর পোরা আছে। বলি ভূত কতপ্রকার সেটা জানা আছে কি?

বললাম—ভূত প্রেত পিশাচ—

দত্ত বললেন—তোমার মাথা। ভূত প্রথমতঃ দুই প্রকার—মৌলিক ভূত এবং যৌগিক ভূত। সেটা জান?

হাঁ হয়ে গেলাম। দত্ত বললেন—মৌলিক ভূত তারাই যাদের ভূত করেই ব্রহ্মা তৈয়ারি করেছিলেন। তারা পুরুষানুক্রমে ভূত—যেমন ধর মহাদেবের প্রধান ভূত নন্দী মহারাজ—নন্দী মহারাজের বেটা দণ্ডী কি শৃঙ্গী, তস্য বেটা জঙ্গী, তস্য বেটা রঙ্গি—; এ নামগুলো অবশ্য ঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু বেটার বেটা তস্য বেটা তস্য তস্য তস্য বেটা তো আছেই। অর্থাৎ খাঁটি ভূত। মানে কালিকট বন্দরে ভাস্কোডিগামার সঙ্গীসাথী খাঁটি পর্টুগীজের মত খাঁটি ভূত। এদেশের লোককে জোর করে ধর্মান্তরিত করা খৃষ্টানের মত হল যারা, তারা হল মানুষ মরে ভূত। কেউ কিছু জন্যে মানে অপঘাতে মরার জন্যে ভূত হল—কেউ পিণ্ডি না পেয়ে ভূত হল—কেউ মরার সময় খারাপ লগ্নে মরে ভূত হল। তারা হল দুসরা রকমের ভূত। তারাই রাম নামে চুপসে যায়। অরিজিনাল ভূতেরা হল খোদ শিবের খাস চেলা—তারা এই কালের হিপিদের মত চব্বিশ ঘণ্টাই সিদ্ধি গাঁজা খেয়ে বোম বোম রাম রাম করে নাচছে—তারা রাম নামে ভয় খাবে সেটা বলে কেডা? হুঃ—যত সব—!

আমাকে মানতে হল কথাটা। হ্যাঁ কথাটা তা ঠিক। এটা তো আমার বোঝা উচিত ছিল। ভূত দুই প্রকার—ভূতের বেটা ভূত, আর মানুষ মরে ভূত। ভূতের বেটা ভূত হয় তাদের মরণ নাই। মানুষ মরে ভূত হয়, তারাই আবার ভূত মরে মানুষ হয়।

দত্ত বললেন—আরও আছে হে বাপু! মানুষ মরা ভূতগুলো শুধুই ভূত, তার বেশি বিশেষ কিছু না; ওই ধর—বামুন মরে ব্রহ্মদৈত্যি, কায়েত মরে যমরাজার আদালতে কেরানী—গলায় দড়ি দিয়ে মরে 'গলায় দড়ে' আগুনে পুড়ে মরলে চামড়া ওঠা ছালছাড়ানো ও ওলের মত রং যথা ভূত, তারপর ধর—জলে ডুবে মরা মানুষ—মেয়ে হলে শাঁকচুন্নী, পুরুষ হলে 'বিলচর' কি 'খালচর' ভূত। অনেক আছে। এরাই রাম নামকে ভয় করে। আর আসল ভূতেরা হল শিবের সেপাই—নন্দীর সন্তান—ওরা দেবতাদের মতই—সেই কারণে ওদের আর এক নাম হল 'অপদেবতা'।

বটে ত! ঠিক বলেছে দত্ত! অপদেবতাই তো বটে। শিব পঞ্চমুখে রামনাম গান করেন ডমরু বাজান নন্দী মধ্যে মধ্যে শিঙাতে ফুঁ দেয়। আর অপদেবতা ভূতেরা—ভূত পেত্নীরা,' বা অপদেবীরা ধুতরা গুলতে এবং কল্কে ফুলের মালা পরে, পায়ে মরার হাড়ের নূপুর পরে তা থৈ থৈ তা থৈ থৈ —থিয়া থিয়া করে নাচে। তারা রাম নাম শুনে ভয় করবে কেন?

তা হলে? একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে তুমি বলছ যারা খসখস করে নড়েচড়ে বা অদৃশ্য থেকে ফিসফিস করে সাড়া দিচ্ছে তারা মানুষ মরে ভূত নয়।

না—। বলছি যারা রাম নাম শুনেও মরছে না—তারা মানুষ মরা ভূত নয়, খাঁটি তুর্কীর মত খান-খানান, কিংবা খাঁটি হারমাদ কি ইংরেজ কি ফরাসীট্‌বাসীদের লর্ড কাউন্ট কি মিস্টার মশিয়েদের মত খাঁটি ভূতের বেটা ভূত কি, অপদেবতা, কি উপদেবতাও হতে পারে।

কথাগুলি যম দত্ত কট্-কট্ করে কামড়ে-কামড়ে বলার মত বললে। তবে তাতে ফোঁকলা দাঁত বুড়োর কামড়ের-মত খুব কষ্ট বা যন্ত্রণাদায়ক মনে হল না। তার উপর বুড়ো আমাকে ভালোবাসে। বললে—দেখ না ইশারা-টিশারা দিয়ে—যদি কিছু নতুন তত্ত্ব কি তথ্য মেলে তা হলে আমেরিকা রাশিয়াকেও হারিয়ে দিতে পারবে। ওরা চাঁদে ল্যান্ড করে যা জানবে—তা থেকে অনেক বেশি জানা যাবে। মানে মানুষ মরে যেখানে যায় সেখানকার খবর পেয়ে যাবে।

কথাটা বুড়ো মন্দ বলেননি; মনে লাগল। রাশিয়া আমেরিকা চাঁদে নেমে ফিরে আসবে। আমি ঘাটভুবনপুরে বৈতরণীর ঘাটের এলাকা পর্যন্ত গিয়ে তো ফিরে এসেছি। আমারই বেকুবি আমি কিছু নিদর্শন আনতে পারিনি। এক আধটা ভূতের নখ কি পেতনীর চুল কি মুলোর মত দাঁতের একটা দাঁত কিংবা খেয়া ঘাটের মাটি, এসবের কিছুই আনতে পারিনি। পারলে তো বাজিমাৎ হয়ে যেতো, তা যখন আনা হয়নি তখন তো প্রমাণ করতে কিছু পারছি না। তবে দেখছি গ্রহগ্রহান্তরে—রেডিও সিগনালের মত ওদের কাছ থেকে ইশারার যেন সিগন্যাল পাচ্ছি। সেই ইশারায় সাড়া দিয়ে দেখাই যাক না। যম দত্ত উপদেশ দিলে—প্রথমেই কিন্তু 'রামনাম সত্য হ্যায়'; বুঝেছ! তাহলে আট ট্যাঁস ফিরিঙ্গী কি কালো দেশী তুর্কীর মত মানুষ মরা ভূত আসবে না। মানুষ মরা ভূত হলে চামচিকে হয়ে ফুড়ুৎ হয়ে যাবে; আর খানদানী মৌলিক ভূত হলে বলবে—নাচবো নাকি? যেমন নাচি শিবের সঙ্গে?

ফলটা হাতে-হাতেই ফলল।

আশেপাশে যখন তখন ফিসফিসিনি খসখসানি কমে গেল। তবে মধ্যে মধ্যে দু চারখানা দীর্ঘনিশ্বাস কি মিহি নাকি সুরে করুণ খুনখুনুনি আওয়াজ পেতে লাগলাম। যার অর্থ হল—হায়রে হায় বা তুমি মানুষটা বড় খট্‌রোগা। বেরসিক লোক।

ওতে আমি কিন্তু এতটুকু সংকোচবোধ করলাম না।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'রামনাম সত্য হ্যায়'! মানুষ মরা ভূতের পরওয়া হম নেহি করতা হ্যায়। আওয়াজ ছাড়লেই সব একেবারে নিস্তব্ধ। বুঝতে পারি—শূন্যলোকে অদৃশ্য চামচিকে বা ফড়িংয়ের মত ভূতের দল উধাও হয়ে গেল।

*　　　*　　　*　　　*

হঠাৎ সেদিন। এই তো ১৩৭৬ সালের ৪ঠা বৈশাখ।

ওই যে ঝড়ের দিন। পেল্লায় ঝড় হয়ে গেল। গোটা বাংলা দেশই প্রায় তছনছ হল সেদিন। বেলা তিনটে থেকে ঝড়ের শুরু হল—দমকায় দমকায় তিনবারে প্রায় ঘণ্টা চারেক ঝড় আর জল। পশ্চিম আকাশ অন্ধকার করে সে ভীষণ কালো পালবন্দী বুনো মহিষের দলের মত মেঘ যেন তেড়েফুড়ে খুরের দাপটে, শিঙের খোঁচায় গাছপালা টেলিগ্রাফের পোস্ট উপড়ে দিয়ে (বোধ করি সমূলে উৎপাটিত করে বলাই ভালো) ঘরের চাল উড়িয়ে দিয়ে উলটে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল। আমি তার আগের দিন রাত্রি থেকে ট্রেনে আসছিলাম। ওরা রাত্রে পাটনা থেকে রওনা হয়ে দুপুর দেড়টায় নেমেছিলাম আমাদের বাড়ির ইস্টিশান—আমদপুরে; সেখান থেকে একটা মোটরে লাভপুর গিয়ে মাকে প্রণাম করে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলাম—

তখন বেলা দুটো। গাড়িতে চড়ে মনে হল পশ্চিম আকাশের একেবারে দিগন্তে—প্রথম বুনো মোষের পালটা যেন বন থেকে মুখ বের করে তৈরি হচ্ছে; ওদের দলপতি একটা হাঁক দিয়ে ছুটতে শুরু করলেই দড়বড়—দড়বড়—গাঁ-গাঁ শব্দ তুলে গোটা পালটাই দৌড়ুতে আরম্ভ করবে। ভয় হল কিছুটা, কিন্তু হলে কি হবে আমারও একটা কেমন গোঁ আছে, সেই গোঁয়ের বশে মেঘ গ্রাহ্য না করেই বললাম—চলো। ছেড়ে দাও গাড়ি।

মোটরে সাত মাইল পথ? পথ এখন নতুন কালের পিচঢালা পথ। কতক্ষণ লাগবে? বড় জোর বিশ মিনিট। ইতিমধ্যে মনে হল মোষের দলটা যেন দিগন্তের ওপাশে মুখ সরিয়ে নিয়ে—বোধহয় মতলব বদলালে। দৌড়টা আজ মুলতুবি রাখলে। শুধু তাদের নিশ্বাসে ওড়া খানিকটা লাল ধুলো উড়ল—কিছুক্ষণ বৃষ্টি হল; আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কিন্তু হরি হরি। হরির মতলব বোঝা ভার। তিনি মারতেও আছেন রাখতেও আছেন। সবেতেই বোধ করি সমান খুসী। আমদপুর স্টেশনে এসে পৌছুলাম যখন তখন পশ্চিমাকাশে কালো স্লেটের মত রঙের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দক্ষিণে বোলপুর, উত্তরে সাঁইথিয়া পর্যন্ত আকাশ জুড়ে সোজা পুবমুখে এগিয়ে চলেছে। উপমা ওই পালবন্দী বুনো মোষ বা বাইসনের সঙ্গে শিং নীচু করে লেজ পিঠে ফেলে পরস্পরের গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি লেগে গর্জন করতে করতে ছুটেছে।

এরই মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো; একটা তীব্র আলো ঝলসানির সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জালে। যেন মোষেরা শিঙে শিঙে ঢু মারলে—তাতেই উঠল আগুন এবং আওয়াজ। তার সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে এলো বৃষ্টি। সামনেই প্লাটফর্মের ওপাশে পয়েন্টসম্যান প্রভৃতিদের কোয়ার্টারের ওধারে অনেককালের একটা বাগান। বাগানটার গাছগুলোও অনেকদিনের। যেন মাথায় বাঁশের বাড়ি খেয়ে বড় গাছগুলো একেবারে বাপ বলে শুয়ে পড়ল। স্টেশনের ওয়েটিং রুমের খোলা জানলা একখানা উড়ে চলে গেল। কোথা থেকে ঝড়ে উড়ে এসে প্লাটফর্মের উপর সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়ল একখানা আস্ত টিন বা করোগেটেড শীট। স্টেশন ওয়েটিং রুমে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল, পাখা চলছিল। ফুস করে আলো নিভে গেল, পাখা চলার শব্দ থামল এবং ঘোরার বেগ মন্থর হল—বোঝা, গেল ইলেকট্রিক গেছে। ওয়েটিং রুমটার মধ্যে একঘর লোক ঠাসাঠাসি হয়ে বসে রইলাম। বাইরে খোলা প্লাটফর্ম ফাঁকা, সেখানে মোটাসোটা ফোঁটায় ঘন ধারায় বর্ষণ চলছে। দেখতে দেখতে প্লাটফর্মের রাঙা কাঁকর ফেলা জায়গায় জল জমে জল বইতে লাগল। আমরা বোবা হয়ে বসে রইলাম। এর মধ্যে সৌভাগ্য বা সুরাহা হল এই যে ঝড় এবং বৃষ্টির ফলে গুমোট গরমের অসহনীয়তা আর রইল না। একঘর লোক, তা প্রায় জন তিরিশেক—সবাই বোবা হয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে প্লাটফর্মের ওপর জমা জলের উপর বৃষ্টি ধারাপাতের একঘেয়ে দৃশ্য দেখছে এবং শব্দ শুনছে। জলঝড় যখন হয় তখন মানুষকে অভিভূত করা একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। মানুষ অবাক হয়ে দেখে বিমূঢ় হয়ে শোনে। দেখে বৃষ্টি পড়া আর শোনে ঝড়ের গোঙানি।

এরই মধ্যে ঝড়টা কিছু কমল। আকাশ ফরসাও কিছুটা হল। ঝড় অবশ্য বইছিল। আকাশের কালো মেঘ সেই ঝড়ের বেগে পূবদিকে চলে গেল। ওদিকে আপ দার্জিলিং মেলের ঘণ্টা পড়ল। স্টেশনে খবর নিলাম কলকাতার ট্রেনের কত দেরি? খবর পেলাম না। মাস্টার বললেন—টেলিফোনে সাড়া পাচ্ছিনা; বোধ হয় টেলিফোন লাইনে গোলমাল হয়ে থাকবে। দাঁড়ান একটু, মেলটা পার হয়ে যাক।

মনে অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

ঘরে বসতে গিয়ে বসলাম না; প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আপ লাইনের সিগনালের দিকে চেয়ে রইলাম। এরই মধ্যে একসময় মনে হল আবার অন্ধকার ঘনালো। উপরে আকাশের দিকে তাকালাম, দেখলাম— আকাশে যেন কালো ছায়া পড়েছে। মেঘের ছায়া। পশ্চিমে আবার ঘন কালো মেঘ উঠেছে। তার চেহারা এমন ভয়াল এবং ভীম যে মনে হল এবার স্বয়ং মহিষাসুর বোধ করি গদা হাতে তার বাছাবাছা সৈন্য সেনাপতির ঠাসা দল নিয়ে বেরিয়েছে।

এরই মধ্যে এল দার্জিলিং মেল। এল, ছেড়ে গেল। মেলখানা ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পার হল—আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। এক সময় কে যেন বললে—ঘরের ভিতর যান।

কে বললে? কাউকে দেখলাম না। তবে ঝড় এবং জল আবার দ্বিগুণ বেগে নিশ্চিত আসছে বুঝে ওয়েটিং রুমে এসে ঢুকলাম। ঘরে তখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়েছে। গুমোটও বেশ ঘন হয়েছে দেখলাম। আর একজন এসে ঘরে ঢুকে বললে—কলকাতার ট্রেনের খবর মিলল না। টেলিফোন টেলিগ্রাফ গন্।

—গন্ মানে?

—গো, ওয়েন্ট, গন। তার ছিঁড়ে গিয়েছে। পোস্ট ধরাশায়ী হয়েছে। অথবা যন্ত্র কোন্ প্রকারে অচল হয়েছে।

—তা হলে?

কে বলবে—ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার। চুপচাপ বসে থাকুন অভিসারের প্রতীক্ষায়—

আকস্মিক প্রচণ্ড গর্জনে সব থর থর করে কেঁপে উঠল। চোখ তার আগেই ধেঁধে গেছে। রসিকতা করার সব শক্তি মন যেন মাথায় লাঠি খেয়ে অচেতন হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল।

ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি হতে শুরু হল—তার সঙ্গে সে এক মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত দীর্ঘকায় জটাধারী পাগলের মাথা নেড়ে নেড়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গেল।

ঘরেব ভিতরটা তখন থমথমে অন্ধকারে ভরে গেছে। মধ্যে মধ্যে দু'একজন এক আধ বারের জন্য হাতের টর্চ জ্বেলেই আবার নিভিয়ে দিচ্ছেন। কথাবার্তা নেই। কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কথা কইবেই বা কি করে। শুধু খেয়ালী মানুষেরা পাথর বা কাঁকড় ছুড়ে ঘুমন্ত কুকুরটাকে সজাগ করবার মত কথা ছুড়ছেন। কেউ ডাকছেন—বাচ্চু!...বাচ্চু কোথায় রে? উত্তর আসে না। তার বদলে ওদিক থেকে কেউ আপসোসের সুরে বলেন—

—ওঃ গাছের পাকা বেগুনগুলো আর একটা গাছে থাকবে না, সব পড়ে যাবে। রমন্দ বললে পেড়ে নাও। তা নিলাম না। আঃ আর একটা পাব না। খাসা বেল। মড়ার মাথার মত! আঁ। কজন হাসলে। আবার কেউ বললে, মনটা চাঁহা চাঁহা করেছে রে! কিন্তু—যাই বা কি করে স্টলে। এনেই বা দেবে কে? কে বললে—খিদে পেয়েছে। আমি এরই মধ্যে শুনছিলাম—কেউ যেন খুনখুন শব্দে কাঁদছে। চাপা কান্না। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস। মধ্যে দমকা ঝড় এসে ঢুকছিল। হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকে বললে—বাস্! সব খতম রে বাবা! হয়ে গেল।

একসঙ্গে কয়েকজনই প্রশ্ন করে উঠল—মানে?

—সারা রাত এখন থাকুন বসে।

—কেন? কেন বসে থাকব?

—ট্রেন আসবে না।—

—আসবে না?

—না। ঝড়ে গাছ উলটে লাইনের ওপর পড়েছে! সাঁইতের আগে। দার্জিলিং মেল বাতাসপুরে খোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোপাইয়ের কাছে গাছ পড়েছে, সেখানে আটকেছে দানাপুর প্যাসেঞ্জার। তার পিছনে বোলপুরে দাঁড়িয়ে গেছে রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার। সারা জেলার ইলেকট্রিক বুত গিয়া। বাস—তখনও প্রবল বেগে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। এবং ঝড় চলছে। এরই মধ্যে মনে হল পিছনের দিকে বাথরুমের দরজাটি খুলে গেল এবং কেউ যেন খুন-খুন-খুন-খুন করে করুণ সুরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে গেল!

"বুঁনি! বুঁনি! শেঁষে গাঁছ চাঁপা পড়ে অপঁঘাতে মরলি বুঁনি। ওরে আমার বুনিরে। কতবার বলেছি—বনে থাকিস নে—বনে থাকিস নে। হাঁয় হাঁয় ঝঁড়ের সময় তো চলে এলে পারতিস!

অস্পষ্ট ফিসফিসানি নাকি সুরে কথা ক'টি ঘরের বাইরে প্লাটফর্মের ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমি চমকে উঠলাম। "বুনি"? কতবার বলেছি বনে থাকিস নে!" কথা যে বললে সে বাথরুমের কোণ থেকে বেরিয়ে এল। তা হলে ও কি—কুনি? রাম রাম রাম! কিন্তু তবুও কুনির যেন খসখসানি ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে পড়ে গেল মা বলেছিলেন "কুনি বুনি" দুই বোন ভূতনীর কথা। 'কুনি, থাকে ঘরের কোণে—'বুনি' থাকে বনে। একদিন এক বামুন গেছিল বনের মধ্যে। কি যেন জড়ি বুটি খুঁজতে গিছল। সেখানে বামুন মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে শুনতে পেলে কেউ যেন বলছে—'কুনিকে বলো গিয়ে বুনির ছেলে হয়েছে।' বামুন প্রথমটা কেয়ার করে নি, পরে বারবার ওই কথাগুলো শুনে কেয়ার না করে পারলে না। শুনলে কিন্তু বুঝতে কিছু পারলে না। যাইহোক বাড়ি ফিরে এসে হাত পা ধুয়ে ধর একটু চা খেতে খেতে বললে—'বামনী আজ বনে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে।'

বামনী বললে—আশ্চর্য কাণ্ড? কি রকম আশ্চর্য কাণ্ড? তারপরে বললে—তোমার তো সবই আশ্চর্য কাণ্ড। যতঃসব—হুঃ।

বামুন বললে— শোন তবে। বলে বললে—বনের মধ্যে বুঝলি কিনা—আমি মাটি খুঁড়ছি আর কে যেন কোথা থেকে বললে—কুনিকে বলো গিয়ে বুনির ছেলে হয়েছে।

আমি প্রথমটা কেয়ার করিনি। কিন্তু সে নাগাড় বলে চলল—মেয়েছেলের গলা তাও একটু একটু খোনা খোনা, ওই এক নাগাড় বলে গেল—কুঁনিকে বঁলো গিঁয়ে বুঁনির ছেঁলে হয়েছে। কুঁনিকে বঁলো গিঁয়ে বুঁনির ছেঁলে হঁয়েছে ও-বাঁমুন, কুঁনিকে বঁলো গিঁয়ে বুঁনির ছেঁলে হয়েছে।

আমার শেষটা কেমন গা ছমছম করে উঠল; আমি ছুটে পালিয়ে এলাম।

বামনী বললে—খুব বীরপুরুষ আমার! ভালো করে দেখলেনা একবার খুঁজে পেতে? কোন বদমাশ মেয়েছেলে তোমার সঙ্গে মস্করা করেছে। ভয় দেখিয়েছে। খুব ছুটেছ তো?

বলতে বলতে কথা বলা আর শেষ হল না। বামনীর মুখের কথা মুখে থাকল চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল—বামুন আতঙ্কে আঁ আঁ করে উঠল। কারণ ঘরের মধ্যে থেকে—অর্থাৎ ঘরের কোণ থেকে—অর্থাৎ ঘরের কোণ থেকে এই এক কালো ধিঙ্গী মেয়ে এই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, এই ভাঁটার মত চোখ, পেঁচার মত নাক, মুলোর মত দাঁত, কুলোর মত কান ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল। আর মুখে সে বেশ সুর করেই বলছিল—কঁয় দিবঁসে? কঁয় দিবঁসে? কঁদিন হঁলো কঁদিন হঁলো।

বলতে বলতে এবং নাচতে নাচতে সে বেরিয়ে চলে গেল বনের দিকে।

এরা কি সেই কুনি এবং সেই বুনি?

মনে তো তাই হচ্ছে। বললে—ঝড়ের সময় তো পালিয়ে এলে পারতিস। সেই বুনি এবং সেই কুনি না হলেও তাদেরই সন্তান-সন্ততি কেউ হবে। এরা তো মানুষ মরা ভূত নয় এরা হল আদিকালের মৌলিক ভূত—কোণের অন্ধকারের ভূত কুনি—বনের অন্ধকারের ভূত বুনি। এরা মৌলিক ভূত—এদের বংশানুক্রমে আছে এরা বিয়ে করে এদের ছেলেপিলে হয়। এরা রামনামে গয়েশ্বরী বা মানুষ মরা ভূতদের মত পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপসে মরা চামচিকের মত হয়ে যায় না।

আমি তখনও শুনেছিলাম—কুনি কাঁদতে কাঁদতে ঝড়ের মধ্যে চলেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল! না ফেলে পারলাম না।

ঝড় থামল কিন্তু সমস্ত অঞ্চলটা অন্ধকার। ইলেকট্রিক লাইন হয়েছে। বড় বড় গ্রামে ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক জ্বলে। স্টেশনে ইলেকট্রিক জ্বলে। সব অন্ধকার। কেবল টর্চ মধ্যে মধ্যে জ্বলছে এবং নিভছে। তাতে যেন অন্ধকার আরও ঘন হচ্ছে। এরই মধ্যে মানুষ আটকে আছে স্টেশনে। রেললাইনে গাছ উলটে পড়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ। বাস নেই। রাস্তার উপর গাছ পড়েছে। দোকানে খাবার নেই। অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে টর্চের ইশারা আর হাঁক।—

ও—হে— !

ও—।

এরই মধ্যে একটা আশ্রয় পেয়েছিলাম। ছোট লাইনের মাস্টার একটি ঘরে একটি বিছানা-পাতা খাটে আশ্রয় দিয়ে বলেছিলেন—কি করবেন। উপায় তো নেই—এই খানে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিন।

সামান্য খাদ্যও মিলেছিল। ক্লান্ত হয়েই ছিলাম—শুয়ে পড়ে ঘুমিয়েই গিয়েছিলাম। আলো ছিল না পাখা ছিল না। না থাক, মেঘ কেটে চাঁদ উঠেছে—ঝড় থেমেছে—একটু একটু শীত ধরা-ধরা হাওয়া দিচ্ছে; রাত্রি গভীর বলে মনে হল। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়েছিলেন মাস্টার, সেটা নিভে গিয়েছে। একটা খোলা জানালা দিয়ে দুধের মত সাদা জ্যোৎস্না এসে মেঝের উপর স্থির হয়ে পড়ে আছে। শান্ত পৃথিবী! এই ঘণ্টা কয় আগে যে এত বড় প্রলয়ের মত ঝড় হয়ে গেছে সে কথা কে বলবে। আমদপুর স্টেশনের সাইডিং লাইনে কোন একটা এঞ্জিনের স্টীমের একটানা সোঁ সোঁ শব্দ বেজে চলেছিল। তার সঙ্গে আরও কিছু। অর্থাৎ আরও শব্দ ছিল। এঞ্জিনের হুইসিল দিয়ে স্টীম বের হচ্ছে বোধ হয় যার জন্য একটা টানা কোঁ বা পোঁ শব্দ মিলে রয়েছে। এবং আরও শব্দ রয়েছে।

হ্যাঁ। তার সঙ্গে আরও কিছু আছে। কানটাকে যথাসাধ্য খাড়া করলাম—অর্থাৎ সজাগ বা সতর্ক। বুঝতে পারছি না। একটা পেঁচা ডেকে গেল। দুটো কুকুর যেন কাঁদছে। অনেক দুরে যেন অনেক লোকের সাড়া।

হ্যাঁ। অনেক লোকের সাড়া। এই অনেক কিছুটা যেন অনেক লোকের সাড়া। যেন অনেক দূরে অনেক লোকে একসঙ্গে হয় তো বা জটলা করছে নয়তো গানটান করছে। যেমন ধর্মরাজ পূজোয় কি গাজনে ভক্তেরা মিলে বোলান গান করে। মনে পড়ল ছেলেবেলায় মনসার ভাসান গান শুনতাম—তাতে বেহুলা কলার মান্দাসে লখিন্দরের দেহ নিয়ে নদীতে ভেসে যেতো; তাই বর্ণনা করে পাঁচ ছজন গায়কে গান গাইতো—

"জলে ভেসে যায় রে—সো-নার কমলা—।"

আর দলসুদ্ধ সুরের ধুয়ো গেয়ে উঠত—"অ—গ—অ।"

কন্নার মাঞ্জাসখানি নদীসে উচ্ছলা

মাঞ্জাস উলটি দিতে হাসে খলখলা—

—অ—গ—অ। জলে ভেসে যায় রে—এঃ।

এতে একটা হ্যাঁক দিয়ে খপ করে থেমে যেতো।

পাশের বিছানায় ভাই-পো বাসু ঘুমুচ্ছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নাক ডাকাচ্ছে। জলঝড় এবং সর্বনাশের মাতন থেমে গিয়ে এখন জমিয়ে ঘুম দেবার (বাসুরা বলে—'পিটোবার') বাত অর্থাৎ আবহাওয়া হয়েছে। আমিও চোখ বুজতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। জানালা দিয়ে ওই অনেক দূরের বোলান গানের মত বহু লোকের সমবেত কণ্ঠের একটা কিছু আমাকেই ডাকছে বলে মনে হল। ওরা ডাকুক বা না-ডাকুক আমার মনে হল আমাকেই ডাকছে বা এ-ডাক কিসের সেটা জানা উচিত। অবশ্য অবশ্য উচিত।

আস্তে আস্তে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। জানালার বাইরে পৃথিবীকে আশ্চর্য সুন্দর বলে মনে হল। ধবধবে জ্যোৎস্নায় ভিজে ভিজে বৈশাখ মাসের ফসলহীন মাঠটিকে আশ্চর্য সুন্দর নরম মনে হচ্ছে—ঠিক যেন সদ্য স্নান করা, থান কাপড় পরা, পূজাবাড়িতে গিন্নীবান্নীর মত লাগছে। মাথার উপরে আবহমণ্ডলের বায়ুস্তর, তার উপরে আকাশ একেবারে ধোয়া মোছা হয়ে তকতক করছে। নীল নির্মল আকাশে আধখানা চাঁদ ঝলমল করছে।

দেখা যাচ্ছে একেবারে সেই দূরদিগন্ত পর্যন্ত। দক্ষিণ দিকে পশ্চিম দিকে আদমপুরের বসতি; আজকাল অনেক বড় বড় হাল ফ্যাসানের পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে। সেগুলো জ্যোৎস্নার মধ্যে নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওই দিক থেকেই আসছে সাইডিং লাইনে এঞ্জিনটার স্টীম এবং চাপা হুইসিলের শব্দ। কিন্তু ওই অনেক মানুষের সাড়ার মত শব্দটা তো এদিক থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে না। উত্তর এবং পূর্ব দিক একেবারে খোলা মাঠ। উত্তর দিকটায় অনেক দূরে গ্রাম। পূবে খানিকটা খোলা প্রান্তরের পর 'আগয়া' নদীর ধারে জঙ্গল এবং রেলের ব্রিজ। ওদিকে তো জনমানবের সঙ্গে এই রাতে একসঙ্গে এত মানুষের সাড়া আসার কথা নয়।

এককালে ডাকাতেরা জমায়েত হত আগয়ার ধারের জঙ্গলে। তারও আগে লোকে বলে আগয়ার বটতলায় নাকি ধর্মরাজের সভা বসত।

বটগাছটার নাকি পাঁচশো বছর বয়স। কেউ কেউ বলে তারও বেশি। আবার অনেকে বলে—নানা—শ খানেক—মানে একশো বছরের হবে!

তা—যত শো বছরেরই হোক। বটগাছটা বিরাট। মূল কাণ্ডটা তো আর নাই-ই। কোনো কালে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে—এখন গাছটার কাণ্ড যেটা সেটা নামাল। ছেলেবেলা দেখেছি দিনে দুপুরবেলাতেও অন্ধকার থমথম করত গাছতলায়। এবং লোকে বলত—গাছতলায় বড় বড় সাপ আছে, পোকামাকড়ের তো অন্ত নেই। সারাটা গাছের ডালপালা ধরে ঝুলত—শ-দুশো বাদুড়। সন্ধ্যে হলেই তারা আকাশে উড়ত। আর গাছের ডালে ডালে নৃত্য শুরু হত তাঁদের। মানে ভূতদের। আমি জানি না এঁরা কোন্ ভূত? অর্থাৎ ভেজালহীন আসল মানে খাঁটি জাত ভূত? না—মানুষ মরা ভূত? কেউ কেউ বলত ওই বাদুড়গুলোই ভূত। ভূতটুত নাচে না রাত্রে বাদুড়গুলো ওড়ে চেঁচায় আর খেয়োখেয়োই করে।

আবার এই গাছটাই ছিল অরণ্য ষষ্ঠির ষষ্ঠিবুড়ীর আস্তানা। জ্যষ্ঠি মাসে দুচারখানা গ্রামের মেয়েরা গয়না কাপড় পড়ে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ষষ্ঠী বুড়ীর পুজো দিয়ে যেতো গাছটার গুঁড়িতে হলুদ সিঁদুর লেপে দিয়ে তালশাঁস আম কাকুড় খেজুর জাম ছোলা ভিজে ও মিষ্টির ভোগ দিয়ে গাছকে গামছা পরিয়ে বাড়ি ফিরে যেত। গাছটা এখন মর মর হয়ে এসেছে। সেখান বা ওদিক থেকে এ আওয়াজ কি করে আসবে!

হঠাৎ জানালার বাইরে মাঠের উপর যেন অকস্মাৎ একটি লোককে দেখা গেল। একটি মেয়ে লোক। বেশ একটি মিষ্টি চেহারার মা, চোখে কাজল গৌরবর্ণ রঙের উপরেও হলুদ হলুদ আভা—হাতে শাঁখা—বেশ ঝলমলে করে কাপড়-পরা চমৎকার মেয়ে। তার পিছনে মুহূর্তে যেন আর একজন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটির ন্যাড়ামাথা গলায় গুলঞ্চ ফুলের মালা—পরনে থান কাপড়, চেহারাটা ভালো নয় কিন্তু খারাপ লোক বলে মনে হল না।

আমাকে ইশারা করে ডাকলে। হাত নেড়ে নেড়ে ইশারা। আমি তাদের দিকে তাকিয়েই ছিলাম—হঠাৎ যেন অনেকটা অভিভূত হয়ে গেলাম। ভালো করছি কি মন্দ করছি—এবিচারে কথা যেন ভুলে গেলাম। এবং একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে—দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম সেই অনেক লোকের কলরব যেন মুহূর্তে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে এই কলরব—এ গাইয়ে হোক আর মন্ত্রপাঠই হোক আর কোন বিচিত্র আলোচনা বাসরই হোক—এটা ওই পুবদিক থেকেই আসছে। অর্থাৎ আগয়ার জঙ্গলের দিক থেকে।

সেই দিকে তাকালাম। ওদিকে মেয়েটি এবং লোকটি এগিয়ে এসে বললে—নমস্কার।

আমিও প্রতিনমস্কার করলাম।

লোকটি বললে—আসুন।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বললে—আমাদের সঙ্গে। বলে তারা চলতে লাগল। আশ্চর্য আমিও চলতে লাগলাম। চলছিই চলছিই। হঠাৎ মেয়েটি বললে—কোন ভয় নেই আপনার।

লোকটি বললে—খুবই দুঃখিত আমরা—এই এত রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিলাম।

মেয়েটি বললে—কি করব বলুন! দুর্ঘটনার উপর তো হাত নেই।

লোকটি বললে—আপনি খুব ভাগ্যবান! বুঝেছেন! তা নইলে—

মেয়েটি ধমক দিয়ে বলল—চুপ কর! কোন বুদ্ধি নেই তোমার!

লোকটি বললে—কেন?

—কেন? ভয় পেয়ে যান যদি?

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ভয় পাব কেন?

—ভয় তো পায় লোকে। অনেক কারণে পায়।

এবার আমার চমক ভাঙল। মনে পড়ে গেল গয়েশ্বরী দেবীর এজেন্টের কথা। সেই নায়েব গোমস্তা জাতীয় জীবটি যে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসত। এঁরা আবার তাদেরই কেউ না কি? আমার উপরে এঁদের নেকনজরের কথা তো জানি। বলেছি ভূত ঝুট হ্যায়। ভয়ের মধ্যে ভূতের বাসা ভাই—নইলে ভূতের কোনো পাত্তা নাই! তা, এরা দুজনেও তাই নাকি?

মনে পড়ে গেল দশরথ রাজার বড় ছেলের নাম। মনে মনে বললাম—রামরামরাম জয় রাম জয় রাম। ভুত আমার পুত—পেত্নী আমার ঝি—রাম লক্ষ্মণ বুকে আমার করবে ওরা কি?

আমি মনে মনে বললাম, ওরা কিন্তু দুজনেই খিলখিল করে হেসে উঠল। মেয়েটি হাসলে খিলখিল শব্দে, লোকটার হাসি খ্যা-খ্যা বা খ্যাক্ খ্যাক্ করে। আমি চমকালাম এবং প্রায় নিশ্চিত করে বুঝলাম যে, এঁরা মানুষ-মরা-তাঁরা নন। এঁরা হলেন জাত তাঁরা। নন্দী মহারাজার সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো বউ এবং কাকার শালার মামার মেসোর পিসের জাত ভাই। ভয় এসে গেল—বাতাস দিলে পাতা যেমন দোলে ঠিক তেমনি ভাবে ওদের হাসির হাওয়ায় আমার মনের পাতা ভয়ের দোলায় দুলল একটু। তবু আমি সাহস সঞ্চয় করে বলতে গেলাম—হাসছ কেন তোমরা এমন করে?

আমি কিছু বলবাব আগেই লোকটি বললে—জয় রাম সীতা রামকালী বাবু! বামজীর দোহাই আপনার কোন ভয় নাই! আমবা ওতে ভয পাই না। আমি বলতে গেলাম তবে আপনারা সেই আদি ও অকৃত্রিম—

মেয়েটি তার আগেই বললে—উঁ-হু, উঁ হু উঁহু! আমরা তাও নই। আমবা ভূত মানে অপদেবতাই নই রামকালী বাবু। আমরা হলাম—

লোকটি বললে—উপদেবতা—

মেয়েটি বললে—এক নম্ববেব মুখ্যু তুমি। অপতে উপতে তফাৎটা কি? যা অপ তাই উপ। লালমুখো বাঁদর আব মুখপোড়া হনুমান —এই তো।

লোকটি বললে—তা হলে?

মেয়েটি বললে—আমরা হলাম শিডিউলড্ দেবতা।

এবার আমার বিস্ময়। এ বকম কথা কখনও শুনি নি। শিডিউল্ড কাস্ট আছে—কিন্তু দেবতাব বেলায় এরকম তো শুনি নি।

মেয়েটি বলল—হ্যাঁ, তফশিলী দেবতা বলতে পারেন। ও তফশিলী—আমি ট্রাইবাল—মানে "আদিবাসী"র মত আদিবাসী দেবতা।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম তার দিকে। সে বললে—ও হল ধর্মরাজের দেবাংশী দেবতা আব আমি হলাম মা ষষ্ঠীর সখী দেবতা। আমবা ভূত নই। আমাদেব পুজো হয।

হ্যাঁ—তা হয়। মনে মনে স্বীকার করতে হল তা হয়। বারো মাসে তের ষষ্ঠী তেলে হলুদে ডগমগ চেহারা, চোখে কাজল, হাতে ঝিনুক, পরেন ঢেলা পাড় শাড়ি,—মা ষষ্ঠী মাসে মাসে আসেন; কখনও অরণ্যে, কখনও পুকুর নদীর ঘাটে নামেন। পরের সাত পুত কোলে করে নিজের সাত পুত পিঠে করে মা ষষ্ঠী সন্তানবতী মায়েদের আর ছোট খোকাখুকীদের দেবতা। মেয়েরা উলু দেয়, ব্রত কথা শোনে ছেলেবা প্রসাদ পায। আর ধর্মরাজও আসেন বৈশাখ মাসে পূর্ণিমায়। ড্যাং ড্যাং ড্যাড্যা ড্যাং; ড্যাডা, ড্যাডা, ড্যাডা ড্যাং—শব্দে ঢাক বাজে—ভক্তেবা নাচে। জয়ো ধর্ম্ম রজ্জো হে! গুলঞ্চ ফুলের মালা গলায় পরে। পণ্ডিতেরা বলে ধর্মরাজ আসলে হলেন—'অমিতাভবুদ্ধ'! অহিংসার প্রেমের অমৃত তাপস—সাক্ষাৎ দশ অবতারের অন্য অবতার। কিন্তু আশ্চর্যভাবে আমাদের দেশে বটগাছ তলায় কি অশথগাছ তলায় পাথর হয়ে বসে আছেন। অহিংসার তপস্বী পাথর হয়ে বামুন দেবাংশীদের পাল্লায় পড়ে পাঁঠা খাচ্ছেন। বাতের তেল হাঁপানীর কবচ চোখের অসুখের 'আজন' দিচ্ছেন! কথাগুলো তো মিথ্যে নয়। তাঁদের প্রতাপ খুব। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী থেকে কম নয়। অবিশ্যি এ-কালে সরস্বতী ঠাকরুনের নাম একসঙ্গে কারুর সঙ্গেই করা যায় না, তবে গ্রীষ্মের রাত্রে অচেনা

অজানা জায়গায় অন্ততঃ পাড়াগাঁয়ে শুয়ে কি রাত্রে মাঠের পথে যাবার সময় মা মনসাকে হেলা করা যায় না। এ সবই সত্যি কথা কিন্তু এই ধর্মরাজের দেবাংশী আর মা ষষ্ঠীর জয়া বিজয়ার কেউ একজনা অকস্মাৎ জোট বেঁধে এই নিশুতি রাতের আমার কাছে কেন রে বাপু? উনি তফশিলী দেবতা—ইনি ট্রাইবাল আদিবাসি দেবী—দুজনে খাঁচার পাখি আর বনের পাখির মত কি মনে করে মিলেছেন? আর এত মানুষ থাকতে আমার কাছেই বা কেন?

মনে করামাত্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম, সেই শিডিউল্ড দেবতা অর্থাৎ ধর্মরাজ ঠাকুরের দেবাংশী বেশ একটু বিরক্তির সুরে বললে—আসেন না ক্যান মশায়--ঠিক ঠাঁইয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন। চোখে দেখবেন কানে শুনবেন!

মা ষষ্ঠীর জয়া বা বিজয়া।

আমার ভাবনা শেষ হতে না-হতে মেয়েটি হেসে বললে—আমি হলাম ষষ্ঠী বুড়ীর মেয়ে, মানে বুড়ীকে হাত ধরে ধরে নিয়ে বেড়াই। তারপর মেয়েটি বললে—নোটন দেবাংশীর কথায় কিছু মনে করবেন না। বয়স হয়েছে তা ছাড়া মানুষটাই একটু গোঁয়ারগোবিন্দ। আজকের তো কথাই নাই। অক্ষয় বট উপাধ্যায় মশায় মারা যাচ্ছেন আমরা নিরাশ্রয় হচ্ছি—এখন কোথায় যাব? কি হবে? কি করব আমাদের আর ভাবনার শেষ নেই।

আমি বললাম—অক্ষয় বট উপাধ্যায়?

—হ্যাঁ। তাঁকে আপনি তো জানেন। কত বার তার পাশ দিয়ে গিয়েছেন—তার কাছে বসেছেন—তাকে নিয়ে কত ভাবনা ভেবেছেন। আগয়া নদীর ধারে, সেই আদিকালের বুড়ো বটগাছ, যে দেহ পালটে পালটে—কাণ্ড মরে গেলে ঝুড়ি নামিয়ে তাকেই কাণ্ড করে বেঁচেছিল এক সময় হয়েছিল সাত-বক্ষ মহাবট, রাবণ হয়েছিল দশমুণ্ড রাবণ আর আমাদের সাত সাতটা ঝুড়ি কাণ্ডের সাত ছাতি নিয়ে হয়েছিল মহাবট-অক্ষয়বট। এ কালে তাঁর হয়েছিল একটি কাণ্ড, বাকিগুলো সব-থ্রম্‌বসিস্ হয়ে প্যারালিসিস্ হয়ে শুকিয়ে গেছে। আজ এই প্রলয় ঝড়ে সেই শেষ দেহটিও সমূলে উৎপাটিত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছেন।

নোটন দেবাংশী বললে—ভালোমন্দ অনেক খেয়েছে, সেই বসুমতীর বুকের মধ্যে মধ্যে শেকড় চালিয়েছে। পাথর ফাটানো শেকড়। তার ওপর বড় ঘরের ছাওয়াল তো সজনে নাজনে শ্যাওড়া ফ্যাওড়া তো নয়—বট! শেকড় গাড়লে তো বাস—মানুষের কুড়ুল না ঠেকলে চক্ষু বুজে একশো দেড়শো বছর। বুঝেছ। তপিস্যেও তো আছে, মহাবিরিঞ্চির মহাপেরান, ঠিক জানতে পেরেছ তুমি মশায় আমদপুরে এই গাট সাহেবদের—কি রুম কি রুম গো—?

মেয়েটি একটু হেসে বললে—নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে ভূত তুমি। এইকালে মানুষগুলো চন্দ্রালোকে যাচ্ছে—আর তুমি 'রানিং রুম' কথাটা মনে রাখতে পার না?

—উঁহু, এত সব মনে থাকে না আমার। আমি বাবার পেসাদী মদ পাঁট ভাঙ-টাঙ খাই আর ধরম বাবার সেই ঘোড়াটা যেটার ডান পাটা লটরপটর, বাঁ পা খান খোঁড়া, ধরম বাবার ঘোড়াটা চড়িয়ে আনি আর বাস।

মেয়েটি বললে—তা নইলে তোমার এমন দুঃখের দশা কেন হবে বল! মানুষ দেবাংশীরা দিব্যি ধরমবাবার আশীর্বাদী দিয়ে প্যাফোলা গোদের ওষুধ বেচে টাকার কাঁড়ি করলে—দালান-কোঠা বানালে, আর তুমি—। মাগো চেহারা দেখলেই মনে হবে উপদেবতা না হয় অপদেবতা? হয় ট্রাইবাল নয় অচ্ছুত মানে শিডিউল! বলুন আপনি বলুন!

শেষ কথাগুলি বললে আমাকে।

আমি বললাম—আমি কি বলব বলুন, আমি কিছু বুঝতেই পাচ্ছি না।

—আচ্ছা তাহলে শুনুন। ব্যাপারটা স্পষ্ট করে দিই। মেয়েটি মাথার উপর টানা আধ ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে বললে—ওই যে অক্ষয় বট উপাধ্যায়—

* * * *

আজকের যে প্রলয়ংকর ঝড়টা গেল—যে ঝড়ে আজ তিনটে গাছ উপড়ে পড়েছে রেললাইনের উপর এবং দার্জিলিং মেল—দানাপুর এক্সপ্রেস রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার বারাউনি প্যাসেঞ্জার আটকে পড়েছে, গোটা এলাকাটার ইলেকট্রিক লাইন ছিঁড়ে বিলকুল অন্ধকার করে দিয়েছে, হাজার কতক ঘরের চাল উড়েছে, মানুষ মরেছে জখম হয়েছে—সেই ঝড়ে ওই অক্ষয় বট উপাধ্যায় সশব্দে উৎপাটিত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছেন।

ধরাশায়ী হয়েও একেবারে মরে কাট হয়ে যান নি। এখনও পাতা সবুজ আছে শিকড়গুলা ছিঁড়ে গিয়েও সতেজ আছে, তার হাড়গোড় ডালপালা অনেক ভেঙেছে। একেবারে শিকড়গুলো আকাশের দিকে তুলে মাঠের উপর মাথা অর্থাৎ শীর্ষদেশের ডালপালা গুঁজড়ে পড়েছেন।

—সে ভীষণ শব্দ হয়েছিল। শুনতে পান নি?

বলালাম—না।

—আমাদিগে ঝড়ের ঠিক আগে বলেছিলেন—তোমরা খুব সাবধান। তা সাবধান হয়ে হবে কি—একেবারে ডিগবাজি খেয়ে চিৎপটাং। বুড়ো বয়সে এই মরবার আগে আস্পর্দ্ধার কাণ্ড দেখ তো। তার ফল লাও হাতে হাতে।

মেয়েটি বললে—তুমি থাম। আমি বলি।

"ঝড়ে উপড়ে পড়ে উনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। উনি অজ্ঞান হযেছিলেন, তার সঙ্গে ভীষণ হতাহতের ঘটনা বিপর্যয়ের কাণ্ড। গাছে প্রায় পোকামাকড় ছিল আট দশ হাজার, সাপ ছিল গোটা বারো, বিছে ছিল সাতাশিটা আর মানুষ মরা ভূত ছিল পাঁচ জন! এক জন গলায়-দড়ে তিনি এই গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়েছিলেন। একজন ঠ্যাঙাড়ের হাতে মরা রাহী, গলা কাটা ভূত। একজন ঠ্যাঙাড়ে ভূত —সে ঠেঙিয়ে মানুষ মারত। একজন হল রাজনৈতিক নেতা ভূত, তিনি পাশের গাঁয়ে বক্তৃতা দিতে এসে হার্ট ফেল করে মরেছিলেন আর একজন গেছে পেতনী সে বেঁচে থাকতে রাত্রে এসে গাছের ডালে চড়ে, ডাল দুলিয়ে লোককে ভয় দেখাতো, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে, ঘাড় ভেঙে মারা যায়। এ ছাড়া ছিল অসংখ্য বাদুড়। সে গুলোও হল ওই ষষ্ঠী বুড়ির ষষ্ঠীর ছা, যারা ষষ্ঠীর প্রসাদে মায়ের কোলে জন্মে ছেলে বয়সেই মরে ভূত হয়ে ফিরে এসেছে ষষ্ঠীর কাছে। ওই ডালে ডালে শুকনো হাড় ঝিরঝিরে ছেলের মত চেঁচাচ্ছে আর নীচু মুখ করে গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলছে। মনে হচ্ছে ওরা বাদুড় কিন্তু বাদুড় ওরা নয়। বাদুড়ের চেয়েও বেশি আছে চামচিকে। বটগাছের গায়ে মরা ডালে গর্তে গর্তে অসংখ্য চামচিকে। ওরাও তাই। ওরা হল পঞ্চতন্ত্রের সেই অনাগত বিধাতারা। অর্থাৎ যারা পরে জন্মাবেন। মা ষষ্ঠীকে তো এরপর মুঠো মুঠো ছানা দান করতে হবে।

মেয়েটি বললে—এরা সব মরে একাকার হয়ে গিয়েছে। বেঁচেছি দেবতা—সে ট্রাইবালই হই আর শিডিউলড্ হই—যাই হই দেবতা বলেই আমরা বেঁচেছি।

এখন ওঁর জ্ঞান হতেই উনি বললেন—কে বেঁচে আছ?

আমরা দুজন গেলাম বললাম—আমরা আছি।

উনি বললেন—হ্যাঁ। তোমাদের থাকবার কথা বটে। তা দেখ আমার শেষ কাল উপস্থিত। আমি মরব। এখন আমার শেষ ইচ্ছা তোমরা পূরণ কর দেখি অনেক পুণ্য হবে তোমাদের।

আমরা বললাম—কি বলুন।

উনি বললেন—আমদপুর ছোট লাইনে গার্ডদের রানিং রুমে রামকালী শর্মা নামক একজন ব্যক্তি আছেন। তিনি আজ ওখানে এই ঝড়ের জন্যই আটকে গেছেন! তাঁকে ডেকে আন। শেষ কথা তাঁকে আমি বলে যেতে চাই। গতবার এই ছোট লাইনেরই ও প্রান্তে ঘাট ভুবনপুরে গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর বাপের শ্রাদ্ধের দিনে গয়েশ্বরীর লোকেরা ট্রেনে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদের কথা লিখেছেন। গয়েশ্বরীদের কাল যেতে বসেছে। লোকে তাদের উড়িয়ে দিচ্ছে। উড়েও তারা যাবে। ফুৎকারে যেমন শিমুল ফল ফাটার ছোট ছোট টুকরো উড়ে যায়—তেমনি ভাবেই উড়ে যাবে। তবু তারা ওই লেখায় থাকবে। সুতরাং তাকে ডেকে নিয়ে এস—তোমাদের কথা এবং আমার কথাও আমি তাঁকে বলে যেতে চাই।

মেয়েটি বললে—তিনি আপনার পথ চেয়ে রয়েছেন। তাঁর কথাতেই আমরা. আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

বললাম—আর কত দূর যেতে হবে?

নোটন বললে—তা দূর একটু আছে গো। এক কাজ কর না!

বললাম—কি?

চোখ বন্ধ কর; তারপর মনে করো তুমি যেন ঘুমিয়ে গেছ।

—সে কি—আমাকে তুলে নিয়ে যাবে না কি?

দেখ না। এই ফুস মন্তরের চোটে কি হয় দেখ না। মনসার কথায় শোননি—তুলোর চেয়ে হালকা হাওয়া বাঁটুলের মত গুড়িয়ে-সুড়িয়ে গোল হওয়া—আর সাপেদের ফণার ভর করা? তেমনি করে ভর কর; বুঝলে?

বুঝতে না বুঝতে পা দুটো যেন মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠল। আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—সোঁ—।

* * * *

সোঁ—সোঁ—সোঁ—সোঁ।

বেশি না। গোটাচারেক বার। তারপরই মাটিতে পা ঠেকল।

লোকটি ঘাড় থেকে নামালে আমাকে; আমার হাত ধরে মেয়েটি বললে আমরা এসে গিয়েছি। চোখ খোল।

চোখ খুলে অবাক হয়ে গেলাম। এই কি আগয়ার জঙ্গল নাকি? কোথায় জঙ্গল কোথায় উপড়ে পড়া বৃহৎ বট? এ যে ভেঙে পড়া এক ভাঙা ঠাকুরবাড়ি। বিরাট এক প্রাচীন ঠাকুরবাড়ি ধ্বংসস্তূপ। পাশেই এক কানায় কানায় ভরা নদী। বাঁধানো ঘাট। নাটমন্দিরে আশ্চর্য এক বুড়ো মাথা ফাটিয়ে ফাটিয়ে হাত ভেঙে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার কাছে হলুদ রঙের কাপড় পরা আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ি—তার গায়ের রঙ সোনার রঙ সোনার বর্ণ; পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি; হাতে শাঁখা, ব'সে তালপাতার তৈরি পাখা নিয়ে হাওয়া দিচ্ছে আর মিটমিট করে তাকাচ্ছে। আর বুকের কাছে বসে ন্যাড়ামাথা গেরুয়াপরা এক বৃদ্ধ। এদের

চিনতে দেরি হল না; একজন ষষ্ঠী ঠাকরুন, অন্যজন ধর্মরাজ। এরা ছাড়া সে প্রায় শতখানেক কি তারও বেশি মানুষ; সে কাচ্চা বাচ্চা বুড়ো জোয়ান নানান বয়সের নানান জাতের মানুষ ঘিরে বসে আছে আর কাঁদছে। দৃষ্টি আরও পরিষ্কার হতেই দেখি—আজকের ঝড়েই এই পুরনো মন্দিরটা ভেঙে চাপা পড়ে কত মানুষ যে মরেছে সে আর গুণে শেষ করা যায় না। ওরে বাপরে। চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

সেই আশ্চর্য বিশালকায় আহত এবং রক্তাক্ত দেহ বৃদ্ধ আমাকে দেখে বললেন—আসুন। কোন ভয় করবেন না। আমি গয়েশ্বরী নই। আমি অক্ষয় বট। আমি ধীর আমি স্থির আমি মহাবলী অথচ মহাশান্ত। আমার ধর্ম ছায়া বিতরণ আশ্রয় দান। আজ আমার শেষ দিন শেষ ক্ষণ।

সে বৃদ্ধের সে কণ্ঠস্বর অতি আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর। গম্ভীর অথচ মিষ্ট, স্পষ্ট এবং ধীর। আজ এই শোকাবহ ঘটনার জন্য আমিই খানিকটা দায়ী। সে সব কথাই আপনাকে বলে যাবার সময় ও সুযোগ পেয়ে এই শোচনীয় ভাবে অপঘাত মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

—"আপনার কাছে আমি হার স্বীকার করে যাচ্ছি। আমরা পরাজিত।"

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। কি বলছে? কিসের পরাজয়?

বৃদ্ধ বললে—মৃত্যুর জন্য দুঃখ নাই। জন্মিলে মরিতে হবে। অমর কে কোথা কবে? তবে বেঁচেছি তো কম দিন নয় অনেক দিন।

এই অনেক দিন ধরেই তোমাদের আমরা ছায়া দান করি ফল দান করি—তোমরা আমাদের দেবতা বলে পূজা কর। দেবতারা আমাদের আশ্রয় নেয়—ভূত প্রেত পেত্নী ঐ সবের কথা বলেই কাজ নেই; মরার পর তাদের গ্রামশহরই হল গাছের ডালপালা।

হঠাৎ একটু থেমে থেকে যেন কথাবার্তার সুর পালটে দিয়ে হাল্‌কা-পলকা ভাবে বললে—সোজা করে বলি শোন।

আমি আগয়ার ধারের বুড়ো বট।

আমি যখন জন্মাই তখন কালটা বোধ হয় মুসলমান আমল। এই যে আগয়া নদী এবং এর আশপাশ সব ছিল খুব নির্জন। দেশের লোকসংখ্যা ছিল কম। এখানে ওখানে ছোটখাটো দু দশখানা ঘরওয়ালা দু একটা গ্রাম ছিল। এই যে পাকা রাস্তাটা এটার চিহ্নই ছিল না। তবে পায়ে-হাঁটা পথ ছিল। এই জঙ্গলে নদীর ধারে ছিল বুনো-শূয়োর আর ভিতরে ছিল খরগোশ, শজারু, দু একটা বাঘ কখনও সখনও আসত। সাপ ছিল বিস্তর আর পাখি ছিল অনেক। গাছের মধ্যে গাছ বেশির ভাগই ছিল অর্জুন। প্রতি বর্ষায় হাজার হাজার চারা হত। এরই মধ্যে জন্মালাম আমি।

এখানে আগয়া নদীর ধারে কতকগুলো কালো মোটা মোটা পাথর ছিল মাটির সঙ্গে। মাটির গড়নই এমনই। এখানে ওখানে পাথর আছে দেখছ তো; ঠিক তেমনি। সেই পাথরের উপর একটা পাখি একধারে আমার পিতামাতা—বটবীজটিকে খেয়ে এখানে বসে বিষ্ঠা ত্যাগ করেছিল—সেই বীজকণা থেকে আমি জন্মে আস্তে-আস্তে ওই অর্জুন গাছের জঙ্গলের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলাম। তখন আমি প্রায় তিন চার হাত লম্বা হয়েছি; চারপাশে তখন তিনটি শাখা মেলেছি।

এই সময় একদিন কাঁদতে কাঁদতে এল একটি অল্পবয়সী মেয়ে। তার ছেলে হয়ে মারা

গেছে; ছেলের শোকে কাঁদবার জন্য এসেছে এই নির্জনে। এসে পাথর দেখে বসল এই পাথরে একেবারে আমার গোড়ায় এবং কাঁদতে লাগল। ভরতি দুপুর বেলা, গরমের সময়, আমি তখন ছোট গাছ—আমার একটুখানি ছায়া তখন; সেই ছায়াতেই কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে গেল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে যে, যে বটগাছটির ('মানে আমার'—বুড়ো বটের আত্মা বললে) ছায়ায় শুয়ে আছে তার কচি ডালগুলোর ডগায় ডগায় যে 'থোকা থোকা' বট ফল ধরে আছে সেগুলো আসলে বট ফল নয়—ওগুলো সব হল ছেলেপুলে।

হাওয়া লেগে ডাল দুলছে—সঙ্গে সঙ্গে ছেলেপুলেগুলোও দুলছে; তা দেখে ওই মা-টির মনে হল—যেন ছেলেগুলোকে নিয়ে দোলা দিচ্ছি আমি (মানে বটগাছ)।

ঘুমের ঘোরেই মেয়েটি ফোঁপাতে লাগল।

আমি—;—

সেই আহত রক্তাক্ত দেহ বুড়ো, সেই বট গাছের আত্মা বললে—বুঝছ, আমি—তখন সেই কালের সেই আমি তাকে বললাম—দেখ, তুমি এক কাজ কর, কাল এখানে আমার গোড়ায় আবার এসো। স্নান করে পুজো সাজিয়ে এসো। এসে—তুমি যে দেবতা বা দেবী ছেলেপুলের দেবী তাকে পূজো করে যেয়ো। বুঝেছ? আমি সেই ঠাকুরকে ডেকে রাখব। মেয়েটি বললে—বেশ। বুঝেছ— সে কালে সহজেই এ সব কথা বিশ্বাস করত। আলো দেয় সূয্যি ঠাকুর, জ্যোৎস্না দেয় চন্দ্র ঠাকুর, জল দেয় ইন্দ্র রাজা, আগুন দেয় অগ্নি দেব, ধান দেন লক্ষ্মীমা, বিদ্যে দেন সরস্বতীমা, তখন ছেলেমেয়েও নিশ্চয় কোনো না কোনো দেবতাই দেন। আমি মনে মনে তাকে ডাকতে লাগলাম।—আহা মেয়েটির বড় দুঃখু। ছেলেমেয়ে দেবার ঠাকুর বা ঠাকরুন তুমি বাপু দয়া করে এস। মেয়েটি কাল পূজা আনবে; তুমি পূজো নিয়ে ওকে দয়া করে একটি ছেলে দিয়ো।

পরের দিন মেয়েটি এল—গরমের সময়—গাছে গাছে খেজুর পেকেছে জাম পেকেছে আম পেকেছে, ফুটি পেকেছে মাঠে, চাষের ছোলা কলাই ভিজিয়ে নিয়ে—পূজোর থালা সাজিয়ে নিয়ে এল। তার সঙ্গে কাপড় গামছা দিলে। হলুদ বাটা সিঁদুর আনলে। এনে আমার গোড়ায় ঢেলে দিয়ে বললে—এই আমার পূজো নাও, তোমার অনেক ছেলে—অনেক ফল ধরেছে তোমার—আমাকে একটি ছেলে দাও।

আমি বললাম—হে দেবতা দয়া কর।

স্বর্গ থেকে এক বুড়ী এল, হলুদ মেখে, কাজল পরে সেই বলে যে 'হলুদ ঘুটুঘুটু—কাজলে ভুটুটু সিঁদুরে সুটুসুটু'—(এর মানে কি তা বুঝলাম না আমি, কিন্তু বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল না।) ঠিক তাই। বুড়ী বললে আমি এসেছি। আমি হলাম স্বর্গের দেবতার দাঈ। আমি ছেলেপিলের দেবতা। স্বর্গের ইন্দ্ররাজার ছেলে জয়ন্তের আঁতুড়ে আমি ছিলাম। মা দুর্গার গড়া পুতুল যখন জ্যান্ত হয়ে কেঁদে উঠল—তখনও আমাকে ডেকেছিল। গণেশকে তুলে আমিই দুর্গামায়ের কোলে দিয়েছিলাম। আমার নাম 'ষষ্ঠী ঠাকরুন'। আমি পৃথিবীতে বারোমাসে তের বার আসি—কখনও আসি অরণ্যে কখনও পুকুর নদীর ঘাটে—কখনও কিছুতে কখনও মিছুতে। তা, এই জষ্টি মাসে তোমার এই গাছতলায় এসে পূজো নিয়ে যাব। আর মেয়েটির ছেলে হবে।

এই বলে সে চলে গেল। আর তারপর আমি যত বড় হলাম তত ডালপালা মেললাম, ছায়া

বড় হল; নানান পশুপক্ষী এসে আশ্রয় নিল। আর এল এক বামুন। সে হল মেয়েদের পুরুত। সে পুজো নিবেদন করতে আসত। সে পূজো করত আর ষষ্ঠী মায়ের মহিমা প্রচার করত। লোকে পূজো যা দিত সেই নিত। আমার গোড়া সে পরিষ্কার করত। আমার ডাল কাটতে দিত না। আমার ডালে বাদুড় চামচিকেরা এসে যখন ঝুলল তখন সেই বললে—ওরা মা ষষ্ঠীর ছানা। ওদেরই মা দান করেন মায়েদের।

তারপর অনেকদিন পর এল ধর্মরাজ।

ধর্মরাজকে নিয়ে এলেন এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী ঠাকুরটি তকতকে গাছতলা নির্জন স্থান আর অরণ্য অরণ্য ভাবের ঠাঁইটি দেখে বাসা গাড়লেন। ঠাঁইটি মানে আমার তলদেশটি আরও ঝকঝকে তকতকে হল। বেদী বাঁধলে। মাটির বেদী। চেলা চামুণ্ডা জুটল। যত সব নিকেজো মানে বেকার বাউণ্ডুলে লোক এসে জমে গেল বাবা সন্ন্যেসীকে ঘিরে। গাঁজা ভাঙ খেতে লাগল আর যারা কাজ করে—তাদের কাছে গিয়ে দেবতার নাম দিয়ে মাতব্বরি করতে লাগল।

রামকালীবাবু আজ আর তোমার কাছে লুকোব না, স্বীকার করব সত্য কথা। দেবতা কেউ চোখে দেখেনি স্বর্গে কেউ যায়নি—কেউ স্বর্গ থেকে আসেনি—কিন্তু দেবতা স্বর্গ পরকাল আর ভূত এরা জীবন্ত মানুষের রাজ্যে আশ্চর্যভাবে এক অদ্ভুত সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার করে বসে আছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ গণেশ কার্তিক—গাজনের শিব ধর্মরাজ মনসা ষষ্ঠী। সুন্দর বনের বাঘের ঠাকুর কোথাও ভালুকের সহজ মানুষরা এককালে আলো যে দেয় তাকে দেবতা ভেবেছে, জল যে দেয় তাকে দেবতা ভেবেছে এমনি করে যা কিছুর কারণ খুঁজে না পেয়েছে তাই ধরে নিয়েছিল এ সব করেন দেবতারা। কিছু কিছু চালাক চতুর লোক—তারা বেশিরভাগ বামুন পাণ্ডা বেকার বাউণ্ডুলে—তারা গাছতলায় পাথর বসিয়ে সিঁদুর লেপে বোম বিশ্বনাথ জয় ধর্ম রজো বলে বসে পড়েছে। আমার সেদিনকার সেই বাড়বাড়ন্তর দিনে আমাকে ঘিরে এই সব ঠাকুরদের আস্তানা পড়েছিল। গোড়াতে একদিকে মা ষষ্ঠী একদিকে ধর্মরাজ, আর ওই দেখ একটু দূরে নদীর ওপারে ওই যে ডাঙ্গাটায় ওই যে ঘরটা ওটা হল মা মনসার ঘর—আরও খানিকটা দূরে এই তো সেদিন রেলের কুলীরা রামদাস হনুমানের নামে মহাবীরের ঝাণ্ডা টাঙিয়েছে।

বারো মাসে তেরো পার্বণ হত। মধ্যে মধ্যে মেলা বসত আমাকে মাঝখানে রেখে এই চারিপাশে। রাত্রে আলো জ্বলত। লোকেরা ঢোল বাজিয়ে গান গাইত; কবিগান যাত্রাগান হত; দিনের বেলা ঢাক ঢোল বাজিয়ে পূজো দিত লোকেরা; বলিদান হত; ছাগ ভেড়া হাঁস কাটত; আবার খোল বাজিয়ে হরিনামও করত।

আমি মাথা তুলে আকাশকে যেন মাথায় ধরে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মনে হত আমি সম্রাট। আমার নিজের শক্তিতে নিজেই আমি আশ্চর্য হতাম। প্রায় ঝগড়া হত আমার মেয়েদের সঙ্গে আর ঝড়ের সঙ্গে। সুয্যিঠাকুর লোক ভালো। চন্দ্রঠাকুর সেও খুব ভালো। কিন্তু এই ঝড়ো ঠাকুর আর এই জলের ঠাকুর মেঘের দেবতা এরা দেবতা হিসেবে যা হোন মানুষ ভালো নন। কুটিল পেঁচালো জেদী, ন্যায় অন্যায়ের বিচার নাই—স্বেচ্ছাচারী। চাঁদসদাগরের সঙ্গে মনসা ঠাকরুনের বাদের কথা জান তো? তুই আমাকে পূজো কর—না করলে তোকে কামড়াব। তাও সামনাসামনি নয়—লুকিয়ে চুরিয়ে রাত্রিবেলা। আর ঠাকরুনের মুরদ তো খুব—একটি লাঠির এক ঘা পড়লেই কাৎ। তারপর শ্রীবৎস রাজা আর শনিঠাকুরের কথা। নলরাজা আর কালি ঠাকুরের কথা। কত

বলব বল সব দেবতার এক বোল। আমাকে পুজো কর। না করলে ছলে বলে তোর সর্বনাশ করব। ওই যে বুড়ী ষষ্ঠীবেটী ও চরিত্তির তাই গো। শেতলা ষষ্ঠীর দিন কোন মা ষষ্ঠীর ভিজে ভাতের পেসাদ না খেয়ে গরমগরম খেয়েছিল—অমনি বুড়ীর মেজাজ খাপ্পা।

দেখ না রামকালী থুড়থুড়ী বুড়ী কটকট করে তাকিয়ে আছে দেখ না।

যাকগে। শোন যা বলছি শোন। সে কালে আমার সঙ্গে ওই ঝড় আর মেঘের দেবতাদের সঙ্গে লড়াই হত। বুঝেছ! আওয়াজ দিয়ে ঝড় সমুদ্র লঙ্ঘনকারী হনুমানের মত পশ্চিম দক্ষিণ কোণে স্থির হয়ে দাঁড়াত, দম ধরত, সারা শরীরকে শক্ত করে তুলত—বড় বড় কুস্তিগীরদের মত তারপর 'গোঁ-ওঁ-ওঁ' শব্দ করে দিত ঝাঁপ—শূন্যালোক তোলপাড় করে যা খানিকটা মাথা তুলেছে তারই মাথায় ধাক্কা মেরে ভেঙেচুরে দিয়ে চলে যেত। আজও যায়; আজই তো দেখলে। তার পিছন পিছন আসে মেঘ আর জল—তার সঙ্গে থাকে ইন্দ্রদেবতার বজ্র। বড় বড় তাল গাছের মাথা দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেয়। আজও পড়েছে বাজ। ওই সুন্দীপুরে পড়েছে তালগাছের মাথায়—হরিরামপুরে পড়েছে পুরোনো মন্দিরের চূড়ায়—আরও দুটো পড়েছে কোপাই নদীর ওপারে।

আগে আগে আমার উপর বজ্রের আঘাত করেছে—একবার নয়, চার চার বার। চার বারে চারটে ডাল শুকিয়ে গেল।

আমি ঝড়কে জলকে ইন্দ্রকে মানতাম না কিনা।

বলতাম—তোমাদেরকে মানব কি হে? তোমরাই তো আমার তলাতে এসে আশ্রয় নিয়েছ। মনসার কাচ্চাবাচ্চারা থাকে, ষষ্ঠী বুড়ী থাকে তার বাচ্চা বাদুড় চামচিকে থাকে, ভূতেরা থাকে। পাঁচটা ভূত থাকে আমার ডালে. ধর্মরাজ থাকে। আমি তোমাদের মানব কেন?

ঝড় বলত—তবে নে, সামাল!

আমিও তাল ঠুকে শক্ত মাটিতে খুঁট দিয়ে দাঁড়াতাম আর মুখে কোন কথা না বলে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। ঠিক ধুলোমাটি মাখা নেঙটা কষা মল্লবীরের মত। ঝড় গোঁ-ওঁ শব্দে এসে ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ে মুচড়ে মাটিতে ঠেসে ধরে ঘাড় ভেঙ্গে দিতে চাইত। আমি নুয়ে পড়তাম প্রথমটায়, তারপরেই ঝটকা দিয়ে ঝড়কে ঘাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার সোজা হতাম। আবার ঝাঁপ দিত ঝড়। আমি আবারও তেমনি করে লড়াই দিতাম। একবার দুবার তিনবার। তারপর ধস্তাধস্তি। সে ফেলে আমি ছুঁড়ে ফেলে দি। সে গোঙ্গায় গোঁ গোঁ আমি হা-হা করে হাসি আমার তলায় ভয়ে বোবা হয়ে বসে থাকে ধর্মরাজ—ষষ্ঠী বুড়ী। সাপখোপ-পোকামাকড় বাদুড় চামচিকে আমার গায়ের গর্তটর্ত দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়ত। ঝড় ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত হল—বৃষ্টি শেষ হত, আমি মাথা তুলে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকতাম। হাসতাম মিষ্টি মিষ্টি। মাথার উপরে আকাশে চাঁদ থাকলে বলতাম—তুমি সাক্ষী ঠাকুর। সূর্য থাকলে তাঁকে বলতাম—প্রভু তুমি সাক্ষী! অনেক গাছের দর্প চূর্ণ করেছে, অনেকে হেরেছে, আমি হারিনি। আমার সঙ্গে একটা আপস হয়ে গিয়েছিল শেষ দিকে। কারণ অনেক দেবতার আশ্রয় তো আমি!

বেশ দিন যাচ্ছিল। আমার বয়স বাড়ছিল তবু বুড়ো হইনি। মূল কাণ্ডটা মরল, তখন আমি নতুন ঝুরি নামিয়ে আরও তিনটে কাণ্ডে ত্রিদেহী মহাবট হয়ে উঠেছি। তোমাদের মধ্যে যমজ ছেলে হয় জোড়া লাগা যমজ—তোমরা তাকে বলো শ্যামটুইন—এ টুইনের থেকে বেশী।

লোক বলত দেব চরিত্র বোঝা ভার।

হঠাৎ কাল পাল্টাল। মানুষ পরশমণির চেয়েও দামী মণি পেলো।

বিজ্ঞান মণি।

যে জ্ঞানের বলে আগের কালে সকল বিশ্বাসের ওপর আলো ফেলে বিশ্বাসের কালো অন্ধকার ঘুচিয়ে বিশ্বাসকেই মুছে দিলে।

আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে লাগল সব।

লোহার গাড়ি জলে আগুনে কয়লায় লাইনের ওপর চলতে লাগল। তারের মুখে বিদ্যুতের আলো জ্বলল। তেল নেই সলতে নেই প্রদীপ নেই ঝড় বাদলে নেভা নেই, আলো জ্বলছে। অবাক হয়েই দেখছিলাম। চমকাই নি।

হঠাৎ চমকে উঠলাম—মানুষদের চিৎকার শুনে।

--ভূত নাই, ভগবান মানি না—দেবতা মিথ্যে!

—ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

আশ্চর্য! আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ভূতেরা মিলিয়ে যেতে লাগল। তোমাদের গ্রামের সেই বিখ্যাত রামাই ভূত কেমন করে নিখোঁজ হল জান? সে সেই বড় শিমুল গাছটার মাথায় বসে পৈতে হাতে নিয়ে জপ করছিল --

ববম ববম ভোলা—জয় কালী জয় কালী—
ধিতাং ধিতাং নাচি—হাতে দিয়ে তালি।

ঠিক এই সময়েই গাছটার একটু দূরের রাস্তা ধরে যত হাল আমলে ছোকরাদের মিছিল চলছিল—তারা হাঁক দিচ্ছিল---ভূত! নেহি হ্যায়। প্রেত—বিলকুল ঝুট; ভূত প্রেত মুর্দাবাদ। ভেঙ্গে দেও---জাহান্নম! সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চমকে গিয়ে রামাই সেই উঁচু শিমুল গাছের সেই উঁচু ডগার ডাল থেকে ফট করে শিমুল ফলের মত ফেটে গেল। শিমুল ফলের তুলো আছে সেগুলো উড়ে বেড়ায় বাতাসে খোলাটা লেগে থাকে বোঁটায়—এর খোলাও নেই ভেতরে তুলোও নেই। সুতরাং ফট করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে ভূত শূন্যে ফুস করে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মত মিশে গেল।

শেষ পর্যন্ত ওই বৈতরণী ঘাটের ধারে যান, ভুবনপুরে ওরা জড়ো হয়ে আছে। কিন্তু তাও আর থাকবে না। এবার মানুষরা চন্দ্রলোকে যাচ্ছে গো। মহা বিপদ। কোথাও গিয়ে পরিত্রাণ নেই। তাই—

বললাম--কি তাই? খুব বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল।

বৃদ্ধ বটের আহত আত্মাপুরুষ বললেন---দেখ, সব দেবতারা এবার শঙ্কিত হল। ভূত গেছে—এবার এরা মহাশূন্যে মহাযান চালিয়ে সব খুঁজে পেতে ভগবানকে ধরতে যাবে।

ভগবান বুড়ো কোথায় থাকে তা ওই ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণও জানে না। বিশ্বাস না হয় উপনিষদ পড়ে দেখো। তাই দেবতারা খুব চঞ্চল হল। সব দেবতা। এরা তো এবার দেবতা-টেবতাদেরও মানবে না। ঘাড় ধরে ধরে নিকাল দেবে! তখন কোথায় যাবে সব? মানুষ যদি দেবতাদের না মানে তবে তারা যাবে কোথায়? খাবে কি? অক্ষম পশু নড়তে পারে না। চড়তে পারে না। কথা কয় না বেচারারা যে শুকিয়ে হেজে-মজে, অঙ্গহীন হয়ে, পুতুল হয়ে, পাথর হয়ে, না হয় নস্যাৎ হয়ে উড়ে যাবে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছিল। আকাশের চাঁদ পশ্চিমদিকে ঢলে পড়েছে। বৃদ্ধ বট পশ্চিমের ঝড়ে উপড়ে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হয়ে পড়েছেন। বিশাল শাখাপ্রশাখা মাটির উপর ভেঙেচুড়ে দুমড়ে মাটির বুকে মুচড়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তার পাশেই তাঁর আত্মা আহত হয়ে পড়ে আছে। দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বোধ হয় রাত্রি-শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবেন স্বর্গলোকে। আশেপাশে অপ বা উপদেবতারা বা শিডিউল্ড আর ট্রাইবাল দেবতারা জমায়েত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ধর্মরাজ থুত্থুরে বুড়ো। ষষ্ঠী আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী। মনসা ঠাকরুন গাজনের শিব, শিবের সেনাপতি বাণ গোঁসাই, রক্ষেকালী শ্মশানকালী, সুন্দর রায়, খোসপাচড়ার দেবতা বেঁটু ঠাকুর—ওরফে ঘণ্টাকর্ণ, তার উপর গলায় দড়ে, পুড়েমরা ভূত, ঘাড়ভাঙ্গা ভূত জলে ডুবে মরা ভূতনী, সাপে কামড়ে মরা ভূত, তেরোস্পর্শে মরা ভূত, শেখ সাহেবদের মামদো, পাদরীদের সাহেব ভূত সব এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

দাঁড়াবে না?—বটগাছ যে তাদের আশ্রয়দাতা!

বুড়ো বটের আত্মা বলল—এইসব নিয়ে আমাদের সভা-সমিতি প্রায়ই হচ্ছিল। কি করা যায়? কিভাবে বাঁচা যায়। মানুষের ওপর কি করে টেক্কা তুরুপ ছাড়া তো পথ নেই। দেখছ তো রাশিয়া আমেরিকার ব্যাপার? এ একটা আকাশযান ছাড়ছে তো ও আর একটা ছাড়ছে। এ যদি শূন্যযানে কুকুর পাঠায় তো ও পাঠায় মানুষ। তখন ও পাঠায় মেয়েছেলে। তারপর এ পাঠায় দুজন। আবার মহাকাশে হেঁটে বেড়ায়। দুটো মহাকাশযানে যানে দেখা হয়। আমেরিকা তাজ্জব করে দিলে। লোক এবার নামাবেই চাঁদের উপর। তাই আমাদের ঠিক হল—আমরা তার আগেই পাঠাব আমাদের প্রতিনিধি। আমাদের যন্ত্রের দরকার নেই। যন্ত্র আমরা বুঝি না। আমরা দেবতা। আমরা উড়ব। তাই ঠিক হয়েছিল আমি উড়ব? ঝড়ের দেবতা রকেটের মত আমাকে বৃক্ষদেবতাকে আকাশে ছুঁড়ে দেবে আর আমার ডালে ঝোলা হাজারখানেক বাদুড় আর একলক্ষ চামচিকে পাখা ঝাপটাতে থাকবে। আমরা মাধ্যাকর্ষণ পার হয়ে চাঁদে গিয়ে ঝপ করে নেমে গোটা চাঁদকে দখল করে হাঁকব—দেবতালোক জিন্দাবাদ। জয়—দেবতাদের জয়।

ঝড়ও এল। দেখেছ কি ঝড়। সে আমাকে তুলেও দিলে—কিন্তু দেবতারা বিজ্ঞান জানে না। বাদুড়ের চামচিকের পাখায় ভর করে শূন্যলোকে উড়ে চন্দ্রলোকে যাওয়া যায় না। আমি ধপাস করে পড়ে গেলাম মাটির বুকে। এবং—

মাঝপথেই থেমে গেল বুড়ো বটের আত্মা এবং একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

তারপর আবার বললে—ভূত দেবতা ভগবান এ সবের কাউকে কিংবা কিছুকে রাখবে না মানুষ।

আমি বললাম—তাতে কি গাছ তো থাকবে।

গাছ বললে—হ্যাঁ। কিন্তু।

—কিন্তু কি?

—দেবতা হয়ে তো থাকবে না।

—দরকার কি? গাছ গাছ হয়েই থাকুক। মানুষও তো মানুষ হয়েই থাকবে?

গাছ বললে—মানুষদের তো আমরা খুব ভালোবাসি। যখন মানুষেরা ঘর গড়তে জানত না—তখন তো ঝড়ের হাত থেকে জলের হাত থেকে রোদের হাত থেকে আমরাই বাঁচিয়েছি।

বললাম—কে অস্বীকার করছে?

করছ না? করবে?

না, মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়।

গাছ বললে—হৃদয়হীনও যেন হয়ো না।

গাছের ওই শেষ কথা। তারপরই পাখি ডাকতে লাগল। পূর্বদিকের আকাশে যেন লালচে আভা ধরেছে। বাসু আমাকে নাড়া দিয়ে ডেকে তুললে। জেগে দেখলাম আমি আদমপুর স্টেশনেই শুয়ে আছি।

ওঃ। তা হলে সারারাত্রি স্বপ্ন দেখেছি।

না—স্বপ্ন ঠিক নয়। কারণ সকালে যখন ট্রেনে চড়ে বাড়ি ফিরলাম তখন দেখলাম আগয়ার ব্রিজের পাশে আগয়া নদীর চরের উপর কুলীরা কাটারী দা কুড়ুল নিয়ে গতরাত্রে ঝড়ে উপড়ে পড়া সেই ষষ্ঠী বুড়ী ও ধরমতলার বটগাছটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে লাইন থেকে সরিয়ে ফেলেছে; এখন বাকী অংশটাকে টুকরো টুকরো করবে। দেখলাম লরী দাঁড়িয়ে আছে। গাছ তুলে নিয়ে যাবে। শুনলাম এখানকার স মিল মানে করাতকলওলারা গাছটাকে কিনে ফেলেছে। চিরে কেটে টুকরো করে বিক্রি করবে।

আরও দেখলাম—অনেক মজুর চাষী দাঁড়িয়ে আছে। বটগাছটা গেল এবার জায়গাটা কেটে জমি করলে কেমন জমি হবে তাই তারা দেখতে এসেছে।

বিকেলবেলা কলকাতা যাবার জন্যে বাড়ি থেকে আবার এই পথেই ফিরলাম—তখন আগয়ার ধরমতলা যড়তলা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এরপর জমি হবে। মাঠটার দুটো নাম হবে—ধরমতলার মাঠ আর ষষ্ঠীতলার মাঠ।

দুধের দাম

বনফুল

ট্রেন আসিয়াছিল। কয়েকটি সুবেশা, সুতন্বী, সুরূপা, যুবতী স্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই আশেপাশে জনকয়েক বাঙালী ছোকরাও, কেহ অন্যমনস্কভাবে, কেহ বা জ্ঞাতসারে ঘোরাফেরা করিতেছিল। ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা যে একজনের হোলড্-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। করিবার কথাও নয়, বিদেশাগত শিভ্যালরি জিনিসটা যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়। সকলে অবশ্য যুবতীদিগকে লইয়া প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ব্যস্ত ছিল না। যাঁহার হোলড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া বুড়ী পড়িয়া গেলেন, তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, কাছেই ছিলেন। তিনি বুড়ীকে স-ধমক উপদেশ দিলেন একটা।

"পথ দেখে চলতে পার না? আর-একটু হলে আমার স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যেত যে।"

বুড়ীর ডান পা-টা বেশ মচকাইয়া গিয়াছিল। তবু তিনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া প্ল্যাটফর্মময় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে। অসম্ভব। ট্রেন বেশিক্ষণ থামিবেও না। হুড়মুড় করিয়া শেষে তিনি একটা সেকেলে ইন্টার ক্লাসে উঠিয়া পড়িলেন। যথারীতি সকলেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। বর্তমানে অবশ্য ইন্টার ক্লাসের নাম বদলাইয়া সেকেন্ড ক্লাস হইয়াছে।

একজন বাঙালী ভদ্রলোক ইচ্ছা করিলে একটু সরিয়া বসিয়া জায়গা করিয়া দিতে পারিতেন, তিনি জিনিসপত্র সমেত বেশ একটু ছড়াইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি সরিয়া বসিলেন না, উপদেশ দিলেন—"উঠলে ত, এখন বসবে কোথায় বাছা!"

"আমি নিচে তোমাদের পায়ের কাছে বসব বাবা। দুটো স্টেশন মাত্র, তারপরই নেমে যাব। বেশিক্ষণ অসুবিধা করব না তোমাদের।"

বুড়ী তাঁহার পায়ের কাছেই তাঁহার জুতোজোড়া সরাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অসুবিধা তেমন কিছু হইল না, কার ' বৃদ্ধা ছোটখাটো আয়তনের মানুষ, গুটিসুটি হইয়া বসিয়া ছিলেন। একটু পরেই কিন্তু তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। যে পায়ে স্ট্র্যাপটা আটকাইয়া গিয়াছিল সেই পা-টা বেশ ব্যাথা করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলেন, পা ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাবনা হইল নামিবেন কী করিয়া। আর দুই স্টেশন পরেই শুধু নামিতে হইবে না, আর-একটা ট্রেনে উঠিতেও হইবে। অথচ পা নাড়িতে পারিতেছেন না, দাঁড়ানই যাইবে না যে। ট্রেনের কামরায় অনেক বাঙালি রহিয়াছেন, অনেকে তাঁহার পুত্রের বয়সী, অনেকে পৌত্রের। কিন্তু ইহারা যে তাহাকে সাহায্য করিবেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না। তবু হয়তো ইঁহাদেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। উপায় কি!

বৃদ্ধা যে-স্টেশনে নামিবেন, সে স্টেশন একটু পরেই আসিয়া পড়িল। প্যাসেঞ্জাররা হুড়মুড় করিয়া সবাই নামিতে লাগিলেন, বুড়ির দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিলেন না।

"আমাকে একটু নামিয়ে দাও না বাবা, উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছি না আমি।"

বুড়ীর এই করুণ অনুরোধ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কিন্তু অধিকাংশ ভান করিলেন যেন কিছু শুনিতে পান নাই।

একজন বলিলেন, "ভিখারী মাগীর আস্পর্ধা দেখেছেন? যাচ্ছে ত উইদাউট টিকিটে, তার উপর আবার—"

তিনি বৃদ্ধাকে ভিখারিণীই মনে করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা কিন্তু ভিখারিণী নন, তাঁহার টিকিটও ছিল। সেকেণ্ড ক্লাসেরই টিকিট ছিল।

আর একজন বিজ্ঞ মন্তব্য করিলেন, "এই সব হেল্পলেস বুড়ীকে রাস্তায় একা ছেড়ে দিয়েছে, এর স্বামী ছেলে নেই না কি, আশ্চর্য কাণ্ড!

সিগারেটে টান দিতে দিতে তিনিও নামিয়া গেলেন। গাড়িতে যাঁহাবা রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জন-দুই টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া আহারে মন দিয়াছিলেন, বুড়ীর কথা তাঁহাদেরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করা তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন না।

বৃদ্ধা তখন দুই হাতে ভর দিয়া ঘ্যাসটাইয়া দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নামিতে সাহস পাইতেছিলেন না।

"এই বুড়ী, হটো দরোয়াজাসে—"

এক মাড়োয়াড়ী যাত্রী বৃদ্ধার গায়ে প্রায় পদাঘাত করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে এক বলিষ্ঠকায় কুলী। তাহার মাথায় স্যুটকেশ হোল্ড-অল। কুলীর পিছনে চপ্পল-পায়ে নীল-চশমা পরা লক্কা গোছের এক ছোকরা। সে ভক্তীভরে বলিল, "দযাময়ি, পথ ছাড়ুন। দবজার কাছে বসে কেন!"

"পায়ে লেগেছে বড্ড বাবা, নামতে পাচ্ছি না।"

"ও দেখি যদি একটা স্ট্রেচার আনতে পারি!"

ছোকরা ভিড়ে অন্তর্ধান করিল আব ফিরিল না।

যে বলিষ্ঠ কুলিটা মাল মাথায় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল সে বাহিরে যাইবাব জন্য দ্বাবেব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"মাইজি, কিরপা করকে থোড়া হাটকে বৈঠিযে। আনে যানেকা বাস্তা পব কাহে বৈঠ গ্যয়ে?"

বৃদ্ধা হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

"আমি নামতে পাচ্ছি না, বাবা, পায়ে চোট লেগেছে—"

"আপ কাঁহা জায়েগা—?"

"গয়া—"

"চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ!"

বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি যেমন করিয়া ছোট শিশুকে দুই হাতে কবিয়া বুকের উপর তুলিয়া লয়, কুলীটি সেইভাবে বুকে বৃদ্ধাকে তুলিয়া লইল। সোজা লইয়া গেল ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে।

"আপ হিঁয়া পর বৈঠিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জারকা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইম পর আকে আপকো ট্রেনমে চড়া দেঙ্গে।"

বৃদ্ধা ওয়েটিং রুমের মেঝেতেই উপবেশন করিলেন।

যে দুইটি ইজিচেয়ার ছিল, সে-দুইটিতেই সাহেবী পোশাক পরা দুইজন বঙ্গসন্তান হাতলের উপর পা তুলিয়া দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া ছিলেন। একজন পড়িতেছিলেন খবরের কাগজ, আব একজন একখানি ইংরেজি বই। বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।

সম্ভবতঃ আলোচনাটা পূর্বেই হইতেছিল। পুনরায় আরম্ভ হইল।

'সিভ্যলরি আমাদের দেশেরও ছিল। নার্য্যস্তুযত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা, একথা আমাদের মনুতেই লেখা আছে মশাই।"

যিনি নারী-মূর্তি-সম্বলিত ইংরেজি মাসিক পড়িতেছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ এ খবর জানিতেন না। উঠিয়া বসিলেন।

"বলেন কি! এ-কথা জানলে ব্যাটাকে ছাড়তুম নাকি! মনুর যুগেও যে আমাদের দেশে শিভ্যল্‌রি ছিল আমরা যে বর্বর ছিলুম না, এ-কথা ভালো করেই বুঝিয়ে দিতুম বাছাধনকে—"

বৃদ্ধা অনুভব করিলেন ইতিপূর্বে কোন সাহেবের সঙ্গে বোধহয় লোকটির তর্ক হইয়াছিল। শ্বেতবর্ণ সাহেব সম্ভবতঃ এই সাহেবী পোশাক-পরা কৃষ্ণচর্ম বঙ্গ-সুন্দরকে বর্বর বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা মনে মনে বলিলেন, "তোমরা বর্বরই বাছা। তোমাদের শিভ্যালরি অবশ্য আছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেবল যুবতী মেয়েদের বেলা।"

বৃদ্ধার বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজিতে কিঞ্চিৎ দখল ছিল। সেকালের বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

হঠাৎ দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন।

"আরে, এ আবার কোত্থেকে জুটল এসে এখানে?"

"কোনো ভিকিরী-টিকিরী বোধ হয়।"

প্রথম ভদ্রলোক আন্দাজ করিলেন।

"সত্যি, ভিখিরীতে ভরে গেল দেশটা। স্বাধীনতার পর ভিখিরীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। সবাই আবার মুখ ফুটে চাইতেও পারে না।"

দেখা গেল ভদ্রলোকটি একটি পয়সা বাহির করিয়া বুড়ীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন বৃদ্ধা।

"পয়সাটা তুলে নাও, পয়সাটা তোমাকেই দিলাম।"

বৃদ্ধা তবু কোনো কথা বলিলেন না।

দাতা ভদ্রলোকের সন্দেহ হইল বোধহয় বুড়ী বাঙালি নয়। তখন রাষ্ট্রভাষা ব্যহার করিলেন। চাকুরির অনুরোধে কিছুদিন পূর্বেই রাষ্ট্রভাষায় পরীক্ষা পাস করিয়াছেন।

"পয়সা উঠা লেও, তুহমী কো দিয়া।"

তখন বৃদ্ধা পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন, "আমি ভিখিরী নই বাবা, আমি আপনাদের মত একজন প্যাসেঞ্জার।"

"এখানে কেন। এটা যে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম।"

"আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আছে।"

পরমুহূর্তে সেই বলিষ্ঠ কুলীটি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

"চলিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জার আ গিয়া।"

তাহার বলিষ্ঠ বাহুব দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মতো বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

গয়া প্যাসেঞ্জারে একটু ভিড় ছিল। কিন্তু কুলীটি বলিষ্ঠ। শক্তির জয় সর্বত্র। সে ধমক-ধমক দিয়া বুড়ীকে একটা বেঞ্চের কোণে স্থান করিয়া দিতে সমর্থ হইল।

বৃদ্ধা তাহাকে দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

এই প্রসঙ্গে কুলীর সহিত হিন্দীতে যে কথাবার্তা হইল তাহার সারমর্ম এই ঃ

"আমার মজুরি আট আনা। দু টাকা দিচ্ছেন কেন?"

"তুমি আমার জন্যে এত করলে বাবা, তাই বেশি দিলুম।"

"না মাইজি, আমাকে মাপ করবেন। আমি ধর্ম বিক্রি করি না।"

"তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছ। আমি তো তোমাকে দুধ খাওয়াইনি, সামান্য যা দিচ্ছি তা দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা। দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

বৃদ্ধার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের কোণে জল টলমল করিতে লাগিল।

কুলী ক্ষণকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রণাম করিয়া নামিয়া গেল।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টেশনে ট্রেন থামিতেই হ্যাট-কোট পরা সুরনাথবাবু নামিয়া পড়িলেন। স্টেশনটি ছোট, তাহার **সংলগ্ন জনপদটিও** বিস্তীর্ণ নয়। ট্রেন দু'মিনিট থামিয়া চলিয়া গেল।

সুরনাথ ঘোষ একজন পোস্টাল ইন্সপেক্টর। সম্প্রতি এদিকটার গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি নূতন পোস্ট অফিস খুলিয়াছে, সুরনাথবাবু সেগুলি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি এদিকে কখনো আসেন নাই।

ছোট সুট্‌কেসটি হাতে লইয়া তিনি স্টেশনে বাহির হইলেন। সঙ্গে অন্য কোন লটবহর নাই। সুট্‌কেসের মধ্যে আছে এক সেট্ প্যান্টুলুন ধুতি গামছা সাবান, দাঁত মাজিবার বুরুশ ইত্যাদি।

স্থানীয় পোস্ট অফিসটি স্টেশনের কাছেই। ডাক এবং তার দুই-ই আছে, কিন্তু সবই শহরের অনুপাতে; একজন পোস্টমাস্টার একটি কেরানী ও দু'জন পিওন। পোস্ট অফিসের পশ্চাদভাগে পোস্টমাস্টার সপরিবারে বাস করেন।

বেলা আন্দাজ এগারটার সময় সুরনাথবাবু পোস্ট অফিসে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন, পোস্টমাস্টার খাতির করিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে আহারাদির ব্যবস্থা পোস্টমাস্টার বাবুর বাসাতেই হইল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সুরনাথবাবু ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার ধড়াচূড় পরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি খবর লইয়াছেন, যে তিনটি পোস্ট অফিস পরিদর্শনে তিনি যাইবেন তাহার মধ্যে সবচেয়ে যেটি নিকটবর্তী সেটি বারো মাইল দূরে। কাঁচা পাকা আছে। সুরনাথ 'তার' পিওনের সাইকেলটি ধার লইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার সময় উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছিবেন, কাল সকালে সেখানকার পোস্ট অফিস তদারক করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসিবেন, আবার অন্য পোস্ট অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবেন।

সাইকেলের পশ্চাদভাগে ছোট সুটকেসটি বাঁধিয়া সুরনাথ তাহাতে আরোহণের উদ্যোগ করিলে পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'এখান থেকে মাইল পাঁচ ছয় দূরে রাস্তা দু-ফাঁক হয়ে গেছে। ডান হাতি রাস্তা দিয়ে গেলে একটু ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু আপনি ওই রাস্তা দিয়েই যাবেন।'

সুরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, বাঁ-হাতি রাস্তাটা কী দোষ করেছে?'

পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'ও রাস্তাটা ভালো নয়।'

সাইকেলে আরোহণ করিয়া সুরনাথ বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি শহরের এলাকা পার হইলেন। তারপর অবারিত মুক্ত দেশ।

দেশটা বর্ণসংকর। অবিমিশ্র পলিমাটি নয়, আবার নির্জন মরুকান্তারও নয়। স্থানে স্থানে ঘন বন আছে, কোথাও নিস্তরুপাদপ শিলাভূমি, কোথাও নরম মাটির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুক্ষ পাথরের টিবি মাথা তুলিয়াছে। এই বিচিত্র ভূমির উপর দিয়া নির্জন পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে।

আকাশে পৌষ মাসের স্নিগ্ধ সূর্য, বাতাসে আতপ্ত আরাম। সুরনাথ প্রফুল্ল মনে মন্থর গতিতে চলিয়াছেন। মাত্র বারো চৌদ্দ মাইল পথ সাইকেলে যাইতে কতই বা সময় লাগিবে!

সুরনাথের বয়স চল্লিশ বছর। মধ্যমাকৃতি দৃঢ় শরীর, মুখশ্রী মোটের উপর সুদর্শন। তিনি বিপত্নীক, বছর তিনেক আগে স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। আবার বিবাহের প্রয়োজন তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন, ফলে যে ক্ষণিক স্বাধীনতাটুকু লাভ করিয়াছেন তাহা বিসর্জন দিতেও মন চাহিতেছে না।

তিনি যখন ছয় মাইল দূরত্ব পথের দ্বিভুজে পৌঁছিলেন তখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকখানি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সম্মুখে দুইটি পথ ক্রমশ পৃথক হইতে হইতে ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে; মাঝখানে উঁচু জমি, তাহার উপর তাল খেজুরের গাছ মাথা তুলিয়া আছে।

হঠাৎ কোথা হইতে ক্ষুদ্র একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল, চারদিক অস্পষ্ট ছায়াছন্ন হইয়া গেল। সুরনাথ পথের সন্ধিস্থলে সাইকেল হইতে নামিলেন।

আশে পাশে নিকট দূরে জনমানব নাই। আকাশ নির্মল, কেবল সূর্যের মুখের উপর একটুকরা মেঘ লাগিয়া আছে, যেন সূর্য মুখোশ পরিয়াছে, সুরনাথ একটু চিন্তা করিলেন। এখনো ছয়-সাত মাইল পথ বাকি, আধঘণ্টার মধ্যেই সূর্য অস্ত যাইবে; অন্ধকার হইবার পূর্বে যদি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে না পারেন, দিকভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

পোষ্টমাস্টার বলিয়াছেন বাঁ-হাতি রাস্তা ভালো নয়, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট সুতরাং বাঁ হাতি রাস্তা দিয়া যাওয়াই ভালো।

সুরনাথ সাইকেলে চড়িয়া বাঁ-হাতি রাস্তা ধরিলেন। পোষ্টমাস্টার মিথ্যে বলেন নাই, পথ অসমতল ও প্রস্তরাকীর্ণ, কিন্তু সাবধানে চলিলে আছাড় খাইবার ভয় নাই। সুরনাথ সাবধানে অথচ দ্রুত সাইকেল চালাইলেন।

সূর্যের মুখ হইতে মেঘ কিন্তু নড়িল না। মনে হইল মুখে মুখোশ আঁটিয়াই সূর্যদেব অস্ত যাইবেন।

মিনিট কুড়ি সাইকেল চালাইবার পর সুরনাথ সামনে একটি দৃশ্য দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। অস্পষ্ট আলোতে মনে হইল যেন রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট কুটির দেখা যাইতেছে, দু'একটা আবছায়া মূর্তিও যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

আরো কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া সুরনাথ ব্রেক্ কষিলেন। একটি ছোট মাটির কুটির যেন মন্ত্রবলে রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আশে পাশে অন্য কোন কুটির দেখা যায় না; এই কুটিরটি যেন গ্রামে প্রবেশের মুখে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

সুরনাথ রাস্তার ধারে যেখানে সাইকেল হইতে নামিলেন সেখান হইতে তিন গজ দূরে কুটিরের দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া একটি যুবতী বসিয়া আছে। সুরনাথের চোখের সহিত তাহার চোখ চুম্বকের মত আবদ্ধ হইয়া গেল।

চাষার মেয়ে! গায়ের রং মাজা পিতলের মত পীতাভ, দেহ যৌবনের প্রাচুর্যে ফাটিয়া পড়িতেছে। মুখের ডৌল দৃঢ়, তাহাতে প্রগল্‌ভতার সমাবেশ। মাথার অযত্নবিন্যস্ত চুলের প্রান্তে একটু পিঙ্গলতার আভাস, চোখের তারা বড় বড়। পরিধানে কেবল একটি সস্তাপাড় শাড়ি, অলঙ্কার নাই। সধবা কি বিধবা কি কুমারী বোঝা যায় না। তার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন আগুন রাঙা চুল্লীর দিকে চাহিয়া আছি।

"হ্যাঁগা, তুমি কোথায় যাবে?" যুবতী প্রশ্ন করিল। দাঁতগুলি কুন্দশুভ্র, গলার স্বর গভীর ও ভরাট; কিন্তু কথা বলিবার ভঙ্গী গ্রাম্য।

সুরনাথের বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল। দীর্ঘকালের অনভ্যস্ত একটা অন্ধ আবেগের স্বাদ তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু তিনি লঘুচেতা লোক নন, সবলে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, 'রতনপুর'।

যুবতী দাওয়ার কিনারায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে প্রগল্‌ভতা ছাড়াও এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ুশিরায় আগুন ধরাইয়া দিতে পারে। শেষে হাসি থামাইয়া সে বলিল, 'রতনপুর যে অনেক দূর, যেতে যেতেই রাত হয়ে যাবে, পৌঁছতে পারবে না।'

সুরনাথ রাস্তার দিকে চাহিলেন। দূর হইতে যে গ্রামের আভাস পাইয়াছিলেন সন্ধ্যার ছায়ায় তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। তিনি উদ্বেগের স্বরে বলিলেন, 'তাহলে গ্রামে কি কোথাও থাকবার জায়গা আছে?'

'এখানেই থাকো না!'

সুরনাথ চকিত চক্ষে যুবতীর দিকে চাহিলেন। যুবতীর দৃষ্টিতে দুরন্ত আহ্বান, আরো কত রহস্যময় ইঙ্গিত। সুরনাথের বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি শরীর শক্ত করিয়া নিজেকে সংবরণ করিলেন, একটু স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'বাড়ির পুরুষেরা কোথায়?'

যুবতী দূরের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, 'তারা মাঠে গেছে, সারা রাত ধান পাহারা দেবে। মাঠে ধান পেকেছে, পাহারা না দিলে চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে।'

সুরনাথ কণ্ঠের মধ্যে একটা সংকোচন অনুভব করিলেন, বলিলেন, 'তা—যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই থাকব।'

যুবতী দশনচ্ছটা বিকীর্ণ কবিল হাসিল, প্রায়ান্ধকাবে তাহার হাসিটা তড়িদ্দীপালির মত ঝলকিয়া উঠিল। সে বলিল, 'তোমার গাড়ি দাওয়ায় তুলে রাখো। আমি আসছি।'

যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল, একটি মাদুর আনিয়া দাওয়ার একপাশে পাতিয়া দিল। এক ঘটি জল ও গামছা খুঁটির পাশে রাখিয়া বলিল, 'হাত মুখ ধোও। চা খাবে তো? আমি এখনি তৈবি করে আনছি।'

যুবতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। সুরনাথ হাত মুখ ধুইয়া মাদুরে বসিলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। আলোর পীতবর্ণ ধারা দাওয়ার উপর আসিয়া পড়িল।

বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। চরাচর গ্রাস করিয়া লইয়াছে। সুরনাথ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মানসিক অবস্থার বর্ণনা অনাবশ্যক। ব্যাধ শরাহত মৃগ, বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মানসিক অবস্থা কে কবে বিবৃত করিয়াছে!

'এই নাও, চা এনেছি!' চা দিতে গিয়া আঙুলে আঙুলে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হইল—'আমি রান্না করতে চললুম।'

সুরনাথ ক্ষীণস্বরে আপত্তি তুলিলেন, 'আমার জন্যে আবার রান্না কেন? ঘরে মুড়ি মুড়কি যদি কিছু থাকে, তাই খেয়ে শুয়ে থাকব।'

'ওমা মুড়ি মুড়কি খেয়ে কি শীতের রাত কাটে! রাতে উপোসী হাতী টলে। তোমাব অত লজ্জায় কাজ নেই, এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে।'

যুবতী চলিয়া গেল। সুরনাথ চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন। পিতলের বাটিতে গুড়ের চা, কিন্তু খুব গরম। তাহাই ছোট ছোট চুমুক দিয়া পান করিতে করিতে তাঁহার শরীর বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সুরনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কুটিরের মধ্যে দুটি ঘর, একটি রান্না ঘর, অপরটি বোধ হয়

শয়ন কক্ষ। তিনি অনুমান করিলেন দাওয়ায় মাদুরের উপর তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইবে। সেই ভালো হইবে। কোনমতে রাত কাটাইয়া ভোর হইতে না হইতে তিনি চলিয়া যাইবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে যুবতী দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'ভাত বেড়েছি, খাবে এস।'

সুরনাথ উঠিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাইরের ঠাণ্ডার তুলনায় ঘরটি বেশ উত্তপ্ত। পিঁড়ের সামনে ভাতের থালা, প্রদীপটি কাছে রাখা হইয়াছে। আয়োজন সামান্যই, ভাত ডাল এবং একটা চচ্চড়ি জাতীয় তরকারী।

সুরনাথ আহারে বসিলেন। যুবতী অতি সাধারণ গৃহস্থালির কথা বলিতে বলিতে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরনাথ লক্ষ্য করিলেন, রান্না করিতে করিতে যুবতী কখন পায়ে আলতা পরিয়াছে।

যুবতী সুরনাথের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিতেছে, অথচ তিনি হুঁ হাঁ ছাড়া কিছুই বলিতেছেন না। বিপদের সময় যে ডাকিয়া ঘরে আশ্রয় দিয়াছে, তাহার অন্তত একটু মিষ্টলাভ করিবার প্রয়োজন আছে। তিনি শামুকের মত খোলের ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, 'তোমার নাম কি?'

এক ঝলক হাসিয়া যুবতী বলিল, 'কামিনী'।

নামটা তপ্ত লোহার মত সুরনাথের গায়ে ছ্যাঁক করিয়া লাগিল। তিনি শামুকের মত আবার খোলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আহারান্তে সুরনাথ হাত মুখ ধুইলে কামিনী বলিল, 'পাশের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছি, শুয়ে পড় গিয়ে।'

সুরনাথের বুক ধড়াস করিয়া উঠিল। তিনি তোতলা হইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি—আমি বাইরে মাদুরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব।'

কামিনী গালে হাত দিয়া বলিল, 'ওমা, বাইরে শোবে কি। শীতে ক্যালিয়ে যাবে যে! যাও, বিছানায় শোও গিয়ে।'

সুরনাথ কথা কাটাকাটি করিলেন না, কামিনী রাত্রে কোথায় শুইবে প্রশ্ন করিলেন না, দণ্ডাজ্ঞাবাহী আসামীর মত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। মেঝের উপর খড় পাতিয়া তাহার উপর তোশক বিছাইয়া শয্যা। সুরনাথ সুটকেস আনিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিলেন, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াই শয়ন করিলেন!

চোখ বুজিয়া তিনি পাশের ঘরে খুট-খাট ঠুন্-ঠান বাসনকোশনের শব্দ শুনিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনের উত্তাপ একটি নিঃশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল।

চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ চট্‌কা ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন, কামিনী নিঃশব্দে কখন তাঁহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়াছে; তাহার মুখে বিচিত্র হিংস্র মধুর হাসি।

তিন দিন পর্যন্ত সুরনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন না তখন পোষ্টমাস্টারবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কেবল সুরনাথবাবুর জন্য নয়, সেই সঙ্গে পোষ্ট অফিসের সম্পত্তি সাইকেলটিও গিয়াছে। পোষ্টমাস্টার পুলিশে খবর দিলেন।

পুলিশ খোঁজ লইল। সুরনাথের যে তিনটি পোষ্ট অফিসে যাইবার কথা সেখানে তিনি যান নাই। পুলিশ তখন রীতিমত তদন্ত আরম্ভ করিল।

সাতদিন পরে সুরনাথকে পাওয়া গেল। বাঁ-হাতি রাস্তায় একটিও কুটির নাই, সেই রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সাইকেলটা অনতিদূরে মাটিতে লুটাইতেছে। তাহার পশ্চাতে সুরনাথের সুটকেস রহিয়াছে, সুটকেসের মধ্যে কাপড়-চোপড় সাবান মাজন বুরুশ সমস্তই মজুত আছে! কিছু খোয়া যায় নাই।

সুরনাথের দেহে কোথাও আঘাতচিহ্ন নাই। কিন্তু দেহটি প্রাচীন মিশরীর 'মমির' মত শুষ্ক ও অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, যেন রক্ত-চোষা বাদুড় দেহটা শুষিয়া লইয়াছে।

পুলিশ হাসপাতালে লাশ চালান দিল। পোষ্টমাস্টার যখন সুরনাথের মৃত্যু-বিবরণ শুনিলেন তখন তিনি আক্ষেপে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা! ডাইনীর হানে পড়েছিলেন! কামিনী ডাইনি এখনো তল্লাটে আছে, মায়া বিস্তার করে বেচারিকে টেনে নিয়েছিল। আমি ইন্সপেক্টরবাবুকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, বাঁ-হাতি রাস্তা ভালো নয়। কিন্তু উনি শুনলেন না।'

* * * *

মৃত্যুভয়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছেলের জন্য স্বামী-স্ত্রী—দু-জনেই একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল।

যাই হোক, ভগবান মুখরক্ষা করিয়াছেন।

হইল না হইল না করিয়া শেষ-বয়সে সুরুচির একটি ছেলে হইয়াছে। এবং ওই পড়ন্ত বয়সে হইয়াছে বলিয়াই ছেলেটি বোধকরি দেখিতে অতি চমৎকার।

ছেলের নাম-করণের সে কী ঘটা!

হরিচরণ বলে, 'নাম রাখ কন্দর্প।'

সুরুচি হাসিয়া হাসিয়া তলিয়া পড়ে। বলে, 'দূর দূর! ওই কি আবার নাম হলো নাকি? লোকে কেঁদো কেঁদো বলে' ডাকবে। ছি!'

'তবে—?'

'কি নাম রাখা যায় বল ত?'

হরিচরণও ভাবে। সুরুচিও ভাবে। ভাবিয়া ভাবিয়া হয়রান। নাম আর কাহারও পছন্দ হয় না। শেষে নাম একটা হইল বটে, কিন্তু সন্তুষ্ট তাহারা তাহাতেও হইল না।

সুরুচি বলিল, 'পরে আবার পালটে দিলেই চলবে।'

নাম হইল—সুন্দর।

তা মন্দ হয় নাই।

সুন্দর তাহাকে বলা চলে।—যেমন রূপ তার তেমনি গড়ন। অমন ছেলে সচরাচর চোখে পড়ে না। সাদা ধপধপে গায়ের রং, কালো কোঁকড়ানো মাথার চুল, ডাগর-ডাগর চোখ,—মুখখানি দেখিলেই ভালোবাসিতে ইচ্ছা করে।

*　　　*　　　*

হরিচরণ সুরুচি ও সুন্দর। এই তিনটি প্রাণীর ছোটোখাটো সংসার! রাস্তার ধারেই রেলিং-দেওয়া ছোট্ট বাড়িখানি। উপরের তিন-চারখানি ঘরই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। নীচের ঘরগুলি ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। ছেলে যখন হয় নাই সুরুচি তখন তাহার ছেলের সাধ মিটাইবার জন্য একটি চন্দনা পাখি কিনিয়াছিল। দূর হইতে দেখা যায় পাখিটি এখনও রেলিং-এর উপর ঝুলানো থাকে। সে এখন সুন্দরের খেলার সাথী।

সুন্দরকে কোলে লইয়া সুরুচি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়। পাখির সঙ্গে ছেলের ভাব করিয়া দেয়।

পাখি বলে, 'খোকা।'

খোকা বলে, 'চন্ননা।'

সুরুচি হাত তুলিয়া পাখিটাকে শাসন করে। বলে, 'খোকা বলবি ত' মেরে খুন করব তোকে। বল—সুন্দর!'

পাখিটা কান পাতিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া শোনে। সুন্দরের গায়ের উপর ঠোঁট বুলাইতে থাকে। কিন্তু 'সুন্দর' সে বলিতে পারে না।

হাত তুলিয়া সুন্দরও শাসন করে। বলে, 'মা-বো।'

এই 'মা-বো' কথাটির মধ্যে সুরুচি কী মাধুর্যের সন্ধান যে পায়—স্বামীকে ডাকিয়া বলে, 'শুনে যাও, ওগো শীগগির এসো।'

হরিচরণ ছুটিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

সুরুচি বলে, 'পাখিটাকে আর একবার শাসন কর ত-বাবা!'

সুন্দর শাসন আর করে না, চুপ করিয়া থাকে।

হাসি-হাসি মুখে সুরুচি তাহার স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া বলে, 'দূর দূর! এলে না এতক্ষণ। আর শুনতে পেলে না। শাসন করছিল পাখিটাকে।'

হরিচরণ বলে, 'ও যে ছেলে হবে, বড় হলে আমাদেরই শাসন না করলে হয়।'

সুরুচি বলে, 'হাঁ রে?'

খিল খিল করিয়া হাসিয়া খোকা তাহার কচি-কচি হাত দুইটি বাড়াইয়া বাবার কোলে গিয়া ওঠে।

হরিচরণ আদর করিয়া চুমা খাইয়া বলে, 'দুষ্টু ছেলে!'

.সুরুচি বলে, 'খবরদার, দুষ্টু বোলো না বলছি, ও-আমার লক্ষ্মী ছেলে। এসো ত বাবা!' বলিয়া মা তাহাকে বাবার কোল হইতে কাড়িয়া লয়।

এমনি করিয়া সুন্দরকে লইয়া এই দুই প্রৌঢ় দম্পতির দিন কাটিতে থাকে।

*   *   *

সুন্দর বড়ো হয়।

গত বৎসরের জামা এ-বৎসর আর গায়ে হয় না।

সুরুচি বলে, 'সুন্দরকে আমি ইস্কুলে দেবো না কিছুতেই। বুঝেছ?'

হরিচরণ হাসিয়া বলে, 'বাড়িতে বসিয়ে মুখখু করে রাখবার ইচ্ছে?'

'না গো না। অতক্ষণ ছেলেকে আমি না দেখে থাকতে পারব না। তা ছাড়া শুনেছি নাকি মাষ্টারগুলো ঠ্যাঙ্গায়।'

হরিচরণ বলে, 'বেশ ত, বাড়িতে মাষ্টার রেখে দেবো।'

সুরুচি বলে, 'সেই ভালো।—দ্যাখো, খোকার বৌ খোকাকে খুব ভালোবাসবে কিন্তু।'

হঠাৎ সে-কথার অর্থ হরিচরণ বুঝতে পারে না। বলে, 'কেন?'

'এই দ্যাখো না। এরই মধ্যে খোকার নাক ঘামছে।'

সুরুচি বলে, 'দ্যাখো, এমন বৌ আনতে হবে, যে-বৌ হবে দেশের সেরা। খুঁজে খুঁজে যেখান থেকে পাও। পয়সা-কড়ি নেবো না বরং তাও ভালো।'

হরিচরণ রসিকতা করিয়া বলে, 'তা হলে খুঁজতে বেরোই এখন থেকে। না, কি বল?'

সুরুচি হাসিয়া বলে, 'হ্যাঁ বেরোও। কেন, এমন ত কত হয়। ছেলে হবার আগেই কতলোক কথা দিয়ে রাখে।'

হরিচরণ বলে, 'শেষে শাশুড়ী-বউ-এ বনি-বনাও না হয় যদি?'

সুরুচি বলে, 'বটে! আমি কি তেমনি শাশুড়ী নাকি? ঝগড়া করব?—হ্যাঁরে খোকা, বউ তোর আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে?'

খোকার অতসব বুঝিবার মত বয়স তখনও হয় নাই। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হ্যাঁ, কলবে।'

হরিচরণ হাসিয়া বলে, 'শুনলে?'

'ওরে দুষ্টু!' বলিয়া মা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলে, 'এখন থেকে তোমার এত বুদ্ধি। বল—করবে না।'

খোকা হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, 'না। কলবে না।'

*   *   *

খোকার একটুখানি অসুখ হইলে মার চোখে আর ঘুম থাকে না। কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দিয়া দিবারাত্রি সে তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া থাকে।

শহরে যেখানে যত ডাক্তার আছে, হরিচরণ সকলকেই একবার করিয়া ডাকিয়া আনে।

হোমিওপ্যাথি ছাড়িয়া এলোপ্যাথি হয়, আবার এলোপ্যাথি ছাড়িয়া কবিরাজী চলে।

একদিনের রোগ—ডাক্তার কবিরাজের কৃপায় দশদিনে ভালো হয়।

কোনও আব্দারই খোকার অপূর্ণ থাকে না।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে শহরের পথে ফিরিওয়ালা হয়ত 'বাসন' হাঁকিয়া যায়।

খোকা বলে 'খাব।'

সুরুচি বলে, 'কোথাকার হাবা ছেলে রে! বাসন বিক্রি করছে,—বাসন।'

খোকা ঝোঁক ধরিয়া বসে, 'বাসন নেবো।'

বাধ্য হইয়া সুরুচি বাসনওয়ালাকে ডাকিয়া খোকার জন্য ছোট ছোট রেকাবি কেনে, জল খাইবার জন্য ছোট একটি গ্লাস, ভাত খাইবার জন্য ছোট একটা থালা।

লোহার রেলিং-দেওয়া বারান্দা হইতে কোনো ফেরিওয়ালাই খোকার চোখ এড়াইতে পারে না। কাজেই দিনের মধ্যে কতবার কত জিনিস সে সুরুচিকে কিনিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

জিনিসে জিনিসে ঘর একেবারে বোঝাই হইয়া উঠিয়াছে।

কত রকমের কত খেলনা আসিয়াছে! কত রকমের কত পুতুল!

হরিচরণ খোকার জন্য সেদিন একটি দম দেওয়া টিনের রেলগাড়ী আনিয়া দিয়াছে। আর একটি দম দেওয়া মোটরকার।

সারা দুপুর কখনও বারান্দার উপর কখনও ঘরের মেঝেয় সর সর ঝড় ঝড় করিয়া খোকার রেলগাড়ী চলিতেছে, মোটরকার চলিতেছে।

খোকার হাস্য কলরবে মুখরিত সুরুচির গৃহস্থালীর শ্রী এখন অন্য রকমের।

*   *   *

সুন্দরের বয়স এখন পাঁচের উপর, কিন্তু তবু তাহার আব্দারের আর অন্ত নাই।

অদ্ভুত তাহার আব্দার।

সরস্বতী বিসর্জনের দিন ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আলো জ্বালাইয়া শোভাযাত্রা করিয়া প্রতিমা যাইতেছিল।

সুন্দর জেদ ধরিয়া বসিল—তাহার সরস্বতী চাই।

মা বলিল, 'দেবো।'

বাবা বলিল, 'কাল তোকে দেবো ওমনি একটা ঠাকুর কিনে।'

ঘাড় নাড়িয়া ছেলে বলিল, 'না। আমার এক্ষুণি চাই।'

এবং চাই ঠিক ওই ঠাকুরটিই। অন্য ঠাকুর হইলে চলিবে না।

চাঁদ-চাওয়া নীলমণি ছেলে!

বেচারা হরিচরণকে তৎক্ষণাৎ বাহির হইতে হইল ঠাকুরের সন্ধানে।

কিন্তু পটো-পাড়ায় সরস্বতী যাহারা গড়িয়াছিল, পূজার পর ঠাকুর তাহারা দিতে পারিল না।

কি যে করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া হরিচরণ বাড়ি ফিরিতেছিল। সুমুখে আর একটি প্রতিমার শোভাযাত্রা চলিতেছে।

একটা লোককে হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওইরকম ঠাকুর কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?'

লোকটা একটুখানি অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল।

হরিচরণ পাগল নয়।

হাসিয়া বলিল, 'ছেলেটা ঝোঁক ধরেছে—ঠাকুর চাই। অথচ পটো-পাড়ায় পেলাম না।'

লোকটি বলিল, 'আসুন আমার সঙ্গে। নদীর জলে বিসর্জন দেবার সময় মুণ্ডুটা আপনাকে ছাড়িয়ে দেবো।'

পূজা-করা প্রতিমার মুণ্ডু।

হরিচরণের বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তা হোক্‌, একেবারে না পাওয়ার চেয়ে ভালো। মাটির প্রতিমা, পূজার পর মন্ত্র পড়িয়া পুরোহিত উহাকে বিসর্জন দিয়াছে, এখনই উহাকে ঢেলার মতো ছুঁড়িয়া জলে ফেলিয়া দিবে। তাহাতে দোষ কি।

নিরুপায় হইয়া হরিচরণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দুই হাতে মাটির মুণ্ডুটি লইয়া হরিচরণ বাড়ি ফিরিল। খোকার খুশী যেন আর ধরে না। সুরুচি বলিল, 'ছি ছি, এ তুমি করলে কি গো। ওই পুজো-করা ঠাকুরের মুণ্ডু আনতে আছে?'

হরিচরণ বলিল, 'তা হোক। তাতে দোষ নেই। অনেককে আমি শুধিয়ে এনেছি।'

* * *

দিন-দুই পরে, সেদিন দুপুরবেলা—সুন্দর খেলা করিতেছে মাটির সেই মুণ্ডুটি লইয়া, সুরুচি পান সাজিতেছে, হরিচরণ ঘুমাইতেছে।

হঠাৎ চারদিক অন্ধকার করিয়া মেঘ করিয়া আসিল। মনে হইল বৃষ্টি নামিবে। বারান্দায় কাপড় শুকাইতেছে। সুরুচির হাত জোড়া, বলিল, 'যা বাবা খোকা, নিয়ে আয় তো কাপড়খানা তুলে।'

খোকা বলিল, 'আমি পারব না।'

সুরুচি বলিল, 'ভারি কথার অবাধ্য। যা বলব তাইতেই না। যা বলছি!'

খোকা তবু যায় না।

বসিয়াছিল হাতের কাছেই। রাগিয়া পিঠের উপর এক চড় মারিয়া বলিল, 'যা বলছি হতভাগা, কথা শোন!'

মার খাইয়া সুন্দর কাপড় তুলিতে গেল।

কিন্তু কাপড় তোলা তাহার হইল না। শহরে একটি সার্কাস পার্টি আসিয়াছে। ঘোড়ার গাড়ীর উপর ব্যাণ্ডের বাজনা বাজাইয়া বিজ্ঞাপনের কাগজ বিলি করিতে করিতে সার্কাসের একদল লোক তখন রাস্তা দিয়া পার হইতেছিল। তাহাই দেখিবার জন্য রেলিং-এর ধারে গিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকের আকাশ অন্ধকার করিয়া মাথার উপর তখন একটা ভীষণাকৃতি মেঘ উঠিয়াছে, আলো বন্ধ হইয়াছে, বাতাস বন্ধ হইয়াছে,—এবং সেই ঘন ঘোর মসীবর্ণ ছায়ান্ধকারের নীচে আলোহীন বায়ুহীন নিস্তব্ধ পৃথিবী যেন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আসন্ন প্রলয়ের ভয়ে জোড়হস্তে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

ব্যাণ্ডের বাজনা তখনও থামে নাই। তাহাদেরই বাড়ীর সুমুখের রাস্তা দিয়া বাজনা বাজাইয়া গাড়ীটা তখন ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে।

খোকা ছেলেমানুষ, নিতান্ত ছোট; এপার হইতে ভালো দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই সে

কাপড় তোলার কথা ভুলিয়া গিয়া রেলিং-এর ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়া দিয়া উপরে উঠিয়া, নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাসি হাসি মুখে সে একাগ্র দৃষ্টিতে সেইদিক পানে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে লাগিল. পাড়ার যত ছেলেমেয়ে গাড়ীটার পিছু-পিছু ছুটিয়া আসিতেছে, গাড়ীর ছাদের উপর বাজনা বাজিতেছে, ভিতর হইতে দুইটা লোক দু-দিকের দরজায় হাত বাড়াইয়া লাল নীল নানা রঙের কাগজ ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে, আর কোলাহল করিতে করিতে ছেলেগুলা মনের আনন্দে কেহ-বা সেগুলা হাতাহাতি করিয়া লুফিয়া লইতেছে, আবার কেহ কেহ বা হুমড়ি খাইয়া এ-উহার গায়ে পড়িয়া ঠেলাঠেলি করিয়া হট্টগোল বাধাইয়া তুলিতেছে।

ঘরের ভিতর হইতে মা ডাকিল, 'খোকা!'

'উঁ।'

'আয়!'

নীচের রাস্তায় হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠিল। ব্যাণ্ডের বাজনা সহসা থামিয়া গেল।

খোকার জবাবটা সেই গোলমালে শুনিতে না পাইয়া সুরুচি তাড়াতাড়ি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখে—

সর্ব্বনাশ!

খোকা নাই।

রেলিং-এর কাছে গিয়া নীচে রাস্তার উপর তাকাইয়া দেখে—মাগো! খোকা নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

সুরুচির সর্বশরীর হিম হইয়া গেল। হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া স্বামীর ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে সিঁড়ি ধরিয়া ছুটিয়া নীচে নামিতেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে পৌছিতে হইল না। নীচে নামিতে তখনও আর কয়েকটা ধাপ বাকি আছে, এমন সময় দেখিল, তাহারই অশ্রু-ভারাক্রান্ত অস্পষ্ট দৃষ্টির সম্মুখে তাহারই সেই পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক রক্তাক্ত কলেবর শিশুপুত্রটিকে কয়েকজনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তাহারই কাছে লইয়া আসিতেছে।

উন্মাদের মতো হরিচরণ 'ডাক্তার' 'ডাক্তার' বলিয়া নীচে নামিতেছিল।

জনতার মধ্য হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল,—'হয়ে গেছে।'

আর বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। কথাটা শুনিবামাত্র সিঁড়ি হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া সংজ্ঞাহীন সুরুচি একেবারে উঠানে আসিয়া পড়িল। হরিচরণ হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া চিৎকার করিয়া ঝাঁপাইয়া একেবারে লোকজনের মাঝখানে আসিয়া খোকাকে তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া, পাগলের মত উর্ধ্বশ্বাসে উঠানময় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘন ঘন খোকার রক্তমাখা বিকৃত বীভৎস মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া সে এমন অসহায়ভাবে হায় হায় করিয়া কাঁদিতে শুরু করিল যে তাহা দেখিয়া পাষাণও গলিয়া যায়।

নীচের ভাড়াটে বাড়ীর মেয়েরা তখন সুরুচিকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মূর্চ্ছা আর তাহার কিছুতেই ভাঙ্গে না। একবার যদিই-বা গোঁ গোঁ করিয়া জ্ঞান হয়, তৎক্ষণাৎ আবার খোকা খোকা বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

* * *

মাঝ-দরিয়ায় নৌকাডুবি হইলে যেমন হয়, ইহাদেরও ঠিক তেমনি হইয়া গেল।

* * *

স্বামী-স্ত্রী—আবার তাহারা উঠিয়াও বসে, আবার তাহারা আহারাদি করিয়া চলিয়া ফিরিয়াও বেড়ায়। দিব্য সহজ মানুষের মতোই আবার তাহাদের কথা কহিতে হয়।

স্ত্রী একদিন বলিল যে, ওই সরস্বতীর মুণ্ডুটাই হইল কাল!

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'বলেছিলাম না, পুজো করা পিতিমের মাথা, ঘরে আনলে অমঙ্গল ঘটে।—দিই এটাকে ফেলে।'

বলিয়া সেই মাটির মাথাটাকে সুরুচি সেদিন ফেলিয়া দিতে যাইতেছিল, হরিচরণ নিষেধ করিল। বলিল, 'না থাক। করুক অমঙ্গল। আর ও আমাদের কি করবে শুনি?'

মুণ্ডুটা তাকের উপর যেখানে রাখা ছিল সেইখানেই রহিল।

* * *

বাঁচিয়া থাকিয়া তাহাদের আর সুখ নাই।

এবার যেন তাহারা মরিতে পারিলেই বাঁচে।

খোকাই যখন চলিয়া গিয়াছে তখন আর এ পৃথিবীতে তাহাদের আছে কি।

হরিচরণ বলে, 'দূর ছাই। এই ত জীবন। আজ আছি কাল নেই। এসো মরি আমরা দু-জনে।'

মৃত্যুর নামে সুরুচি উল্লসিত হইয়া ওঠে।

বলে, 'কেমন করে' মরি বল ত?'

'দু-জনে একসঙ্গে বিষ খাই এসো, পাশাপাশি শুয়ে থাকি।'

সুরুচি বলে, 'সেই ভালো। বাড়ি-ঘর-দোর যাকে খুশী দান করে দিয়ে যাই। মিছে নয়—বল তুমি বিষ আনবে?'

হরিচরণ বলে, 'হ্যাঁ, দেখি চেষ্টা করে'—লুকিয়ে আনতে হবে। খুব সহজে যাতে মৃত্যু হয়। শেষ —না পাওয়া ত... আফিম।'

* * *

হরিচরণ গোপনে বিষ আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিষ পাওয়া বড়ো সহজ কথা নয়।

এদিকে সুরুচি তাহার চক্ষের মণি বক্ষের মাণিক হারাইয়া ঠিক পাগলের মতো হইয়া উঠিয়াছে। বাঁচিবার সাধ তাহার আর নাই। যে পৃথিবী, খোকা বাঁচিয়া থাকিতে আলোকে আনন্দে হাসিতে গানে বিপুল সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হইত, আজ তাহাই তাহার কাছে শুধু মিথ্যা, শুধু মরীচিকা দিয়া গড়া বলিয়া মনে হয়। আশার এতটুকু ইঙ্গিতের চিহ্ন কোথাও নাই, বিধাতা নাই, স্রষ্টা নাই, নিবিড় তমসাচ্ছন্ন দুঃখে-দুর্ভোগ ছাড়া কোথাও কিছু নাই। এবং সেই দুঃখ-দুর্ভোগের চিরান্ধকার রাত্রির মাঝে যে বহ্নি সহসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, নির্বোধ নরনারী তাহাকেই ভাবে বুঝি বিধাতার আশীর্বাদ। অসহায় মানব তাহাতেই পুলকিত হয়, আশায় বুক বাঁধিয়া বৃথাই বাঁচিয়া থাকে। সীমাহীন আশাহীন মৌন মূক স্তব্ধতার মধ্যে তাপদগ্ধ মরুবালুকার মাঝখানে পথভ্রান্ত পথিকের চোখের সুমুখে মায়া-মরীচিকার মতো সে আলেয়ার বহ্নিশিখা যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, আবার তেমনি নিঃশব্দেই নিবিয়া যায়। চিরনিষ্ঠুর চিরনির্বাক যে বিধাতা তাহাকে এমনি করিয়া পরিহাস করিয়াছে, যে তাহাকে দুঃখ দিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহাকে সে আনন্দ হইতে সে বঞ্চিত করিবেই।—সে মরিবে।

* * *

সুরুচি বারান্দায় গিয়া দাঁড়ায়। লোহার রেলিং-এ ভর দিয়া নীচের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া

থাকে। চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ তাহার সেই অঞ্চলের নিধি চঞ্চল বালকের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে, এইখান হইতে এমনি করিয়াই সে পড়িয়া মরিয়াছে। যাইতে সে চায় নাই। সে-ই তাহাকে জোর করিয়া কাপড় তুলিতে পাঠাইয়াছিল, সে নিজেই তাহাকে হত্যা করিয়াছে। ভাবিতে গেলে তাহার আর জ্ঞান থাকে না, বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে থাকে, রেলিং পার হইয়া নিজেও সে সেইখানে পড়িয়া মরিতে চায়। কিন্তু ভয় হয়—কচি ছেলে—সামান্য আঘাতও তাহার সহ্য হয় নাই, তাই মরিয়াছে। কিন্তু সে নিজে যদি না মরে। যদি পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকে...

স্বামীকে তাই সে বারে বারে জিজ্ঞাসা করে—'এনেছ?'

হরিচরণ কথাটা হঠাৎ বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকে, তাহার পর খোকার সেই কচি মুখখানি মনে পড়িতেই নিজেও সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে,—আজ সে আনিবেই। যেমন করিয়া হোক, যেখানে হোক—মৃত্যুর অমৃত সে সংগ্রহ করিবেই।

* * *

পাড়ায় হঠাৎ বসন্ত দেখা দিয়াছে। শীত কাল।

হরিচরণ সেদিন বাড়ি ফিরিল গায়ে সামান্য জ্বর লইয়া। মাথাটা ধরিয়াছে, গায়ে হাতে বেদনা, সামান্য সর্দি। হয়ত বা ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।

আসিয়াই শুইয়া পড়িল। সুরুচিকে বলিল, শোনো।

কি।

তেল একটুখানি গরম করে আনো ত।

কেন? তেল কি হবে।

'আছে কাজ।'

সুরুচি তেল আনিতে গেল!

ফিরিয়া আসিয়া ছোটো একটি বাটির সন্ধানে তাকের উপর নজর পড়িতেই দেখিল, সরস্বতীর সেই মাটির মুণ্ডুটি নাই।

'কোথায় গেল সেটা?' বলিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,--

'হ্যাঁগা, জানো তুমি?'

হরিচরণ সাড়া দিল না।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি?'

'সেই যে মুণ্ডুটা ছিল এইখানে।'

'জানি না।' বলিয়া হরিচরণ পাশ ফিরিয়া শুইল।

সুরুচি জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ, কি করতে হবে বল ত?'

পা দুইটা বাড়াইয়া দিয়া হরিচরণ বলিল, 'পায়ের তলায় বেশ ভালো করে' মালিশ করে দাও দেখি। কেমন যেন সর্দি সর্দি বোধ হচ্ছে, শরীরটা ভালো নেই আজ।'

স্বামীর পায়ে তেল মালিশ করিতে বসিয়াও সুরুচি সেই মুণ্ডুটার কথা ভুলিতে পারিল না। বলিল, 'বাঃ এ ত বেশ ভৌতিক কাণ্ড দেখছি। বাড়ি থেকে জিনিস উড়ে গেল?

'না না, উড়ে আবার যায় নাকি?' নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে হরিচরণ বলিল, 'সে আমি ফেলে দিয়েছি।'

বলিয়া চোখ বুজিয়া হরিচরণ বোধকরি বসন্তের ভয়েই ডান হাত দিয়া নিজের গায়ের উত্তাপ নিজেই অনুভব করিতে লাগিল।

মহাপুরুষের সিদ্ধিলাভ

শিবরাম চক্রবর্তী

সেবার গ্রীষ্মকালটা যেন একমাস আগেই এসে পড়েছিল। দারুণ গরমে আম-কাঁঠাল সব আগাম পেকে উঠল। কিন্তু সামার ভ্যাকেশানের তখনো ঢের দেরি। বোর্ডিং-এ আমাদের মন তো আর টেকে না! ছুটিটা এসে পড়লে হয়, বাড়ি গিয়ে বাঁচি!

আমরা সত্তর আশিজন ছেলে সুদূরবর্তী পাড়াগাঁর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জেলার স্কুলে পড়তে এসেছি, বাধ্য হয়ে বোর্ডিং-এ থাকি। বাধ্য হয়ে থাকা ছাড়া আর কি বলব, যা খাওয়া-দাওয়ার ছিরি —রেঙ্গুন চালের ভাত, লাল রঙের এমন হৃষ্টপুষ্ট ভাত তোমাদের অনেকে চোখেও দেখনি; তার সঙ্গে জলবত্তরলং ডাল আর এই একটুকরো একটুখানি মাছ,— ঝোলের বর্ণনা না-ই দিলাম! উঠেই একবাটি মুড়ি আর এক টুকরো আম নিয়ে বসব; দুপুরে আবার দুধ দিয়ে ভাত দিয়ে আমের রস দিয়ে আরেক প্রস্থ হবে—ভাবতেও জিভে জল আসে!

আমাদের মধ্যে জগা-ই হচ্ছে মাতব্বর। সে বললে, আয়, হেডমাস্টারের কাছে ছুটির দরবার করিগে।

জগা মাতব্বর, কেন না সে সবার সেরা স্পোর্টস্‌ম্যান, ফুটবল ও ক্রিকেটে সমান চৌকস; হাই-জাম্প, লং-জাম্প ও বল থ্রোইং-এ তার জুড়ি নেই। তার প্রতি মাস্টারদের যেন একটু পক্ষপাত আছে, সে ফেল করলেও দেখি বারবার প্রোমোশন পেয়ে এসেছে; এখন ফার্স্ট ক্লাসে উঠে আর কিছুতেই টেস্ট-এ এলাউ হতে পারছে না। জগা বলে, জানিস, আমি পাস করে বেরিয়ে গেলে তোদের স্কুলের মুখ রাখবে কে? আর সব স্কুলের সঙ্গে কম্পিটিশন ম্যাচে তোরা কি আর জিততে পারবি, তাই আমাকে ফেল করিয়ে এমনি করে আটকে রাখছে।

আমরা তার কথা বিশ্বাস করতাম। স্বয়ং সে ছুটির দরবার করবে জেনে আশ্বস্ত হৃদয়ে আমরা সবাই তার পিছু পিছু গেলাম। হেডমাস্টার মশাই শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'কি? এখনো কোয়ার্টার্লি পরীক্ষা হয়নি, এখন ছুটি? যাও, যাও পড়গে মন দিয়ে।'

'বড্ড গরম পড়েছে স্যার—'

'গরম পড়বে না তো কি? শীতকালে বড্ড শীত পড়বে, গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গরম পড়বে, বর্ষাকালে ভারী বর্ষা হবে—এ তো জানা কথা। তাই বলে পড়াশুনা কে ছেড়ে দিয়েছে? জগা, তোমার বাড়ি কি দার্জিলিং যে বাড়ি যেতে চাইছ? সেখানে গরম পড়েনি? যাও যাও, পড়গে, সময় নষ্ট কোরো না।'

জগা বিফল হলো—এ রকম ঘটনা আমাদের বোর্ডিং-এর ইতিহাসে এর আগে ঘটেনি। ছুটি না পাওয়াতে আমাদের দুঃখ যত না হোক, জগার লজ্জা তার চারগুণ। কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলে সে নয়, বললে, 'ছুটি আদায় করি কি না, দ্যাখ তোরা!'

রোজ সন্ধ্যায়, ছেলেরা ফুটবল খেলে মাঠ থেকে ফিরলে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে রোল-কল হতো। তিনি নিজে সবার নাম ডাকতেন। সেদিন সন্ধ্যায় রোল-কলের সময় জগার সাড়া না পেয়ে তিনি ভারী চটে গেলেন; আমাকে ডেকে বললেন, 'শিবু, যা একটা বেত কেটে নিয়ে আয়!'

ব্যাপার যতদূর বোঝা গেল তা এই, ছেলেদের মধ্যে ছুটির হুজুগ তোলার জন্য সকাল থেকেই হেডমাস্টার মশাই জগার উপরে চটেছিলেন, তারপরে সে আজ স্কুল কামাই করেছে, অথচ দুপুরে হোস্টেলেও ছিল না। এখন রোল-কলের সময়েও তার পাত্তা নেইকো। আমি বেত নিয়ে হাজির হতেই, তাঁর হুকুম হলো—'যা, জগাকে ধরে নিয়ে আয়!'

আমি ধরে আনব—জগাকে? চটেছেন বলে কি স্যারের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? যে-জগা ব্যাকে খেললে অন্য দলের ফরোয়ার্ডদের দুর্বিপাক, আর ফরোয়ার্ডে খেললে বিপক্ষের ব্যাকের এবং গোলকির দফারফা, তাকে ধরে আনব কি না আমি! আর কিছু না, হাত যদি সে না-ও চালায়, কেবল যদি হাই-জাম্প আর লং-জাম্পের সাহায্য নেয়, তাহলে তো ঝোপ-ঝাড়, খাল বিল ডিঙিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পগার পার। বিলকুল আমার নাগালের বাইরে!

কিন্তু দরকার হলো না, পর মুহূর্তেই শ্রীমান জগার সাড়া পাওয়া গেল। তাকে দেখে হেডমাস্টার মশাই গর্জন করলেন—'এগিয়ে এস—' বলে টেবিলের উপর সপাৎ করে বেতটা ঝাড়লেন একবার। যেন ওটাকে রিহার্সাল দিয়ে নিলেন।

এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল, হেডমাস্টার মশাই যেখানে বেত ঝাড়লেন ঠিক তারই উপরে সহসা কড়িকাঠ থেকে সশব্দে একটা চাপড়া খসে পড়ল। একাশি-জোড়া বিস্ফারিত চোখ মেলে আমরা দেখলাম তা বালির চাপড়াও নয়, টালির টুকরোও না—আস্ত একটা মড়ার মাথার খুলি।

হেডমাস্টার মশায়ের হাত থেকে বেত খসে পড়ল; আমাদের মধ্যে কয়েকজন ভয়ে চিৎকার করে উঠল—তারপর সব নিস্তব্ধ। কারো যেন নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না।

হেডপণ্ডিতমশাই প্রথম কথা কইলেন—'আজ তিথিটা কি হে? ত্রয়োদশী—কই তিথি দোষ তো নেই। তবে বেস্পতিবারের বারবেলা বটে। দাও তো হে মাথার খুলিটা, ওটা আমার কাজে লাগবে।'

স্কালটা হাতে নিয়ে, গম্ভীরভাবে তিনি বেরিয়ে গেলেন। হেডপণ্ডিতমশাই তান্ত্রিক মানুষ, কালী-সাধনা করেন। অমাবস্যা চতুর্দশীর গভীর রাত্রে শ্মশানে তাঁর গতিবিধি আছে বলে কানাঘুষা। কে জানে, খুলিটা তিনি কোন্ কাজে লাগাবেন!

ততক্ষণে হেডমাস্টারমশাই সামলে উঠেছেন, কম্পিত কণ্ঠের ভেতর থেকে তাঁর বাণী শোনা গেল—'যাও সব, পড়তে বসগে, হৈ চৈ কোরো না।'

বলা বাহুল্য, আমরা হৈ-চৈ করছিলাম না, তা করবার মতো উৎসাহ তখন আমাদের কারোর মধ্যেই ছিল না। নীরবে আমরা যে যার সিটে গিয়ে বই খুলে বসলাম; কিন্তু পড়ব কি, সবার বুকের মধ্যে কি রকম যেন কাঁপুনি ধরে গেছে। দুরু দুরু বুকে যেদিকে তাকাই সেদিকেই কি যেন আবছায়া দেখি! এক নিমেষে এত লোকজনভরা অতবড় বোর্ডিং যেন একেবারে ভূতের রাজত্ব হয়ে উঠল।

সে-রাত্রে আর পড়াশুনা হল না; হেডমাস্টারমশায়ের হুকুমে তাড়াতাড়ি দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ছেলেরা সব শুয়ে পড়ল; আমি হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে থাকতাম, তিনি নিজের মশারি খাটানো সেরে আমার দিকে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে বললেন, 'আলোটা জ্বালা থাকলে কি তোমার ঘুমের খুব অসুবিধা হবে, শিবু?'

'না স্যার।'

'অন্ধকার ঘরে তুমি ভয় পেতে পারো কিনা, তাই বলছিলাম। নইলে আমার কোন দরকার নেই। নিভিয়ে দিই তাহলে, কেমন?'

'দিন তবে।'

কিন্তু জ্বালানো থাকলেই যেন ভালো ছিল। জমাট অন্ধকারের মধ্যে কাদের যেন ছায়ামূর্তি দেখতে লাগলাম। মনে হতে লাগল, এই বুঝি চৌকির তলা থেকে কে পা-টা টেনে ধরে। যতদূর গোটানো সম্ভব পা-দুটো গুটিয়ে নিয়েছি, হাতের তালু আর পায়ের চেটো প্রায় আমার একাকার এখন। এইভাবে একটু তন্দ্রা আসছিল যেন, হঠাৎ কখন চিৎকার করে উঠেছি। ঘরের অপর দিক থেকে হেডমাস্টার মশায়ের ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা গেল—'কি হল, কি হল শিবু?'

'কার যেন হাত ঠেকল আমার কপালে।'

'য়্যাঁ?'

খানিকক্ষণ উভয়ের আত্মসংবরণ করতে গেল। অবশেষে বুঝতে পেরে বললাম, আমারই নিজের হাত মাস্টারমশাই।

'তাই বলো! আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছে! তুমি যে রকম চেঁচিয়ে উঠেছিলে! কেবল ভয়ের কথা ভাবছ বুঝি তখন থেকে?'

'না স্যার।'

খানিক বাদে আমার হেডমাস্টারমশায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।—'শিবু কাগজের গাদাগুলো কে যেন হাঁটকাচ্ছে না?'

ভয়ে আমার গলা থেকে শব্দ বেরুল না।

'বোধ হয় ইঁদুর। কিছু ভেব না, ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়।'

ঘুমিয়ে পড়ব কি, খানিক বাদে যা কাণ্ড শুরু হলো, তাকে ভূতের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বাইরের উঠোনময় কারা যেন দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। কে যেন রান্নাঘরের কোণের ছাইগাদায় বসে গোঙাচ্ছে, আবার ঠিক আমাদের ঘরের বাইরের চটচট করে হাততালির আওয়াজ! কিছুক্ষণ বাদে আমাদের জানালার খড়খড়িগুলো যখন খুলতে আর বন্ধ হতে শুরু হলো হেডমাস্টারমশাই একলাফে আমার বিছানায় এসে বসলেন!

আমি এতক্ষণ মড়ার মতো পড়েছিলাম, স্যার আসতে সাহস হলো। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কি হবে শিবু?'

আমার ততক্ষণে সাহস অনেক বেড়েছে; এমন কি তখন আমার ভয় করতেই ভালো লাগছিল। বললাম, 'ভয় কি স্যার? ভয় কিসের?'

'না, না আমার আবার ভয় কি?' তোমার জন্যই ভাবছি—

'আপনি আমার কাছে বসে থাকুন, তাহলেই আমার ভয় করবে না।'

'সেই ভালো শিবু! রাত তো আর বেশি নেই, দুজনে বসে বসেই কাটিয়ে দিই।'

হেডমাস্টারমশাই কতক্ষণ বসেছিলেন জানি না আমি কিন্তু বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি সারা উঠানময় মড়ার হাড়গোড় ছড়ানো। কিন্তু সকালবেলায় হেডমাস্টারমশাইকে দেখে রাত্রের লোকটিকে আর চেনাই যায় না। তিনি ভয়ানক হাঁকডাক জুড়ে দিয়েছেন—এসব হচ্ছে দুষ্টু লোকের কাজ! ভূত আমি মানিনে। এক্ষুনি পুলিসে খবর দিচ্ছি; পুলিসের কাছে বাবা চালাকি নয়, সব ধরা পড়ে যাবে।

হেডপণ্ডিতমশাই বললেন, 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি? পুলিসে খবর দেবেন দিন, কিন্তু ভূত নেই এ কেমন কথা? ভূত অবশ্যই আছে তবে তাকে ভয় করবার কিছু নেই, একথা আপনি বলতে পারেন বটে।'

'যান যান, আপনি আর কথা বলবেন না। ফি অমাবস্যায় শ্মশানে গিয়ে কী যে করেন, আপনিই তো এসব উপদ্রব টেনে এনেছেন।'

অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে হেডমাস্টারমশাই, বোধ করি, থানাতে খবর দিতেই সবেগে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় আমাকে ডেকে বলে গেলেন, 'ঘরের কোণে যত সব পুরানো কাগজের জঞ্জাল জড়ো হয়ে আছে, সব সাফ করে কাগজওয়ালাদের বিক্রি করে দাওগে। নইলে ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে রাত্রে তো চোখ বুজবার জো নেই।'

কাগজের গাদা নাড়তে গিয়ে দেখি, কী সর্বনাশ! তার তলায় এত হাড়গোড় আর মড়ার মাথার খুলি, এসব কে জড়ো করল এখানে? আমি ভয়ে-বিস্ময়ে ভ্যাবাচাকা—এমন সময়ে জগা দৌড়তে দৌড়তে ঘরে ঢুকল এসে।

'খবরদার, কাগজের গাদায় হাত দিবিনে বলছি! ও বাবা, এর মধ্যেই আবিষ্কার করা হয়ে গেছে? যাক, কাউকে বলিসনি। বললে তোকে আস্ত রাখব না!'

'এ সব কি ব্যাপার, জগাদা?'

কাগজের গাদা আবার আগের মতো ঠিকঠাক করে রেখে আমার হাত ধরে জগা বলল, 'আয়, তোকে সব বলছি।'

তার সমস্ত কীর্তি-কাহিনী ব্যক্ত করে রুমালে বাঁধা একটা জিনিস আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এখন কথা শোন। এটা যেন দেখিসনে। হেডমাস্টারমশাই শুয়ে পড়লে আস্তে আস্তে তাঁর মশারির চালে এটা রেখে দিবি, রুমালটা খুলে নিবি অবশ্যি। পারবি তো? যদি পারিস, তাহলে কাল থেকে আমাদের ভ্যাকেশান—একেবারে অব্যর্থ।

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে আমি বললাম—খুব পারব।

সেদিন ভোররাতের দিকে হেডমাস্টারমশাই এক দারুণই চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর আর্তনাদে, আমার কেন, বোর্ডিং সুদ্ধ সবার ঘুম ভেঙে গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে আমাকে বললেন, 'শিবু, শিবু আলো জ্বাল—শিগ্‌গির ...... শিগ্‌গির।'

'কি হয়েছে স্যার?'

'বলছি, আলো জ্বাল আগে। মশারির মধ্যে কে যেন—'

'সে কি?'

'কার সঙ্গে যেন মাথা ঠুকে গেল—'

'মনের ভ্রম নয় তো স্যার? কালকের আমার মতন?'

'না—না। মাথাটা ফেটে যাবার জোগাড়—আর মনের ভ্রম! আলো জ্বাল, এঃ, কপালটা ফুলে উঠেছে একেবারে।'

আলো জ্বাললাম। ততক্ষণে ঘরের বাইরে বোর্ডিং-এর ছেলেরা, মাস্টাররা সবাই জড়ো হয়েছে। হেডপণ্ডিতমশাই পর্যন্ত খড়ম খটখট করে উপস্থিত। লণ্ঠন ধরে দেখা গেল মশারির চালে একটা আস্ত মড়ার মাথা!

হেডপণ্ডিত বললেন, 'ওমা! এ যে টাটকা দেখছি, মায় দাড়ি সমেত।'

একজনের ফাউন্টেন পেন হারাইয়াছে। কেহ সেই কলমটা পাইয়া থাকিলে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া মালিক নিজের নাম ও ঠিকানা বিজ্ঞাপিত করিয়াছে। লোকটা এখনো যুদ্ধপূর্ব জগতে বাস করিতেছে। কলম হারাইলে তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করাও পণ্ডশ্রম। তাহা ছাড়া সবাই বুঝিয়া লইবে লোকটার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। বেচারা নিজের হাতে নিজের বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছে। অতঃপর তাহার ঘর-বাড়ি, জমিজমা বেহাত হইলে বিস্মিত হইব না।

এটা আবার কি? খবরের কাগজের জমিতে লালে-কালোতে ডোরাকাটা মস্ত বিজ্ঞাপন। অন্যান্য ছোট-খাটো বিজ্ঞাপনের মধ্যে এ যেন একেবারে ডোরাকাটা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। আজ পোস্ট অফিসের নিকটবর্তী মাঠে বেলা দুই ঘটিকায় সহস্র সহস্র শ্রমিকের রুষ্ট হাতুড়ির আঘাতে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা হইবে। কলিকাতা হইতে বিখ্যাত শ্রমিক-শিল্পী, ধনিক-বিভীষণ বি-রক্ত নেতা....আসিবেন। আসুন, সকলে সমবেত হইয়া সাম্রাজ্যবাদের শেষ কৃত্য দেখিয়া নয়ন সার্থক করুন।" বাপ রে! এই বিজ্ঞাপনের পরেও কি আর সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়া থাকিতে পারে? কখনো তাহাকে চোখে দেখি নাই। আজ তাহাকে দেখিবার প্রথম ও শেষ সুযোগ। এমন সুযোগ ছাড়া চলে না। যাইব পোস্টাফিসের ময়দানে। বেলা দুইটা। আমার গাড়ির সময় পাঁচটা। তিন ঘণ্টার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের প্রাণ কি বহির্গত হইবে না—এত কি শক্ত তাহার প্রাণ, বিশেষ হাতুড়িটা যখন রুষ্ট!

॥ ২ ॥

এমন সময়ে স্টেশনে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কলিকাতার ট্রেন আসিতেছে। কোথা হইতে পাঁচ-সাত বছরের একদল ছেলে, ছোটখাটো একটি লজঞ্চুস ব্যাটালিয়ান প্ল্যাটফর্মে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে তাহাদের নিশান, সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম মুহূর্ত ঘোষণাকারী শ্লোগান লিখিত প্ল্যাকার্ড এবং একখানি লাল কাপড়ের উপরে অঙ্কিত এক জোড়া কাস্তে-হাতুড়ি রাধাকৃষ্ণের ভঙ্গীতে পরস্পরকে জড়াইয়া বিরাজমান। তাহারা তারস্বরে ধনিক সভ্যতার ধ্বংস ঘোষণা করিতে লাগিল। সামান্য কয়েকজন ছোট ছেলে কি এত চিৎকার করিতে পারে। বাঙালির ছেলে বটে। তাহাদের পিছনে জন-দুই বয়স্ক ছোকরা। একজনের হাতে একটি ফুলের মালা। বুঝিলাম ইহারা শ্রমিক-শিল্পী নেতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ট্রেন আসিয়া থামিল। গাড়ি হইতে কয়েকজন যাত্রী গুড়ের হাঁড়ি, ফুলকপি প্রভৃতি লইয়া নামিল। কিন্তু শ্রমিক-শিল্পী কোথায়? সকলে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িল। ট্রেন চলিয়া গেল। লজঞ্চুস ব্যাটালিয়ান পূর্বশিক্ষা মতো 'নেতার জয়' হাঁকিয়া চলিল। নেতা আসে নাই—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? বয়স্ক ছেলে কয়টি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া রহিল—এবং অবশেষে একান্তে সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি চিন্তা করিতে লাগিল। আমি দূরে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা ও দেয়ালের ঘড়িটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বয়স্ক ছেলে কয়টি আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—এবং একটা নমস্কারের অপভ্রংশের মতো করিয়া বলিল—স্যার, একটা কথা আছে।

আমি মুখ তুলিয়া তাকাইলাম।

একজন বলিল—স্যার, আপনি তো এখানকার লোক নন।

আমি বলিলাম—না।

অপর একজন বলিল—আপনাকে তো এখানে কেউ চেনে না।

আমি পুনরপি বলিলাম—না।

তখন সাহস পাইয়া পূর্বোক্ত বক্তা বলিল—স্যার, আমাদের ঠেকা কাজটা যদি চালিযে দেন।

—কি কাজ?

—কাজ এমন কিছু না। আমাদের সভায় গিয়ে একটা বক্তৃতা করবেন।

আমি বললাম—কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে ধ্বংস করতে হয় তা তো আমার জানা নেই।

তখন তাহারা সমস্বরে বলিল—কারই-বা জানা আছে? ওটা একটা সিম্বল ছাড়া কিছু নয়।

—কিন্তু আপনাদের লীডার এলেন না কেন?

একজন সলজ্জভাবে বলিল—আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসলে আর লীডার হবেন কেন?

—তিনি বোধহয় অন্য কোন সভায় গিয়েছেন।

—কিংবা খুব সম্ভবত কোথাও পিকনিক করিতে গিয়ে থাকবেন।

আমি বলিলাম—আমি তো লীডার নই।

সপ্রতিভভাবে একজন বলিল—সেইজন্যই তো আপনার কাছে এসেছি। লীডার হলে কি আপনাকে এত সহজে পেতাম।

—কিন্তু পুলিশ-টুলিশ?

সকলে সমস্বরে বলিল—আজ্ঞে না। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের অনুমতি আগে থেকেই নিয়েছি।

অপর একটি ছেলে চোখে কৌতুক-কণিকা বর্ষণ করিয়া বলিল—জানেন তো স্যার—দিস ইজ পলিটিক্স।

ঠিক জানতাম না। যাইহোক, আমার ট্রেনের এখনো অনেক দেরি। ছেলেদের হতাশ করিতে পারিলাম না। রাজি হইলাম। বিশেষ, আপসে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয় তাহা দেখিবার কৌতূহলও মনে ছিল

আমি রাজি হইবামাত্র সেই গাঁদাফুলের মালাটি একজন আমার গলায় পরাইয়া দিল, লজঞ্চুস ব্যাটালিয়ান—শ্লোগান হাঁকিয়া উঠিল। এইভাবে, অপ্রত্যাশিতভাবে নেতৃত্বের পথে প্রথম পদ-বিক্ষেপ করিলাম। লজঞ্চুস ব্যাটালিয়ান শ্লোগান হাঁকিতে হাঁকিতে চলিল। একটি ছেলের গলা চিরিয়া খানিকটা শ্লেষ্মার মতো পড়িল। আমি বলিলাম—তোমার কাশি হয়েছে, তুমি থামো। অপর একটি ছেলে বলিল- -ওটা কাশি নয় স্যার। ও এখনি দুধ খেয়ে এসেছে—তাই উঠল। দুধই বটে তবে তাহার বয়স বিবেচনা করিলে মাতৃদুগ্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়। আমি লীডার নই, কিন্তু তাহাদের অনেকবার দূর হইতে দেখিয়াছি, সেইভাবে, সেই চালে চলিতে চেষ্টা করতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজ্ঞাপনে ঘোষিত সেই পোস্টাফিসের মাঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই সেই জন্মস্থান, এই সেই নূতন পাণিপথের মাঠ, সেখানে সাম্রাজ্যবাদ ধসিয়া পড়িবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের উপকরণের অল্পতা দেখিয়া মনটা বড়ই দমিয়া গেল। খানকতক টুল ও চেয়ার, গোটা-দুই নিশান, আর পঁচিশ-ত্রিশজন মিশ্র বয়সের ও অমিশ্র শ্রেণীর লোক। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়। হৃদয়ে আশা অপরিমিত থাকিলে উপকরণের অল্পতা চোখেই পড়ে না। গ্যালিলিও মাত্র দুইখণ্ড চশমার কাঁচের সাহায্যে নতুন জ্যোতিষ্ক-জগৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

আমি একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট হইলে একটি বয়স্ক ছেলে আরম্ভ করিল—কমরেডগণ—(বাকি অংশের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পত্রান্তরে নিত্য প্রকাশিত হইতেছে।) বক্তৃতা করিতে করিতে হঠাৎ সে স্বর নীচু করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, স্যার, আপনার নামটা?

কারো মুখ থেকে একটা শব্দ বেরুল না; তিনিই মাথা নেড়ে আবার বললেন, 'হুঁ তা তো হবেই, কাল চতুর্দশী ছিল যে! আজ অমাবস্যা আছে আবার!'

চতুর্দশীতেই এই মাথা-ঠোকাঠুকি ব্যাপার, অমাবস্যাতে না জানি কি কাণ্ড হয়! ভাবতেই সবার হৃৎকম্প হলো।

হেডপণ্ডিতমশাই বললেন, 'একে শনিবার, তায় অমাবস্যা! আজ একটা গুরুতর কথা বটে!'

ছোট ছেলেদের মধ্যে অনেকে কেঁদে ফেলল, দু-একজনের মূর্ছার উপক্রম হলো। জগা মুখখানা অতিমাত্রায় কাঁচুমাচু করে বলল, 'স্যার, আমাদের ছুটি দিয়ে দিন, আমরা বাড়ি চলে যাই, নইলে এখানে থাকলে আমরা বাঁচব না!'

হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের ছুটি। আজ সকালেই যে যার বাড়ি চলে যাও। আমিও সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরি। চতুর্দশীতে মাথা ঠুকে ছেড়ে দিয়েছে, আমাবস্যায় যদি ঘাড় ধরে মটকে দেয়! কাজ নেই!'

হেডপণ্ডিতমশাই বললেন, 'ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি! কোনো মহাপুরুষ তান্ত্রিক যোগী সন্নিকটে কোথাও সাধনা করছেন, এই ভৌতিক উপদ্রব তাঁর সিদ্ধিলাভের অনুষ্ঠান—তাছাড়া আর কিছু না। এতে ভয় পাবার কিছু নেই।'

জগা বললে, 'আমারও তাই মনে হয় পণ্ডিতমশাই। কোনো মহাপুরুষ কার্যসিদ্ধির জন্য—'

পণ্ডিতমশাই তার সায়-দেওয়াকে ঠাট্টা মনে করে বললেন, 'হ্যাঁ, তুই তো সব জানিস। তুই থাম!'

প্রমথনাথ বিশী

বনগাঁ স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছি। বেলা পাঁচটার ট্রেনে আমার এক বন্ধু আসিবে, তাহারই জন্য এই প্রতীক্ষা। এখন কেবল বেলা এগারটা। সমস্তটা দুপুর এবং বিকালের অর্ধেকটা এখনো সম্মুখে পড়িয়া—আর সম্মুখে পড়িয়া দক্ষিণ বাঙলার একটি ক্ষুদ্র রেলস্টেশনের অসহনীয় পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে স্টেশনটিতে যাহা দেখিবার সমস্তই একাধিকবার দেখিয়া লইয়াছি। দুইটি চায়ের স্টল আছে, দুইটিতেই একাধিকবার চা-পান করিয়াছি। প্রত্যেক পানওয়ালার নিকট হইতে এক-এক খিলি পান খাইয়াছি। যাত্রীদের সুখ-দুঃখের বিশ্রম্ভালাপ উপচাইয়া আসিয়া কানে প্রবেশ করিয়াছে—তাহাতে বুঝিয়াছি তেল, চিনি, গুড়, চাউল, আটা সমস্তই দুষ্প্রাপ্য।

একজন বলিল—এই দেখো না কেন বেগুন। এখান থেকেই চালান যায়, অথচ কলকাতায় গিয়ে কেনো তিন আনা সের, এখানে পাঁচ আনার কমে পাও তো কি বলেছি!

তাহার শ্রোতা বলিল—কলকাতার সুখ-সুবিধাই আলাদা!

তাই কি! তবে আমি কলকাতার লোক হইয়া এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া আছি কেন?

ছেলেদের তিন-চারটি ক্ষুদ্র দল খাতা-পেন্সিল লইয়া আসন্ন সরস্বতী পূজার চাঁদা আদায় করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে আসিয়া ধরিল। এখানকার লোক নই বলিয়া এড়াইয়া গেলাম। একটি বালক বলিল, তাতে ক্ষতি কি স্যার? সরস্বতী তো সব জায়গারই। সরস্বতীর এমন বরপুত্রকে নিরাশ করা চলে না। কিছু দিতে হইল। তবে বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম যে, অন্য দলের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। তাহারা রাজি হইল। পাছে অপর দল আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে, একজন আমার সঙ্গে বডিগার্ড রূপে রহিয়া গেল। ছেলেটি বীরপুরুষ, কাহাকেও আমার কাছে ঘেঁষিতে দিল না। সাধে কি কার্তিককে সরস্বতীর ভ্রাতা বলা হইয়া থাকে!

উজান-ভাটির গাড়ি যাতায়াত করিতেছে। ধোঁয়া, শব্দ, গাড়ি, যাত্রীর ভিড় এবং কোলাহল; কুলি, টিকিট চেকার, নীল নিশান আবার ধোঁয়া ও শব্দ। গাড়ি চালিয়া যাওয়ার শূন্যতা। এই ছবির পর্যায় কিছুক্ষণ পরে পরেই।

চারিদিকের মাঠে শীতের মধ্যাহ্নর প্রকৃতির সৌন্দর্য অবশ্যই আছে—কিন্তু কয়েক পেয়ালা গৌড়ী চা মাত্র পান করিয়া এবং সারাদিনের অনাহার ও বিশ্রামাভাব সম্মুখে করিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিবার মতো মানসিক অবস্থা কাহার থাকে—অন্তত আমার তো নাই। তাহার চেয়ে স্টেশনের দেয়ালে সংলগ্ন মুদ্রিত ও হস্তলিখিত কাগজের বিজ্ঞাপনখণ্ডগুলি পড়িতেছি—আর অবাধ্য চক্ষু দুইটা ঘুরিয়া ফিরিয়া স্টেশনের কক্ষনিবাসিনী, মৃদুভাষিণী সেই তাহার দিকে গিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেকবার ভাবিয়াছি আর তাকাইব না, লাভ কি, কেবল মনঃকষ্ট ছাড়া আর কিছুই তো নয় কিন্তু অবোধ মন বোঝে না, অবাধ্য চক্ষু কথা শোনে না, ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই মুখ-চন্দ্রমার প্রতি ধাবিত হয়। কবিরা যে মুখ-চন্দ্রমা বলিয়াছেন, তাহা একেবারেই অতিশয়োক্তি নয়। চন্দ্রের 'গোলিমা', চন্দ্রের শুভ্রতা, চন্দ্রের সকলঙ্ক লাবণ্য সবই আছে—তবে মুখ-চন্দ্রমা নয় কেন? আবার লজ্জারও অভাব নাই, মৃদুভাষিণী, মৃদুগামিনী! মানে কক্ষের দেয়াল সংলগ্নিকা ঘটিকাটি! পাঠককে বোধ করি নিরাশ এবং পাঠিকাকে বোধ করি বিস্মিত করিলাম। কিন্তু আমিও কম নিরাশ হই নাই—এবং বিস্ময়ের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করিতে বসিয়াছি।

নামটা বলিলাম।

তখনই আবার সে আরম্ভ করিল—বিখ্যাত শ্রমিক-শিল্পী, প্রখ্যাত নেতা...... আজ এসেছেন। ইনি প্রায় সাতাশ বৎসর ধরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। ধনতন্ত্রের হাতে তিনি যে কত অত্যাচার সহ্য করেছেন—তা আপনারা সবাই জানেন। তারপরে সে আমার যে-সব গুণাবলী বলিয়া গেল তাহা এতাবৎ আমারও অজ্ঞাত ছিল।

অতঃপর আমার বক্তৃতার পালা। কিছুক্ষণ আগেও জানিতাম না সাম্রাজ্যবাদ কেমনভাবে ধ্বংস করিতে হয়। কিন্তু এখন দেখিলাম এমন সহজ কাজ আর নাই। সবেগে বক্তৃতা করিয়া চলিলাম। যেখানে গভর্নমেন্ট ও পুলিশের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলাম, দেখিলাম ঠিক সেইখানেই জনতার (কতজন মিলিত হইলে হয়?) মধ্যে উপস্থিত একজন পুলিশ হাততালি দিয়া উঠিল। সাহস বাড়িয়া গেল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বহুপ্রকার কটুকাটব্য করিলাম। লোকটা ভালো করিয়া হাততালি দিবার উদ্দেশ্যে হাতের খৈনি মুখে ফেলিয়া দিয়া দুই হাত খোলসা করিয়া লইল। আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। এমন সময়ে একটি বয়স্ক ছেলে আমার কানের কাছে সভয়ে বলিল—স্যার, ও কথাগুলোর স্যাংশন নেওয়া হয়নি, ওসব নাই বললেন।

ইস, এখনি থামিব? সাম্রাজ্যবাদ কেবল অর্ধভগ্ন হইয়াছে—আর ঘা-দুয়েক দিলেই হয়। কিন্তু উদ্যোক্তাদের নির্বন্ধতিশয্যে সাম্রাজ্যবাদের সৌধকে পীশার 'লীনিং টাওয়ারের' মতো শূন্যে কাত করিয়া রাখিয়া বসিতে বাধ্য হইলাম। লজঞ্চুস ব্যাটালিয়ান সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ও আমার জয় হাঁকিয়া উঠিল।

সভা ভাঙিল। আমি বিদায় লইয়া স্টেশনে আসিলাম। প্রত্যাশিত ট্রেনে চড়িয়া কলিকাতা ফিরিলাম। আমার বক্তৃতার পূর্ণ রিপোর্ট দেওয়া বাহুল্য—কারণ পত্রান্তরের ঔদার্যে তাহা মোটা অক্ষরের হেড লাইনে এখন সর্বজনবিদিত।

এখন আমি একজন ষোলকলায় বিকশিত লীডার। বাম হাত তির্যকভাবে কোমরে রাখিয়া, রক্তশোষণকারী ধনিক সম্প্রদায়ের অদৃশ্য নাসিকার অভিমুখে দক্ষিণ হস্তের উদ্যতমুষ্টি আমার ছবি কে না দেখিয়াছে? দূর ও নিকট বহু স্থান হইতে বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ আমার আসে। কোথাও যাইতে অস্বীকার করিলে পরিচিতেরা অনুযোগ করিয়া বলে—কোন্ বনগাঁর সভায় যেতে পারো—আর এখানে পারো না? এখানে যে 'শ্রমিকের রক্তে হোলিখেলা চলছে।' যাইতেই হয়—কারণ হোলিখেলার অলঙ্কারটা আমার কারখানাতেই প্রস্তুত। এক-একদিন গভীর রাতে নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া ভাবি এই স্বরচিত ফাঁদ হইতে কি উপায় মুক্তি পাইব? হায়, কি কুক্ষণে বনগাঁয়ে গিয়াছিলাম। কিন্তু উপায় নাই—কর্মজাল হইতে এত সহজে নিষ্কৃতি কোথায়? মুড়ি ও নারিকেল খাইবার উপদেশ দিবার ফলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আর যেমন প্রকাশ্যে সন্দেশ খাইবার উপায় ছিল না—আমারও অনেক তেমনি ঘটিয়াছে।

এমন সময়ে 'নোয়াখালি' ঘটিল। ভাবিলাম বুঝি সেখানে যাইতে হয়। কিন্তু দেখিলাম ভয় অকারণ। আগে ঝামেলা কাটিয়া যাক। ব্যাপারটা যে সংখ্যালঘিষ্ঠের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠকে অপদস্থ ও বিব্রত করিবার জন্যই তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি পোড়াইয়া এই কাণ্ডটি করিয়াছে—এমন একটা 'থিওরি' খাড়া করিতে পারিলেই আবার আমি বক্তৃতা আরম্ভ করিব—আবার আমার ছবি প্রকাশিত হইবে—আবার হাততালি পাইব, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, এবার আর সামান্য পুলিশ নয়—অনেক উচ্চ হইতে হাততালি আসিবে। আমার হাতও শূন্য থাকিবে না।

নুরবানু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কুরমান হাটে কাচের চুড়ি কিনতে এসেছে।

মেজাজ খুব খারাপ। গা এখনো কশ-কশ করছে। তবু এ-দোকান থেকে ও-দোকানে সে ঘোরাঘুরি করে। সোনালী কিনবে না বেগুনী কিনবে চট করে ঠাওর করতে পারে না।

অন্যদিন হাটে এসে তামাক কিনতো, লঙ্কা-পেঁয়াজ কিনতো, তিত-পুঁটি বা ঘুসো চিংড়ি। আজ তাকে কাচের চুড়ি কিনতে হচ্ছে। কিনতে হচ্ছে চুলের ফিতে।

চুড়ির সোয়া তিন আঙুল জোখা। চুড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখে কুরমান। জোখা মেলে তো রঙ পছন্দ হয় না, রঙ মনে ধরে তো জোখায় গরমিল।

নুরবানুর কাচের চুড়ি সে আজ ভেঙে দিয়ে এসেছে। ফিতে ধরে টানতে গিয়ে খুলে দিয়েছে চুলের খোঁপা। চোট-জখম লেগেছে হয়তো এখানে-ওখানে।

জমি-জায়গা নেই, কর-কবুলত নেই, বর্ষায় চাষ করে কুরমান। তাও লাঙল কিনে আনতে হয় পরের থেকে। ধান যা-ও হয়েছিল গত সন, পাখিতে খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে ইঁদুরে। এ বছর গাছ হয়েছে তো শিষ হয়নি। ডোবা জমি, নোনা কাটে না ভালো করে। যা ধান হয়েছে দলামলা করে মনিবের খাস খামারে তুলে দিয়ে আসতে হবে। সে পাবে মোটে তিন ভাগের এক ভাগ।

বড়ো দুর্বল অবস্থা তাদের। না আছে থান না আছে থিত। তাই কুরমানের একার খাটনিতে চলে না। নুরবানুকেও কাজ করতে হয়।

নুরবানু মনিবের বাড়িতে ধান ভানে, পাট গুটোয়, কাঁথা-কাপড় কাচে, জল টানে। আর মনিব গিন্নীর খেজমত করে। চুল বাছে, গা খোঁটে, তেল মাখে। ভালোমন্দ খেতে পায় মাঝে-মাঝে। দরমা পায় চার টাকা।

কিন্তু শান্তি নেই। মনিব উকিলদ্দি দফাদার, নুরবানুকে অন্যায় চোখে দেখেছে।

প্রথম দিনেই নালিশ করেছিল নুরবানু : 'মুনিব আমাকে অন্যায় চোখে দেখে।'

'কেন কি করে?'

'খুক খুক করে কাশে, বাঁকা চোখে তাকায়, আমোদ-সামোদ করে কথা কয়।'

'তুই ওর ধারাধারি যাসনে কোনদিন।'

'না, আমি ঘোমটা টেনে চলে যাই দূর দিয়ে।'

কিন্তু দফাদার তাতে ক্ষান্ত হয়নি। একদিন নুরবানুর হাত চেপে ধরলো। সেদিনও কাঁদতে কাঁদতে নুরবানু বললে, হাত ছাড়িয়ে নেবার সময়ে খামচে দিয়েছে।

রাগে শরীরের রগগুলো টান হয়ে উঠলো কুরমানের। বললে, 'তুই সামনে গেছিলি কেন?'

'কে বললে? যাইনি তো সামনে।'

'সামনে যাসনি তো হাত চেপে ধরে কি করে?'

'আমি ছিলাম ঢেঁকি-ঘরে। ও ঘরে ঢুকে বললে, বীজ আছে ক-কাটি? আমি পালিয়ে যাচ্ছি পাছ-দুয়ার দিয়ে ও খপ করে আমার হাত চেপে ধরলো।'

তবু সেদিনও সে মারেনি নুরবানুকে। নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দিয়েছিল।

আশ্চর্য গরিবের বউ-এর কি একটু ছুরৎও থাকতে পারবে না? গরিব বলে স্ত্রীর বেলায়ও কি তাদের অনুভব আর উপভোগের মাত্রাটা নামিয়ে আনতে হবে।

'খবরদার, সামনে যাবি না ওর। ওরা জোরমন্ত লোক, থানা পুলিস সব ওদের হাতে, ওদের অনেকদূর দিয়ে আমাদের হাঁটা চলা। কাজ কাম সেরে ঝপ করে চলে আসবি।'

কিন্তু আজ ওর হাত-ভরা কাচের চুড়ি। ফিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিনুনি পাকানো।

হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল নুরবানু, কুরমানের মুখের চেহারা দেখে ঝিম মেরে গেলো।

'এসব কোত্থেকে?'

'মুনিব গিন্নী দিয়েছে।'

কিন্তু জিগ্‌গেস করি, পয়সা কার? এ সাজানোর পেছনে কার চোখের সায় রয়েছে লুকিয়ে? আজ কাচের চুড়ি, কাল আংটি-চুংটি। নোনা জমি এমনি করেই আস্তে আস্তে মিঠেন করে তুলবে। হাত ধরেছিল, ধরবে এবার গলা জড়িয়ে।

'খুলে ফেল শিগ্‌গির।' গর্জে উঠলো কুরমান।

সাজবার ভারী সখ নুরবানুর। একটু সে হয়তো টাল মাটাল করেছিল, কুরমান হাত ধরে হেঁচকা টান মারলো। পট পট করে ভেঙে গেলো কতগুলি। হেঁচকা টান মারলো খোঁপায়। একটা কুণ্ডলী-পাকানো সাপ কিলবিল করে উঠলো।

ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো নুরবানু। চুড়ির ধারে জায়গায়-জায়গায় হাত কেটে গিয়েছে। চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রক্ত।

ঘরের পুরুষের এমন দুর্দান্ত চেহারা দেখেনি সে আর কোনোদিন। বাবা, ভয় করে। দরকার নেই তার চুড়ি-খাড়ুতে, কিষাণের বউ সে, ঠুঁটো প্যাথর হয়ে থাকবে। সাধ-আমোদে তার দরকার কি।

কিন্তু একি! হাটের থেকে তার জন্যে চুড়ি নিয়ে এসেছে কুরমান। লঙ্কা-পেঁয়াজ তামাকটিকে না এনে। লজ্জায় গলে যেতে লাগলো নুরবানু।

পাঁচ আঙুলের মুখ একসঙ্গে ছুঁচলো করে চেপে ধরে কুরমান। টিপে-টিপে আস্তে আস্তে চুড়ি পরিয়ে দেয়। হঠাৎ রাগে মাথা ঘুরে গিয়েছিলো তার। নইলে এমন যার তুকতুকে হাত তার গায়ে সে হাত তোলে কি করে?

'তুমি কেন মিছিমিছি বাজে খরচ করতে গেলে? এদিকে তোমার একটা ভালো গামছা নেই লুঙিটা ছিঁড়ে গেছে।

'যাক সব ছিঁড়ে-ফেড়ে। তুই শুধু একবারটি হাস আমার মুখের দিকে চেয়ে।'

পিঠে চুলগুলি খোলা পড়ে আছে ভুর করে।

'তোর চুল বাঁধা দেখিনি কোনোদিন—,

আজ শুধু দেখে না কুরমান, শোনেও। শোনে চুল বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির ঠুন্ ঠুন্।

উকিলদ্দির বাড়িতে তবু না গেলেই নয় নুরবানুর। চারটে টাকা কি কম? কম কি এক বেলার খোরাকি? ধান-পান যদি পায় ভবিষ্যৎ, তাই কি অগ্রাহ্য করবার?

কিন্তু সেদিন নুরবানু উকিলদ্দির বাড়ি থেকে নতুন শাড়ি পরে এলো। ফলসা রঙের শাড়ি। নুরবানুর বর্ণ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

'এ শাড়ি এলো কোত্থেকে? বর্শার মুখের মতো চোখা হয়ে উঠলো কুরমান।

'আজ যে ঈদ খেয়াল নেই তোমার? ঈদের দিনে মুনিব-গিন্নী দিয়েছে শাড়িখানা।'

ঈদের দিন হলেও নরম পড়লো না কুরমান। ফিরনি—পায়েসের ছিটেফোঁটাও নেই, নতুন একখানা গামছা হয় না, ঈদ কোথায়?

না, নরম পড়লো না কুরমান। শাড়ির প্রত্যেকটি সুতোয় দেখতে পাচ্ছে সে উকিলদ্দির ঘোলা চোখ, ঘষা জিভ। ফাঁই ফাঁই করে সে শাড়িটা ছিঁড়ে ফেললো। এবার আর সে হাটে গেলো না পালটা শাড়ি কিনে আনতে। পয়সা নেই, ইচ্ছেও নেই। ক্ষুদ্দুর চাষা, তার বউয়ের আবার সাইবানী হবার সখ কেন? চট মুড়ি দিয়ে থাকতে পারে না সে ঘরের কোণে?

সত্যি, এত সাজ তার পক্ষে অসাজন্ত ছিল। বুঝতে দেরি হয় না নুরবানুর। কিন্তু তখন কি সে বুঝতে পেরেছে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে সাপ রয়েছে লুকিয়ে? গা বেয়ে বেয়ে শেষকালে বুকের মধ্যে ছোবল মারবে? নুরবানু তার কালো ফুলের ছাপমারা কালো শাড়িই পরে এবার। তার রাতের এ নিরিবিলি শান্তির মতোই এ শাড়িখানা। তাই ঘুমের স্রোতে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারে সে স্বামীর স্পর্শের ঘেরের মধ্যে। ফলসা রঙের শাড়িটার জন্যে তার এতটুকুও কষ্ট নেই।

কুরমান কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনলো নুরবানুকে। নিয়ে এলো পর্দার হেপাজতে। উপাসে-তিয়াসে কাটবে তবু পাপের পথের পাশ দিয়ে হাঁটবে না। দারিদ্র্য লাগুক গায়ে, তবু অধর্ম যেন না লাগে। অদিন এলেও যেন না অমানুষ বনে যায়।

কিন্তু উকিলদ্দি ছিনে-জোঁক। বয়স হয়েছে কিন্তু বিবেচনা নেই।

ধান কাটতে মাঠে গিয়েছে কুরমান। লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটবার দিন এখন। পা টিপে টিপে দুপুরবেলা উকিলদ্দি এসে হাজির। কানের জন্যে ঝুমকো, পায়ের জন্য পঞ্চম, গলার জন্যে দানাকবজ নিয়ে এসেছে গড়িয়ে।

বললে, 'কই গো বিবিজান। দেখো এসে কী এনেছি।'

বেরিয়ে আসতে নুরবানুর চক্ষু স্থির। রুপোর জেওর দেখে নয়, চোখের উপর বাঘ দেখে।

অনেক ভয়-ডর নুরবানুর। এক নম্বর মালেক, দুই নম্বর মুনিব। তিন নম্বর দফাদার। চার নম্বর একটা মাংসখেকো জানোয়ার।

'চলে যান এখান থেকে।' চোখে মুখে আঁচ ফুটিয়ে ঝাপসা গলায় বললে নুরবানু।

'তোমার জন্যে লবেজান হয়ে আছি। এই দেখো, জেওর এনেছি গড়িয়ে।'

'দরকার নেই। আপনি চলে যান। নইলে শোর তুলবো এখুনি।'

কিন্তু শোর তুলবার আগেই কুরমান এসে হাজির।

রোদে সে তেতে-পুড়ে এসেছে, চোখে ঘোলা পড়েছে বোধ হয়। নইলে দেখছে সে কী তার বাড়ির উঠোনে? উকিলদ্দির হাতে রুপোর গয়না আর নুরবানুর চোখে খুশির ঝলকানি, কতো না জানি ঠাট্টা-বটকেরা, কতো না জানি হাসির বুজরুকি। রঙ-সঙ আমোদ-বিনোদ। এই গয়নাতে কত না জানি যোগসাজসের শর্ত।

মাথায় খুন চেপে গেলো কুরমানের, চারপাশে চেয়ে দেখলো সে অসহায়ের মতো। দেখলো ধানের আঁটির সঙ্গে কাঁচি সে ফেলে এসেছে মাঠে।

'এখানে কেন?'

ধানাই-পানাই করতে লাগলো উকিলদ্দি। শেষকালে বললে, 'লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটতে গিয়েছিস কিনা দেখতে এসেছিলাম।'

'তা মাঠে না গিয়ে আমার বাড়ির অন্দরে কেন?'

'বেশ করেছি। সমস্ত জায়গা-জমি সদর-অন্দর আমার, আমার যেখানে খুশি আমি যাবো আসবো।'

কুরমান হঠাৎ উকিলদ্দির দাড়ি চেপে ধরলো। লাগলো ঝটাপটি, ধস্তাধস্তি। উকিলদ্দির হাতে যে লাঠি ছিল দেখেনি কুরমান। তা ছাড়া কুরমান আধপেটা খাওয়া চাষা, জোর জেল্লা নেই শরীরে সেটাও সে বিচার করে দেখেনি। উকিলদ্দি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে তো দিলই, তুলে নিল লাঠিগাছাটা।

কুরমানকে দেখেই ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল নুরবানু। এখন মারমুখো লাঠি দেখে বেরিয়ে এলো সে হন্ত-দন্ত হয়ে, শিক্‌রে পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো উকিলদ্দির উপর। লাঠিটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলো জোর করে। মুঠো আলগা করতে পারে না। শুধু শুরু হয় লটপাট।

কি চোখে দেখলো ব্যাপারটা কে জানে কুরমানের রক্তের মধ্যে ঝড় বয়ে গেলো। এক ঝটকায় টেনে আনতে গেল নুরবানুকে চুলের ঝুঁটি ধরে : 'তুই, তুই কেন বেরিয়ে এসেছিস পর্দার বাইরে। কেন পর-পুরুষের সঙ্গে জাপটাজাপটি শুরু করে দিয়েছিস?' উকিলদ্দিকে রেখে মারতে গেলো সে নুরবানুকে।

আর যেমনি এলো এগিয়ে, হাতের নাগালের মধ্যে, অমনি উকিলদ্দির লাঠি পড়লো কুরমানের মাথায়। মনে হলো নুরবানুই যেন লাঠি মারলো। মনে হলো কুরমানের মারের থেকে উকিলদ্দিকে বাঁচাবার জন্যই তার এই জোটপাট। উকিলদ্দির গায়ে পড়ে তাই এত সাধ্য-সাধনা।

কুরমান দিশেহারার মতো চেঁচিয়ে উঠলো : 'এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক—বাইন।'

ব্যস, উথল-পাথল বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। সব নিশ্চুপ, নিঃশেষ হয়ে গেল।

রাগ ভুলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো কুরমান। হাজার লাঠি পড়লেও এমন চোট লাগতো না। আঁধার দেখতে লাগলো চারদিকে।

নুরবানুর সেই রাগরাঙা মুখ ফুসমন্তরে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেলো। ফকির ফতুরের মতো তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। আর মাটি থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে চাপা সুখে হাসতে লাগলো উকিলদ্দি।

লোক জমতে শুরু করলো আস্তে-আস্তে।

কুরমান গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। বললে নুরবানুকে, 'ও কিছু হয়নি, চলে যা ঘরের মধ্যে।'

সত্যিই যেন কিছু হয়নি, এমনি ভাবেই আঁচল গুটিয়ে চলে গেলো ঘরের মধ্যে, ঘরের বউ-এর মতো।

কিছু হয়নি বললেই আর হয় না। আস্তে আস্তে বসে গেলো দশ-সালিশ। তালাক-দেওয়া স্ত্রী এখন আলগা-আলগোছ মেয়েলোক। তার উপর আর পূর্ব স্বামীর এক্তিয়ার নেই। এক কথায় অমনি আর তাকে সে ঘরে তুলতে পারে না। বিয়ে ফস্ত হয়ে গেছে, অমনি আর তাকে নেয়া যায় না ফিরতি। অমন হারামি সমাজ বরদাস্ত করতে পারে না।

উকিলদ্দি দাঁত বার করে হাসতে লাগলো।

'রাগের মাথায় ফস করে কথা বেরিয়ে গেছে মুখের থেকে, অমনি আমার ইস্ত্রি পর হয়ে যাবে?' কুরমান কেঁদে উঠলো।

পর বলে পর! এপার থেকে ওপার! একবার যখন বিয়ে ছাড়ার ফারখৎ জারি করেছে তখন আর উপায় নেই। ঘুড়ি কাটা পড়লে নাটাই গুটিয়ে কি ঘুড়িকে ধরে আনা যায়?

'মুখের কথাটাই বড়ো হবে? মন দেখবে না কেউ?'

মুখের জবানের দাম কি কম? রঙ-তামাশা করে বললেও তালাক তালাক। আর এ-তো জল জীওন্ত রাগের কথা, গলা দরাজ করে দিন-দুপুরে তালাক দেওয়া।

'আর দস্তুরমতো সাক্ষী রেখে।' ফোড়ন দিল উকিলদ্দি।

'এখন উপায়? নুরবানুকে আমি ফিরে পাবো না?'

এক উপায় আছে। দশ-সালিশ বসলো ফরমান দিতে। ইদ্দতের পর কেউ যদি নুরবানুকে বিয়ে করে তালাক দেয় তবেই ফের কুরমান নিকে করতে পারে তাকে। এ ছাড়া আর কুরমানের পথ নেই।

কে বিয়ে করবে? কুরমানকে ফিবিয়ে দেবার জন্যে কে বিয়ে করবে নুরবানুকে? আর কে। দাড়িতে হাত বুলুতে-বুলুতে উকিলদ্দি বললে, 'আমি বিয়ে করবো।'

কিন্তু বিয়ে করেই তক্ষুনি-তক্ষুনি তালাক দিতে হবে। কথার খেলাপ করলে চলবে না। দশ-সালিশেব হুকুম মানতে হবে। এর মধ্যে আছে খাদেম-ইমাম, মোল্লা-মুনশী, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মানু-গুণী লোক সব। এদেরকে অমান্য করা যাবে না।

একটু যেন বল পেলো কুরমান। কিন্তু তার বাড়িতে থাকতে পারবে না আর নুরবানু। বিরানা পর-পুরুষের ঘরে কি করে থাকতে পারে সমর্থ বযসের মেয়েছেলে? পাশ-গাঁয়ে তার এক চাচা আছে, বেচারী নাচার, সেখানে সে থাকবে। ইদ্দতের তিন মাস।

এক কাপড়ে কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেলো নুরবানু। যেন কুরমানকে গোর দেওযা হয়েছে। পুঁতে রেখেছে মাটির নীচে।

তাছাড়া আর কি? কুরমানের হাতের নাগালের মধ্যে দিয়ে চলে গেলো, তবু হাত বাড়িয়ে তাকে সে ধরে রাখতে পারলো না। সামান্য কটা মুখের কথা এমনি করে সব নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে এ কে জানতো! কুরমানের নিজের রাগ নিজেকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

দাউল হয়ে কুরমান চলে গেলো দক্ষিণে। নুরবানু ছাড়া তার আর ঘরদুয়ার কি! ঘরের উইয়ে খাওয়া পাটঘড়ির বেড়া ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তেমনি ভেঙে-ভেঙে পড়ছে তার বুকের পাঁজরা। চলে গেছে দক্ষিণে, কিন্তু মন কেবল উত্তরে ভেসে-ভেসে বেড়ায়।

ধান কাটা সারা হয়ে গেছে, নিজের গাঁয়ে ফিরে আসে কুরমান। গাঁয়ের হালট ধরে নিজের বাড়িতে। ঘরের ঝাঁপ খোলে। কোথায় নুরবানু? চৈতী মাঠের মতো বুকের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু রাত করে লুকিয়ে একদিন আসে নুরবানু। যেন একটা অন্যায় করছে এমনি চেহারায়। কুরমানের থেকে অনেক দূরে সরে বসে আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদে।

কুরমান বুঝি ঝাঁপিয়ে ধরতে চায় নুরবানুকে। ইচ্ছে করে কোলের কাছে বসিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে দেয়।

নুরবানু বলে, 'না। এখনো হালাল হইনি। ইদ্দত কাবার হয়নি। হয়নি ফিরতি বিয়ে, ফিরতি তালাক।'

বলে, 'তোমাকে শুধু একবার দেখতে এলাম। বড়ো মন কেমন করে।'

বড়ো কাহিল হয়ে গেছে নুরবানু। বড়ো মনমারা। গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেছে। জোর-জুলুস মুছে গেছে গা থেকে।

এটা-ওটা একটু-আধটু গোছগাছ করে দেয় নুরবানু। ঘরের মধ্যে নড়ে-চড়ে। 'তোকে কি আর ফিরে পাবো নুরু?'

'নিশ্চয়ই পাবে। দশ-সালিশের বৈঠকে চুক্তি হয়েছে, কড়ায় ক্রান্তিতে সব আদায়-উশুল হয়ে যাবে। চোখ বুজে এক ডুবে মাঝখানের এই কয়েকটা দিন শুধু কাটিয়ে দেওয়া।'

'আমার কি মনে হয় জানিস? ও তোকে আর ছাড়বে না। একবার কলমা পড়া হয়ে গেলেই ও ওর মুখে কুলুপ এঁটে দেবে। বলবে, দেব না তালাক।' 'ইস!' নুরবানু ফণা তুলে ফোঁস করে উঠলো : 'দশ-সালিশ ওকে ছাড়বে কেন?'

'না ছাড়লেই বা কি, ও পষ্ট গরকবুল করবে। এ বিয়ে তো আর আদালত চলবে না। বলবে, কার সাধ্য জোর করে আমাকে দিয়ে তালাক দেওয়ায়।'

'ইস, করুক দেখি তো এমন বেইমানি।' আবার ফোঁস করে ওঠে নুরবানু : 'বেতমিজকে তখন বিষ খাইয়ে শেষ করব। ওর বিষয়ের অংশ নিয়ে এসে সাদি করব তোমাকে।'

নুরবানুর চোখে কত বিশ্বাস আর স্নেহ।

'গা-টা তেতো-তেতো করছে জ্বর হবে বোধ হয়।'

গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল নুরবানু। হাত গুটিয়ে নিল ঝট করে। অমন সোনার অঙ্গ স্পর্শ করার তার অধিকার নেই।

একেক দিন গহিন রাতে কুরমান যায় নুরবানুর ঘরের দরজায়। নুরবানুর চোখে ঘুম নেই। বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে বসে থাকে। বলে, 'কেন পাগলের মতো ঘুরে বেডাচ্ছ? লোকে যে চোর বলবে। চৌকিদার দেখলে চালান দেবে।'

'কবে আসবি?'

'দফাদার লোক নিয়ে এসেছিল। আসছে জুম্মাবার কলমা পড়বে। তারপরেই তালাক আদায় করে নেব ঠিক। এখন বাড়ি যাও।'

কোথায় বাড়ি! কুরমানের ইচ্ছে করে পাখিটাকে বুকের উমে করে উড়াল দিয়ে চলে যায় কোথাও! কোথায় তা কে জানে। যেখানে এত প্যাঁচ-ঘোঁচ নেই, যেখানে শুধু দেদার মাঠ দেদার আসমান।

শিগ্‌গির বাড়ি যাও, কুরমান চোর, কুরমান পরপুরুষ।

জুম্মাবারে বিয়ে হয়ে গেলো, কিন্তু কই, শনিবারে তো তালাক নিয়ে চলে এলো না নুরবানু।

যা সে ভেবে রেখেছে তাই হবে। একবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে উকিলদ্দি আর ছেড়ে দেবে না নুরবানুকে। গলা টিপে ধরলেও তার মুখ থেকে বার করানো যাবে না ঐ তিন অক্ষরের তিন কথা। বলবে, মরণ ছাড়া আর কারুর সাধ্য নেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। কুরমান খোঁজ নিতে গেলো। দাবিদারের মতো নয়, দেনাদারের মতো।

উকিলদ্দি বললে, 'আমার কোনো কসুর নেই। বিয়ে হয়েছে তবু নুরবানু এখনো ইস্ত্রী হচ্ছে না। ইস্ত্রী না হলে তালাক হয় কি করে?

যতসব ফাঁকিজুঁকি কথা। তার আসল মতলব হচ্ছে নুরবানুকে রেখে দেবে কবজার মধ্যে। অষ্টঘড়ির বাঁদি করে।

কুরমান দশ-সালিশ বসালো। জানালো তার ফরিয়াদ।

ডাকো উকিলদ্দিকে। জবাব কি তার? কেন এখনো ছাড়ছে না নুরবানুকে? কেন এজাহার খেলাপ করছে?

উকিলদ্দি বললে, বিয়েই এখনো সিদ্ধ হয়নি, ফলন্ত-পাকন্ত হয়নি। এখনো মাটির গাঁথনিই আছে, হয়নি পাকাপোক্ত। বিয়ে হয়েছে অথচ এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে নুরবানু। ধরাছোঁয়া দিচ্ছে না। শুতে আসছে না। দরজায় খিল দিয়ে ভেবেছে কলমা পড়ার পরই বুঝি ও তালাকের কাবিল হলো। তাই রয়েছে অমন কাঠ হয়ে, বিমুখ হয়ে। এমনি যদি থাকে, তবে কাঁটান-ছিঁড়েন হতে পারে কি করে?

সত্যিই তো। দশ-সালিশ রায় দিলো। স্বামীর সঙ্গে একরাত্রিও যদি সংসার না করে তবে বিয়ে জায়েজ হয় কি করে? বিয়ে পোক্ত না হলে তালাক চলে না। হালাল হওয়া চলে না নুরবানুর।

উপায় নেই, হালাল হতে হবে নুরবানুকে। তালাক মেনে নিতে হবে ভিক্ষুকের মতো।

ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিলো নুরবানু।

পরদিন ভোবে পাখিপাখলা ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই উকিলদ্দি নুরবানুকে তালাক দিলো।

বিকেলের রোদ উঠোনটুকু থেকে যাই যাই করছে, নুরবানু চলে কুরমানের বাড়িতে। কুরমান বসে আছে দাওয়ার উপর। হাতের মধ্যে হুঁকো ধরা কিন্তু কলকেতে আগুন নেই। কখন যে নিবে গেছে কে জানে। চেয়ে আছে—শুনা মাঠেব মতো চাউনি। গায়ের বাঁধন সব ঢিলে হয়ে গেছে, ধস ভেঙে পড়েছে জীবনের। ভাঙন নদীর পারে ছাড়া-বাড়ির মতো চেহারা।

যেন চিনি অথচ চিনি না, এমনি চোখে কুরমান তাকালো নুরবানুর দিকে। তার চোখে গত রাতের সুর্মা টানা, ঠোঁটে পান-খাওয়ার শুকনো দাগ। সমস্ত গায়ে যেন ফুর্তির আতর মাখা। পরনে একটা জামরঙের নতুন শাড়ি। পরতে-পরতে যেন খুশির জলের স্রোত।

সে জল বড় ঘোলা। লেগেছে কাদা মাটির ময়লা। পচা দামের জঞ্জাল। মড়ার মাংসের গন্ধ। সে জলে আর ্ন করা যায় না।

'ইদ্দত আমি এখানেই কাবার করবো। দিন হলেই মোল্লা ডেকে কলমা পড়িয়ে নাও। তাড়াতাড়ি।' নুরবানু ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

নেবা হুঁকোয় টান মারতে মারতে কুরমান বললে, 'না। আমার নিকে-সাদিতে আর মন নেই। তুই ফিরে যা দফাদারের বাড়িতে।'

মহানগর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমার সঙ্গে চলো মহানগরে, যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে আর চূড়ায় আর অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।

আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে, যে পথ জটিল, দুর্বল মানুষের জীবনধারার মতো, যে পথ অন্ধকার মানুষের মনের অরণ্যের মতো, আর যে পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মতো।

এ মহানগরের সঙ্গীত রচনা করা উচিত, ভয়াবহ, বিস্ময়কর সঙ্গীত।

তার পটভূমিতে যন্ত্রের নির্ঘোষ, উর্ধ্বমুখ কলের শঙ্খনাদ, সমস্ত পথের সমস্ত চাকার ঘর্ঘর, শিকলের ঝনৎকার—ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের আর্তনাদ। শব্দের এই পটভূমিব ওপর দিয়ে চলেছে বিসর্পিল সুরের পথ; প্রিয়ার মতো যে নদী শুয়ে আছে মহানগরের কোলে তার জলের ঢেউয়ের সুর, আব নগরের ছায়াবীথির ওপর দিয়ে যে হাওয়া বয় তার, নির্জন ঘবে প্রেমিকেরা অর্ধস্ফুট যে কথা বলে তারো। সে সঙ্গীতের মাঝে থাকবে উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি; শব্দের বন্যার মতো, আর থাকবে ক্লান্ত পথিকের পথের ওপর দিয়ে পা টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ, মধ্যরাতে যে পথিক চলেছে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে।

কঠিন ধাতু ও ইটেব ফ্রেমে লক্ষ জীবনের সূত্র নিয়ে মহানগর বুনছে যে বিশাল সূচীচিত্র। যেখানে খেই যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে, উঠছে জড়িয়ে নতুন সুতোর সঙ্গে অকস্মাৎ- সহসা যাচ্ছে ছিঁড়ে —সেই বিশাল দুর্বোধ চিত্রের অনুবাদ থাকবে সে সঙ্গীতে।

এ সঙ্গীত রচনা করার শক্তি আমার নেই। আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি—মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনীর সমুদ্রের দু'একটি ঢেউ, মহাসঙ্গীতের স্বাদ তাতে মিলবে না,—তৃষ্ণা তাতে মেটাবার নয়,—জানি।

সঙ্কুচিত আড়ষ্টভাবে নদীর যে শাখাটি ঢুকেছে নগরের ভেতর, তারই অগভীর জলের মন্থর স্রোতে ভেসে আমরা গিয়ে উঠব নড়ালের পোলের তলায় ফুটন্ত কদমগাছের নিশান দেওয়া সেই পুরনো পোনাঘাটে। আমরা পেরিয়ে যাব পুরনো সব ভাঙা ঘাট, পেরিয়ে যাব ন্যাড়াশিবের মন্দির, পেরিয়ে যাব ইঁটখোলা আর চালের আড়ত আর পাঁজা করা টালি ও ইঁট আর সুরকি বালির গাদা। আমরা চলেছি পোনার নৌকায়। আমাদের নৌকার খোলে টই-টুম্বুর জল আর তাতে কিলবিল করছে মাছের ছানা। সেই পোনার চারা বিক্রি হবে কুনকে হিসাবে পোনাঘাটে।

আষাঢ় মাসের ভোরবেলা। বৃষ্টি নেই, কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। সূর্য হয়ত উঠেছে পূবের বাঁকা নগর-শিখর-রেখার পেছনে, আমরা পেয়েছি মাত্র মেঘ থেকে চোয়ান স্তিমিত একটু আলো। সে আলোয় এ দিকের দরিদ্র শহরতলীকে আরো যেন জীর্ণ দেখাচ্ছে। ভাঙাঘাটে এখনও স্নানে বড় কেউ আসেনি, গোলাগুলি ফাঁকা, ধানের আড়তের ধারে শূন্য সব বালতি বাঁধা। সব খাঁ খাঁ করছে।

জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে নৌকা। মাঝিরা বড় নদীতে বরাবর এসেছিল দাঁড় টেনে। এখন তারা ছইয়ের ভেতর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। শুধু হালে বসে আছে মুকুন্দ, আর তার কাছে কখন থেকে চুপটি করে গিয়ে বসেছে যে রতন তা কেউ জানে না,—সেই বুঝি রাত না পোহাতেই। নৌকা তখন মাঝনদীতে। বাদলা রাতে আকাশে নেই তারা। রতনের মনে হয়েছে সব তারা যেন নেমেছে জলের ওপর, নদী তখন মহানগরের নাগাল পেয়েছে; দুধারে জাহাজ আর স্টীমার, গাদাবোট আর বড় বড় কারখানার সব জেটি। অন্ধকারে তাদের রূপ দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু গায়ে আলোর ফোঁটা, কালো জলের এপার থেকে ওপারে। মেঘলা আকাশ ছেড়ে তারাই ত নেমেছে নদীর ওপর।

রতন ভয়ে ভয়ে এসে বসেছে নিঃসাড়ে হালের কাছে। কে জানে বাবা বকবে কিনা? হয়ত ধমকে আবার দেবে পাঠিয়ে ছইয়ের ভেতর। কিন্তু সে কি থাকতে পারে এমন সময় ছইয়ের ভেতর,--নৌকা যখন পেয়েছে মহানগরের নাগাল, আকাশের তারা যখন জলের ওপর নেমেছে। তার যে কতদিনের সাধ, কতদিনের স্বপ্ন! রতন দু-চোখ দিয়ে পান করেছে আলো ছিটান এই নগরের অন্ধকার আর নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলেছে সাবধানে, পাছে বাবা টের পায়, পাছে দেয় তাকে ধমকে ভেতরে পাঠিয়ে। কিছুই তো বিশ্বাস নেই। বাবা ত তাকে আনতেই চায়নি বাড়ি থেকে। ছেলেমানুষ আবার শহরে যায় নাকি। আর নৌকায় এতখানি পথ যাওয়া কি সোজা কথা! কি করবে সে সেখানে গিয়ে? কত কাকুতি-মিনতি করে, কেঁদেকেটে, না, রতন শেষ পর্যন্ত বাবাকে নিমরাজী করিয়েছে। তবু নৌকোয় তুলে বাবা তাকে শাসিয়ে দিয়েছে,—খবরদার, পথে দুষ্টুমি করলে আর রক্ষা থাকবে না। না, দুষ্টুমি সে করবে না, কাউকে বিরক্তও না। তাকে যা বলা হবে তাই করতে সে রাজী। সে শুধু একবার শহর দেখতে চায়—রূপকথার গল্পের চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কিন্তু শুধু তাই জন্যে কি শহরে আসবার এই ব্যাকুলতা রতনের? আচ্ছা সে কথা এখন থাক।

কিন্তু রতনকে কেউ লক্ষ্য করে না, কিম্বা লক্ষ্য করেও কেয়ার করে না। রতন বসে আছে নিঃসাড়ে, শুধু সমস্ত দেহের রেখায় ফুটে উঠেছে তার ব্যাগ্রতার প্রখরতা।

ধীরে ধীরে অন্ধকার এল ফিকে হয়ে। এবার নদী রূপে রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রথম ছিল চারিধারে আবছা কুয়াশা। প্রকৃতির পটের ওপর যেন রঙের এলোমেলো ছোপ, কোথাও একটু ঘন কোথাও হালকা, সে রঙের ছোপ তখনও নির্দিষ্ট রূপ নেয়নি। নীহারিকার মতো আকারহীন সেই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে তরলতা থেকে রতনের চোখের ওপরেই কে যেন এইমাত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে তুলছে। আকাশের গায়ে কালো খানিকটা তুলির পোঁচ দেখতে দেখতে হয়ে উঠল প্রকাণ্ড একটা জাহাজ, তার জটিল মাস্তুলগুলি উঠেছে ছোটোখাটো অরণ্যের মতো মেঘলা আকাশে, তার নোঙরের শেকল নেমেছে অতিকায় অজগরের মতো জলের ভেতর। রতনদের নৌকা সে দানবের ভ্রূকুটির তলা দিয়ে ভয়ে ভয়ে পার হয়ে যায় ছোটো সোনার খেলনার মতো। জলের আরেক ধারে বিছান ছিল খানিকটা তরল গাঢ় রঙের কুয়াশা। সে কুয়াশা জমাট বেঁধে হয়ে গেল অনেকগুলো গাদাবোটের জটলা—একটি জেটির চারিধারে তারা ভিড় করে আছে। দূর থেকে মনে হয় ওরা যেন কোন বিশাল জলচরের শাবক—মায়ের কোল ঘেঁসে তাল পাকিয়ে আছে ঘুমিয়ে। নদীর ওপরকার পর্দা আরো গেল সরে। কলকারখানার বিশাল সব দেহ উঠল জেগে নদীর দুপারে। জলের ওপর তাদের লৌহবাহু

তারা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঁধান পাড় থেকে বড় বড় ক্রেন উঠেছে গলা বাড়িয়ে; দুই তীরে সদাগরি জাহাজের আশেপাশে জেলেডিঙি আর খেয়া নৌকা, স্টীমার আর লঞ্চ ভিড় করে আছে এই মহানগর। ভয়ে বিস্ময়ে ব্যাকুলতায় অভিভূত হয়ে রতন প্রথম তার রূপ দেখলে।

তারপর তাদের নৌকা বাঁক নিয়ে ঢুকেছে এই শাখার ভেতর, চলেছে পুরোনো শহরতলীর ভেতর দিয়ে, বড় নদীতে মহানগরের রূপ দেখে রতন সত্যি ভয় পেয়েছিল। হতাশ হয়েছিল আরো বেশি। কিন্তু এই পুরোনো জীর্ণ শহরগুলি দেখে তার যেন একটু আশা হয়। কেন আশা হয়? আচ্ছা সে কথা এখন থাক।

নদীর আরেকটা বাঁক ঘুরেই দেখা যায় নড়ালের পোল। আগে থাকতে পোনার সব নৌকা এসে উঠেছে পোনাঘাটে। মুকুন্দ হাঁক দিয়ে এবার সবাইকে তোলে। লক্ষণ উঠে তার কুনকে ঠিক করে। মাঝিরা গা মোড়া দিয়ে ওঠে। আর রতন বসে থাকে উত্তেজনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে। তার চাপা দুটি পাতলা ছোট ঠোঁটের নীচে কি সঙ্কল্প আছে জানে কি কেউ? বড় বড় দুটি চোখে তার কিসের ব্যগ্রতা? শুধু শহর দেখার কৌতূহল ত এ নয়। কিন্তু সে কথা এখানে থাক।

পোনাঘাটে নৌকা লাগে। পোনাঘাটে আর জায়গা কই দাঁড়াবার। এরই মধ্যে মাটির হাঁড়ি দুধারে ঝুলিয়ে ভারীরা এসেছে দূর-দূরান্তের থেকে পোনার চারা নিয়ে যেতে। তাদের ভিড়ের ভেতব পাড়ের কাদার ওপর কারা দোকান পেতে বসেছে পান বিড়ি আর তেলেভাজা খাবারের। সরকারী লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে পাওনা টাকা আদায় করতে। দালালেরা ঘুরছে হাঁকডাক করে।

পাড়ে আর জায়গা নেই, তবু মুকুন্দ দাসের খাস নৌকার একটু নোঙর ফেলবাব ঠাঁই মেলে। মুকুন্দ ত আর যে-সে লোক নয়। বর্ষার কটা মাসে তার গোটা ছয়েক পোনার নৌকা আনাগোনা করে এই পথে।

মাঝিরা এর মধ্যেই নৌকার খোল থেকে জল ছেঁচে ফেলতে শুরু করছে একটু-আধটু। লক্ষ্মণ কুনকে পরখ করেছে—মাছ মেপে দেবার সময় খানিকটা জল রেখে হাত সাফাই কবতে সে ওস্তাদ। মুকুন্দ দাস নৌকা থেকে জলে নেমে ডাঙায় ওঠে। পেছন দিকে হঠাৎ চোখ পড়ায় ধমক দিয়ে বলে, "তুই নামলি যে বড়!"

রতন বাবার দিকে কাতরভাবে তাকায়। মুকুন্দ একটু নরম হয়ে বলে, "আচ্ছা কোথাও যাসনি যেন, ওই কদমগাছের তলায় দাঁড়াগে যা।"

রতন তাই করে, কদমগাছ থেকে অসংখ্য ফোটা ফুল ঝরে পড়েছে মাটিতে। কাদায় মানুষের পায়ের চাপে রেণুগুলো থেঁতলে নোংরা হয়ে গেছে। পোনা চারার হাটে কদমফুলের কদর নেই!

রতনের চারিধারে হট্টগোল।

"চাপড়াও না হে, নইলে বাড়ি গিয়ে মাছচচ্চড়ি খেতে হবে যে।"

"একটা নতুন হাঁড়িও জোটেনি! ভাতের তিজেলটাই এনেছ বুঝি টেনে। তারপর মাছ যখন ঘেমে উঠবে তখন হবে দালাল বেটার দোষ।"

ভারীরা কেউ এসেছে খালি হাঁড়ি নিয়ে, কারুর কেনা প্রায় সাঙ্গ হল। বসে বসে তারা হাঁড়ির জল চাপড়ায়, মরা মাছ ছেঁকে ফেলে। নদীর ধারের কাদায় মরা মাছ আর কদমরেণু মিশে গেছে। রতন কিন্তু কদমতলায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে না। এখানে থাকবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করে সে ত শহরে আসেনি। সারা পথ সে মনের কথা মনেই চেপে এসেছে,

মুখ ফুটে একবার বুঝি লক্ষ্মণকে গোপনে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিল, "হ্যাঁ কাকা, পোনাঘাটের কাছেই উল্টোডিঙি না?"

লক্ষ্মণ বাঁকা হেসে বলেছে, "দূর পাগলা, উল্টোডিঙি কি সেথা? সে হল কত দূর।" তারপর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, "কেন রে, উল্টোডিঙির খোঁজ কেন? উল্টোডিঙি তুই শুনলি কোথা?"

কিন্তু রতন তারপর একেবারে চুপ। আর তার পেটের কথা বার করে কার সাধ্য।

কদমতলায় দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে রতন চারিদিকে তাকায়। তার বাবা কাজে ব্যস্ত, রতনের দিকে তাকাবার তার সময় নেই। সুবিধে বুঝে ক'পা ক'পা করে রতন এক সময়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এখানে তার সাহস হয় না। একটা দিক খেয়ালমতো ধরে সে এগিয়ে যায়।

মহানগরের বিশাল অরণ্যে কত মানুষ আসে কত কিছুর খোঁজে;—কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বা বিস্মৃতি। মৃত্তিকার স্নেহের মতো শ্যামল একটি অসহায় ছেলে সেখানে এসেছে কিসের খোঁজে? এই অরণ্যে নিজেব আকাঙ্ক্ষিতকে সে খুঁজে পাবার আশা রাখে—তার দুঃসাহস ও কম নয়।

অনেক দূব গিয়ে রতন সাহস করে একজনকে পথ জিজ্ঞাসা করে। লোকটি অবাক হয়ে তার দিকে তাকায, বলে, "এ তো উল্টোদিকে এসেছ ভাই, উল্টোডিঙি ওই দিকে, আর সে ত অনেক দূর।"

—অনেক দূর। তা হোক, অনেক দূবকে রতন ভয় করে না। রতন অন্য দিকে ফেরে। লোকটি কি ভেবে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি একলা যাচ্ছ অত দূর। তোমার সঙ্গে কেউ নেই?"

বতন সঙ্কুচিতভাবে বলে, "না।"

লোকটি কি মনে হয়, একটু শক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করে, "বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছ না তো? উল্টোডিঙিতে কার কাছে যাচ্ছ?"

রতন ভয়ে ভয়ে বলে ফেলে, "সেখানে আমার দিদি থাকে।" তারপর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়। লোকটা যদি আরো কিছু জিজ্ঞাসা করে, যদি ধরে নিয়ে যায় আবার তার বাবার কাছে।

তাহলে এবার বলি। রতন এসেছে দিদিকে খুঁজতে। যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিয়ে খুঁজে পায় না, সেই মহানগর থেকে তার দিদিকে খুঁজে বার করবে। শহর মানে দিদি। বাড়িতে থাকতে সে ভেবেছে শহরে গেলেই বুঝি দিদিকে পাওয়া যায়। মহানগরের বিরাট রূপ তার সে ধারণাকে উপহাস করেছে; কিন্তু তবু সে হতাশ হয়নি। দিদিকে খুঁজে সে পাবেই। শিশু-হৃদয়ের বিশ্বাসের কি সীমা আছে?

কিন্তু দিদিকে খোঁজার কথা তো কাউকে বলতে নেই। দিদির নাম করাও যে বাড়িতে মানা তা কি সে জানে না। কেন যে মানা তা অবশ্য সে বুঝতে পারে না। কিন্তু অনুচ্চারিত কোন নিষেধ তার শিশু-মনের ব্যাকুলতাকে মূক করে রেখে দেয়।

এতদিন এসেছে মনের কথা মনে চেপে। তাই সে একা বেরিয়েছে দিদির সন্ধানে। দিদিকে যে তার খুঁজে বার করতেই হবে। দিদি না হলে তার যে কিছু ভালো লাগে না। ছেলেবেলা

থেকে সে ত মাকে দেখেনি, জেনেছে শুধু দিদিকে। দিদি তার মা, দিদিই তার খেলার সাথী। বিয়ে হয়ে দিদি গেছল শ্বশুরবাড়ি। তবুও তাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। কাছাকাছি দুটি গাঁ, রতন নিজেই যখন-তখন পালিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে দিদির কাছে। তারপর দিদির কাছ থেকে তাকে নিয়ে আসা সোজা ব্যাপার নয়। দিদি যেখানে থাকতে পারে দিনের পর দিন, সেখানে তার বেশি দিন থাকা কেন যে দোষের তা সে কেমন করে বুঝবে!

তারপর কি যে হল কে জানে। একদিন তাদের বাড়িতে বিষম গণ্ডগোল। দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে ভিড় করে, ভিড় করে এসেছে গাঁয়ের লোক। থানা থেকে চৌকিদার পর্যন্ত এসেছে। ছেলেমানুষ বলে তাকে কেউ কাছে ঘেঁষতে দেয় না। তবু সে শুনেছে—দিদিকে কারা নাকি ধরে নিয়ে গেছে। শুনে সে অবাক হয়ে গেছে—গেলই বা দিদিকে ধরে নিয়ে—তাকে আবার কেড়ে আনলেই ত হয়। কেন যে কেউ যাচ্ছে না তাই ভেবে তার রাগ হয়েছে। তারপর সে আরো কিছু শুনেছে। শিশুর মন অনেক বেশি সজাগ। দিদিকে কোথায় ধরে নিয়ে গেছে কেউ নাকি জানে না।

এইবার সে কেঁদেছে। কে জানে কারা নিয়ে গেছে দিদিকে ধরে। তারা হয়ত দিদিকে মারছে, হয়ত দিচ্ছে না খেতে। দিদি হয়ত রতনকে দেখবার জন্য কাঁদছে। এ কথা ভেবে তার যেন আরো কান্না পায়।

বাবা তাকে আদর করেছেন কান্না দেখে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন, "কান্না কেন বাবা?"

চুপিচুপি রতন বলেছে, "দিদি যে আসছে না বাবা।"

মুকুন্দ শিশুর সজাগ মনের রহস্য না জেনে বলেছে, "আসবে বই কি বাবা, শ্বশুরবাড়ি থেকে কি রোজ রোজ আসতে আছে!"

রতন আর কিছু বলেনি। কিন্তু বাবা তার কাছে কেন লুকোতে চান বুঝতে না পেরে তার অত্যন্ত ভয় হয়েছে।

তারপর একদিন সে শুনেছে যে দিদিকে নাকি পাওয়া গেছে। দারোগাসাহেব পুলিশ নিয়ে গিয়ে তাকে নাকি কোন দূর দেশ থেকে খুঁজে বার করেছেন। দিদিকে খুঁজে পাওয়া গেছে। রতনের আনন্দ আর ধরে না। দিদি এতদিন বাদে তাহলে আসছে!

কিন্তু কোথায় দিদি! একদিন দুদিন ব্যাকুলভাবে রতন অপেক্ষা করে, কিন্তু দিদি আসে না। দিদিকে ফিরে পাওয়া গেছে তবু দিদি কেন আসে না রতন বুঝতে পারে না। দিদির ওপর তার রাগ হয়। কতদিন রতন তাকে দেখেনি তা কি তার মনে নেই। দিদি নিজে চলে আসতে পারে না? আর বাবাই বা কেমন, দিদিকে নিয়ে আসছে না কেন। রতনের সকলের ওপর অভিমান হয়েছে।

হয়ত দিদি চুপিচুপি শ্বশুড়বাড়ি গেছে ভেবে একদিন সকালে রতন সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু সেখানে ত দিদি নেই। সেখানে কেউ তার সঙ্গে ভালো করে কথা পর্যন্ত কয় না; দাদাবাবু তাকে দেখতে পেয়েও দূর থেকে না ডেকে চলে যান। মুখখানি কাঁদো-কাঁদো করে রতন সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছে।

ফিরে এসে বাবার কাছে কেঁদে সে আবদার করেছে, "দিদিকে আনছ না কেন বাবা?"

সেই দিন মুকুন্দ তাকে ধমকে দিয়েছে।

তারপর থেকে দিদি আর আসেনি। দিদি নাকি আর আসবে না।

কিন্তু রতন মনে মনে জানে তাকে কেউ ডাকতে যায়নি বলেই অভিমান করে দিদি আসেনি।

রতন যে জানে না দিদি কোথায় থাকে, না হলে সে নিজেই গিয়ে দিদিকে ডেকে আনত।

কিন্তু কেমন করে সে জানবে দিদি কোথায় আছে! কেউ যে তাকে দিদির কথা বলে না। দিদির কথাই বলতে নেই। রাত্রে সে চুপি চুপি শুধু দিদির জন্যে কাঁদে, দিদি কেমন করে তাকে ভুলে আছে ভেবে সে মনে মনে তার সঙ্গে ঝগড়া করে। দিদি কোথায় থাকে সে জানে না।

কিন্তু শিশুর মন আমরা যা মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশি সজাগ। শিশু অনেক কিছু শুনতে পায়, অনেক কিছু বোঝে। কোথা থেকে সে শুনেছে কে জানে যে, দিদি থাকে শহরে, রূপকথার চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কোথা থেকে কার মুখে শুনেছে—উল্টোডিঙির নাম। বাতাসে কথা ভেসে ভেসে আসে। বিনিদ্র ভালোবাসা কান পেতে তাকে শুনতে পায়।

তাই সে কাকুতি-মিনতি করে এসেছে মহানগরে, তাই সে চলেছে সন্ধানে।

দিদিকে সে খুঁজে বার করবে, সে জানে দিদির সামনে একবার গিয়ে দাঁড়ালে সে আর না এসে থাকতে কিছুতেই পারবে না। এমনি তার গভীর বিশ্বাস।

রতনকে আমরা এইখানে ছেড়ে দিতে পারি। মহানগরে অনেকেই আসে, অনেক কিছু খোঁজে— কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বিস্মৃতি, কেউ আরো বড় কিছু। সবাই কি সব পায়? পথের অরণ্যে তারা হারিয়ে যায়। মহানগর তাদের চিহ্ন দেয় মুছে। রতনও তেমনি যাবে হারিয়ে ভেবে আমরা তাকে ছেড়ে দিতে পারি।

কিন্তু তা যাবে না। পৃথিবীতে কি সম্ভব কি অসম্ভব কে বলতে পারে? রতন সত্যি দিদির খোঁজ পায়। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে বিকেলের দিকে। আষাঢ় মাসের আকাশ মেঘে ঢাকা বলে বেলা বোঝা যায় না। ক্লান্তপদে শুকনো কাতর মুখে একটি ছেলে গিয়ে দাঁড়ায় খোলায় ছাওয়া একটি মেটে বাড়ির দরজায়। একটি মেয়ে তাকে রাস্তা থেকে এনেছে সঙ্গে করে।

রতন অনেক পথ ঘুরেছে, অনেককে জিজ্ঞাসা করেছে পথ, শেষে সে সন্ধান পেয়েছে। ভালোবাসা কি না পারে'

খানিক বাদে হয়রান হয়ে খোঁজ করতে করতে রতন দূরে একটি মেয়েকে দেখতে পায়, উৎসাহভারে সে চিৎকার করে ডাকে, "দিদি"।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়াতেই রতন হতাশ হয়ে যায়। তার দিদি ত অমন নয়। কুণ্ঠিতভাবে সে অন্য দিকে চলে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটি তাকে ডেকে বলে, "শোনো!"

কাছে গেলে তার ক্লান্ত শুকনো মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে "কাকে খুঁজছ ভাই?"

রতন লজ্জিতভাবে তার দিদির নাম বলে। মেয়েটি হেসে বলে, "তোমার দিদির বাড়ি বুঝি চেন না, চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মেটে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এখন মেয়েটি ডাকে, "ও চপলা, তোকে খুঁজতে কে এসেছে দেখে যা।"

ভেতর থেকে চপলাই বুঝি রুক্ষ স্বরে বলে, "কে আবার এল এখন?"

"দেখেই যা না একবার।"

চপলা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। রতনের মুখেও কথা ফোটে না। দিদিকে চিনতেই তার কষ্ট হয়। দিদি যেন কেমন হয়ে গেছে।

দুজনেই খানিকক্ষণ থেকে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। যে মেয়েটি রতনকে সঙ্গে করে এনেছে

সে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বলে, "তোর নাম করে খুঁজছিল, তাই তোর ভাই ভেবে বাড়ি দেখাতে এলাম। তোর ভাই নয়?"

উত্তর না দিয়ে চপলা হঠাৎ ছুটে এসে রতনকে বুকে চেপে ধরে, তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে অবাক হয়ে ধরা গলায় বলে, "তুই একা এসেছিস!"

রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে, কিছু বলে না।

মহানগরের পথে ধুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখন কখন পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব কিছুকে দাগী করে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।

চপলা রতনকে ঘরে নিয়ে যায়। সে ঘর দেখে রতন অবাক। মাটির ঘর এমন করে সাজান হতে পারে, এত সুন্দর জিনিস এখানে থাকতে পারে রতন তা কেমন করে জানবে? এত জিনিস দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে প্রথম, "এ সব তোমার দিদি?"

চপলার অকারণ চোখের জল তখনও শুকোয়নি, একটু হেসে সে বলে, "হ্যাঁ ভাই।"

কিন্তু দিদির ঘর যেমনই হোক তা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না ত। আসল কথা রতন ভোলেনি। সে হঠাৎ বলে, "তোমায় বাড়ি যেতে হবে দিদি!"

চপলা ম্লান ভাবে এবার বলে, "আচ্ছা যাব ভাই, এখন ত তুই একটু জিরিয়ে নে।"

"কিন্তু জিরিয়ে নিয়েই যেতে হবে। আমাদের নৌকা কাল সকালেই ছাড়বে কিনা। এসব জিনিস কেমন করে নেব দিদি?"

এবার চপলা চুপ করে থাকে।

হঠাৎ কেন বলা যায় না একটু ভীত হয়ে রতন জিজ্ঞাসা করে, "একটু জিরিয়ে নিয়েই যাবে ত দিদি?"

দিদির মুখে তবু কথা নেই। দিদি জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ভাবনাতেই হয়ত রাজি হচ্ছে না ভেবে রতন তাড়াতাড়ি বলে, "এসব জিনিস একটা গরুর-গাড়ি ডেকে তুলে নেব, কেমন দিদি?"

চপলা কাতর মুখে বলে ফেলে, "আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই।"

যাবার উপায় নেই! রতনের মুখের সব দীপ্তি হঠাৎ নিভে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় বাবার রাগ, মনে পড়ে বাড়িতে দিদির নাম পর্যন্ত উচ্চারণ নিষেধ। সত্যিই বুঝি দিদির সেখানে যাবার উপায় নেই। বৃথাই এসেছে সে দিদিকে খুঁজতে, দিদিকে খুঁজে পেয়েও তার লাভ নেই।

তারপর হঠাৎ আবার তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, "আমিও তাহলে যাব না দিদি!"

"কোথায় থাকবি?"

"বাঃ তোমার কাছে ত!" বলে রতন হাসে, কিন্তু চপলার মুখ যে আরো ম্লান হয়ে এসেছে তা সে দেখতে পায় না।

তারপর খেয়েদেয়ে সারা বিকাল দুই ভাই-বোনের গল্প হয়। কত কথাই তাদের আছে বলবার, জিজ্ঞাসা করবার। কিন্তু সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসে তত চপলা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। একবার সে বলে, "তুই যে চলে এলি একলা, বাবা হয়ত খুব ভাবছে!"

দিদির প্রতি অবিচারের জন্য বাবার ওপর রতনের একটু রাগই হয়েছে, সে তাচ্ছিল্য করে বলে "ভাবুক গে।"

খানিক বাদে চপলা আবার বলে, "এখান থেকে নড়ালের পোল অনেকখানি পথ, না রতন?"

রতন এ-পথ পার হয়ে ত এসেছে। গর্বভরে বলে, "ওরে বাবা, সে বলে কোথায়?"

"পয়সা নিয়ে তুই ট্রামে করে, না হয় বাসে, যেতে পারিস না?"

"বাঃ আমি কি যাচ্ছি নাকি?" দিদির মুখের দিকে চেয়ে সে থমকে যায়। দিদির চোখের জল।

মাথা নীচু করে চপলা ধরা গলায় বলে, "এখানে যে তোমায় থাকতে নেই ভাই!"

রতন কিছুই বুঝতে পারে না; কিন্তু এবার তার অত্যন্ত অভিমান হয়। দিদি সেখানেও যেতে পারবে না, আবার এখানেও বলবে তাকে থাকতে নেই! আচ্ছা, সে চলেই যাবে। কখ্খনো, কখ্খনো আর দিদির নাম করবে না, বাবার মতো! ধীরে ধীরে সে বলে, "আচ্ছা আমি যাব।"

মেঘলা আকাশে একটু আগে থাকতেই আলো এসেছে ম্লান হয়ে। চপলা উঠে তার আলমারি থেকে চারটে টাকা বার করে রতনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, "তুই খাবার খাস।"

চার টাকায় অনেক অনেক পয়সা, তবু আপত্তি করবার কথাও আর রতনের মনে নেই। দিদি যে এক্ষুনি তাকে চলে যেতে বলছে তা বুঝে সে যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে। তার সমস্ত বুক গেছে ভেঙে।

বতন আর ঘরে দাঁড়ায় না, আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে।

দিদির মুখের দিকেও আর না চেয়ে গলি দিয়ে সে সোজা বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। মুখের দিকে চাইলেও হয়ত দিদির অবিশ্রান্ত চোখের জলের মানে সে বুঝতে পারত না।

চপলা পেছন থেকে ধবা গলায় বলে, "বাসে করে যাস রতন, হেঁটে যাসনি।"

বতন সে কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে, কিন্তু বড় রাস্তার কাছ থেকে হঠাৎ আবার সে ফিরে আসে। তার মুখ আ৺ার গেছে বদলে। এইটুকু পথ যেতে কি সে ভেবেছে কে জানে।

চপলা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বলে, "বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না।"

বলেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গী পর্যন্ত সবল, এতটুকু ক্লান্তি যেন তার আর নেই। দেখতে দেখতে গলির মোড়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।

রাজকবি

সতীনাথ ভাদুড়ী

নতুন ডাকপিয়নটার একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব, 'দেখুন তো চিঠিখানা আপনাদের কিনা।'

বাবা মারা গিয়েছেন, বাইশ বছর আগে। তাঁরই নামে চিঠি। তিনিও ডাক্তার ছিলেন, আমারই মতো। নামের আগে ডাক্তার কথাটা দেখেই হয়তো পিয়ন কিছুটা আন্দাজ করে থাকবে। এ চিঠি কে দিল? পোস্ট-অফিসের ছাপ পড়া যায় না। খুলতেই নজরে পড়ে—Yours sincerely, Ramjash Bhattacharji. রামযশ ভট্টাচার্য! এঁর কথা কি এখানকার লোক ভুলতে পারে! গৌরী সেন বা নিধিরাম সর্দারের মতো তিনিও যে বেঁচে থাকবেন চিরকাল, একটি স্থানীয় বাক্যরীতির কল্যাণে। অলংকার-বহুল বাজে ইংরেজিতে লেখা কোনো কিছু দেখলেই এখানকার লোকে বলে, 'এ যে দেখছি রামানন্দী-নোটিস বাবা!' এই রামনন্দী হচ্ছেন শ্রীরামযশ ভট্টাচার্য। আমরা অর্থাৎ তাঁর ছাত্ররা, অবশ্য শুধু এই কারণেই যে তাঁকে মনে রেখেছি তা নয়। মনে দাগ কেটে বসবার মতো বহু কাজ তিনি এখানে করে গিয়েছিলেন। সরকারি চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া, এইটাই একজন মধ্যবিত্ত বাঙালিকে মনে করে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট; তার ওপর আবার যদি সেই মাস্টার কপালে তিনটে তিলক কাটেন, বাবরি চুল বাখেন, তাহলে তো কথাই নেই। তিনি এখানকার স্কুলে একনাগাড়ে অনেকদিন ছিলেন। প্রথমে ছিলেন অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার, পরে হয়েছিলেন হেডমাস্টার। আমরা প্রথমের দিকে বলতাম রামযশসার; পরে বলতাম এনজিনসার। বোর্ডিং-এর ছেলেরা বলত যে, উনি যখন রোজ রাত্রে জপে বসেন, তখন নাকি রেলের এনজিনের মতো হুসহুস করে শব্দ হয়। বোর্ডিং-এর কোনো নতুন ছেলে এলেই, পুরনো ছেলেদের ডিউটি হত শীতের রাত্রে হেডমাস্টারের কোয়ার্টারের বন্ধ জানালার নিচে বসিয়ে শব্দটা পরখ করিয়ে নেওয়া। সে সুযোগ, সে সৌভাগ্য আমাদের ছিল না; কেননা আমরা বাড়িতে থেকে পড়তাম। কেবল একদিন চেষ্টা করেছিলাম। সেদিন মশার-ডাক্তার ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি দেখাবেন স্কুলের হলঘরে। সেইজন্য রাত্রিতে স্কুলে যাবার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল বাড়ি থেকে। একটা বোর্ডিং-এর ছেলের সঙ্গে, এনজিনের শব্দটা স্বকর্ণে শোনবার জন্য গুটিগুটি এগোচ্ছি অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ এনজিনসারের গলার স্বর কানে এসে লাগল বুলেটের মতো, 'কে?' ভাগ্যে সে যুগে টর্চলাইটের ব্যবহার ছিল না। দৌড় দৌড়, পিছন ফিরে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই। পরদিনই নোটিশ বার হয়েছিল গালভরা ইংরেজিতে, বোর্ডিং-এর নোটিশ-বোর্ডে-- 'সর্পসমাকীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া যে কোনো কারণে চলাফেরা করিবার সময় রাত্রিতে যেন লণ্ঠন সঙ্গে থাকে, নতুবা কঠোর দণ্ড দেওয়া হইবে।' ছেলেরা নোটিশ পড়ে চোখ-টেপাটেপি করে হেসেছিল। এর কিছুক্ষণ পর একজন ছেলে বোর্ডিং-এর পাশের নিমগাছটার উপর চড়েছিল দাঁতন পাড়বার জন্য। এনজিনসার বেত নিয়ে ছুটে এসেছিলেন বাড়ি থেকে। তারপর ছাত্রদের সতর্কবাণী দেওয়া নোটিস বেরিয়েছিল— 'Henceforth, plucking of neem twigs will be considered as a sacrilege, and the culprits will be punished with an iron hand.' আমরা ইংরেজিটা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম সুবিধামতো রচনার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার

জন্য। বোর্ডিং-এর ছেলেরা, আবার চোখটপাটেপি করে হেসেছিল। এ হাসির কারণ, এনজিনসার প্রতি শনিবার কলকাতা যাবার সময়ে স্ত্রীকে বাড়ির মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিয়ে যেতেন তালা দিয়ে।

রূঢ়স্বভাব, খামখেয়ালী আচরণ, আরও বহু জিনিস তাঁর বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও, স্থানীয় ভদ্রলোকরা তাঁর উপর সে-রকম বিরূপ ছিলেন না। এর কারণ তিনি নাকি খুব ভালো হাতের রেখা দেখতে জানতেন। এ সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশোনা আছে, এই কথাই আমরা শুনতাম পিতৃবন্ধুদের মুখে। এত ভালো হাতের রেখা দেখতে জানেন, তবু দেখতাম আলখাল্লা পরা পাঞ্জাবী জ্যোতিষীর দল যখন প্রতি বছর এখানে আসত, তখন তারা কেউ খালি হাতে ফিরে যেত না তাঁর কাছ থেকে। একবার একজন নেপালী না তিব্বতী গণতকারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সকলের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছিলেন—সে লোকটা হাত না দেখেই মুখস্থর মতো গড়গড় করে লোকের ভবিষ্যৎ বলে যেত। এ ছাড়া বহু তিলক-কাটা অবাঙালি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত বাইরে থেকে। কেন আসত কে জানে। এ সম্বন্ধে বড়দের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলতেন—রামযশবাবু রামানন্দী যে। অমন বৈচিত্র্যময় চরিত্রের যে-কোনো দিক সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ কর, সব সময় আমরা ওই একই উত্তর পেতে অভ্যস্ত ছিলাম। রামানন্দী বলতে ঠিক কাদের বোঝায়, সে কথা আমি আজও জানি না; তাঁরাও কেউ জানতেন না। কাজেই কোনো সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্য করবার কথা ওঠে না; ওটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একটা কথার মাত্রা। এত জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর ঝোঁক কেন? রামানন্দী যে। এমন খাপছাড়া আচরণ কেন? রামানন্দী যে। এত গভর্নমেন্টের খয়েরখাঁগিরি করে কেন? রামানন্দী যে। তিলক কাটে কেন? রামানন্দী যে। শনিবারে শনিবারে কলকাতায় যায় কেন? গতানুগতিক উত্তর পাওয়া যেত না শুধু এই প্রশ্নটার বেলায়। কেউ বলতেন রেস খেলতে যায়, কেউ-বা বলতেন, ওই রকমই অন্য একটা কিছু; কিন্তু তাঁদের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার অভাব স্পষ্ট বোঝা যেত, কারণ তাঁদের ধারণাটা ঠিক খাপ খায় না রামানন্দীর অন্যান্য জানা আচরণের সঙ্গে। অনিশ্চয়তার এই অস্বস্তিটুকু তাঁদের চিরকাল ভোগ করতে হয়নি। বস্ত্রব্যবসায়ী সুরেন দাঁ কলকাতায় পুজোর বাজার করতে গিয়েছিল। সেখানে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় এনজিনসারের সঙ্গে। সন্ন্যাসী, ফকির, বা ভিখারী গোছের একজন লোক ফুটপাথের উপর শুয়ে রয়েছে, আর উনি তার পা টিপে দিচ্ছেন। 'মাস্টারমশাই' বলে ডাকতেই তিনি এমন কটমট করে তাকিয়েছিলেন যে সুরেন দাঁ সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। সে-ই এসে এখানে খবর দিয়েছিল। সকলেই শুনে বলেছিল—রামানন্দী কিনা! এ-সব বছর তিরিশেক আগের কথা। এই রকমই চলত। একটার পর একটা বিচিত্র গল্পের খোরাক এনজিনসার নিত্য জোগাতেন। তাঁর কিছুই যেন অন্য কারও সঙ্গে মেলে না, অনেক আচরণের কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই তাঁকে ঘিরে বেশ খানিকটা রহস্যের সৃষ্টি হয়েছিল—রহস্যের সঙ্গে কৌতুক মেশানা।....

সেই রামযশ ভট্টাচার্য রামানন্দী ইংরেজিতে বাবাকে পত্রাঘাত করেছেন পাকিস্তানের এক গ্রাম থেকে। এখানে চলে আসতে চান, সেই কথাই বেশ ফেনিয়ে লেখা। 'আপনি ওখানকার সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। ওখানে আমার কিছু সুবিধা করিয়ে দিতে পারেন কিনা জানাইলে বাধিত হইব'—এই লাইনটার নিচে লাল কালি দিয়ে দাগ দেওয়া। ঠিক কী ধরনের সুবিধা চান সে কথা চিঠি থেকে বোঝা যায় না।

বয়স হবার একটা মস্ত অসুবিধা যে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলবার মতো লোক পাওয়া যায় না। বেশি বয়সের বন্ধুত্বের খানিকটা শিষ্টাচার ও আড়ষ্টতা থাকে। আমাকে এই দুরদৃষ্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছে বাল্যবন্ধু নরেশ। অন্যসব বন্ধুরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, শুধু ও-ই এখানে থেকে গিয়েছে। হওয়া উচিত ছিল ওর কবি, কিন্তু হয়েছে কবিরাজ—পসার-প্রতিপত্তিওলা ভালো কবিরাজ। সময়ে অসময়ে শলাপরামর্শ নেবার জন্য, বা দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করবার জন্য আমি ওর কাছে যাই। এখনও চিঠিখানাকে পকেটে পুরে ওর কাছেই গেলাম।

'মহাসমস্যায় পড়েছি।'

'কী রে? কী ব্যাপার?'

'আগে কবিরানীকে চা করতে বল তো, তারপর বলছি। বেদম প্রহার দিয়ে তোর কবিতা লিখবার অভ্যাস ছাড়াতে চেয়েছিলেন একজন, তাঁর কথা মনে আছে?'

'বাবার কথা বলছিস?'

'ধুত!'

'তবে?'

'এনজিনসারের কথা মনে আছে?'

হো হো করে হেসে ওঠে নরেশ। মনে পড়েছে তার পুরনো কথা।

'মেরে কখনও কবিতা লেখা বন্ধ করা যায়। খুনেটা শেষ পর্যন্ত হার মেনে গিয়েছিল।'

এনজিনসারকে 'খুনে' বলায়, আর 'গিয়েছিলেন' না বলায়, বুঝে যাই যে তাঁর সম্বন্ধে ওর মনের ভাব তিরিশ বছরেও বদলায়নি। না বদলাবারই কথা—যা মার খেয়েছিল। দোষের মধ্যে সে বাকিংহাম প্রাসাদের ঠিকানায় ভারতসম্রাটের কাছে একখানা চিঠি লিখেছিল বিলাতের হ্যারো স্কুলে পড়বার খরচের জন্য। কবিতায় লেখা চিঠি। 'ভূতলে অতুল প্রতাপশালী ব্রিটিশ কেশরী কেতন'—এই লাইনটা দিয়ে চিঠিখানার আরম্ভ। সঙ্গে ভুল ইংরেজিতে অনুবাদ দেওয়া। বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর স্বাক্ষর, সীলমোহর ও মন্তব্য সংবলিত হয়ে চিঠিখানা শেষ পর্যন্ত হেডমাস্টারের কাছে ফিরে আসে, সমুচিত ব্যবস্থার জন্য। সে কী নির্দয় প্রহার! কেটে কেটে গায়ে বসে যাচ্ছে বেতের দাগ! এক ঘা বেত মারছেন, আর চিৎকার করে বলছেন—'এই সব করে তোমরা আমার চাকরিটা খাবে! ইংরেজি শিখছেন! কবিতা লিখেছেন!'

ছুটির পর আমরা নরেশকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম যে, ডাকে ফেলবার আগে ইংরেজিটা এনজিনসারকে দিয়ে দেখিয়ে নিলে বোধহয় এত চটতেন না। এর দিনকয়েক পরে নরেশ নিজস্ব ধরনে এই প্রহারের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ইন্সপেক্টরসাহেব স্কুল ভিজিট করতে এসেছেন। এ ইন্সপেক্টরের পায়খানা দেখবার ঝোঁকের কথা সকলেই জানে। তাই হেডমাস্টার আগের দিন নিজে দাঁড়িয়ে পায়খানার দেওয়ালের লেখাগুলোর উপর চুনকাম করিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্সপেক্টরসাহেব যখন দেখতে গেলেন, তখন দেওয়াল জুড়ে নীল পেন্সিল দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল একটি কবিতা।

রামযশ গাইবার এনজিন বাজনা
বউকে নোটিশ দেয়, শনিবার আজ না।

নরেশকে বলি—তুই নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবি। সে বলল—ধুত! বাঁ হাত দিয়ে লিখেছি।

পরদিন রামানন্দী নোটিশ বার হল, 'লালনীল পেন্সিল লইয়া কোনো ছাত্র স্কুলে আসিলে দশটাকা জরিমানা করা হইবে।'

এই কবিতাই হয়তো পায়খানার দেয়ালের শেষ কবিতা হত নরেশের; কিন্তু এনজিনসার তা হতে দিলেন না। হঠাৎ শোনা গেল গভর্নমেন্টের খোশামুদে, আর চাকরি-অন্তপ্রাণ ভদ্রলোকটি কেন যেন কাজে ইস্তফা দিচ্ছেন। প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গেল সকলে। কে খুশী হল, কে দুঃখিত, ঠিক বোঝা গেল না; সকলেই একবাক্যে তাঁকে চাকরি ছাড়তে বারণ করল। শহরের প্রবীণরা, কেন চাকরি ছাড়ছেন জিজ্ঞাসা করায়, তিনি জবাব দিলেন—'আমার ইচ্ছা'। ক্যাশবাক্স দোয়াতদানি, আরও কী কী যেন জিনিস তাঁকে দিয়ে, আমরা ঘটা করে ফেয়ারওয়েল মিটিং করলাম। জিনিসগুলো মিটিং-এর পর হেডমাস্টারের কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে যখন আমরা ফিরব তখন এনজিনসার খবর দিলেন যে গভর্নমেন্ট এখনও তাঁর ত্যাগপত্র মঞ্জুর করেনি, পুনর্বিবেচনা করতে লিখেছে। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম যে, যদি উনি সত্যিই না যান, তাহলে কি ফেয়ারওয়েলের জিনিসগুলো নেওয়া ওঁর পক্ষে উচিত হয়েছে? রামানন্দী কিনা!

স্কুলের পায়খানার দেওয়ালে কবিতা বার হল; এবার কাঠকয়লা দিয়ে—

রামযশ মহানন্দে বগল বাজায়,
ক্যাশবাক্সে বউ পুরে কলিকাতা যায়।

এবার কিন্তু ছেলেদের শাসন করবার জন্য আর রামানন্দী নোটিস বার হল না। কেমন যেন নিস্পৃহ হয়ে গেছেন এনজিনসার চাকরি সম্পর্কিত সমস্ত কাজকর্মে; ছাত্রদের শাসন সম্বন্ধে উদাসীন; স্কুলে আসতে হয় তাই আসেন; কোনো রকমে দিনগত পাপক্ষয় করে চলে যান। আমরাও বড়দের কথার পুনরাবৃত্তি করি—'একটা কোনো আঘাত পেয়েছেন, বুঝলি।'

সে সময়ে দেশে একটা স্বরাজের হুজুগ চলছিল। উনি কোনো রাজনৈতিক কারণে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন কিনা সে কথা জানবার জন্য অনেক সি. আই. ডি. এসেছে এ শহরে, শুনলাম। আরও কত রকমের কথা শোনা গেল। মাস ছয়েক পর তাঁর ইস্তফাপত্র উপর থেকে মঞ্জুর হয়ে এলে এইসব জল্পনাকল্পনা বন্ধ হয়। কবি নিজের ভুল বুঝতে পেরে পায়খানার দেওয়ালের কবিতাটা একটু বদলে দিল। ফাঁকতালে শবদটা খাটে না আর।

রামযশ মহানন্দে বগল বাজায়,
ক্যাশবাক্সে বউ পুরে খুলনাতে যায়।

তিনি চলে যাবার দিন আমরা সকলে স্টেশনে গিয়েছিলাম—কবি নরেশ পর্যন্ত। রহস্যে ঘেরা যে অসূর্যম্পশ্যা মহিলাটিকে প্রতি শনি-রবিবারে ঘরে বন্ধ থাকতে হয়, তাঁকে একবার এই সুযোগে দেখে নেবার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। মেয়ে-কামরায় চড়বার সময় তাঁর এত লম্বা ঘোমটা ছিল যে চেষ্টা করেও মুখখানা দেখা গেল না। আর সকলে যখন এনজিনসারকে নিয়ে ব্যস্ত, আমি তখন প্লাটফর্মের দিকটা ছেড়ে গেলাম গাড়ির পিছন দিকে। প্ল্যাটফর্মের দিকে পিছন ফিরে এনজিনসারের স্ত্রী বসে রয়েছেন! ঘোমটার বহর কমেছে। গালে পান। গিন্নীগিন্নী চেহারা। স্নেহের রসে ভরা করুণ চোখদুটি। আমার দিকে নজর পড়তেই নমস্কার করলাম তাঁকে। থতোমতো খেয়ে গেলেন তিনি প্রথমটায়। তারপর বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা!' চোখের কোণে কয়েকটি কুণ্ঠিত হাসির রেখা। আবার পিছন ফিরে বসবার আগে ওই রেখাকয়টির মধ্যে দিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিতে চাইলেন—'তোমরা তো আমার অবস্থা সব জানই।' মুহূর্তের জন্য একটা নিবিড় একাত্মতা অনুভব করলাম ওই অসহায়া মহিলাটির সঙ্গে। এঁকে নিয়ে ছড়া কাটবার নির্দয়তা উপলব্ধি করে মনটা খারাপ হয়ে গেল। স্কুলে ফিরে, কবির অনুমতি না নিয়ে, পায়খানার দেয়ালের কবিতাটিতে একটা সংশোধন করে দিলাম। বউ শব্দটির স্থানে বই।

রামযশ মহানন্দে বগল বাজায়,
ক্যাশবাক্সে বই পুরে খুলনাতে যায়।

বিবেক একটু তৃপ্ত হল বটে, কিন্তু অনুতাপের গ্লানি তবু গেল না।

তিরিশ বছর পরে, আজ নরেশ কবিরাজ, শ্রীরামযশ ভট্টাচার্যের চিঠিখান পড়ে প্রথমেই যে কথাটি বলল, সেটি না বললে আমি হতাশ হতাম।

'এ যে দেখছি রামানন্দী নোটিস বাবা।'

'বল, এখন কি করা যায়।'

'আরে চেপে যা, দরকার কী এ-সব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে।'

'কিন্তু বিপদে পড়ে লিখেছেন ভদ্দরলোক।'

'ও রামানন্দী আরও কত জায়গার কত গণ্যমান্য লোককে চিঠি ঝেড়েছেন, তার ঠিক কী!'

'তবু তো একটা উত্তর দিতে হয়।'

'তোর বাবার নামে চিঠি, সে চিঠির উত্তর দেবার তোর দায়িত্ব নেই।'

নরেশের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেও কিন্তু কোনো ফল হল না। চিঠির উত্তর না দিলে কী হয়, এনজিনসার ছাড়বার পাত্র নন। মাসতিনেক পর, একদিন দেখি বাক্সপেঁটরা সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ এসে হাজির আমার বাড়িতে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। এই পঁচাত্তর বছর বয়সেও দেখলাম বৃদ্ধ বেশ শক্ত আছেন। সে তুলনায় তাঁর স্ত্রীকে আরও বেশি বুড়ি বলে মনে হয়। সংকোচকাতর, ত্রস্ত চাউনি বৃদ্ধার। এনজিনসার এসে আমার নাম ধরেই ডেকেছিলেন; এর থেকে বুঝি যে স্টেশন থেকে আসবার পথে সব খবর নিয়ে এসেছেন। 'তোমার পিতার নামে একখান চিঠি দিয়েছিলাম মাসতিনেক আগে।'

কথার সুরে জবাবদিহি নেবার ইচ্ছা স্পষ্ট। তার উপর 'পিতা' শব্দটির ব্যবহার। সাবধান হয়ে গেলাম।

'সে চিঠি পাইনি তো।'

'আমিও সেই রকমই ভেবেছিলাম। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টটাতেই পচ ধরেছে। কলমটা দাও দেখি তোমার। পোস্টমাস্টার-জেনারেলের কাছে একখান কড়া চিঠি দিয়ে দিই।'

'আচ্ছা সে হবে এখন।'

'হবে মানে? ওই করে করেই তো তোমরা দেশটাকে উচ্ছন্নে দিলে!'

বুঝলাম যে ওঁর মেজাজ আগেকার চেয়েও রুক্ষ হয়েছে। কাগজ-কলম তখনই ওঁর হাতে দিয়ে তবে রক্ষে। ওঁর স্ত্রী ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে বাড়ির ভিতর পৌঁছে দিয়ে এসে বসলাম এনজিনসারের কাছে।

তাঁরা মাসখানেক আগে পাকিস্তান থেকে এসেছেন। এতদিন ছিলেন কলকাতার এক রিফিউজি ক্যাম্পে। সেখানে বিশেষ সুবিধা হল না। তাই এখানে এসেছেন। গল্প করতে করতে হঠাৎ মধ্যে একবার মুখখিস্তি করে তাড়া দিয়ে উঠলেন আমার কম্পাউন্ডারবাবুকে। ওঁর সঙ্গে আনা প্যাকিং বাক্সের উপর সে পা রেখেছিল অন্যমনস্কভাবে। ধরে মারেন আর কি, ওই বাক্সটির উদ্দেশ্যে চোখ বুঁজে প্রণাম করে আবার তিনি নিজের কথা বলতে আরম্ভ করেন। এই অনর্গল গল্প শেষ হল রাত্রে শুতে যাবার সময়। 'নাও। এইটা রেখে দিও তো। সেখানকার সব বেচে মাত্র এই দু'হাজার টাকাই তো আনতে পেরেছি।'

আমি নোটের বাণ্ডিলটা নিয়ে নিজের ঘরে যাব, তিনি আবার তাড়া দিয়ে উঠলেন, 'এত বয়স হল, তবু আক্কেল হল না তোমাদের। টাকা কখনও না গুনে নিতে আছে! Principle হচ্ছে Principle—সে তোমার বাপই হোক, আর গুরুঠাকুরই হোক!'

মন খারাপ হয়ে গেল। এই বদমেজাজী, রূঢ়ভাষী অতিথির অত্যাচার কতদিন যে সহ্য করতে হবে কে জানে! সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হবে! এর চেয়ে বরঞ্চ যদি মাসে মাসে কিছু টাকা দিয়ে রেহাই পাওয়া যেত তাহলে ছিল ভালো। এমন শরণার্থী যে তাঁকে আশ্রয় দিয়ে একটা সৎকাজ করবার তৃপ্তিটুকুও পাওয়া যায় না।

অপ্রসন্ন চিত্ত নিয়েই গিয়েছিলাম নরেশের কাছে।

'এনজিনসার এসেছে! বলিস কী! ক্যাশবাক্সটা এনেছে? দেখিসনি? সে বুড়ির বয়স কত হবে রে এখন? সত্তর হবে? ঘোমটার বহর? বুড়ো বলল নাকি যে ওই বয়সের মেয়েছেলেদের নিয়েও আর থাকবার উপায় নেই সেদেশে? ধানের জমি আর নারকোল-সুপুরির বাগান ক'শ বিঘা বলল? যে আসে তারই মুখে শুনি ওই! আরে, পূর্ববঙ্গে কি তিনশ বিঘার কম জমি কোনো লোকের থাকত না রে! কথাবার্তা সেই রকমই উগ্রবীর্যের মতো আছে নাকি? তার চেয়েও বেড়েছে! বলিস কী! বিদায় করে দে, বিদায় করে দে যত তাড়াতাড়ি পারিস! নইলে কোনোদিন তোকেই ঠেঙিয়ে বসবে! কী করতে চান তিনি এখানে এই বয়সে? সেসব জিজ্ঞাসা করিসনি! কী রে তুই! এই বয়সে স্কুলমাস্টারি করতে কি আর পারবে? প্রাইভেট টুইশানি করতে পারে হয়তো। কিন্তু খুনেটার হাতে কে তার ছেলেমেয়েকে ছেড়ে দেবে বল। পুরুতগিরিও তো করবে না নিশ্চয়ই—রামানন্দী যে। রাত্রিতে শুনিস তো আজ, এখনও এনজিনেব শব্দ করে কি না! রিলিফ-টিলিফ পাবার তদবির একটু করে দিলেই হবে, যত তাড়াতাড়ি পারিস বাড়ি থেকে বিদায় কর।'

নরেশ তো উপদেশ দিয়েই খালাস। কিন্তু এনজিনসার যাবার নামও করেন না। ভবিষ্যতে কী করতে চান, সে সম্বন্ধে , কোনো আভাস দেন না। ডিসপেনসারির মধ্যে বসে সারাদিন কোষ্ঠী, ঠিকুজি, সামুদ্রিকবিদ্যা, আর হস্তরেখা বিচার সম্বন্ধে গল্প করেন অনর্গল, আমার রুগিদের সঙ্গে। তাঁকে থামাবার জন্য একদিন জিজ্ঞাসা করলাম 'আচ্ছা, হাতের রেখা দেখে কি সত্যিই লোকের ভবিষ্যৎ বলা যায়?'

ভেবেছিলাম চটে উঠবেন, কিন্তু দেখলাম যে আমার অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে থতোমতো খেয়ে গেলেন তিনি। চকিতের জন্য যেন বিষাদের ছাড়া পড়ল তাঁর চোখমুখে। বললেন, 'আমার নিজের যা ধারণা —ভালো জ্যোতিষীদের কথাও সম্পূর্ণ ফলে না আজকাল। ফলে ধর—এই—শতকরা সত্তর ভাগ— সেভেন্টি পারসেন্ট। জ্যোতিষীদের দোষ নেই; তারা তো বইটই ঘেঁটেই বলবে; তার থেকে ওই সেভেন্টি পারসেন্ট-এর উপরে ফল পাওয়া যায় না। তোমার কাছে তো আর মিথ্যা কথা বলতে পারি না। এ শাস্ত্রের কোনো বই পড়তে বাদ রাখিনি। সেকালের মুনিঋষিরা লিখে গিয়েছিলেন সব ঠিকই—আমরাই বোধ হয় মানে বুঝতে ভুল করে, হিসাবে একটু এদিক-ওদিক করে ফেলি। সেসব আমাদেরই অজ্ঞানতা। তাই কিছু-কিছু অংশ ফলে না। তবে তোমরা—আজকালকার ছেলেছোকরার দল—যারা জ্যোতিষশাস্ত্রে অবিশ্বাস করো—তাদের বলি—আগে শাস্ত্রটা পড়ে দেখ, তারপর বিচার করতে এসো। একজন ভণ্ড মুর্খ কাকে কী হাত দেখে বলেছে, আর সেইটা মেলেনি বলে তো আর একটা

শাস্ত্রকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তুমি যদি পড়তে চাও তো আমার ওই দুটো প্যাকিংবাক্সে ভরা জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বই আছে; পড়ে দেখতে পার। শুধু ওইগুলোই তো আনতে পেরেছি পাকিস্তান থেকে। তোমার পড়ায় আমি সাহায্যও করতে পারি।'...একটা বাড়ি থেকে রুগি দেখবার জন্য ডাকতে আসায়, আমি তখনকার মতো রক্ষা পাই।

এনজিনসারের স্ত্রী কিন্তু দেখলাম অন্য ধরনের মানুষ। প্রাথমিক সংকোচটুকু কাটবার পর বোঝা গেল তিনি কত ভালো। কি মিষ্টি কথা! একেবারে আপন করে নেওয়া ব্যবহার। স্বামীর আচরণে সব সময় একটু কুণ্ঠিত ভাব। স্ত্রীর দেখাদেখি আমিও তাঁকে মাসিমা বলতে আরম্ভ করলাম। বেঁধে খাওয়ানো, ছেলেমেয়েদের রূপকথা শোনানো, হাসি, গল্প—ইনি একেবারে অন্য মানুষ। শুধু এনজিনসারের খড়মের শব্দ শুনলেই ভয়ে কাঠ হয়ে যান।

ভদ্রমহিলা যত ভালোই হোন, বর্তমান ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে পারে না। ভয় হতে লাগল, এনজিনসারের কল্যাণে আমার রুগি না হাতছাড়া হয়ে যেতে আরম্ভ করে। একদিন একজন দাঁতের ব্যথার রুগিকে ঝাড়া দেড় ঘণ্টা বোঝালেন যে, গার্গী বলে কেউ ছিলেন না—গর্গমুনির লেখা পুঁথিগুলোর নামই গার্গী। সেই রাত্রিতেই চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে ওঁকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরকমভাবে তো চিরকাল চলতে পারে না।'

'সে তো নিশ্চয়ই।'

'ছেলে পড়াবেন?'

'ওদিকে আবার আমি যাই!'

'পৌরোহিত্য?'

'খেপেছ।'

'তবে? একটা কিছু করতে তো হয়।'

'সে তো করবই। তুমি কি ভেবেছ যে তোমার ভরসাতেই আমি ঘরবাড়ি ছেড়ে এতদূর এসেছি।'

'না না, সে কথা কি আমি বলছি। আমি বলছি, যদি কিছু সাহায্য করতে পারি আমরা, আপনার কাজে।'

'ছাই করবে তোমরা। দাও না বড় রাস্তার উপর একটা ছোট বাড়ি জোগাড় করে। খুব তো ফপরদালালি করছ।'

'দোকান দেবেন নাকি?'

'পাগল।'

'এখন বাড়ি পাওয়া শক্ত। দু-তিন বছর আগে কত বাড়ি খালি হয়েছিল। আপনি যদি ঘর-দুয়োর ছেড়ে আসাই ঠিক করলেন, তবে এ দু-তিন বছর দেরি করলেন কেন? দেশ ভাগ হওয়ার সময়ই চলে এলেন না কেন?'

'আমার সময় হবে, তবে তো আমি আসব।'

কথাটা আমি ঠিক বুঝলাম না। তবু বলতেই হল, 'তা তো বটেই।'

শেষ পর্যন্ত খুলেই বললেন। তিনি জ্যোতিষীর কাজ করতে চান। কলকাতায় বসলেই ঠিক হত; কিন্তু সেখানকার বাসাভাড়া তাঁর মতো লোকের পক্ষে জোটানো সম্ভব নয়; তাই পিছিয়ে গিয়েছেন সে সংকল্প থেকে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে আসা।

নিজের গরজে, সরকারী মহলে তদ্‌বির করে এনজিনসারের জন্য একটা ছোট বাড়ি

জোগাড় করা গেল। আগে এটা ছিল পশমী শাল আলোয়ানের দোকান। আলমারিতে বই, তক্তাপোশে শীতলপাটি, আর কুলুঙ্গিতে ধুনুচি দিয়ে ঘর সাজানো হল। পাঞ্জাবী শালওয়ালাটা চলে গেছে পাকিস্তানে; কিন্তু তার জীর্ণ সাইনবোর্ডখানা তখনো দেওয়ালে টাঙানো ছিল। সেইটাতে নতুন করে রং দিয়ে লেখা হল, রাজজ্যোতিষী শ্রীরামযশ ভট্টাচার্য। 'রামানন্দী নোটিস' ছাপিয়ে আমার ডিসপেন্সারির টেবিলের উপর গাদা করে রাখা হল, রুগিদের মধ্যে বিতরণের জন্য। আমি শুধু বলেছিলাম, 'ইংরেজিতে হ্যান্ডবিল দিয়ে লাভ কী?' সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর পেয়েছিলাম 'পয়সাটা খরচ হচ্ছে আমার না তোমার? আমার নিজস্ব ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে আস কেন বল তো!'

তবু তারপরও আমি যথাসাধ্য করেছি ওই পরিবারটির জন্য। সে কেবল ওই মৃদুভাষিণী বৃদ্ধাটির কথা মনে করে। আমার স্ত্রী মাসিমা বলতে পাগল; ছেলেমেয়েরা একদিন দিদিমার দেখা না পেলে হাঁপিয়ে ওঠে। তাঁদের খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে যেত খুব সকাল-সকাল। তারপরই তিনি চলে আসতেন আমাদের বাড়িতে, প্রত্যহ। মুখে একমুখ হাসি নিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কী, ছেলের খাওয়া এখনও হয়নি?' আমার খেতে-খেতে দুটো বেজে যেত। তিনি পাখা হাতে কবে খাওয়ার কাছে বসতেন। তারপর হামানদিস্তায় ছেঁচা পান মুখে দিয়ে আমার স্ত্রীব সঙ্গে গল্পগুজব করে, বেলা চারটের সময় ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে আসবার পর বাড়ি ফিরতেন। এ তাঁর নিয়মিত কাজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঠিকুজি কোষ্ঠী তৈয়ারি করে এই ছোট শহবে কত আর রোজগাব করা যায়; তার উপর ওই মেজাজ। সেইজন্য আমার স্ত্রী নানা রকমের জিনিসপত্র দিযে মাসিমার অভাবেব সংসারে সাহায্য করবার চেষ্টা করতেন। মাঝে-মাঝে অর্থ সাহায্যও করতে হত—অবশ্য রাজজ্যোতিষীকে লুকিয়ে।

আমার মতো নরেশও ঠিকুজি কোষ্ঠীর ধার ধারে না। তাব মেয়ের যেখানে বিয়ের কথা হচ্ছে, তারা ঠিকুজি চেয়ে পাঠিয়েছে—পাত্রটি ভালো—হাতছাড়া না হয়ে যায়—আমিই বললাম—'রাজজ্যোতিষীকে দিয়ে করিয়ে নিলে কেমন হয়। বৃদ্ধার বড় অভাব। এই সুযোগে তাঁকে দু-চার টাকা বেশিই দিয়ে দিতে পারিস। মেয়ের দেবগণ হলে যে-কোনো ছেলের কোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে যাবে।'

নরেশ ইতস্তত করছিল। শেষ পর্যন্ত আমার কথাতে গেল। রাজজ্যোতিষীকে প্রণাম করে, যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর একখানি দশ টাকার নোট তাঁর পায়ের কাছে শীতলপাটির উপর রাখে।

'কী উদ্দেশ্যে?'

'আজ্ঞে, একখান ঠিকুজি তয়ের করে দিতে হবে।'

'কার?'

'আমার বড় মেয়েটির।'

'বিবাহ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ বেশ। কোষ্ঠী না মিলিয়ে কখনও বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। জন্মপত্রিকা না মিলিয়ে বিবাহ করে, আমি নিজে ভুগেছি সারাজীবন। কী অশান্তিই যে গিয়েছে চুয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত। মেয়ের জন্মের সময়টা লিখে এনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দয়া করে একখান দেবগণওয়ালা কোষ্ঠী তয়ের করে দেবেন স্যার।'

আর যাবে কোথায়! এত বড় ধৃষ্টতা বরদাস্ত করবার পাত্র এনজিনসার নন।

'কী! এত বড় কথা! আমাকে মিথ্যা জন্মপত্রিকা তয়ের করে দিতে বলছ! টাকা দেখাতে এসেছ!' নোটখানাকে নিয়ে, টেনে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে তিনি ফেলে দিলেন মেঝের উপর।

'যাও! নিকাল যাও! আভি নিকালো!'

অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে তিনি নরেশকে ঘর থেকে বার করে দিলেন। লোক জমে গেল সেখানে।

এনজিনসারের স্ত্রী ছুটে এলেন আমার কাছে। চোখে জল। এত বিহুল তাঁকে আমি কখনও দেখিনি।

'আমারই হয়েছে মরণ। একেবারে জ্বলেপুড়ে ম'লাম এক পাগলের হাতে পড়ে! এর চেয়ে মা-বাপ গলায় পাথর বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেয়নি কেন! নিজে যা সহ্য করেছি সারা জীবন সে কেবল আমিই জানি--আর জানেন অন্তর্যামী। কিন্তু লোকের কাছে যে মুখ দেখানো ভার। অতবড় একজন লোক—নরেশ কবরেজ—তাঁকে বুড়ো কী গালাগালিটাই না করল। আমি না হয় জানি, পাগল; লোকে তা বুঝবে কেন। কত সময় ভেবেছি আত্মহত্যা করি; তাও করিনি ওই পাগলের জন্যে। পাগল কি সোজা পাগল! দেশের বাড়িতেও গ্রামসুদ্ধ সবাই ওকে জানত বদ্ধপাগল বলে। এখান থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাবার পর খেয়াল হল শাক-সবজির বাগান করব—নিজ হাতে। বেশ তো করো না—কে বারণ করছে। প্রথমেই গিয়েই পশ্চিমের নারকোল বাগানটা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা হল। পাড়ার মাথারা এসে কত বোঝালেন --নারকোল গাছের মধ্যে কি শাক-সবজি ফলে –তার চেয়ে বাড়ির পিছনে খালি জায়গাটুকু ঘিরে তাতেই তরকারির বাগান করো। কে কার কথা শুনছে—আমি ওই নারকোল-বাগানের মধ্যেই তরকারি ফলিয়ে দেখাব। দেখাও। পৃথিবীর আর সবাই বোকা, যত বুদ্ধি সব ভগবান দিয়েছেন ওরই মাথার মধ্যে পুরে। মুখ থেকে একবার যে কথাটা বার হবে, সেটার কি নড়চড় হবার জো আছে! নিজ হাতে বাগান করব মানে সত্যিকারের নিজ হাতে--নিজে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে বাগান করা—নিজে শাবল দিয়ে এক-কোমর গর্ত করে তার থেকে ইটপাটকেল বাছা--সব নিজ হাতে। পারবে কেন? সব কোনোদিন অভ্যাস থাকলে তো পারবে। ফলল হয়তো দু'গাছ সরু সরু ডাঁটা। তারই পিছনে কী মেহনত। যেসব মাসে রোদ্দুরের তেজ বেশি, সেসব মাসে বাগান কোপাতে যেত রাত্রিতে। সাপখোপের সময়। আমি ভয়ে মরি। জপতপ সব গেল বুড়োর; কেবল বাগান আর বাগান। পাগল আর কাকে বলে। না-হয় দুটো লোকই রাখ। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে সে কথা তোলে ওই পাগলের কাছে। আমাকে তো জিজ্ঞাসা করে না কোনো কথা কোনোদিন—করতে জানে শুধু হুকুম। মুখ থেকে হুকুমটা বার করতে যেটুকু দেরি; তারপর এই দাসীবাদী তো হাজিরই রয়েছে। পান থেকে চুন খসুক। শুধু কি ধমক আর রাগারাগি! মার পর্যন্ত খেয়েছি। সে কি একদিন দু'দিন। কতদিন। থাকগে—সেসব কি অপরের কাছে বলবার মতো কথা! কাকে দোষ দেব—দোষ আমার কপালের। ওর চোখের দিকে আমি কোনোদিন তাকাতে পারি না ভয়ে—এই বুঝি চোখ রাঙিয়ে চিৎকার করে উঠল।...নিজে থেকেই দু-চার বছর বাগান করবার পর খেয়াল হল যে তরকারির জমির সব রস নারকোল গাছে টেনে নিচ্ছে। ওর ওষুধ কী হল জান? তখনই হুকুম হয়ে গেল নারকোলগাছ কাটবার। আহা রে। দু'শটা ফলন্ত নারকোলগাছ! তারপর মনের মতো তরকারির বাগান হল। ওইখানেই করা চাই। বদ্ধ পাগল! একবার নষ্টচন্দ্রের রাত্রিতে ছেলের দল এসেছিল

শসা চুরি করতে—ও বুঝি তখন বাগানে কাজ করছিল—অন্ধকারে কোদাল ছুঁড়ে একটা ছেলেকে এমন মেরেছিল যে খুনের দায়ে পড়বার জোগাড়। পাড়ার লোকে সেবার বুড়োকে মারধরও করেছিল। করবেই তো। সবাই তো আর আমার মতো কেনা বাঁদী না। তবু ভালো যে চিরকালই লোকজনের সঙ্গে আমার দেখাশোনা কম। এখানে এসে পাবার মধ্যে তো পেয়েছি তোমাদের। তাও আমার অষ্টপ্রহর ভয় যে তোমাদের সঙ্গে একটা দুর্ব্যবহার করে না বসে। অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়! তুমি বাবা, একটু নরেশ কবরেজকে বুঝিয়ে বোলো, তিনি যেন আজকের অপমানের কথাটা মনে করে না রাখেন। আমি যে তাঁর সম্মুখে বার হই না, হইলে আমি নিজেই যেতাম তাঁর কাছে! বোলো যে বুড়ো পাগল—একটা পাগলের কথায় কি রাগ করতে আছে। সে পাগলের আর কী, আমারই মুখ দেখানো ভার!'...দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে মাসিমার। কী বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেব, ঠিক করতে না পেরে, আমরা চুপ করে থাকি।

দেখা হতে, নরেশ কিন্তু ভাব দেখাল যেন কিছুই হয়নি। আমার মনে হল যেন সে ইচ্ছা করেই অতটা হাসিখুশী ভাব দেখানোর চেষ্টা করছে। যেতেই কবিতা আওড়াল,

'এতদিনে জানলেম
বউকে যে বাঁধলেম
তালা দিয়ে রাখলেম
সে কিসের জন্য,
হাত গোনা গোষ্ঠীর
গরমিল কোষ্ঠীর
জন্য রে জন্য।'

'চুয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত এই বিপদ ছিল বুড়োর।' হো হো করে হেসে সে বুঝিয়ে দিল যে, এনজিনসার আজ ভুলে এই কথাটা স্বীকার করে ফেলেছে তার কাছে।

নরেশের কবিতা লিখবার ক্ষমতা দেখে আমি চিরদিন অবাক হয়েছি; কিন্তু তার রুচির প্রশংসা কোনোদিন করতে পারিনি। এনজিনসারকে নিয়ে ছড়া কাটবার সময়, সে তাঁর স্ত্রীর নাম ওর মধ্যে টেনে আনবেই আনবে! সে বেচারী কী দোষ করেছে! সেই পায়খানার দেওয়ালের ছড়াগুলো থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কোনোটাতেই সে সেই অসহায়া মহিলাটিকে রেহাই দেয়নি। কিন্তু এ কথা আজ নরেশকে বলার সাহস নেই আমার। আমার কথাতেই সে রাজজ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিল ঠিকুজী করাতে। আজকের অঘটনের জন্যে নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। তাই নরেশের মন জুগিয়ে কথা বলতে হল।

'জানিস, রাজজ্যোতিষী একদিন আমার কাছেও আর-একটা কথা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আজকালকার সবচেয়ে ভালো জ্যোতিষীর গণনারও মাত্র সত্তর পারসেন্ট সত্যি হয়।'

'তাই বলেছে নাকি? তাহলে আমি বলছি, তুই লিখে রাখ—ওর ধারণা যে ওর স্ত্রী ওই তিরিশ পারসেন্ট-এর মধ্যে পড়েছে। ও ধরে নিয়েছে যে ওর স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে গণনাটা ভুল। তাই আজকাল নিরাপদ মনে করে তোদের বাড়িতে যখন-তখন আসতে দিচ্ছে।'

নরেশের ঘর-কাঁপানো হাসির মধ্যে আমার মৃদু আপত্তি কোথায় তলিয়ে গেল।

'এমন এক-একটা কবিরাজী গুলি তুই থেকে-থেকে বার করিস।'

'শোন্ শোন্! ছড়া শোন্।

খড়িপাতা গণনার আহা মরি ছিরি সে
গিন্নীকে ফেলেছেন শতকরা তিরিশে।'

'তুই কবির দল খুললি না কেন রে?'

'কবির দল খুললাম না কি আর সাধে! যে লোকটা আমার বাঁধা গান সংশোধন করে দিত, সে দেখলাম ডাক্তার হয়ে গেল। মনের দুঃখে আমাকে হতে হল কবিরাজ।'

এই আবহাওয়ার মধ্যে মাসিমার অনুরোধের কথাটা আর তুলতে পারলাম না নরেশের কাছে সেদিন।

এর কিছুকাল পর, একদিন বেলা গোটাদশেকের সময়; বাজারে হইচই শোনা গেল। কম্পাউণ্ডার খবর দিল রাজজ্যোতিষীর বাড়িতে পুলিশের গাড়ি এসে থেমেছে। সঙ্গে আছে শালওয়ালাটা।

'কোন শালওয়ালা?'

'রজব আলি, পাঞ্জাবী—ওই যে, যে আগে থাকত ওই বাড়িতে। বাড়িটাড়ি খালি করাবে বোধ হয়।'

'কেন, আবার ফিরে আসবে নাকি পাকিস্তান থেকে?'

শালওয়ালার পুরনো সাইনবোর্ডটা রাজজ্যোতিষী রঙচঙ করে বদলে নিয়েছে। সেই সংক্রান্ত কিছু নয় তো? তুমি একবার দৌড়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এস না, কী ব্যাপার।'

কম্পাউন্ডার ফিরে এল ঘণ্টাখানেক পর। ব্যাপার কিছুই বোঝা গেল না। পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। অফিসারদের সঙ্গে শালওয়ালা বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে। বহুক্ষণ হয়ে গেল, বাইরে বার হবার নাম নেই।

কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও, দারোগা-পুলিশের ব্যাপার বলে, আমি আর ওদিকে ঘেঁষলাম না

দুপুরে খেতে বসেছি। স্ত্রী বললেন, 'মাসিমা এলেন না এখনও; অসুখ-টসুখ করল নাকি কে জানে।'

'আসবেন কী করে। ওঁদের বাড়িতে যে এখনও পুলিশ রয়েছে।'

সমস্ত ব্যাপারটা বললাম। স্ত্রী তো চেঁচামেচি কান্নাকাটি করে অস্থির। 'তোমার একবার যাওয়া উচিত ছিল না?'

কথার খোঁচাটা গায়ে মাখলাম না। 'রুগি ফেলে আমি যাই কী করে?'

পুলিশ ভ্যানের হর্নের শব্দ শোনা গেল।

'ওই পুলিশরা চলে গেল।'

'ধরে-টরে নিয়ে গেল না তো? খাওয়া হলে তুমি একবার যাও। আমার নিজেরই যে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে!'

'হ্যাঁ, সে তো যাবই।'

খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—দড়াম করে ধাক্কা দিয়ে সদর দরজা খুলবার শব্দ হল হুড়মুড় করে রাজজ্যোতিষী এসে ঢুকলেন। বৃদ্ধ হাঁপাচ্ছেন। ছুটতে ছুটতে এসেছেন। উল্লাসের আতিশয্যে পরিবেশের কথা ভুলে গিয়েছেন। চিৎকার করে বললেন, 'ফলেছে। ফলেছে!'

আমার স্ত্রী মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'মিথ্যা কি কখনও হতে পারে সেসব কথা? আমরা মূর্খ মানুষ, তাই ওই শাস্ত্রের উপর সন্দেহ করি। তোমায় একবার বলেছিলাম না সত্তর পারসেন্ট ঠিক হয়। আমার সে ধারণা ভুল। প্রায় সব ঠিক হয়। একটু-আধটু এদিক-ওদিক হতে পারে। বলছি, বলছি, সব বলছি। এখানে নয়। চলো বসবার ঘরে।'

সেখানে গিয়ে গল্প আর ফুরোয় না। এত খোশমেজাজে তাঁকে কোনোদিন দেখিনি এর আগে।...

'আমি যে তক্তাপোশখানায় শুই, ঠিক তার নীচে সিমেন্টের মেঝে খুড়ে শালওয়ালা বার করলে টাকাকড়ি, গয়না-গাটি। পুঁতে রেখে গিয়েছিল পাকিস্তানে চলে যাবার সময়। বোঝো একবার ব্যাপারটা! তোমরা আজকালকার ছেলে—বিশ্বাস কর না এসব—বোঝ। ওতে কি ভুল হবার জো আছে! ও কি শুধু আমার মতো হেঁজিপেঁজি দৈবজ্ঞের গোনা! যিনি আমায় বলেছিলেন তিনি কি সাধারণ মানুষ—এতদিনে বোধহয় দেহ রেখেছেন—কলকাতায় ক্যাম্পে থাকবার সময় খোঁজ করেছিলাম তার—দেখা পাইনি। কতদিন কত সেবা করে, তাঁর মুখ থেকে মাত্র ক'টা কথা বার করে নিতে পেরেছিলাম। যখন বললেন, তখন যেন চোখের সম্মুখে আমার দেশের বাড়ির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি দেখতে পাচ্ছেন। বলেছিলেন যে চুয়াত্তর বছর বয়সের মধ্যে, পূর্বতন কারও পোঁতা গুপ্তধন আমার আয়ত্তে আসবে। আমি প্রতি সপ্তাহে কলকাতায় গিয়ে, তাঁর কাছে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকি —জিজ্ঞাসা করি কোথায় পাব। শেষকালে বলেছিলেন, বাড়ির পশ্চিমে নারকোল-বাগানে। এর পরই আমি চাকরি ছেড়ে চলে যাই দেশে। তিনি বলেছিলেন যে আমার যা-কিছু ভালো আর যা-কিছু মন্দ সব ঘটবে ওই চুয়াত্তর বছর বয়সের মধ্যে। পাকিস্তান হবার পরও যে ওখানে তিন বছর দেরি করলাম সে শুধু ওই চুয়াত্তর বছর পেরোয়নি বলে। বোঝো—ব্যাপারখানা বোঝো—একেবারে হুবহু ফলে গিয়েছে—শুধু জায়গার আর সময়ের একটু এদিক-ওদিক। একসময় আমারও সন্দেহ এসেছিল মনে,— স্বীকার করেছি,—তিনি ক্ষমা করবেন।'...

চোখ বুঁজে রাজজ্যোতিষী সেই স্বর্গগত মহাত্মাকে প্রণাম জানিয়ে আবার আরম্ভ করলেন, 'তার মতো কত সর্বজ্ঞ লোক আমাদের দেশে আছেন; কিন্তু তাঁরা তো নিজেদের ঢাক পিটিয়ে বেড়ান না। Full many a gem of purest ray screne...এখানে screnest লিখল না কেন বল তো? purest যখন রয়েছে, তখন ওটা নিশ্চয়ই উচিত screnest!'...

অবান্তর কথা আসায় বুঝি যে ওঁর কাজের কথা শেষ হয়েছে। আবার এখনই কাগজ-কলম না চেয়ে বসেন বিলাতের পণ্ডিতদের কাছে চিঠি লিখবার জন্য!

'আপনার স্নানাহার হয়েছে?'

'না। আজ আর সে সময় পাওয়া গেল কোথায়। এতক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই ভাতেভাত চড়িয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, চলি। অনেক বেলা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আসুন; আর দেরি করবেন না। মাসিমার রান্না হয়তো এতক্ষণে হয়ে গিয়েছে।'

'তুমি আবার আসছ কোথায়?'

'একবার দেখে আসি, কেমন মেঝে-টেঝে খুঁড়ে পুলিশে তছনছ করেছে ঘর।'

'না না!'

গলার স্বরে চমকে উঠলাম। রাগ আর বিরক্তি সে স্বরে সুস্পষ্ট। হনহন করে চলে গেলেন তিনি।

আমার স্ত্রী দেখলাম খিড়কির দরজা দিয়ে উঠোনে ঢুকছেন; হাতে পাথরের বাটিতে কী যেন ঢাকা।

'মাসিমাকে দেবার জন্য একটু দই নিয়ে গিয়েছিলাম; দেখলাম দরজায় তালা দেওয়া। আমাদের বাড়ি ছাড়া আর তো উনি কোথাও যান না! এরই মধ্যে বেরিয়ে গেলেন কোথায়?'

কী আর জবাব দেব। কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাবদ্ধ করে রাখে, আমরা তার কী করতে পারি! কোনো অধিকার নেই আমাদের। বৃদ্ধের উপর একটা রুদ্ধ আক্রোশে মন বিষিয়ে উঠল।

নরেশকে গিয়ে সব বললাম।

সে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁ রে, রাজজ্যোতিষী কথাটার মানে কী রে? রাজাদের জ্যোতিষী, না জ্যোতিষীদের রাজা?'

'কে জানে! ইনি কিন্তু রামজ্যোতিষী বাবা!'

'যা বলেছিস। কিন্তু শুনে রাখ।

চড়ুইপাখিরা সবে করে কানাকানি
জ্যোতিষীর রাজ নিয়ে হবে টানাটানি।'

'ঠিক বুঝলাম না কথাটার মানে।'

'বুঝলি না? কী রে তুই! অত খুলে বললে কি কবিতার রস থাকে? আজ থেকে রাজজ্যোতিষী আবার আগেকার মতো রাত্রিতেও জেগে পাহারা দিতে আরম্ভ করবে নাকি রে? শোন তবে খুলেই বলি—

মইয়ে-চড়া অধীনের ভাব দেখি ছবি,
আজ রাতে কবিরাজ হবে রাজকবি।।

এই প্রৌঢ় বয়সেও নরেশ তাই করে ছাড়ল। এবার পায়খানার দেওয়ালে নয়, রাজজ্যোতিষীর সাইনবোর্ডে; বাঁ হাত দিয়ে নয়, ডান হাত দিয়ে; কাঠকয়লা দিয়ে নয়, আলকাতরা দিয়ে। পরদিন সকালে দেখা গেল, 'রাজ'-এর জায়গায় 'রাম' লিখে সে আমার কথাপ্রসঙ্গে বলা সংশোধন মেনে নিয়েছে। সাইনবোর্ডের পাশের দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা প্ল্যাকার্ড আঁটা। তাতে বড়-বড় অক্ষরে লেখা—

রামানন্দী নোটিস (বাংলায়)
রামযশ, রামানন্দী, হেডমাস্টার,
তারপরে হয়েছিল এনজিনসার।
রাজজ্যোতিষীর পর বাকি কত আর,
অষ্টোত্তরশত নাম মানিল যে হার।
দেখ নামের কী বাহার।

এরপর তর্জনী-সংকেতে দেখানো, সাইনবোর্ডের 'রামজ্যোতিষী' শব্দটি।

ইচ্ছা হল ওর হাতখানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিই। সত্যিই রাজকবি হবার যোগ্য। আমার আনন্দ যে আজকের ছড়াটির মধ্যে সে মাসিমার নাম টেনে আনেনি। এতদিনে বুঝি তাঁর দুঃখে ওরও প্রাণ কেঁদেছে!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কান্না গল্পের সাত বছরের ছিচকাঁদুনে মেয়েটা মাইরি আমায় অবাক করেছে। যেমন মা-বাবা, তেমনি মেয়ে। শুধু কান্না আর কান্না। যত চাও রুটি খাও শুনে কোথায় খুশিতে ডগমগ হবে, ভাববে যাকগে, আজকে পেটটা আমার ভরবেই ভরবে—তা নয়, এক মুঠো ভাতের জন্য কান্না। রেশনের চালের ভাত! রুটি এমনি চিবোলে মিঠে লাগে, একটু গুড় পেলে মাখিয়ে নিলে হয়ে যায় একেবারে পাটিসাপটা পিঠে। রুটি খেয়ে পেট ভরে জল খাও, তার কাছে নাকি ভাত খাওয়ার পেট ভরা! ছিটেফোঁটা ডাল, এইটুকু তরকারী, তাই দিয়ে ছিরি আছে নাকি ভাত খাওয়ার?

প্রাণটা ভাত চেয়ে চোঁ চোঁ করে বৈকি ভেতো মনিষ্যির। বড়দের আরও বেশি করে। কিন্তু ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসলে প্রাণটা যে আবার লাগসই পরিমাণে ডাল তরকারি মাছ চায় মশাই! শুধু ডাল হোক, শুধু একটা তরকারী হোক, তাই দিয়ে এক দিস্তে রুটি মেরে দেওয়া যায় (যেন এক দিস্তে রুটি গরিবদের মেরে দিতে দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ-পোষক সদাশয় কংগ্রেস সরকার)। রুটি স্রেফ ভুলিয়ে দেয় মাছের শোক! বাটিভরা ডাল নেই, ভাজা নেই (তেল লাগে) চচ্চড়ি, শুক্ত, মরিচঝোল, ডালনা-ফালনার যে কোন একটা যদি থাকে তো দু গেরাসের বেশি ভাত মাখার মতো নেই, নাকে একটু আঁশটে গন্ধ নেই—সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রাত এগারোটায় হয় কাদার মতো গলা গলা আর নয়তো কড়কড়ে শক্ত ভাত খেতে পেয়ে কে যে সুখে একদম গদগদ হয় বাংলায়?

ঠাণ্ডা বরফ ভাত!

সেটা ভুললে চলবে না। রান্না হয় সন্ধ্যায়—গুদাম-পচা সরকারী চালের বোটকা গন্ধেই বুঝি ন্যাকা মেয়ের ভাতের জন্য কান্না বাড়ে।

কর্তাকে গরম গরম ভাত দিয়ে খুশী করতে যে গিন্নি রাত এগারোটা পর্যন্ত উনানে কয়লা পোড়াবে, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে সে কর্তা ব্যক্তিটা সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত খেটে মরে, সে মানুষটা গিন্নির সাথে কাব্যি করবে না, মারবে এক চাঁটি।

গাঁ-ঘেঁষা ঘর। যতীনের একগণ্ডা ছেলেমেয়ে আব্দার তোলে শুনতে পাই, এবেলা রুটি করো মা, রুটি করো। করো না রুটি। আটা কম তো কম করে করো না! ভাতের সঙ্গে একটা দুটো করে খাব।

'বাবারে বাবা, কি রুটিই তোরা খেতে পারিস।'

'একটা করে দিও।'

'দাঁড়া দেখি হিসেব করি।'

হিসাব ছাড়া পথ নেই। সব বিষয়ে সব কিছুর গোনা-গাঁথা ওজন করা হিসাব দিয়ে কোনো মতে দিন গুজরান। আটার পরিমাণ দেখে অবলা তার জীর্ণ পুরনো সেলাই করা ব্লাউজটা গা থেকে খুলে ফেলে দিতে দিতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

'নাঃ, এবেলা রুটি হবে না।'

শুধু এ বেলা নয়, এ হপ্তার বাকি কটা দিন আর রুটি পাবে না কেউ, ভাতের সঙ্গে দু-খানা-একখানাও নয়। সকাল আটটায় বেরিয়ে রাত এগারোটায় ফিরবে যে মানুষটা, কদিন তার বাইরে খাবার জন্য রুটি করে দিতেই এ আটাটুকু লেগে যাবে। বাইরে কিনে খেতে বড্ড খরচ।

তবু আব্দারের কলরব ওঠে—ছোট দুজনের। তারা এখনো ভাবজগতের মায়া একেবারে কাটিয়ে উঠে বাস্তব জগতের কঠোরতা সম্পূর্ণ মানতে পারেনি, এখনো বুকে আশা নিয়েই আব্দার করে। তবে এক ধমকে তারা থেমে যায়।

সাত বছরের মেজ মেয়েটা ফোঁস করে ওঠে, 'তুমি সব বাবার জন্যে রেখে দেবে। আমরা ভেসে এসেছি? বাবা বলে কত কিছু কিনে খায়—'

তার গালে একটা চড় পড়ে সশব্দে।

চড়চাপড় এই মেয়েটাই খায়। ওর স্বাস্থ্যটাই ভালো, খিদেও বেশি—ওই বেশি খাই খাই করে। অন্য তিনজনেই রোগা দুর্বল—দশ বছরের বড় মেয়েটা তো প্যাঁকাটির মতো দেখতে। ওদের গায়ে হাত তুলতে ভরসা হয় না—হয়তো মরেই যাবে, খিদেয় কাতর বাপের চড় খেয়ে চাষীর যে ছেলেটার মরে যাবার খবর খবরের কাগজে বেরিয়েছে তার মতো।

অন্য তিনজনকে বশে আনতে অনেক সময় শাসন জোটে একা ওই সাত বছরের মেজ মেয়েটার।

রোগা ক্ষীণজীবী বড় মেয়েটা দু-চারখানা বাসন মাজে, ঘটিতে করে জল তোলে, ঘর ঝাঁট দেয়, দোকানে যায়। পুতুলখেলা ফেলে মেজ বোন দিদির সাথে হাত লাগায়। পুতুল খেলার চেয়ে তার ভালো লাগে টুকটাক সংসারের কাজ করার খেলায়।

সে দিদির কাজ করে, মার সঙ্গে তার বিবাদ!

সে মিনতি করে বলে, 'দিদি, আমায় দে না বাটিটা মাজি।'

মা বাটিটা এগিয়ে দিতে বললে সে শুনতে পায় না। ধমক দিয়ে হুকুম করলে অনিচ্ছার সঙ্গে ওঠে, পুতুলকে বলে যায়, 'বোস বাছা একটু, পরে খেতে দেব। রাক্ষুসী ডাকছে।'

আটটা বাজবার আগেই ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে চারজন।

সেটাও মেজাজ বিগড়ে দেয় অবলার, কিন্তু বেচারী করবে কি?

খাদ্যে মেটে ক্ষয়ের পূরণ, আর পুষ্টির প্রয়োজন ঘুম, তাই ঘনিয়ে আসে আরও বেশি ক্ষয় ঠেকাতে। এ বিষয়ে প্রকৃতি ছেড়ে কথা কয় না কাউকে। ওই তেতলা বাড়ির ভুঁড়িওয়ালা মালিক ঘনশ্যামবাবু, সাতজন ভাড়াটের কাছে লোকটা মাসে বাড়ি ভাড়াই পায় চারশো টাকার মতো—অনিদ্রা রোগ খুব বেশি বেড়ে গেলে মাঝে মাঝে তাকেও মাছ-মাংস মিঠাই মণ্ডা একেবারে বাদ দিয়ে উপোস করতে হয়। অতিপুষ্ট শরীরটা তার যথারীতি পুষ্টি না পেয়ে আপসে একটু ঘুম এনে দিয়ে নিদ্রাহীনতার অসহ্য কষ্টে তাকে পাগল হতে দেয় না।

চারজনে একসঙ্গে খেতে বসে। তার মানে চারজনকেই এক সঙ্গে বসানো হয়, একসঙ্গে চুকিয়ে দিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়।

অবলারও সহ্যের সীমা আছে তো।

'আমি আলু পাইনি মা।'

'আমায় ডাঁটা দিলে না যে?'

'এট্টুখানি ডাল দাও মা, শুধু এট্টুখানি।'

'পেট ভরেনি।'

'আমারও ভরেনি।'

'খা। খা। খা। আমার হাড় মাস চিবিয়ে খা তো।'

রোগা বড় মেয়েটা চুপচাপ খায়। এবার সে তার ক্ষীণকণ্ঠ যতদূর পারে চড়িয়ে বলে, 'তুমি যেন কেমন করো মা। রুটি দিলে না একখানা, আরেক হাতা করে ভাত দাও না আমাদের? খিদের চোটে রাতে ওরা কাঁদলে ফের মারবে তো?'

ঘরে বসে মেয়েটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। একটু বাঁকা মেরুদণ্ডটা সে সোজা করেছে। শীর্ণমুখে যেটুকু ক্ষোভের স্ফূরণ হয়েছে, খাঁটি দরদীর চোখে ছাড়া নজরেই পড়বে না। ছোট ছোট চোখ, সে চোখে ভর্ৎসনার ঝিলিক দেখে কালো হরিণ চোখের কথা ভুলে গিয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নতুন প্রতিবাদের কবিতা লিখতেন।

'তোরা সব চেটেপুটে খাবি, আমরা উপোস দেব? দ্যাখ তো হাঁড়িতে ভাত আছে কতটুকু? তোদেব জন্য দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলছি, আমি খাব না?'

মাকে কৈফিয়ত দিতে হয় ছেলেমেয়েদের কাছে, প্রচার করতে হয যে মা হওয়া কি মুখের কথা! বাপ হওয়া কি সহজ কাজ! মায়ের কত ত্যাগ, বাপের কত ত্যাগ, তাতেই মুগ্ধ সন্তুষ্ট থাকা উচিত সন্তানের।

মেজ মেয়েটা ছ্যাঁচোড়। সভ্যতা ভব্যতা ভদ্রতা কিছু শেখেনি সাত বছর বয়সে। সে ফ্যাঁস করে ওঠে, 'ইস! তোমরা খাবে না খাবে আমাদের কি? আরও ভাত রাঁধনি কেন? তোমরা খাও না যত খুশি, আমরা না করেছি? আমাদের খালি মারবে, আমাদের খালি পেট ভরে খেতে দেবে না!'

হে রাত আটটার তারায়-ভরা আকাশ, একবার বিদীর্ণ হও কোটি বজ্রের গর্জনে ফেটে চৌচির হয়ে যাও। আমার বাংলার ছেলেমেয়েরা আজ খিদেয় কাতর হয়ে একখানা রুটির জন্য, একমুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম শুরু কবেছে নিরুপায় মায়ের সঙ্গে।

রাত সাড়ে-দশটা নাগাদ বাড়ি ফিবে জামাকাপড় ছেড়ে যতীন দু-দণ্ডের জন্য আমার ঘরে বসে। আড্ডা দিতে নয়—সারাদিন যা করেছে তার একেবারে বিপরীত কাজ আহার এবং নিদ্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে। যে খাটে সে জানে যে খাটুনি শেষ করেই খিদের চোটে দিশেহারা হয়ে খেতে নেই। তাতে অসুখ হয়। শোষণের স্তর থেকে একেবারে পোষণের স্তরে আছাড় খেয়ে পড়লে সামঞ্জস্য ঠুনকো কাঁচের মতো ভেঙে চৌচির হয়ে যায়।

আমার দেওয়া বিড়িটা ধরায়। টানতে গিয়ে কাশে। গায়ে বাতাস লাগায়। হাঁপ ছাড়ে। দেহমনের টান করা তন্ত্রী আর স্ক্রুগুলি ঢিলে করে দেয়। আমার চোখের সামনে দু-দণ্ডে জীবন্ত মানুষটা ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে। এও বাঁচার লড়াইয়ের কৌশল। সকাল থেকে চলেছে সক্রিয় লড়াই—এখনকার লড়াই নিষ্ক্রিয় বিরামের। চিন্তা ভয় ক্ষোভ দুঃখ স্নেহমমতা আনন্দ উদ্দীপনা ন্যাকামি কোন অজুহাতেই আর একবিন্দু বাড়তি শক্তি ক্ষয় করা নয়।

খেতে বসে টের পায় নিজের ভাগ কমিয়ে অবলা তার পাতে ভাত বেশি দিয়েছে। দুটো রসগোল্লা নয়, পেটে খিদে নিয়ে পেট ভরবে না জেনে দুমুঠো ভাত বেশি দেওয়া। এ ত্যাগের আগের দিনের মূল্য দেবার সাধটা মনের কোণে একবার উঁকি দিয়ে যায় বৈকি, দরদ দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় বৈকি যে, 'তুমি আমায় রাক্ষস বানাবে।'

কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নিছক আগের দিনের জের টানার জন্যেই ন্যাকামি করা কি পোষায় মানুষের?

খেতে শুরু করে খাঁটি দরদ দেখিয়ে বলে, 'তুমি বসে যাও? মিছে রাত করবে কেন?'

'হ্যাঁ, আমিও বসি।'

ফাঁকা আদর আর মিছে চোখে জল আসার চেয়ে কত মনোরম এই বোঝাপড়া। ভোরে উঠে উনান ধরাতে হবে অবলাকে, রাতের আবছা আঁধার বজায় থাকা ভোরে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তাকে বিশ্রাম করতে বলাটাই সবচেয়ে সুমিষ্ট আদর।

অবশ্য অবস্থাটা এরকম বলে।

তারা শোয়। তাদের চোখে গাঢ় ঘুম ঘনিয়ে আসে। ঘুমোতে কেন, শ্বাস উঠে মরতেও দু-চার মিনিট সময় লাগে মানুষের। সেই ফাঁকে মেজ মেয়েটা উঠে চলে যায় রান্নাঘরে।

খিদের আগুনে পুড়ে গিয়েছে তার ঘুম! অন্ধকারে কোথায় গেল, কি করতে গেল মেয়েটা? অবলাই ওঠে গায়ের জোরে। বলে, 'মাগো আর তো পারিনে।'

রুটি পায়নি মেজ মেয়েটা। অন্ধকারে আটা নিয়ে সে জলে গুলে খাচ্ছে। খানিক ছড়িয়েছে মেঝেতে।

এঁটো হাতাটা তুলে নিয়ে অবলা প্রাণপণে বসিয়ে দেয় তার পিঠে! আর্ত কান্নায় চিরে যায় রাত্রির অন্ধকার।

হট্টগোলে চমকে জেগে কেঁদে উঠেই কান্না থামায় ক্ষীণজীবী রোগা বড় মেয়েটা।

রান্নাঘরে গিয়ে দ্যাখে কি, বোনটি তার আকাশ-চেরা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে আটার হাঁড়িটা কাত করে ফেলে পা ছুঁড়ে তছনছ করে উড়িয়ে দিচ্ছে আটাগুলি, বাবা তার দাঁড়িয়ে আছে পুতুলের মতো, মা হাতটা উঁচু করেছে মেয়েকে আরেক ঘা বসিয়ে দেবার জন্য।

রোগা মেয়েটা দু-হাতে হাতাটা চেপে ধরে কেড়ে ছিনিয়ে নেয়। যাকে মারবার জন্য হাত উঁচু করা, হাতা ধরা হাত দুটো তারই মায়ের, তাই রোগা কাঠি মেয়েটার ক্ষীণ শক্তিটুকুই হাতাটা কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সপ্তমে তোলা তীক্ষ্ণ বাঁশীর আওয়াজে বলে, 'পেতলের হাতা দিয়ে মারলে যে মরে যাবে মা?'

'ও! বড় যে দরদী আমার।'

বলে রোগা মেয়েটার গালে চড় কষিয়ে দেবার জন্য অবলা হাত তুলেছে, যতীন তার হাতটা চেপে ধরে।

'কি করছ?'

অবলা ঠাণ্ডা হয়ে বলে, 'আর সয় না, এবার আমি মরব!'

মেয়ে বলে, 'মরবে তো নিজে মর না? আমাদের মারছ কেন।'

পরিচয়, ১৯৫১

রজনী হ'লো উতলা

বুদ্ধদেব বসু

মেঘনার ঘোলা জল চিরে স্টিমার সামনের দিকে চলছে, তার দু-পাশের জল উঠছে, পড়চে দুলচে—তারপর ফেনা হয়ে গড়িয়ে প'ড়ে যাচ্ছে, জলকন্যার নগ্নদেহের মতো শুভ্র, দ্রাক্ষারসের মতো স্বচ্ছ। একদিকে তরুপল্লবের নিবিড় শ্যামলিমা অন্যদিকে দূর দিগন্তরেখার অস্পষ্ট নিলীমা।

খুব জোরে বাতাস বইছে কোনো দিক থেকে, ঠিক করতে পারছিনে। এখানে-ওখানে ছোটো ছোটো নৌকাগুলি তীরবেগে ছুটে চলেছে; ওরা সব পাল তুলে দিয়েছে—বাউলের গাত্রবাসরের মতো নানা রঙের তালি-দেওয়া পাল। আমাদের স্টিমার এদের মধ্যে পরিচারিকা-বেষ্টিতা রানীর মতো চলছে, সামনের দিকে চলছে।

এইমাত্র সূর্য অস্ত গেলো। আমাদের সামনে পূব দিক—সন্ধ্যারাণীর লাজনম্র রক্তাভ মায়াটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছিনে—আমরা দেখছি খুব মস্ত এক টুকরো আকাশ—কুয়াশার মতো অস্পষ্ট—তার রংটা ঠিক চেনা যাচ্ছে না—মনে হচ্ছে, কে যেন তার মুখ থেকে সমস্ত রঙের ছোপ মুছে নিয়েছে—অমন বিবর্ণ, বিশ্রী, ম্লান চেহারা আমাদের দেশে আকাশের বড়ো-একটা হয় না।

আমরা দু-জন পাশাপাশি ডেক-চেয়ারে বসে আছি, কারো মুখে কথা নেই। ওদিকে হয়তো রঙেব হোলিখেলা চলছে—কিন্তু আমাদের দিকে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে এলো—নিখিল গগনব্যাপী এক নিষ্ঠুর নিশাচর পাখির ডানার মতো। নদীর ঘোলা রং কালো হয়ে উঠলো—বিবর্ণ আকাশের বুকে একটি তারার মণিকা ফুটে উঠলো।

আমি মুখ ফিরিয়ে ওর চোখের দিকে চাইলুম—আশ্চর্য! ওর চোখের কোনো রং আমি আজ অবধি ঠিক কবতে পারলুম না। ও যেন ক্ষণে-ক্ষণে বদলায়! কখনো সন্ধ্যার এই ছায়াটুকুর মতো ধূসর, কখনো ঐ সুদূর তারকার মতো সবুজ, কখনো নদীর জলের মতো কালো, কখনো দিগন্তরেখার অপরূপ ভঙ্গিমার মতো নীল।

নীলিমা ফিক করে হেসে ফেললে, কী দেখছো?

আমি তার মাথাটি কাছে টেনে এনে তার ঐ মায়াময় চোখ দুটির উপর ঠোঁট রেখে নিঃশব্দে জবাব দিলুম। নীলিমার চোখ দুটি অবশেষে মুদিত হয়ে এলো। আমি এই অবসরে তার সারা দেহের উপর একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে গেলুম। অপরূপ! বিশ্বশিল্পী তাঁর কত স্নেহ, কত সুধা, কত মমতা দিযেই না এই নারীদেহ গড়েছেন! এ যেন একটি বীণা—তা আপনা আপনি বাজে না—তাকে কোলে তুলে নিয়ে কোনো সুররসিক সুরসাধনা করবে, এই তার সার্থকতা। আমি আর পারলুম না। সন্তর্পণে ওকে একেবারে বুকের কাছে টেনে তুলে নিয়ে বিপুল আবেগে জড়িয়ে ধরলুম।

নীলিমা আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তার চেয়ারটি আমার কাছে আরো একটু এগিয়ে এনে বললে—তোমার সেই কথাটা বলবে না?

কোন্ কথাটা?

সেই যে একদিন বলেছিলে—মনে নেই?

এই উত্তেজনার ফলে তখনো সে একটু-একটু কাঁপছিলো। ওর বুক তীব্র নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দুলছিলো—এক-একবার ফুলে ফুলে উঠে ব্লাউজের নির্দিষ্ট বন্ধনের সীমা প্রায় অতিক্রম করে যাচ্ছিলো—মনে হচ্ছিলো, যেন পাত্র বেয়ে সুরা উছলে পড়তে চাচ্ছে!

আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেদিকে চোখ রেখে বললুম, হুঁ।

নীলিমা ছোটো মেয়ের মতো আবদারের সুরে বলে উঠলো, না গো!

হঠাৎ যেন আমার স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলো! আমি গলার সুরটা যথাসম্ভব সহজ করবার চেষ্টা করে বললুম, আমার একটা অনুরোধ, নীলিমা—তুমি এই একটি কথা আমার কাছ থেকে কোনোদিন শুনতে চেয়ো না।

ওর তরল আঁখির করুণা কামনা একসঙ্গে মিনতি ও অভিয়োগ জানাল।

আমি পাশের একটা ইজি-চেয়ারের দিকে চেয়ে বললুম, আচ্ছা, বলছি। কিন্তু যখন বুঝবে, এ-কথাটা তোমার না-শোনাই উচিত ছিলো, তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবে না।

নীলিমা মাথাটা একটু পেছন দিকে হেলিয়ে বললে, আহা—তোমায় আবার দোষ দেবো! তুমি যে আমার বর!

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো—বর বটে—কিন্তু এখনো তো স্বামী হইনি। আমি এখন যা বলবো, তা শোনবার পর বর হবার সম্ভাবনাই লোপ পেতে পারে।

সেইজন্যেই তো আরো বেশি করে শুনতে চাচ্ছি।

* * * * * * * * *

দু-বছর আগে আমি যখন প্রথম কলকাতায় যাই, তখনো আমাদের সেখানে বাড়ি হয়নি। কাজে-কাজেই ভবানীপুরের এক ব্যারিস্টারের আতিথ্য স্বীকার করতে হলো। বাবার সঙ্গে ওঁদের পুরোনো বন্ধুত্ব ছিলো। নামও কি শোনা দরকার, নীলিমা?

নাম না হলে কি গল্প চলে?

অন্য কোনো গল্প না চলতে পারে, কিন্তু আমার এ গল্প চলবে।

আচ্ছা বলে যাও।

তখন গ্রীষ্মের ছুটি। কলেজ থেকে সবে আই. এ. পরীক্ষা দিয়েছি। তখন আমার বয়স কাঁচা। দেহ-মনে সবে নব যৌবনের রং ধরেছে। পৃথিবীর অনেক কিছুই তখন আমার কাছে রহস্যময় আর তার মধ্যে সবচেয়ে রহস্য হলো—

নারী?

হ্যাঁ, নারী। মনে রেখো, নীলিমা, তখন আমার সেই বয়স, যে বয়সে একটুখানি শাড়ির আঁচল দেখলেই বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, একটু চুড়ির রিনিঝিনি শোনবার জন্যে মনটা যেন তৃষিত হয়ে থাকে—যে বয়সে মানুষ অঙ্কশাস্ত্র ছেড়ে কাব্যচর্চা শুরু করে, ফিজিক্সের এক্সপেরিমেন্টের চেয়ে বায়োস্কোপের অভিনয় বেশি পছন্দ করে।

সত্যি কথা বলবো নীলিমা? তখন যখনই যেখানে কাঁচা বয়সের মেয়ে দেখতুম, ইচ্ছে হতো ছুটে গিয়ে ওকে আমার নিজের ঘরে টেনে নিয়ে আসি, তারপর—ওর সঙ্গে কথা কই, ওকে খুব আদর করি। আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে মেয়ে-ইস্কুলের গাড়ি আসা-যাওয়া করতো কতদিন—তাদের কারো সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করার ব্যর্থ চেষ্টা আমি করেছি। আমার

মগজের মধ্যে তখন অহর্নিশ যে-সব চিন্তা ঘুরে বেড়াতো, তা শুনলে এখন নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে না।

আমার সেই সদ্যজাগ্রত প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে আমি সে-বাড়িতে গিয়ে একেবারে অগাধ জলে পড়ে গেলুম। বাবার বন্ধুটি তিন পুরুষ যাবৎ সাহেবি চালে থাকেন—তাঁর বাড়ির সব কায়দাকানুন, রীতি-নীতি আমার জন্মগত সংস্কারে কেমন বিসদৃশ ঠেকতে লাগলো। হাজার হোক, খাঁটি ব্রাহ্মণের ছেলে তো আমি! প্রথম প্রথম দু-চারদিন চলতে-ফিরতে পদে পদে এমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো, যেন আমি জলের মাছ ডাঙায় উঠে এসেছি। তারপর ক্রমে ক্রমে সবই এমন সয়ে গেলো, যেন আমি জন্মাবধি এই আবহাওয়াতেই বেড়ে উঠেছি। সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে, দিনগুলো দিব্যি সুখেই কাটছিলো।

আমি হঠাৎ চুপ করে গেলুম। নদীর জল আর দেখা যাচ্ছে না—রাত্রির কালোয়·সব কালো হয়ে গেছে। পূবের আকাশে যেখানে ছোটো মণিকাটি জ্বলছিলো, সেখানে অনেক তারা দেখা দিয়েছে; ওরা বুঝি অমরাবতীব দুয়ারে জ্যোতির্ময়ী উষার ললাটের শিশিরবিন্দু। ডেকের উপর ইলেকট্রিক আলোগুলো দুলছে। নীলিমার কণ্ঠ শুনতে পেলুম—বলে যাও না। চুপ করে রইলে কেন?

আমি তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, নীলিমা। একটু আলোতে এসো না! অন্ধকারে মুখ ঢেকে আছো কেন?

নীলিমা আমার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কোমল সুরে বললে, এই যে আমি। আমি তো দূরে সরে যাইনি! তুমি হাত বাড়ালেই যে আমায় ছুঁতে পাও!

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। মনে হলো, যেন আমি জলের নিচে ডুবে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ উঠে এসে আবাব নিশ্বাসের সঙ্গে বাতাসের অমৃত সেবন করছি। চেয়ারের হাতলের উপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখের অত্যন্ত কাছে মুখ নিয়ে বললুম, আঃ এই যে তুমি নীলিমা। এত কাছে! আমি তোমার কেশের সৌরভ পাচ্ছি, তোমার নীল চোখ দুটির মধ্যে আমার নিজের চোখের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। আমার আর ভয় নেই—আঃ নীলিমা, তুমি কত সুন্দর!

নীলমা শান্তকণ্ঠে বললে, তারপর, কী হলো?

দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতো আমি হঠাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত বলতে লাগলুম—ও-বাড়ি তো বাড়ি নয়—যেন রূপের মেলা! যেন ফুলের বাগান। তাতে কত ফুল ফুটে রয়েছে—তারা রূপের জৌলুসে চাঁদনি রাতকে হার মানিয়ে দেয়, সৌরভের মাদকতায় বাতাসকে মাতাল করে তোলে। বলেইছি তো, আমার সেই সদ্যজাগ্রত অসীম তৃষ্ণা নিয়ে আমি তাদের মধ্যে গিয়ে পড়লুম। পড়ে হঠাৎ যেন জীবন-সূত্রের খেই হারিয়ে ফেললুম।

গৃহস্বামীর নিজের সাতটি মেয়ে, তার মধ্যে তিনটি বিবাহযোগ্যা। তাছাড়া, তাঁর দূর সম্পর্কিতা নবযৌবনা আত্মীয়ার সংখ্যাও কম নয়। বন্ধুবান্ধব নিয়ে মোট সংখ্যা বোধহয় বারো কি তেরোতে পৌঁছেছিলো। তখন রোজই একবার করে শুনতুম, তবু ঠিক সংখ্যাটা এখন আর মনে নেই।

এই মেয়ের দল আমাকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলতে লাগলো। অনায়াসে নাচিয়ে বেড়ানোর পক্ষে আমার মতো অমন সুপাত্র বোধহয় তখন পর্যন্ত পায়নি। তাছাড়া আমার বাপের টাকা আছে, নিজের চেহারাটাও নেহাত মন্দ নয়—কেউ-কেউ যে আমার সম্বন্ধে কোনো বিশেষ অভিপ্রায় পোষণ না করতেন, এমনও মনে হয় না। মাঝে-মাঝে চাউনির বিজলি

হেনে তাঁরা সে কথাটা আমায় জানিয়ে দিতেও ছাড়তেন না। ওদের লীলাচাতুরী, কলা-ছলা-ছলনাই বা কত ছিলো! কথা কইবার সময় মুখটাকে খামকা খুব কাছে এনে হঠাৎ সরিয়ে নেওয়া, চলতে চলতে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে চাবির গোছা দুলিয়ে আমার গায়ে ছোট্ট চড় মারা, ড্রেসিং রুম থেকে চুল বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ দরজার আড়াল থেকে আমায় ডেকে নিয়ে কানে-কানে একটা নেহাত অর্থহীন কথা বলে চট করে সরে যাওয়া এ সব তো ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার! সন্ধান যে একটিরও ব্যর্থ হয়নি, তা আমি স্বীকার করবো। এদের কৌতুকলীলার মধ্যে পড়ে আমি যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলুম— কী যেন হচ্ছে তা ঠিক ভালোমতো বোঝবার চেষ্টাও করলুম না। সে উদ্দাম বন্যায় নিজেকে একেবারে নিঃসহায় করে ভাসিয়ে দিলুম। কী করবো বলো? তখন তো আমার নিজের ওপরে কোনো হাত ছিলো না।

গলার স্বর হঠাৎ নামিয়ে ফেলে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলুম, আরো শুনতে চাও?

নীলিমা রুদ্ধস্বরে জবাব দিলো—চাই।

আমার কলকাতায় আসবার পর দিনকতক কেটে গেছে। একদিন রাত্রে খুব আস্তে আস্তে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। খুব আস্তে আস্তে—কী রকম জানো? মধ্যরাতে দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষ যেমন ধড়ফড় করে জেগে উঠে খুব জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে, সে-রকম নয়। ভোরবেলা শোবার ঘরে কেউ কথা বললে বা চলাফেরা করলে যেমন তা প্রথম স্বপ্নের সঙ্গে উঠে মিশে যায়—তারপর ধীরে ধীরে বাস্তব হয়ে উঠে মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে যায়— সে জেগে উঠে চুপি চুপি হেসে নিয়ে আমার চোখ বুজে পাশ ফিরে শোয়, অনেকটা সেই রকম। খুব আস্তে আস্তে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। আমি চোখ মেলে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালুম—তাকাতেই মনে হলো।—

মনে হলো, প্রকৃতি চলতে-চলতে যেন হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেছে— যেন উৎসুক আগ্রহে কার প্রতীক্ষা করছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের যবনিকা উঠবার আগমুহূর্তে দর্শকরা কেমন হঠাৎ স্থির, নিঃশব্দ হয়ে যায়, সমস্ত প্রকৃতিও যেন এক নিমেষে সেইরূপ নিঃসাড় হয়ে গেছে। তারাগুলো আর ঝিকিমিকি খেলছে না, গাছের পাতা আর কাঁপছে না, রাত্রে যে-সমস্ত অদ্ভুত অকারণ শব্দ চারদিক থেকে আসতে থাকে, তা যেন কার ইঙ্গিতে মৌন হয়ে গেছে, নীল ক্লান্ত পশুর মতো নিস্পন্দ হয়ে গেছে—ওঃ নীলিমা, অমন সুন্দর, অমন মধুর, অমন ভীষণ নীরবতা, অমন উৎকট শান্তি আর আমি দেখিনি। আমি নিজের অজানিতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলুম—কেউ আসবে বুঝি?

অমনি আমার ঘরের পর্দা সরে গেল। ঘরের বাতাস মূর্ছিত হয়ে পড়লো, আমার শিয়রের উপর যে-একটু চাঁদের আলো পড়েছিলো, তা যেন একটু নড়ে-চড়ে সহসা নিবে গেলো—আমার সমস্ত দেহ-মন এক স্নিগ্ধ অবসাদে শ্লথ হয়ে এলো—আমি যেন কিচ্ছু দেখছি না, শুনছি না, ভাবছি না—এক তীব্রমাদকতার ঢেউ এসে আমাকে ঝড়ের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো—তারপর—

নীলিমা, তোমার মুখ অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? তোমার চুলের ফুলটি যে মাটিতে লুটোচ্ছে। তোমার আঁচল যে ধুলোয় খসে পড়েছে! নীলিমা—

তারপর?

আজ এতদিন পর সবই কোমল স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। যেন অনেক দিন আগে দেখা স্বপ্ন—হাজার বছর, লক্ষ বছর আগেকার—গত জন্মের স্মৃতি! আমার কি তখন চৈতন্য ছিলো? আমি কি তখন পরিষ্কারভাবে সব বুঝতে পেরেছিলুম? কি জানি। কিন্তু আজকে কিছুই সত্য বলে মনে হচ্ছে না—সব আবছায়া, বাসি ফুলের মতো ম্লান, অশ্রুপূর্ণ চোখের দেখা জিনিসের মতো ঝাপসা!

হ্যাঁ—তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কী কতগুলো খশখশে জিনিস এসে পড়লো—তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে উঠলো। প্রজাপতির ডানার মতো কোমল দুটি গাল, গোলাপের পাপড়ির মতো দুটি ঠোঁট, চিবুকটি কী কমনীয় হয়ে নেমে এসেছে, চারুকণ্ঠটি কী মনোরম, অশোকগুচ্ছের মতো নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দুটি বক্ষ—কী সে উত্তেজনা, কী সর্বনাশা সেই সুখ, তা তুমি বুঝবে না, নীলিমা।

তারপর ধীরে ধীরে দু-খানি বাহু লতার মতো আমায় বেষ্টন করে যেন নিজেকে পিষে চূর্ণ করে ফেলতে লাগলো—আমার সারা দেহ থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগলো—মনে হলো আমার দেহের প্রতি শিরা বিদীর্ণ করে রক্তের স্রোত বুঝি এখুনি ছুটতে থাকবে!

বিপুল উত্তেজনার পর যে-অবসাদ আসে, তার মতো ক্লান্তিকর বোধহয় জগতে আর কিছু নেই। বাহুবন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এলো।

সত্যি বলছি, তখন আমার মুহূর্তের তরেও মনে হয়নি যে, এ-ঘনটার মধ্যে কিছু আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক আছে বা থাকতে পারে। আমারও মনের মধ্যে তখন কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠলো—এ কে? কোন্‌টি? এ ও না সে? তখন নামগুলো জপমালার মতো মনে মনে আউড়ে গেছলুম, কিন্তু আজ একটি নামও মনে নেই।—সুইচ টিপবার জন্যে হাত বাড়াতেই আরেকটি হাতের নিষেধ তার উপর এসে পড়লো। আমার কণ্ঠের জড়তা কেটে গিয়েছিলো—বেশ সহজভাবেই বললুম—তোমার মুখ কি দেখাবে না?

চাপা গলায় উত্তর এলো তার দরকার নেই।

কিন্তু ইচ্ছে করছে যে!

তোমার ইচ্ছে মেটাবার জন্যেই তো আমার সৃষ্টি! কিন্তু ওইটি বাদে!

কেন? লজ্জা?

লজ্জা কিসের? আমি তো তোমার কাছে আমার সমস্ত লজ্জা খুইয়ে দিয়েছি।

পরিচয় দিতে চাও না?

না, পরিচয়ের আড়ালে এ-রহস্যটুকু ঘন হয়ে উঠুক।

আমার বিছানায় তো চাঁদের আলো এসে পড়েছিলো—

আমি জানালা বন্ধ করে দিয়েছি।

ও, কিন্তু আবার তো খুলে দেওয়া যায়।

তার আগে আমি ছুটে পালাবো।

যদি ধরে রাখি?

পারবে না।

জোর?

জোর খাটাবে না।

একটু হাসির আওয়াজ এলো। শীর্ণ নদীর জল যেন একটুখানি কূলের মাটি ছুঁয়ে গেলো। তুমি যেটুকু পেয়েছো, তা নিয়ে কি তুমি তৃপ্ত নও?

যা চেয়ে নিইনি, অর্জন করিনি, দৈবাৎ আশাতীতরূপে পেয়ে গেছি, তা নিয়ে তো তৃপ্তি অতৃপ্তির কথা ওঠে না।

তবু?

তোমার মুখ দেখতে পাওয়ার আশা কি একেবারেই বৃথা?

নারীর মুখ কি শুধু দেখবার জন্যেই?

না, তা হবে কেন? তা যে অফুরন্ত সুধার আধার!

তবে?

আমি হার মানলুম।

আমি আবার দু-হাত বাড়িয়ে ওর লতায়মান দেহটি সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম। নিঃশব্দে ও আমার বুকের উপর এলিয়ে পড়লো।

আমাদের মাথার উপরে কোথায় যেন চাঁদ উঠেছে! নদীর কালো বুক হলদে হয়ে উঠেছে—এখানে-ওখানে রুপোর ছিটা! নীলিমা বুকে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। ও কি আমার সমস্ত কথা শুনেছে! ওর ঠোঁট দুটি পাপড়ির মতো শুকিয়ে গেছে। ও আমার পানে অমন করে তাকিয়ে আছে কেন? কী যেন বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না। কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভয় করছে। না জানি ও কী বলে বসে। জলেতে জোছনায় মিলে যেখানে ছুটোছুটি করছে, সেই দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালুম। ধোঁয়াগুলো উঠছে, নীল, মসৃণ, সরু রেখার মতো। স্টিমারটা কী বিশ্রী শব্দ করছে। ও কি অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে? কোনোদিনই কি থামবে না? নীলিমার মুখখানা যে মরুভূমির উপরকার আকাশের মতো শুষ্ক হয়ে উঠছে।

নীলিমা বললো, এইখানেই কি তোমার গল্প শেষ হলো?

মাস্টারের কাছে ছাত্রের পড়া-বলার মতো করে জবাব দিলুম—না, এইখানে সবে শুরু হলো। কিন্তু এর শেষেও কিছু নেই—এই শেষ ধরতে পারো।

নীলিমা আর কিছু বললে না। আমি বলে যেতে লাগলুম—সেইভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। জেগে দেখি, বিছানার উপর রোদ এসে পড়েছে। সমস্ত বালিশে, চাদরে—সারা বিছানায় গত রজনীর তার গায়ের সৌরভটুকু প্রিয় স্মৃতির মতো লেগে রয়েছে।

পরের দিন সকালে আমার কী লাঞ্ছনাটাই না হলো। রোজকার মতো ওরা সব চারদিক দিয়ে আমায় ঘিরে বসলো—রোজকার মতো ওদের কথার স্রোত বইতে লাগলো জল-তরঙ্গের মতো মিষ্টি সুরে, ওদের হাসির রোল ঘরের শান্ত হাওয়াকে আকুল করে ছুটতে লাগলো, হাত নাড়াবার সময় ওদের বালা চুড়ির মিঠে আওয়াজ রোজকার মতোই বেজে উঠলো—সবাকার মুখই ফুলের মতো রূপময়, মধুর মতো লোভনীয়!—কিন্তু আমার কণ্ঠ মৌন, হাসির উৎস অবরুদ্ধ। গত রাত্রির পাগলামির চিহ্ন আমার মুখে, আমার চোখের কোণে লেগে রয়েছে মনে করে আমি চোখ তুলে কারো পানে তাকাতেও পারছিলুম না। তবু একবার লুকিয়ে প্রত্যেকের মুখ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলুম—যদিই বা ধরা যায়। যখন যাকে দেখি, তখনই মনে হয়, এই বুঝি সেই। যখনই যার গলার স্বর শুনি, তখনই মনে হয় কাল রাত্রিতে এই কণ্ঠই না ফিশফিশ করে আমায় কত কী বলছিলো! অথচ কারো মধ্যেই এমন বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখলুম না, যা দেখে

নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায়! সবাই হাসছে, গল্প করছে। কে? কে তাহলে? আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম? তখন স্বপ্ন বলে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে পারতুম, যদি না তখনও আমার সর্বাঙ্গে একটা গভীর অবসাদ অপ্রকাশ্য বেদনার মতো জড়িয়ে থাকতো।

আমার অবস্থা দেখে একজন বলে উঠলেন, আপনার কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি নাকি?

আর-একজন বললেন, তাই তো! আপনার চেহারা যে ভারি শুকনো দেখাচ্ছে!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো আমি তাড়াতাড়ি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম। এই তো সুযোগ! এ-সময়ে কারো মুখ যদি একটু শুকিয়ে যায় বা একটু লাল হয়ে ওঠে—যদি কেউ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা একটু বিশেষভাবে হাসতে থাকে, তাহলেই তো আর বুঝবার কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু সবাই ঠিক একভাবে ঠোঁটের এক কোণে একটু হাসছে—কাউকে আলাদা করে নেবার জো নেই। আমার মনে হলো, ওরা সবাই যেন আমার গোপন রহস্য জেনে ফেলেছে, যেন সবাই মিলে পরামর্শ করে আমায় নিয়ে একটু রসিকতা করছে। কিন্তু এ কোন ধারা রসিকতা। আমি কি একটা খেলার পুতুল—না, কি? তারপর প্রত্যেকের প্রত্যেকটি চাউনি, প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি আমার এই সন্দেহকে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করে তুললো—ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম বোধ হলো, আমি অভদ্রের মতো কাউকে কিছু না বলে ছুটে বাগানে চলে গেলুম—একটু খোলা হাওয়ায় থাকবার জন্য।

দুপুর পর্যন্ত আমার সময়টা যে কী ভাবে কেটে গেলো, তা আর মনে করতে ইচ্ছে করছে না। রাস্কলনিকফ বোধহয় খুনী হয়েও এমন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেনি। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে আমার গায়ে সর্বদা যেন কাঁটা ফুটতে লাগলো। কারো সঙ্গে কথা কইতে পারলুম না—যখনই যে কাছে আসে, মনে হয় এই বুঝি সে!

প্রত্যেকের সম্বন্ধেই সন্দেহ অন্যের চেয়ে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। আমার ঘরের মধ্যেও থাকতে পারিনে। মেঝের কার্পেট থেকে দেওয়ালের চুনকাম পর্যন্ত সব যেন আমার দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর হাসি হাসতে থাকে—অথচ সবাকার দৃষ্টি হতে নিজেকে লুকিয়ে রাখাও তো চাই! কাজেই অছিলো করে সারাটা দিন কলকাতার রাস্তাময় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

কিন্তু দুপুরের পর থেকে আর-এক নতুন সংশয় আরম্ভ হলো। আজ রাত্রেও কি সে আসবে? আমার মধ্যে যা-কিছু ভদ্র ও মার্জিত ছিলো, সমস্ত একযোগে বলে উঠলো—না। আর আসবে না। আঃ বাঁচা গেলো। আমার আহত দর্প বললে,—যাক, অপমান থেকে রেহাই পেলুম। কিন্তু পিতৃপুরুষের রক্ত অস্থির হয়ে বলতে লাগলো—না, আসবে, আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। যাও ফেরো—বাসায় ফেরো।

আমার মন ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করলে—না, যাবো না।—নীলিমা, তুমি আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করো? উৎসস্থল বহু দূরে থেকেও তার প্রিয়তমের আকুল আহ্বান শুনতে পেয়েছিলো, এ তুমি সম্ভব মনে করো?...এখন অবশ্য আমিও করি না—কিন্তু তখন—তখন আমার বাস্তবিক মনে হয়েছিল সমস্ত ইঁট-পাটকেলের বেড়া যেন স্বচ্ছ হয়ে গেছে—আমি তার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, কে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, রাস্তার সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে একটি ক্ষীণ, মধুর আহ্বান আমার কানে ভেসে আসলো—সে কী অদ্ভুত, কী বিপুল, কী ভয়ানক, নীলিমা, তা মনে করে এখনো আমার বুক কেঁপে উঠছে। আমি ছুটে গেলুম—দিনের আলো নিভে যাবার আগে—ছুটে ফিরে গেলুম আমার সেই ঘরে—সে আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলুম না, নীলিমা।

আমার কণ্ঠস্বর হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে এলো। নীলিমার মুখের পানে তাকাতে সাহস হচ্ছে না—ইচ্ছে করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। সোজা সামনের দিক থেকে বাতাস আসছে, আমার চুল উড়ে উড়ে কপালে এসে পড়ছে—নীলিমার শাড়িও বোধ হয় নড়ছে—দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি। ও চেয়ারের দুই হাতলে হাত রেখে স্থির হয়ে বসে আছে—নিঃশ্বাস পড়ছে না, চোখের পলক নড়ছে না। স্টিমারের গতি বোধহয় ঘুরে গেছে—একাদশীর চাঁদের আধখানা আমার চোখে পড়ছে, কামধেনুর স্বর্ণশৃঙ্গের মতো। ডাইনিং সেলুনে বসে সাহেব-মেমগুলি ডিনার খাচ্ছে—মদের বোতল খোলার শব্দ, সোডার বোতল ভাঙার শব্দ, কাঁটা চামচে প্লেটের শব্দ, ভাঙা ভাঙা কথাবার্তার টুকরো—সব ভেসে আসছে—সব কান পেতে শুনছি। নীলিমা স্টিমারে ডিনার খেতে ভারি ভালোবাসে—ওকে কি জিজ্ঞেস করবো? কী জানি! আঘাত যা দেবার, তা তো দিলুম, এখন কি অপমানেরও কিছু বাকি রাখবো না? অথচ আজকেই সূর্য অস্ত যাবার আগে ওকে বলছিলুম, নীলিমা, তোমার মতো কাউকে কখনো ভালোবাসিনি।

অনেক দূরে দিগন্তরেখার কোলে কিসের একটা আলো জ্বলে উঠলো! আর-একটা! আর একটা! পাঁচ—নয়—তেরো আর গুনতে পারছি না। কিসের এত আলো! অতলশায়ী বাসুকীদেব কি আজ চিরন্তন শয্যাতল ছেড়ে তাঁর সহস্র মণি জ্বালিয়ে উঠে এলেন? না, এ বুঝি গোয়ালন্দ স্টিমারঘাটের আলো! স্টিমারের গতিও কমে আসছে—আমরা যে প্রায় এসে পড়লুম। আর তো সময় নেই।

অকস্মাৎ ক্ষিপ্তের মতো বলে উঠলুম—নীলিমা, এতখানি যখন শুনলে, তখন দয়া করে বাকিটুকুও শুনবে না কি? এইটুকু দয়া আমায় করো, নীলিমা। বাকিটুকু না বলতে পারলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

— বলো।

চমকে উঠলুম। এ কণ্ঠস্বর যে একেবারে অপরিচিত। এ কি নীলিমার?

ভেবেছিলুম, সমস্ত রাত জেগে থাকতে হবে। মনের সে-অবস্থার সচরাচর ঘুম আসে না। কিন্তু অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনার ফলেই হোক বা পায়ে হেঁটে সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর দরুণ শারীরিক ক্লান্তিবশতই হোক, সন্ধ্যার একটু পরেই ঘুমে আমার সারা দেহ ভেঙে গেলো—একেবারে নবজাত শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লুম। তারপর—আবার আস্তে আস্তে ঘুম ভেঙে গেলো—আবার প্রকৃতির সেই স্থির, প্রতীক্ষমান, নিষ্কম্প অবস্থা দেখতে পেলুম—আবার আমার ঘরের পর্দা সরে গেলো—বাতাস সৌরভে মূর্ছিত হয়ে পড়লো—জোছনা নিভে গেলো—আবার দেহের অণুতে অণুতে সেই স্পর্শসুখের উন্মাদনা— সেই মধুময় আবেশ—সেই ঠোঁটের উপর ঠোঁট ক্ষইয়ে ফেলা—সেই বুকের উপর বুক ভেঙে দেওয়া—তারপর সেই স্নিগ্ধ অবসাদ—সেই গোপন প্রেমগুঞ্জন—তারপর ভোর-বেলায় শূন্য বিছানায় জেগে উঠে প্রভাতের আলোর সাথে দৃষ্টিবিনিময়!

আবার দুপুর পর্যন্ত এই রহস্যময়ী গোপনচারিণীর পরিচয় জানবার অদম্য লালসা আমাকে যেন টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতো—তারপর, বিকেল হতেই সেই নিষ্ঠুর কামনা, সেই অলঙ্ঘনীয় আহ্বান, সেই অপরাজেয় আকর্ষণ! দিনের পর দিন—রাতের পর রাত কাটতে লাগলো। এর মধ্যে আমার চেহারা এত বদলে গেলো যে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমি চমকে উঠতে লাগলুম। দেহের সে লাবণ্য শুকিয়ে গেছে, সে স্নিগ্ধ শ্রী ঝরে পড়ে গেছে। কিন্তু তখন

আমার স্বভাবত শান্ত চোখ দুটি নিরন্তর কোন উৎকট তৃষ্ণায় হিংস্র পশুর মতো ধকধক করে জ্বলতো! সে ভীষণ চাউনি মনে হলে এখনো আমার গা শিউরে ওঠে।

ক্রমে আমার এমন অবস্থা হলো যে আমার সমস্ত সত্তা রাত্রির সেই অল্প সময়টুকুর মধ্যে বন্দী হয়ে পড়লো—কেবল ওইটুকু সময়ের জন্য আমি প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠতুম, অন্য সব সময় আমার অস্তিত্বের কোনো লক্ষণ আমি নিজে পেতুম না। সে সময়ে কে আমার সম্বন্ধে কী ভাবছে, কী বলছে, ও-সব কথা আমার মনের ধার দিয়েও আসতো না—আমাকে যেন সারাদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হতো। আমার মনের সমস্ত চিন্তা, প্রাণের সমস্ত আবেগ, দেহের সমস্ত বৃত্তি যেন ওই একটি বাঞ্ছিত মুহূর্তের প্রতীক্ষায় একেবারে নিশ্চল হয়ে যেতো—ওই একটি মুহূর্তের মধ্যে যেন অনন্তকাল বাঁধা পড়েছে—ওরই মধ্যে যেন বিশ্বজগতের ছায়া! ওর বাইরে সময় নেই, জগৎ নেই, আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রাণ নেই, মৃত্যু নেই, সুখ-দুঃখ কিচ্ছু নেই, শূন্যও নেই! রহস্যময়ীর রহস্য মোচন করবার জন্যে মনের যে কৌতূহল একটা স্বাধীন চিন্তার রূপে, অস্তিত্বের একটু ক্ষীণ সাড়ার মতো আমার মধ্যে ঝিলমিল করছিলো—তা-ও মিলিয়ে গেলো—সে-কৌতুহলও আর রইলো না।—এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে তখন নিশ্চয়ই আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম—এ-ও যদি পাগলামি না হয়, তবে আর পাগলামি কী?

এই উন্মত্ত লীলা কতদিন চলেছিলো মনে নেই, কিন্তু কী করে হঠাৎ একদিন চিরতরে থেমে গেলো, তা বলছি। সে-রাত্রে শোবার ঘরে ঢুকবার সময় চৌকাঠে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলুম—সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠলো—মধুর অন্ধকার নিবিড় হয়ে এলো। ক্লান্তি, নীলিমা—অসম্ভব ক্লান্তি! বিছানায় উঠে যেতেও যেন ক্ষমতায় কুলোলো না। সেই কার্পেটের উপর মাথা রেখেই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লুম। সে রাত্রে আর ঘুম ভাঙেনি।

দেশে ফিরে এসে শুনলুম, সে রাত্রে আমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ে কার্পেট ভিজে গিয়েছিলো, ওই অজ্ঞান অবস্থায় দু দিন ছিলুম— সারাক্ষণ এত দুর্বল ছিলুম যে, ডাক্তাররা আশঙ্কা করছিলেন যে-কোনো সময়ে আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমার জ্ঞান হারানোর জন্যও নাকি ভয়ানক শারীরিক দুর্বলতা আংশিকরূপে দায়ী! তাছাড়া মানসিক উত্তেজনা ও স্নায়বিক দৌর্বল্য মিলে আমার শরীরকে নাকি এমনভাবে ভেঙে দিয়ে গিয়েছিলো যে, আর একটু হলেই একেবারে হাড়গোড়সুদ্ধ চুরমার হয়ে যেতুম।

ধীরে ধীরে সেরে উঠলুম। মনটা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো, তখন সেই অপরিচিতাকে জানবার জন্য সহস্র চেষ্টা করতে গেলুম, কিন্তু সমস্ত ছল, সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হলো। কিছুতেই কোনো দিশে করতে পারলুম না। আজ পর্যন্ত পারিনি।

তারপর—স্টিমারটা বিকট স্বরে শিঙা বাজিয়ে উঠলো। আমার আর বলা হলো না।

গোয়ালন্দ এসে পড়েছে। অতি সংকীর্ণ জলপথের মধ্য দিয়ে আমাদের স্টিমারখানা খুব সাবধানে আপনাকে বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে চলছে। একটা বিশাল ফ্ল্যাট সামনে এসে পড়েছে, ঝনঝম কড় কড় করে নোঙর নেমে যাচ্ছে, ভশভশ করে রাশি রাশি বাষ্প বেরুচ্ছে—এতখানি পথ নিরাপদে অতিক্রম করে এসে স্টিমারটা যেন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে—সঙ্গে সঙ্গে একটু-একটু দুলছে, আমাদেরও দোলাচ্ছে। ঘটঘট করে সিঁড়ি ফেলা হচ্ছে, খালাসিরা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে, কুলিরা দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অনিশ্চিত সিঁড়ি ডিঙিয়ে দুড়মুড় করে উপরে উঠে 'ফাস্টো কেলাসে'র মাল নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে, থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা ব্যাগ হাতে করে

প্রতীক্ষা করছে—আমাদেরও নাবতে হবে তো। এখানে অসংখ্য স্টিমার ফ্ল্যাটের ব্যূহ ভেদ করে চাঁদের আলো ঢুকতে পারছে না। গ্যাসের আলোয় নদীর কালো জল আগুনের মতো জ্বলছে—ডাঙায় রেলগাড়ির সিংহনাদ শোনা যাচ্ছে—উঃ —কী ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে চারদিক থেকে।

এতক্ষণে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলুম। দুটো কুলি ডেকে ওদের মাথায় জিনিসপত্তরগুলো চাপিয়ে দিয়ে ওদের আগে পাঠিয়ে দিলুম। তারপর নীলিমার একটু কাছে সরে এসে বললুম, 'গাড়ি ছাড়বার আর পনেরো মিনিট বাকি। এ-গাড়িতে চাপলে কাল ভোর নাগাদ পৌঁছবো। কাল বুধবার। রবিবার তারিখ ফেলা হয়েছে। মাসের তিনটে দিন হাতে থাকে। তুমি আজ ছাড়বার সময় যে-কথা বলেছিলে, এখনো কি সেই কথা বলছো?'

নীলিমার ঠোঁট কেঁপে উঠলো, কিন্তু কী বললে, শুনতে পেলুম না। ঠিক সেই মুহূর্তেই স্টিমারের বাঁশিটা অসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠলো। নীলিমার মুখের উপর স্টিমারের চোঙাটার ছায়া পড়েছিলো।

আমি নীলিমার হাত ধরে সেই অন্ধকারের তলা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম।

পশ্চিম দিগন্ত

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

তিনঘণ্টার বেশি রামলোচনের ঘুম হয় না। এগারোটা সাড়ে এগারোটায় যখন সবাই শুয়ে পড়ে তখন অগত্যা তাঁকেও শুতে হয় কিন্তু ঠিক তিনটি ঘণ্টা পরে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। আগে আগে আর কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতেন, চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকতেন, কিন্তু আজকাল আর সে বৃথা চেষ্টা করেন না। হুঁকো-কল্‌কে ঠিক করাই থাকে, হাতড়ে হাতড়ে দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে টিকে ধরাবার লম্পটা জ্বালেন, তারপর কল্‌কেটা ধরিয়ে অন্ধকারেই বসে বসে নিঃশব্দে তামাক টানেন। অবশ্য যতটা সম্ভব নিঃশব্দে—হুঁকোর বেশি আওয়াজ হলে মেজকর্তা, মানে তাঁরই মেজভাই, বিষম বিরক্ত হন।

তামাক খাওয়া শেষ করে তাঁর খাটো গামছাখানি পরে রামলোচন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান। নিস্তব্ধ দালান, দালানের ওধারের দরজা খুললে তবে উঠোনে বা কলঘরে যাবার পথ। আলো জ্বেলেই যাওয়া উচিত—বুড়ো মানুষ, হোঁচট খাওয়া বা ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা তো পদে পদে—কিন্তু আলো জ্বালবারও হুকুম নেই। প্রথমত বেকার বড় ভাইয়ের জন্য বৃথা আলোর খরচ করতে মেজকর্তা বা ছোটকর্তা কেউ বাজি নন, তাছাড়া বাইরে আলো জ্বাললেও নাকি তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। সুতরাং দালানের জানালা দিয়ে এসে পড়া ক্ষীণ নক্ষত্রের আলোতেই দৃষ্টিটা সইয়ে নিয়ে সাবধানে এগোতে হয় একপা একপা করে, দেওয়াল ধরে ধরে। অবশ্য পথটা এতদিনের অভ্যাসে একরকম জানা হয়েই গেছে—কোথায় আলমারির কোণ হাতে ঠেকবে, তারপর কোথায় বাসনের সিন্দুক, তাঁর আঙুলগুলো আন্দাজে আন্দাজে ঠিক খুঁজে নেয়। একটা টর্চ আছে বটে কিন্তু তার ব্যাটারি দেয় ভাগ্নে বাদল,—সে ব্যাটারি মাস দুই চলে এক সময়ে নিঃশেষ হয়। কিন্তু বাদল তো আসে এ বাড়িতে ছ-মাস আট-মাস অন্তর, বাকি সময়টা যে-তিমিরে সে-তিমিরে।

কলঘর থেকে ফিরে আস্তে আস্তে দালানের দরজা বন্ধ করে দিয়ে রামলোচন থমকে দাঁড়ান। বাইরের চেয়ে ভেতরের অন্ধকার একটু বেশি গাঢ়, সুতরাং কিছুক্ষণ ধরে দৃষ্টি সইয়ে নিতে হয়। তারপর চলে তাঁর চৌর্যবৃত্তির নিঃশব্দ অভিযান। কোথায় আনাজের ঝুড়িতে মেজবৌ ভুলে কলা ফেলে গেছেন হয়তো; কিংবা মিট্‌সেফের মাথায় কোনও বৌমা তাঁর ছেলের বিস্কুটের বাক্স রেখে দিয়েছিলেন, তাড়াতাড়িতে ঘরে নিয়ে যেতে বা আলমারিতে তুলতে ভুলে গেছেন; কোথাও বা তারের ঝুড়ি ঝুলোনো আছে কড়িকাঠ থেকে—তার মধ্যে আছে মেজবৌমার মেয়ের তাল-মিছরি কী ন'বৌমার মেজছেলের গুঁজিয়া; এইগুলি ঘুরে ঘুরে হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব করেন রামলোচন, টিপে টিপে পরিমাণটা বুঝে নেন, বিস্কুট হলে অন্ধকারেই গুনে দেখেন। চুরি করতে করতে তার 'আর্ট'-টা ওর জানা হয়ে গেছে; এমনভাবে নিতে হবে যে-কেউ সন্দেহ করতে না পারে। বিস্কুটের বাক্স যদি একেবারে ভর্তি থাকে তাহলে একখানার বেশি নেওয়া চলবে না, আবার খুব খালি হয়ে এলেও তাই। অথচ মাঝামাঝি অবস্থায় দুখানা কি তিনখানাও তুলে নেওয়া যায়, কারণ সে সময়টা অত হিসেব থাকে না। মিছরি কিংবা গুজিয়া যদি ঠোঙাভর্তি থাকে তো

দুটো তিনটে পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেন, নইলে লোভ সংবরণ করতে হয়, একটা বা একটুকরো নিয়েই ক্ষান্ত হন।

এইভাবে এদিক ওদিক হাতড়ে লুণ্ঠিত জিনিসগুলি বুকে করে নিজের ঘরে ফিরে আসেন। সেগুলি বিছানার ওপর সযত্নে সাজিয়ে রাখা হলে তবে কাপড় ছাড়বার কথা মনে পড়ে। এই বস্তুগুলি তারপর অন্ধকারে বসে বসেই খাওয়া চলে, সেই শেষরাত্রেই। মিছরিটা চিবোতে পারেন না, গালে ফেলে পাক্‌লে পাক্‌লে খান। খাওয়া শেষ হলে আর এক কল্‌কে তামাক টেনে আর একবার গিয়ে শুয়ে পড়েন, নিশ্চিন্ত হয়ে।

কিন্তু বোধ হয় ঠিক নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে পারেন না, কারণ কান থাকে মেজকর্তার ঘরের দোরের দিকে। মেজকর্তা ওঠেন ঠিক সাড়ে চারটায়, তাঁর ছিটকিনি খোলার শব্দ পেলেই রামলোচনও সরকারি ভাবে শয্যাত্যাগ করেন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আওড়াতে আওড়াতে গিয়ে তামাক সাজতে বসেন। শীতকালে তখনও অন্ধকার থাকে, কিন্তু তাতেই বা কী, এখন আর আলো জ্বালতে বাধা নেই। মেজকর্তা নিজে যে সময় ওঠেন, তাঁর বিশ্বাস সেইটেই ঘুম ভাঙবার প্রকৃষ্ট সময়, সুতরাং তখন আলো জ্বাললে বা কথা কইলে বিরক্ত হন না। তামাক খাওয়া শেষ করে আর একবার তাঁর খাটো গামছাখানির শরণাপন্ন হতে হয়। এবারে দালানে আলো জ্বালানোই থাকে, কারণ মেজকর্তা উঠেই কলঘরে ছোটেন, দৈবাৎ তা না থাকলে রামলোচন সদর্পে আলো জ্বালতে জ্বালতে এগিয়ে যান। আর ভয় কাকে।

এরপর প্রাতঃকৃত্য শেষ করে পূজা-আহ্নিক সারতে সারতে বেলা ফরসা হয়ে যায়, গরমের দিনে রোদ উঠে পড়ে কট্‌কটে। কিন্তু তখনও এক বড়বৌ অর্থাৎ রামলোচনের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও মেয়েছেলে ওঠে না—তাদের ছেলেরা তো নয়ই। সেজকর্তা ছোটকর্তা উঠেও নিজেদের পরলোক চর্চায় ব্যস্ত থাকেন বলে তরুণ-তরুণীদের নিদ্রাভঙ্গের কোনও কারণই ঘটে না। তা না হোক, রামলোচন তাতে দুঃখিত নন। সবাই উঠে পড়লে ঝামেলা, ছেলেমেয়েরা চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করে দেয়, স্ত্রীলোক ও পুরুষে দালান-উঠোন যেন গিজ গিজ করতে থাকে। সে ভিড় অসহ্য মনে হয় তাঁর। তার চেয়ে এই ভালো বড়বৌ স্নান করতে যান রান্নাঘরের চাবি খুলে দিয়ে, রামলোচন সেখানে ঢোকেন স্ত্রীকে সাহায্য করতে। প্রত্যহ উনান ধরিয়ে দেওয়া তাঁর কাজ, এটা তিনি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন। বাড়ির আর কোনো কাজ তাঁকে দিয়ে কেউ করাতে পারে না, এইটি ছাড়া। তার কারণ, আর কেউ ওঠবার আগে একা রান্নাঘরে ঢোকা লাভজনক। গত রাত্রির অবশিষ্ট বহু ভোজ্য নানা রকমে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, হিসাবের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে এ ঘরে নিয়ে আসা বা ওখানেই উদরস্থ করা এমন কিছু কঠিন নয়। অবশ্য দু-একবার যে ধরা পড়বার উপক্রম না হয়েছে এমন নয় কিন্তু প্রতিবারই কোনমতে সে বিপদটা এড়িয়ে গেছেন।

এরপর জামাটি গায়ে দিয়ে লাঠি হাতে প্রাতর্ভ্রমণে বার হন। এ নাকি তাঁর ডাক্তারের উপদেশ, খুব ঝড়-জল না হলে ভ্রমণ বন্ধ থাকে না। কিন্তু লোকে অবাক হয় এই দেখে যে একেবারে লেকের গায়ে বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেদিকে বেড়াতে যান না। তিনি যান ওধারের রাজপথ ধরে—সোজা গিয়ে বড় রাস্তায় ওঠেন। এইবার উদ্দেশ্যটা বোঝা যায়, ওখানকার দোকান থেকে এক আনার জিলিপি বা সিঙাড়া কিনে বাড়ি ফেরেন। এটা হল প্রকাশ্য জলখাবার। বাড়ির চায়ের পর্ব শুরু হয় একটু বেলাতেই—চাকরি ত কেউ করে না, সকলেই ব্যবসায়ী। অত বেলা অবধি থাকতে পারেন না বলে বেড়িয়ে এসেই জিলিপি-দুটি খেয়ে একঘটি জল খান প্রকাশ্যে। আগে

আগে ভাইপো ভাইঝিদের ছেলেমেয়েরা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। এখন তারাও মানুষ চিনে নিয়েছে, বৃথা লোভ করে না।

চায়ের পাট শুরু হয় সাড়ে-সাতটা নাগাদ। তখন বিস্কুট বা টোস্ট যাহোক কিছু অদৃষ্টে জোটে, নইলে হয়তো গরম পরোটা। কিন্তু তাতেও অনেকদিন তাঁর হয় না, রান্নাঘরের দোরের কাছে মোড়া পেতে বসে এদিক-ওদিক চেয়ে প্রশ্ন করেন, 'বড়বৌ, বাসি রুটি এক-আধখানা পড়ে আছে নাকি?' বড়বৌ বিষম চটে যান, গালমন্দও হয়তো দেন, তবু না দিয়েও থাকতে পারেন না। প্রার্থিত বস্তু হাতে পেলে প্রশান্ত মুখে গালাগাল শুনতে রামলোচনের আপত্তি নেই।

এসবের পালা শেষ করে আর একবার বাইরে বেরোন। রোগ এক-রকমের নয়; অর্শের জন্য ওল বা কচু চাই; পেটের অসুখের জন্য গাঁদাল পাতা বা থানকুনি পাতা, ডুমুর, কচুশাক, ওলকোঁড়া, নিমপাতা—এর জন্য ঢাকুরিয়া অঞ্চলে গিয়ে বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয় এই সময়টা। গড়ফা বা বৈষ্ণবঘাটা পর্যন্ত এক-একদিন হেঁটে যান যদি বিনামূল্যে পলতা পাওয়া যায় এই আশায়,—ধনে-পলতা খেতে হবে, রক্ত পরিষ্কার করে। এরই মধ্যে অবশিষ্ট তিনটি দাঁতের গোড়ার পরিচর্যার জন্য বকুলছাল বা নিমছাল কি পেয়ারা পাতা সংগ্রহ করতে ভুল হয় না। এইসব বোঝা সংগ্রহ করে দশটা এগারোটার সময় বাড়ি ফিরে বড়বৌর অবসরের জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারের জন্য সাধারণ রান্না যা হচ্ছে তার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর এইসব রান্না করিয়ে নিতে হবে।—বড়বৌ রাগ করেন খুবই, কিন্তু না করলেও নয়, বৃদ্ধ স্বামী হাতে-পায়ে ধরাধরি করেন। বাড়ির ঝালমশলা-তেল-বিশিষ্ট সমস্ত ব্যঞ্জনগুলির হিসাব কিন্তু সংগ্রহ করা থাকে রামলোচনের, খাওয়ার সময় নিজের নানা রকমের পথ্যের সঙ্গে সেগুলোও মিলিয়ে বুঝে নেন। ওঁর বিশ্বাস এই উপকারী বস্তুগুলোর সঙ্গে ওসব জিনিস খেলে আর দোষ নেই, ওর বিষক্রিয়া এতে কেটে যাবে। আবার এরই এক ফাঁকে দই আনতে ভুল হয় না চার পয়সার। সামান্য যা টাকা নিজের হাতে আছে এবং ভাইপো ও ভাগ্নেদের কাছে চেয়ে-চিন্তে যা পান, তাইতেই এই সব চলে। তাই বলে তাঁর এই সব খাদ্য থেকে কণামাত্র কাউকে তিনি দেন না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এককোঁটা দই কি একটুকরো কলার জন্য কেঁদে মরে গেলেও না। উদাসীন নিস্পৃহতার সঙ্গে সে সব তিনি উপেক্ষা করতে পারেন।

দ্বিপ্রহরের এই গুরুভোজনের পরে একটু দিবানিদ্রা দিয়ে উঠেই শুরু হয় চায়ের জন্য ধন্না দেওয়া। দুপরের আগুনের যা জের থাকে উনুনে, তাইতেই জল গরম করে নিয়ে তিনটে নাগাদ দু-তিন কাপ চা তৈরি হয় মেজগিন্নি ও কোনও কোনও বধূর জন্য। তা থেকে ভাগ নেওয়া চাই-ই তাঁর। তারপর তামাক ও অপরাহ্নকৃত্যের পর আবার পাঁচটায় যখন সরকারি চা-জলখাবারের ব্যবস্থা হয় তখন সেটারও পুরোপুরি সুবিধা নিতে ইতস্তত করেন না।

এর পরের ইতিহাস আরও বিচিত্র। এই সময় তিনি সত্যি-সত্যিই বেড়াতে বেরোন। গলাবন্ধ কোটটার ওপর মান্ধাতার আমলের চাদর ঝুলিয়ে ছড়িটি নিয়ে বেরোন। এ অভ্যাস তাঁর নাকি বহুকালের। প্রথম বয়সে—যখন কিছু পৈতৃক অর্থ ছিল হাতে, যখন এই সময় চোখ দুটো রঙিন করবার ব্যবস্থা ছিল,—তখন নাকি যেতেন মেয়েমানুষের কাছে। অবশ্য বড় নজরের সঙ্গতি বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না, খোলার ঘরের সস্তা স্ত্রীলোকের কাছেই যাতায়াত ছিল। এখন সে সামর্থও নেই (বহুকাল ধরেই নেই, সুতরাং শখটা অন্যভাবে মেটাতে হয়। বড়রাস্তাটা যেখানে বেঁকে কলকাতার সীমা লঙ্ঘন করেছে সেখানে এবং আশেপাশে বিস্তর বস্তি আছে; সাধারণত ঝিয়েরা

ওই সব বস্তিতেই ঘরভাড়া করে থাকে। সেখানে কিংবা ওধারের পাড়ার মধ্যে, রাস্তার কলের ধারে কি পুকুর-পাড়ে, যেখানে তারা কাজ-কর্ম করে, রামলোচন ঘুর-ঘুর করেন সেইখানেই। সকুল ঝি বলে—'ঠাকুর যেন ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়।' অবশ্য এরা অধিকাংশই খারাপ নয়, স্বামী-পুত্র নিয়ে বাস করে; কিন্তু খারাপ হলেই বা কী, রামলোচনেরও সে বয়স নেই। শুধু মেয়েছেলের সাহচর্য লাভ করা, তার সঙ্গে দুটো আলাপ করা—এইটুকুই তাঁর সাধ, এতেই তিনি কৃতার্থ। চিরকালই অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গ তাঁর ভালো লাগে কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েদের সংস্পর্শে কেমন অস্বস্তি বোধ করেন। সুতরাং ঝোঁকটা ওঁর এদের দিকেই বরাবর।

বিচিত্র মানুষ রামলোচন।

পৈতৃক জমিজমা এবং সামান্য কিছু টাকা-কড়ি ছিল বৈকি। কাজকর্ম কোনদিনই করেননি, বসে খেয়েছেন এবং নাবালক ভাইদের অংশও বেচে উড়িয়ে দিয়েছেন। লেখাপড়া জানতেন না, চাকরি করার যোগ্যতা বা ব্যবসা করার মতো বুদ্ধি কোনটাই ছিল না। বরং শেষ বয়সে দোকানে খাতা লেখার কাজ বা ছোট ছোট ছেলে-পড়ানোর কাজ জোগাড় করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খাতায় ভুল করার জন্য এবং ছেলেমেয়েদের ভুল শেখানোর জন্য কোনও চাকরিই টেকেনি বেশি দিন। অবশ্য খুব বেশি প্রয়োজনও ছিল না তার—ভাই ও ভাইপোরা ভালো, কেউ ওঁকে ভাসিয়ে দেয়নি। যদিচ, অনেকে বলে সেটা ওঁর জন্য নয়, বড়বৌ-এর জন্য। বড়বৌ সুগৃহিণী, সংসারটাকে মাথায় করে আছেন, তাঁর মুখ চেয়েই তাঁর স্বামীকে সহ্য করে ওরা। আর বড়বৌও স্বামীর সামর্থ্য জানেন বলে প্রাণপণে খেটে যান। পরের বাড়ি রাঁধুনিগিরি করার চেয়ে নিজের দেওর ও দেওরপোদের সংসারে খাটা ভালো—এই তাঁর বিশ্বাস। বাইরে অন্তত সম্মানটা থাকে তাতে।

ভাইরা বড় হয়ে সবাই ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিলেন, সে সব ব্যবসা ভাইপোদের হাতে পড়ে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আসবাবের দোকান, মনোহারী, ছাপাখানা, বইয়ের দোকান—কী নেই। অভাব নেই কোথাও, তাই বড়ভাইকে সহ্য করেন। তাছাড়া মানুষটা তো নিজেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, আর ক-দিন! পেট খারাপ, কিছুই হজম হয় না, ছত্রিশ রকমের রোগ ও উপসর্গ দেহে জড়ানো। ডাক্তার বলেন এসময় ওঁর একবেলা অল্পকিছু আহার করা উচিত, তাতেই সুস্থ থাকবেন। কিন্তু সে সব কথা উনি বিশ্বাস করেন না। শরীর যত খারাপ হয় তত খেতে চান। আহারের লোভ তো বটেই—তাছাড়া ধারণা আছে যে, যত বেশি খাবেন তত শরীর সারবে। এই করেই হজমের ক্ষমতা নষ্ট করেছেন উনি, বেশি করে খেয়ে উঠেই এমন কিছু খেতে শুরু করেছেন— হজমী বলে যার খ্যাতি আছে; আবার হজমী জিনিস খাচ্ছেন যখন, তখন শীগগিরই হজম হয়ে যাবে এই বিশ্বাসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারী খাবার খেয়েছেন।

তবু, এসবও অনায়াসে ক্ষমা করা যেত যদি স্বভাবের ওই বড় দোষটা না থাকত।

স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর বনিবনাও কোনও কালে নেই, দুজনের ঘনিষ্ঠতা দেখেছে বলে কারুর মনে পড়ে না। এমন কী ওঁদের যে সন্তান হয়নি তার জন্য বড়বৌ আকার ইঙ্গিতে স্বামীকেই দায়ী করেন। অথচ বাইরের টান ওঁর আছে প্রথম থেকে—আজ পর্যন্ত। বাড়িতে তরুণী ঝি রাখার উপায় ছিল না, তার জন্য অন্যান্য বধূদের বহু বাঁকা কথা শুনতে হয়েছে বড়বৌকেই। তাতেও রক্ষা ছিল না, ঘরে না পেলে পাড়ার আশেপাশে খুঁজে বেড়িয়েছেন।

আজ, এই এতকাল পরে, নখদন্তহীন অবস্থাতেই বা কম কি? বিকেলে যখন বেড়াতে বেরোন তখন পাড়ায় যতগুলি ঝির সঙ্গে দেখা হয় প্রত্যেকের সঙ্গেই খানিকটা ঘনিষ্ঠতা না করে ছাড়েন

না—অথচ কেউ কোনদিন শোনেনি তাঁকে ভাইপো ভাইঝির বা নাতি-নাতনিদের খবর নিতে। আর বাইরে?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম মোড়টিতেই হয়তো থেমে গেলেন রামলোচন, 'বলি অ লক্ষ্মী, ভালো আছ? মেয়ে ভালো? শ্বশুড়বাড়ি থেকে ফিরেছে মেয়ে? ওর শাশুড়ি কেমন?...ভালো...ভালো।'

লক্ষ্মী হয়তো প্রশ্ন করে, 'আপনার শরীর কেমন দাদাঠাকুর?'

'আমার আর শরীর। খেতে পাইনে ভালো, শরীর সারবে কী করে? যা বাজার, না দুধ না দই—কী খেয়ে বাঁচি তারই নেই ঠিক।...যাব একদিন লক্ষ্মী তোদের বাড়ি, মেয়ের কী গয়না হল দেখে আসব।'

ততক্ষণে হয়তো অন্নদা এসে পড়েছে।

'এই যে অন্ন, কবে এলি? শরীর ভালো? ইস—আবার নতুন ফুল গড়ালি যে কানের—ও কী ফুল রে?'

'পেরজাপতি বাবাঠাকুর, পাখায় লাল পাথর বসানো। তাই ছত্তিশ টাকা পড়ল। কী সোনার দর হয়েছে!'

'ছ-ত্রি-শ টাকা! তা হবে বৈকি! প্রায় যে একশ' টাকা দর এখন সোনার। বেশ, বেশ দিব্যি মানিয়েছে কিন্তু তোকে অন্ন। নতুন রসান দেওয়া ফুল, মুখখানি বেশ জমজম করছে।'

অন্ন মানুষ চেনে। সে বাসন নামিয়ে হাত ধুয়ে নিয়ে বলে, 'এই গড়াতে গিয়ে হাত একেবারে খালি হয়ে গেল বাবা...দোক্তা কিনব এমন পয়সা হাতে নেই, কী টানাটানি চলছে কী বলব।'

রামলোচন পকেটে হাত পুরে একটা আনি বার করেন, 'তাইত, তা অন্ন, এই আনিটা রাখ। দোক্তা কিনে নিয়ে যাস।'...তারপর একটু ইতস্তত করে বলেন, 'আর বুঝলি, দরকার হলে চাস, লজ্জা করিসনি!'

আজই সকালে ছোট ভাইপোর কাছ থেকে তিনটে টাকা পেয়েছেন, পকেট ভারী আছে।

ওখান থেকে এগিয়ে গিয়ে আর একটা পুকুরের ধারে থমকে দাঁড়ান। সামনের বাড়িতে বীণা কাজ করে। তাঁদেরই পুরোনো ঝি কাদুর মেয়ে বীণা, অল্পবয়সী, সুশ্রী মেয়েটি। শ্যামবর্ণের ওপর দিব্যি একটা লাবণ্য আছে, মুখে হাসি লেগেই থাকে বলে আরও ভালো দেখায়। বীণা এবাড়ি আসে ঠিক সাড়ে পাঁচটা ছটার সময়ে, সময়টা জানা আছে রামলোচনের। এখনই বাসন নিয়ে বেরিয়ে ঘাটে আসবে মাজতে।

বীণা এসে ঘাটে বাসন নামালে রামলোচন একেবারে কাছে এসে উবু হয়ে বসেন। টেনে টেনে রস দিয়ে বলেন, 'কী লো, আজ মুখ ভারী ভারী কেন? বর বুঝি আসেনি কদিন?'

'কী যে বলেন দাদু,' বীণা মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'মুখের আকঢাক নেই! আজ একটু অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই।'

লোলচর্ম, ঈষৎ-কম্পিত হাতখানা বাড়িয়ে দেয় রামলোচন ওর দিকে, বীণার মসৃণ নিটোল-বাহুমূলে হাত বুলিয়ে যেন ওর উন্নত যৌবনটা অনুভব করতে করতে বলেন, 'যাই বল বীণা, এমন হাত, একজোড়া তাগা না হলে মানায় না। বরকে বলতে পারিস না গড়িয়ে দিতে?'

একটা ঝাঁকানি দিয়ে বীণা হাতটা সরিয়ে নেয়, 'আমার বর তো আর বড়লোক নয়। কী যখন তখন গায়ে হাত দাও দাদু, লজ্জা করে না? আমরা না হয় খেটে খাই লোকের বাড়ি, তোমারও তো মান মর্যাদা আছে!'

অপ্রতিভ রামলোচন ফোকলা দাঁত বার করে হাসেন বোকার মতো, 'তাতে কী হয়েছে রে, হাজার হোক তুই তো নাতনি হলি লো সুবাদে!'

'তা হোক, তুমি যাও—ওঠো এখন। কাজ করতে দাও।'

অগত্যা উঠতে হয় ওঁকে। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে অঘোর ঘরামির দাওয়া; রামলোচন ধপাস করে সেখানে বসে পড়েন। অঘোরের মেয়ে সুকুমারীকে ডেকে বলেন, 'এক ছিলিম তামাক খাওয়াবি নাকি রে নাতনি? দ্যাখ, খাওয়াস তো বসি নইলে চলে যাই।'

এমনি করে দু-তিনটে পাড়া ঘুরে সকলকার খবর নিয়ে বাড়ি ফেরেন যখন, তখন আটটা বেজে যায়। এসেই রান্নাঘরের সামনে আবার ধন্না শুরু হয়—গরম রুটি, ডাল আর সামান্য একটু দুধ মিলবে, সেই আশায়।

এই হল তাঁর দৈনন্দিন জীবন। জীবনের যত সমস্যাই দেখা দিক চারিদিকে, যত প্রশ্নই তীব্র হয়ে উঠুক, ওঁর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রতিটি দিন এবং রাত্রি, অপর দিন ও রাত্রির সঙ্গে সমান। কোথাও কোনও তফাত, কোনও বৈচিত্র্য নেই।

আষাঢ়ের শেষাশেষি রামলোচন এবার বিষম অসুখে পড়লেন। জ্বর, তার সঙ্গে উদরাময়, ডাক্তাররা বললে খারাপ ধরনের অসুখ, বোধহয় গ্রহণী। তিনচার দিন পরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বড়বৌ সেবা করতে এসে দেখেন তোশকের নীচে কতদিনের বাসি পচা জিলাপি, ভাঙা বিস্কুট, শুকনো লুচি। কবে কোন্ দোকানের হালখাতার একসরা খাবার পেয়েছিলেন, কাউকে কখনও কোনও খাবারেরই ভাগ দিতেন না, তবু কোন্ চক্ষুলজ্জায় লুকিয়ে এনে সরাসুদ্ধ ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। সেগুলো পচে সমস্ত বাক্সটায় দুর্গন্ধ। বড়বৌ এসব সাফ করেন, গজগজ করেন আর গালাগাল দেন। তবু করতে হয় তাঁকেই; নইলে এত কে করবে আর? কার এত গরজ?

প্রায় মাসখানেক ভুগে জ্বরটা গেল, পেটটাও সামান্য একটু ধরে এল, রামলোচন সজ্ঞানে আবার ভালো করে তাকালেন চারিদিকে। কিন্তু পা আর হল না। উঠতে কিছুতেই পারেন না, পায়ে জোর নেই, কোমরও বোধ হয় ভেঙেছে। রামলোচনের বিলাপের শেষ নেই। কেউ তাঁকে ভালো করে ডাক্তার দেখাচ্ছে না—এ অনুযোগ তো আছেই। বউবৌকে চুপি চুপি বলেন, 'আছি, তবু তো মাছ-ভাত পেটে যাচ্ছে দুবেলা বড়বৌ, তুমি একটু মুখ পানে চাও। ওরা না দেখায়, বালাজোড়া বাঁধা দিয়ে ভালো ডাক্তার আনো!'

বড়বৌ উত্তর দেন, 'মরণ আর কী! কী এমন নিধি উনি, তাই বালা বাঁধা দিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে। কেন, ভাইরা ডাক্তার দেখাচ্ছে না? উপযুক্ত ছেলে থাকলেও এমন চিকিৎসা হত না, ভাই-ভাইপো যা করলে। আর বুড়োবয়সে কী একদিনে সেরে ওঠে নাকি?'

একটু চুপ করে থেকে কাতর-কণ্ঠে বলেন, 'বড়বৌ, হাত পায়ের ফুলোগুলো কমে গেলে বোধ হয় একটু জোর পাব, তোমার বাপের বাড়ির দেশে কী এক সুতো পাওয়া যায় না? ধারণ করলে ফুলো কমে?'

বড়বৌ বলেন, 'হ্যাঁ, ডাক্তাররা বলছে পেটে কিছু হজম হচ্ছে না, তার দরুণ রক্ত নেই বলে হাত-পা ফুলছে—লাল সুতো বেঁধে উনি সে ফুলো সারাবেন!'

তবু লালসুতো এনে দু পায়ে বেঁধে দেন। আরও দু-একটা মাদুলি আসে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না, পায়ে আর জোর আসে না কিছুতেই।

সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে রামলোচনের এই পরনির্ভরতা। বিছানায় শুয়ে দৈহিক কাজগুলো সারতে হয় এজন্য তাঁর তত দুঃখ নেই, কারণ সে বড়বৌ করে—এখনও তাঁকে তিনবার করে কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল নিতে হয় মাথায় (এতবার স্নান করা সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থা), সে জন্য লজ্জাও নেই—কিন্তু আহারটার জন্যেও যে পরের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়, এর চেয়ে আর দুঃখ কী আছে? ডাক্তার বেঁধে দিয়েছেন পোরের ভাত, সিঙিমাছের ঝোল আর কাঁচকলা সিদ্ধ, বিকালে বার্লি, রাত্রে দুধবার্লি বা খই-দুধ। এ খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে, না পায়ে জোর পায়? এ শুধু ওদের ষড়যন্ত্র ওঁকে পঙ্গু করে রাখার।

রামলোচন হাঁ করে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন। একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন বাইরের দালানের দিকে। কিন্তু দালানের এ কোণের দিকে প্রায়ই কারুর প্রয়োজন হয় না—কদাচিৎ কেউ ছিটকে এসে পড়ে। তবে যদি কেউ আসে তার আর রক্ষা নেই, সঙ্গে সঙ্গে রামলোচনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তাকে তাড়া করে, 'অ ন-বৌমা, মালক্ষ্মী, এদিকে একবার শোনো-না। আমার মা-জননী কই গো, ছেলেকে কি মনে পড়ে না?'

আগে আগে দয়া-পরবশ হয়ে কিংবা ভদ্রতার খাতিরে, ইদানীং মজা দেখবার জন্য—হয়তো সে এসে দাঁড়াল। ভালো করে ঠাউরে দেখে রামলোচন বললেন, 'ন-বৌমা নয় আমাদের নতুন বৌমা, মালতী? বেশ, বেশ—আহা, তুমি মা কত বড় বংশের মেয়ে, তোমার বাবাকে তো আমি চিনি—মহাশয় লোক ছিলেন। আহা অমন লোক কী আর হবে!'

মালতী হয়তো বললে, 'ওকি জ্যাঠামশাই, ছিলেন কী, আমার বাবা তো এখনও বেঁচে আছেন!'

'থাকবেন বৈকি মা, থাকবেন বৈকি! পুণ্যের শরীর তাঁর, দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবেন। তুমি দেখে নিও নতুন বৌমা, একশ বছর পরমায়ু পাবেন তোমার বাবা!...তা হ্যাঁ, একটা কথা শুনবে মা?'

'কী বলুন?' অতিকষ্টে হাসি চেপে বললে মালতী।

'চারটি মুড়ি একটু নুন-তেল মেখে নিয়ে আসতে পারো মা? খুব দুটিখানি?'

'না জ্যাঠামশাই, সে আমি পারব না। ডাক্তার আপনাকে তেল খেতে একেবারে বারণ করেছে!'

'ওসব ডাক্তারদের বুজরুকি মা, বুঝেছ? আমাকে মেরে ফেলবার মতলব। ওসব তুমি শুনো না বাছা,—যাও দুটিখানি মেখে নিয়ে এসো, লক্ষ্মী মা আমার!'

মালতী ঘাড় নেড়ে বললে, 'না সে আমি পারব না। মা জ্যাঠাইমা রাগ করবেন।'

এই বলে সে হয়তো ঘব থেকে বেরিয়ে গেল। রামলোচন রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বললেন, 'তা পারবেন কেন? কুঁড়ে পাথর নিজে গিলতে পারো খুব! রাক্ষুসী!...ছোটলোকের ঘরের মেয়ে তো, ও আর কত ভালো হবে! ছোটলোকের ঝাড় সব!' ইত্যাদি।

সে রাগটা কমলে আবার উৎসুখ দৃষ্টি মেলে শুয়ে থাকেন। এবার হয়তো আসে চাঁপা, মেজভাইয়ের নাতনি। সঙ্গে সঙ্গে রামলোচনের কণ্ঠ মোলায়েম হয়ে আসে, 'চাঁপা ভাই, দিদি আমার, একবার শুনবি এধারে? একটুখানি, এক মিনিট?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাঁপা এসে দাঁড়ায়, 'কি বলছ?' সতেরো আঠারো বছরের ঝলমলে মেয়ে চাঁপা সদ্য বিয়ে হয়েছে ওর, শাড়িতে ও গয়নায় যেন জ্বলছে।

'চাঁপা ভাই, নাতজামাই এসেছিল কাল?'

'কাল কেন আসবে, কাল কি আসবার দিন? কী দরকার তাই বলো না—'

'না তাই বলছি! যাই বলিস ভাই চাঁপা, আমার সলিল বড় ভালো ছেলে, অমন জামাই

একটাও এ বাড়িতে আসেনি। যেমন রূপ তেমনি গুণ! আর বিদ্যেটাই কি সোজা? সলিল আমার রত্ন।'

'আচ্ছা তাই না হয় হল। এখন আমাকে ডাকছিলে কেন?'

'চাঁপা, একখানা গরম লুচি খাওয়াতে পারিস দিদি?'

'লুচি? লুচি কোথা পাব?'

'তবে একটা গজা?' উৎসাহে, আগ্রহে, আকুলতায় মাথাটা ওঁর বিছানা থেকে ঝুলে পড়ে, 'একখানা খাস্তা গজা? গজা খেলে কিচ্ছু ক্ষতি হবে না আমার, তুই দেখে নিস।'

'হ্যাঁ, তারপর বড়দি আমাকে বকুক? তাকে একশ' বার ময়লা ঘেঁটে মরতে হচ্ছে, আর আমি কুপথ্যি খাইয়ে আরও রোগ বাড়িয়ে দিই। সে আমি পারব না।'

সবেগে মাথা নেড়ে, শাড়ির আঁচল দুলিয়ে চাঁপা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

রামলোচন পেছন থেকে গালাগালি দেন, 'মরণ! অহ্মারে মটমট করছেন। তবু যদি বড়লোকের ঘরে বিয়ে হত। ওই তো বরের ছিরি, কালো রোগা কাঠ! ওইতেই এত তেজ! তেজের মাথা খাও!'

আবারও গলাটা ঝুঁকিয়ে দালানের দিকে চেয়ে থাকেন, যদি কেউ আসে এধারে।

সেদিন বাড়িতে কী একটা খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, বোধ হয় কোনও বৌয়ের সাধ কিংবা অন্নপ্রাশন কারুর ছেলের। সারাদিন ভালো ভালো রান্নার গন্ধ রামলোচনের নাকে এসে পৌঁছেছে অত দূর থেকেও। সন্ধ্যা থেকে লুচি, কাটলেট, পাঁপর ভাজার গন্ধ। অনেকবার মিনতি করেছেন বড়বৌয়ের কাছে, অনেক পরলোকের ভয় দেখিয়েছেন, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। সন্ধ্যাবেলা রাগ করে দুধবার্লিরিও গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, তাতে লাভের মধ্যে বড়বৌয়ের কুবাক্যই সইতে হয়েছে, পরে আর একগ্লাস বার্লিও জোটেনি। অতিথিদের শুনিয়ে গৃহস্থদের অপদস্থ করার ইচ্ছায় খানিকটা চিৎকার করে কাঁদবার চেষ্টাও করেছেন—ফল হয়েছে এই যে, ভাইপো এসে ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে গেছে। অগত্যা ঘরে শুয়ে শুয়ে অতিথিদের আনন্দ-কোলাহল শোনা এবং পরিবেশনের শব্দ থেকে কী কী রান্না হয়েছে সেটা অনুমান করার চেষ্টা করা—এছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি রামলোচন।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এল। বাড়ির সমস্ত গোলমাল কমতে কমতে একসময়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ভরসা ছিল যে, বড়বৌ মুখে যাই বলুক, আর একগ্লাস বার্লি অন্তত দেবে, কিন্তু সে আশাও একসময়ে ছাড়তে হল যখন দালানের ঘড়িতে একটা বাজার শব্দ কানে এসে পৌঁছোল।

রাগে, ক্ষোভে, ক্ষুধায় ঘুমোতে পারেন না রামলোচন। ইদানীং আর বড়বৌ এঘরে থাকেন না, রোগ খুব বেশি নেই, মিছিমিছি সারাদিন খাটুনির পর বিশ্রামটা নষ্ট করতে চান না। অয়েলক্লথের ওপর রামলোচন শুয়ে থাকেন, কতকগুলো ছেঁড়া ন্যাকড়া পাশেই থাকে। পা পড়ে গেছে, হাত তো আর যায়নি!' ঝঙ্কার দিয়ে বলেন বড়বৌ, 'আমি কি আর দিনরাত ওই করব?'

অবশেষে ঘড়িতে দুটো বাজল। কিছুতেই আর শুয়ে থাকতে পারেন না রামলোচন। নিজের অনাহার এবং ভালো ভালো খাদ্যের কল্পনা তাঁকে পাগল করে তোলে। শেষ পর্যন্ত একটা অদ্ভুত মতলব মাথায় যায় ওঁর, কোনমতে বিছানার ধারে এসে দেহের ওপরের অংশটা অনেকখানি

ফুলিয়ে দুই হাতে মেঝেটা স্পর্শ করেন, তারপর হাতের ওপর ভর দিয়েই একটু একটু করে এগিয়ে পা-দুটো টেনে তক্তপোশ থেকে নামিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কাজটা দুর্বল শরীরের পক্ষে খুবই দুরূহ, হাত দুখানা থর থর করে কাঁপে, সমস্ত দেহ ঘামে ভেসে যায়। তবু রামলোচন হাল ছাড়েন না। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণ চেষ্টায় শরীরের নীচের অংশকে আকর্ষণ করতে থাকেন।

খানিকক্ষণ ধরে এমনি চেষ্টা করার পর একসময় সেটা ধপাস করে আছড়ে এসে পড়ে মেঝের ওপর! যন্ত্রণায় একটা চাপা আর্তনাদ করে ওঠেন রামলোচন, কিছুক্ষণ আর নড়তেও পারেন না। মনে হয় পা-দুটো বুঝি ভেঙেই গেল। কিন্তু খানিকটা পরে আবার নিজেকে সামলে নেন, প্রবল ইচ্ছাশক্তিই জয়ী হয়ে ওঠে—দুটো হাতে ভর করে পা টানতে টানতে এগিয়ে যান দরজার দিকে, খোঁড়া কুকুর যেমন করে পেছনের পা-দুটো টেনে টেনে চলে—কতকটা সেই রকম করে।

তারপর দরজাটা ফাঁক করে দালানে মুখ বাড়ান।

আঃ—কী মুক্তি! কতকাল পরে এ ঘরের বাইরে পা দিলেন তিনি!

আজকাল একটা পাঁচ বাতির আলো দালানে জ্বলে সমস্ত রাত। তাঁর অসুখের সময়ই এ ব্যবস্থা হয়েছিল, ছেলেপুলের ঘরে খুবই সুবিধা হয় বলে সেটা টিকে গেছে। ক্ষীণ আলো, তবু তাইতেই সর্বাগ্রে চোখে পড়ল তাঁরই ঘরের প্রায় সামনে এঁটো পাতা-গেলাস-খুরি স্তূপাকার করা আছে, তার সঙ্গে দুচারটে গামলা বালতি প্রভৃতি বাসনও।

লোভে ও ঔৎসুক্যে চোখ জ্বলতে থাকে ওঁর। দেহে যেন অপরিসীম বল অনুভব করেন। সামনে এগিয়ে লোলুপ-আগ্রহে সেই এঁটো পাতার রাশির মধ্য থেকে উচ্ছিষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করতে থাকেন—আধখানা লুচি, আলুর টুকরো, মাছের কুঁচি, খানিকটা কাটলেট, সিকিখানা চিংড়িমাছ, দরবেশের গুঁড়ো, পান্তুয়ার অর্ধেকটা—এমন কী আস্ত সন্দেশ রসগোল্লাও একআধটা খুঁজে পান। খেতে খেতে যেন নেশা লাগে, পাতাগুলো তুলে তুলে জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করেন। সারা মুখে, বুকে, সর্বাঙ্গে তরকারির ঝোল মিষ্টির রস, দই লাগে—তবু ভ্রূক্ষেপ নেই।

অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে খেয়ে একসময়ে শ্রান্ত হয়ে চুপ করেন রামলোচন। এইবার দালানটার দিকে ভালো করে তাকাবার অবসর মেলে।

ও কি, ওখানে শুয়ে কে! এত কাছে মানুষ ছিল তাঁর, আর এই কাণ্ড তিনি করেছেন এতক্ষণ ধরে, নিশ্চিত হয়ে?

ভয়ে রামলোচনের বুকের মধ্যেটা যেন ঠান্ডা হয়ে আসে। টিপ টিপ করে শব্দ হয় সেখানে।

কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হন। না, ও ঘুমোচ্ছে। ঝি বোধ হয়, নতুন ঝি।

রামলোচনের মনে পড়ে ওঁদের পুরোনো ঝি নেতার মেয়ে সাবি বিধবা হয়ে মার কাছে ফিরে এসেছে, তারই সম্প্রতি বহাল হবার কথা শুনেছেন বড়বৌয়ের কাছে। সাবি যখন এগারো বছরের মেয়ে তখন বিয়ে হয়েছে—এখন সে-হিসেবে ওর কুড়ি একুশ বছর বয়স হবার কথা। কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে।

কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে ক্রমশ। তেমনি হাতে ভর দিয়েই এগিয়ে যান তার দিকে। একটা মাদুরের ওপর সাবি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। পরিশ্রান্ত দেহ, কাপড়চোপড় যে এলিয়ে পড়েছে তা ও টের পায়নি। ওরই মাথার ওপর আলোটা জ্বলছে, সেই আলোতে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রামলোচনের দৃষ্টি লুব্ধ হয়ে ওঠে বহুকাল পরে, তিনি স্থান কাল পাত্র সব ভুলে যান।

সেই খাবারের রস ও ঝোল মাখা হাতেই ওর নধর যৌবনপুষ্ট কাঁধ ও হাতের ওপর হাত বুলোতে যান। হাতই যেন রসনা ওঁর, সাবির তরুণ যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করেন হাত বুলিয়ে

কিন্তু সে স্পর্শে সাবির ঘুম ভেঙে যায়। মুহূর্ত কয়েক বিহ্বলভাবে ঘুমচোখে তাকিয়ে থেকে ঘুম-ভাঙার অর্থ খুঁজে পায় সে। বৃদ্ধের লোলুপ দৃষ্টি এবং সর্বাঙ্গে ওই ভোজ্যের রস মাখা বীভৎস চেহারা দেখে ভয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল সাবি। লাফিয়ে সরে গিয়ে কেঁদে চিৎকার করে একেবারে হাট বাধিয়ে তুললে।

সে চিৎকারে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এল। তাদের খানিকক্ষণ সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর বড়বৌ মেঝেতে মাথা খুঁড়তে লাগলেন লজ্জায় ও অপমানে, বাকি সকলে যার যা মুখে এল বলতে লাগল।

সেই অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার মধ্যে ব্যাকুল অসহায় আর্ত রামলোচন বিহ্বল-দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলেন চুপ করে—শুধু কী যেন একটা কৈফিয়ত দিতে গেলেন বারবার—কিন্তু কিছুতেই গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোল না, শুধু সেই চেষ্টায় ওঁর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল।

লীলা মজুমদার

পঞ্চাশ বছর আগেও কলকাতার দক্ষিণদিকে ভবানীপুরে অনেক জায়গা ছিল। সেসব জায়গায় বট অশ্বত্থের সঙ্গে আম জাম তেঁতুল নারকেল জামরুল আর কৃষ্ণচূড়ার গাছের ডালে রাজ্যের পাখি এসে গান জুড়ে দিত। গাছতলায় দিনের বেলায় পশ্চিমা ব্যাপারি রামসেবকের ছাতুর দোকানে ভিড় হত। পাড়ার ছেলেরা ডাংগুলি খেলত। রাতে শেয়াল ডাকত, হুতুম প্যাঁচা ডাকত। বৃষ্টি হলে জল জমত, কোলা ব্যাঙ গ্যাঙর গ্যাঙ করত।

সেই রকম একটা জায়গা, তার এক বড় রাস্তা দিয়ে ট্রামগাড়ি যেত আর বাকি তিন দিকে কুড়ি ফুট পথের ওপর গোটা বারো ভালো ভালো বাড়ি ছিল। বাড়িগুলো বেশ পুরনো। এ পাড়ার সবাই সবাইকে চিনত, প্রায় বাড়িতে এক-ই ধোপা, দরজি কাজ করত; কাজেই সব বাড়ির সব খবর বাকিরা সবাই জানত। সব খবর জানলেও, সকলের সঙ্গে সবাই মিশত না। বিশেষ করে ট্রাম-লাইনের ঠিক উল্টো দিকের পাশাপাশি ৬ নং আর ৭ নং দুই বাড়ির বাসিন্দারা। তাদের বাড়ির মধ্যিখানের পঞ্চাশ বছরের পুরনো পাঁচিলটা ছিল দোতলার সমান উঁচু। সেকালে রায়েরা ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্ম আর চৌধুরীরা গোঁড়া হিন্দু। অন্তত সবাই তাই জানত। পাড়ার সবাই তাই নিয়ে হাসাহাসি করত। নাকি ৬০ বছর আগে দুই বন্ধু ছিলেন হরিহরাত্মা। জলের দরে জমি কিনে—অনেকে এত দূরও বলে যে সেকালে এ অঞ্চলে ঠ্যাঙাড়েদের উপদ্রব ছিল, তাই পয়সা দিয়ে জমি কিনতে হত না। বরং কেউ জমি নিয়ে বাড়ি করে বাস করলে তাকে নগদ কিছু দেওয়া হত,—নিশ্চয় সব আজগুবি গুজব, তাই হয় কখনো?—বাড়ি করে গুছিয়ে বসতে না বসতে অর্ণব রায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাল্লায় পড়ে ব্রাহ্ম হয়ে গেলেন। কানু চৌধুরী রেগে চতুর্ভুজ হয়ে অর্ণবের বাড়ির দিকের ঘর দুটো ঠাকুর-ঘর বানিয়ে রোজ দুই সন্ধে পূজা-পাঠ শঙ্খ-ঘণ্টা লাগিয়ে দিলেন। এই সমস্ত পৌত্তলিক অনাচার সইতে না পেরে, অর্ণবও দো-তলার সমান পাঁচিল তুললেন। আবার কেউ কেউ বলে অর্ণবের বাবুর্চির অসাবধানতার জন্যে রোজ রোজ দু-তিনটে মুরগি কানুর বাড়ি চরতে যেত, তাই কানুই পাঁচিল তুলেছিলেন। কে না জানে কথায় কথা বাড়ে।

আদি কারণটা যাই হোক, সেই ইস্তক দুই-বাড়িতে যাওয়া-আসা নেই। অন্তত প্রকাশ্যে নেই। অবিশ্যি সামাজিক অনুষ্ঠানে, পাড়ার আর সকলের যেমন নেমন্তন্ন হত, এঁরাও পরস্পরকে নেমন্তন্ন করতেন, পুরুষরা গিয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করেও আসতেন কিন্তু মেয়েদের মধ্যে নাকি আসা-যাওয়া ছিল না। তবে পাড়ার লোকের যেমন অভ্যেস, তারা কানাঘুষো করত বুড়োরা যা খুশি করতে পারেন, তরুণরা বংশপরম্পরায়—যাকগে, পাড়ার লোকের কথার কতটুকুই বা মূল্য।

সে-দিন ছিল শনিবার, ৫টা বেজে গেছিল, ৬ নম্বরের এক তলার খাবার ঘরের চায়ের টেবিলে কাঁধে সোনার পিন দিয়ে আঁটা ব্রাহ্ম-ফ্যাশানে ক্রেপের শাড়ি পরা, আধা-বয়সি দুই মহিলা-ই থেকে থেকে রুপোর চা-দানির দিকে তাকাচ্ছিলেন। যদিও চা-দানির ওপর মস্ত রেশমি ঘাগরা-পরা মেম-পুতুল চাপা দেওয়া থাকাতে, চট করে চা ঠান্ডা হবার সম্ভাবনা কম ছিল। টেবিলে লেসের ঢাকনি দেওয়া দুটি ছোট পাত্র-ও ছিল। দরজার ওপরকার ঘড়িতে

৫।১০ বাজতেই, পাশের দরজা খুলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে রুমা বলল, 'সরি পিসিমা, সরি হেমন্তপিসি আজ আপিসে—'

পিসিমা শুকনো গলায় বললেন, 'চায়ের টেবিল ব্যবসার গল্পের জায়গা নয়, রুমা। মি. সরকারের ল্যান্ডো বোধ হয় তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল?'

রুমা হাসল, 'কি যে বল পিসিমা! উনি সেই সাত সকালে সরে পড়েছেন। মাঘোৎসব কমিটির মিটিং আছে। বাসব—'বলেই রুমা থেমে গিয়ে, লেসের ঢাকনি খুলে এক সঙ্গে মুড়ে তিনটে তিনকোণা শশার স্যান্ডউইচ তুলে নিল।

পিসিমা বিরক্ত হলেন, 'রুমা রিয়েলি!! বৌদিদি তোমাকে কিচ্ছু শেখায়নি, দাদার জন্য দুঃখ হয়!' রেগে পিসিমা টুক করে হাতের ভারী টিপটটা তার খুরো দেওয়া ছোট ট্রে-র ওপর নামালেন। হেমন্তপিসিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'তুমি অত উদ্বেল হলে চলবে কেন, টিনা, ওতে তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হবে। কারো কথা তো শুনল না, অবনীদা মনে নেই, বায়না ধরেছিল কানু চৌধুরীর সেই ফ্যাকাশে মেয়েটাকে বিয়ে করবে?—একেবারে আকাট মুখ্যু, তার মেয়েগুলো আমাদের স্কুলে পড়ত, মা-টি এক-গাল পান খেয়ে, এক-গা গয়না পরে, আঁচলে চাবি ঝুলিয়ে আব বিশ্বাস কর, খালি পায়ের আঙুলে রুপোর রিং পরে প্রাইজের দিন আসত। এই মোটা, ফ্যাকফ্যাকে ফরসা, আর কি জোরে জোরে হাসত।'

পিসিমা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'রুমার সামনে ও কি সব কথা, হেমন্তদি, তোমার যদি কোনো আক্কেল থাকে।' রুমা আরো তিনটে স্যান্ডউইচ এই অবসরে তুলে নেবার তালে ছিল, হতাশ হয়ে বলল, 'বাঃ, থামলে কেন হেমন্ত পিসি, তারপর কি হল?'

পিসিমা বললেন, ''হবে আবার কি বাবা দাদাকে বিলেত পাঠালেন। সেখান থেকে লিখে পাঠাল 'ল্যান্ডলেডির মেয়ে বিয়ে করব, বয়সে একটু বড় হলেও, খাসা রাঁধা।'' বাবা পত্রপাঠ ছেলে ফিরিয়ে এনে ওষুধের ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিলং গিয়ে দাদা একজন গরিব প্রচারকের মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এল। তোর দাদামশাই গরিব প্রচারক, তা জানতিস? গলাবন্ধ কোট আর ধুতি পরে বেড়াতেন। ব্যাস বাবাও দাদাকে ত্যাজ্য পুত্র করে দিলেন। আচ্ছা, রুমা, বিলেতে দেখে এসেছি, এই আফটারনুন টি একটা চমৎকার আর্টিস্টিক ব্যাপার, একটা সামাজিক শিল্পের মতো! তুই এত গিলছিস কেন?''

রুমা বলল, 'কি করি পিসিমা? তোমার বাড়ি স্যান্ডউইচ এত বেশি আর্টিস্টিক যে দাঁতে কাটল কি না টের পাই না, বড্ড খিদে পায় যে। সেই দশটার আগে খেয়ে বেরিয়েছি।'

হেমন্তপিসি শক্ড। 'খিদে পায়? আমাদের সময় কোনো ভালোঘরের ইয়ং লেডি খিদে স্বীকার করত না। অবিশ্যি তোমাদের কথা আলাদা। আমাদের সময় কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে টিচার কিংবা দু-একজন লেডি-ডাক্তার ছাড়া কিছু হওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। এমএ, বিএ হয়ে একটা ল-অপিসে ঢুকে কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে যে চাকরি করতে পারে, এ আমি জানতাম না।'

রুমা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, 'বাসব বলে কোনো মেয়ে-টিচারের বিয়ে হয় না, কিন্তু সব লেডি-ডাক্তারের বিয়ে হয়ে যায়, তা তাদের যেরকম চেহারাই হোক না কেন। অবিশ্যি উকিল মেয়েদের-ও বোধ হয় বিয়ে হয় না, কর্নিলিয়া সোরাবাজি-কে দেখ না। কিন্তু দেদার টাকা কামায়। বাসব বলছিল আমার ডাক্তারি পড়া উচিত ছিল'।

হেমন্তপিসি বললেন, 'বাসব? তুমি অবিবাহিত মেয়ে হয়ে পুরুষ মানুষদের সঙ্গে বিয়ের গল্প কর নাকি? ছি ছি! কে এই বাসব?'

পিসিমা রুপোর চামচ দিয়ে নিজের চা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'পাশের বাড়ির ছেলে। বিলেত ফেরত। ডাক্তার। খুব নাম করছে।' হেমন্ত পিসির বেজায় কৌতূহল, 'তাহলে সুপাত্র বল। নাকি বিয়ে হয়ে গেছে? তোমাদের পাড়ার তো সবাই হিন্দু মেয়েদের তেরোয়, ছেলেদের একুশে বিয়ে হয়। ডিসগাস্টিং। কানুর নাতি বোধ হয়?'

বাসবের বিষয়ে পিসিমা কোনো সময়ই কোনো মন্তব্য করেন না। মুখ তুলে বেয়ারাকে বললেন, 'কিছু দরকার আছে' নকুড় বলল, 'দিদিমণিরা আজ রাতে এসে পড়বেন, কিন্তু আয়া সকাল থেকে আসেনি। তার শরীর খারাপ।'

আয়া আসেনি? কি সর্বনাশ। রেলের ধকলের পর বাড়ি পৌঁছে কিটি বেচারি যে আকুলপাথারে পড়বে। হেমন্তপিসি ব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন। পিসির ঘর গেরস্থালি দেখার তাঁর কাজ। একটু দূর সম্পর্কের বোন; বয়সে বছর দশেকের বড়; কুড়ি বছর বয়স থেকে শিক্ষকতা করেছেন, বিয়ে-থা হয়নি—বাসব বলে 'হবে না-ই তো। ডাক্তারি পড়লেই পারতেন, যেমনি চেহারা হোক না কেন, বর জুটে যেত।'—বছর দুই হল অবসর নিয়ে পিসির ঘরকন্নার ভার নিয়েছেন, পিসি সমাজ সেবা করেন, সেজেগুজে মিটিং-এ যান; এ বাড়িতেও মিটিং ডাকেন; টাকা তোলেন, লাট-সাহেবের মেমের সঙ্গে পর্যন্ত চা খান। হেমন্তপিসির সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেন।

হেমন্তপিসি উঠে গেলে রুমার দিকে চেয়ে পিসি বললেন, 'তোমার ঘরের কথা দাদা কি লিখেছে?'

'লিখেছেন পুরো একতলাটার জন্য তুমি যখন একশো টাকা ভাড়া দাও, আমি একখানা ঘর জুড়ে থাকলে আশির বেশি নেওয়া উচিত নয়। তোমার ক্ষতি করা ঠিক নয়।'

কাষ্ঠ হেসে পিসিমা বললেন, 'দাদার যেমন কথা কুড়ি টাকায় কি আমাকে বড়লোক করে দেবে? নাকি আমি আমার ভাইঝিকে তার নিজের বাড়ির একটা ঘর দিতে পারব না? এর পর কিটির বাবাও তাঁর ঘরের জন্য আমাকে বোধ হয় কুড়ি টাকা ভাড়া দেবেন।'

রুমা উঠে গিয়ে পিসিমার কাঁধের ওপর হাত রাখল। পিসিমা হাতটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাসবের সঙ্গে না তোদের মেলা-মেশা করা বারণ?' রুমা বলল, 'যাদের ২৩ বছর বয়স, তারা সাবালিকা, পিসিমা, কারো বারণ শোনে না। তাছাড়া বাসব তো মি. দে সরকারের বাড়িতে ডিনার খায়।'

পিসিমা রুমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, রুমা, কিটি কি বাসবকে ভালোবাসে।' রুমা হাসল। 'যেমনি আষ্টেপৃষ্ঠে ওকে বেঁধে রাখ তোমরা পিসিমা। কাউকে ভালোবাসার সুযোগ পাবে কোথায়? তোমাদের ওই গোষ্ঠীর বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মিশতেও দেবে না; ঠিক করা বিয়েকে সেকেলে হিন্দু প্যাটার্নের বলবে। তা তোমার অমন সুন্দরী মেয়ে প্রেমে পড়বে কার সঙ্গে? ওই যে-সব সম্বন্ধ আসে তার একটার সঙ্গে লাগিয়ে দাও না কেন? নিজে মেলামেশা করতে গিয়ে তো এমন দশা হল যে পিসেমশাই কাজকর্ম ছেড়ে শিমলে দৌড়লেন।'

'ও রাজি হয় না। নিশ্চয় বাসবকে ভালোবাসে। তাই ওকে ভুলবার আশায় ওই মদন বাঁদরটার সঙ্গে ভাব করল। বাসব থাকতে ওকে কেউ ভালোবাসতে পারে, তুই বল না? তুই বাসবের খোলা মোটরে কি বলে এলি? ওর পাশে বসেছিলি নিশ্চয়।'

রুমা খুব হাসল, 'কি বলব পিসিমা। আপিস থেকে বেরিয়ে দেখি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে, কি বলল জানো—ট্রামে ওঠবার সময় নাকি আমার পায়ের কবজি দেখা যায়; ও নিজে দেখেছে। এ রকম অসভ্যতা পাড়ার লোক হয়ে ও কি করে সহ্য করে, তাই নিতে এসেছে।'

'কি বেয়াদব ছেলে। ওর বাবা জানে।'

'জানলে বোধ হয় গঙ্গাস্নান করাতেন।'

'না। তাহলে ওকে বিলেতে পাঠাত না। সোমনাথের বাবা ওকে বিলেত পাঠায়নি, জাত যাবার ভয়ে। ভারী গোঁড়া ওরা। পিঁড়িতে খায়। মেয়েরা মাংস খায় না। এঁটো মানে। গায়ে একটা ভাত পড়লে কাপড় ছাড়ে। আরো কত—হ্যাঁ, আরেকটা কথা, রুমা। যাদের বাড়ির মেয়েরা আমাদের বাড়ির ছেলে, মেয়েদের সামনে বেরোয় না, তাদের বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের মেলামেশা করা উচিত নয়।'

রুমা না হেসে পারল না, 'নেই-ই কোনো ছেলে আমাদের বাড়িতে তা মিশবে কার সঙ্গে? এক যদি মেশোমশায়ের সঙ্গে—তা ওঁর আবার সময় কোথায়—এই শেষের প্যাস্ট্রিটা খেয়ে ফেলব? আমাদের আপিসের মিসেস গুডেনফ বলেন শেষেরটা খেলে বিয়ে হয় না। তা আমার তো বিয়ের বয়স চলেই গেছে, হেমন্তপিসির মতে। আমার কিন্তু এখনো বিয়ের শখ আছে, পিসিমা, এই বলে রাখলাম।'

অন্যমনস্কভাবে পিসিমা বললেন, 'সব কুসংস্কার। জানিস, সমাজের রেজিস্ট্রার বরদাবাবু সস্ত্রীক ব্রাহ্ম হলে পর ওঁর স্ত্রী বললেন, 'ছোটবেলা থেকে যা শিখে এসেছি সবই যদি কুসংস্কার হয়, তাহলে এগুলোও নিশ্চয় কুসংস্কাব।' এই বলে থান পরলেন, হাত খালি করলেন, কদম ছাঁট করে চুল কাটলেন—এই সব করে সত্যি প্রমাণ করে দিলেন ও সবই কুসংস্কার। এখন পর্যন্ত ওঁর স্বামী বহাল তবিয়তে আছেন।'

রুমা বলল, 'কিন্তু বিশ্রী দেখায়। পুরুষমানুষের মতো।'

'তা তুই-ই বা ওইসব বিশ্রী মোটা কাপড় পরা ধরেছিস কেন?'

রুমা তো অবাক। 'বিশ্রী কি বল, পিসিমা! এগুলো মাঝারি মিহি খদ্দর। চমৎকার দেখতে, তবে কাচতে প্রাণ বেরোয় আর শুকোতেও চায় না, টেকেও না বেশি দিন। কিন্তু হাতে সুতো কেটে ঘরে তাঁতে বোনা কি চমৎকার জিনিস বলো তো?'

এই সময় হেমন্তপিসি দুদ্দাড় করে ছুটে এসে, একটা চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর মুখের বিভ্রান্ত ভাব দেখে ব্যস্ত হয়ে রুমা উঠে পড়ল, 'কি হল, হেমন্তপিসি, আইস বক্স থেকে একটু ঠান্ডা জল এনে দেব?'

হেমন্তপিসি কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি এখান থেকে যাও দিকিনি। আয়া আসেনি, কিটির ঘরের জানলা-টানলা খুলে দাওগে যাও।'

বাধ্য মেয়ের মতো ২৩ বছরের রুমা ঘর থেকে চলে গেলে, হেমন্তপিসি হাউহাউ করে কেঁদে, দু হাতে মুখ ঢেকে বললেন, 'এত দেখে শুনে যাকে রাখলাম, টিনা, তার কিনা—তার কিনা—চরিত্র খারাপ।'

পিসিমা অবাক হলেন। 'চরিত্র খারাপ? চরিত্র অমনি খারাপ হলেই হল? গেছিলে ওর ঘরে?'

হেমন্তপিসি চোখ মুছে বললেন, 'যাবার দরকার হয়নি। বাইরে থেকেই দেখলাম ও শুয়ে আছে আর একজন পুরুষমানুষ—কি বলব তোমাকে!—একজন পুরুষমানুষ কাঁদছে আর ওর পায়ে হাত বুলোচ্ছে। আমি ও-সব জঘন্য ব্যাপারের মধ্যে নেই, টিনা, গরিব হতে পারি—কিন্তু আমার মা-বাবা—'

পিসিমা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন, 'কি বাজে বকছ, হেমন্তদি। তুমি ওকে আনলে

কোত্থেকে? এনেছে তো নকুড়, ওর চেনা-জানা কার যেন বোন না কি হয়, চল তো একবার বাসন ধোবার ঘরে—।'

রুমা কিটির ঘর ঝাড়-পোঁছ করছিল আর বাবার কথা ভাবছিল। বাবার জন্য রুমার বড্ড দুঃখ হত। বাবার বিষয়ে কেউ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বললে বড্ড কষ্ট হয়। পিসেমশাই এত ভালো, অথচ বাবার বিষয়ে উল্লেখ করলেই বলতেন 'দ্যাট ক্যারাক্টার'। বাবার ক্লিষ্ট ফরসা মুখটা মনে পড়ে। মা যা বলেন বাবা তাতেই রাজি। ভাগ্যিস গরিব প্রচারকের মেয়ে, বড়মানুষি কাকে বলে জানেন না। মাঘোৎসবের সময় দাদামশায়ের সঙ্গে দু-তিনবার এসে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের মন্দিরের পেছনে অন্য প্রচারকদের পরিবারের সঙ্গে 'শেলটার' বলে একটা জায়গায় থেকেছিলেন। কখনো থিয়েটার দেখেননি। কার্সিয়াং-এর বাড়িতে আসবার আগে চলচ্চিত্রও দেখেননি। এখনো উপভোগ করতে পারেন না। দেখতেও সুন্দরী নন, কিন্তু খুব ফরসা। তাঁদের মেয়ের রং কেন শ্যামলা হবে ভেবে রুমার ছোটবেলায় ভগবানের ওপর কি রাগ। রুমা দেখতে খারাপও না. ভালোও না। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ একেক দিন ওকে বড্ড সুন্দর মনে হত। অনেকে সেটা লক্ষ্যও করত।

দোতলায় কিটির শোবার ঘরের জানলা খুললেই নিচে বাড়ির পেছনের বাগান দেখা যেত। সেকালের যাদের অবস্থা একটু ভালো ছিল, তাদের বাড়িতে বাগান থাকত। দু-পাশে পিসিমার বড় শখের দু-সারি সুইট-পী গাছের ছড়া ছড়া ফুল ফুটেছিল; তার মিহি মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। নিচের খোলা বারান্দার রেলিং-এর থামের ওপর চিনে-মাটির গামলায় ফিকে হলুদের সঙ্গে গাঢ় বেগুনি রংয়ের প্যানজি ফুল, দেখে মনে হত ছোট ছোট সুন্দর মেয়ের মুখ। মধ্যিখানে ঘাস-জমি। তার পেছনে উঁচু মেহেন্দির বেড়া, তার পেছনে চাকর-বাকরদের গুদোম ঘর। তারি একটাতে আয়া থাকে। সেখানে যাবার পথটিও মেহেন্দি গাছ দিয়ে আড়াল করা। তবে এখান থেকে সবই দেখা যায়। আয়ার ঘরে তেলের বাতি জ্বলছিল।

কিটির ঘর গুছোতে গুছোতে রুমা ভাবছিল, মা এখন কি করছেন? যতক্ষণ না বাবা ডিস্পেনসারি ঘরের দরজায় তালা দিয়ে, বাড়ির ভিতরে না আসছেন, মাও ততক্ষণ কাচে মোড়া বারান্দায় বেতের ঝুড়ির মতো চেয়ারে, তুলোর কুশনে ঠেস দিয়ে, নিশ্চয় বুড়ি মিসেস পিন্টোর সঙ্গে বসে ক্রুশের লেশ বুনছেন আর গোটা কার্সিয়াং-এর হাঁড়ির খবর নিচ্ছেন। একবারো কেউ সন্ধের আলো লাগা বরফের পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছেন না।

একটা ক্লাব ছিল ওখানে। সেখানে সন্ধেবেলায় বুড়ো-বুড়িরা তাস খেলত। ফিরিঙ্গিরা আর কিছু কিছু সাহেব-ভাবাপন্ন দিশি ছেলেমেয়েরা নাচগান করত। রুমার মতে নির্দোষ আমোদ-আহ্লাদ হত; খুব ভালো খাবার-দাবার পাওয়া যেত। পাহাড়ি ঝি-চাকররা উলটো দিকের পাহাড়ের গায়ে সারি সারি বসে মজা দেখত। কিন্তু মা-বাবা কখনো যেতেন না। মা বলতেন পয়সা দিয়ে তাস খেললে সেটাকে জুয়াখেলা বলে। আর নাচ মানেই তেষ্টা, তেষ্টা মানেই বোতল থেকে তেষ্টা মেটানো। তার থেকে ঢলাঢলি হতে কতক্ষণ? নভেল পড়তেন না মা; বিশ্রী সব প্রেমের গল্প।

তাহলে করবেনটা কি? হেঁটে বেড়াতে পারেন না; কুড়ি বছর আগে একবার পড়ে গিয়ে পায়ের সরু একটা হাড় সরে গিয়েছিল, এখনো হাঁটলে ব্যথা করে। কোনো দিনই হেঁটে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা করত না; বাবাই জোর করে সঙ্গে নিয়ে হাঁটাতেন। তার ফলে চিরদিনের

মতো পা-টা পঙ্গু হয়ে গেল। বেড়াবেন কি করে? যেমন কপাল করে এসেছিলেন, রিকশ রাখার খরচ কুলোয় না।

মিসেস পিন্টো আলোর দিকে ফিরে ক্রুশের টেবল স্টিচের ফাঁশ টেনে হয়ত বললেন, 'সত্যি বড্ড এক্সপেনসিভ, ডিয়ার, ডক্টর রয় পারবেন কেন? আমরা তো পাহাড়ে এসে ইস্তক রিকশ চড়িনি।' শুনে মা-র নিশ্চয় একটু রাগ হল। কিসে আর কিসে। বুড়ো পিন্টোর গরম মোজা-গেঞ্জির ব্যবসা। দোকানদার। তার সঙ্গে অর্ণব রায়ের ছেলের তুলনা।

রুমার মনে পড়ল ওই পাহাড়েরই গায়ে ধাপে ধাপে ফুল-ফলের বাগান করেছিল মিসেস পিন্টোর ছেলের বৌ আর ক্রিশ্চান বুড়ি মিসেস বান্ট। তারা জ্যাম, জেলি, চাটনি করে, বাহারে বোতলে ভরে, লোক পাঠিয়ে বাড়ি বাড়ি বেচত। মা বলতেন, 'দোকানদারি, আমার আসে না। কি করব, এসব তো আর শিখিনি। অথচ তোর ঠাকুরদার ওই এক ছেলে!' 'ত্যাজ্য পুত্র, মা, ছেলে নয়।' 'দিতে চেয়েছিল তোর পিসিমা অর্ধেক টাকা। নিলেন না। আত্মসম্মানে বাধল। স্ত্রী খুঁড়িয়ে চললে কিন্তু বাধে না।' এত কথা রুমা আগে জানত না। আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, 'তাহলে বাড়িটার অর্ধেক বাবা নিলেন কেন?' কাষ্ঠ হেসে মা বললেন, 'বাড়ির অর্ধেক তো উইল করে তোর ঠাকুমা তোকে দিয়ে গেছেন। বাবা না বলবার কে?' সেই অর্ধেকটা পিসেমশাই ১০০ টাকায় ভাড়া নিয়েছেন। রুমা আবার তার একটুখানি বলা যেতে পারে ২০ টাকায় ভাড়া নিয়েছে। ভাবলেও রুমার হাসি পেত। নিজেই নিজের সাবটেন্যান্ট। কিন্তু হাসবে কার সঙ্গে, এ-বাড়িতে ডিনার পার্টির সময় কেউ মজার কথা বললে সবাই হাসে, অন্য সময় হাসে না। পিসেমশায়ের শার্টের উঁচু শক্ত কলারে যখন কানে সুড়সুড়ি লেগেছিল বলে রেগে গেছিলেন, তখনো কেউ হাসেনি। বাসব বলে ব্রাহ্মদের হাসতে নেই। রাগে গা জ্বলে যায়।

কেশবদের বাড়িতে এসব কথা হয়। সেখানেই তিনপুরুষ ধরে সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ। এক সময় কেশবের ঠাকুরদার মারফত অর্ণব আর কানু তর্কাতর্কি করতেন; নিজেদের মধ্যে তো কথা বন্ধ। পিসিমার কাছে শোনা, একবার নাকি কানু দশ-সেরি এক কাতলা ধরে, অর্ণবের ভাগটা কেশবের ঠাকুরমার কাছে দিয়ে এসেছিলেন, পাঠিয়ে দেবার জন্য। তিনিও মাছটা রেঁধেটেধে নিজে এসে অর্ণবের স্ত্রীর কাছে দিয়ে গেছিলেন। কে ধরেছে কার মাছ পরে বলেছিলেন। কানু মলে অর্ণব পেট-ব্যথা হয়েছে বলে সারাদিন নিজের পড়ার ঘরের কৌচে শুয়েছিলেন। দরজায় ছিটকিনি দিয়ে। এসব হাসির কথা না কি কান্নার কথা রুমা ভেবে পেত না।

কিটির আলমারি লন্ডভন্ড। যাবার সময় এখান থেকে ওখান থেকে জিনিস টেনে কুমিরের চামড়ার স্যুটকেসে ভরেছিল। কেমন রাগ রাগ ভাব। রাগ, না অনুরাগ রুমা বুঝতে পারত না। দুটোর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য মনে হত। ভালোবাসা। ভালোবাসাই হল দুনিয়ার যত নষ্টের গোড়া। এই তো রুমা বেশ আছে। ভালোবাসাটাসাকে ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় না। আর কে-ই বা কালো মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসায় পড়বে। বেশ আছে রুমা। বাবাকে দেখতে হয়। ভালোবাসার জন্যে আর মেয়ে পেলেন না; কি? না, বাসবের বড় পিসিকে পছন্দ। তাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবেন না! সবাই হাঁ। ফরসা একটা মুখ্যু মেয়ে। অবনী তার জানেই বা কি, আর দেখেছেই বা কতটুকু? দু-বাড়িতে তো কোনো সম্বন্ধ ছিল না।

ছোট্ট একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল রুমার ঠোঁটের কোণে। শূন্য ঘরে রুমা সুন্দরী হয়ে উঠল। কেউ দেখতে পেল না। দেখাশুনো হয় বই কি। কেশবের ঠাকুরদার বাড়িতে। যেমন

বংশপরম্পরায় দু-বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা দেখা-শুনো করে এসেছে। এবং এখনো করে। ঠাকুরদারা সবাই গত হয়েছেন তবু নিয়মগুলো চলেছে। মহা মুখফোঁড় ওই কেশবটি। বেজায় ফূর্তিবাজ। নিজের বাবার মুখের ওপর হক কথা বলে দেয়, কাউকে ভয় পায় না। হাসে আর বলে। সবাই ওকে ভালোবাসে। যেখানে বিপদ-আপদ সেখানেই কেশব। রুমার চেয়েও একটু ছোট। কিটির সমান। এক সময় আমগাছের ডাল বেয়ে এ-বাড়িতে এসে, ওদের সঙ্গে কম মারপিট করেনি। অথচ সদর দরজা দিয়ে যাওয়া-আসা করতে ওর কোনো বাধা ছিল না। সে দিক দিয়েও আসত। ভালোমানুষ সেজে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। আবার চোখাচোখি হলেই চোখ মটকাত। ভীষণ চালাক। পড়ায় বেজায় ভালো। বছর দুই আর আসেটাসে না। বিলেত পাঠাবার টাকা নেই বাপের, তবে এবার দিল্লি থেকে ছেলেরা আই. সি. এস-এর জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে। বোধহয় সেখানেই গেছে কেশব, অনেকদিন তো দেখা নেই। ও থাকলে পাড়াটা দিব্যি সরগরম হয়ে ওঠে।

বাবাও নাকি আগে ওই রকম ছিলেন। চালাক ফুর্তিবাজ। বাসবের বড় পিসির সঙ্গে বিয়ে হল না। তারপর থেকেই অন্য রকম হয়ে গেলেন। খুব ফূর্তিবাজ ছিলেন। নিন্দুকরা বলত বড্ড বেশি ফুর্তিবাজ। আর এখন দেখতে হয়। ক্লাবে যান না, কেন না ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েগুলো ফুর্তি করে। ফুর্তি কি খারাপ জিনিস? কেশবেরো ফুর্তি এদানীং কমে গেছিল। এই কথা মনে আসবামাত্র কিটির একটা রেশমি কাপড়ে টান দিতেই ঠক. করে একটা জিনিস মাটিতে পড়ল। সিল্কের কাপড় জড়ানো রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো কেশবের একটো ছোট্ট ফোটো।

তার কোণায় লেখা 'তোমার কেশব'। অমনি কিটি রহস্যের সব পরিষ্কার হয়ে গেল। 'তোমার কেশব'। ফোটোটি আবার জড়িয়ে তুলে রাখল রুমা। মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল।

কেশব কিন্তু রূপবান ছিল না, কিন্তু তবু বড্ড ভালো দেখতে। তার মানে দেখতে ভালো লাগত। কিটি কিন্তু ভারি সুন্দরী। ছোটবেলা থেকে সব্বাই ওকে ভালোবাসত। এখনো বাসে। বাসব বলত, 'কিটি হল সুন্দরী আর রুমা হল ছু ছুন্দরী!' ওকে বলত, 'এই তুই কিটির পাশে দাঁড়াস না, তাহলে তোকে বাঁদরের মতো দেখায়। বাঁদরের মতো স্বভাব সে তো সবাই জানে, আবার দেখাবার কি দরকার?' বলা বাহুল্য রুমা তখন ওকে ভেংচি কেটে, খিমচে আঁচড়ে একাকার করে দিত। আর কিটি বড় বড় চোখ করে বলত, 'ছি, রুমাদি, ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েরা সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।' কেশব হি-হি করে হেসে বলত, 'বাঁদরের আবার কদ্দুর হবে?'

এই বাড়ির ছাদে আমগাছের ডাল বেয়ে উঠে আসত ওরা। সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেত। কালীপুজোর রাতে এরা ছাদে উঠে ফুলঝুরি জ্বালাত। কেশবটা হাসত আর বলত 'তবে না ব্রাহ্মরা হিন্দুদের পুজোয় যোগ দেয় না? এই তো এরা দিব্যি ফুলঝুরি পোড়াচ্ছে। ফুলঝুরি আর পৌত্তলিকতায় তফাতটা কি হল শুনি?' মহা পাজি ছিল কেশবটা।

আমগাছটা গত বছর পড়ে গেছে। আজকাল কেউ যাওয়া-আসাও করত না। তবু দুঃখ হত। এই বাড়িতেই রুমার ছোটবেলার অনেকখানি কেটেছিল। ঠাকুরদা মারা যাবার পর, ওই কেশবের বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুমা কার্সিয়াং গিয়ে রুমাকে ফিরিঙ্গি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। পিসেমশাইরা তখন রেঙ্গুনে ছিলেন। এসেও পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। কিটিকে লোরেটোতে দিলেন। রুমা গেল নতুন প্রতিষ্ঠিত গোখেল মেমোরিয়ালে। সে কি আজকের কথা।

কি সুন্দর কিটির এই ঘরটি। এটা নাকি বাবার ঘর ছিল, পিসিমা বলেছেন। এই রকম সুন্দর করেই সাজানো ছিল, শীতের শেষে বসন্তের বাতাসে এই রকম নিমফুল উড়ে এসে ঘর ভরে

রাখত। এমন ঘরে মানুষ হয়ে বাবা কি করে কার্সিয়াং-এর ওই ঘুপসি বাড়িতে সুখী হয়? সুখী কি? হয়তো সুখী নন, সন্তুষ্ট। ভালোবাসলে কেউ কখনো সুখী হয়? বাবা সুখী হতেই পারেন না। শীতের ভয়ে মা জানলা খুলতে দেন না। শীত নাকি ঘরে ঢুকে বাসা বাঁধে। দিনে গোলাপি লেসের পরদা, রাতে সবুজ কম্বলের পরদা। কাঠের মেঝের ওপর নারকেল ছোবড়ার ম্যাটিং পাতা। তার থেকে গুমো-গুমো গন্ধ বেরোয়।

রবিবার সকালে বাবা মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করেন। মা ক্ষীণ সুরে ব্রহ্মসঙ্গীত থেকে গান করেন। জনা পাঁচেক লোক উপাসনা শুনতে আসেন। তাঁরা কেউ নাকি ব্রাহ্ম নন। রবিবার বাড়িতে নিরামিষ খেতেন। মজা করে বানিয়ে গল্প বললেও মা রাগ করেন। মাকে তাঁর পাওনা ভালোবাসা দিতে পারেন নি বলে, মা যা বলেন বাবা তাতেই রাজি হন।

নিজের চিন্তায় নিজেরি হাসি পায়। পাওনা ভালোবাসা আবার কি? ভালোবাসা কারো পাওনা নাকি? বহু ভাগ্য করে এলে না চাইতেই পাওয়া যায়। যায়-ও না। এই দু-বাড়ির ছেলে-মেয়েরা বংশ-পরম্পরায় এ-ওকে ভালোবেসে এসেছে। তাতে কে কি পেয়েছে? অন্যকে বিয়ে করে জীবন কাটিয়েছে। হয়তো সুখেই কাটিয়েছে। ছেলে-মেয়ে ঘর-সংসার নিয়ে দিব্যি দিন কাটিয়েছেন। ভালোবাসা পায়নি বলে কিচ্ছু এসে যায়নি। খালি বাবার মনের ফুর্তি চলে গেছে। পিসিমার বিরস-বদন। কিটির রোজ জ্বর আসে, খিদে হয় না, স্বভাব উড়নচণ্ডী হয়ে ওঠে।

আর রুমা? দুম করে আলমারির দরজা বন্ধ করে রুমা ভাবে রুমা মা-বাবার অভাবের সংসারে ১০০ টাকা পাঠায়। ও-বাড়ির কার মনে কি হয়, রুমার জানবার কথা নয়। ছোট্টো একটা ফোটোয় লেখা 'তোমার কেশব'। রেশমি কাপড়ে জড়ানো ছোট্টো একটা ছবি। যার ছবি, সে ছেলে কেবলি ব্রাহ্মদের টিটকিরি দেয়। দুগ্গো পুজোয় পিসিমা চাঁদা দিতেন না। কোনো পুজোতেই দিতেন না। অর্ণবের সময় থেকে এরা সবাই জানে পৌত্তলিকতা খুব খারাপ। পুতুল-পুজো করলে ইয়ে—ঠিক কি হয় তা না-জানলেও খুব খারাপ তাতে সন্দেহ নেই। বড্ড ঢাক-ঢোল পেটায়। পড়ার ক্ষতি করে। ঘুমোতে দেয় না। ঢাক ঢোল থেমে গেলেও চোখে ঘুম আসে না। এই তো পাঁচ বছর আগেও কেশব বলেছিল, আশুবাবুর পাঁঠাবলির মাংস খাওয়া খুব অন্যায় বুঝি? ভগবানের নামে প্রাণী হত্যা। আর নকুড় যে শেখের দোকান থেকে মাংস আনল, সে তো হালাস করা মাংস। ঝপ করে বলি দেওয়ার চেয়ে বুঝি গলার খানিকটা কেটে ছেড়ে দেওয়া ভালো? কেমন ছটফট করে মরে বল? কিটি-রুমা কানে হাত চাপা দিয়ে পালিয়েছিল। বাড়িতেও কিছু বলতে পারেনি। কি জানি পিসিমা যদি বলে বসেন 'ও বাড়িতে যেয়ো না।'

সুখ? প্রেমের সঙ্গে সুখের কি সম্পর্ক? পিসিমা বলেন, 'কিটির একটা ভালো বিয়ে হয়ে গেলেই আমি সুখী হই।' মা বলেন, 'মাসে আমার হাতে নগদ পাঁচশোটা টাকা এলেই আমি সুখী হই। আর কিছু চাই না।' আর ওঁদের চাইবার কি আছে? কিটির একটা ভালো ছেলে হলেই হল। অর্থাৎ ফ্যাশানেবল ও সচ্চরিত্র। ব্রাহ্ম মতে বিয়ে করলে, হিন্দু হলেও ক্ষতি নেই। খুব বড়লোক হবারো দরকার নেই। কিটি তার মা-বাপের সর্বস্ব পাবে। অমন ছেলে পাওয়াও যায় হয়তো। তা কিটি কিছুতেই রাজি হয় না। এই হল মুশকিল।

পিসিমাদের বাড়িতে যাঁরা ডিনার খেতেন তাঁদের অর্ধেক হিন্দু। মুরগিও খেতেন। বাসব পর্যন্ত বিলেত থেকে ফিরে, পিসেমশায়ের কোন বন্ধুর স্ত্রীর চিকিৎসা করে অবধি ডিনারে নেমন্তন্ন পেয়েছে। কিন্তু আসেনি। নাকি বড্ড কাজ। তাই না আরো কিছু। ওই সব ফ্যাশনেবল অতিথিরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলতেন। মহিলারাও। অনেকেই পিসিমার মতো

স্বামীদের সঙ্গে বিলেত ঘুরে এসেছেন। কিটিও এসেছে। যারা ভয়ংকর বেপরোয়া, তারা গালে একটু রুজ, ঠোঁটে একটু গোলাপি রং লাগায়। আধ-বুড়িরাও। তাতে কিছু চরিত্র খারাপ হয়ে যায় না। ভুরুতে পেনসিল দাগ টানে।

পিসিমা শুধু গোলাপি ফেস পাউডার মাখতেন। কিন্তু কিটি যদি তার বন্ধুরা যা করে তাই না করে, তারা তো ওকে টিটকিরি দেবে। বলবে ডাওডি। রুমা শুধু মুখে একটু পাউডার ঘষে। তাও গায়ে মাখবার ট্যালকাম পাউডার। নইলে নাকটা বিশ্রী রকম চকচকে করে। রুমার কথা বাদ দেওয়া যাক।

এব মধ্যে কিটির এক বন্ধু জুটেছিল। মদন মল্লিক। কি চমৎকার দেখতে। কি ভালো ঘোড়া হাঁকায়। পোলো খেলে। বাপের মস্ত ব্যবসা। বিলেত ফেরত। হিন্দু। তাতে আর কি। পিসেমশাইও তো হিন্দু ছিলেন। গোঁড়া হিন্দু। এখন দেখতে হয়। সবাই বলতে লাগল মাণিক-জোড়। তা ওই মদন এই শেষবার বিলেত গিয়ে, মেম বিয়ে করে, ব্যবসার লন্ডন আপিসের ভার নিয়ে থেকে গেল।

সবাই বলতে লাগল, ওই দেখ কিটি রোগা হয়ে গেছে, ভালো করে খায়-দায় না, চোখ অস্বাভাবিক চকচকে, খালি পার্টি, পিকনিক, বাপের গাড়ি না পেলে বন্ধুদের গাড়ি, এক দিন অজ্ঞান হয়ে গেল। ডাকো বাসবকে। বাসবের বাবা সোমনাথ বললেন, যাও শিগগির। টিনির মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। বাসব কালো ব্যাগ নিয়ে এসে ওষুধপত্র দিল, জ্ঞান হল। পিসিমাকে আশ্বাস দিয়ে বাসব বলল, 'ও কিছু না। স্রেফ বাড়াবাড়ির ফল। খায় না, বিশ্রাম করে না। ছোটোবেলায় কি লক্ষ্মী মেয়েই না ছিল। যত দুষ্টু ওই রুমা। কিটিকে শিমলা নিয়ে যান পিসেমশাই, এখন তো সিজন। আপনারো একটা চেঞ্জ দরকার—।'

তাই গেল ওরা। বাড়ি অন্ধকার। আজ ওদের ফেরার কথা। কোথায় যেন এক রাত থাকবে। আজ রাতে পৌঁছোবে। এখন আয়া নিয়ে এই হ্যাপা।

সোমনাথ কাকা বাবার সঙ্গে পড়তেন। বেজায় ভাব ছিল। তখন দুই বাড়িতে মুখ-দেখাদেখি ছিল না। তবে আম-গেছো পথটি ছিল। সোমনাথের বড় মেয়ে শান্তিলতা মহা দুরন্ত ছিল। ফরসা ধবধবে, খ্যাঁদা-বোঁচা, এই বড় বড় চোখ, দিন-রাত হাসত আর গড়-গড় করে গাছের ডাল বেয়ে এ-বাড়িতে চলে আসত। তার যখন ষোলো বছর বয়স, তখন তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কানু চৌধুরী বিয়ে দিয়ে দিলেন। খবর পেয়েই বাবা বাড়ি থেকে পালিয়ে পাটনায় আংকল জাম্বোর বাড়িতে চলে গেছিলেন। তাঁরা খ্রিস্টান। কেশব বলে, 'খ্রিস্টানে মুসলমানে, ব্রাহ্মে তফাতটা কি শুনি? যার উপাসনা করে তাকে দেখতে পায় না পর্যন্ত। বিরক্ত হয়ে সে উঠে গেল কি না তাও টের পায় না।'

যা তা বলে কেশব। নাকি রামমোহন রায়ের এক বংশধর নেশাটেশা করত। তাকে কেউ বলেছিল, 'ছিঃ লজ্জা করে না? রামমোহনের বংশধর হয়ে নেশা করো?' সে নাকি হেসে বলেছিল, 'আমার ঠাকুরদা তেত্রিশ কোটি দেবতা কেটে এক ব্যাটাকে রেখেছিল, আমি তাকেও বিদেয় করে দিয়েছি।' কিটি রুমার হাত ধরে টেনে বাড়ি চলে এসেছিল। ভারী অসভ্য ওই কেশব। 'তোমার কেশব।' রুমার গলার কাছটা ব্যথা করে।

ততক্ষণে ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। কিটির ঘর সাফ-সুফ হয়ে গেছে। পরান ধোপা দরজার বাইরে থেকে ডেকে বলে, 'মাসিমা তো কাপড়টা নিচ্ছেন না। এদিকে ভাটি চড়িয়েছি, বসতে-ও পাচ্ছি না।' পরানের বাড়ি পাশের গলিতে। মধ্যিখানের উপবনের এক ধারে সে কাপড়

শুকোয়। তারা তিন পুরুষ ধরে এ-পাড়ায় তিন পুরুষের কাপড় কেচেছে, কোনো বাড়ির কোনো গোপন কথা তার অজানা নেই।

রুমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'কি হয়েছেটা কি? অন্য কাপড়ের সঙ্গে ওটা দাওনি কেন।' 'ওমা! দেব না কেন। নেয়নি।' 'নেননি কেন?' ওনার ইচ্ছে। কোল-আঁচলে সিকি পরিমাণ হলুদ লেগেছিল। দেখাও যাচ্ছিল না। তা বলেন কি না 'চার নম্বরের গায়ে-হলুদ যাবার জন্য এ কাপড় তুই ভাড়া দিয়েছিলি। ও আমি নেব না।' বলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তা আবার ধোয়া-পাকলা করে এনেছি। এখন কাঁদা-কাটা লেগেছে, ডাকছি, শুনছে না। সোমনাথবাবু বললেন, 'দিদিকে দে না যা।'

রুমা অন্যমনস্কভাবে কাপড়টা নিয়ে বলল, 'কাঁদাকাটি কিসের পরান?' পরানের মুখ হাঁড়ি হল। 'কি জানি, আমাদের তাতে কি দরকার। ওই আয়ার কি হয়েছে। তুমি আবার ওদিকে ছুটো না।' যা দুরন্ত স্বভাব তোমার, একবার আমার নীলের গামলায় পড়েছিলে না।' এই বলে পরান দুদ্দুড় করে নেমে গেল। রুমা বর্তমানে ফিরে এল। আয়াকে নিয়ে কাঁদাকাটি কিসের ভেবে পেল না রুমা। বড্ড রান্নার শখ ছিল রুমার, সেলাইয়ের শখ ছিল। যাকে পেত তাকে ধরে কত রকম যে শিখে নিয়েছিল তার ঠিক নেই। এ-বাড়িতে তার কিছুই কাজে লাগত না। মাইনে করা সাহেব-বাড়ির দরজি ছিল। রান্নাঘরে বেয়ারা বাবুর্চির সঙ্গে মেলা-মেশা পিসিমা পছন্দ করতেন না। তা হলে নাকি ওরা খাতির করে না। কে জানে। বেয়ারার নাম যে নকুড়, সে তো রুমার আবিষ্কার। আয়ার নাম ফুলমণি। সবাই ডাকে বেয়ারা, আয়া। জনকে বলে বোর্চি। সাহেবরা বাবুর্চি বলতে পারে না, তাই বলে বোর্চি। কিন্তু মেডিটারেনিয়ন সি বলতে পারে, এমন্নি অদ্ভুত। রুমা পাঁচজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটু একটু রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, কিন্তু পিয়ানো বাজাতে শেখেনি। অত দাম দিয়ে কে পিয়ানো কিনবে যে অভ্যাস করবে? বর্মায় কিটির জন্য পিয়ানো কেনা হয়েছিল। সেই এক অভ্যাস হল। এখানে এসে মেয়ের কি কান্নাকাটি। শেষটা এখানেও একটা কেনা হল। কিটি তাতে মাঝে মাঝে টুং-টাং ঢং-ঢং করে। নিচের তলায় নিজের ঘরে বসে রুমা আপিসের কাগজপত্র দেখতে দেখতে শুনতে পায়। ভালোই লাগে। কিটি কারো সঙ্গে ঝগড়াও করে না, নিজের গোঁ-ও ছাড়ে না। বড্ড ভালো কিটি। রুমা রেগে-মেগে মনের কথা সব ঝেড়ে ফেলে, অন্য লোককে খুশি করবার জন্য কি না করে? যার যেমন স্বভাব। কিটিকে বড্ড ভালোবাসে রুমা। নাঃ, নিচে বড্ড গোলমাল হচ্ছে। এ-বাড়িতে কেউ গলা তুলে কথা কয় না। আজ আবার হল কি?

ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখে রুমা। মানুষ কেমন নিজের পরিবেশে নিজের ছায়া রেখে যায়। ঘরময় বসন্তের নিমফুলের স্মৃতির সঙ্গে আরো গভীর এক সুগন্ধ। সে কি কিটির বিলিতি সাবান, এসেন্সের? নাকি ওর অঙ্গ-সৌরভ? ওর সব সুন্দর। ওকে নতুন চোখে দেখল রুমা। কিন্তু বাসব? ছোটবেলায় বাসব, ইন্দু, রতন, সতু, নীলু, সবাই কিটিকে ভালোবাসত। ও পড়ে গেলে সবার কি উদ্বেগ। ও কাঁদলে সবাই উদ্‌ভ্রান্ত। ওকে খুশি করতে সবাই তৎপর। বাসব ছিল সবার বড়; নিজেকে সকলের নেতা মনে করত; কিন্তু কিটির কথার ওপর একটি কথা বলত না। হাত-পাগুলো পদ্মফুলের মতো। একবার ফ্যাশান করে এই বড় বড় নখ রেখেছিল। তাতে পালিশ লাগাত। তারপর এক কাণ্ড। ওদের স্কুলের পিয়ানো টিচার একদিন রেগেমেগে বললেন, 'পিয়ানোর ওপর আঁচড়-কাটা বের কচ্ছি!' বলে এই বড় এই কাঁচি দিয়ে সব নখগুলো মুড়িয়ে কেটে দিলেন। বিকেলে সে কথা শুনে ঠাকুমা থেকে ছোকরা মশালচি পর্যন্ত—মশালচি

হল বোর্চির অ্যাসিস্টেন্ট—সবাই হেসে লুটোপাটি। কিটি প্রথমে রাগে দুঃখে ফোঁশ-ফোঁশ করছিল, তার পর হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলেছিল। সুন্দর কিটি। কিন্তু, কেশবের কি হবে তাহলে? ফুর্তিবাজ কেশব-ও কি বাবার মতো হয়ে যাবে? আর মজার কথা বলবে না? কি হবে? এ দুটো বাড়ি হল ব্যর্থ প্রেমের বাড়ি। কেশব-ও বাসবদের নিকট আত্মীয়। এত ভালো-ও লাগে এই দু-বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পরস্পরকে। একে অপরকে না হলে চলে না। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অন্য জায়গায় বিয়ে হয়। আলাদা সংসার হয়। সেই পুরনো প্রেমের অংকুর নিয়ে আরেক পুরুষ জন্ম নেয়, বড় হয়।

কিন্তু, ঠিক এই সময় সমস্ত বাড়িটা হঠাৎ থমথমে চুপচাপ হয়ে গেল কেন? তার পরেই নীরবতা ভেঙে ঝাঁঝালো কর্কশ সব গলার স্বর শোনা গেল। রুমা কিটির ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সিঁড়ির নিচে হলঘর, তার ডানদিকে বসবার ঘর, বাঁ দিকে খাবার ঘর। তারপর প্যান্ট্রি, সেখানে তৈরি খাবার-দাবার, বাসনপত্র থাকে। তার পেছনে স্কালারি, সেখানে বাসন ধোয়া হয়, চাকররা গল্প করে, তারপর আলাদা করে রান্নাঘর অর্থাৎ বোর্চিখানা। যাতে উনুনের ধোঁয়া ঘরে না আসে।

প্যান্ট্রিতে নিরপেক্ষ জায়গায় দাঁড়িয়ে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেমন্তপিসি বলছিলেন, 'সবাই যদি একজোট হয়ে এভাবে মুনিবকে ঠকাও, তাহলে আমার বলার কিছু থাকে না। সবাইকে এক মাসের নোটিস দিলাম। অন্য কাজ দ্যাখো।'

জং পঁচিশ বছর ওদের রান্না করেছে, সেই বর্মা থেকে, সে সহজে মুখ খুলতে জানে না। বাংলা জানে কি না তা-ও বোঝা যেত না। আজ হঠাৎ উদ্ধত স্বরে বলল, 'আমরা যাব কেন? আমরা গেলে সবার কষ্ট হবে।' হেমন্তপিসি চেঁচিয়ে বললেন, 'সেজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না! সব মুসলমান কিম্বা ক্রিশ্চান চাকর রাখব। তোমাদের চেয়ে ঢের ভালো তারা, এত জোচ্চুরি করবে না?'

জং বেপরোয়াভাবে বলল,—'যা মুখে আসে বলবেন না, মাসিমা। মেম-সাহেব জানেন আমরা কেমন লোক। বোনঝিটাকে কোথায় ফেলে দেব? ছোট বোনটাও মরে বেঁচেছে। মেয়েটা জাত ভেঙে বিয়ে ক'ল। কারো মানা শুনল না; জামাইয়ের চাকরি গেল। কেউ একটু দাঁড়াবার জায়গা দিল না। আমি একা মানুষ, বাসায় থাকি। মাসিমা বললেন আয়ার কাজ জানা চাই, পেছন পেছন ব্যাটা ছেলে ঘুরবে না, ত তাকে স্বামী বলো, ভাই বলো, বন্ধু বলো, যা-খুশি বলো ঘর পাবে, শুকনো রসদ পাবে, বিশ টাকা মাইনে পাবে। জামাইটাকে বললাম তুমি এদিকে এসো না, পল্টনে নাম লেখাও। তা শুনল কই।'

পিসিমা হঠাৎ রেগে গেলেন, 'দূর করে দাও বাড়ি থেকে। অসভ্যতা করার জায়গা পেল না।'

তখন নরম-সরম নকুড় পর্যন্ত বদলে গেল; 'বলুন মেম-সাহেব, এ বাড়িতে ছেলে হলে, ওকে রাখতেন আপনি? তাই ওষুধ খেয়েছিল। এখন প্রাণ যায়।'

চোখের কোণা দিয়ে রুমা দেখতে পেল, চাকরদের খিড়কি-দোর দিয়ে ঢুকে কারা যেন ঝোপের পেছনে পথ দিয়ে গুদামের দিকে যাচ্ছে, আসছে। একটু পরই রান্নাঘরে পেছনের দরজা থেকে বাসব ডাকল, 'তুমি একটু এসো, রুমা। সাহায্য করার কেউ নেই।' রুমা অমনি রওনা। পিসিমা, হেমন্তপিসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যেয়ো না বলছি, রুমা। মানা করছি। বাসব কি পাগল হল?'

রুমার কানে কথা গেল না, সে গুদোম-ঘরে গিয়ে ঢুকল।

এর পরের দেড় ঘণ্টার কথা ভাবা যায় না। বিজলিবাতি ছিল না গুদোমে। রুমা অবাক

[illegible] ঘরে, সোমনাথ [illegible] পাড়ের বাড়ি।

এসে ঘরে ঢুকলেন। বাসব তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে পড়ল। এমন সময় পিসিমা, হেমন্তপিসিমা কিসব কাপড়-চোপড় নিয়ে এসে উপস্থিত। হোঁতকা লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক করে। পিসিমা বিরক্ত হয়ে তাকে বললেন, 'তুমি এখানে কি করছ, বাপু? এ কি ব্যাটাছেলের জায়গা। যাও রান্নাঘরে, নকুড় চা দেবে।' লোকটা ছুটে পালাল।

পাঁচ মাসের ছেলে বাঁচে না। ফুলমণির ছেলেও বাঁচল না। কিন্তু ফুলমণি যমের দুয়োর থেকে ফিরে এল বাসব তাকে টেনে নিয়ে এল। আরো অনেক পরে, রুমা তার নিজের বিছানা থেকে পরিষ্কার চাদর এনে দিল। নিজের পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরিয়ে দিল। ততক্ষণে বাসব রুমার স্নানের ঘর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে একতলার পেছনের বারান্দায় দাঁড়াল। সোমনাথের নতুন দারোয়ান হল জং-এর দেশ-ভাই। তার বৌ এসে ফুলমণির ভার নিল। ঘরদোর সাফ হল। ফুলমণি কান্না থামিয়ে ঘুমোল। রুমা ছুটি পেল।

পেছনের বারান্দার চার ধাপ সিঁড়ি বেয়ে, ওপরে উঠেই বাসবের সঙ্গে মুখোমুখি। নীল নবঘন মেঘের মতো শ্যামসুন্দর বাসব। রুমার চোখে কালি, রুক্ষচুল, শুকনো মুখ, চকচকে নাক, ময়লা কাপড়-চোপড়। এর আগে সে কখনো পাঁচ মাসের মরা ছেলে দেখেনি। বাসব ওকে দেখে ভাবল এত খারাপ ওকে কখনো দেখায়নি। প্রবল স্নেহের জোয়ারে গলাটা বুজে এল। বুক টিপ-টিপ করতে লাগল। তিন পুরুষের গোপন ব্যথা দু ফোঁটা চোখের জল হয়ে রুমার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল, বাসব তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ঠিক সেই সময় বারান্দার উজ্জ্বল বিজলি বাতিটা জ্বলে উঠল। বাসব সঙ্গে সঙ্গে রুমাকে ছেড়ে দিয়ে, তার আঁচলেব কোণাটি ধরে রাখল। যাতে পালাতে না পারে। গোলাপি ডুরে শাড়ি পরে, ভোমরার মতো কালো কোঁকড়া চুল কাঁধ অবধি ঝুলিয়ে, কিটি খিলখিল করে হেসে বলল, 'ড্যাডি! কাণ্ড দ্যাখো। মনে হচ্ছে ডবল-ওয়েডিং ইন্ডিকেটেড।'

এ কিটিকে চেনা যায় না। আনন্দ তার সর্বাঙ্গ থেকে উছলে পড়ছে। রূপের ছটায় বাবান্দা আলো। সঙ্গে সঙ্গে পিসেমশাই ঢুকে একবার বাসবের দিকে, একবার রুমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আই সি। পেছিয়ে কেন কেশব? এই নাকি তোমার সাহস! বাসব, এসো বাবা। কেশব আই. সি. এসের বদলে রেলের কি সব পরীক্ষা, ইন্টারভিউ দিয়ে ভালো চাকরি পেয়ে গেছে।'

বারান্দায় বড্ড ভিড়। পিসিমা, হেমন্তপিসিমা শক্ত মুখ করে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় অনাবশ্যকভাবে প্রজ্জ্বলিত পেট্রোম্যাক্সটা হাতে নিয়ে বারান্দায় উঠে এসে সোমনাথ বললেন, 'টিনি, ওদের আশীর্বাদ করো। অর্ণব আর কানু তাদের বংশধরদের যথেষ্ট দুঃখ দিয়েছে। আর নয়।'

তারপর পিসেমশায়ের দিকে ফিরে বললেন, 'ব্রাদার, আর দেরি নয়, কাল থেকে পাঁচিল ভাঙা হবে।'

পিসেমশাই মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বললেন, 'রাইট। আর গৌর অ্যাক্টে ডবল বিয়ে।'

আনন্দের চোটে পিসিমার মুখ লাল হয়ে উঠল, তিনি চারজনকে একসঙ্গে কোলে নেবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন। হেমন্তপিসিমারও হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল; হেসে বললেন, 'যাই কার্সিয়াং-এ অবনীদাদের টেলিগ্রাম করি।'

সুবোধ ঘোষ

নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-আটষট্টি বর্গ-মাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই। মহারাজা আছেন; ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নাজারৎ সব আছে। একুকুড়ির ওপর মহারাজার উপাধি। তিনি ত্রিভুবনপতি; তিনি নগরপাল, ধর্মপাল এবং অরাতিদমন। দু'পুরুষ আগে এ-রাজ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো হ'ত; এখন সেটা আর সম্ভব নয়। তার বদলে শুধু ন্যাংটো করে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।

সাবেক কালের কেল্লাটা যদিও লুপ্তশ্রী, তার পাথরের গাঁথুনিটা আজও অটুট। কেল্লার ফটকে বুনো হাতির জীর্ণ কঙ্কালের মতো দুটো মরচে-পড়া কামান। তার নলের ভেতর পায়রার দল স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ে; তার ছায়ায় বসে ক্লান্ত কুকুরেরা ঝিমোয়। দপ্তরে দপ্তরে শুধু পাগড়ি আর তরবারির ঘটা, দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মতো তামা আর লোহার ঢাল।

সচিব, সচিবোত্তম আর ন্যায়াধীশ—ফৌজদার, আমিন, কোতোয়াল, আর সেরেস্তাদার। ক্ষত্রিয় আর মোগল এই দু'জাতের আমলাদের যৌথ-প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করেন! সেই অপূর্ব অদ্ভুত শাসনের ঝাঁজে রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজা সরে পড়েছে দূরে মরিশাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।

সাড়ে-আটষট্টি বর্গমাইল অঞ্জনগড় শুধু ঘোড়ানিম আর ফণীমনসায় ছাওয়া রুক্ষ কাঁকরে মাটির ডাঙা আর নেড়া নেড়া পাহাড়। কুর্মি আর ভীলেরা দু'ক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুণ্ড থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভবে আনে—জমিতে সেচ দেয়—ভুট্টা যব আর জনার ফলায়।

প্রত্যেক বছর স্টেটের তসিল বিভাগ আর ভীল ও কুর্মি প্রজাদের ভেতর একটা সংঘর্ষ বাধে। চাষীরা রাজভাণ্ডারের ন্য ফসল ছাড়তে চায় না। কিন্তু অর্দ্ধেক ফসল দিতেই হবে। মহারাজার সুগঠিত পোলো টিম আছে। হয় শ্রেষ্ঠ শতাধিক ওয়েলারের হ্রেষারবে রাজ-আস্তাবল সতত মুখরিত। সিডনির নেটিভ এই দেবতুল্য জীবগুলির ওপর মহারাজার অপার ভক্তি। তাদের তো আর খোল ভুসি খাওয়ানো চলে না। ভুট্টা যব জনার চাই-ই।

তসিলদার অগত্যা সেপাই ডাকে। রাজপুত বীরের বল্লম আর লাঠির মারে ক্ষাত্রবীর্যের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে সব প্রতিবাদ স্তব্ধ, সব বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে যায়।

পরাজিত ভীলেদের অপরিমেয় জংলি সহিষ্ণুতা ভেঙে পড়ে। তারা দলে দলে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে ভর্তি হয় সোজা কোনো ধাঙড়-রিক্রুটারের ক্যাম্পে। মেয়ে মরদ শিশু নিয়ে কেউ যায় নয়াদিল্লি, কেউ কলকাতা, কেউ শিলং। ভীলেরা ভুলেও আর ফিরে আসে না।

শুধু নড়তে চায় না কুর্মি প্রজারা। এ-রাজ্যে তাদের সাতপুরুষের বাস। ঘোড়ানিমের ছায়ায় ছায়ায় ছোট বড় এমন ঠান্ডা মাটির ডাঙা, কালমেঘ আর অনন্তমূলের চারার এক একটা ঝোপ সালসার মতো সুগন্ধ মাটিতে। তাদের যেন নাড়ির টানে বেঁধে রেখেছে। বেহায়ার মতো চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায়। ঋতুচক্রের মতো এই ত্রিদশার আবর্তনে তাদের দিনসন্ধ্যেয় সমস্ত মুহূর্তগুলি ঘুরপাক খায়। এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

তবে অঞ্জনগড় থেকে দয়াধর্ম একেবারে নির্বাসিত নয়। প্রতি রবিবারে কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায় হাজারের ওপর দুস্থ জমায়েত হয়। দরবার থেকে বিতরণ করা হয় চিঁড়ে আর গুড়। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে-আল্পনা-আঁকা হাতির পিঠে চড়ে জলুস নিয়ে পথে বার হন প্রজাদের আশীর্বাদ করতে। তাঁর জন্মদিনে কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয়—প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকোপে যা হয়—সব ব্যাপারেই লাঠি। যেখানে জনতা আর জয়ধ্বনি সেখানে লাঠি চলবেই, আর দুচারটে অভাগার মাথা ফাটাবেই। চিঁড়ে আশীর্বাদ বা রামলীলা—সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়। প্রজারা সেই ভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।

লাঠিতন্ত্রের দাপটে স্টেটের শাসন, আদায় উসুল আর তসিল চলছিল বটে, কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল তাতে গদির গৌরব টিকিয়ে রাখা যায় না। নরেন্দ্রমণ্ডলের চাঁদা আর পোলো টিমের খরচ! রাজবাড়ির বাপের কালের সিন্দুকের রুপোর আর সোনার গাদিতে ক্রমে ক্রমে হাত পড়ল।

অঞ্জনগড়ের এই অদৃষ্টের সন্ধিক্ষণে দরবারের ল-এজেন্টের পদে আনানো হল একজন ইংরেজি আইননবিশ। আমাদের মুখার্জিই এল ল-এজেন্ট হয়ে। মুখার্জির চওড়া বুক—যেমন পোলো ম্যাচে তেমনি স্টেটের কাজে অচিরে মহারাজাব বড় সহায় হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমে মুখার্জিই হয়ে গেল 'ডি ফ্যাক্টো' সচিবোত্তম আর সচিবোত্তম রইলেন শুধু সই করতে।

আমাদের মুখার্জি আদর্শবাদী। ছেলেবেলার ইতিহাস-পড়া মার্কিনি ডেমোক্রেসির স্বপ্নটা আজো তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে অত্যন্ত শান্তবুদ্ধি। সে বিশ্বাস করে— যে সৎ-সাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যাণকৃৎ তাঁর কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

মুখার্জি তার প্রতিভার প্রতিটি পরমাণু উজাড় করে দিল স্টেটের উন্নতি সাধনায়। অঞ্জনগড়ের আবালবৃদ্ধ চিনে ফেলল তাদের এজেন্ট সাহেবকে, একদিকে যেমন কড়া অন্যদিকে তেমন হমদরদ। প্রজারা ভয় পায় ভক্তিও করে। মুখার্জির নির্দেশে বন্ধ হল লাঠিবাজি। সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করে তোলপাড় করে তুললো। স্টেটের জরিপ হল নতুন করে; সেন্সাস নেওয়া হল। এমনকি মরচে-পড়া কামান দুটোকেও পালিশ করে চকচকে করে ফেলা হল।

ল-এজেন্ট মুখার্জিই একদিন আবিষ্কার করল অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদ। রত্নগর্ভ অঞ্জনগড়—তার গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর অ্যাসবেস্টসের স্তূপ। কলকাতার মার্চেন্টদের ডাকিয়ে ওই কাঁকরে মাটির ডাঙাগুলিই লাখ লাখ টাকায় ইজারা করিয়ে দিল। অঞ্জনগড়ের শ্রী গেল ফিরে।

আজ কেল্লার এক পাশে গড়ে উঠেছে সুবিরাট গোয়ালিয়রি স্টাইলের প্যালেস। মার্বেল, মোজায়িক কংক্রিট আর ভিনিসিয়ান সার্সীর বিচিত্র পরিসজ্জা! সরকারি গ্যারেজে দামি দামি জার্মান লিমুজিন, সিডান আর টুরার। আস্তাবলে নতুন আমদানি আইরিশ পনির অবিরাম লাথালাথি। প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের পাওয়ার হাউস—দিবারাত্র ধক ধক শব্দে অঞ্জনগড়ের নতুন চেতনা আর পরমায়ু ঘোষণা করে।

সত্যিই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে। মার্চেন্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে—মাইনিং সিন্ডিকেট। খনি অঞ্চলে ধীরে গড়ে উঠেছে খোয়াবাঁধানো বড় বড় সড়ক,

কুলির ধাওড়া, পাম্প-বসানো ইঁদারা, ক্লাব, বাংলো, কেয়ারিকরা ফুলের বাগিচা আর জিমখানা। কুর্মি কুলিরা দলে দলে ধাওড়া জাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরি পায়, মুরগি বলি দেয়, হাঁড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদল ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চলে সরগরম করে রাখে।

মহারাজা এইবার প্ল্যান আঁটছেন—দুটো নতুন পোলো গ্রাউন্ড তৈরি করতে হবে; আরো এগারো বিঘা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগানটাকে বাড়াতে হবে; নহবতের জন্য একজন মাইনে-করা ইটালিয়ান ব্যান্ডমাস্টার হলেই ভালো।

অঞ্জনগড়ের মানচিত্রটা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে মুখার্জী বিভোর হয়ে ভাবে—তার ইরিগেশন স্কিমটার কথা—উত্তর থেকে দক্ষিণ, সমান্তরাল দশটা ক্যানাল। মাঝে মাঝে খিলান-করা কড়া-গাঁথুনির শ্লুস-বসানো বড় বড় ডাম। অঞ্জনা নদীর সমস্ত জলের ঢল কায়দা করে অঞ্জনগড়ের পাথুরে বুকের ভেতর চালিয়ে দিতে হবে—রক্তবাহী শিরার মতো। প্রত্যেক কুর্মি প্রজাকে মাথা পিছু তিন কাঠা জমি। আউশ আর আমন। তা ছাড়া একটা রবি। বছরের এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে। উত্তরের প্লটের সমস্তটাই নার্সারি, আলু আর তামাক; দক্ষিণে আখ, যব আর গম। তারপর—

তারপর ধীরে একটা ব্যাংক; ক্রমে একটা ট্যানারি আর কাগজের মিল। রাজকোষের সে অকিঞ্চনতা আর নেই। এই তো শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ! শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মতো একটি পরিকল্পনায় সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে। সে দেখিয়ে দেবে রাজ্যশাসন লাঠিবাজি নয়; এও একটা আর্ট।

একটা স্কুল—এইটাতে মহারাজার স্পষ্ট জবাব, কভি নেহি! মুখার্জি উঠলো। দেখা যাক, বুঝিয়ে বাঝিয়ে মহারাজার আপত্তিটা টলাতে পারে কি না।

মহারাজা তাঁর গালপাট্টা দাড়ির গোছাটাকে একটা নির্মম মোচড় দিয়ে মুখার্জির সামনে এগিয়ে দিল দুটো কাগজ—এই দ্যাখো।

প্রথম পত্র—প্রবল প্রতাপ দরবার আর দরবারের ঈশ্বর মহারাজ। আপনি প্রজার বাপ। আপনি দেন বলেই আমরা খাই। অতএব এ বছর ভুট্টা, যব, জনার যা ফলবে, তাতে যেন সরকারি হাত না পড়ে। আইনসঙ্গতভাবে সরকারকে যা দেয়, তা আমরা দেব ও রসিদ দেব। ইতি দরবারের অনুগত ভৃত্য কুর্মি সমাজের তরফে দুলাল মাহাতো বকলম খাস।

দ্বিতীয় পত্র—মহারাজার পেয়াদা এসে আমাদের খনির ভেতর ঢুকে চারজন কুর্মি কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে আর তাদের স্ত্রীদের লাঠি দিয়ে মেরেছে। আমরা একে অধিকারবিরুদ্ধ মনে করি এবং দাবি করি মহারাজার পক্ষ থেকে শীঘ্রই এ-ব্যাপারে সুমীমাংসা হবে। ইতি সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসন।

মহারাজা বললেন—দেখছ তো মুখার্জি, শালাদের সাহস।

—হ্যাঁ, দেখছি।

টেবিলে ঘুসি মেরে বিকট চীৎকার করে অরাতিদমন প্রায় ফেটে পড়ল—মুড়ো, শালাদের মুড়ো কেটে এনে ছড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি বসে বসে দেখি, দুদিন দুরাত দেখি।

মুখার্জি মহারাজকে শান্ত করল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একবার ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করি, আসল ব্যাপার কি।

বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মরিশাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকি জীবনটা উপভোগ

করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে। তবু তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা—একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

কুর্মিরা দুলালের কাছে শিখেছে—নগদ মজুরি কি জিনিস। ফায়জাবাদ স্টেশনে কোনো বাবুসাহেবের একটা দশসেরি বোঝা ট্রেনের কামরায় তুলে দাও! ব্যাস—নগদ একটি আনা, হাতে হাতে।

দুলাল বলতো—ভাইসব, এই বুড়োর মাথায় য'টা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নিয়ম। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।

সিন্ডিকেটের সাহেবদের সঙ্গে দুলাল সমানে কথা চালায়। কুলিদের মজুরির রেট, হপ্তা পেমেন্ট, ছুটি, ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা—এ সবই দুলাল কুর্মিদের মুখপাত্র হয়ে আলোচনা করেছে; পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সিন্ডিকেটও দুলালকে উঠতে বসতে তোয়াজ করে—চলে এসো দুলাল। বলোতো রাতারাতি বিশ ডজন ধাওড়া ধরে দিচ্ছি। তোমার সব কুর্মিদের ভর্তি করে নেব।

দুলাল জবাব দেয়—আচ্ছা, সে হবে। তবে আপাতত কুলি পিছু কিছু কয়লা আর কেরোসিন তেল মুফতি দেবার অর্ডার হোক।

—আচ্ছা তাই হবে। সিন্ডিকেটের সাহেবরা তাকে কথা দিত।

দুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন রাজ্যের কুর্মি একত্রিত হল ঘোড়ানিমের জঙ্গলে। পাকাচুলে ভরা মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে হাতে নিয়ে দুলাল দাঁড়ালো—আজ আমাদের মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হল। এখন ভাব কি করা উচিত। চিনে দ্যাখো, কে আমাদের দুশমন আর কেই বা দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জৎ, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোনো মতেই ক্ষমা নয়।

ভাঙা শঙ্খের মতো দুলালের স্থবির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে কেঁপে কেঁপে আওয়াজ ছাড়ল—ভাই সব, আজ থেকে এ মাহাতোর প্রাণ মণ্ডলের জন্য, আর মণ্ডলের প্রাণ...।

কুর্মি জনতা একসঙ্গে লাঠি তুলে প্রত্যুত্তর দিল—মাহাতোর জন্য। ঢাক ঢোল পিটিয়ে একটা নিশান পর্যন্ত উড়িয়ে দিল তারা। তারপর যে যার ঘরে গেল ফিরে।

ঘটনটা যতই গোপনে ঘটুক না কেন মুখার্জির কিছু জানতে বাকি রইল না। এটুকু সে বুঝল—এই মেঘে বজ্র থাকে। সময় থাকতে চটপট একটা ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু মহারাজা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পায়। ফিউডলি দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জত কমপ্লেক্স জর্জর এই সব নরপালদের তা হলে সামলানো দুষ্কর হবে। বৃথা একটা রক্তপাতও হয়তো হয়ে যাবে। তার চেয়ে নিজেই একহাত ভদ্রভাবে লড়ে নেওয়া যাক।

পেয়াদার এসে মহারাজকে জানালো—কুর্মিরা রাজবাড়ির বাগানে আর পোলো লনে বেগার খাটতে এল না। তারা বলছে—বিনা মজুরিতে খাটলে পাপ হবে; রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

ডাক পড়ল মুখার্জির। দুলাল মাহাতোকেও তলব করা হল। জোড় হাতে দুলাল মাহাতো প্রণিপাত করে দাঁড়ালো। মেষশিশুর মতো ভীরু—দুলাল যেন ঠক ঠক কাঁপছে।

—তুমিই এসব সয়তী করছ! মহারাজা বললেন।

—হুজুরের জুতোর ধুলো আমি।

—চুপ থাকো।

—চুপ! মহারাজা জীমূতধ্বনি করলেন। দুলাল কাঠের পুতুলের মতো স্থির হয়ে গেল।

—ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে। আমার বিনা হুকুমে কোন কুর্মি খনিতে কুলি হয়ে খাটতে পারবে না।

—জি সরকার। আপনার হুকুম আমার জাতকে জানিয়ে দেব।

—যাও।

দুলাল দণ্ডবৎ করে চলে গেল। এবার আদেশ হল মুখার্জির ওপর।—সিন্ডিকেটকে এখুনি নোটিশ দাও, যেন আমার বিনা সুপারিশে কোনো কুর্মি প্রজাকে কুলির কাজে ভর্তি না করে।

অবিলম্বে যথাস্থান থেকে উত্তর এলো একে একে : দুলাল মাহাতোর স্বাক্ষরিত পত্র।—যেহেতু আমরা নগদ মজুরি পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেই হেতু আমরা খনির কাজ ছাড়তে অসমর্থ। আশা করি দরবার এতে বাধা দেবেন না... আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। রাজ-তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়।... আগামী শীতের সময়ে বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুরি আর লকড়ি ব্যবহার করার অনুমতি হয়।

নোটিশের প্রত্যুত্তরে সিন্ডিকেটের একটা জবাব এল—মহারাজার সঙ্গে কোনো নতুন শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে আমরা রাজি আছি। তবে আজ নয়। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ যখন ফুরোবে—নিরানব্বই বছর পরে।

—কি রকম বুঝছ মুখার্জি? অগত্যা দেখছি ফৌজদারকেই ডাকতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, খাল-কাটার স্বপ্নটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কি না?

মহারাজা আস্তে আস্তে বললেন, বটে, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, রুদ্ধ একটা আক্রোশ শত ফণা বিস্তার করে তাঁর মনের ভেতর ছটফট করছে।

মুখার্জি সবিনয়ে নিবেদন করল—মন খারাপ করবেন না সরকার। আমাকে সময় দিন, সব গুছিয়ে আনছি আমি।

মুখার্জি বুঝেছে দুলালের এই দুঃসাহসের প্রেরণা জোগাচ্ছে কারা? সিণ্ডিকেটের দুষ্ট উৎসাহেই কুর্মি সমাজের নাচানাচি। এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না করলে রাজ্যের সমূহ অশান্তি-অমঙ্গলও। কিন্তু কি করা যায়।

দুলাল মাহাতোর কুঁড়েঘরের কাছে মুখার্জি এসে দাঁড়ালো। ব্যস্তভাবে দুলাল বেরিয়ে এসে একটা চৌকি এনে মুখার্জিকে বসতে দিল। মাথার পাগড়িটা খুলে মুখার্জির পায়ের কাছে রেখে দুলালও বসলো মাটির ওপর। মুখার্জি এক এক করে তাকে সব বুঝিয়ে শেষে বড় অভিমানে ভেঙে পড়ল—একি করছো মাহাতো। দরবারের ছেলে তোমরা; কখনো ছেলে দোষ করে, কখনো করে বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ বাপের ইজ্জত নষ্ট করে না। সিন্ডিকেট আজ না হয় তোমাদের ভালো খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন দুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাঁচাবে।

মুখার্জির পায়ে হাত রেখে দুলাল বলল—কসম, এজেন্ট বাবা, তোমার কথা রাখব। বাপের তুল্য মহারাজা, তাঁর জন্য আমরা প্রাণ দিতে তৈরি। তবে ওই দরখাস্তটি একটু জলদি জলদি মঞ্জুর হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখার্জি দুলালের কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে

পড়ল।—নাঃ, রোগে তো ধরেই ছিল অনেকদিন। এইবার দেখা দিয়েছে বিকারের লক্ষণ।

স্নান, আহার আর পোশাক বদলাবার কথা মুখার্জিকে ভুলতে হল আজ। একটানা ড্রাইভ করে থামলো এসে সিন্ডিকেটের অফিসে।

—দেখুন মিস্টার গিবসন, রাজা-প্রজা সম্পর্কের ভেতর দয়া করে হস্তক্ষেপ করবেন না আপনারা। আপনাদের কারবারের সুখ-সুবিধার জন্য দরবার তো পূর্ণ গ্যারাণ্টি দিয়েছে।

গিবসন বললো—মিস্টার মুখার্জি, আমরা মনিমেকার নই, আমাদের একটা মিশনও আছে। নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। দরকার থাকে, আরো লড়বো।

—সব কুর্মি প্রজাদের লোভ দেখিয়ে আপনারা কুলি করে ফেলছেন। স্টেটের এগ্রিকালচার তাহলে কি করে বাঁচে বলুন তো।

ঝোঁকের মাথায় মুখার্জি আর ক্ষোভের আসল কারণটি ব্যক্ত করে ফেললো।

—এগ্রিকালচার না বাঁচুক, ওয়েল্‌থ তো বাঁচছে। এটা অস্বীকার করতে পারেন? গিবসন বিদ্রুপের স্বরে উত্তর দেয়।

—তর্ক ছেড়ে কো-অপারেশনের কথা ভাবুন মিস্টার গিবসন। কুলি ভর্তির সময় দরবার থেকে একটু অনুমোদন করিয়ে নেবেন, এই মাত্র। মহারাজও খুশি হবেন। এবং তাতে আপনাদেরও অন্যদিকে নিশ্চয়ই ভালো হবে।

—সরি, মিস্টার মুখার্জি। গিবসন বাঁকা হাসি হেসে চুরুট ধরালো।

নিদারুণ বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল মুখার্জির কর্ণমূল। সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে সে অফিস ছেড়ে চলে গেল।

ম্যাক্‌কেনা এসে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার হে গিবসন?

—মুখার্জি, দ্যাট মাংকি অফ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটার, মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি। কোনো টার্মই গ্রাহ্য করিনি।

ঠিক করেছ। শুনেছ তো, ওর ওই ইরিগেশন স্কিমটা? সময় থাকতে ভণ্ডুল করে দিতে হবে, নইলে সাংঘাতিক লেবারের অভাবে পড়তে হবে। কারবার এখন বাড়তির মুখে। খুব সাবধান।

—কোনো চিন্তা নেই। পোষা বিড়াল মাহাতো রয়েছে আমাদের হাতে। ওকে দিয়েই স্টেটের সব ডিজাইন ভণ্ডুল করবো।

পরস্পর হাস্য বিনিময় করে ম্যাককেনা বলল—মাহাতো এসে বসে আছে বোধহয়। দেখি একবার।

অফিসের একটা নিভৃত কামরায় মাহাতোকে নিয়ে গিয়ে গিবসন বলল—এই যে দরখাস্ত তৈরি। সব কথা লেখা আছে এতে। সই করে ফেল; আজই দিল্লির ডাকে পাঠিয়ে দি।

মাহাতোর পিঠ থাবড়ে ম্যাক্‌কেনা তাকে বিদায় দিল—ডরো মৎ মাহাতো আমরা আছি। যদি ভিটে মাটি উৎখাত করে, তবে আমাদের ধাওড়া খোলা রয়েছে তোমাদের জন্য, সব সময়। ডরো মৎ।

নিজের দপ্তরে বসে মুখার্জি শুধু আকাশপাতাল ভাবে। কলম ধরতে আর মন চায় না। মহারাজকে আশ্বাস দেবার মতো সব কথা ফুরিয়ে গেছে তার। পরের রথের সারথ্য আর বোধহয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতেই তুলে দিতে হবে লাগাম। কিন্তু

মানুষগুলোর মাথার ঘিলু নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে সব। সবাই নিজের নিজের মূঢ়তায়—একটা আত্মবিনাশের উৎকট কল্পনা-তাণ্ডবে মজে আছে যেন। কিংবা সেই ভুল করেছে কোথাও।

মহারাজার আহ্বান; খাস কামরায়।

সচিবোত্তম ও ফৌজদার শুষ্ক মুখে বসে আছেন। মহারাজা কৌচের চারদিকে পায়চারি করছেন ছটফট করে। মুখার্জি ঢুকতেই একেবারে অগ্ন্যুদ্‌গার করলেন।

—নাও, এবার গদিতে থুথু ফেলে আমি চললাম। তুমিই বসে তার ওপর আর স্টেট চালিয়ো।

হতভম্ব মুখার্জি সচিবোত্তমের দিকে তাকালো। সচিবোত্তম তার হাতে তুলে দিল এক চিঠি। পলিটিক্যাল এজেন্টের নোট—স্টেটের ইন্টার্নাল ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। দিন দিন আরো নতুন ও গুরুতর অভিযোগ সব আসছে। আমার হস্তক্ষেপের পূর্বে, আশা করি, দরবার শীঘ্রই সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।

ফৌজদার একটু ভ্রূকুটি করেই বলল—এই সবের জন্য আপনার কনসিলিয়েশন পলিসিই দায়ী, এজেন্ট সাহেব।

ফৌজদারের অভিযোগের সূত্র ধরে মহারাজা চীৎকার করে উঠলেন—নিশ্চয়, খুব সত্য কথা। আমি সব জানি মুখার্জি। আমি অন্ধ নয়।

—সব জানি? এ কি বলছেন সরকার?

—থাম, সব জানি। নইলে আমার রাজ্যের ধুলো মাটি বেচে যে বেনিয়ারা পেট চালায় তাদের এত সাহস হয় কোথা থেকে। কে তাদের ভেতর ভেতর সাহস দেয়?

মহারাজা যেন দমবন্ধ করে কৌচের ওপর এলিয়ে পড়লেন। একটা পেয়াদা ব্যস্তভাবে ব্যঞ্জন করে তাঁকে সুস্থ করতে লাগল। সচিবোত্তম ফৌজদার আর মুখার্জি ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে বোবা হয়ে বসে রইল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে মহারাজাই আবার কথা পাড়লেন।—ফৌজদার সাহেব, এবার আপনিই আমার ইজ্জত বাঁচান।

সচিবোত্তম বলল—তাই হোক, কুর্মিদের আপনি শায়েস্তা করুন ফৌজদার সাহেব, আর আমি সিন্ডিকেটকে একটা সিভিল সুটে ফাঁসাচ্ছি। চেষ্টা করলে কন্ট্রাক্টের মধ্যে এমন ফাঁক পাওয়া যাবে।

মহারাজা মুখার্জির দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু মুখার্জি এর মধ্যে দেখে ফেলেছে, মহারাজার চোখ ভেজা ভেজা।

সিংহের চোখে জল। এর পেছনে কতখানি অন্তর্দাহ লুকিয়ে আছে, তা স্বভাবত শশক হলেও মুখার্জি আন্দাজ করে নিল। সত্যিই তো এ দিকটা তার এতদিন চোখে পড়েনি। তার ভুল হয়েছে মহারাজার সামনে এগিয়ে গিয়ে সে শান্তভাবে তার শেষ কথাটা জানালো।—আমার ভুল হয়েছে সরকার। এবার আমায় ছুটি দিন। তবে আমায় যদি কখনো ডাকেন, আমি আসবই।

মহারাজা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে নরম হয়ে গেলেন—না, না মুখার্জি কি যে বল। তুমি আবার যাবে কোথায়? অনেকে অনেক কিছু বলছে বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। তবে পলিসি বদলাতেই হবে; একটু কড়া করতে হবে। ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয় না মুখার্জি।

শীতের মরা মেঘের মতো একটা রিক্ততা ক্লান্তি যেন মুখার্জির হাত-পায়ের গাঁটগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে। দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। শুধু বিকেল হলে, ব্রিচেস চড়িয়ে

বয়ের কাঁধে দু'ডজন ম্যালেট চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়। সমস্তটা সময় পুরো গ্যালপে খ্যাপা ঝড়ের মতো খেলে যায়। ডাইনে বাঁয়ে বেপরোয়া আন্ডার-নেক হিট চালায়। কড় কড় করে এক একটা ম্যালেট ভেঙে উড়ে যায় ফালি হয়ে। মুখের ফেনা তার গায়ের ঘামের স্রোতে ভিজে চুপসে যায় কালো ওয়েলারের পায়ের ফ্ল্যানেল। তবু স্কোরের নেশায় পাগল হয়ে মুখার্জি চার্জ করে। বিপক্ষদল ভ্যাবাচাকা খেয়ে অতি মন্থর ট্রটে ঘুরে আত্মরক্ষা করে। চক্কর শেষ হবার পরেও সে বিশ্রাম করার নাম করে না। অকারণে পোলো-লনের চারদিকে বিদ্যুৎবেগে, ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। রেকাবে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে—বুক ভরে যেন স্পিড পান করে।

খেলা শেষে মহারাজা অনুযোগ করেন।—বড় রাফ খেলা খেলছ মুখার্জি।

সেদিনও সন্ধ্যার আগে নিয়মিত সূর্যাস্ত হল অঞ্জনগড়ের পাহাড়ের আড়ালে। মহারাজা সাজগোজ করে লনে যাবার উদ্যোগ করছেন। পেয়াদা একটা খবর নিয়ে এল।—চৌদ্দ নম্বরের পিটে ধসেছে, এখনো ধসছে। নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুলি চাপা পড়েছে।

—অতি সুসংবাদ। মহারাজা গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চেঁচিয়ে উঠলেন। এইবার দুশমন মুঠোর মধ্যে. নির্দয়ের মতো পিষে ফেলতে হবে এইবার।—সচিবোত্তম কোথায়? শীগগির ডাক।

সচিবোত্তম এলেন, কিন্তু মরা কাতলা মাছের মতো দৃষ্টি তাঁর চোখে। বললেন দুঃসংবাদ।

--কিসের দুঃসংবাদ?

বিনা টিকিটে কুর্মিরা লকড়ি কাটছিল। জঙ্গলের রেঞ্জার বাধা দেয়। তাতে রেঞ্জার আর গার্ডদের কুর্মিরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

— তারপর? —মহারাজার চোয়াল দুটো কড় কড় করে বেজে উঠল।

—তারপর ফৌজদার দিয়ে গুলি চালিয়েছে। ছর্‌রা ব্যবহার করলেই ভালো ছিল। তা না করে চালিয়েছে মুঙ্গেরি গাদা আর দেড় ছটাকি বুলেট। মরেছে বাইশজন আর ঘায়েল পঞ্চাশের ওপর। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে সব লাশ এখনো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মহারাজা বিমূঢ় হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের সামনে পলিটিক্যাল এজেন্টের হুঁশিয়ারি চিঠিটা যেন চকচকে সূচিমুখ বর্শার ফলার মতো ভেসে বেড়াতে লাগল।

—খবরটা কি রাষ্ট্র হয়ে গেছে?

—অন্তত সিন্ডিকেট তো জেনে ফেলেছে।—সচিবোত্তম উত্তর দিল।

মুখার্জিকে ডাকলেন মহারাজা।—এই তো ব্যাপার মুখার্জি। এইবার তোমার বাঙালি ইলম দেখাও। একটা রাস্তা বাতলাও।

একটু ভেবে নিয়ে মুখার্জি বলল—আর দেরি করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটকান।

জন পঞ্চাশ পেয়াদা সড়কি লাঠি লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে দৌড়ল দুলালের ঘরের দিকে।

মুখার্জি বলল—আমার শরীর ভালো নয় সরকার; কেমন গা বমি বমি করছে। আমি যাই।

চোদ্দ নম্বরের পিট ধসেছে। মার্চেন্টরা দস্তুরমতো ঘাবড়ে গেল। তৃতীয় সিমের ছাদটা ভালো করে টিম্বার করা ছিল না, তাতেই এই দুর্ঘটনা। ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত পাথরের কুচি আর ধূলোর সঙ্গে রসাতল থেকে যেন একটা আর্তনাদ থেমে থেমে বেরিয়ে আসছে—বুম বুম বুম।

কোয়ার্টজের পিলারগুলো চাপের চোটে তুবড়ির মতো ধুলো হয়ে ফেটে পড়ছে। এরি মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পিটের মুখটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য ধাওড়া থেকে দলে দলে কুলিরা দৌড়ে আসছিল। মাঝ পথেই দারোয়ানেরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে।—কাজে যাও সব, কিছু হয়নি। কেউ ঘায়েল হয়নি, মরেওনি কেউ।

মার্চেন্টরা দল পাকিয়ে অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছে। গিবসন বলল—মাটি দিয়ে ভরাট করবার উপায় নেই, এখনো ছ'দিন ধরে ধসবে। হাজিরা বইটা পুড়িয়ে আজই নতুন একটা তৈরি করে রাখো।

ম্যাককেনা বলল—তাতে আর লাভ কি হবে? দি মহারাজার কানে পৌঁছে গেছে সব। তা ছাড়া দ্যাট মাহাতো; তাকে বোঝাবে কি দিয়ে? কালকের সকালেই শহরের কাগজগুলো খবর পেয়ে যাবে আর পাতা ভরে স্ক্যান্ডাল ছড়াবে দিনের পর দিন। তারপর আসবেন একটি এনকোয়ারি কমিটি; একটা গান্ধিয়াইট বদমাশও বোধহয় তার মধ্যে থাকবে। বোঝো ব্যাপার?

সে রাতে ক্লাব ঘরে আর আলো জ্বললো না! একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জ্বলে উঠল প্যালেসের একটা প্রকোষ্ঠে। আবার ডাক পড়ল মুখার্জির।

অভূতপূর্ব দৃশ্য। মহারাজা, সচিবোত্তম আর ফৌজদার—গিবসন, ম্যাককেনা, মূর আর প্যাটার্সন। সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেন্টারের ঠাসাঠাসি।

সস্মিতবদনে মহারাজা মুখার্জিকে অভ্যর্থনা করলেন।—মাহাতো ধরা পড়েছে মুখার্জি। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।

গিবসন সায় দিয়ে বলল—নিশ্চয়, অনেক ক্লামজি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উভয়ের ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্তব্য কি নির্ধারিত হয়ে গেছে, ফৌজদার তাই মুখার্জির কানে কানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দিল। নিরুত্তর মুখার্জি শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুজে বসে রইল।

গিবসন মুখার্জির পিঠ ঠুকে একবার বলল—এসব কাজে একটু শক্ত হতে হয় মুখার্জি, নার্ভাস হবেন না।

রাত দুপুরে অন্ধকারের মধ্যে আবার চৌদ্দ নম্বর পিটের কাছে মোটর গাড়ি আর মানুষের একটা জনতা। ফৌজদারের গাড়ির ভেতর থেকে দারোয়ানেরা কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাশটা টেনে নামালো। ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে ট্রাক বোঝাই লাশ এল আরো। ক্ষুধার্ত পিটটার মুখে মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানেরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিলে একে একে।

শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছল ছল করছিল মুখার্জির চোখ দুটি। গাড়ির বাম্পারের ওপর এগিয়ে বসে চৌদ্দ নম্বর পিটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল অন্য কথা। অনেক দিন পরের একটা কথা।

লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোনো একটা জাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতুহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল। অর্ধপশুগঠন, অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণির পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল; যারা আকস্মিক কোনো ভূবিপর্যয়ে কোয়ার্টজ আর গ্রানিটের স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতকগুলি সাদা সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোনো দাগ নেই।

আশাপূর্ণা দেবী

পড়ন্ত বিকেল মেঘলা আকাশের ঘোলাটে ছায়ায় ঘরের মধ্যে প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বুতান তাই জানলার ধার ঘেঁষে বসে শেলেটে ছবি আঁকছে। শেলেটে ছবি আঁকতেই ভালোবাসে বুতান, অপছন্দ হওয়া মাত্রই ডাস্টার ঘষে বিলীন করে ফেলা যায়। আবার নতুন রেখা পড়ে।

মাকে ঘরে ঢুকতেই তাকিয়ে দেখলো বুতান, আর চমকে উঠে বললো, মা! তুমি এইমাত্তর অফিস থেকে এসেই আবার বেরোচ্ছ?

তানিমা বললো, হ্যাঁরে, একটু ডাক্তারখানায় যেতে হবে।

ডাক্তারখানায়? কেন? কার অসুখ করেছে?

আরে বাবা অসুখ নয়, কদিন ধরে ভীষণ মাথা ধরছে, চোখটা একটু দেখাতে যেতে হবে।

তোমার তো চশমা রয়েছে। নতুন সুন্দর চশমা।

ওই তো ওইটাই ঠিক লাগছে না। তাই ডাক্তারবাবুকে বলতে যাচ্ছি।

বারে আমি বুঝি একা পড়ে থাকবো?

একা আবার কী? মালতীমাসি রয়েছে না?

ও তো পচা।

এই! চুপ! খবরদার এসব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে না। তুমি মালতী মাসির কাছে দুধটা খেয়ে নিয়ো। লক্ষ্মী হয়ে খাবে বুঝলে? মালতীমাসি যেন তোমার নামে নিন্দে করতে না পারে।...

মার গলার স্বরটা মৃদু হয়ে আসে, দেখেছো তো আমি ফিরে এলেই মালতীমাসি তোমার নামে নিন্দে করে। বলে, 'খুকু দুধ ফেলে দিয়েছে!...খুকু ডিম খায়নি, ভেঙে গেলাসের জলে গুলে দিয়েছে। ...খুকু আমার একটাও কথা শোনেনি।...

'খুকু' সতেজে বলে, ওকে ছাড়িয়ে দিতে পারো না?

এই! আবার? চুপ! ছাড়িয়ে দিলে চলবে কী করে? লোক পাওয়া যায়? নইলে দিতে তো ইচ্ছে করে। দায়ে পড়েই রাখা।

সাড়ে চার বছরের মেয়েটাকে এই 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল'টি আস্বাদন করিয়ে তনিমা, এখন গলা তুলে বলে গুড গার্ল হয়ে থাকবে। মালতীমাসিকে একদম জ্বালাতন করবে না! দুধ খেয়ে নেবে।... আচ্ছা টা-টা!

বুতান অনিচ্ছা ভরে একবার টা-টা'র ভঙ্গিতে হাতটা নাড়ে। যেটা দেখলেই মনে হয় 'না না।' পরক্ষণেই চেঁচিয়ে ওঠে, কখন আসবে?

আরে বাবা সে কি ঠিক করে বলা যায়? বাস পাওয়া যায় না, রাস্তা জ্যাম, ডাক্তারখানায় লোকের ভিড় তিন ঘণ্টা বসিয়ে রাখে—

ও। বুঝেছি। তার মানে দেরি করবে। আচ্ছা আচ্ছা আমিও দুধ খাবো না। মালতীমাসির কথা শুনবো না।

বুতান, দিন দিন ভারী অসভ্য হয়ে যাচ্ছো তুমি? কেন, তুমি জানো না, এসব হয়? তোমায় নিয়ে বেরোই না? দ্যাখো না? আমার কি গাড়ি আছে?

ইস। বাপীটা যা একখানা বুদ্ধু। একটা গাড়ি কেনে না।

তনিমা চলে যেতে গিয়েও ফিরে এসে উৎসাহচাপা, চাপাগলায় বলে, বলিস না তোর বাপীকে। খুব করে বলবি।

বললেই যেন শুনবে বাপী! বাপী যা না একখানা। আমাদের ক্লাশের সব মেয়ের বাপীর গাড়ি আছে।

মা থমকে বলে, তারা স্কুলবাসে আসে না? গাড়িতে আসে?

আহা। তা কেন? ওদের বাপীদের বুঝি আপিস যেতে হয় না? তো অন্যসময় তো ওদের মা, গাড়িটা নিয়ে যত ইচ্ছে বেড়ায়। ওরাও বেড়ায়।

একটি দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়ায়। তোর মার ভাগ্যে আর তা হয়েছে। আচ্ছা চলছি। ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। মনে আছে তো? একদম গুড গার্ল হয়ে—

মা অন্যমঞ্চে এসে দাঁড়ায়।

মালতী, তুমি শুধু শুধু বসে আছো কেন? এইসময় রুটি টুটিগুলো করে নিলেই তো হয়।... রোজই তো দেখছো সন্ধে হলেই লোডশেডিং।

মালতী যেমন বসে ছিল সেই ভাবেই বসে থেকে, পোজ দিয়ে একটা গা মোচড় দিয়ে বলে, বিকেলের সময় কিচেনে ঢুকতে মন লাগে না! লোড্‌শেডিঙের জ্বালায় টি.ভি. দেখা তো ঘুচে গেছে। তাড়াতাড়ি রান্না সেরে কী সগগো লাভ হবে? দুটো মোমবাতি রেখে যান।

একগোছা মোমবাতি তো চায়ের বাসনের তাকে রাখাই রয়েছে। আর শোনো—দেখছো তো 'ইনভার্টারটা' কদিন খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। কারেন্ট চলে গেলে খুকুর ঘরে একটা কেরোসিন আলো জ্বেলে দিয়ো!

সে অত বলতে হবে না। আপনি আসবেন কখন?

তনিমা হঠাৎ ঈষৎ কঠিন সুরে মনিবানীর গলায় বলে, সে আমি তোমায় বাক্যদত্ত হয়ে বলে যেতে পারছি না! দেরি হলে খুকুকে ঠিক সময় খাইয়ে দেবে।

খেলে তো! যা মেয়ে! শুনবে আমার কথা?

আচ্ছা ঠিক আছে। বাচ্চাকে একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে বশ করতে হয় মালতী। যাক কেউ 'বেল' বাজালেই হুট করে দরজা খুলে দেবে না, পাশের দিকের জানলা দিয়ে দেখে নেবে। আর দুম করে বলে বোসো না 'বাড়িতে কেউ নেই।' বলবে বৌদিদি একটুখানির জন্যে বেরিয়েছে, আর দাদাবাবু এক্ষুনি অফিস থেকে আসবে।

মালতী টাইট ফিট ব্লাউস আর পেট বার করা স্টাইলে শাড়ি পরা শরীরটাকে আর একবার মোচড় খাইয়ে বলে, ও কথা তো আপনি রোজই পাখি পড়া করে বলে যান বৌদিদি। আবার বলার কী আছে?

'বৌদিদির' মুখটা কালো হয়ে যায়। সেই কালচে স্বরেই বলে, তবু ভুলে যেতেও তো কসুর দেখি না। আচ্ছা এসে দরজাটা ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে যাও। মালতী একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আপনাদের বাড়ির এই এক ফ্যাচাং! দরজা লাগাও, দরজা খোলো। ফেলাটবাড়ির

দরজা কেমন ঠেকিয়ে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির লোকরা যে যখন ফেরে নিজে নিজে চাবি খুলে ঢুকে আসে। 'কাজের লোকদের' কোনো ঝামেলা নাই।

হুঁ।

তনিমা রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে যায়। রাগ ওই দুর্বিনীত মেয়েটার ওপর, রাগ বরের ওপর। রাগ 'দেশের বাড়ি বাসিনী' শাশুড়ির ওপর। আশ্চর্য জেদি মহিলা। নিজে 'দেশের বাড়িটা দেখাশোনার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে' বলে সেখানেই গিয়ে পড়ে আছেন, (অবিশ্যি 'গেছেন' সেটা তনিমার ওপর ভগবানের দয়া। সর্বদা মাথার ওপর জাঁতা! বাপস!) কলকাতার এই পচা বাড়িখানা বিক্রি করতেও দেবেন না। হলেও আজেবাজে প্যাটার্নের একতলা একটা বাড়ি, তবু রাস্তার ধারে—এতখানি জমিসমেত বাড়ি কি আজকালকার দিনে সোজা দাম মিলবে?...তা নয় ছেলের কাছে কাঁদুনি 'তোর বাবার সাধ ছিল দোতলা তোলবার। বলেছিলেন, 'অলক যদি পারে।' সে যদি তুই নাও পারিস বাবা, আমি বেঁচে থাকতে বেচাবেচি করিসনে। আমি মরলে যা খুশি করিস।'....

...যেন উনি এক্ষুনি মরছেন! ইস্পাতের শরীর। তো মাতৃভক্ত পুত্তুরের তার ওপর আর একটি কথা নয়।...যুক্তির বালাইমাত্র নেই। আমি যদিবা ও বিষয়ে একটু কথা তুলেছি—মুখ চোখের ভাব এমন হয়ে উঠবে, যেন ওনার মাকে খুন করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।...ওনার দিকে যুক্তি কী? না 'যদি কখনো মা অসুস্থ হয়ে পড়েন, কলকাতায় চলে আসতে চান? এ বাড়ির পাট উঠিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাটবাড়িতে গিয়ে থাকলে, মা এসে উঠবেন কোথায়?' যেন ফ্ল্যাটের দরজায় তাঁর 'প্রবেশ নিষেধ' লটকে রাখা হবে।...

আসলে সেকালের বুড়োবুড়িদের স্বভাবই হচ্ছে, একটা কোনো 'সেন্টিমেন্ট' খাড়া করে, পরবর্তীদের হাত-পা বেঁধে রাখা। তা সে যে কোনো ব্যাপারেই হোক। এ স্রেফ মনস্তত্ত্বের একটি জটিল তত্ত্ব। যেটুকু ক্ষমা প্রয়োগ করতে পারি, তাই প্রয়োগ করেই ওদের সুখের হন্তারক হই।

এই বাড়িটা বেচে দিলেই একটা সুন্দর ফ্ল্যাট আহরণ করা যায়। হয়তো 'উদ্বৃত্তও' কিছু থাকতে পারে, যা মূলধন করে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির স্বপ্ন দেখা যায়।

দূর! কিস্যু হবে না।

উঃ। যা দেরি হয়ে গেল।

অলকই হয়তো আগে এসে পড়বে। আর মাত্র দু'মিনিট আগে এলেও, অনায়াসে বলবে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি।'

'মুক্তাঙ্গনে' একটা নতুন নাটক এসেছে, বড়দি খুব প্রশংসা করল সেদিন, সেই থেকেই দেখার ইচ্ছে।

কিন্তু তনিমার পক্ষে ইচ্ছেপূরণ কি সহজ?

বরকে জপানো, বাড়িতে ছল-চাতুরি। ওই যা একখানি মেয়ে হয়েছেন। মা কোথাও বেরোচ্ছে দেখলেই যেন হাপসে পড়েন মেয়ে। 'ডাক্তার দেখানো', 'মেজমাসির শরীর খারাপ দেখতে যাওয়া' এমনি যা হোক বানিয়ে তবে রেহাই। সিনেমা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি শুনলে সাড়ে চার বছরের ধাড়ি মেয়ে হাঁ হাঁ করে কাঁদতে বসবে।

আর তার বাপটিও তেমনি।

বলা হবে টিভিতে তো রাতদিনই সিনেমা থিয়েটার নাচ গান সব কিছু দেখছো। হিন্দি বাংলা ইংরেজি, আবার ছুটে ছুটে দূরে যাওয়ার দরকার কী?

এই মানুষকে নিয়ে ঘর করা।

এ দিন আবার বলা হলো, কেন সেদিন তোমার বড়দি জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলেই পারতে? রাতদিন তো ফোনে কথা চলে। কী রকম রাগটা হয়?...যখন মেজাজ দেখিয়ে বললাম। 'কেন? আমি কি একটা আলতু ফালতু বিধবা? যে সব সময় পরের নেজুড় হয়ে কোথাও যেতে হবে?' তখন তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে আনলো।...তাই কি নিশ্চিন্ত সুখ বলে কিছু আছে? এই যে যাচ্ছি—বাড়ি ফিরে মেয়ের কাছে গপপো বানাতে হবে—বাস খারাপ হয়ে কিংবা হঠাৎ কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিলো। নয়তো ডাক্তারের চেম্বারেই তিনঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছিলো।' আর সঙ্গে সঙ্গে ওই পাজিটা বলতে বসবে—আপনি যখন যেখানে যাবেন, মেয়েকে নিয়ে যেয়ো বৌদিদি। ওকে 'মেনেজ' করা এই মালতী মণ্ডলের কর্ম নয়।

'কর্ম নয়।' ইয়ার্কি? যেন শুধু এই—আড়াই খানা লোকের রান্নাবান্না করার জন্যে তোকে মাসে মাসে আড়াইশো টাকা মাইনে দিই। চার বেলা রামরাজত্ব করে খাওয়া, আর আরাম, আয়েস, সাজ-সজ্জা টিভি দেখা, ইত্যাদি দিয়ে রাখা। তার ওপর জল ঘাঁটলে ওনার হাতে হাজা হয় বলে, বাসন মাজা কাপড় কাচার জন্যে আলাদা একটা লোক রাখা। অন্য অন্য বাড়িতে তো দেখি—একটা লোকই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করে।...অবিশ্যি হাজা ফাজা হলে বিশ্রী লাগে। সর্বদা খাবার জিনিসে হাত। তো কাজ কমানোয় একটু কৃতজ্ঞতা আছে?

মিনিবাসটা চট করে পেয়ে গিয়েছিল এই যা ভালো।

তবু বাসে বসে তনিমা অবিরত আপন দুর্ভাগ্যের আর জ্বালার হিসেব কষে চলে। আর কবজি উল্টে উল্টে ঘড়ি দেখে।

*　　　　*　　　　*

ঠিক তাই! সন্ধে হওয়া মাত্রই ফস করে বিদ্যুৎ বিদায় নিলো। সঙ্গে সঙ্গেই বুতান তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো, এই মালতীমাসি শিগগির আলো আনো।...আঃ! দেরি করছো কেন? মালতী মাসি—

মালতী একটা আধখানা ভুসোপড়া চিমনি পরানো জ্বলন্ত কেরোসিন ল্যাম্প সাবধানে হাতে ধরে এনে বললো, বাবাঃ বাবাঃ! উড়ে আসবো না কী? এই জন্যেই তো তোমার মাকে বলি, আপনার 'ইনভার্টার' আলো না থাকলে যেদিন সন্ধের মুখে বেরিয়ে যাবে, একটা কেরোসিন বাতি জ্বালিয়ে রেখে যেয়ো।...তো শুনিয়ে দেবে—'কেরোসিন বুঝি খুব শস্তা?' এ দিকে মেয়ে যে ছিঁচকাঁদুনি।

কী? আমায় ছিঁচকাঁদুনি বলা হচ্ছে? তোমার বুঝি ছোটবেলায় বাড়িতে কেউ না থাকলে আলো নিভে গেলে ভয় করতো না?

মালতী ল্যাম্পটাকে সাবধানে টেবিলের মাঝখানে বসিয়ে, পলতেটা উসকে দিয়ে বলে, আমার? হেঃ। আমাদের আবার ঘরে কেউ নাই এমন হতো নাকি? সর্বদাই তো ঘরে লোক গিসগিস।...মা-বাপ-পিসি-ঠাকুদ্দা, আর আমরা পাঁচটা ভাইবোন। ছিলো না শুধু ঠাকুমা।

পাঁচটা ভাইবোন!! য্যাঃ।

পাঁচটা তো। দুটো ভাই, তিনটে বোন।

ওঃ। নিজের খুব মজা ছিলো কিনা। তাই আমায় ছিঁচকাঁদুনি বলা হচ্ছে। মাকে বলে দেব।

দিবি তো দিবি। তোর মা আমায় ফাঁসি দেবে না কী?

অ্যাই! তুমি আমায় 'তুই' বলছো যে? তুমি কাজের লোক না?

শোনো কথা। কাজের লোক তা কী? এইটুকু একটা পুঁচকে মেয়েকে 'আপনি আজ্ঞে' করতে হবে নাকি?

কেন? 'তুমি' বলতে পারো না? দেখো মাকে বলে দিলে, মা রেগে গিয়ে তোমায় ছাড়িয়ে দেবে।

মালতী নিজস্ব ভঙ্গিতে শরীরে মোচড় দিয়ে বলে, ওমা! এইটুকু মেয়ে, যেন পাকা ঝিঁকুটি। ছাড়িয়ে দেবে তো দেবে। আমার যেন আর কাজ জুটবে না! ওই নতুন ফেলাটবাড়িগুলো থেকে তো হরদম ডাকে।

ঝটকা মেরে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গেই বুতান চেঁচিয়ে ওঠে, আঃ। মালতীমাসি চলে যাবে না বলছি। এই আলোয় আমার বিচ্ছিরি লাগে।

তো আমি কী করবো? এখানে বসে থাকলে আমার চলবে? কাজ নাই? তোমার মা তো এসে মাত্তরই প্যাঁচাল পাড়বে, 'এটা হয়নি কেন? ওটা হয়নি কেন?'

চলে যায়।

আর পরক্ষণেই বুতান রান্নাঘরে চলে আসে।

মালতীমাসি, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে।

মালতী ঝাঁজের সঙ্গে বলে, তা এখানে কী? তোমার ঘরে বোতলে ফোটানো জল নাই?

না। আমি এখানের জল খাবো। ফ্রিজের জল।

তা আর না। তারপর মা আসামাত্তরই বলবে, 'মা মালতীমাসি আমায় ফ্রিজের জল দিয়েছে।' তোমায় চিনি না আমি?

তা চিনলেই বা কী। বুতানের যে এখন এখানেই থাকা দরকার। একটা মানুষের সান্নিধ্যে। আর সে সান্নিধ্যটা বিলম্বিত করতে উপায় হচ্ছে কথা চালিয়ে যাওয়া।...সে কথার মধ্যে যে শুধু বুদ্ধির প্রকাশই থাকবে তা তো হয় না।...

তাই মালতীর আরো কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় বুতান, আহা মা বুঝি বলে না, 'মালতী কী কী করেছে এতক্ষণ? তোকে কী খেতে দিয়েছে সব বল?' আচ্ছা মাকে বলে দেব না—আমায় একটু ফ্রিজের জল দাও। মোটেও বলবো না।

মালতী চাকি বেলুন পেড়ে বসে মিচকে হেসে বলে, বলবে না। শুধু মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে খুক-খুক কাশবে, আর বলবে, ঠান্ডা জল খেয়েছি কি না তাই কাশি হয়েছে। হাড় বিচ্ছু ঘুঘু মেয়ে। জানি না আমি?

মালতীমাসি।

বুতান সতেজে বলে, তুমি আমায় গালাগালি দিচ্ছো?

মালতী ঢোক গিলে বলে, শোনো কথা। গালাগাল আবার কী? ও তো ঠাট্টা!

ঠাট্টা! আহা।

বুতানের মুখে একটু দেবদুর্লভ হাসি ফুটে ওঠে, আমায় যেন বোকা পেয়েছে।...

আচ্ছা আচ্ছা। তুমি এখন বকবক থামাও তো। লেখাপড়া করোগে না।

লেখাপড়া! সেই একা ঘরে! ভুসোপড়া চিমনি ঢাকা আলোর নীচে? আধা ছায়ায় আধা আলোয়!
এখানেও মোমবাতির শিখার চারদিকে অন্ধকারের ছায়া। তবু এখানে একটা মানুষের উপস্থিতি।
মালতীমাসি। আমি রুটি বেলবো। দাও—

আঃ। খুকু! কাজের সময় দিক্ কোরো না। একে লোডশেডিং-এর জ্বালায় মরছি। পড়া লেখা নাই? ভোর না হতেই ইস্কুলে ছুটতে হবে না!

কী? কাল ইস্কুলে যেতে হবে? কাল বুঝি রবিবার নয়? বোকা। বোকা। দাও বেলুনটা।

আঃ। খুকু! বলছি না কাজের সময় ব্যস্ত কোরো না বাবা! এই মেয়েখানিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে বৌদিদির রোজ সন্ধেবেলা বেড়াতে যাওয়া!

কী? বুতান আবার মর্যাদাবোধে সচেতন হয়। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ভঙ্গিতে বলে, তুমি আবার আমার মার নামে নিন্দে করছো! মা না থাকলেই তুমি মার নামে নিন্দে করো। রোসো, বলে দিয়ে তোমায় কী মজা দেখাই! মা তোমায় কী করে দেখো।

দেখাস। কে কাকে মজা দেখায় দেখিস। কী করবে তোর মা আমার? মুণ্ডু কেটে নেবে? এখন যাবি? কাজ করতে দিবি? ওই তো—এখান থেকে তো তোর ঘর দেখা যাচ্ছে। কেবল রান্না ঘরে ঘুরঘুর। আচ্ছা জ্বালা।

ওঃ। তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে!

গটগট করে চলে যায় বুতান। এতো অপমানের পর আর থাকা যায় না। চোখ ফেটে বেবিয়ে আসা জলটা ফ্রকের কোণ তুলে মুছতে মুছতে চলে যায়।

আলোর ধারে এসে দাঁড়ায়।

লেখাপড়ার প্রশ্ন ওঠে না, শুধু কান্না চাপা।

শেলেট-পেন্সিলটা নিয়েই বসে আবার।

কিন্তু কিছু আঁকা আসে না কেন? আলোটা অমন কেঁপে কেঁপে উঠছে কেন? বাতাসে জানলার পর্দাগুলো দুলে দুলে দেয়ালে এমন ছাড়া ফেলে কেন? কোথায় কী সব শব্দ হয় কেন? বাবা এখনো আসছে না কেন?...নিজের বুকের মধ্যেই এমন দুমদুম শব্দ হয় কেন?...হঠাৎ হঠাৎ রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া গাড়ির শব্দগুলো এমন বিচ্ছিরি লাগে কেন? শব্দগুলো কি অন্ধকারে অন্যরকম হয়ে যায়?...সবচেয়ে স্বস্তির শব্দ শুধু রান্নাঘর থেকে আসা খুন্তির শব্দ। কড়ার ওপর চাটুর উপর।

সেই স্বস্তির শব্দের কাছেই চলে যাওয়া ছাড়া উপায় কী?

মালতীমাসি! এখনো আলো আসছে না কেন?

সে কথা আলো কোম্পানিদেরই শুধোগে যাও। মুখপোড়াদের জ্বালায় একদিন টিভি দেখার জো নাই।

তোমার খালি টিভি আর টিভি। মা কখন আসবে?

সে কথা আমায় বলে গেছে? যখন থিয়েটার ভাঙবে তখন আসবে।

কী? থিয়েটার মানে?

মানে আবার কী! মা থিয়েটার দেখতে গেছে, জানিস না বুঝি?

কখনো না। মিথ্যুক। মা তো চোখ দেখাতে চশমার ডাক্তারবাবুর কাছে গেছে।

.তোকে তাই বলে বুঝিয়ে গেছে বুঝি?...মালতীর মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে ওঠে। এই

বাড়ির কাজটা তো ছেড়েই দেবে ঠিক করেছে, তবে আবার তোয়াক্কা কিসের? তাই বলে, মা যদি ডাক্তারখানায় গেছে তো, তোর বাপী এখনো আসছে না কেন? মা এখান থেকে থিয়েটারে গেছে, বাপী আপিস থেকে এসে সেখানে জুটবে। দেখিস একসঙ্গে ফিরবে!

তোমায় বলেছে?

বুতানের চোখে অগ্নিশিখা।

মালতীর প্রাণে সেই পৈশাচিক সুখস্বাদ, আমায় কারুর কিছু বলতে হয় না। দুজনায় ইংরিজি করে কথা বললেও বুঝতে পারি।

তুমি মিথ্যুক। তোমায় আমি মারবো।

মার। মাব না যতো ইচ্ছে।

মালতীমাসি। আমার রুটি খিদে পেয়েছে। এতো দেবি হয়ে গেছে আমায় খেতে দিচ্ছো না কেন?

আপাতত এই কটি পর্বে, রান্নাঘরে উপস্থিতির একটা সম্মানজনক কারণ থাকবে।

মালতী বলে, ও বাবা! এ যে ভূতের মুখে রামনাম। নিজেই তো মা না এলে খেতে চাও না। এসো তালে। দিচ্ছি।

*　　　　*　　　　*

থিয়েটার হল থেকে বেবিয়ে এসে তনিমা অলককে বলে, দেখলে তো? তোমায় বলিনি, বড়দি বলেছিল নাটকটা দারুণ!

অলক বলে, তা দেখলাম অবশ্য। তবে বাড়ি ফিরে কী নিদারুণ নাটক দেখতে হবে তাই ভাবছি। হয়তো দেখা যাবে তোমার মালতীতে আর বুতানেতে কোনও একটা উপলক্ষে খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেছে।

ভয় পাইয়ে দিয়ো না বাপু। বেশ ছিলাম এতক্ষণ। এই একটা ট্যাক্সি দ্যাখো না গো।

ট্যাক্সি! বাস পেয়ে যাব না?

এখন আর লোকের সঙ্গে গাদাগাদি করে বাসে চড়তে ইচ্ছে করছে না। ভয় নেই, তোমার পকেট ভাঙবো না। আজ আমি তোমায় গাড়ি চড়াই।

দেখি। ট্যাক্সি পেলে! এ সময়—

ওই তো। আগে থেকেই 'নেতিবাচক উক্তি।' সত্যি এত ইয়ে তুমি! জামাইবাবুকে দেখেছ? এখনো এ বয়সে সব বিষয়ে কী এনার্জি।

পকেটে এনার্জির রসদ থাকলে সবাই এনার্জিদার হতে পারে।

সেটা মজুত রাখতে—অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় মশাই! শুধু অফিসটি আর বাড়িটি ছাড়া আর কিছু তো জানলে না—ওই ওই তো, এই ট্যাক্সি!

*　　　　*　　　　*

গুছিয়ে বসে তনিমা বলে, জানো, তোমার কন্যা তোমায় খুব হ্যানস্তা করছিল!

অলক বললো, খুবই স্বাভাবিক। শিশু অনুকরণপ্রিয়।

আহা। ইস। তুমি না এমন একখানা!

এখন সদ্য একটি ভালো নাটক দেখে আসার আবেশে দুজনে কাছাকাছি বসে নিভৃত কথোপকথন করতে করতে পথচলার সুখস্বাদ, তাই মেজাজের পারা নীচের দিকে।

বলছিলো কী জানো? ওর ক্লাশের সব মেয়ের বাপীর গাড়ি আছে, শুধু ওর বুদ্ধু বাপীটারই গাড়ি কিনতে ইচ্ছে হয় না।

অলক মৃদু হেসে বলে, শুধু এই? এরপর আরো কত বলবে।

আহা বাচ্চা তো। অন্যের দেখে সাধ হয়।

সেটা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হয়।

তনিমা অলকের গায়ের ওপর একটু এলিয়ে পড়ে বলে, বাদে তুমি! তবে সত্যি বাপু গাড়ি একখানা থাকা মানে হাতে স্বর্গের টিকিট থাকা। এই তো দ্যাখো না, গাড়ি থাকলে অনায়াসেই বুতানটাকে নিয়ে আসা যেতো। একা রেখে আসতে হতো না।

এই নাটক দেখতে? বুতানকে?

আহা নাটকের ও কী বুঝতো? মা বাপীর সঙ্গে এলাম, সেটাই আমোদ। আর সত্যি বলতে মালতীর কাছে একা রেখে আসা! ওটি যে 'কী' তোমায় বলে বোঝানো যাবে না। বুতানের সঙ্গে যা রেষারেষি আর চোটপাট করে! এক একদিন তো যা শুনি বুতানের কাছে রাগে মাথা জ্বলে যায়। অথচ বেশি বকাবকির উপায় নেই। তক্ষুনি ঠিকরে উঠে বলবে, 'না পোষায় ছেড়ে দিন।' তখন মনের রাগ মনে চেপে আবার দেঁতো হাসি হেসে তোয়াজ করতে হয়। তোর মেজাজ এমন মিলিটারি কেনরে? গত জন্মে লড়ুয়ে ছিলি বোধহয়। এই সব বলে। উপায় কী। সহজে লোক মিলবে? তাছাড়া একটা গুণ, চোর ছ্যাঁচোড় নয়। এই যা।

সেটাও কম নয়, বলে অলক মালতী প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে বলে, ভাবছি সামনের শনিবারে একবাব শ্যামনগরে চলে গেলে হয়।

হ্যাঁ আজকাল এই ভাষাতেই ইচ্ছে ব্যক্ত করে অলক। আগে আগে তো বলতো, সামনের শনিবারে মার কাছে যাবো ভাবছি। একদিন বড়শালির সামনে বড় অপদস্থ হতে হয়েছিল। শালি বলছিলেন তোরা কী কুনো বাবা। সাতজন্মে একবার বেড়াতে আসতে পারিস না। বুঝলাম দুজনেই অফিসের বাবু তবু রবিবারগুলো কী করিস? শুধু ঘুমিয়ে কাটাস? সঙ্গে সঙ্গে তনিমা বলে উঠেছিল, আর বলিস না বড়দি, শনিবার এলো কী, এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটি 'মা যাবো—' বলে হেদিয়ে পড়বেন। বাস! রবিবারটি খতম।

তদবধিই, ভাষাটার বদল হয়ে গেছে।

'শ্যামনগরে ঘুরে এলে হয়।'

তনিমা চকিত হয়ে বললো, কেন? কোনো ইয়ে—অসুখটসুখের খবর পেয়েছ নাকি?

খবর আর কোথা থেকে পাবো? চিঠিপত্র তো—খবর পাইনি বলেই—

কেন তোমার সেই শ্যামনগরের ডেলিপ্যাসেঞ্জার পরেশবাবু?

তিনি তো ছমাস হলো রিটায়ার করেছেন।

ও। তাই বুঝি।

তনিমা একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে, আমারও তো একবার যেতে ইচ্ছে করে। বুতানটাও তো এতদিন তার ঠামাকে দেখেনি।

অলক একটু চমকায়। এ আবার কী ভূতের মুখে রামনাম? নাকি একটু সৌজন্যের স্টান্ট? নাকি অন্য কিছু? তবু আস্তে আলগা ভাবে বলে, গেলে মা দারুণ খুশি হবেন?

তা তনিমার মধ্যে একটু অন্য কিছু আছে বইকি। তার বিশ্বাস নিজে একবার গিয়ে পড়ে,

নিজেদের বহুবিধ অসুবিধের কথা ফেঁদে আর যুক্তির জাল ফেলে, সেই অবুঝ জেদি মহিলাটিকে কবজা করে নিয়ে বাড়িটা বিক্রি করানোয় রাজি করে ফেলতে পারে। ওই উনি একটি সই না ঝাড়লে তো অলকের কিছু করার নেই। তাই তনিমার এই সাধু সংকল্প!

তবে তখনি কী ভেবে বলে উঠলো, আচ্ছা—রবিবার সকালে গিয়ে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসা যায়, এমন কোনো গাড়ি নেই? বাসেও তো যাওয়া যায় তাই না?

অলক ঈষৎ গম্ভীর হয়, সকালে গিয়ে সন্ধেয় ফেরা? সে যাওয়ার আর মানে কী? মার তো জানাও থাকবে না। আমাদের খাওয়া দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কথা বলার সময়ই থাকবে না। আমি একা যাই, তাতেও ব্যস্ত হয়ে যান। যা কিছু কথা ওই শনিবার রাতটুকুই।

এত ব্যস্ত হবার কী আছে? আমরা তো আর কুটুম নই?

অলকের মুখে আসছিল, 'আপাতত, তো তাই'। সেটা সামলে নিল। যত নিরাপদে থাকা যায়। বললো, সেকথা কে বোঝাবে?

কিন্তু রাতে থাকাও তো একটা মস্ত প্রবলেম। এখানে তাহলে মালতীকে একা বাড়িতে রেখে যেতে হয়।

অলক মানলো। বললো তা বটে। ভয় পেতে পারে।

ভয়?

তনিমা ব্যঙ্গে তীব্র হয়, ওই মেয়ের ভয়? ভয় পাবার মেয়েই বটে। জাঁহাবাজের রাজা একখানি।

তবে আর কী? তুমি তো বলো, খুব বিশ্বাসী।

তা ঠিক। আস্পদ্দাবাজরা বড় চোর ছ্যাঁচোড় হয় না। তনিমা গলার স্বর খাদে নামায়। অন্য অবিশ্বাস আছে। সুযোগ পেয়ে একা বাড়িতে—ভাব ভালোবাসার লোক এনে ঢোকাবে না, তার গ্যারান্টি কী?

আঃ। কী যে বলো।

আহা গো! যেন এই মাত্তর পৃথিবীতে পড়লে। হয় না এমন?

অলক গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু হঠাৎ একঘণ্টার নোটিশে ভালোবাসার লোক জোটানো একটু বেশি কল্পনা নয়?

তনিমা ঝুনো গলায় বলে, ওহে মশাই, যা ভাবো তা নয়। আছে 'একটি'। খুকুকে বলে রাখি তো আমরা যখন বাড়ি থাকি না, তখন মালতীমাসি কী করে কোথাও বেরিয়ে যায় কিনা, ওর কাছে কেউ এসে কথা বলে কিনা নজর রাখিস।...তো মেয়েটি তোমার কম ওস্তাদ নয়। ওই তো চুপি চুপি বলেছে, এক একদিন মালতীমাসি জানলা দিয়ে একটা বিচ্ছিরি মতন লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে।

অলক তিক্ত গলায় বলে, তার মানে বুতানকে একটি স্পাই করে তোলা হচ্ছে।

ওঃ। ভারী নীতিবাগীশ এলেন।...কিছুক্ষণ আগের সেই সুখস্বাদ আর থাকল না, তনিমা যথা স্বভাব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তুমি আমি দুজনেই তো বেলা নটার মধ্যে বেরিয়ে যাই। খুকুটা সাড়ে দশটার সময় এসে যায়, তাই ওকে নজর রাখতে বলবো না তো কাকে বলবো? চোর বদমাশ কার সঙ্গে কী পরামর্শ করবে ঠিক কী? পেয়ারের লোক হলে তো আরো বিপদ। তোমায় তো আর কোনো জ্বালা পোহাতে হয় না। মহাপুরুষ হওয়া শক্ত কী? আমার যা জ্বালা। কাঁটাতারের

ওপর দিয়ে হাঁটা। দেখছ কী উদ্ধত ভঙ্গি! আমার সঙ্গে কথা কয়, কী তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে! জেরাও করিনি কিছুই নয় 'কে এসেছিল রে?' জিজ্ঞেস করতেই কী ঝঙ্কার। বলে কিনা 'গরিব বলে কী আমাদের একটা মামা কাকা থাকতে নাই? তাও তো আপনার 'সন্দ' বাতিকের তরে জানলা থেকে কথা বলেই বিদেয় দিই। বাড়ির মধ্যে ঢোকাই না। ও বাড়িতে থাকতে মাসিমা নিজে ডেকে, বসতে বলেছে, চা জল খাবার দিতে বলেছে। মাসিমা বলেছে আহা! কাকা বলে কথা।' আপনার বাড়ির মতো এমন ওঁচা বাড়ি আর দেখি নাই।

বোঝো? এও আমায় সয়ে যেতে হয়েছে। তক্ষুনি ইচ্ছে হলো দূর করে দিই। কিন্তু কী করবো? ওকে ছাড়ালে নিজেও চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকতে হয়। তাই ওই একখানি সর্বদা ফণা উচনো কেউটেকেই পরম পূজ্যি করে থাকতে হয়।

অলক কি চেঁচিয়ে উঠে বলবে, 'অথচ সত্যিকার পূজনীয়কে 'পূজ্যি' করে চলতে তোমার মানে বাঁধে! অথচ যাতে সব সমস্যার সমাধান আছে।' নাকি চেঁচিয়ে উঠবে। তবু ওই কালকেউটেব হাতেই জীবনের যথাসর্বস্ব সর্বস্বের সারকে ছেড়ে রেখে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকা হয়? ওই একটা অজ্ঞাত-কুলশীল কোথাকার কোন গ্রামের চাষিবাসি ঘরের মেয়ে, পরিচয়ের মধ্যে পাশের বাড়ির কাজের লোকের দেশের মেয়ে। শুধু এই। তবু তার হাতেই—

কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলেই তো হয় না? জবাবটা মাথায় রাখতে হবে না? তক্ষুনি শুনতে হবে না, এমন ঘটনা বুঝি অলক জীবনে এই প্রথম দেখছে? 'আর কারো সংসারে দ্যাখোনি এমন? একটা ফ্রকপরা খুকির হাতে সমগ্র সংসার আর বাচ্চার ভার ফেলে রেখে দুজনে সারাদিন বাইরে থাকছে দেখনি!'

অতএব চেঁচিয়ে ওঠা হয় না।

এযুগে পুরুষের কণ্ঠস্বর জোর হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে।

নীরবতাই নিশ্চিন্ততা।

গাড়ি বাড়ির মোড়ের কাছে এসে গেছে।

তনিমা বলে উঠল, এই শোনো, তুমি এইখানটায় নেমে পড়ে রাস্তায় দুমিনিট দাঁড়িয়ে থাকো, আমি আগে বাড়ি ঢুকবো। তুমি তারপর—

অলক অবাক হয়ে তাকালো।

তনিমা ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে বললো, তোমায় বলা হয়নি বুতানকে বলে এসেছি, ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাতে যাচ্ছি। দুজনে একসঙ্গে ফিরলে সন্দেহ করবে।

অলক স্তব্ধ হয়ে গিয়ে, পাথরের গলায় বলে, এতক্ষণ ডাক্তারের কাছে!

ওঃ সে যা হোক একটা বানিয়ে ফেলা যাবে। তোমার ওই মেয়েটির জন্য গল্প বানাতে বানাতে গল্প লিখিয়ে হয়ে যাচ্ছি। কীভাবে যে সবদিক বজায় রেখে ম্যানেজ করে চালাতে হয়, আমিই জানি।

অলক আরো স্থির গলায় বলে, আর আমি? আমি তাহলে এতক্ষণ কোথায় ছিলাম?

এবার ঝঙ্কারের পালা।

আহা তোমার আবার নতুন কী? অফিসের কাজে ফিরতে রাত দুপুর হয় না কোনো কোনো দিন? এই যে ভাই, গাড়িটা একটু থামিয়ে—ইনি এখানে নেমে যাবেন! আমি আর একটুখানি—

অলক নিঃশব্দে নেমে পড়ে।

এখানেই কি চেঁচিয়ে ওঠা সম্ভব! সম্ভবের মধ্যে শুধু একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তায় পায়চারি করা।

আর ভাবা—

মাকড়সা নিজেকে ঘিরে ঘিরে জাল রচনা করে বোধহয় আপন শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়।

হঠাৎ খেয়াল হলো, গোটা তিনেক সিগারেট ধ্বংস করা হয়ে গেছে। বুতানটা ঘুমিয়ে পড়লো না তো? এখন দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো। দরজার ওপর দেহটাকে প্রায় সমর্পণ করে ডোরবেলটা বাজালো। শব্দটা কি বড় বেশি জোরে হলো?

দরজা খুলে দিতে এলো মালতী নয়, তনিমা।

ওই ঘণ্টিটার মতোই ঝনঝনে গলায় বলে উঠলো, উঃ। এতক্ষণে আসা হলো! এতক্ষণ কে তোমার জন্যে অফিসের দরজা খুলে রাখে বলো তো? আশ্চর্য!

আর সঙ্গে সঙ্গে বুতানের আরো তীক্ষ্ণ স্বর তীব্র হয়ে আছড়ে পড়লো, মালতীমাসি! এই মালতীমাসি! এই তো বাপী এতক্ষণে আপিস থেকে এলো। বলা হচ্ছিলো কিনা—'মা ডাক্তারখানায় গেছে না কচু। মা তো থিয়েটার দেখতে গেছে। তোর বাপী আপিস থেকে সেখানে আসবে। দুজনে থিয়েটার দেখবে। মিথ্যুক। মিথ্যুকের রাজা! তোমায় আমি গুম গুম করে কিল মারবো। তোমার মুণ্ডু ভেঙে দেবো! তোমার চুল কেটে নেবো। তোমার চোখে লংকা দিয়ে দেবো। তোমায় তোমায় তোমায় মেরে ফেলবো।

একটু ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ শিশুচিত্তের অসহায়তার যন্ত্রণা আর দুর্বল মুহূর্তে বিরোধী পক্ষের কাছেই শরণ নিতে বাধ্য হওয়ার গ্লানি, এই একটা উপলক্ষ পেয়ে ফেটে পড়ে।

আর অন্য একটা চিত্র, সবদিক বজায় রেখে ম্যানেজ করে ফেলার কৃতিত্বে পুলকিত হয়ে বলে ওঠে, আঃ বুতান। কী পাগলামি হচ্ছে? মালতীমাসি তোমায় খেপাচ্ছিল বুঝতে পারোনি? একের নম্বরের বোকাটা!

বিমল মিত্র

মানুষের সংসারে কত চরিত্রই যে দেখলাম। এক-একটা মানুষ দেখেছি, আর একটি মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দ পেয়েছি। পৃথিবীতে সব মানুষ সব কিছু পায় না, সেজন্যে আমার অভাববোধ হয়ত আছে, কিন্তু অভিযোগ নেই। আমি গোয়াবাগানের মেসে সুধা সেনকে দেখেছি, বিলাসপুরে বানী-বিদ্যায়তনে প্রমীলা সরকারকে দেখেছি, দেখেছি রানী দে, রুণু রায়, লিলি পালিতকে। দেখেছি মিসেস সুজাতা স্বামীনাথনকে জব্বলপুরের শিয়ালকোট লজ-এ। আরো দেখেছি নীলনেশার রায়সাহেবকে, প্রফেসরপত্নী কণিকা দেবীকে। আর আরো দেখেছি সবজি বাগানের সুরুচি আর সদানন্দবাবুকে। ওদের সকলকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছি—কিন্তু আরো কতজনকে নিয়ে যে আমার আজো লেখা হয়নি তাও তো বলে শেষ করা যায় না।

এই যেমন আজকেব রানীসাহেবা—

রানীসাহেবাকে আজ এতদিন পবে আবার—! বেহারের এই দুর্গম পল্লীতে রানীসাহেবার একদিন দুদিনেব নয়, সুদীর্ঘ পঁচিশ-তিরিশ বছরেব সম্পর্ক। মনে হলো, ভবিষ্যতে যদি কাউকে নিয়ে গল্প লিখি তা সে এই রানীসাহেবাকে নিয়েই লেখা উচিত।

সেই পাঁচশো মাইল দূর থেকে আমরা এসেছি। লাহেড়িয়া সরাইতে নেমে মোটরে তিরিশ মাইলের রাস্তা। মৃণালিনীর বিয়ে—রানীসাহেবার একমাত্র মেয়ে মৃণালিনী। অনেকদিন পরে যখন প্রথমে সন্তান হলো, গোকুল জিগ্যেস করেছিল—কী নাম রাখা যায় রে মেয়ের—

তখন সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কবছি। নাম দিয়েছিলাম—শকুন্তলা—

কিন্তু সে নাম টেকেনি। শেষ পর্যন্ত মার ইচ্ছের কাছে বাবার ইচ্ছেকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সেই নামের ব্যাপাবেই শুধু নয়। গোকুল যখন নামে-প্রতিভায়-প্রতিষ্ঠায় বড় হলো, রায়সাহেব হলো, তখনও কঠোর হাতে পেছন থেকে যে মানুষটি শাসন করতো, সে মৃণালিনীর বাবা নয়, তার মা—আজকের এই রানীসাহেবা। কত সম্বর্ধনা সভায় উঠে বক্তৃতায় বলেছে গোকুল—আমার উন্নতির মূলে বয়েছেন আমার স্ত্রী—তিনি আমায় দিয়েছেন তাঁর একনিষ্ঠ ভালোবাসা, তাঁর সেবা, তাঁর যত্ন, তাবর ঐকান্তিকতা—

সত্যি সত্যি বিয়ের আগে কী ছিল গোকুল আর পরে কীই না হয়েছিল। এ তো যুদ্ধের হিড়িকে ফুলে-ফেঁপে বড়লোক হওয়া নয়, ধাপে ধাপে কেবল উঠেছে গোকুল, শুধু আরো বড় ধাপে ওঠবার জন্যেই। চেম্বার অব কমার্স, এম এল এ, সেনেট সভা, স্বদেশ-বিদেশ সমস্ত জুড়ে মরবার শেষ দিনটি পর্যন্ত কেবল সাফল্য আর সাফল্য। যাতে হাত দিয়েছে, তাতেই লাভ। সমস্তর মূলে নাকি গোকুলের স্ত্রী। ওর স্ত্রীর ভালোবাসা।

আমি শুনতাম। কিন্তু ভেবে পেতাম না, শুনে হাসবো না কাঁদবো।

কিন্তু সেসব কথা এখন থাক।

কলকাতা থেকে পাঁচশো মাইল দূরে বেহারের এই দুর্গম পল্লীতে রানীসাহেবার মেয়ের বিয়েতে এসে যদি সেদিনকার সব কথা, সব ইতিহাস মনে পড়ে যায়, তো মনকে দোষ দিই কী

করে। বিরাট বাড়ি। ঠিক বাড়ি নয়, প্রাসাদই বটে। শুনলাম, সাতানব্বই বিঘের ওপর বাড়িখানা। কিন্তু সকাল থেকে যে ব্যাপার চলছে, তাকে কে বলবে দেখে যে বিয়ে আজকে নয়। আমরা যাঁরা অতিথি, তাঁদের আদর-আপ্যায়নের আয়োজন চূড়ান্ত। দশখানা গ্রামের হাজার হাজার প্রজা সকাল থেকে পাতা পেড়েছে। লাড্ডু পেড়া, গুলজামুন, বালুসাই, পুরি, বরফির ছড়াছড়ি চারিদিকে। মুন্সীজী এক-একবার এসে খবর নিয়ে যায় সকলের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না।

পরের দিন যখন বর এল, কখন বিয়ে হলো ভিড়ের মধ্যে কিছু দেখাই গেল না। তবু দেখবার চেষ্টা করেছিলাম বৈকি। রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, তার স্বামীকে দেখবার ইচ্ছে ছিলই। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

বিয়ের পরদিন মুন্সীজীকে বললাম—একবার রানীসাহেবার সঙ্গে দেখা করতে পারা যায় না—

মুন্সী হয়ত প্রথমে অবাক হয়েছিল। কিন্তু চেষ্টা করবে বলে শেষ পর্যন্ত অন্দর মহলে খবর পাঠালে। খবর যেতে আসতে তাও প্রায় একঘণ্টা লাগলো। সত্যিই তো বিয়েবাড়ি—সবাই ব্যস্ত। এখন একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে কার-ই বা অবসর হবে। কিন্তু তা নয়। মুন্সীজী বললে—না হুঁজুর, রানীসাহেবার কড়া হুকুম আছে, পুরুষমানুষ কেউ যেন অন্দর মহলে না ঢোকে—

মুন্সীজীর কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তা পরেই টের পেলাম। সদর আর অন্দরের মাঝামাঝি একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালো মুন্সীজী। দক্ষিণ দিকে একটিমাত্র দরজা। দরজার ওপাশেই অন্দরের সীমানা। দরজার পর্দা খাটানো। ঘোমটা দিয়ে একজন ঝি এসে দাঁড়ালো দু ঘরের মাঝখানে।

মুন্সীজী আমায় ইঙ্গিত করলে—রানীসাহেবা এসেছেন—যা বলবার শিগগির বলে দিন।

এমন অবস্থার জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। এমন দিনও গেছে, যেদিন রানীসাহেবার সামনা-সামনি বসে কথা বলেছি। আজ হঠাৎ এতদিন পরে বাঙলাদেশ ছেড়ে এসে বেহারের এই জমিদারিতে বসে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বিগত স্বামীর বৃদ্ধ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে এই সঙ্কোচ, এই আয়োজন এ আমার পছন্দ হলো না। এমন জানলে আমিই কি এমন প্রস্তাব করতাম। নিজেকে যেন অপমানিত মনে করলাম। রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের বিধবা স্ত্রীর অগাধ সম্পত্তি থাকতে পারে—কিন্তু আমরা দুজনে এক সময় তো ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলাম। সে-বন্ধুত্বের দাবিও কি কিছুই নয়।

মৃণালিনীর বিয়েতে দেবার জন্য কলকাতা থেকে একটা শাড়ি এনেছিলাম। সেখানা মুন্সীজীর হাতে দিয়ে বললাম—না, আমার কিছু কথা বলবার নেই—এইটে রানীসাহেবাকে দিয়ে দিয়ো—

বলে আর কালক্ষেপ না করে সোজা বাইরে চলে এলাম। তখুনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে নিয়ে স্টেশনে রওনা দিলাম। আজ অবশ্য গোকুল বেঁচে থাকলে এমন ঘটনা ঘটত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে এখানে কিসের টানে এত দূরদেশে এসেছিলাম, তাই ভেবেই নিজের মনকে ধিক্কার দিলাম। কে রানীসাহেবা! কোথাকার রানী! আমার কে তারা? মনে পড়তে লাগলো গোকুলের কথাগুলো। অর্থের অভাব গোকুলের কখনও অবশ্য হয়নি। বিয়ের পর থেকেই বৃহস্পতি তুঙ্গী হয়েছিল ওর জীবনে। ধনে, মানে, প্রতিষ্ঠায় বন্ধুদের মধ্যে আর কে অমন সাফল্যের সপ্তম স্বর্গে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু অমন হতভাগ্যও আমি জীবনে তো কম দেখেছি।

কোন মহিলা সভার সম্পাদিকা একবার চাঁদার খাতা নিয়ে এসেছিলেন গোকুলের বাড়িতে। ধনবান গোকুলের কৃপাপ্রার্থী তারা। বাইরের ঘরে চেয়ারে বসিয়ে গোকুল কথা বলছিল, এমন সময় ভেতরের পরদা ঠেলে এই রানীসাহেবা বেরিয়ে এসেছিলেন।

ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—বের করে দাও এঁকে—এখুনি বের করে দাও—

গোকুল যতখানি স্তম্ভিত, তার চেয়ে বেশি স্তম্ভিত মহিলা সভার সম্পাদিকা।

রানীসাহেবা বলেছিলেন—তুমি যদি বের করে না দাও, আমারও বের করে দেবার অধিকার আছে—দারোয়ান—দারোয়ান—

চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন রানীসাহেবা। ঘরের মধ্যে আরো দুজন ভদ্রলোক, একজন টাইপিস্ট, আশেপাশে চাকর, দারোয়ান, ঝি, ঠাকুর। কারোর দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কলকাতার ধনীসমাজে সবেমাত্র প্রভাব-প্রতিপত্তি শুরু হয়েছে গোকুলের। বৌবাজারে ছোট দোতলা বাড়িটা ছেড়ে লেক রোডের চারতলা বাড়িটা সবে তুলেছে। হাওড়ার দু দুটো জুট মিল চলছে, আবার সেই সঙ্গে গিরিডির একটা অভ্রখনি সবে কিনেছে। ওদিকে কাউন্সিলের ইলেকশনে দাঁড়াবে কিনা ভাবছে—অবস্থাটা এই রকম। মোটকথা সেদিনকার সেই ঘটনাটা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অপমানজনক। কোনও সূত্রে প্রকাশ্যে বাইরের ঘরে তাঁর আসবার কথাও নয়।

দারোয়ান এখনি এসে যাবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন স্ত্রীর আচরণে হতবাকও বটে, ক্ষুব্ধও বটে। গোকুল উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু কাকে সে নিবারণ করবে। স্ত্রীর মুখের ওপর কথা বলার সাহস আর যারই থাক গোকুলের নেই।

সম্পাদিকা পর্দানশিনা নন। দশ রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় অভিজ্ঞতা আছে, ব্যাপারটা বুঝলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা আমি এখন উঠি তা হলে স্যার-—একদিন সময়মতো আপনার অফিসে দেখা করবো বরং—

বাঘের মতন লাফিয়ে উঠলেন স্ত্রী।

—তা তো করবেনই—কিন্তু খবরদার বলছি, ও হাসি আমি চিনি—হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে এলোখোঁপা দুলিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগে জানি—আরো ভালো লাগে যদি সে মানুষটি দেখতে ভালো হয়, লক্ষ টাকার মালিক হয়—চাঁদা চাইবার নাম করে ... ছি ছি ... পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি—

আঃ কি হচ্ছে মিন্টু—ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে গোকুল।

—তুমি থামো দিকি—আমি না থাকলে কবে তুমি এদের পাল্লায় পড়ে মারা যেতে—ছি ছি! তোমাকে আমি দোষ দিই না—কিন্তু সংসারে এমন সরল হলে কি করে চলবে—

মহিলাটি তখন এক ফাঁকে সরে পড়েছেন।

কিন্তু পরদিন থেকে ব্যবস্থা হলো অন্যরকম। গোকুলের ড্রাইভারের পাশে দিবারাত্র আর একজনকে দেখা যেতে লাগলো।

গোকুল মোটরে যেতে যেতে জিগ্যেস করল—তোর পাশে ও কে রে যজ্ঞেশ্বর?

যজ্ঞেশ্বর পুরোনো ড্রাইভার। বললে—আজ্ঞে, চিন্তার বড় ভাই—

গোকুলকে মোটরে উঠবার সময়ে নমস্কার করেছিল একবার। মনে পড়ল এখন। লোকটা আর একবার পেছন ফিরে নমস্কার করলে। বললে—আমার নাম হরিশ আজ্ঞে, চিন্তা আমার ছোট বোন হয় আজ্ঞে—

স্ত্রীর ডান হাত চিন্তা। সেই চিন্তার বড় ভাই।

অফিসে ঢুকে বসেছে গোকুল। কাজ করছে। মাঝে মাঝে অকারণে হরিশ ঘরের ভেতর উঁকি মারে।

—কিছু দরকার আছে?

উত্তর দেয় না হরিশ। টুপ করে মাথাটা সরিয়ে নেয়।

এক একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে ইচ্ছে হয় একবার সিনেমায় যায়। কিন্তু স্ত্রীর কড়া বারণ আছে ওতে। সিনেমা মানেই তো ওই। দেয়ালে দেয়ালে প্ল্যাকার্ডগুলো দ্যাখো না। বাইরে যার ওই, ভেতরে যা আছে তা কল্পনা করে নাও। আগে না বলে কয়ে কয়েকদিন ঢুকেছে ভেতরে। মাথাটা যেন ঠান্ডা হয়ে যায় বেশ। কিন্তু হরিশ আসার পর থেকে কেমন যেন সঙ্কোচ হয় গোকুলের।

স্ত্রী বলেন—কেন, গাড়িতে হরিশ থাকা তো ভালো, রাস্তাঘাটে কত রকম বিপদ-আপদ আছে, দেশে ধর্মঘট তো রোজ লেগেই রয়েছে—তোমার সুবিধের জন্যেই তো রাখা—

যত কাজই থাক রাত আটটার পর গোকুলের আর বাইরে থাকবার হুকুম নেই। একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকতে হবে। সে-নিয়ম যেমন কঠোর তেমনি অমোঘ।

স্ত্রী বলেছেন—রাত্রিবেলা বেলায় যারা ব্যবসা চালায় তাদের বলে বেশ্যা- অমন পয়সার দরকার নেই আমার-—একবেলা খাবো, ভিক্ষে করে পেট চালাবো তাও ভালো—তবু—

গোকুল বলেছে-—না ভাই, ও-সব জিনিস তর্ক করবার নয়—ও যা চায় না তেমন কাজ নাই বা করলাম—

স্ত্রীর মতেই চলেছে গোকুল সারা জীবন, স্ত্রী পরামর্শ মতই কাজ করেছে। একটা পয়সা কাউকে চাঁদা বা ধার দিতে গেলে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তবে দিয়েছে। বাড়িতে এসে সারাদিন কোথায় কোথায় গিয়েছে কার কার সঙ্গে দেখা করেছে বা দেখা হয়েছে সমস্ত সবিস্তারে বলেছে স্ত্রীকে—। টাকা, পয়সা, আধলা পাইটি পর্যন্ত স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তবে ছাড়া পেয়েছে।

একবার খুব অসহ্য হওয়াতে ডাক্তার সেনগুপ্তের কাছেও গিয়েছিল।

গোকুল সমস্ত খুলেই বলেছিল—দেখুন আমার স্ত্রী আমাকে বড় সন্দেহ করেন—সন্দেহ মানে তিনি মনে করেন আমাকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে বিশ্ব-সংসারের সমস্ত নারীজাতি বুঝি উন্মুখ হয়ে আছে—আমার মতো সুপুরুষ কলকাতা শহরে আর দ্বিতীয়টি নেই—এ রোগের কী চিকিৎসা বলুন তো—

—ছেলেপুলে হয়েছে আপনার? ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—না।

ছেলেপুলে হলেই সেরে যাবে—কিছু ভাববেন না—যাতে ছেলে হয় বরং সেই চিকিৎসা করান—সে-চিকিৎসা করাতে হয়নি শেষ পর্যন্ত। কারণ কয়েক বছর পরেই মেয়ে হলো গোকুলের। মেয়ে হবার পর একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—এখন কেমন চলছে গোকুল—ব্যাধি কমেছে।

—না ভাই, আরো বেড়েছে—গোকুল ম্রিয়মাণ হয়ে জবাব দিলে।

—সে কি?

আমার কিন্তু বরাবর মনে হতো গোকুল হয়ত ঠিক সত্যি কথা বলে না। কোথায় যেন

একটা গর্ববোধ আছে মনের ভেতরে। অন্যের স্ত্রীরা যেন ওর স্ত্রীর তুলনায় কম সতীসাধ্বী; কম পতিপ্রাণা। ওর মনে হতো ওর উন্নতির মূলে আছে ওর স্ত্রীর একনিষ্ঠতা। বুঝি ওর স্ত্রীর কল্যাণেই ওর সমস্তিপুরের একটা সুগার মিল, হাওড়ার দুটো জুট মিল, ওর রায়সাহেব উপাধি, ওর কলকাতার সাতখানা বাড়ি, লাহেড়িয়াসরাইয়ের জমিদারি—সব।

যা হোক—সেই গোকুল মিত্তির—লেট রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের মেয়ে মৃণালিনীর বিয়ের নিমন্ত্রণে না বলতে পারিনি। পুরোনো বন্ধুত্বের টানে পাঁচশো মাইল দূর থেকে এই বয়সে এই পল্লীগ্রামে এসেছি। কিন্তু স্টেশনের ওয়েটিংরুমের মধ্যে চুপচাপ বসে বসে মনে হলো আমি না এলেই বা কে কী মনে করতো! কার কী ক্ষতি হতো।

এখনো ট্রেন আসতে দু ঘণ্টা দেরি।

হঠাৎ মুন্সীজী শশব্যস্তে ঘরে ঢুকলো।

বললে—রানীসাহেবা পাঠিয়ে দিলেন আমাকে—আপনি চলে যাবেন না—এই চিঠিটা রানীসাহেবা পাঠিয়েছেন আমার হাতে—

মনে হলো বলি—রানীসাহেবা তোমাদের রানীসাহেবা, আমার কে। কিন্তু নিজেকে শান্ত করে চিঠিটা পড়লাম। অনেক অনুনয় করে লিখেছেন—'আপনি এমন রাগ করে চলে গেলে মিনুর অকল্যাণ হবে। বর-কনে চলে যায়নি এখনও। অতিথি দেবতার সমান। আপনার সঙ্গে আমারও কিছু কথা ছিল —মেয়ের বিয়ের পর বলবো ইচ্ছে ছিল। এ সুযোগ হয়ত আর পাবো না—দয়া করে ফিরে আসবেন—আমার মান রাখবেন—'

রানীসাহেবার মোটরে করে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই আবার ফিরে আসতে হলো।

বিদায়ের সময় ভালো করে বরকে দেখলাম। শুনলাম মতিহারীর লোক। ওখানেই ওদের জমিদারি। রানীসাহেবার চেয়েও বড় জমিদার ওরা। ছেলের বয়েস যেন মৃণালিনীর চেয়ে কমই মনে হলো। বিহারে তিন-চার পুরুষের বাস। এখানে থাকতে থাকতে চেহারায় পুরোপুরি বিহারী হয়ে গেছে। পাশে মৃণালিনীর বিরাট ঘোমটা—তাও যেন কেমন অবাক লাগলো। 'সুনীতি-শিক্ষা-সদন' থেকে আই এ পাশ করেনি বটে, কিন্তু কিছুদিন তো সেকেন্ড ইয়ার ক্লাশ করেছিল। সেই মেয়ে যাকে নিয়ে অত কাণ্ড সে-ই বা অমন অতখানি ঘোমটা কেমন করে দিতে পারলে।

বর-কনে চলে গেল। বিয়ের উৎসব কিন্তু তখনও এতটুকু কমেনি। গ্রামের হাজার হাজার লোক নাকি কদিন ধরে এমনি খাওয়া-দাওয়া কববে। রানীসাহেবার একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাদের হয়ত এই শেষ উৎসব।

সন্ধেবেলা রানীসাহেবা লিখে পাঠালেন—আজ রাত্রিটা আমায় ক্ষমা করবেন—আমার মন বড় খারাপ, কাল দিনের বেলার ট্রেনে যাবার বন্দোবস্ত করে দেব, এবং যদি সকালে আপনার অসুবিধে না হয়—সেই সময়ে সাক্ষাৎ হবে—

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক পুরোনো কথা মনে আসতে লাগলো—

পুরোনো বলে পুরোনো?

সে প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা। শুধু ঘটনা বললে ভুল বলা হবে। আমার জীবনে সে এক দুর্ঘটনাই বটে। আর রানীসাহেবা। কিন্তু তখন তো তিনি রানীসাহেবা হননি—তখন তিনি জামশেদপুরের আরতি রায়। সেকেন্ড ইয়ারের আর্টসের ছাত্রী।

গোকুল মিত্তিরের বিয়ের খবরটাও বন্ধুমহলে হঠাৎ শোনা গেল।

বরযাত্রীরা কলকাতা থেকে দল বেঁধে বরের সঙ্গে যাবে টাটানগরে.

আর আমি? আমি তখন কাকার বারো নম্বর সি-রোডের কোয়ার্টারে সামনের ঘরটায় ছুটি কাটাতে গেছি। হঠাৎ গোকুলের চিঠি পেলাম—তোর সামনের বাড়িতে বিয়ে করতে যাচ্ছি—তৈরি থাকিস—সদলবলে পরশু বিকেল বেলা হাজির হবো—

তখন নজরে পড়লো সত্যি সত্যি সামনের ষোলো নম্বরের বাগান ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে বটে। সামনের বাড়িতে যেন উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে এরই মধ্যে। সামনে দু-তিনটে মোটর, লোকজন—।

মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। সেদিনই একলা একলা অনেক রাত পর্যন্ত একখানা বই নিয়ে পড়ছিলাম। কাকা কাকিমা ভেতরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ অত্যন্ত মৃদুস্বরে দরজায় একটা টোকা পড়ল। তারপর আর একবার। উঠে র‍্যাপারটা ভালো করে গায়ে দিয়ে দরজাটা খুলে পর্দাটা সরাতেই বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছি!

সেই শীতের ঠান্ডা রাত—চারদিকে অন্ধকার— মনে হলো মানুষ নয় যেন পরী। বাইরের কুয়াশা, যেন পরী হয়ে ঘরের মধ্যে আগুন পোয়াতে এসেছে।

মেয়েটির কত বয়েস হবে। আঠাবো উনিশ। আমাব হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সে কী অঝোরে কান্না। এমন ঘটনায় বিভ্রান্ত না হয়ে কি উপায় আছে!

বললাম—কে আপনি—কী চান—

দু'কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে অনেকবার প্রশ্ন করলাম। আমার প্রশ্নে কান্না তার আরো করুণ হয়ে উঠলো। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না কী চায়, কেন এসেছে সে এত রাত্রে।

পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা, সব কথা মনে নেই আজ।

তবু কাঁদতে কাঁদতে সে রাত্রে মেয়েটি যা বলেছিল তা' যেমন অস্বাভাবিক তেমনি কৌতুকপ্রদ। ষোলো নম্বর সি-রোডের বাড়িতে যে ছেলেটি থাকে—তাকে আমার তখুনি ডেকে দিতে হবে। তার নাম নাকি বিকাশ। বাড়ির সামনে যে-ঘর, তার পুব দিকের জানালায় গিয়ে ডাকলেই সে আসবে। তার সঙ্গে সেই রাত্রে দেখা হওয়া মেয়েটির নাকি বিশেষ দরকার।

মেয়েটি বললে—আমি গেলে কেউ দেখতে পাবে—আপনি দয়া করে একবার বিকাশকে ডেকে আনুন—জিজ্ঞেস করলে বলবেন আরতি তাকে ডাকছে—আমি বিশেষ বিপদে পড়েছি—

আরতি বসলো আমারই বিছানায়।

আর আমি তার নির্দেশমতো অগত্যা সেই শীতের মধ্যে ডাকতে গেলাম ষোলো নম্বরের অজ্ঞাত-কুলশীল বিকাশকে। সেদিন ভারী রহস্যময় মনে হয়েছিল এই ঘটনা। বিকাশ যখন এল আরতির চোখে সে কী ব্যাকুল ভয়ার্ত আবেদন। বিকাশকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার কি কর্তব্য ভাবছিলাম, মেয়েটি বললে—আপনি দয়া করে বাইরে একটু বসুন—একটু কষ্ট দেব আপনাকে—

আমার ঘরের বিছানায় ওদের দু'জনকে বসিয়ে আমি নির্বোধের মতন বাইরে চলে এসে বারান্দার বেতের চেয়ারটায় বসলাম।

তারপর সেই শীতার্ত রাত কেমন করে কাটলো তা আজ আমার মনে থাকবার কথা নয়।

শুধু এতটুকু মনে আছে যে সমস্ত রাত ওদের ঘরের আলো জ্বলেছে আর আমি না-ঘুম না-জাগরণে সেই বেতের চেয়ারে বসে পলে পলে শীতে জমে বরফ হয়ে গেছি। তারপর কখন কাকার ওয়াল ক্লকটায় বারোটা বেজেছে, একটা বেজেছে, দুটো বেজেছে, তিনটেও বেজেছে—সব টের পেয়েছি। ঘরের ভেতরের টুকরো-টাকরা কথা, কান্নার আভাস বাইরে ভেসে এসেছে। পাশের চেরি গাছটার পাতা থেকে টপ টপ করে শিশির ঝড়ে পড়েছে সারা রাত। আমার গায়ে শুধু একটা পুল ওভার। জামশেদপুরের সেই কনকনে ঠান্ডা শীত সে পুল-ওভার কতটা আর আটকাতে পারে!

ভোর হবার আগে ওরা যখন বেরিয়ে যায়, আমার সঙ্গে কোনও কথা বলা বা ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। মনে আছে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে আমার প্রায় নটা বেজে গিয়েছিল।

কিন্তু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হওয়ার বুঝি তখনও আমার অনেক বাকি ছিল। বরযাত্রীর দলবল নিয়ে গোকুল এল বিয়ের দিন বিকেলে। কিন্তু বিয়ের আসরে বউ দেখতে গিয়ে আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল।

আরতি রায়। সেই রাত্রের আমার ঘরে আসা সেই মেয়েটি।

গোকুল বোধ হয় বউ দেখে খুশিই হয়েছিল। বরযাত্রী দলের সঙ্গে কলকাতায় চলে এলাম। কিন্তু নিজেব বিবেকের সঙ্গে যে বিবোধ সমস্ত মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছিল—তা কেমন করে চেপে বেখেছি সারাজীবন তা আমার অন্তরাত্মাই জানে।

বৌভাতের দিন বন্ধুরা এক-একটা উপহার তুলে দিয়েছে নববধূর হাতে। কারোর দিকে মুখ তুলে চায়নি নববধূ। আমি কিন্তু আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম সেদিন সেই সুযোগে। মনে হলো ধূতিব নরুন পাড়ের মতো সারা মুখে একটা বিষাদ, পাউডার আর স্নোর প্রান্তে আলতো ভাবে ঝুলছে। সেই বিষাদটুকুই নববধূর সমস্ত অবয়বে একটা অভিনব মাধুর্য এনে দিয়েছে যেন। সেদিন মনে হয়েছিল—আমিই কি ভুল করেছি না ও শুধু আমার নিজস্ব একটা ভাষ্য—যার পেছনে যে যুক্তি আছে তাও বুঝি আমার মনগড়া। অনেকবার মনের গোপন সংবাদটা বিশ্বস্ত বন্ধুদের বলি-বলি করেও বলা হয়নি। গোকুলকে বলা তো দূরের কথা।

পরে অনেকদিন গোকুল বলেছে—ভারি ইনটেলিজেন্ট—জানলি—কিন্তু তোর ওপর ওর খুব রাগ—কেন বল তো—

বলতাম—ব্যাচিলারদের ওপর বন্ধুর বউদের ওরকম একটু রাগ থাকে—

তারপর আস্তে আস্তে গোকুল বড়লোক হলো। অল্পবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকে ধনী—ধনী থেকে লক্ষপতি—সে ইতিহাস এখানে অবান্তর। কখনও কচিৎ কদাচিৎ দেখা হতো—আবার কখনও ঘন-ঘন। অতবড় ব্যবসাদার, নানান কাজের মানুষ কিন্তু বরাবর দেখে এসেছি রাত আটটার পর কখনও বাইরে থাকেনি।

বলেছে—না ভাই, ও-সব তর্ক করবার জিনিস নয়—ও যা চায় না তেমন কাজ নাই বা করলাম—

সম্বর্ধনাসভায় উঠে দাঁড়িয়ে গোকুল বলেছে—আমার এই উন্নতির মুলে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিচ্ছেন, সে সম্মান আমার প্রাপ্য নয়, অনেকখানিই প্রাপ্য আমার স্ত্রীর—আমি

অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি এমন স্ত্রী, এমন স্ত্রীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ভালোবাসা সেবা ও যত্ন না পেলে আমি জীবনে কিছুই করতে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংবাদপত্রে সে রিপোর্ট সবিস্তারে ছাপা হয়েছে। আমি পড়েছি। আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু নিজের কৌতূহল আর সেই রাত্রের গোপন ঘটনাটির কথা মারণমন্ত্রের মতো বুকে পুষে রেখে নিজের মনেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। বহুদিন পরে একবার টাটানগরে গিয়েছিলাম। সেই অজ্ঞাতকুলশীল বিকাশের খোঁজও করেছিলাম। কাকার বাড়ি সি রোড থেকে তখন এফ রোডে হয়েছে। কিন্তু জীবনে অনেক জিনিস হারিয়ে যাওয়ার মতো বিকাশও সেদিন হয়ত সৌভাগ্যক্রমে হারিয়েই গিয়েছিল এবং অনেকদিন পরে যখন দেখা হলো...কিন্তু সে-কথা এখন থাক, নইলে রানীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখবার প্রচেষ্টাই বা কেন!

এরপর গোকুল মিত্তির বৌবাজার থেকে লেক রোড, লেক রোড থেকে ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে থিয়েটার রোড-এ ধাপে ধাপে উঠে গেছে। সাধারণ লোক থেকে রায়সাহেব হয়েছে। দশজনের একজন ছিল, ক্রমে দশজনের শীর্ষে উঠেছে। বাইরে থেকে আমরা দেখেছি গোকুলকে। বাহবা দিয়েছি। কিন্তু গোকুল বরাবর বলেছে—না না, আমি কিছু নয় ভাই—এর পেছনে আছেন মিসেস মিত্তির—আরতি—মিন্টু—

আমরা যখনি আমাদের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলেছি, গোকুল সাপ দেখার মতো লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে হাসাহাসি হয়েছে—তামাশা হয়েছে।

আমার স্ত্রী বলেছে—কেন হাসির কী আছে—ওই তো ভালো—তোমাদের যেমন মেয়েমানুষ দেখলেই জিব দিয়ে নাল পড়ে।

চাঁদা চেয়ে বা ধার চেয়ে কখনও কেউ হতাশ হয়নি গোকুল মিত্তিরের কাছে। কিন্তু মহিলা-সমিতি, গার্লস স্কুল কিংবা দুঃস্থা বিধবা—এসব ব্যাপারে একটি পয়সা কখনও দেয়নি গোকুল, এক আমাদের সুনীতি শিক্ষা সদন ছাড়া। গোকুল বলতো—কী করবো, আরতির আপত্তি যে—

গোকুলের উন্নতির সঙ্গে আমি যদিও বরাবর জড়িত ছিলাম—কিন্তু ওর চরিত্রের ওই দিকটার কথা মনে হতেই কেমন যেন করুণার চোখে দেখতাম ওকে। মনে হতো ইচ্ছে করলেই এক দণ্ডে গোকুলের জীবন বরবাদ করে দিতে পারি। ও হয়তো আত্মহত্যা করবে শুনে। কিন্তু আবার এক একবার মনে হতো হয়তো আমারই ভুল। আমারই মনের ভুল কিংবা চোখের ভুল। সেদিন সেই শীতের রাত্রে বারো নম্বর সি রোডের সামনের ঘরটার ঘটনা শুধু নিছক বিভ্রম মাত্র—আর কিছু নয়। আসলে গোকুলের ক্রম-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের কৌতূহলের মাত্রাটাও দ্বিগুণ ত্রিগুণ চর্তুগুণ হয়ে বেড়েই চলেছিল।

এর পরের ঘটনা আরতি রায়কে নিয়ে নয়। আরতি তখনও রানীসাহেবা হননি। তখন কেবল মিসেস মিত্র। প্রচুর প্রতিষ্ঠার শিখরে উঠে রায়সাহেব গোকুল মিত্তির যখন মারা গেল হঠাৎ, তখন কারবার নিজের হাতে নিলেন মিসেস মিত্র। স্বামীর জীবিত অবস্থায় যেমন আড়ালে থেকে স্বামীকে পরিচালনা করতেন, তেমনি আড়ালে থেকেই তখন থেকে ব্যবসা পরিচালনা করতে লাগলেন তিনি।

ঘটনাটা সেই সময়ের।

শকুন্তলা নয়—মৃণালিনী। মৃণালিনী ম্যাট্রিক পর্যন্ত পর্দা স্কুলে পড়েছে। গোকুল মিত্তির ওই মৃণালিনীর স্কুলে যাওয়ার জন্যেই পালকি-গাড়ি কিনেছিল। রবারের টায়ার লাগানো চাকা।

জানালা দরজা খড়খড়ি বন্ধ। দুটো মোটা মোটা ওয়েলার ঘোড়া। দুটো মোটর থাকতেও কেন যে এই ব্যবস্থা। জিজ্ঞেস করতে গোকুল বলেছিল—ও-সব কথা থাক ভাই—আরতি যখন চায় তখন ও নিয়ে আর—

তারপর ভর্তি হলো আমাদের সুনীতি শিক্ষা-সদনে। গীতাপাঠ, স্তোত্রপাঠ, আর তার সঙ্গে আই এ.-র কোর্স। এখানে ভর্তি হওয়ার পেছনে মিসেস মিত্রের নিশ্চয়ই সম্মতি ছিল। কারণ স্ত্রীর বিনা-পরামর্শে কোনও কাজ করবার পাত্র গোকুল নয়।

তখন গোকুল বেঁচে নেই। সমস্ত কাজ কারবারের কলকাঠি মিসেস মিত্রের হাতে। তখন সেই সময়ে একদিন আগুন জ্বলে উঠল।

সেদিন কলেজে নিয়মিত গেছি। ক্লাশ বসে গেছে। হঠাৎ মিসেস মিত্রের চিঠি নিয়ে এসে হাজির মিসেস মিত্রের দারোয়ান। পিয়োন-বুকে সই দিয়ে চিঠি নিলেন। চিঠি খুলে পড়তে গিয়ে মাথায় বজ্রাঘাত হলো।

সিল করা চিঠি। বিশেষ জরুরি এবং গোপনীয়।

টাইপ করা তিন পৃষ্ঠা চিঠি। নিচের মিসেস মিত্রের সই।

পত্রের বিবরণে প্রকাশ—মিসেস মিত্রের মেয়ে মৃণালিনী নাকি প্রেমপত্র লিখেছে সুনীতি-শিক্ষা-সদনের ইংরেজির প্রফেসার বিভূতি ঘোষালের কাছে এবং বিভূতি ঘোষাল যে চিঠির জবাব দিয়েছে। এমন একখানা দু'খানা নয়, অনেকদিন ধরে অনেক চিঠিই লেখা হয়েছে। কিন্তু মিসেস মিত্তির এখন ধরে ফেলেছেন সমস্ত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃণালিনীর কলেজে আসা বন্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, এখন জানতে চেয়েছেন বিভূতি ঘোষালের মতো প্রফেসারকে কেন এখনি বরখাস্ত করা হবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেন সুনীতি-শিক্ষা-সদনকে এখনি ভেঙে দেবে না। যেখানে মেয়েদের শিক্ষার নামে চরিত্রহীনতার হাতেখড়ি দেওয়া হয় এবং যে-প্রতিষ্ঠানে অসচ্চরিত্র লম্পট শিক্ষকদের বেছে বেছে নিযুক্ত করা হয় মেয়েদের প্রলুব্ধ করবার জন্য—সে প্রতিষ্ঠান তুলে দেবার জন্যে কোনও আইন দেশে আছে কিনা—এবং না থাকলে সে আইন এখনি কেন প্রবর্তন করা হবে না তাই জানতে চেয়েছেন। সুশিক্ষার নামে এইসব প্রতিষ্ঠানে ভদ্রঘরের যুবতী মেয়েদের যে এইভাবে অনাচার ও দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় তা বহুলোক বহুদিন ধরে সন্দেহ করে আসছেন। কিন্তু ভদ্রবেশী গুন্ডাদের কূটনীতিতে এতদিন সকলের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে ছিল। সুনীতি-শিক্ষা সদনের এই দৃষ্টান্ত এবার সকলকে ইত্যাদি।

তিন পৃষ্ঠাব্যাপী অভিযোগ। শেষে লিখেছেন—দেশবাসী তথা বিশ্ববিদ্যালয় এর কোনও প্রতিবিধান না করলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবেন।

এর একখানা নকল তিনি পাঠিয়েছেন ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে—আর একখানা চ্যান্সেলারের কাছে। এবং লিখেছেন যে, তাঁর উত্তরের জন্যে তিনি পনেরো দিন অপেক্ষা করবেন—জবাব না পেলে তিনি অন্য ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন।

গোকুল বেঁচে নেই। তবু গোকুল বেঁচে থাকলেও কোনও সুরাহা হতো বলে মনে হয় না। কারণ মিসেস মিত্রের কথাই শেষ কথা জানতাম। কিন্তু চিঠিটা পড়ে হাসিও পেল। কারণ জামশেদপুরের সেই বারো নম্বর সি রোডের ঘটনা তো নিছক কল্পনাও নয়।

কিন্তু চিঠিটা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতেও পারলাম না। তখুনি বিভূতি ঘোষালকে ডেকে পাঠালাম। ছোকরা মানুষ। ওদিকে বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে রত্নও বলা যায়। অনেক দেখেশুনেই

তাকে ভর্তি করেছিলাম। ইংরেজি, হিস্ট্রি আর ইকনমিক্সে এম এ দিয়েছে। তিনটেতেই ফার্স্ট। চিরকাল এখানে চাকরি করবে না। আরো উন্নতি করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।

সেদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে যে কথা সে বলেছিল তাতে তার বিশেষ কোনও দোষ আমি পাইনি।

এক কথায় সে বলতে চেয়েছিল—তারা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসে—

সেদিনকার মৃণালিনীকেও আজ মনে করতে চেষ্টা করলাম। খড়খড়ি বন্ধ পালকি-গাড়ির মধ্যে বন্দি হয়ে আসতো রোজ। মিসেস মিত্রের কড়া নজর আর কোচোয়ান চাকর ঝি দারোয়ানের নজরবন্দি হয়ে থেকে থেকে একমাত্র বোধহয় কলেজের এলাকায় ঢুকেই সে জীবন ফিরে পেত। চটুল চলা আর কথা বলার ভঙ্গি থেকে বুঝতাম এখানেই একমাত্র সে বুঝি মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে তার লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় ওঠা, ক্লাশের বাইরে দুর্দম ছোটাছুটি আর তারপর ঠিক বাড়ি যাবার আগে পালকি গাড়িটা যখন ঘেরা কলেজ কম্পাউন্ডের ভেতরে এসে ঢুকতো তখন অকারণে বাড়ি যেতে দেরি করা আর যাবার আগে তার সেই বিষাদ-মলিন চেহারা হয়ে যাওয়া—সমস্তর যেন একটা মানে ছিল। আজ সেই মেয়েকেই দু'হাত নিচু ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় তার চেয়ে কমবয়েসি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যেতে দেখে তাই অত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

যা হোক চিঠিটা পেয়েই মিসেস মিত্রের বাড়ি গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে—দেখাও হলো।

কিন্তু কে চিনতে পারবে সেদিনের সেই আরতি রায়কে। সাদা থান, তুষারধবল গায়ের রং আর প্রচুর স্থূল মাংসপিণ্ডের তলায় জামশেদপুরের সে-মেয়েটি বুঝি কবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, যতক্ষণ ছিলেন সামনে বসে, একবারও আমার চোখে চোখ রাখলেন না। হয়ত ভেবেছিলেন যদি চোখের জাফরি দিয়ে সেই কুমারী আরতি রায় হঠাৎ এক ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে ফেলে! কিংবা যদি আমি চিনে ফেলি সেই আরতি রায়কে।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন—যাদের হাতে ছেলে-মেয়ের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব, তারাই যদি এমন করে তাদের সর্বনাশ করে তা হলে বাপ-মায়ের মনে কতখানি দুঃখু হয় তা ভাবুন তো একবার—

আমার অবশ্য চুপ করে শোনবারই পালা। যিনি কথা বলছেন তিনি তখন আর বন্ধু-পত্নী নন—রায়সাহেব গোকুল মিত্রের প্রচুর সম্পত্তিশালিনী বিধবা স্ত্রী।

বললেন—আপনারা ও-স্কুল উঠিয়ে দিন—যদি তা না দেন তবে জানবেন ও আমিই উঠিয়ে দেব—দেহের ধর্মনাশ আর মনের ধর্মনাশ ও একই কথা—

তারপর পাশের দিকে চেয়ে ডাকলেন—প্রফুল্লবাবু—

গোকুলের পুরোনো টাইপিস্ট প্রফুল্ল কাজ করছিল একপাশে। মিসেস মিত্রের ডাকে উঠে এল কাছে।

মিসেস মিত্র কপালের চুলগুলো ডান হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন—একশো সাতের সি ফাইলটা আনুন তো একবার—

ফাইলটা আসতেই মিসেস মিত্র সেখানা খুললেন। বললেন—প্রফুল্লবাবু, এই তেত্রিশের ফোলিয়োটা দেখে রাখুন—মাসে মাসে সুনীতি-শিক্ষা-সদনের নামে যে পাঁচ হাজার করে চাঁদা বরাদ্দ আছে—আজ একটা চিঠি ড্রাফট করে দেবেন—ওটা ক্যানসেলড হবে—আর ওদের

ওখানে যে পঞ্চাশখানা পাখা দেওয়া আছে ওগুলোও ফেরত দেবার কথা লিখে দেবেন ওই সঙ্গে—

তারপর বাঁ পাশে দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন—চিন্তা—

চিন্তা এল।

বললেন—যজ্ঞেশ্বরকে একবার ডেকে দে তো—

যজ্ঞেশ্বর সামনে আসতেই বললেন—যজ্ঞেশ্বর, শুনে রাখ, কাল যখন আপিসে যাবি একবার আমাদের অ্যাকাউনটেন্টকে দেখা করতে বলবি—খগেনবাবু আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করেন বাড়িতে—বলবি বিশেষ দরকার—

তারপর চিন্তার দিকে চেয়ে আবার বললেন—হ্যাঁ রে, মিনু বার্লি খেয়েছে, না এখনও...একবার জ্বরটা দেখলে হতো যে...আর যজ্ঞেশ্বর—শোন ইদিকে—

যজ্ঞেশ্বর ঝুঁকে পড়ে বললেন—মা—

—একবার বড় ডাক্তারবাবুকে খবর দে তো—গাড়ি নিয়ে যা—নইলে দেরি হবে—বলবি এখনি যেন আসেন—প্রফুল্লবাবু, আপনি এ-মাসে ডাক্তারবাবুর মেডিকেল বিলগুলো এখনও দেননি কেন—কাজে আপনাদের বড় গাফিলতি হয়—আমি যেদিকে না দেখবো...

দশটা কাজের মধ্যে মিসেস মিত্রকে যেন কেমন দিশেহারা দেখলাম। ঠিক যেন সামঞ্জস্য করতে পারছেন না জীবনেব সঙ্গে—কোথায় কোনো ফুটো দিয়ে বুঝি সব নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার দিকে না চেয়েই আমাকে বললেন—ও, আপনি এখনও বসে আছেন—আপনাকে চা আনিয়ে দিচ্ছি—চিন্তা, চা নিয়ে আয় তো এক কাপ—

কী জানি হঠাৎ মিসেস মিত্রের চিঠিটা পেয়ে যেমন উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম—সামনাসামনি প্রত্যক্ষ দেখে কেমন যেন ওঁর ওপর করুণা হলো। অর্ধমৃতের ওপর আঘাত করতে ইচ্ছে হলো না। মিসেস মিত্র কি সত্যি সত্যিই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ!

সেদিন বাড়ির বাইরে এসে বাড়িটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখেছিলাম। চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জেলখানার মতো। অমন রক্ষা-ব্যবস্থা কিসের জন্য? জানালাগুলোর সামনে দেড় হাত জায়গার ব্যবধানে খড়খড়ির আবরণ দেওয়া। চন্দ্র-সূর্যও যেন ওখানে প্রবেশ করতে না পারে।

শেষ পর্যন্ত সত্যি সুনীতি-শিক্ষা-সদনের মাসিক মোটা চাঁদাটা বন্ধ হয়ে গেল। গোকুল মিত্রের ধার দেওয়া পঞ্চাশখানা পাখা—তাও একদিন ওদের লোক এসে খুলে নিয়ে গেল। তবু টিমটিম করে চলতে লাগলো প্রতিষ্ঠান। শেষে একদিন তাও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর একদিন কার কাছে যেন শুনছিলাম যে মিসেস মিত্র মেয়েকে নিয়ে তাঁর লাহেড়িয়াসরাই-এর জমিদারিতে গিয়ে বাস করছেন। জনতা, কোলাহল, শহর, সভ্যতা থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে তিনি হয়ত আত্মরক্ষা করতেই চেয়েছিলেন। কুমারী জীবনে যে দুর্বলতার প্রশ্রয় দিয়েছেন আরতি রায়, মিসেস মিত্র হয়ে তিনি সারাজীবন তার প্রায়শ্চিত্তই হয়ত করে গেলেন এবং নিজের কন্যার মধ্যে যাতে তাঁর কোন বিগত দুর্বলতার ছাপ না পড়ে তার সেই শুভ প্রচেষ্টাই হয়ত তাঁকে তাঁর লাহেড়িয়াসরাই-এর দুর্গম বন্দিনিবাসে আবদ্ধ করেছে। আমার ধারণা যে ভুল নয়, তা আজ মৃণালিনীর লম্বা ঘোমটা আর তার কমবয়সি স্বামীকে দেখেই বুঝতে পারলাম।

মুন্সীজীও বলেছিল—ওরা হুজুর বড় ভারী জমীন্দার—বনেদি বংশ ওদের—ওদের বংশের নিয়মই আলাদা, বউ শ্বশুরবাড়ি গেলে জীবনে আর কখনও বাপের বাড়ি আসতে পারবে না—বড় ভারী বনেদি জমীন্দার ওরা হুজুর—

সকালবেলা নিয়মিত জলযোগের পর ডাক পড়লো।

মহলের পর মহল পেরিয়ে মুন্সীজী আজ একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে এসেছে। আজ আরতি রায়ও নয়, মিসেস মিত্রও নয়, আজ রানীসাহেবা! সেই দুর্গম পল্লী প্রাসাদের অভ্যন্তরে অন্দরমহলের একটি ঘর দেখলাম পরিপাটি করে সাজানো। চারপাশে কলকাতার সোফা কৌচ। দেয়ালের সারা গায়ে গোকুলের নানা বয়সের নানা ভঙ্গির ফোটো। দুটো মানুষ-সমান অয়েল পেন্টিং; একটা গোকুলের আর একটা রানীসাহেবার।

খানিক পরে পাথরের প্লেটে ফল আর মিষ্টি এল। আর তার পেছনে পেছনে এসে হাজির হলেন রানীসাহেবা।

বহুদিন পর দেখছি। বিচলিত হলাম। সত্যি এ-যেন অন্য মানুষ!

এসেই বললেন—ওটা খেতে আপত্তি করবেন না—ওটা প্রসাদ—আমার বিগ্রহ দেবকীনন্দনের—

তারপর সামনে বসলেন। আরো শুচিশুভ্র আর তুষারধবল হয়েছে তাঁর অবয়ব। একটু আগেই স্নান সেরে পুজো সেরে আসছেন বোধ হয়। কপালে চন্দন-চর্চিত জোড়া ভৃগুপদরেখা। হাতে নামজপের থলি। ভেতরে আঙুলটা নিঃশব্দে নড়ছে। বুঝি ইষ্টনাম জপ করছেন।

বললেন—কেমন জামাই দেখলেন আমার—তারপর খানিক থেমে বললেন—জানেন, মিনুর বিয়ের জন্য আমার ভারী ভাবনা ছিল—আজ আমি সত্যিকারের স্বাধীন—

দেয়ালের অয়েল পেন্টিংখানা দেখিয়ে বললেন—উনি বলতেন বটে যে, আমি নাকি ওঁর উন্নতির মূলে—কিন্তু উনি ছিলেন দেবতা, ওঁর স্পর্শ পেয়ে আমিই বরং ধন্য হয়ে গেছি—ওঁর ভালোবাসা না পেলে কি আজ মিনুকে ঠিক নিজের মনের মতন করে মানুষ করতে পারতুম—নিজের পছন্দমতো ঘরে-বরে দিতে পারতুম—আজ উনিও নেই—মিনুও গেল—আপনারা সবাই এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাই কোনও বাধা এল না—তাছাড়া—

আরো এমনি দু-একটা কথা হলো। আশ্চর্য হলাম। এ যেন সে-মানুষ নন। আরতি রায়, মিসেস মিত্র আর আজকের এই রানীসাহেবা—এরা যেন একজন নয়—তিনজনের তিনটি বিভিন্নরূপ। অথচ পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে ওঁকে চিনে এসেছি, তবু মনে হলো চেনার যেন আর শেষ নেই। এ-চেনার শেষ হবেও না। কবেকার কোন আরতি রায়—সে কি আজ রানীসাহেবাকে দেখলে চিনতে পারবে? কিংবা হয়ত রানীসাহেবাও আজ আরতি রায়কে দেখে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। আরতি রায়কে দেখে রানীসাহেবাও আজ বুঝি লজ্জায় অপমানে অধোবদন হয়ে থাকবে। নইলে এমন করে অসঙ্কোচে আমার চোখে চোখ রেখে কথাই বা কেমন করে বলতে পারছেন এই রানীসাহেবা!

মামুলি বিদায়-অভিনন্দনের পর চলে আসছিলাম।

দরজার বাইরে পা বাড়াতেই কানে এল—আর একবার শুনুন—

ফিরে দাঁড়ালাম। হাসি-হাসি মুখ। হাসি দেখে কেমন যেন খটকা লাগলো। হাসি তো কখনও দেখিনি ওঁর মুখে।

বললেন—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতুম—

—বলুন না, কী কথা—

—আপনি একদিন আমার মেয়ের নাম রাখতে চেয়েছিলেন শকুন্তলা—আমি রেখেছি মৃণালিনী—আপনার দেওয়া নামে আমার আপত্তি ছিল—কেন জানেন?

—না, কেন?

—আপনি আগে বলুন কী মনে করে আপনি ওর নাম শকুন্তলা রেখেছিলেন?

—আমি কিছু মনে করে ও নাম রাখিনি। কিন্তু—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না—

—আপনি সত্যি কথা বলছেন?—রানীসাহেবা হঠাৎ যেন বড় ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন।

আমি হঠাৎ এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেলাম। তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। ভয় হলো—ধরা পড়ে গেলাম নাকি; ও কি হাসি নয় তবে—ভ্রূকুটি?

তারপর আমার দিকে তেমনি ভাবে তাকিয়েই রানীসাহেবা বললেন—আমার স্বামীকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবেই জানতেন, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোনও ফাঁকি ছিল না—যদি এতদিনের পবিচয়েও সেটা না বুঝে থাকেন তো...

বলতে বলতে থেমে গেলেন রানীসাহেবা। তারপর একসময়ে আশেপাশে চেয়ে নিয়ে বললেন—আজ আমি স্বাধীন, উনিও নেই, মিনুও জন্মের মতো পর হয়ে গেল—আজ আর বলতে দোষ নেই —কেন আপনি শকুন্তলা নাম রেখেছিলেন তা আর কেউ না বুঝুক—আমি বুঝেছিলাম—

আমায ক্ষমা কববেন—আমায় ক্ষমা করবেন আপনি—

--কিন্তু আপনি যে ক্ষমার যোগ্য নন—শকুন্তলার জন্ম-বৃত্তান্ত আমাদের দেশের একটা সাত বছরের মেয়েও জানে— বলতে বলতে বিদায়-সম্ভাষণ না করেই চলে গেলেন দরজার পর্দার আড়ালে। খানিকক্ষণ হতবাকের মতন দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম।

ট্রেনে আসতে আসতে ভেবেছি কত কথা। ভেবেছি—অল্প বয়সের ক্রটির জন্য যাঁকে সারাটা জীবন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে—সমস্ত বিলাস ব্যসন শহর সভ্যতা ছেড়ে যিনি আত্মবিবরে মুখ লুকিয়ে মুহ্যমান মৃতকল্প হয়ে আছেন—আজ রানীসাহেবার সেই পরিপূর্ণ রূপটাই যেন দেখবার সৌভাগ্য হলো। গোকুল অবশ্য ছিল হতভাগ্য কিন্তু এই রানীসাহেবাকে দেখলাম আজ তার চেয়ে আরো শতগুণ হতভাগ্য!

মনে মনে সঙ্কল্প করলাম—রানীসাহেবাকে নিয়ে এখন গল্প লিখবো না। ওই মৃণালিনী যখন শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারে আত্মধিক্কারে উন্মাদ হয়ে আত্মহত্যা করবে—তখনই রানীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখার উপযুক্ত সময়।

সেই আমার রানীসাহেবার সঙ্গে শেষ দেখা। এর পর আর দেখা হয়নি।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ দেখা নয়। এর পরে যে ছোট ঘটনাটি ঘটলো সেটি না ঘটলে রানীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখবার কোনও সার্থকতাই থাকে না। এতদিনের সমস্ত দেখা একটি মুহূর্তে যেন ভুল-দেখায় পরিণত হলো। সেই ঘটনাটা বলি।

এক সুগার মিলের শেয়ার বিক্রি করতে এক ভদ্রলোক একদিন আমার কাছে এসে হাজির। সকালবেলা। লোকটি কিন্তু বড় স্মার্ট।

বললে—শেয়ার আপনাকে আমি এখনি কিনতে বলছি না, কিন্তু আমাদের প্রসপেক্টাসখানা

একবার পড়তে অনুরোধ করি—ম্যাকসুইনি ব্রাদার্স লিমিটেডের সমস্ত কনসার্ন আমাদের বি কে গুপ্ত অ্যান্ড কোং কিনে নিয়েছেন—ম্যানেজিং এজেন্টস্ নতুন হলেও ফার্ম বহুদিনের, প্রেফারেনসিয়াল শেয়ারে ডিভিডেন্ড এইট পারসেন্ট আর অর্ডিনারি শেয়ার হলো...

উল্টেপাল্টে দেখলাম। 'নরকটিয়াগঞ্জ সুগার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেডিং কনসার্ন—ম্যানেজিং এজেন্টস্—বি কে গুপ্ত অ্যান্ড কোং—'। সাদা অ্যান্টিক পেপারে রয়্যাল আট পেজি বুকলেট। শেষের পাতায় ব্যালান্সশিট।

ছোকরাটি বললে—আপনি হয়ত ভাববেন নতুন ম্যানেজিং এজেন্টস—কিন্তু বি কে গুপ্তকে যাঁরা জানেন তাঁদের যদি একবার জিজ্ঞেস করে দেখেন...মিস্টার গুপ্ত আমেরিকা আর জাপানে কুড়ি বছর ধরে এই সুগার টেকনোলজি নিয়ে জীবনপাত করেছেন—এতদিন পরে ইন্ডিয়াতে ফিরে এসে আজ ক'বছর হলো এইটে হাতে নিয়েছেন—অদ্ভুত ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার মশাই—ছোটবেলায় একজন নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে ওঁকে জাপানে পাঠায়—অত্যন্ত গরিবের ছেলে ছিলেন কি না—

খানিক পরে ছোকরাটি বললে—আর একটা ভেতরের কথা তা হলে আপনাকে বলি—বিহারের রানীসাহেবার নাম শুনেছেন?

চমকে উঠলাম।

তিনি নিজে এর পেছনে আছেন—তিনি একাই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছেন এরি মধ্যে, আবার দরকার হলে আরো লক্ষ লক্ষ টাকার...

বললাম—রানীসাহেবা?

আমার চোখে মুখে বোধ হয় বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিহারের রানীসাহেবা বলতে ওই একজনকেই তো বোঝায়—আপনি চেনেন নাকি—তা সেই রানীসাহেবাই ওঁকে কুড়ি বছর ধরে আমেরিকায় জাপানে পড়বার খরচ চালিয়ে এসেছেন—ফরেন কোনও ডিগ্রি আর বাকি নেই আর কি—দেশে ফেরবার আর ইচ্ছেই ছিল না, রানীসাহেবাই ওঁকে ডেকে এনে ওইতে নামিয়েছেন—আসল কোম্পানিটা রানীসাহেবারই বলতে পারেন—অথচ দেখুন মিস্টার গুপ্ত ছোটবেলায় কী গরিবই ছিলেন—জামশেদপুরে পরের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়েছেন—

—কী নাম বললেন? আমি শিরদাঁড়া সোজা করে চেয়ারে উঠে বসলাম?

—আজ্ঞে আমাদের ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর নাম? মিস্টার গুপ্ত।

—পুরো নাম?

—মিস্টার বি কে গুপ্ত।

—না না—ইনিশিয়াল নয় পুরো নামটা কী?

—বিকাশ গুপ্ত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

আমার পড়ার ঘরে ঢুকে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি একবার মাত্র বই থেকে মুখ তুলে আগন্তুকের চেহারাটা দেখে নিলাম। যেন ওই একবার তাকানোই যথেষ্ট। তাতেই বুঝে নিলাম মানুষটি কেমন। বলতে কি, প্রথম দর্শনেই আমার মন কেমন খারাপ হয়ে গেল; এই মানুষ আমার সঙ্গে থাকবে, এখানে খাবে, হয়তো আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোবে চিন্তা করে মনটা ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল।

আস্তে আস্তে সে আমার পড়ার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে একটা বই তুলল। নামটা পড়ল। দুটো পাতা ওল্টাল। তারপর আবার বইটা রেখে দিল।

আমি তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে বাঁধানো খাতাটা টেনে নিয়ে ক্লাসের অঙ্কগুলি টুকে নিচ্ছিলাম। টেবিলে ছোট টাইম্‌পিসটা টিকটিক শব্দ করছিল। কিন্তু সেই মৃদু শব্দ হঠাৎ যেন অস্বস্তিকর লাগছিল। যেন আমার কাজে বাধা দিচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল আমার খুব গরম লাগছে, কানের ভিতর দিয়ে গরম বাতাস বেরোচ্ছে। কাজ করা আর হল না। খাতাটা বন্ধ করে কলমটা হাত থেকে এক রকম ছুঁড়ে ফেলে রেখে দুপদাপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

একটা লোকের উপস্থিতি যে কত খারাপ লাগতে পারে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। অথচ সে আমার কোন অপকার করছিল না, কোনরকম অনিষ্টচিন্তা করছিল না। কিন্তু তবু কেন তার ওপর আমার এই বীতস্পৃহা রাগ আক্রোশ প্রথম দিন থেকে বুকের ভিতর দানা বাঁধতে শুরু করল ভেবে পাইনি। হয়তো তাই হয়। রাস্তায় একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে—নাম ধাম জানি না স্বভাবচরিত্র কেমন শুনিনি, অথচ লোকটাকে একটুখানি দেখেই কেমন ভালো লেগে গেল, বাসে উঠলাম, আর একটা মানুষ সদয় হয়ে এক পাশে সরে বসে আমাকে বসতে একটু জায়গা করে দিল, কিন্তু কেন জানি মানুষটাকে দেখেই আমার এত খারাপ লাগল যে মুখ ঘুরিয়ে রড ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম; সাধারণ একটা ধন্যবাদ জানাবার মতন আমার মনে উদারতা জাগবে দূরে থাক—তার পাশে বসতে হবে চিন্তা করে দেহমন কুঞ্চিত হয়ে উঠল। অথচ চেহারায় পোশাকে তাকে ঘৃণা করার কিছু নেই। তবু তার ওপর আমার বিরক্তি বিদ্বেষ ঘৃণা। কাজেই মানুষকে অপছন্দ করার ঘৃণা করার কারণ যেমন চট করে হাতের কাছে খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি ভালো লাগার যুক্তিও যে সর্বদা উপস্থিত থাকবে বলা শক্ত। যুক্তির চেয়ে চোখের দেখাটাই আগে মনের ওপর কাজ করে। যেমন সেদিন আমার পড়ার ঘরে মানুষটাকে দেখামাত্র তার ওপর আমার মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগানের ডালিম গাছটা দেখছি, পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে আমার পাশে দাঁড়াল। বুঝলাম আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। কিন্তু অত চট করে আলাপ জমাবার সুযোগ তাকে কে দেয়! আমি গম্ভীর হয়ে নীচে নেমে গেলাম। ঘাসের ওপর পায়চারি করতে লাগলাম। যা আশঙ্কা করলাম, সে নীচে নামল। রাগে দুঃখে আমি সেখান থেকে

একরকম ছুটতে ছুটতে বাইরে রাস্তায় চলে গেলাম। আমাকে এভাবে ছুটতে দেখে সে অবাক হয়েছিল, টের পেয়েও আমি দূরে সরে গেলাম, তার নাগালের বাইরে; তার ছায়া আমার ছায়ার সঙ্গে মিশতে দেব না এমন একটা কঠিন প্রতিজ্ঞায় আমার দু পাটির দাঁত কঠিন দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

সকালটা এভাবে কাটল। রাস্তায়, কখনো বাগানে। বাড়ির ভিতর ঢুকতে ইচ্ছা করছিল না। স্কুলে অঙ্কের মাস্টারের বিস্তর বকুনি খেলাম হোম-টাস্ক করা হয়নি বলে। মুখ ফুটে কিছু বললাম না। হয়তো আমি যদি সুকুমারবাবুকে বুঝিয়ে বলতাম কি কারণে অঙ্কগুলি করে আনা হয়নি তো তিনি নিশ্চয় আমাকে গালমন্দ না করে চুপ করে যেতেন, একটু সহানুভূতি দেখাতেন।

কিন্তু কি করে বলি, বাড়িতে একটি লোক এসেছে, আমার এক মাসতুত ভাই—যাকে দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। পড়ার টেবিলের কাছে ঘেঁসেছিল যখন তার গায়ে বোটকা গন্ধ ঘামের গন্ধ আমার নাকে লেগেছিল; শুকনো পেঁয়াজের শিকড়ের মতো চার পাঁচটা অসমান দাড়ি থুতনি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, মাথার চুলগুলি খাড়া খাড়া, নখগুলি বড় বড়; রং চটা ছোট একটা হাফ-প্যান্ট পরনে—যা তার বয়স ও দেহের কাঠামোর পক্ষে অত্যন্ত বেমানান ঠেকছিল; মুগুরের মাথার মতন জবরদস্ত হাঁটু দুটোর দিকে তাকিয়ে কথাটা আমার মনে হয়েছিল। এমন একটা অপরিচ্ছন্ন বুনো চেহারার মানুষ আমার মাসতুত ভাই—আর সে আমাদের বাড়িতে থাকবে খাবে শোবে, হয়তো আমার ঘরে আমার বিছানায় আমার পাশে শোবে চিন্তা করে সারা সকাল আমার মাথা গরম ছিল, অঙ্কের স্যার সুকুমারবাবুকে যদি বুঝিয়ে বলতে পারতাম! না, কাউকে বলা হল না। ক্লাসে চুপচাপ মুখভার করে বসে আমার সারাদিন কাটল। সহপাঠীদের গল্পে যোগ দিতে পারিনি। লিগের খেলা, সিনেমা, রকেট, গ্যাগারিন, ইংলিশ চ্যানেল—কত কি গল্প বুদ্‌বুদের মতন আমার নাকের সামনে চোখের সামনে ভেসে বেড়াল ঘুরে বেড়াল—আমি একটা বুদ্‌বুদ ওড়াতে পারিনি, একটাও ফুঁ দিয়ে ভাঙতে পারিনি। কেবল বোকার মতন হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সব দেখলাম, শুনলাম। মনে হচ্ছিল আমি অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেছি, পরিচিত বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। তাদের সঙ্গে কথা বলবার মিশবার অধিকার আমার নেই। কেমন কান্না পাচ্ছিল। দূরে বা কাছে এমন একটি মাসতুত ভাই আমার থাকতে পারে কোনোদিন চিন্তা করিনি। ওরা—সহপাঠী বন্ধুরা আমার ওই ভাইটিকে দেখলে নির্ঘাত হেসে ফেলবে নাক সিঁটকাবে। আমার এমন জংলি চেহারার এক ভাই আছে যখন তারা জানতে পারবে তাদের কাছে আমিও অস্পৃশ্য হয়ে যাব।

স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছিল না।

নিশ্চয় পথের দিকে হাঁ করে সে তাকিয়ে আছে। আমার জন্য অপেক্ষা। আমার সঙ্গে কথা বলতে মিশতে মানুষটা কী ভীষণ ছটফট করছিল তখন বোঝা গেছে। সকাল বেলা বলা কওয়া নেই একটা ফাইবারের সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে হাঁটু অবধি ধুলো নিয়ে সে যখন বাড়িতে ঢুকল আমি তা দেখে অবাক। টিপ করে মাকে প্রণাম করল বাবাকে প্রণাম করল। মা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'চিনতে পারিস? ছোটবেলায় দেখেছিস—তারপর তো আর দেখা হয়নি, তোর মাসতুত ভাই—গণেশ। সোদপুরের মাসিমার ছেলে।' সোদপুরে আমার এক মাসিমা ছিল জানতাম, ক বছর আগে তিনি মারা গেছেন তা-ও শুনেছি—হাঁপানির রোগী মেসোর কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে—রোগের জন্য তেমন ভালো কাজকর্ম জোটাতে পারছেন না, তার

ওপর একটা বড় মেয়ে আছে ঘাড়ে, একটা ছেলে আছে। মাঝে মাঝে বাবা ও মাকে সেই মেসোর কথা বলাবলি করতে শুনতাম। বোন নেই, কিন্তু তা হলেও মা সেই রুগ্ন মেসো ও তাঁর ছেলে মেয়েকে দেখতে একদিন সোদপুরে গিয়েছিল—তা-ও প্রায় বছর ঘুরতে চলল। এখন সেই সোদপুরের মাসির ছেলে যে এই ছেলে—এই চেহারা আমি কি করে জানব। মাথার খাড়া খাড়া চুল ও থুতনির আগায় পেঁয়াজের শিকড় কটা দেখে আমার প্রথমটায় এমন হাসি পাচ্ছিল। তালগাছের মতন ঢ্যাঙা শরীর। আর মনে হচ্ছিল লোকটা কালা বোবা হবে। মা তাকে কী প্রশ্ন করছে হয়তো শুনতে পাচ্ছে না; বাবা কী জিজ্ঞেস করছেন বুঝতে পারছে না। কেমন যেন অসহায় শূন্য দৃষ্টি তুলে ধরে বাবাকে দেখছিল মাকে দেখছিল এবং ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার বার আমাকে দেখছিল। ঠিক কালা বোবা না হলেও, বোকা মূর্খ আস্ত একটি গর্দভ হবে ওই তালগাছের মতন মানুষটা চিন্তা করে আমি আমার পড়ার ঘরে চলে এলাম। তারপর বুঝি সেই মানুষ মার কথামতন জামাকাপড় ছেড়েছে, মুখ হাত ধুয়েছে, হাঁটুর ধুলো পরিষ্কার করেছে এবং মার দেওয়া চা রুটি যা হোক কিছু খেয়ে আস্তে আস্তে একসময় আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকেছিল। পড়ার ঘর মানে আমার থাকবার শোবার বসবার পায়চারি করবার এবং অনেক কিছু করবার ঘর। আমার সংসার, আমার পনেরো বছরের জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল চার ফুট ছ ফুট ওই কুঠুরিটা। মুনি-ঋষিদের যেমন গুহাগহ্বর থাকে এবং সেটাই তাদের একমাত্র জগৎ আমার পড়ার ঘরটাও আমার সেই গোপন সুরক্ষিত পবিত্র নির্জন জগৎ। সেখানে হঠাৎ এমন বিদঘুটে চেহারার একটা মানুষকে ঢুকে পড়তে দেখে কি রাগটাই না আমার তখন হয়েছিল।

কিন্তু এখন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমার নানারকম দুর্ভাবনা হচ্ছিল। যদি দুপুরে আবার সে আমার পড়ার ঘরে ঢুকে থাকে! বইগুলি ঘাঁটতে পারে, টেবিলের টানাটা খুলে দেখতে পারে; আমার বিছানার বালিশের তলায় কী আছে না আছে শূন্য ঘরে নেড়েচেড়ে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করতে তাকে বাধা দেবে কে। বাবা অফিসে, মা নিজের ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, চাকরটা এসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাস পিটতে নিজের আড্ডায় চলে যায়, সুতরাং—

নিশ্চয় বইগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে কোনো না কোনো একটার পাতার খাঁজের ভিতর লুকিয়ে রাখা দু তিনটা চিঠি ও একটা ফোটো তার চোখে পড়বে, টানাটা খুললে প্ল্যাস্টিকের ছোট সেফ্‌টি রেজারটা দেখে ফেলবে; মা কোনোদিন আমার বই বা টেবিলের টানা ঘাঁটাঘুঁটি করে না, বাবাকে তো এজীবনে আমার পড়ার ঘরে উঁকি দিতেই দেখিনি, কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে আমি সবকিছু টেবিলের টানার ভিতর বইয়ের খাঁজের মধ্যে রেখে দিতে পারতাম। বালিশের নীচে আজ ভুল করে সিগারেটের প্যাকেটটা রেখে এসেছি। পারত পক্ষে মা আমার বিছানা ধরে না, দরকার হলে চাকরটাকে পাঠিয়ে দেয়, চাদরটা ওয়ারটা খুলে আমি তার হাতে তুলে দিই সাবান দিয়ে কেচে দিতে কি ডাইংক্লিনিং-এ পাঠাতে। কিন্তু তা হলেও সিগারেটটা দেশলাইটা আমি বালিশের নীচে কি তোষকের নীচে রাখি না। আজ কেমন ভুল হয়ে গেল। আর ঠিক আজই সেই লোক আমার ঘরে ঢুকবে। না, ওই গেঁয়োটাকে আমি ভয় করি না। কোথায় সোদপুরের ছেলে আর আমি খাস বালিগঞ্জের ছেলে। এই বয়সে আমি সিগারেট খাচ্ছি কি দাঁড়ি গোঁফ কামাচ্ছি কি কিছু গোপন চিঠিপত্র ও আমার প্রিয় দু একজন ফিল্ম স্টারের ছবি বইয়ের ভিতর

লুকিয়ে রেখেছি তা আমি দেখব। এসবের জন্য ওই কিম্ভূতকিমাকার চেহারার গণেশচন্দ্রের কাছে জবাবদিহি দিতে বড় একটা গ্রাহ্য করব কিনা। না, আমার ভয়, যদি মাকে বলে দেয়! চিঠির জন্য ভয় করি না। কেননা যে চিঠি লিখেছে সে আমার 'খোকন' নামের পরিবর্তে বুদ্ধি করে 'মণি' নামটা ব্যবহার করেছে। কাজেই এই চিঠি আমার কাছে লেখা নয়, এক বন্ধুর চিঠি, বন্ধু আমার কাছে রাখতে দিয়েছে মাকে স্রেফ বুঝিয়ে বলা যাবে। সেফটি রেজারের জন্যও ভয় করি না। আমার নাকের নীচে ও থুতনিতে কানে চুল গজাচ্ছে—ঘামলে মুখ কুটকুট করে, অসুবিধা হয়—তাই সেগুলি পরিষ্কার করতে অস্ত্রটা হাতের কাছে রাখতে হয়। মাকে বুঝিয়ে বলব, তুমি তোমার বোনপোর মুখখানা একবার দ্যাখো, তার থুতনির ওই জঙ্গল দেখতে যদি তোমার ভালো লাগে তবে এখন থেকে আমিও না হয় আমার মুখটা এমন নোংরা করে রাখব। কিন্তু আমরা যে-জায়গায় আছি যে-পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছি তাতে কোনোরকম নোংরামি অপরিচ্ছন্নতা বরদাস্ত করতে শিখিনি, তুমি তা' ভালো করে জানো মা। স্কুলে যাবার সময় জুতোটা চকচকে না থাকলে কি মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো না থাকলে তুমি রাগ করো চোখ রাঙাও। কাজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এতটুকু ত্রুটি থেকে না যায় সেদিকে ছোটবেলা থেকে আমার কড়া নজর—তোমার কাছ থেকে এই নজর পাওয়া, বাবার কাছ থেকেও পাওয়া। নিশ্চয় বাবা টের পেয়েছেন আমি এখন থেকেই ব্লেড দিয়ে মুখ চাঁছতে আরম্ভ করেছি। সেদিন খাবার টেবিলে বসে বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁর টের না পাওয়ার কিছু কথা নয়। তার ওপর পুরুষ মানুষ। মা রেজার ব্লেডের কারবার করেন না। কাজেই আমার মুখ দেখে তাঁর টের পাবার কথা নয়। কিন্তু সেদিন সেই নীরব হাসির মধ্যে কি আমার এ-কাজের প্রতি সুন্দর একটা সমর্থন ছিল না। তাই তো তিনি চুপ করে গেলেন। স্কুলের সীমানা ডিঙিয়ে পরে কলেজে ঢুকব আর আমি দাড়ি গোঁফ কামাব, তার আগে রেজার হাতে তোলা দোষের এমন কুসংস্কার বাবার নেই। কাজেই এদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত। ফিল্ম-স্টারের ছবি বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা যদি দোষের হয় তো আমাদের বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে যে ক্যালেন্ডারগুলি ঝুলছে সেগুলি ছিঁড়ে ফেলতে হয়। অথচ বাবা সেগুলি অফিস থেকে আনতে না আনতে মা কত যত্ন করে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে। হ্যাঁ, ভয় ওই সিগারেটের জন্য। সিগারেট ধরেছি এই বয়সে জানতে পারলে মার বিস্তর বকুনি খেতে হবে। চাই কি বাবার কানে কথাটা উঠে যেতে পারে। ওই গেঁয়ো ভূতটাই না সরাসরি বাবার কাছে প্যাকেটটা নিয়ে হাজির করে। যেমন আহাম্মকের মতন চেহারা কাজকারবারও সেরকম হবে। বুকটা দমে গেল। কেমন বিশ্রী একটা ভয় গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে যন্ত্রণা দিতে লাগল। বাড়িতে ঢুকতে পা দুটো সরছিল না।

কিন্তু ঈশ্বর যার সহায় হন তাকে কে কী করতে পারে।

সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় উঠতে দৃশ্যটা আমার চোখে পড়ল। বাবার বসবার ঘরের সোফার ওপর হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে সোদপুরের গণেশচন্দ্র ঘুমোচ্ছে। চমৎকার নাক ডাকছে। পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকলাম। হাঁ করে ঘুমোচ্ছে মানুষটা। কষ বেয়ে লাল ঝরছে। সোফার নীল বনাতের ওপর টুপ টুপ করে সেই লাল ঝরে আধুলির সাইজের একটা কালো দাগ ধরে গেছে জায়গাটায় এর মধ্যেই। যেন সেই লালার গন্ধে কোথা থেকে একটা মাছি উড়ে এসে ঘুমন্ত মানুষটার মুখের কাছে ঘুর ঘুর করছে। ঘেন্নায় আমার গা বমি বমি করতে লাগল। ওই

বয়সের কোনো মানুষের কষ বেয়ে লালা ঝরতে দেখলে কার না ঘেন্না হয়। তেমনি পা টিপে টিপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি আমার ঘরে চলে এলাম। সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে টেবিলের বইগুলি দেখলাম। না, ঠিক আছে সব, কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। টেবিলের টানাটা খুলে দেখলাম, যেমনটি সব রেখে গেছলাম জায়গামতন রয়ে গেছে, বোঝা গেল কারো হাত পড়েনি। বালিশটা তুলতে সিগারেটের প্যাকেটটা চোখে পড়ল, চট করে ওটা সেখান থেকে সরিয়ে ফেললাম। কোণায় পুরোনো খবর কাগজের জঞ্জালের মধ্যে আপাতত ওটা গুঁজে রাখলাম। এবার আমি নিশ্চিন্ত। হাল্কা নিশ্বাস ছেড়ে জামাকাপড় ছাড়লাম। 'বোকা লোক', মনে মনে বললাম, 'একদিক থেকে ভালো। শয়তানি বুদ্ধি থাকলে আমার পড়ার ঘরে ঢুকে এটা ওটা নাড়াচাড়া করত, কোথায় কি আছে না আছে খুঁজতে আরম্ভ করত।' কিন্তু তা না করে বাইরের ঘরে সোফার ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে বলে সোদপুরের মাসতুত ভাইটি সম্পর্কে আমার তিক্ততা ও বিদ্বেষ যেন একটু কমল।

হাত-পা ধুয়ে খেতে বসেছি, তখন মা কথাটা তুলল।

'গণেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোর?'

'না তো, এসে দেখি বাবার বসবার ঘরে সোফার ওপর পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। সারা দুপুরই ঘুমোচ্ছে বুঝি?'

মা অল্প হাসল।

'সোদপুর থেকে হেঁটে এসেছে। অতটা রাস্তা হাঁটা যায়। ওইটুকুন ছেলে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

'কেন, বাস বা ট্রেনের পয়সা জোটাতে পারেনি বুঝি?'

'ভীষণ গরিব। একবেলা খাচ্ছে তো আর একবেলা উপোস থাকছে।' মা গম্ভীর হয়ে গেল।

'এখানে কদিন থাকবে?'

'তার ঠিক কি। বলছে কাজকর্মের চেষ্টায় এসেছে।'

'চাকরি।' আমি প্রবলবেগে মাথা নাড়লাম। 'ওই চেহারায় কেউ চাকরি দেবে না।' একটা থেমে পরে বললাম, 'কদ্দুর লেখাপড়া করেছে শুনি?'

'লেখাপড়া আর হল কোথায়। বলছিল সেভেন কেলাসে উঠে আর পড়া চালাতে পারেনি। ইস্কুলের মাইনে দিতে পারে না। নাম কাটা গেছে।'

'তবেই হয়েছে। সাত ক্লাসের বিদ্যা নিয়ে চাকরি! অফিসের বেয়ারার কাজও জুটবে না।'

'না চাকরি করবে কেন, চাকরি করতে আমি দেব নাকি ওই দুধের ছেলেকে। আমার কাছে যখন এসেছে দেখি আবার ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে পারি কিনা।'

যেন দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠলাম।

'এখানে? আমাদের স্কুলে? আমার সঙ্গে রোজ যাবে?'

'কেন,' আমার চেহারা দেখে মা ঈষৎ হাসল। 'তুই কি মাথায় করে নিয়ে যাবি ওকে!'

'ধেৎ, সেকথা বলছে কে।' গজ গজ করে উঠলাম, 'দাঁড়িগোঁফ গজিয়েছে, এখন যদি ও আবার সেভেন ক্লাসে পড়তে যায় সবাই হাসাহাসি করবে। আমার ভীষণ লজ্জা করবে ওর সঙ্গে স্কুলে যেতে—আমি কাউকে বলতেই পারব না এমন গেঁয়ো জংলি চেহারার ছেলে আমার [illegible]—মাসতুত ভাই।'

'ছি!' মা ধমকের সুরে বলল, 'ভাইকে এসব বলে নাকি কেউ? গেছো জংলি হবে কেন, তোর চেয়ে ওর মুখখানা দেখতে বেশি সুন্দর।' একটু থেমে মা কী চিন্তা করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি সেজেগুজে থাকো, আদর যত্নে আছ তাই মাজাঘষা চেহারা। না হলে গণেশের গায়ের রং তোমার চেয়ে ভালো। আর অতবড় ছেলে সেভেন কেলাসে ভর্তি হলে ছেলেরা হাসবে—তা হাসুক, সব বয়সেই মানুষ সব ক্লাসে পড়তে পারে, লেখাপড়ায় আবার নিন্দা আছে নাকি।'

'ওই বয়সে কলেজে পড়লে মানাত।' হাসতে যাচ্ছিলাম। মা ভুরু কোঁচকালো।

'ওই দেখতেই মনে হয় না জানি কত বয়স হয়েছে গণেশের, আসলে ওর শরীরের বাড়টা একটু বেশি, দেখছি কেমন যেন ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছে এদিকে। ও কিন্তু তোরও ছ মাসের ছোট।'

চমকে উঠলাম, মার কথাটা বিশ্বাস করতে কেমন বাধল।

'তুই হয়েছিস এক ফাল্গুনে, আর ওর জন্ম ঠিক পরের ভাদ্রে। হিসাব করে দ্যাখ না।' মা আঙুলের কর গুণতে আরম্ভ করল। ঠিক এমন সময় চোখ রগড়াতে রগড়াতে সেখানে গণেশ এসে হাজির। গালে লালার দাগটা তখনো লেগে আছে। যেন মার চোখে তা পড়ল না।

'ঘুম ভাঙল,' আদুরে গলায় মা বোনপোকে কাছে ডাকল, 'আয় একটু দুধ পাউরুটি খেয়ে নে। এই যে খোকন এসেছে। তখন না বার বার বলছিলি, দাদার ইস্কুল কখন ছুটি হবে কখন বাড়ি আসবে।'

পাছে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয় সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু টের পেলাম, সদ্য ঘুম ভাঙা করমচা রঙের বড় বড় চোখ দুটো মেলে ধরে সোদপুরের মানুষটা আমাকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখছিল।

আর তখন থেকে আমিও তাকে নতুন চোখে দেখতে লাগলাম। আমি কালো, তার গায়ের রং ফরসা। আমার চোখ ছোট, তার চোখ দুটো বড় বড়, উঁচু ধারালো নাক—আমার নাক চেপ্টা মতন। বয়সে ছোট হয়েও সে আমার চেয়ে মাথায় লম্বা হয়ে গেছে। সেই অনুপাতে তার হাত পা গলা পিঠ কোমর সবই আমার চেয়ে বড় মোটা ও পুষ্ট। মার কাছে বসে সে যখন দুধরুটি খাচ্ছিল মার ঘরের বড় আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিয়ে একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

অবশ্য আমার মনের ক্ষোভ বেশিক্ষণ রইল না। সোদপুর মানে পাড়া গাঁ। বন জঙ্গলে ভর্তি। সেখানকার মানুষগুলিকে তুমি বুনো জংলি বলতে পার। শহরের মানুষের চেয়ে বুনো জংলিরা বেশি উঁচু লম্বা জোয়ান জবরদস্ত হবেই। আগাছার মতন তারা বেড়ে ওঠে। আমাদের বালিগঞ্জের পার্কের একটা গাছের সঙ্গে জঙ্গলের একটা গাছের তুলনা করলে বেশকমটা যেমন চোখে পড়ে। বাবা সেদিন কি কথায় যেন বলেছিলেন, সভ্য মানুষ চিন্তাশীল মানুষ, দিনরাত যারা এ-ব্যাপারে সে-ব্যাপারে বুদ্ধি খরচ করে বেড়াচ্ছে তারা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও ক্ষয় করছে—কাজেই অসভ্য জংলি জানোয়ারদের মতন প্রকাণ্ড একটা দেহ সভ্য মানুষদের বড় একটা হয় না। অর্থাৎ বাবা বলতে চেয়েছিলেন, কেবল শরীরের দিক দিয়ে বেড়ে যাওয়া অসভ্যতার লক্ষণ। এখানেও তাই গণেশচন্দ্রের লম্বা হাত পা চওড়া কাঁধ কোমর আমাকে আর ঈর্ষান্বিত করতে পারল না। কেবল তার নাক চোখ ও ফরসা রংটাই যা থেকে থেকে মনটাকে খোঁচা দিতে লাগল। কিন্তু ঝাঁটার কাঠির মতন মাথার খাড়া খাড়া চুল ও অপরিচ্ছন্ন থুতনির

ছবিটা মনে করে সেই খোঁচাটাও একসময় ভুলে যেতে পারলাম। পাছে সে আমার পিছু নেয় তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা আমাদের লেক-ক্লাবে চলে গেলাম। মনের আনন্দে সেখানে সারাটা বিকেল বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলা করলাম। বাড়িতে এক হবুচন্দ্র মাসতুত ভাই এসেছে কথাটা অনেকক্ষণ ভুলে ছিলাম।

ক্লাবের পিন্টু ও নন্তুর সঙ্গে লেকের ধারে বসে গল্প করে সন্ধ্যাটাও কাটালাম। কিন্তু যখন বাড়ি ফেরার সময় হল সেই মুখটা আমার মনে পড়তে আরম্ভ করল।

'কি হল, হঠাৎ চুপ করে গেলি যে?'

নন্তু প্রশ্ন করছিল। জোর করে হাসলাম।

'না ভাবছি, এখনি গিয়ে আবার বই নিয়ে বসতে হবে।'

'ও, তার জন্য মন খারাপ।' পিন্টু হাসল, 'পড়ার বই পড়তে আমার যখনই খারাপ লাগে আমি স্রেফ একটা সিনেমার কাগজ খুলে বসি।'

'কাগজটা বুঝি টেক্সট বইয়ের তলায় লুকিয়ে রেখে পড়তে বসিস?'

'তা ছাড়া কি।' পিন্টু গম্ভীর হয়ে গেল। 'কত আর নাসিরুদ্দিন মামুদ আর গিয়াসুদ্দিন বলবন মুখস্থ করা যায়। কাজেই তখন—'

'কাজেই তখন সিনেমার কাগজটা খুলে দুরের-মায়া বইয়ের নতুন নায়িকা—কি যেন নাম?' নন্তু আমার দিকে তাকাল।

'চামেলী চ্যাটার্জি।' হেসে বললাম।

'চামেলীর মুখখানা দেখি—কেমনরে পিন্টু।' পিন্টুর পিঠে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল নন্তু।

'মাইরি বলছি।' পিন্টু দু চোখ বুজে ফেলল, 'চামেলীকে আমি ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নে দেখি।'

'ধেৎ, তার চেয়ে প্রথম-পলাশ-ফুলে যে মেয়েটা নামছে—কি যেন রে নাম, খোকন?' নন্তু আমার দিকে তাকাল।

'ইরা সোম।' বললাম আমি।

'অনেক বেশি মিষ্টি চেহারা।' নন্তু চোখ দুটো প্রায় বুজে ফেলল।

'আমার ভাই স্বাতী সেনের মুখটাই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগেল। মরুর-বুকে ছবির নায়িকা।' বললাম, 'তোদের বলতে বাধা নেই, জিয়োম্যেট্রি পড়ার আগে আমি অনেকক্ষণ ধরে স্বাতীর মুখখানা দেখে নিই।'

'জিয়োম্যেট্রি বইয়ের ভিতর স্বাতীর ফটো লুকিয়ে রাখিস নিশ্চয়?' নন্তু প্রশ্ন করল।

'তা ছাড়া কি।' আমি হাসলাম।

'সত্যি, কত আর ট্রপিজিয়ম আর রম্বস মুখস্ত করা যায়।' পিন্টু এতক্ষণ পর আবার হাসল। 'আয় এইবেলা সিগারেট খাওয়া যাক।' পিন্টুর জামার পকেট থেকে তকতকে ঝকঝকে একটা নতুন প্যাকেট বেরিয়ে এল। তিনজন প্রাণভরে লেকের ধারের মিষ্টি হাওয়া খেতে খেতে সিগারেট টানলাম। বাড়িতে লুকিয়ে সিগারেট খেয়ে আরাম হত না বলে তিন বন্ধু রোজ সন্ধ্যার দিকে এমন একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে ধূমপানের আসর জমাতাম।

একটু রাত করে বাড়ি ফিরলাম। যেন মাংস রান্না হচ্ছিল। গন্ধ পেলাম। আশ্বস্ত হওয়া গেল। মা যেদিন মাংস রান্না করে বাবা সেদিন রান্না ঘরে বসে থাকবেনই। অসীম উৎসাহ তাঁর এ-ব্যাপারে, দরকার হলে হাতা দিয়ে উনুনের হাঁড়িটা দুবার নেড়েচেড়ে দেন তিনি। কাজেই

রাত করে বাড়ি ফেরার জন্য আর ভয় রইল না, বাবার সামনে পড়তে হল না, চট করে বাথরুমে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে সোজা পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লাম। আলো জ্বেলে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে টেবিলের বইয়ের সারিটা একবার দেখে নিলাম, টানা খুলে ভিতরটা একবার পরীক্ষা করলাম। দুশ্চিন্তা দূর হল। গণেশচন্দ্র তা হলে এবেলাও আমার ঘরে ঢোকেনি। নিশ্চিন্তমনে চেয়ারে বসে জ্যামিতি বইটা টেনে আনলাম। না, আনতে গেছি, হঠাৎ চৌকাঠের কাছে পায়ের শব্দ হল। বই থেকে হাতটা আপনা থেকে সরে এল। ঘাড় ঘুড়িয়ে পিছনের দিতে তাকাতে দেখলাম সেই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, হাঁ করে আমাকে দেখছে। ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো দিয়ে আমাকে গিলছে মনে হল।

'কি চাই?' এই প্রথম আমি তার সঙ্গে কথা বললাম, 'এখন না, এখন এ-ঘরে না। আমি পড়াশোনা করব—আমার অনেক পড়া।'

ঠিক তখন মা এসে দরজায় দাঁড়াল।

'আহা এমন করিস কেন—তোর ভাই, খুব ভালো ছেলে গণেশ। সারাদিন আশায় আশায় থেকেছে কতক্ষণ তুই ওর সঙ্গে কথা বলবি।'

চুপ করে গেলাম।

মা আবার বলল, 'তখন তুই স্কুল থেকে এসে খেয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলি। ও খুঁজল তোকে, বারান্দায় গেল, বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখল—তুই নেই।'

'আমি আমাদের ক্লাবে গিয়েছিলাম।' অন্যদিকে তাকিয়ে রুষ্ট গলায় বললাম, 'ছুটির পর বাড়ি এসে রোজ ক্লাবে চলে যাই তুমি তো জানই।'

'আমিও গণেশকে বললাম। ও চাইছিল তোর সঙ্গে বেড়াতে যেতে, বলছিল, দাদা এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলল না মাসিমা।'

রান্নাঘর থেকে বাবার কাশির শব্দ ভেসে আসতে শুনলাম। বুঝলাম বাবাকে হাঁড়ির কাছে বসিয়ে রেখে মা বোনের ছেলেকে সঙ্গে করে এনেছে আমার সঙ্গে মেলামেশার কথাবার্তা চালানোর সূত্রটা ধরিয়ে দিতে। যেন কচি খোকা। হাঁটি হাঁটি পা পা। অথচ কতবড় একটা শরীর! ছ ফুট লম্বা হবে। কাজেই একটা মস্ত 'ইডিয়ট' ছাড়া আর কিছুই না। মনে মনে বললাম।

'এখন পড়াশোনা কর, তারপর খাওয়াদাওয়া হয়ে যাক—ওর সঙ্গে কথা বলবি। খুব দুঃখ করছিল গণেশ তুই কথা বলছিস না বলে।' মা ঘুরে দাঁড়াল, 'দেখি, মাংসটা বোধ করি হয়ে এল।' রান্নাঘরের দিকে আবার চলল মা। সেই মূর্তিও আর দাঁড়াল না। মাথাটা নিচু করে মার পিছে পিছে চলে গেল। আমার রকমসকম দেখে বুঝতে পেরেছে সে আমি তাকে ভয়ংকর অপছন্দ করছি। তাই আমি বুঝিয়ে দিতে চাইছিলাম।

বাবা ও মার কথার ধরনে বুঝলাম গণেশ পাকাপাকিভাবে এবাড়িতে থেকে যাবে। ভাদ্র মাস। এখন স্কুলে ভর্তি হওয়ার অসুবিধা আছে। নতুন সেশন আরম্ভ হলে আমার স্কুলে ভর্তি হবে। মাংস ভাত খাচ্ছিলাম। কিন্তু তবু মুখে কেমন তেতো তেতো লাগছিল সব। আমার এপাশে বাবা বসে খাচ্ছেন ওপাশে বসেছে বুনোটা। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম কী ভীষণ খেতে পারে মার সোদপুরের বোনের ছেলে। এক থালা ভাত উড়ে গেছে কখন। মা আবার থালায় ভাত ঢেলে দিয়েছে। তা-ও সে সাবাড় করে আনল. অথচ আমার এক বারের ভাত

নড়ছে না। বাবা আর কটা ভাত খান। তবু মা বোনপোর সামনে বসে থেকে বারবার সাধাসাধি করছিল, 'এটা খা, ওটা খা—আর দুটি ভাত খেয়ে নে।' দুটি মানে আর এক থালা। রাগে আমার শরীর ফেটে যাচ্ছিল। আবার হাসিও পাচ্ছিল। এই আদর কদিন! ইস্কুলে ভর্তি হোক। ওই সেভেন ক্লাসেই তিনবার ডিগবাজি খাবে এই ছেলে। তখন দেখা যাবে থালা থালা ভাত খাচ্ছে দেখে মা কী করে। আমি জানি মা কোনদিন বেশি ভাত খাওয়া দেখতে পারে না। সুদাস নামে আমাদের এক চাকর ছিল। এইটুকুন ছেলে। অথচ পারলে হাঁড়ির সব ভাত খেয়ে নিত। মা এক একদিন এমন বিরক্ত হত! বাবা বলতেন, যাদের ব্রেন-ওয়ার্ক অর্থাৎ মাথার কাজ করতে হয় না তারা বেশি ভাত খায়। যেমন মুটে মজুর রিকশাওয়ালারা। অতিরিক্ত ভাত খাওয়া ছোটলোকের লক্ষণ। মা বলত, দারিদ্র্যের চিহ্ন। অথচ আজ বাবা তো চুপ করে আছেনই, মা আদর করে আর একজনকে ঠেসে ঠেসে খাওয়াচ্ছে। কাজেই আমি চুপ করে রইলাম। যার ভাত দেবার মালিক তাদের চোখে যদি এই রাক্ষুসে-খাওয়া ভালো লাগে তা আমি কি করতে পারি। বস্তুত এত ভালো মাংস রান্না হওয়া সত্ত্বেও আমি তেমন করে খেতে পারলাম না। মার আদর দেখে হিংসায় আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছিল।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতে মা আবার তাকে সঙ্গে করে আমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। মার হাতে একটা বড় বালিশ।

'গণেশ এ ঘরে তোর সঙ্গে শোবে।'

'এইটুকুন তো একটা খাট।' আমার মুখ কালো হয়ে গেল। করুণচোখে মার দিকে তাকালাম। 'তোশকটাও ছোট—দুজনেব অসুবিধা হবে।'

'তোমার সবতাতেই অসুবিধে—এমন কোনো ছোট বিছানা না তোমার—দু ভায়ে বেশ শুতে পারবে।'

তবু আমি বিড়বিড় করছিলাম।

'বাবার বসবার ঘরটা তো খালি পড়ে থাকে—সেখানে একজন শুতে পারে।'

'সে ঘরে বঙ্কু শোয় তুই জানিস না।' আগের চেয়েও জোরে ধমক লাগাল মা। 'চাকরের সঙ্গে গণেশকে আমি শুতে বলব নাকি—কেন, তোর ঘর থাকতে—' বলতে বলতে মা ভিতরে ঢুকল, হাতের বালিশটা আমার বিছানার ওপর রাখল। 'আয় ভিতরে আয়, গণেশ।'

গণেশ ভিতরে ঢুকল। মুখখানা এখন হাসি হাসি। অর্থাৎ আমার আপত্তি টিকছে না বুঝতে পেরে খুশি হয়েছে। ঈশ্বর জানে, রাগে আমার তখন কী করতে ইচ্ছা করছিল! কিন্তু মার জন্য মুখ বুজে সব সহ্য করতে হল। বিছানার চারদটা টেনেটুনে ঠিক করে দিয়ে দুটো বালিশ পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে মা ঘুরে দাঁড়াল।

'তুই এখন শুবি?'

'আমার অনেক পড়া আছে।' মার মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছিল না।

'গণেশ, তোর তো ঘুম পেয়েছে—শুয়ে পড়।'

'আমি পরে শোব, মাসিমা।'

'বেশ তো, খোকন, তোর একটা গল্পের বইটই থাকে তো ওকে দে, বসে বসে দেখুক।'

'গল্পের বই আমি রাখি না। সব টেক্সট বই।' দুজনের কারোর দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর গলায় উত্তর করলাম।

'বেশ, তবে গণেশ তুই ততক্ষণ বারান্দায় এসে একটু বোস—চমৎকার ফুর ফুরে হাওয়া ওখানটায়।'

মা চৌকাঠের দিকে সরে গেল। আড়চোখে আমি তাকিয়ে দেখছিলাম যাকে বারান্দায় যেতে বলা হল সে কি করে। গেল না বারান্দায়। বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আমাকে দেখছে, টেবিলটা দেখছে, বইগুলি দেখছে। যেন আজব দেশে এসেছে। আমি আজব দেশের মানুষ। রাগ হচ্ছিল, আবার হাসি পাচ্ছিল, আর সেই সঙ্গে অহংকারে গর্বে বুকের ভিতরটা ফুলে উঠছিল। দেখবেই তো, আমার দিকে বার বার তার না তাকিয়ে উপায় কি! মোটে ছ মাসের বড় হয়ে আমি দু ক্লাস উঁচোয় পড়ছি। আমার কত বই! আর সবগুলি বই কেমন চমৎকার বাঁধানো চকচকে। কতবড় একটা টেবিল আমার, সুন্দর একটা টেবিল-ল্যাম্প, একটা চেয়ার, ধবধবে বিছানা। একলা আমি পড়াশোনা করব বলে, থাকব বলে এই ঘর। দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটে আমার শার্ট প্যান্ট ধুতি পাঞ্জাবি গেঞ্জি পায়জামাই বা ঝুলছে কত। সোদপুর থেকে খালি পায়ে ও হেঁটে এসেছে। আর আমার জুতো চটি মিলিয়ে চার পাঁচ জোড়া। তাই অবাক হয়ে চোখ ঘুরিয়ে সব দেখছে সে। বিছানা জামাকাপড় জুতো বই চেয়ার টেবিল দেখা শেষ করে তারপর এসবের যে মালিক তাকে দেখছে; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে আমার গাল মুখ কত পালিশ পরিচ্ছন্ন—মাথার চুল কেমন পরিপাটি, হাতের নখগুলি কত সুন্দর মসৃণ করে কাটা। গাঁয়ের মানুষ। কাজেই তার জানবার কথা না আমাদের শহরের ছেলেদের সারাক্ষণ কেমন পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে হয়। বেশভূষায় চেহারায় চালচলনে আমরা পান থেকে চুনটুকু খসতে দিই না। আস্তে আস্তে জানবে কেন আমাদের এত ফিটফাট মাজাঘষা চেহারা হয়ে থাকতে হয়। রোজ চন্দন সাবান গায়ে মেখে আমি স্নান করি, মাথায় ভালো সেন্টেড তেল মাখি, স্নো ক্রিম পাউডার উঠতে বসতে মুখে মাখছি। বুনো জংলিদের এসব জানবার কথা না, এসবের খোঁজখবরও রাখে না তারা। তাই আমার চকচকে চেহারা তাকে এত অবাক করেছে।

সকালের মতন টেবিলের কাছে সরে এসে দাঁড়াল সে।

'কি চাই?'

'কিছু না।' এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিল সে। দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। খামোখা হাসবার অভ্যাস, বুঝলাম।

'কিছু চাই না তো ওদিকে সরে দাঁড়াও।' বিরক্ত গলায় বললাম, 'আমি এখন পড়ব।'

'আমি তোমার ইস্কুলে ভর্তি হব, মাসিমা বলেছেন।'

'ওই চেহারা নিয়ে বালিগঞ্জ বয়েজ স্কুলে ঢুকতে হবে না।'

'কেন।' যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন চেহারা করে ফেলল সোদপুরের মাসিমার ছেলে। চেহারাটা দেখে আমার ভালো লাগল। মুখটা অনেকক্ষণ ভার করে রেখে পরে একটা ঢোক গিলল।

'তোমার সঙ্গে যাব—তুমি আমার দাদা—ঢুকতে দেবে না কেন?'

'দাদা বললেই তো তারা তা বিশ্বাস করছে না।'

চুপ করে রইল সে।

'থুতনিতে পেঁয়াজের শিকড়ের মতন কি কতগুলো ঝুলছে, ঝাঁটার কাঠির মতন মাথার চুল, বড় বড় নখ হাতে পায়ে—ইস্কুলের ছেলেরা গাড়ল ছাড়া আর কিছুই ভাববে না—'

হাঁ করে তাকিয়ে থেকে আমার কথাগুলি শুনল সে, তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। বনের পশুকে আঘাত করার যে আনন্দ সেরকম একটা কিছু আমি ভিতরে ভিতরে অনুভব করছিলাম।

আর কিছু আপাতত বলার প্রয়োজন নেই। ওতেই যথেষ্ট কাজ হবে। চিন্তা করে একটা পড়ার বই টেনে এনে মনে মনে পড়তে শুরু করে দিলাম। অথচ পড়ায় আমার এক ফোঁটাও মনোযোগ ছিল না। আড়চোখে দেখছিলাম, গাড়লটা মেঝের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ দুর্ভাবনার অথই জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার ভালো লাগল। অন্তত রাক্ষুসে দাঁতগুলো বার করে আমার সামনে অকারণে আর সে হাসবে না। বলতে কি ওই বোকা হাসিটাই আমার মাথা গরম করছিল বেশি।

কিন্তু দেখা গেল আমার কথাগুলি সে মনেপ্রাণে ধরে রেখেছে। পরদিন সকালে মার কাছে আবজি পেশ করল। মা তৎক্ষণাৎ বঙ্কুকে দিয়ে বোনের ছেলেকে চুল কাটার সেলুনে পাঠিয়ে দিল। রাত্রে তার পাশে শুয়ে সত্যি আমার ঘুমোতে কষ্ট হচ্ছিল। গায়ের ঘাম ময়লার উটকো গন্ধে বমি আসছিল। আমি বার বার উঃ আঃ করেছিলাম। দুর্গন্ধ শব্দটাও উচ্চারণ করেছিলাম। তাই পরদিন দেখলাম সেলুন থেকে চুলটুল কেটে এসে গণেশচন্দ্র বাথরুমে বসে দারুণভাবে সারা গায়ে সাবান মাখছে। খুশি হলাম। বুনোটা আমার মতন হতে চাইছে। স্নানের পর ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরল। এগুলো বাবার। ছ ফুট লম্বা শরীরে আমার শার্ট পাঞ্জাবি প্যান্ট পায়জামা ধরবে না। না হলে পুরোনো বা একটু ছেঁড়ামতন শার্ট প্যান্ট আমারই কি কম বাক্সে তোলা আছে। আমার মতন বাবারও ভয়ংকর নাক টান। একটু সুতো উঠে গেল কি জেলজেলে হয়ে গেলেই শার্টটা পায়জামাটা আর গায়ে তুলতে চান না তিনি। মা সেগুলি ধুইয়ে এনে তুলে রাখে। এখন সেসব কাজে লাগল।

দেখতে মন্দ লাগছিল না সোদপুরের মাসির ছেলেকে। রংটা ফরসা তো। চুল কেটেছে, গায়ের ময়লা পরিষ্কার করেছে; তার ওপর ধোয়া পাঞ্জাবি পায়জামা গায়ে চড়িয়েছে। আমার পড়ার ঘরে ঢুকে দাঁত বার করে সে হাসছিল, ধরে নিয়েছে আমি তার ওপর এখন বেজায় সন্তুষ্ট। কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণ আমি প্রকাশ করলাম না। গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ওই বুনোই থেকে গেলি?'

'কেন?' তার মুখের হাসি নিভে গেল।

আমি আঙুল দিয়ে থুতনিটা দেখলাম।

নিজের থুতনির ওপর হাত বুলিয়ে সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। কিন্তু যেন এখানে তার কিছু করবার নেই—সম্পূর্ণ নিরুপায়, এমনভাবে সে আমার দিকে তাকাল। তেমনি গম্ভীর থেকে আমি টেবিলের টানা খুলে সেফটি রেজারটা বার করলাম, চটপট হাতে রেজারে নতুন ব্লেড পরালাম, দেওয়াল থেকে ছোট আরশিটা নামিয়ে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখলাম, মুখে সাবান মাখা বুরুশ ঘষলাম—তারপর পাঁচ সাত মিনিটের কাজ। আমার মুখটা দেখতে দেখতে ডিমের মতন মসৃণ তকতকে হয়ে উঠল। ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে গণেশ এতক্ষণ আমায় দেখছিল। দেখা শেষ করে সে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। এখন আর দাঁত বার করল না, অল্প হেসে আস্তে আস্তে বলল, 'মুখের চুলগুলি একদিন কাঁচি দিয়ে কাটতে গেছলাম—আর বাবা দেখতে পেয়ে এমন মার দিল—'

'বাবার সামনে কাটতে গেলে মার দেবেই।' দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে অল্প হেসে বললাম, 'বাবা মা-কে দেখিয়ে সব কাজ করতে গেলে তবেই হয়েছে।'

প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলল গণেশ।

'আমার তো ওই যন্তরটন্তর কিছু নেই।'

'এটা দিয়েই এখন কাজ চালাবি—আর একটা নতুন ব্লেড দেব ওটা পরিয়ে নিবি—দুপুরে মা যখন ঘুমোবে তখন এ-ঘরে বসে চুপি চুপি—বুঝলি?'

খুশি হয়ে সে ঘাড় কাত করল।

'কিন্তু সাবধান—আমার সেফটি রেজার খুব ভালো করে ধুয়ে মুছে রাখা হয় যেন—নোংরামি আমি একেবারে পছন্দ করি না।'

গণেশ এবারও ঘাড় কাত করল।

এক সেকেন্ড কথাটা চিন্তা করলাম, তারপর চোখের ইশারায় দোরটা আর একটু ভালো করে ভেজিয়ে দিয়ে আসতে বললাম গণেশকে। দেখলাম, আমি যা বলছি, যা করছি তাতেই তার প্রচণ্ড উৎসাহ।

আমার উৎসাহ অবশ্য অন্যদিক থেকে। একটা বুনোকে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তুলছি। যেমন খেলা দেখাবার জন্য সার্কাসের দলের লোকেরা বনের পশুকে শিখিয়ে পড়িয়ে তোলে। সার্কাসের শিম্পাঞ্জি দাড়ি কামায় সিগারেট টানে খবরের কাগজ পড়ে আমার দেখা আছে। যেন সোদপুরের গণেশ সম্পর্কেও আমার সেই ধরনের উৎসাহ।

সিগারেটটা প্রায় শেষ করে এনেছি। গণেশ একভাবে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলছে।

'অভ্যাস আছে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম।

গণেশ মাথা নাড়ল।

সিগারেটের টুকরোটা তার হাতে তুলে দিলাম, বললাম, 'অভ্যাস নেই যখন খুব আস্তে টান দিবি।'

আস্তে আস্তে টানল সে। কিন্তু তা হলেও চোখমুখ লাল হয়ে গেল। দুবার খুক করে কাশল।

'থাক আর দরকার নেই—ফেলে দে, প্রথমটায় বেশি ধোয়া গিলতে গেলে বেদম কাশতে শুরু করবি।'

আর একটা বড় করে টান দিয়ে গণেশ জ্বলন্ত টুকরোটা হাত থেকে ফেলে দিল। আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুনটা নিভিয়ে দিলাম। তারপর সেটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে জানালা দিয়ে গলিয়ে দূরে বাগানের ঝোপের ভিতরে ফেলে দিলাম।

গণেশের চোখমুখের লাল ভাবটা তখনো কাটেনি। নাকের ছিদ্র দিয়ে একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

'মাসিমা জানতে পারলে ভীষণ বকুনি দেবে।'

'মাসিমাকে জানাচ্ছে কে আহম্মক।' চাপা গলায় গর্জন করে উঠলাম। ধমক খেয়ে মার বোনপো রাগ করল না। বরং যেন নিশ্চিন্ত হল।

'বাবা আমায় কেবল বলত, সাবধান কারো সঙ্গে মিশে বিড়ি-সিগারেট যেন আবার অভ্যাস করতে আরম্ভ করিস না, তাহলে মগজ পেকে যাবে—লেখাপড়া হবে না।'

কথা শুনে হাসলাম।

'ছ ফুট লম্বা হয়েছিল মাথায়—এখনো কি তোর মগজ কাঁচা আছে ধরে নিয়েছিস।' একটু থেমে পরে বললাম, 'গাঁয়ের মানুষ তোর বাবা—কি খেলে কি হয় আর কি না খেলে না হয় বড় জানে কিনা, বিড়ি সিগারেট না খেয়ে তুই কোন্ পি. আর. এস, পি. এইচ ডি হয়েছিস শুনি?'

ইংরেজি শব্দগুলি গণেশ বুঝল না, কিন্তু আমার কথাটা বুঝতে পারল তার চোখ দেখে টের পেলাম। মুখ নিচু করে আছে। আমি যে অতি সত্যি কথা বলছি তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হচ্ছে না। সিগারেট টেনে টেনে আমি ঠোঁট কালো করে ফেললাম অথচ নাইন ক্লাসে পড়ছি—এত এত বই আমার; কথাটা সে না ভেবে পারে না। তাই আমি চুপ করতে চোখ তুলে সে আমার হাতের সিগারেটের প্যাকেটটা আবার দেখতে লাগল। তাজা মাছ দেখে বিড়াল যেমন করে তাকায়। বুনোটার এই তাকানো আমার ভালো লাগল।

মা মহাখুশি। গণেশ আর আমার কাছছাড়া হয় না। যতক্ষণ আমি বাড়িতে গণেশ আমার সঙ্গে আছে, আমার ঘরে আছে। আমার সঙ্গে সে কত কথা বলছে এবং গেঁয়ো ছেলেটা সম্পর্কে আমিও আর মার কাছে কোনরকম খুঁত খুঁত করছি না। 'গণেশ একটু বাবু হয়েছে,' মা মাঝে মাঝে বলে, 'খোকনের সঙ্গে থেকে এটা হয়েছে।' শুনে আমি চুপ করে থাকি। তা তো হবেই, মনে মনে বলি, গেঁয়োটাকে আমি বাবু সেজে থাকতে শিখিয়েছি, সিগারেট ফুঁকতে শিখিয়েছি, একদিন অন্তর দাড়ি গোঁফ কাঁমাতে শিখিয়েছি, আর যখন তখন আমার টেবিল থেকে সিনেমার কাগজগুলি টেনে নিয়ে সুন্দরী অভিনেত্রী রেবা, চামেলী, স্বাতী বা অন্য কোনো মেয়ের মুখের ওপর উপুড় হয়ে থাকতে শিখিয়েছি।

একটা খেলা আমার—একটা আনন্দ। যেন আমার মনের ভাবটা এই, পোষা জন্তুটা আমার সব কিছু অনুকরণ করুক, শিখুক; তারপর কী দাঁড়ায়, কতটা যায় দেখা যাবে।

আমার সেই গোপন চিঠিগুলিও সে দেখল, পড়ল। মিষ্টি হাতের লেখা আদুরে চিঠি, অভিমানের চিঠি, কান্নার চিঠি, উচ্ছ্বাসের অস্থিরতার চিঠি। কে লিখেছে, কাকে লেখা এত সব গোপন পত্র হয়ত বোকাটা বুঝল না। এবং এই জন্য তার মাথা ব্যথাও নেই, মনে হত। সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মুখগুলি দেখতে দেখতে যেমন মাঝে মাঝে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলত তেমনি মিষ্টি মিষ্টি চিঠিগুলি পড়া শেষ করে দেয়ালের দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকত আর কী যেন ভাবত।

বুনোটার এই চুপ করে থাকা ও দীর্ঘশ্বাস ফেলাটা আমি উপভোগ করতাম। কিন্তু ওই পর্যন্ত। আর অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না—আর কিছু শেখানো হবে না। এটা বলেছিল আমাকে ক্লাবের বন্ধুরা। কেননা স্কুলে ক্লাসের কোনো ছেলের কাছে ঘুণাক্ষরেও আমার এমন এক বোকারাম মাসতুত ভাই আছে প্রকাশ করিনি। কিন্তু ক্লাবের নন্তু পিন্টুদের কাছে গোপন করিনি। বুনোটা সম্পর্কে তাদের সঙ্গে নানা পরামর্শ করার দরকার ছিল বইকি। লেকের ধারের নির্জন অন্ধকারে বসে তিনজন সিগারেট টানতে টানতে অদৃশ্য গণেশচন্দ্রকে নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি করতাম। নন্তু বলত 'ছ ফুট লম্বা তার ওপর গায়ের রংটা খুব ফরসা বলছিস, কাজেই যেটুকু শেখানো হয়েছে ওই থাক—আর বেশি শেখাতে গেলে তোর ভাত মারা যাবে।'

বন্ধুর ইঙ্গিতটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। পিন্টু বলছিল, 'হুঁ, ওই একটা জায়গায় ফাঁক রাখবি—গেঁয়ো গোঁয়ার মানুষ—সব কিছু শেখাবার বিপদ আছে বইকি।' বন্ধুদের কথা শুনে আমি হেসেছি। আমি যে অনেক বেশি চালাক বন্ধুরা হয়তো ঠিক চিন্তা করে দেখেনি। যদি বুনোটাকে সব কিছু দেখানো শেখানোর মন থাকত তো তাকে নিয়ে নিশ্চয় অন্তত এক আধদিন আমি বাইরে বেড়াতে বেরোতাম। একদিন তাকে আমাদের লেক-ক্লাবের আড্ডায় আনিনি। কি স্কুলের খেলার মাঠে। ওকে সঙ্গে নিয়ে আমি কোনোদিন রাস্তায় বা পার্কেও যেতাম না। যতটা মেলামেশা বা যেটুকু প্রশ্রয় দেওয়া বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে থেকে। আমার বাইরের জগতে উঁকি দেবার ছাড়পত্র সে পায়নি।

মা মাঝে মাঝে ঘ্যানঘ্যান করত। ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেড়াতে যাই না কেন। চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ, মনুমেন্ট, যাদুঘর কত কি দেখবার আছে। আমি মুখ ভার করে বলতাম, 'আমার সময় নেই।' কাজেই বঙ্কুকে সঙ্গে দিয়ে মা সোদপুরের বোনের ছেলেকে এটা ওটা দেখতে, রাস্তাঘাট চিনতে পাঠাত। আমার কাছে গণেশচন্দ্র এসব আশা করত না যদিও। কেননা বাড়িতে থেকে আমার পড়ার ঘরের দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে তাকে যেটুকু দেখিয়েছিলাম চিনিয়েছিলাম তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট ছিল। বস্তুত যদি বা কোনোদিন হাবেভাবে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার ইচ্ছা প্রকাশ করত তো তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে আমি মাথা নেড়ে বলতাম, 'এখনো সময় হয়নি, এখনো তোর জংলি ভাবটা পুরোপুরি কাটেনি—তুই আমার মাসতুত ভাই বন্ধুরা যখন শুনবে ভীষণ হাসাহাসি করবে।' সঙ্গে সঙ্গে সে চুপ করে যেত। দেয়ালের দিকে চোখ রেখে ভাবত। তারপর সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মুখগুলি দেখত। তাকে খুশি রাখতে চট করে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দিয়েই খাতাবই বগলে নিয়ে আমি স্কুলে বেরিয়ে গেছি। স্কুল থেকে ফিরে এসে আবার একটা সিগারেট তার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি ক্লাবে ছুটে গেছি। আমার পড়ার ঘরে বসে বাবা মা কি চাকর বঙ্কুকে টের পেতে না দিয়ে সে যে লুকিয়ে সিগারেট খেতে শিখেছে এই জন্য আমি খুশি ছিলাম। একটু একটু করে বুনোটার বুদ্ধি বাড়ছে, মনে মনে বলতাম।

ছুটি দিনটাই মুশকিল। অথচ ছুটির দুপুর, রবিবারের দুপুরটাই সবচেয়ে লোভনীয়। বাবা বাড়িতে থাকেন বলে মার চোখে সেদিন আর এক ফোঁটা ঘুম থাকে না। আর সেদিন চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরোবার মতলব করে জামাটা আমি গায়ে চড়িয়েছি কি মা কেমন করে জানি টের পেয়ে আমার ঘরের দরজায় ছুটে আসে।

'গণেশকেও সঙ্গে নিয়ে যা—এখন তো আর স্কুলে যাচ্ছিস না, ক্লাবে যাচ্ছিস না।' মা হেসে বলত। 'গাঁয়ের ছেলেকে তোদের ক্লাবে নিয়ে যেতে লজ্জা করে বলিস, এমনি না হয় ওকে নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আয়।'

সঙ্গে সঙ্গে জামাটা খুলে ফেলি।

'না বড্ড গরম। বেরোব না।'

মা আর হাসত না, গম্ভীর হয়ে যেত।

'এসব তোমার বাঁদরামি। গণেশকে সঙ্গে নেবার নাম করতে তোমার মাথা ব্যথা শুরু হল। আশ্চর্য! নিজের মাসতুত ভাই, ধরতে গেলে নিজের মায়ের পেটের ভায়ের মতন!'

আঘাত পেয়ে মা চলে গেছে। আর আমি মনে মনে বলেছি, বরং বুনোটাকে আমি সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যেতে পারি, ক্লাবেও হয়তো এক আধদিন যাওয়া চলে, কিন্তু এখন আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে অসম্ভব। ভাই বলে, ভাই বোন বাবা মা আত্মীয় বন্ধু—পৃথিবীর কাউকে সেখানে নিয়ে যাওয়া চলে না। এক যেতে পারে আমি আর আমার ঈশ্বর। আর তাই তো আমি এমন একটা নির্জন নিঃসঙ্গ দুপুরের অপেক্ষায় ছিলাম। তার ওপর এখন শরৎকাল। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। নারকেল পাতার ঝালর থেকে উজ্জ্বল রৌদ্র চুঁইয়ে পড়ছে। নীচে দিঘির জল আয়নার মতন স্বচ্ছ স্থির। আয়নার বুকে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছবি, সাদা মেঘের টুকরো টুকরো প্রতিবিম্ব। আর জলের কিনারে লম্বা সবুজ ঘাস, ঘাসের ডগায় হলদে ফড়িং।

ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে না উঠতে মিলিয়ে গেছে মার জন্য—নষ্ট হয়ে গেছে। এমন করে দুটো রবিবারের ছুটির দুপুর নষ্ট হয়েছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। গণেশকে সঙ্গে নিয়ে যা।

আমার কান্না পায়।

আমার সব কিছু থেকে ওই দুপুর ওই ছায়া ওই রং ঘাস জল মেঘের ছবি আলাদা করে রেখেছি। ওখানে আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না, থাকতে পারে না।

এর সঙ্গে আমার সিগারেট খাওয়া, লুকিয়ে দাড়ি কামানো, লুকিয়ে সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মেয়ের মুখ দেখার কোনো যোগাযোগ নেই। মিষ্টি চিঠিগুলিরও না। চিঠি চিঠি। আর কারোর হতে পারে, অন্য কেউ লিখতে পারে! বললেই হল। লেখা হয়ে গেলে পড়া হয়ে গেলে কয়েক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কি! সে সব এক দিকে।

আর এখন, পর পর দুটো রবিবার নষ্ট হবার পর, আজ এই তৃতীয় রবিবারের ছুটির দুপুরে আমি যেখানে যেতে চাইছি—আমাব একান্ত গোপন সুন্দর নিভৃত জগতে, আর কেউ না, যাকে দেখলে আমি হাসি, ঘৃণা করি, অনুকম্পা করি, সোদপুরের আধা জানোয়ার আধা মানুষের চেহারার বোকারাম গণেশচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে আমি পায়ে মাথায় শিউরে উঠলাম।

অথচ আজ পরম সুযোগ। কি একটা কাজে বাবা কলকাতার বাইবে গেছে। মা ঘুমোচ্ছে। আকাশটাও আজ বড় বেশি নীল। মেঘের টুকরোগুলি অতিরিক্ত সাদা। নারকেল পাতার ঝালর চুঁইয়ে হিরের মতন উজ্জ্বল রাশি রাশি রৌদ্র আয়নার মতন স্থির স্বচ্ছ দিঘির বুকে ঝরে পড়ে না জানি কী শোভা ধরেছে কল্পনা করে আমি যখন জামাটা ব্র্যাকেট থেকে টেনে আনতে যাব আমার দুই চোখ স্থির হয়ে গেল।

'আমি যাব দাদা।'

'কোথায়?'

'তুমি যেখানে যাচ্ছ।'

'আমি তো কোথাও যাচ্ছি না।'

'ওই তো জামা পরছ।'

স্থির শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে দরজায়। বাবার একটা পুরোনো সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়েছে, সদ্য পাটভাঙা পায়জামা পরেছে। যেন মাকে দিয়ে বাক্স ঘেঁটে এগুলি বার করে নিয়েছে। অথচ আজ মা উপস্থিত নেই সামনে—পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তার জন্য গণেশ

চুপ করে বসে নেই। সেজেগুজে তৈরি হয়ে আছে, আমার সঙ্গে বেরোবে। বুঝলাম কদিনে আর একটু চালাকচতুর সাবালক হয়ে উঠেছে বুনোটা। দাদার সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য মাসিমাকে দিয়ে আরজি পেশ করানোর দরকার বোধ করছে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আধুলির সাইজের দাঁতগুলি বার করে সে হাসছিল। দেখে মাথাটা গরম হয়ে গেল। তথাপি জামাটা গায়ে চড়ালাম। 'আমি কাজে বেরোচ্ছি।' কঠিন গলায় বললাম, 'যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোকে নিয়ে যাওয়া চলে না।'

'কেন চলবে না, তুমি তো এমনি বেড়াতে যাচ্ছ—কাজ আবার কি! আমি যাব।'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। চিরুনি বুলিয়ে মাথাটা ঠিক করছিলাম। হাতের মুঠোয় চিরুনিটা স্থির হয়ে গেল।

'এমন গেঁয়ো জংলিকে সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আমার লজ্জা করবে।' রাগে আমার ঠোঁট কাঁপছিল।

'মোটেই আর আমি জংলি নই।' রাগ না করে গণেশ নরম গলায় বলল, 'কাল তুমিই বলছিলে; এখন আমাকে রীতিমতো শহুরে ছেলে বলা যায়, তোমার মতন রোজ গায়ে সাবান মেখে স্নান করি, দাড়ি কামাই, সিগারেট খাই, পরিষ্কার জামাকাপড় পরি—সিনেমার কাগজ টাগজ নাড়াচাড়া করি—'

ঠাট্টা করে কাল কথাটা বলেছিলাম বটে। মজা দেখতে যে বুনোটাকে আমি আমার সব কিছু শিখিয়েছি দেখিয়েছি তা তার বোঝবার ক্ষমতা থাকত যদি! তাই আর রাগ না করে হাসলাম।

'হুঁ, তোর বাইরেটা শহুরে হয়ে গেছে আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু ভিতরটা? মনটা? এখনো কাঁচা, এখনো গেঁয়ো ভাবটা পুরোপুরি রয়ে গেছে—আর একটু চালাক-চতুর না হলে—'

ড্যাবড্যাবে চোখে ছ ফুট লম্বা মানুষটা আমার মুখ দেখল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেন সামনে একটা আরশি পেলে তক্ষুনি সে নিজের মুখটা শরীরটা আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করে। এখনো গেঁয়ো বোকা রয়ে গেছে আমার কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারছে না।

চিরুনি চালিয়ে চুলটা ঠিক করে ফেললাম।

'দরজা থেকে সরে দাঁড়া।' রুমালে খানিকটা সেন্ট ঢেলে সেটা পকেটে পুরলাম। গণেশ দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর থেকে আমাকে বেরোতে না দেবার মতলব? হেসে বললাম, 'ভাদ্দরের কাঠ ফাটা রোদ উঠেছে দেখছিস তো, এখন বাইরে হাঁটতে মোটেই ভালো লাগবে না। তার চেয়ে ফ্যানটা খুলে দিয়ে আমার টেবিলে বসে আরামসে সিগারেট খা, সিনেমার কাগজটা দ্যাখ, মিষ্টি চিঠিগুলো আর একবার পড়তে পারিস।' পকেট থেকে সিগারেট বার করলাম।

কিন্তু আজ আর সিগারেটের জন্য সে হাত বাড়াল না। চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল। 'চিঠি পড়ে আর ছবি দেখে কেবল কী হবে। অনেক দেখা হয়েছে—অনেক পড়া হয়েছে—তুমি আমার বাইরে নিয়ে চল।'

'বাইরে তোমার যাওয়া চলবে না। আমার সঙ্গে চলবে না। বন্ধুর সঙ্গে যেতে পারো।' রাগে আবার গজ গজ করে উঠলাম। 'ওই চেহারা ওই বুদ্ধি নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইছ, কী আস্পর্ধা!'

বললাম বটে, বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। যেন হঠাৎ একটা আগুনের

ঝিলিক দেখলাম সোদপুরের মাসির ছেলের চোখে। অথচ দাঁতগুলি ঢেকে রেখে কেমন করে যেন হাসছে, শয়তানের মতন। অস্বস্তি বোধ করলাম।

'রাস্তা ছেড়ে দে'। রুখে উঠলাম আমি।

'আমি সব বলে দেব মাসিমাকে।' গণেশ গম্ভীর হয়ে বলল।

'কি বলবি শুনি?'

'তুমি আমায় সিগারেট খেতে শেখাচ্ছ, এই বয়সে গালে রেজার চালাতে শেখাচ্ছ, সিনেমার মেয়ের মুখ রাতদিন দেখাচ্ছ—'

'হায়রে গর্দভ, হায়রে মূর্খ!' মনে মনে বললাম, 'এসব অপরাধের সঙ্গে তুইও জড়িয়ে আছিস, কাজেই বাবা মার কাছে শাস্তি পেতে একলা আমিই পাব না, তুইও পাবি, কথাটা ভেবেছিস?' কিন্তু তথাপি আমার বুকের ভিতর গুড়গুড় করতে লাগল গেঁয়ো গোঁয়ার মানুষ, কী বলতে আরো সব কী বলে দেয় মাকে চিন্তা করে চট করে রাগটা সংবরণ করলাম। পায়চারি করতে লাগলাম ঘরের ভিতর। এদিকে বাইরে রোদ কমলা রং ধরতে শুরু করেছে—সাদা মেঘের ধারগুলি থেকে এখনি পাটকিলে রং ফুটে বেরোবে—নারকেল গাছের ছায়ারা লম্বা হতে থাকবে, দিঘির জলের স্বচ্ছ আরশিটা কালো হয়ে নিভে যাবে একসময়। বুকের ভিতর হায় হায় করে উঠল। আমার আর একটা ছুটির দুপুর চিরদিনের মতন নষ্ট হতে চলল হারিয়ে যেতে লাগল। কেমন অস্থির হয়ে উঠলাম। অস্থিরতার মধ্যে বুদ্ধি ঠিক করে ফেললাম।

'আচ্ছা, তাই হবে, চ—তুইও সঙ্গে যাবি।' বুনোটার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সেও হাসল। অতিরিক্ত খুশি হবার দরুন দাঁতগুলি আবার বেরিয়ে পড়ল। দুজন ঘরের বাইরে চলে এলাম।

'চমৎকার দুপুর!'

আমি কথা বললাম না।

'আকাশটা নীল—মেঘগুলো কী সাদা!' আমার পিছনে থেকে সে কথা বলছিল। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।

'সত্যি দাদা, তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোনো আমার অনেকদিনের ইচ্ছা।' একটু পর আবার বলল ও।

আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোলেই কি আর আমার সমান হওয়া যাবে, মনে মনে বললাম ও হাসলাম। সত্যি, সেখানে গেঁয়োটাকে নিয়ে যাচ্ছি বলে একটু আগে যে ভয়টা হচ্ছিল সেটা ততক্ষণে কেটে গেছে। আমার ক্লাবের কোনো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না, ক্লাসের কোনো ছেলেকেও না। পোষা কুকুরটুকুর যেমন লোকে সঙ্গে নিয়ে যায় তেমনি সোদপুরের এই গাড়লটা আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আমাদের বালিগঞ্জের ছেলেদের সে কতটুকু দেখেছে, কী জানে! বাড়িতে দেখেছে আমাকে, আমার পড়ার ঘরে দেখেছে, বাবার সামনে দেখেছে, মার সামনে দেখেছে। তাতে আমার কতটুকু জানা হয়েছে দেখা হয়েছে। তাই মনে মনে হাসলাম।

বরং ওটা সঙ্গে যাচ্ছে বলে উৎসাহটা ক্রমেই বাড়ছিল।

অর্থাৎ বুনোটাকে এই কদিনে অনেক কিছু দেখিয়েছি শিখিয়েছি—না হয় আর একটু দেখবে শিখবে। আমার বুদ্ধির শিকল দিয়ে যখন ওকে বেঁধে রেখেছি, তখন আর ভয় কি! বরং নতুন একটা খেলা হবে। আর একটু দেখে শিখে গেঁয়োটা কতটা অগ্রসর হয় মজা দেখা যাবে।

ট্রাম ডিপো পিছনে রেখে সরু পথ ধরেছি। তখন থেকে পথের দুধারে নারকেল গাছের সারি শুরু হল। একটা দুটো পাখি ডাকছিল মাঝে মাঝে।

'মনে হয় গাঁয়ের রাস্তায় এসে গেছি, দাদা।'

'হুঁ, তোদের সোদপুরের জঙ্গল।'

ঠাট্টাটা সে বুঝল না। সত্যি কোনো জঙ্গলের কাছে এসেছি কিনা দেখতে অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকায় আর চপ্পলের শব্দ করে হাঁটে। বাবার একজোড়া পুরোনো চপ্পল পরে এসেছে।

'তুই সাঁতার জানিস?'

'খুব'। উৎসাহে লম্বা পা ফেলে আমার সঙ্গে এবার কাঁধ মিলিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল বুনোটা। 'আমরা কোনো দিঘিটিঘির ধারে যাচ্ছি বুঝি।'

'হুঁ', সংক্ষেপে বললাম, 'পদ্মদিঘি।'

'যদি পদ্ম ফুটে থাকে, আমি সাঁতার কেটে জল থেকে এন্তার ফুল তোমার জন্যে তুলে আনব, দাদা।'

'তাই আনবি।' খুশি হয়েছি এমন ভান করে বললাম, 'এখন শরৎকাল, এখন তো পদ্ম ফোটার সময়।' আর মনে মনে বললাম, বোকাটাকে সঙ্গে এনে ভালো করেছি। আমি সাঁতার জানি না, অথচ মাঝে মাঝে পদ্ম ফোটে, ইচ্ছে থাকলেও দুটো একটা ফুল আমি ওকে তুলে এনে দিতে পারি না।

'এই শোন।' বললাম, 'গাছে চড়তে পারিস?'

'খুব'। অতিরিক্ত খুশির দরুন গলার এমন ঘোঁত শব্দ করে সে হাসল যে প্রথমটায় চমকে উঠলাম, যেন একটা পশুর গলার শব্দ শুনলাম। গলা বড় করে গণেশ বলল, 'গাঁয়ে থেকে মানুষ, গাছে চড়তে শিখব না!'

ভালো, মনে মনে বললাম, ওদের দিঘির পাড়ের বাগানের পেয়ারা গাছ কত পেয়ারা পেকেছে, কামরাঙা গাছে কামরাঙা, অথচ গাছে চড়া শেখা হয়নি বলে একটা ফলও আমি ওকে পেড়ে দিতে পারি না। আজ গাড়লটাকে দিয়ে পদ্ম তুলে আনা, গাছের ফল পাড়া সব কাজ চলবে।

যেন দাদার সব কাজ করে দেবার বল বিক্রম নিয়ে ছ ফুট লম্বা কাঠামোটা আগে আগে হেঁটে চলল। এখন আর তার ওপর আমার বিদ্বেষ নেই, বা তার জন্য লজ্জা পাবার কারণ নেই। এমন একটা প্রয়োজনীয় জন্তু সঙ্গে থাকা দরকার চিন্তা করে হালকা মনে আমিও হাঁটতে লাগলাম।

'বাঁয়ে।' পিছন থেকে হেঁকে উঠলাম। গণেশ বাঁ দিকে মোড় নিল। প্রথমে মেহেদীর বেড়া, তারপর মাধবীর ঝোপ, তারপর কাঠমালতির জঙ্গল পার হয়ে সবুজ ঘাসের ফ্রেমে আঁটা সেই আশ্চর্য দিঘির কাছে আমরা এসে গেলাম।

না, জলের আয়নায় নারকেল গাছের ছায়া, সাদা মেঘ, নীল আকাশের ছবি দেখবার আগে আমার চোখ সরে গেল ওদিকে। করবী গাছের ছোট্ট ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ও। আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নিশ্চয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। আমার দেরি হয়ে গেল গাড়লটার সঙ্গে তর্ক করতে। শেষ পর্যন্ত যদিও ওটাকে সঙ্গে আনতে হল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। নিশ্চয় রাগ করেছে ও আমার এত দেরি দেখে। অন্যদিন দেখা হওয়া মাত্র ছুটে এসেছে। আজ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আজ তার বেশভূষা অন্যরকম। ফ্রক না, শাড়ি পরেছে। মেঘের রং। চট

করে মনে পড়ে গেল। ওটাই তার মেঘডম্বর শাড়ি। টালিগঞ্জের মাসিমা জন্মদিনে উপহার দিয়েছে, সেদিন বলছিল। এখানেও মাসিমা। কথাটা মনে পড়ে একটু হাসি পেল।

'এই, তুই বোস, নারকেল গাছের ছায়ায় চুপ করে বসে থাক।' বুনোটাকে বসিয়ে দিয়ে আমি করবী গাছের কাছে ছুটে গেলাম।

'চুপ করে আছ কেন?' ওর হাত ধরলাম।

হাত ছাড়িয়ে নিল ও। দু হাত তুলে খোঁপা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই নিয়ে দুদিন আমি তাঁকে খোঁপা করতে দেখলাম। যদিও এমনি বেণি করে রাখলেও ওকে কম সুন্দর দেখায় না। কিন্তু খোঁপা করলে বেশি সুন্দর লাগে। মেঘডম্বর শাড়ির সঙ্গে মেঘের থোকার মতন খোঁপাটাই চমৎকার মানিয়েছে। যেমন ফ্রকের সঙ্গে চেরা-বেণিটা ভালো লাগে।

'কথা বলছ না কেন?'

'দু রবিবার আসনি কেন?'

'ও, তাই অভিমান।' অল্প হাসলাম। কিন্তু বলতে পারলাম না ওই বুনোটা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, লজ্জা করছিল ওটাকে সঙ্গে করে এখানে আসতে। বললাম, 'শরীরটা খারাপ ছিল, তাই আসা হয়নি।'

'যত সব বাজে ওজর, ইস কী মিথ্যা কথাই না বলতে পারো তোমরা বালিগঞ্জের ছেলেরা!'

'বিশ্বাস করো!'

'মোটেই বিশ্বাস করি না তোমার কথা।' ঠোঁট ফোলাল ও, ভুরু কোঁচকালো। 'নিশ্চয় তুমি আর কারো সঙ্গে প্রেম করছ।'

'আর কে, আবার কে!' হাসতে গিয়ে অবাক হয়ে আমি ওর ফোলা ঠোঁট কোঁচকানো ভুরু জোড়া দেখলাম।

'তা কত মানুষ থাকতে পারে।' আকাশের দিকে চোখ ঘোরালো ও। 'নন্তুর বোন হতে পারে, পিন্টুর ছোট পিসি হতে পারে।'

'মোটেই না, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, ওদের দিকে তাকাতে আমার ঘেন্না করে।' ও দেখতে পায় এমন করে ঘাসের ওপর থুথু ফেললাম। 'নন্তুর বোনটাকে দেখলে আমার শাকচুন্নির কথা মনে হয়, পিন্টুর ছোট পিসিকে মনে হয় পেতনি একটা।'

'এবার ও ঘাসের দিকে তাকায়, দুই ঠোঁটের মাঝখানে হাসির রেখা জাগল।

'তোমরা বালিগঞ্জের মেয়েরা এমন ভুল বোঝাবুঝি করো—সত্যি দুঃখ হয়।' ওর হাত ধরলাম, এবার হাত ছাড়াল না ও।

আমি হাসলাম।

'আসলে আমার অসুখ করেনি, বুঝলে, ওই যে নারকেল গাছের ছায়ায় উল্লুকটা বসে আছে ওটার জন্য আসা হয়নি—দুটো রবিবার নষ্ট হল।'

'কে ও!' রুবি নারকেল ছায়ার দিকে চোখ ফেরায়।

'সোদপুরের ছেলে। মা বলে, আমার মাসতুত ভাই—কিন্তু আমি ভাই বলে স্বীকার করি না।' কিন্তু রুবি একটু বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে চোখ ফেরায়।

'রংটা খুব ফরসা, কেমন না?'

'ওই ফ্যাসফেসে রং-ই একটা আছে—আর কিছু নেই।'

'উঁচুলম্বা আছে ছেলেটা।'

'ওই মাথায় তালগাছের মতন লম্বা হয়েছে—ভেতরে কিছু নেই।'

'কেন!' ছোট একটা ঢোক গিলল রুবি।

'বোকা—একেবারে বোকা।' আবার ঘাসের ওপর থুথু ফেললাম আমি। নারকেল গাছের ছায়ার দিকে চোখ ফিরিয়ে রুবি আবার একটু সময় কী ভাবে।

'লেখা পড়া জানে না?'

'সেভেন পর্যন্ত বিদ্যা।' অল্প হাসলাম। 'হয়তো তা-ও না, বলে বটে।'

'একবার কাছে ডাকো না।' রুবি আর একটা ছোট ঢোক গিলল।

'কি হবে কাছে ডেকে। ভয়ংকর বুনো। কথা বলে সুখ পাবে নাকি ওর সঙ্গে।' আমি নাক কোঁচকালাম। 'সদ্য পাড়া গাঁ থেকে এসেছে। যখন আমাদের বাড়িতে এসে উঠল তখন তুমি যদি চেহারাটা দেখতে। এই লম্বা চুল মাথায়, থুতনিতে দাড়ির জঙ্গল, কী নোংরা বা বেশভূষা। তবু তো আমাদের এখানে থেকে থেকে কদিনে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে শিখেছে।'

'জলের দিকে তাকিয়ে আছে।' রুবি অল্প হাসল।

'হুঁ, পদ্মফুল দেখছে। দেখছ না কেমন হাবার মতন একদিকে তাকিয়ে আছে।' নিচু গলায় হাসলাম। 'তুমি যে একটি মেয়ে—আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, দেখতে পাচ্ছে, অথচ এদিকে তাকাচ্ছে না। অর্থাৎ মেয়েটেয়ে সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই তার নেই, সেসব কোনো বোধই ঈশ্বর তার ভিতর দেয়নি। হাঁ করে তাকিয়ে জল আর জলের পদ্ম দেখছে তো দেখছেই।'

'সরল—সাদাসিধা খুব, কেমন না?'

'গোরু—গাধা বলতে পার।' রুবির চোখের ভিতর তাকালাম। 'কাজেই এখানে, তোমার ও আমার মধ্যে ওটাকে আনতে পেরেছি। কেননা, মাথায় কিস্‌সু নেই যার তাকে দিয়ে ভয়ও নেই—গোড়ায় ভয় করছিলাম সঙ্গে আনতে। তাই তো দুটো রবিবার আসা হল না।'

রুবি লম্বা মতন একটা নিশ্বাস ফেলল। চোখের পলক ঘাসের দিকে নেমে গেল ওর। একটু চুপ থেকে আমি আবার হাসলাম।

'অবিশ্যি আমার সঙ্গে থেকে একটু একটু শহুরে হতে শিখছে—ওই দেখে দেখে যেটুকু অনুকরণ করার—তার বেশি না, নিজে থেকে কিছু করবার বুঝবার ক্ষমতাই ঈশ্বর ওকে দেয়নি।'

'কি শিখেছে শুনি!' রুবি হাসল না।

'আমরা বালিগঞ্জের ছেলেরা কী করি কেমন করে থাকি তুমি কি জানো না। এই ধরো যেমন রোজ গায়ে সাবান মাখা। আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া। সাবান মেখে স্নান না করলে আমি আমার বিছানায় ওকে শুতে দেব নাকি। আমি একদিন অন্তর শেভ করি—বলে কয়ে ওটাও ওকে অভ্যাস করিয়েছি। রামছাগলের মতন মুখ করে রাখলে আমি আমার ঘরে ঢুকতে দিতাম না ওকে।'

'আর?' রুবি এবার মুচকি হাসল।

'আমি স্মোক করি তুমি জানো, দেখাদেখি একটু আধটু সিগারেট টানে এখন বোকাটা। আমি সিনেমার কাগজ রাখি তুমি জানো। আমার দেখাদেখি সেগুলো নাড়াচাড়া করে মাঝে মাঝে, সুন্দর মেয়ের মুখ থাকলে ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।'

'তবে আর কি, তবে তো একরকম পাকিয়ে এনেছ।' রুবি হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

'ধেৎ—ও আবার পাকবে কি, পাকতে যাওয়ার জন্যও বুদ্ধি থাকা চাই; ওই তো বললাম, যেটুকু দেখছে সেটুকুই করছে—তার বেশি না। যেমন একটা বানরকে সিগারেট খাওয়া শেখালে সিগারেট খাবে এ-ও তেমনি।'

'ইস—ভীষণ বাড়িয়ে বলছ তুমি তোমার ওই মাসতুত ভাই সম্পর্কে।' রুবি আবার আকাশের দিকে চোখ তুলল, কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছে ও—চেহারা দেখে বুঝলাম।

'মোটেই না।' আমারও খারাপ লাগল বোকাকে বোকা স্বীকার করে নিতে রুবির আটকাচ্ছে কেন। 'তুমি বললে বিশ্বাস করবে? তোমার কটা চিঠি ওই গাড়লটা পড়েছে, আমিই পড়তে দিয়েছি—'

'মাইরি' চমকে উঠল ও, চোখের পাতা দুটো কেঁপে উঠল।

'তাতে কি?' ব্যাপারটাকে সহজ করে দিতে আমি হালকা গলায় হাসলাম। 'ওই পড়াই সার—একটা চিঠি পড়ে তা থেকে কোন আইডিয়া করে নেওয়ার ক্ষমতা ভগবান ওকে দিয়েছে নাকি। যখন পড়ল, তখন পড়ল, যেমন সিনেমার কাগজ উলটে একটা সুন্দর মেয়ের ছবি যখন দেখল—দেখল, ব্যাস, তারপর এই নিয়ে কিছু ভাবা বা চিন্তা করা ওই উজবুকটার কাছ থেকে তুমি আশা করতে পারো না।'

কিন্তু তবু রুবির দুশ্চিন্তার ভাব কাটছে না।

আমি আর এক দফা হাসলাম।

'যদি তাই হত তো চিঠি পড়া শেষ করে আমায় নিশ্চয় এক আধবার সে জিজ্ঞাসা করত, কার চিঠি কে লিখেছে বা কেন এত মিষ্টি মিষ্টি কথা লেখে—চিঠিতে আমার বা তোমার নামধাম নেই যখন।'

'হ্যাঁ, তা-ও বটে।' এবার একটু খুশি হল ও। আমার চোখের দিকে তাকাল।

'ডাকব কাছে? তুমি কথা বলে দেখবে?' আবার আমি নাকের আগাটা কোঁচকালাম। 'তখন বুঝবে কেমন বুনো জংলি মা'র ওই সোদপুরের বোনের ছেলে।'

রুবি অস্পষ্টভাবে ঘাড় কাত করল।

'এই গণেশ।'

গণেশ চমকে উঠে চোখ ফেরাল। জল দেখা শেষ করে এখন বুঝি ওধারের বাগানের পেয়ারা আর কামরাঙা গাছ কটা দেখছিল শুনছিল।

'ইদিকে আয়।' হাত তুলে ডাকলাম।

ছ ফুট লম্বা শরীর নিয়ে হাঁদারাম উঠে দাঁড়াল। কাছে ডেকেছি বলে বেজায় খুশি। আমি ঈশ্বরকে ডাকছিলাম রুবির সামনে না বাতাসার মতন গোল মাথার দাঁতগুলি বার করে দিয়ে বুনোটা হাসতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঈশ্বর আমার ডাক শুনবে কেন, যার যেমন স্বভাব গড়ে দিয়েছে—দু হাত দূরে থাকতে সব কটা দাঁত সে মেলে ধরল। তা-ও যদি শব্দ করে হাসত উজবুকটা। কাঁঠালের কোয়ার মতন এতগুলি দাঁত বার করে চুপ করে হাসতে থাকলে যে-কেউ তাকে ইডিয়ট ছাড়া আর কিছু মনে করবে না, করতে পারে না। অবশ্য রুবি চুপ করে ছিল। কিন্তু ওর চোখ মুখের অবস্থা কেমন হল আমি দেখিনি। আমার লজ্জা করছিল তখন রুবির দিকে তাকাতে; ঘাসের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অবস্থাটা একটু সয়ে আসতে কটমট করে আমি গণেশের দিকে তাকালাম। যেন আমার এই তাকানোর অর্থ সে বুঝল। দাঁতের সারি বুজিয়ে ফেলল। রুবি

একদৃষ্টে গণেশকে দেখছিল, ওর চেহারার কোনো পরিবর্তন বোঝা গেল না। কেবল হাত তুলে খোঁপাটা ঠিক করছিল।

'গণেশ চমৎকার সাঁতার কাটতে জানে।' বললাম রুবিকে।

'তাই নাকি।' আমার দিকে চোখ ফেরাল ও।

'যদি তুমি চাও তো ওই সুন্দর পদ্মফুলটা সে তোমাকে তুলে এনে দিতে পারে। কেমন পারবি না, গণেশ?' আবার সে দাঁত বার করছিল, কিন্তু আমি চোখের ইশারায় ধমকে দিতে সেগুলো আর বার করতে সাহস পেল না, ঠোঁট বোজা রেখে গণেশ হেসে ঘাড় কাত করল।

'নীচে ইজের আছে না তোর?'

'আছে।'

'তবে ওই ঝোপের পাশে গিয়ে পা'জামাটা খুলে আয়।'

কথা না কয়ে গণেশ কেয়াফুলের বড় ঝোপটার ওপাশে ছুটে গেল। রুবির দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

'আমি যা বলব তাই শুনবে। বুদ্ধি না থাকায় একটা মস্ত সুবিধে। পোষা কুকুরের মতন, ওকে দিয়ে আমি যা ইচ্ছা করাতে পারি।'

রুবি কথা বলছিল না। কেয়ার ঝোপের দিকে ওর চোখ। গণেশ ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল। বুঝলাম ওটা বাবার পুরোনো ইজের—দু জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে, তাল গাছের গুঁড়ির মতন ইয়া লম্বা দুটো পা, তার ওপর চুলে ভর্তি—আমার কেমন ঘেন্না করছিল গাড়লটার দিকে তাকাতে, তবু এতক্ষণ পায়জামা পাঞ্জাবিতে একরকম লাগছিল, এখন বনের পশু ছাড়া আর কিছু কল্পনা করা যায় ওকে? আর ওই অবস্থায় রুবির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে আমি ধমক লাগালাম।

'এখানে এলি কেন, জলে নেমে পড়—ফুলটা তুলে আন।'

'বোঁটা শুদ্ধ তুলে আনবে।' রুবি বলল। রুবি এই প্রথম বুনোটার সঙ্গে কথা বলল। বস্তুত তাতে তার একটু বেশি খুশি হবার কথা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ জলের দিকে ছুটে গেল বলে চেহারাটা দেখতে পেলাম না। আমার মনে হয় না একটি মেয়ের মুখে একথা শোনার পরও গণেশের চেহারার খুব একটা পরিবর্তন ঘটেছিল – কেননা, ফুলটাই এখানে তার লক্ষ্য, ওটা এনে কোনো মেয়ের হাতে তুলে দেবার মধ্যে যে উত্তেজনা - একটা অন্য ভাব থাকতে পারে তা ভেবে দেখার মতন মগজ তাকে দেয়নি ঈশ্বর।

'এসো আমরা জলের কাছে যাই।' রুবি বলল। রুবির হাত ধরে আমি দিঘির দিকে এগোই। তখন রৌদ্রের কমলা রং ধরেছে। জলে নেমে এত জোরে গেঁয়োটা সাঁতার কাটছে, হাত পা ছুঁড়ছে যে ঈষৎ লাল হয়ে আসা মেঘের ছায়া, নীল আকাশ, নারকেল গাছের সুন্দর ছবিগুলি ভেঙেচুরে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সবটা দিঘির জল তোলপাড় করে একটা জানোয়ার সাঁই সাঁই করে পদ্মবনের দিকে ছুটেছে। দৃশ্যটা কেমন অস্বস্তিকর লাগছিল, অথচ রুবির জন্য ডাঁটা শুদ্ধ ফুল ছিঁড়ে আনতেই হবে। আড়চোখে রুবিকে দেখলাম, দৃশ্যটা তার ভালো লাগল কি খারাপ লাগল বোঝা গেল না। মুখের রেখার কোনো পরিবর্তন ছিল না। চোখের কালো লম্বা পালকগুলি স্থির করে ধরে রেখে ও জল দেখছিল।

ফুল নিয়ে গণেশ ফিরে এল। কোমর জলে দাঁড়াল। রুবি হাত বাড়াল ফুলটা ধরতে।

'না', আমি বাধা দিলাম, 'তুই আর একটু কাছে উঠে আয়, গণেশ।'

আমার কথামতো সে তীরের কাছে উঠে এল।

'ওর খোঁপায় গুঁজে দে পদ্মটা।'

রুবি চমকে উঠল, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। আমি আদেশ করলাম, 'দে, সুন্দর করে গুঁজে দে ওটা ওর চুলে।' গম্ভীর হয়ে গণেশ দাঁতগুলি বার করতে চেয়েছিল, আমার চোখের ধমক খেয়ে নিজেকে সংশোধন করল। রুবি ঘাড় নোয়াল। গণেশ ওর খোঁপার চুলের ভিতর ফুলটা আটকে দিল। খোঁপাটা একটু নড়ে গেল। রুবি হাত দিয়ে ওটা ঠিক করতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল বাঘের থাবার মতন বিশাল দুটো হাতের তেলো দিয়ে চেপেচুপে গণেশই ওটা ঠিক করে দিয়েছে। রুবি একটু লাল হয়ে উঠল।

'যা, আর একটা ফুল নিয়ে আয়।'

বলা মাত্র পশুর মতন ঝাঁপিয়ে গণেশ জলে পড়ল।

'ইস, এমন লজ্জা করছিল আমার।' রুবি বলল।

'কেন, কাকে লজ্জা', আমি হাসলাম, 'ওর মাথায় কিছু আছে নাকি; তোমার চুলে গুঁজে দিচ্ছিল বলে অন্য কোনোরকম ধারণা তার মনে এসেছিল, তুমি আশা করতে পারো না—যদি ওই লোকটাকে দিয়ে তোমার লজ্জা করে তবে একটা গাছকে দিয়েও তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।'

রুবি ঠোঁট ফাঁক করে হাসল।

'আহা, তা হলেও তো পুরুষ।'

'তার সে খেয়ালই নেই সে একটা পুরুষ, আর--আর তুমি এমন ফুটফুটে চেহারার একটি নরম মেয়ে।'

রুবি ঢোক গিলল, চুপ করে রইল।

'বরং আমায় ভয় হচ্ছিল বুনোটার হাতের নখগুলির জন্য, বাঘের নখের মতন এত বড় এক একটা নখ; যখন তোমার খোঁপা ঠিক করে দিচ্ছিল ঘাড়ের নরম চামড়ায় ওই নখের আঁচড় না লাগে, রক্ত না বেরোয়।'

'না, কিছু হয়নি।' রুবি নরম গলায় হাসল ও হাত দিয়ে নিজের ঘাড় কাঁধটা ছুঁয়ে দেখল। গণেশ ততক্ষণে সাঁতার কেটে পদ্মবনের কাছাকাছি চলে গেছে।

'তুমি ফুলটা গুঁজে দিলে না কেন?' রুবি প্রশ্ন করল।

ঘাড় কাত করে হাসলাম।

'আমি তো অনেক গুঁজেছি—তোমার খোঁপায় কম ফুল গুঁজে দিয়েছি! আজ বুনোটাকে দিয়ে কাজটা করালাম।'

'আর একটু শহুরে হতে শেখাচ্ছ বুঝি ওকে?'

'হ্যাঁ, তা-ও বলতে পারো।' অল্প শব্দ করে হাসলাম, 'বা বলতে পারো মজা দেখছিলাম, খেলছিলাম, একটা পশুকে নিয়ে খেলতে তোমার ভালো লাগে না? কেমন করে ও তোমার খোঁপাটা হাটকায় মাথাটা দু হাতে চেপে ধরে?'

রুবি আর কথা বলল না, একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

গণেশ পদ্ম নিয়ে ফিরে এল।

রুবি আবার হাত বাড়াল। আমি বাধা দিলাম না। গণেশ ওর হাতে ফুলটা তুলে দিতে রুবি সেটা তাড়াতাড়ি ব্লাউজের ফাঁকে বুকের ওপর গুঁজে রাখল।

'আয় এইবেলা জল থেকে উঠে আয়।' গম্ভীর হয়ে গণেশকে ডাকতে সে তীরে উঠে এল। যেন আমি তার ওই অবস্থায়—ভিজা ইজের পরা ভিজা গা-মাথা নিয়ে গাড়লের মূর্তি হয়ে রুবির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একেবারেই পছন্দ করব না অনুমান করে কাপড় বদলাতে সে ঝোপের দিকে ছুটে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিলাম।

'উঁহু, আরো কাজ আছে, ফল পাড়তে হবে—পা'জামা পড়ে গাছে চড়া সুবিধা হবে না।' রুবির দিকে ঘাড় ফেরালাম, 'কটা পাকা পেয়ারা পেড়ে দিক তোমাকে?'

রুবি কিন্তু খুশি হল কিনা বুঝলাম না, কেবল ছোট ঘাড়টা একটু কাত করল ও। আমরা বাগানের দিকে চললাম। গণেশ আগে, আমি ও রুবি পিছনে। গাছের ছায়া তখন লম্বা হয়ে গেছে, রোদের রং আরো গাঢ় হয়েছে, ঝিঁঝি ডাকছিল।

গণেশকে গাছে তুলে দিয়ে দুজনে নীচে দাঁড়ালাম। দেখলাম, এখন যেন রুবির উৎসাহ একটু একটু করে বাড়তে আরম্ভ করেছে। আঙুল দিয়ে গাছের ডাঁশা পেয়ারাগুলি ও দেখিয়ে দেয়, আর, এক ডাল থেকে আর এক ডালে ঝুলে পড়ে গণেশ সেগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নীচে ছুঁড়ে ফেলে।

'এখন অনায়াসে একটা বানর কি শিম্পাঞ্জি বলে ধরে নিতে পারো তুমি গণেশকে; দ্যাখো ওই মগডাল থেকে লম্বা হাত বাড়িয়ে কেমন করে পেয়ারা ছিঁড়ছে।' রুবি আমার সঙ্গে হাসল না, পেয়ার কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। টুপ টাপ করে গাছ থেকে ক্রমাগত পেয়ারা পড়ছে মাটিতে। একটা পেয়ারা ওর খোঁপার ওপর পড়ল, পদ্মের দুটো পাপড়ি খসে পড়ল পেয়ারার বাড়ি লেগে, একটা এসে পড়ল রুবির বুকের ঠিক মাঝখানে। যদি আমি এমন করতাম, গাছে চড়তে না জানি, যদি মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকেও এভাবে ওর চুল কি বুকের ওপর পেয়ারা ছুঁড়ে ফেলতাম রুবি খিলখিল করে হেসে সারা হত। কিন্তু এখন ও হাসছে না, কেননা ইচ্ছা করে বা দুষ্টুমি করে কেউ তার মাথা বা বুক লক্ষ্য করে পেয়ারা ছুঁড়ে মারছে না। গাছের ওপর যে আছে তার সেরকম দুষ্টুমি করার ছেলেমানুষি খেলা খেলবার বুদ্ধিই নেই রুবি এটুকু বুঝে ফেলেছে, তাই না ও এত গম্ভীর। রুবির জন্য আমার কষ্ট হল।

'কেবল কুড়াচ্ছ, একটা খাও না, খেয়ে দ্যাখো কেমন মিষ্টি।' একটা পেয়ারা তুলে আমি রুবির দিকে বাড়িয়ে দিলাম, এতক্ষণ পর ও হাসল।

'তুমি খাও, তুমি বসে বসে পেয়ারা খাও, 'আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি।' রুবি এক ডজন পেয়ারা আমার সামনে ঘাসের ওপর জড়ো করে রাখল। খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘাসের ওপর চেপে বসলাম। রুবির দেওয়া একটা পেয়ারায় কামড় দিয়ে মনে হল অমৃত। ও ঘামছিল। ছুটে ছুটে পেয়ারা কুড়াচ্ছে বলে খোঁপাটা আবার ঢিলে হয়ে গেছে। আমার ইচ্ছা করছিল হাত দিয়ে চেপে খোঁপাটা জায়গা মতন বসিয়ে দিই। আর সেই সঙ্গে আমার হাতের নখগুলির ওপর নজর পড়ল। কত পরিচ্ছন্ন মসৃণ। রুবির গলা বা ঘাড়ের চামড়ায় এই নখ লাগলে ও বুঝতে পারবে না—টেরই পাবে না—এমন পালিশ করে কাটা; আর সেই তুলনায় গাছের বুনোটার প্রত্যেকটা আঙুলের নখের কী বিশ্রী বীভৎস চেহারা। বলতে কি গণেশের নখগুলির কথা মনে পড়তে মুখের পেয়ারাটা পর্যন্ত বিস্বাদ হয়ে গেল। ইচ্ছা করছিল রুবিকেও আবার কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে দুজনে একসঙ্গে হাসি।

হঠাৎ চোখে পড়ল পেয়ারা কুড়াতে কুড়াতে রুবি একটু দূরে সরে গেছে। গাছের গায়ে গাছ, বুঝলাম একটা গাছের ডাল বেয়ে গাড়লটা আর একটা গাছে চলে গেছে। 'আর পেয়ারা দিয়ে

কী হবে, অনেক হয়েছে,' ডেকে বলতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু চুপ করে রইলাম। রুবি কুড়িয়ে আনন্দ পাচ্ছিল, ওকে বাধা দিলাম না।

অগত্যা সিগারেট ধরালাম। পেয়ারা কত খাওয়া যায়! দুটো খেয়ে আমার ঢেকুর উঠছিল। সিগারেট ধরিয়ে টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণেশও গাছ থেকে নেমে পড়ল।

'কি হল, হয়ে গেল?' আমি হাসলাম, রুবির দিকে তাকিয়ে হাসলাম, ও আমার কাছে চলে এল। বোকাটা দূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ওই পোশাক নিয়ে আমার সামনে ছুট করে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সত্যি, ঈশ্বর এই বয়সেই মা'র বোনের ছেলেকে কী প্রকাণ্ড একটা শরীর তৈরি করে দিয়েছে—অসুরের মতন কোমর হাত পা ও বুকের চেহারা; কোমরে হাত রেখে পেয়ারা তলায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার আদেশের অপেক্ষা করছে, আমি ডাকলে তবে কাছে আসবে, যতক্ষণ ডাকব না আসবে না। কথাটা চিন্তা করে এত ভালো লাগছিল। রুবিও বুঝতে পেরেছে, অতবড় একটা শরীর ওই বুনোটার, অথচ তুলনায় কত ছোটখাট একটি মানুষ হয়ে আমি তাকে হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছি।

আঁচলের পেয়ারাগুলি রুবি আমার সামনে ঘাসের ওপর রাখল। পেয়ারার পাহাড় জমে গেল। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার দরুন ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল ওর।

'একটু জিরিয়ে নাও এখানে বসে।' বলতে চেয়েছিলাম, তার আগেই রুবি সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'চলি।'

'কোথায় আবার।' আমি ঢোক গিললাম। ও অল্প হাসল।

'কামরাঙাগুলো পেকে আছে কদিন ধরে—সেগুলো পেড়ে দেবে।'

খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করলাম।

'ওই গাড়লটাকে দিয়ে সব কটা পাড়িয়ে নাও।' আস্তে বললাম, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক দিয়ে গণেশকে বললাম, 'এই গণেশ, এখন কামরাঙা গাছে উঠতে হবে।'

গণেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করল। রুবির চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ঠোঁট টিপে হাসলাম। যদিও এই হাসিটাকে 'মেয়েলি হাসি' বলে ও মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, এখন করল না; এখন ও পালটা ঠোঁট টিপে হাসল। এখানে আমার হাসির অর্থ রুবি চট করে বুঝে নিয়েছে। আর দাঁড়ায় না ও, কামরাঙা গাছের দিকে ছুটে গেল। গণেশ আগেই চলে গেছে।

যেন আর একটা কি কথা আমি বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ঝাঁকড়া মাথার বাতাবি লেবু গাছটার জন্য রুবিকে দেখা গেল না।

আমি নিশ্চিন্তমনে হাতের সিগারেটটা টানতে লাগলাম। রোদটা একেবারে মজে গেছে। ঝিঁঝির ডাক ক্রমে খরতর হয়ে উঠছে। সুন্দর একটু হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে বলে বাতাবিলেবুর পাতাগুলি থেকে থেকে দুলছিল। দুজনকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু রুবির গলা শুনছিলাম।

ওর গলার স্বর শুনে আমি বুঝতে পারছিলাম, উৎসাহ বেড়ে গেছে। 'ওই যে, আর একটা, আর একটা, পেকে টুসটুসে হয়ে আছে, কেমন হলদে হয়ে আছে ওই কামরাঙাটা।' চেঁচিয়ে বলছিল ও। একটা পাখি ডাকছিল। কিন্তু পাখির স্বরের চেয়েও রুবির গলা যে অনেক বেশি মিষ্টি সিগারেট টানতে টানতে আমি তা অনুভব করছিলাম। একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাসলাম। কেননা রুবির ছোট্ট একটা খিলখিল হাসি ইতিমধ্যে আমার কানে এসেছে। অর্থাৎ এতক্ষণ পর, অনেকক্ষণ চেষ্টার পর রুবি বুনোটাকে নিয়ে খেলতে পারছে; রুবি নিশ্চয় হাসি দিয়ে তাকানো

দিয়ে বোকারাম গণেশের মধ্যে দুষ্টুমি বুদ্ধি জাগাতে পেরেছে; বোধ করি ইচ্ছা করে গণেশ ওঁর খোঁপা লক্ষ্য করে এক আধটা কামরাঙা ছুঁড়ে ফেলতে পারে; তাই রুবির হাসি।

জড়বুদ্ধির একটা মানুষকে আমি বাধ্য করে ফেলেছি, হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি, তাই আমার আনন্দের অবধি ছিল না; এখন রুবিও সেটা পারছে, একটা জানোয়ারকে বশ করে ফেলেছে, তাকে নিয়ে খেলছে। রুবির সঙ্গে এই নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে চিন্তা করে আমি তখনি উঠলাম না, চুপ করে বসে সিগারেট টানতে লাগলাম, যেন আশা করছিলাম রুবির খিলখিল হাসিটা আর একবার শুনব।

একটা দমকা হাওয়া উঠল, উঠল আবার সঙ্গে সঙ্গে থেমেও গেল। আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। কেননা একটু সময়ের জন্য বাতাসটা কেমন যেন অস্বস্তি জাগিয়ে দিয়ে গেল। বাতাস বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকটা যেন বেশি চুপচাপ হয়ে গেল। গাছের পাঁতা আর নড়ছে না। রুবির গলা শুনছি না, বা ওধারে গাছের ডালে উঠে কেউ ফলটল পাড়ছে সেরকম কিছু আভাস পাচ্ছি না! পাতার খসখস কি ছোটখাট ডাল ভাঙার শব্দ—কিছু না। সব মরে আছে স্থির হয়ে আছে। ঝিঁঝির ডাকটাও থেমে আছে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

উঠে আস্তে আস্তে বাতাবিলেবু গাছটার দিকে এগোলাম। এক সময় লেবু গাছ পিছনে ফেলে, জঙ্গল মতন জায়গাটা, যেখানে সারি সারি তিনটে কামরাঙা গাছ, সেখানে চলে গেলাম। কাউকে দেখলাম না। অতি সূক্ষ্ম আওয়াজ করে কি একটা পোকা কোন গাছের শুকনো ডাল না শিকড় যেন কুরে কুরে খাচ্ছিল। কেমন ভয় হল মনে। বস্তুত সেখানে কোনো মানুষ চুপ করে বসে বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বিশ্বাস করতে বাধছিল, এত নির্জন, এমন নিঃসঙ্গ, মনে হচ্ছিল বাগানের ভিতরটা। কামরাঙা গাছ দেখা শেষ করে আমি লিচু গাছের কাছে গেলাম। লিচুর সময় না, কাজেই জায়গাটা আরো শূন্য স্তব্ধ মনে হল। দুবার আমি রুবির নাম ধরে ডাকলাম, তিনবার গণেশকে ডাকলাম। কোনো সাড়া নেই। বা বলা যায় আমার ডাকের উত্তরে আতাবনের ওদিকটা থেকে বাদুড়ের পাখার ঝাপটা ভেসে এল। আতাজঙ্গলের দিকে যাব কি, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে ততক্ষণে, সাপের হিসহিস শব্দের মতন একটা শব্দও ভেসে আসছিল ওদিক থেকে। তাছাড়া আতা পাকতে আরম্ভ করেনি যে ওরা ওখানে যাবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম ওরা সেখানে নেই; আবার পেয়ারা তলায় ফিরে এলাম, দিঘির ধারে ছুটে এলাম। জলের বুক কালো হয়ে গেছে। অন্যদিন এসময়টায় তারার ঝিকিমিকি ছবি ধরে রাখে দিঘিটা আরশি হয়ে—আজ সেরকম কোনো ছবি ছিল না, অথবা ছিল, আমিই দেখিনি, দেখার চোখ ছিল না; চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে উঠল একটু সময়ের মধ্যে। ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে যে-কথাটা ভাবতে ভাবতে আমি বাগান থেকে সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম, তা ঠিকই হয়েছিল। আর দশজনের ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনা মিলে গিয়ে তা চিরকালের সত্য হয়ে রইল।

কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হত, ওরা বাগানেই ছিল, বাগান থেকে বেরিয়ে কোথাও যায়নি। সেই সন্ধ্যার ছবিটা আমার মনে পড়ত। যাকে বুনো বলতাম গাড়ল বলতাম, সে আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সেই অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।

চতুরঙ্গ, ১৯৬১

তেইশ

কমলকুমার মজুমদার

ছ-আনির বাবুদেরই টুলটুলী। ৫নং ছিটে দেখা যাবে উত্তর-পশ্চিম কোণের রাখহরি সর্দারের জমির মধ্যবর্তী তিনবিঘে এবং ওপাশে খালের মাঝবরাবর দেড়বিঘে, একুনে সাড়ে চার বিঘে জমি তার ছিল, এ জমি আবাদী। ফসল ভগবানের দান; যদিচ লাঙল ঠেলে যাদের শরীরে ছায়া পড়ে না, এমনি যখন যে অবয়ব। সে চাষ করে, সে আকাশকে প্রত্যয় করেই, সে জগদীশ্বরে মতি রাখে, সে ক্যাংলা বলদজোড়াটা ভালোবাসে! যেহেতু কেননা সে চাষী। কখনও সে হয় জন, জন খাটে। এখানে বহুদিন পূর্বে, তার বাবার বাবা এসেছিল, যখন এসেছিল তখন সমস্ত লাট চরাচর বেহাঁসিল ছিল, অতঃপর ভেড়ি টাঙানো হয়েছিল, এবার সমৃদ্ধি সবুজ দেখাল; যাবা পত্তন করেছিল বাবুরা তাদের উচ্ছেদ করলেন; পরম্পরা নিরিক বেড়েছিল। বাবুরা সজ্জন, তারা একটা টিউবওয়েল করে দিয়েছেন। টিউবওয়েলে জল নেয়; কে নিচ্ছিল, এখন তার শব্দ আসছে, গোরুগুলো আলমের নিস্তব্ধতার সুযোগ নিয়েছিলই তারা চোরের মতো দাঁড়িয়েছিল, সে শুনছিল কিয়ৎক্ষণ; অন্যমনস্কভাবে সে কাপড়টা এঁটে দিয়েছিল। টিউবওয়েলের শব্দ শুনছিল, বিড়বিড় করে বললে, বাবুরা সজ্জন! হাজার হোক বাবুরা বাপমা, আর একবার বলছিল 'বাবুরা সজ্জন' বলে যেক্ষণে সে ফিরেফিরতি বলদের ল্যাজ মলে দিয়ে বললে, 'আঃ দূর দাঁড়ালি কেন হারামী'—হলেও তার গলায় লাঙলের শশ্ স্বর।

'কি মিয়া ভাবছ কি, মাজায় ব্যথা নাকি?' এটুকুতেই সে ইতর রসিকতা করেছিল।

ইত্যাকার কথায় আলমের গা জ্বলে ওঠার কথা, এজন্য সে দাঁতে দাঁত ঘষে, বলদের পিঠে মারলে কষে, 'চল শালা' এবং সেইহেতু সে বলেছিল, 'শালা গোরুচোর চোখের যদি একটুকু পর্দা থাকে, যোশোদাদুলাল, শালার মুখে আগুন, তোর মা তোকে আঁতুড়ে মারেনি, শালা ছোটলোক বেইমান,' সত্যিই সে আউরে গিযেছিল কেননা যেহেতু যশোদা বউয়ের দু-গাছা চুড়ি গড়িয়ে দেবার খবর পৌঁছে দিয়েছিল কাছারীবাড়ি। এতে আলমের এখন যদি বেসামাল ঘটেই, যদি তার রাগ চারায়, তাহলে কিছুই নয়।—আলম সোজা ছোট মানুষ; হয়তো অভাবেরও বা সোজা মানুষটি বেঁচে রয়, ফলে সে চুড়ি গড়িয়েছিল, অন্যপক্ষে তার নিরিক বাঁকি। দেব, দিয়ে দেবই, নিশ্চিত দেব এমন সদিচ্ছা তার থাকে, ফলত কথাগুলি। তৎজন্য যশোদার উপর তার ভারী সাংঘাতিক ক্রোধ হল, সময়ে জ্বলে জ্বলে পুড়ে, এ রাগ কমাবার যেমন নয়।

বলদগুলি ঘুরে ঘুরে চলছে, এখানে ও আর তারাপদ আর আলিজান ছাড়া যারা লাঙল দেয় তারা সবাই জন, ভাত দুবেলা সকালে পান্তা এবং রোজ তারিখে তিনগণ্ডা এই হিসেবে তারা জন খাটে।

"গোরুচোর" যশোদাও জন। এমন যে, তখন সে বলেছিল, 'আর লাঙল দে কি হবে।'

'দেখ শালা গোরুচোর যশোদা, ফের যদি কথা বলিস, মেরে তো হাড় ভেঙে দেব হারামী...'

বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছিল, যখন এমনই অতএব নিজেও বুঝি সে ভারী আশ্চর্য ভেবেছিল এমনকি যশোদা তার প্রতি বলে, যে সে তদ্দণ্ডে ক্রুদ্ধ হয়। যদিও যশোদার কথা বাঁকা ছিল,

যদি সত্যিই, সুতরাং কিছুই কিছু নয়। একটা চোখ যখন যার ঘোলা, হয়তো সেই সবেরা একটু স্বাভাবিক নয়। এটিও একটি সত্য, ঠিক তাহলেও এখনও একটি অপেক্ষা ছিল। এবং এই সূত্রে সে আরও ঠিক ছিল, যে দুপুরবেলায় কাছারীবাড়ি যাবেই, অনেক দূরে দেখা যাবে ওই অশ্বত্থ গাছের পাশে বহু পুরাতন বাড়িটা টুলটুলীর কাছারীবাড়ি, অবশ্য শুধু এ ছাড়াও আর আর লাটের এই কাছারীবাড়ি। ঠিক ঠিক খবর যখন পায়, পাবেই। আলম নিজে আর তেমন শিষ্ট নয়, সে কিছু বিপজ্জনক। 'গোরুচোর' কথাটা যশোদার অপ্রিয় বলে বোধ হয়, এবং সে নিবিষ্ট মনে লাঙল দিতে থাকল। সে লাঙল দেয়, আর-আররাও লাঙল দেয়।

সূর্য মানিক বায়েনের গোলা ছেড়ে উঠে এসেছে এখন। সুতরাং তার অর্থ প্রায় এগারোটা বেজেছিলই। উত্তরে ওপারে খাসমহলের ভেড়িপথ—কারা, ওরা কারা? এক চোখে সে বহুদূরে লোক চিনতে পারেনি, অন্যপক্ষে দেখতেও পায়নি। সামনে সাইকেলে দফাদার, চৌকিদার, নায়েব যতীনবাবু, গোমস্তা, আমিন, পিছনে ঢোল আর পাঁচ-ছজন লোক, প্রত্যেকের হাতে ছাতি, শুধু যতীনবাবুর মাথায় বেলদার নন্দ ছাতা ধরেছে; একটি ছোট্ট শোভাযাত্রা যেন। ট্যাঁড়ায় গুম্ গুম্ গুম্ আওয়াজ সঙ্গে—'তিন নম্বর লাটের সম্পত্তি নীলাম হবে...'

এখনও আলম শুনতে পায়নি অথবা সে ঢোলের আওয়াজ শুনেছিলই—সে হয় একটি বোকা, সরল করে ভেবেছিল, হয়তো গোরু খোয়া গিয়েছে বা, হয়তো অন্য কিছু খোয়া গিয়েছিল অথবা সে যেমন চষে, লাঙলটা একটু জোর করে মাটিতে চেপে ধরলে বীজধানগুলো ভারী সবুজ হয়েছে হুকারস্ সবুজ...।

যখন ছোট জনস্রোতটা এসে থেমেছিল খালের ওপাশে, খাসমহলের রাস্তায় যতীনবাবুকে মোড়া পেতে দিয়েছিল ভব, তিনি আসীন। ছোট একটা লাল নিশান। আবার ঢোল বাজল ভারী জোরে, কিন্তু এতক্ষণেও আলমের বুকের উপর বাজা উচিত, তা হল না। সবাই ছিট দেখতে ব্যস্ত; যতীনবাবু বললেন,—একটু কেশেছিলেন, 'আর দেরি নয় ডাক হোক...ভালো জমি তেজী, চার কাহন ধান, বরাদ্দ—আর দেখ বদোরদ্দী—বাঁধ দেখ—খাড়া বার হাত উঁচু, চারিদিকে গই (সুলিইশ)...চুপ কেন, ডাক দাও...একুনে সাড়ে চার বিঘে, টাকা পরে দিও... পরে দিও ও সুরেন সাঁপুই ডাকো...।'

'আমি আর কি বলব, বদরোদ্দী মিঞা যখন...' তখন বোধ হয় সে এখন ঠাট্টাই করেছিল, কেননা তার প্রায় ৬০০ বিঘে জমি, 'না, নায়েব মশাই ও জমি ডাকব না, আলমের ঠাকুরদার বাবা, আর আমার ঠাকুরদার বাবা বন্ধু ছিল, এখনও পুণ্যাহে ওরা আর আমরা কাপড় পাই—আমি ডাকব না...ওরা বহু পুরানো চাষী খাতকের বংশ, আজ নয় এলো হয়েছে...'

যতীনবাবু এতে কিছু বলতে পারলে না, যেহেতু সে সুরেন সাঁপুই জাতিতে ওরা উগ্রক্ষত্রিয় হলেও পয়সা আছে।

বদরোদ্দীর একটু খটকা লাগল, গুড়ের ব্যাপারী সে, তার খটকা লাগল। সে চুপ করলে। কিন্তু ছোটখাটো গ্রাহকের মধ্যে সদাশিব কয়াল ছিল, বাড়িতে তার একটা মেয়েমানুষ আছে, তাই তার বীরত্ব করার স্পৃহা ছিল সে বলে উঠল...পঁচিশ—পঁচিশ...'

'পঁচিশ কি রকম?' হাসলেন বললেন, 'নিরেক ১৫০ আনা, চার কাহন ধান, বল না এবার ধান কত করে বেচেছ।'

'জমি খাজনা কি?' কে একজন জিগ্যেস করলে।

'স্বত্ব—নিষ্কর, কেরে ব্যাটা?' যতীনবাবু হাঁক দিলেন।

এবং ইত্যবসরে কয়েকজন এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, একজন, তার নাম কেষ্ট বায়েন, সে বেলদারের হাতে খোলা ছিটের দিকে আড়ভাবে তাকিয়ে ছিল। ২৩নং দাগে মোটা নোক বিকৃত আঙুলটি সেখানে, যেখানে স্থির। কেষ্ট আর দাঁড়াল না, পাছে মাথার গামছা পড়ে যাবে, সত্বর সে গামছা কাঁধে নিয়ে দৌড়িয়েছিল। আলের পথ কাদাকাদা থাকে, আর তার পা বসে যাচ্ছিল, ছোট শীর্ণ খালটা পায়ে পায়ে এখন পার, উঠল গিয়ে আলমের পাশেই, তার বয়স হয়েছিল, সে হাঁফায়। আলম চোখে কম দেখে, তখন ঝাপসা স্বচ্ছ হয়ে কেষ্ট বায়েন। বেচারী লোক, খেতে পায় না সেইহেতু দ্বিতীয়কে সে হিংসা করা কখনও করে না। সে একটা গাধা, আর সে—যে হয় সরল মানুষ। যখন আলম তার দিকে তাকিয়ে ছিল, বিড়বিড় করে বললে, 'কি দাঁড়ালে যে, পথ ছাড়ো,' সত্যিই কেষ্ট বায়েন তার পথের উপর দণ্ডায়মান তাই সে আবার বললে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে, চারিদিকে এবার ঘনঘটা করে এল, ঈশান কোণে মেঘে মেঘে ঢাকা।

'তুমি কি পাগল নাকি, না খেয়ে খেয়ে তোমাব বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাচ্ছে...' এটা এখানকার সাধারণ বলার কথা, সবাই বলে।

অতঃপর এবম্প্রকার কথায়, আলম ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে বলেছিল 'কেন?—কি হয়েছে?' সে ওর চেহারা স্পষ্টভাবে দেখেছিল।

'খেয়াল আছে ওখানে কি হচ্ছে?' ইশারায়, সে আঙুল তুলে দেখালে।

ছোট ভীড় তখনও থাকে। তাবা কি করে? শুধু ভীড়—একটা নিশান ঠাহর হয়, খুব হাওযা—আবছাযা। আব কিছু নয় আকাশ না মানুষ?

'ও কিসেব ভীড় গা?'

'তোমার সব গেল!'

তখন এবার সে অবাক হয়ে বলেছিল, 'সব গেল, আমার কেন? বালাই!'

'বললে তো হবে না, তোমার ভূমি নীলাম হচ্ছে।'

আলম তখন যতদূর পেরেছিল, বলেছিল ভেঙে ভেঙে 'আমার' আর সেই বোকা লোকটা সোজাসুজি ধীরে মাথাটি নাড়িয়েছিল, কাঁধের লগ্ন গামছা যখন ঠান্ডা হাওয়ায় কিছু কিছু নড়েছিল। এখন সে চোখে কম দেখে, সে ছিল না। গোরুটির গায়ে বসন্তের পুরাতন দাগ—আর খানিক ঘোলা বাদামী জল। অদ্ভুত সে মোটেই নয় এক্ষণে উচিত মত গম্ভীর হতে পারেনি। এবার সে আপনকার ভারী মাথাটা তুলে চেয়ে দেখল উঁচু করে। এখন দূর হতে আসা টিউবওয়েলের শব্দ দূর দূর যায়। ফলে সে কিছু ভাবছিল।

তার ভিতরটা অন্ধকার ধোঁয়া ধোঁয়া। ইত্যবসরে উক্ত ব্যপদেশে বিড়বিড় করে বললে, 'কি করব... কি করব!'

বোকা লোকটার সর্বাঙ্গে চুলকানি, সে তার কনুইয়ে একটি চুলকাতে চুলকাতে বললে, 'তোর লাঙলটা দে, আর বাকি তিনপো লাঙল দিয়ে এক ধকলে হবে, তোর লাঙলের ফলা ভালো রে—'

কিন্তু এ বোকাপনার কথা সে শুনতে পায়নি শুধু সর্‌সর্ খড়ের আওয়াজ সে শুনেছিল। মুখেও তার বসন্তের দাগ, একটা চোখ খোলা ছিল তবু তাকে যে কেউ এখন দেখে তার মায়া হয়। ক্রমশ সে ছোট হয়ে গিয়েছিল সেই দণ্ডে। অতঃপর সে দৌড়ল খুব, খালের মধ্যে

একবার সে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, কি কথা সে বলবে, আমার কি হল? তাই সে কেমন করে করে বলে, এমনই বারবার ক্রমে তার ঠক করে সেই কথাটা বললে 'সর্বনাশ' পরানের সদ্য বিধবা বউটা যেমন চেঁচিয়ে উঠেছিল যেমন। 'সর্বনাশ হল!'

জমি নীলামের ব্যাপারটা সত্যিই অসময়ে হয়েছে, উপরন্তু পরোয়ানা এল না—মেঘ হল না। তলে তলে এ কি করে তারা করে! এতটুকু সময় পেল না, সময় নেই। সে সাবেক প্রজা। বাবুরা সজ্জন, এমন হঠাৎ তারা, যে সে কি—তারা...

তখন এরা সকলে তাকে পথ ছেড়ে দিলে কেমন সে বিপদে পড়ে গিয়েছে, আপনকার হাতদুটি নিয়ে ওর বুঝি মুশকিল। পথশ্রমে সেইটুকুই কাতর, আর নয়। বর্তমানে সকলের মুখেই একটি নাম আর তারই নাম খস্‌খস্ শব্দিত। এতে যতীনবাবু ঘাড়টা বাঁকিয়ে, তিনি কিছু কেশেছিলেন, বললেন—'শাজাদের বেটা...কি খবর?'—একথা নিশ্চিত অনাবশ্যক নয় কি? বলে তিনি টিনের বাক্স খুলে একটি ছোট খিলি খেলেন, একটু চুন খেলেন বইকি। আবার তিনি বললেন, 'কি শাজাদের বেটা আলম?' এবার এখন তিনি আবশ্যক বোধ করলেন, 'সবই ভাগ্য বুঝলি শাজাদের বেটা...'

'আমার কি সর্বনাশ করলেন নায়েব মশাই আমার কি সর্বনাশ করলেন, আমি কি করেছি—সাবেক প্রজা আমরা বাবু মশায়,' এখনও প্রাণহীন—এ জমি তার ছিল না, যেমন অন্য লোকের; আপনকার সম্পত্তি বলে সে বোধ করে না, সব সময়ে তার সে চেতনা তার নেই; বুঝিবা সে জানতই, জমি হয় জমিদারের, আর সে হয় জন। ভালো করে বলতেও সক্ষম হচ্ছিল না—যে জমি তার পুরুষানুক্রমে, যদি যায় তাহলে কি করে যায়।

তখন সকলেই ওর কাছ থেকে আরও কথা আশা করেছিল, এখন তারা ওর মুখপানে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। আলম ভিতরে ভিতরে আছাড় পিছড়, এবার সে একতক্কে বলে ফেললে, 'আমি যে পথের ভিখারী হব বাবু, বাবু'। চঞ্চল হয়ে উঠছিল সে, তার যে দুঃখ নিয়ে আজন্ম আমরণ দুঃখটি সে বুঝতে পারে না, দুর্দশা কতবড়! আক্ষেপে আক্ষেপে তার নিশ্চিত ইচ্ছে হচ্ছিল, আপনকার হাত কামড়ায়। এখন অস্থির এখন পাঁশুটে সে যেন একটি কিম্ভূত; হঠাৎ সে দড়াম করে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ল, যদি দয়ার উদ্রেক হয়। হাস্যকর প্রচেষ্টা, সবাই তখন হতভম্ব হয়েছিল, তাদের এমতাবস্থায় কি করা উচিত, কিছুই এতটুকু ছিল না। যতীনবাবু একহাতে চাষীদের নাড়ী ধরে থাকেন বললেন, 'ঢং করবার জায়গা পেলে না শালা ভূত, মরতে হয় নদীতে ডুবে মরগে যা পাজী!'

আলম তখন আছে জেনে অবাক, ইতিমধ্যে উপরে ধূসর আকাশে পাখী উড়ে যায়। পিঠটা স্যাঁত স্যাঁত করছে রাস্তা ছিল কাদাকাদা। তাকে কে সাহায্য করেছিল তখন সে নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালে। সেও শুনলে। *'দেখ সদাশিব, ছেড়েদি নগা ঢালিকে...দেখ্...'*

'তা দিন...' এবার সে ঠাট্টা করলে রাগ করে, 'বাবুদের যখন এত পুরানো খাতকের (এ কথাটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল) সাড়ে চার বিঘে খাবার সাদ—হায়রে, ওই নিক...৪২ টাকার দরে ও জমি আমি নেব না; আর ও মুসলমানের ভিটেও আমি নেবই না—'

'নগা—টাকা আছে? দে আজ কিছু দে যা পারিস।'

সোৎসাহে নগা চারিদিকে চাইল, একটু বেয়াকুব হল। নিজেকে কাটিয়ে সে গেঁজে কোমর থেকে খুলে, হুড় হুড় করে তার হাতের উপর পাড়ল টাকাটা সিকিটা আনি দো আনি অনেক

কিছুই সে শুনে গেঁথে দশটাকা দিলে, গোমস্তা শিববাবু শুনে নিলে, পরে হেসে বললে, 'খরচা আমাদের হিসেব আন।—'

'দেব, দেব, এর দাখিলা পাব তো—?'

'কবলা লিখতে হবে... অনেক কাজ বাকি, তাহলে ওর ভিটেটা তুই নিবি না?'

'না তিন কাঠায় কি হবে...'

'ওখানে পাঠশালাটি উঠিয়ে আনলে হবে...'

নন্দ আবার মোড়াটা বগলদাবা করে, কে একজন ঢাকে কাঠি মারলে গুম করে, এরা যারা তারা উঠল আর সবাই চলে গেল।

আলম; পিঠময় কাদা, হিমহিম পিঠটা; সে এক চোখে অনেক কিছুই সমস্ত কিছুই দেখলে, তার হাতটা খালি খালি লাগছিল। তার হাতে যেমন কোন বোঝা ছিল বা, একটা নিশ্বাসও ছাই পড়ল না রে।

চাষী মানুষ দীর্ঘনিশ্বাস যে তা সে পাবেই কোথায়। তার ভিতরটা অন্ধকার, ধোঁয়াটে আলম, এ সুযোগে একবার শুধু একবার জগদীশ্বরকে স্মরণ করতে ভুলেছিল বুঝিবা, হয় মনে মনে হয়তো এই একটি কথা সে উচ্চারণ করেছিল।

বলরাম শিকারী নিজে খুব আমোদপ্রিয় ছিল, সে নানা রকম হিজিবিজি রসিকতা করবে, সে রসিকতার মানে নেই, হুড় হুড় করে এক দমকা ইংরিজি বলে, তাহলে সেগুলো ইংরিজি। ভীড় যখন ভেঙেছে, যতীনবাবু আর আর লোকরা কয়েক হাত, মাঠের জনরা পিছনে জনতা করে, ঠিক সেই ক্ষেত্রে সে মাথার উপর হাতটা তুলে বলেছিল, 'সব ফরশা, বাবুস মর্জি ইন দি ক্যালকাটা রাঁড়ের বাড়ি, বাইস্কোপ, পোর্টকোম্পানী, ওয়ান কাপ্ টি গ্যাস্‌পোস্টে, পুওরম্যান্, চাষী খাতক, কোর্ট, ঠোক শালা পাঁচ নম্বর, উকিল, মোক্তার হাকিম, বালিস্টর, বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না—নিরেক বাঁকি, বেঁধে জুতো গ্যাসপোস্ট খেলস্ খতমস্...' এমনি ভাবে সে বলে যেমন সে ইংরাজিই সবখানিক বলেছিল। লোকে তার কথায় হাসে, সে দলের মধ্যে বলে, যাত্রা ভেঙে গেলে, অথবা কাছারীবাড়ি থেকে বের হবার সময় সময় তাই বলে। একজন ছিল তার নাম বলরাম শিকারী।

'দুঃ শালা তোর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে,' একথা বলেওছিল যেমন, যতটুকু হাসবার সে হেসেছিল ফের, 'দেখ না শালার গরম, বাইয়ের ভেড়ুয়া।'

অন্যক্ষেত্রে উপস্থিত সকলে এতেও হাসত, কিন্তু এতাদৃশ সময় সকলে একটু গম্ভীর হবার চেষ্টাই বরং করেছিল। যে ঢোলে চাঁটি মেরেছিল সে এতক্ষণ বাদে বেয়াকুফ বনে গেল বইকি, বলরাম শিকারী ঠিকভাবে তদানীন্তন গুরুত্ব এখনও অথচ উপলব্ধি করতে পারল না। শুধু সে কেন, উপস্থিত সকলেই পারেনিকো, পাশেই আলম এবার বসেছে পাশে একটু ঘাস ছিল। এদের কথোপকথন তার কানে গিয়েছিল। অথবা সে বুঝতে পারে নি। সে একটি গর্দভ বিশেষ, ঠান্ডা হাওয়া তার হাতে লাগছিল, তার রোমকূপগুলো ফুলে কাঁটা কাঁটা, সেই রকম অন্য স্থান শরীরের; তারই উপর দিয়ে ইঁদুর চলে যাচ্ছে যেন কাঁপতে কাঁপতে। সে নির্বিকার।

'চ চ খানিকটা লাঙল দিয়ে নি,' বলে সে দাঁড়িয়ে ছিল, এ ভয়ঙ্কর সময়ে আলমকে কিছু বলা দরকার, অন্তত এখন কল্কেটা তার দেওয়া উচিত, লোকটি এইটুকুই বুদ্ধি খাটাতে পেরেছিল; এবার সে এইজন্যে কতদূর সাহসী হল, সে ভীরুভাবে বললে, তারই কাছে পাশে উবু হয়ে বসে, কল্কেটা হাতে করে এগিয়ে দিতে বলেছিল, 'নাও আলমভাই—টানো দিকিনি।'

তাই আলম বুঝিবা সজাগ হয়েছিল। তখন সে ঘাড় ফিরিয়েছিল, সে যেন স্নান করে উঠেছে, কেন যে সে খানিক সতেজ। এবং আর একবার একথা মনে হল, আর আর সকলে তারই পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে চাইছে, তখন তার একথা ভালো লেগেছিল, তার মুখে অসহায় ভাবটা আরও আরও ঘনীভূত হয়েছিল, এটা সে হয়তো চেয়েছিলই। সে কল্কেটা নিয়ে একবার অন্যমনস্ক ভাবে, আস্তে ধীরে টানলে, তারপর সে আবার টানলে। চক্ষুদ্বয় তার স্থির ছিল, তার হাড়ে ঠান্ডা বাতাস লাগছিল, এখন তার কথা সবাই শুনতে পেল, সে বলেছিল, 'আলিজান তোর হুঁকুটা দে দিকি'—গলাটা তার অসাড়। আলিজান তার হুঁকো দ্রুত তুলে নিয়েই ধীরে এগিয়ে দিল, এ দেওয়ার মধ্যে পরিচ্ছন্ন লক্ষণ ছিল—কেমন একটি সমবেদনা। আলম কল্কেটিকে বসিয়ে, একটু কেশে টানতে লাগল। শুধু ছিল, গুরুগুরু আওয়াজ, সকলে চুপ, আজ মেঘের দিন—উপরে মেঘ।

তখন সকলেই আশা করেছিলই কেবলমাত্র, কেউ কথা বলে। ও বলুক, এ বলুক, আর তারা সবাই চেয়েছিল বলরাম শিকারী চুপ করে থাকে, কথা না কয়। একটু গভীর।

'তুমি এখন কি করবে,' কথাটা মনে হল একটু বোকার মতন হয়েছে। ফ্যাল ফ্যাল করে সে চারদিকে চাইলে, যে নড়বড়ে বা সবাই নড়বড়ে হল তবু যখন একথা, তখন কথা কওয়া যাবে।

'আল্লা জানে,' বলে আলম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে না পেরে গভীরভাবে নিশ্বাস নিল শব্দ শোনা গেল। তামাকের ধোঁয়ার না নিশ্বাসের!

'তবু?'

'ভাবছি!'

'ভাবলে তো চলবে না' ভারিক্কী ধরনে, আলমকে এতে সচেতন করার নিছক চেষ্টা ছিল।

'কি করব তোমরাই পাঁচজন বল,' এবার সে সকলের মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা করলে। উপস্থিত সকলে একটু ফাঁপড়ে পড়ল, পাঁজি যাদের চাঁষের ক্ষণ ঠিক করে, তারা একটু সতেরো দফার হিসাব নিয়ে পড়ল। তারা সবাই অতঃপর পা বাড়াবার জন্যে প্রস্তুত। সে কি তারা প্রস্তুত।

'কি করব তোমরা পাঁচজন বল ভাই,' আবার দ্বিতীয় বার সে বলল সকলের মুখের দিকে চাইলে, তখন তার মনে হল, এবার সকলে, কিয়ৎক্ষণ আগের মুহূর্তের মতো ঘেঁষাঘেঁষি বসতে চাইল না, ইতিমধ্যে একটি আল এসেছে। একটু কষ্ট হল, যে নড়ে চড়ে নিজেই তাদের কাছে সরে আসতে চেয়েছিল। একটু ঠেকো চেয়েছিল। 'পায়ে শালা ঝিঁঝিঁ ধরেছে, ওই আমার এক ব্যামো উবু হয়ে বসতে পারি নে,' বলে কে একজন উঠে দাঁড়াল, একটু দাঁড়াল, তারপর ক্ষেতে নেমে পড়ল।

'তুমি কিছুটি জানতে না, তোমার এমন সর্বনাশ হবে?'

'না—আল্লার কিরে।'

'শাখা যাকে ভাঙতে হয় সে কি জানতে পারে?' আর একজন বললে।

'একটি খবর তো পেতে... বেলদার, ঠাকুরদা (দরওয়ান) ওদের কাছ থেকে খবর পেতে।'

'কেউ আমার বলে নি গো'

'বিনা মেঘে বজ্রসংঘাত, ব্যাপার ভারী মন্দ না।'

আলম তুমি কেন বরং যাও না, বাবুদের পা আঁকড়ে ধরগে'

'ওগো, সে বড় শক্ত ঠাঁই—ছ-আনির বাবুরা ডাকসেঁটে কসাই'

'তব যদি গে কেঁদে পড়ে...পরনো প'জা খাতক...খাস থেকে...'

'হ্যাঁ খাস থেকে জমি দেবে। মাগ দেবে সেবার জন্যি, রাজত্ব লেখাপড়া করে দেবে যাও না, সেবার আমি বলে আমি গিইলাম, ঠাকুরের নামে বলতে, বলেছ্যালো, হতভাগা শালা তোকে ঢুকতে দিলে কে গেটের মন্দি, বেরো শালা।'

'আলম আমার মন বলে, তুমি ঘরকে যা সেখানে তোর মাগের কি দশা কে জানে, তাকে তো নিশ্চয় বার করে দেয়েছে... ক্রোক যেকেলে—'

'ও রইল না ঘর ক্রোক করবে কেমন ধারা!'

'থাকো চরহাট্, জন খাটতে এয়েচো জন খাটো, এখানকার বাবুদের মতি জানলে কেরে কেরে করে উঠতে,' বলে ভীত হাসি হাসল।

ও লোকটি দমল না, স্পষ্ট বললে, 'তোমাদের বাবুদেব মুখে আগুন!'

যখন একথা স্পষ্টভাবে তার কানে বাজল, আলম চারিদিকে খুঁজতে খুঁজতে তাকাল। সে হয় শক্তিরহিত, ইদানীং সে বড্ডই ক্লান্ত ছিল, হাত পা ব্যথা, যেন সারাদিন জল সেঁচেছে, বিরক্ত হয়েছে। এ ব্যথা তৎজনিত বা। সে উঁচু করে দেখতে লাগল; তিনপো দূরের শেষে, হাই দেখা যাবে তাদের গেরাম। দু রসি লম্বা তারক বরের ঘরের মাটির পাঁচিল, একহাঁটু উঁচু; আর মাদার গাছ, একটা খামার বাড়ি বিষ্ণু সর্দারের, পর পর দেখলে, কাছে থেকেই যেমন দেখেছিল। ওই বিরাট তেঁতুল গাছের পরেই তার বসতবাড়ি। সেটি ও বগলদাবা নিতে পারে। আলম উঠে দাঁড়ালে, কতবড় প্রকাণ্ড ঢাউস আকাশ, কত কত জমি পৃথিবীতে, পরে আকাশ, দক্ষিণে, উত্তর আর পশ্চিমে গ্রাম গ্রাম সবুজ। সে কেবল একরত্তি ছিল। যারপরনাই অসহায়।

'তাই যাও তাই যাও,' তাকে দম দিয়ে দিলে।

এখন এ লোকটি এসেছিল। সে লোকটি নিজেকে এদের মধ্যে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল বেশ। মনে পড়ে, সে একটু বা নড়বড় করছিল। তার মনে হয়েছিল সকলেই মুখচেনা। তার দেহটা যেমন লতাচ্ছে, বিনয়ে সে কিছু ভিজে ভিজে; উপস্থিত ব্যক্তিরা তাকে ঘৃণা করতে চেয়ে, তার উপর মনে মনে খেপে উঠল। সেই লোকটা একেবারে গায়ের উপর এসে পড়ল, এতে করে সবাইকে ন্যাজেগোবরে করছিল! সেই লোকটি নগা ঢালি। এ জমি কিনে একুনে তার প্রায় সাড়ে-সাতান্ন বিঘে জমি হল, এ ছাড়া বসতের সংলগ্ন দুই বিঘে, তাতে সে বাগান করে, সে ধানের ব্যাপারী। বলরাম শিকারীর একে দেখে কিছু বলবার অভিপ্রায় হয়েছিল তখন; কিন্তু সে একটু ভড়কে ছিল।

নগা ঢালি গামছাটা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বললে, 'আলম,' কথাটি খাটল না। আবার সে চেষ্টা করলে, 'আলম ভাই—'

'কি বলছ বল,' বাধ বাধ গলায় সে উত্তর দিলে।

'আমার উপরে রাগ করেছ নাকি,' থেমে, 'আমি না ডাকলে কেউ না কেউ কিনতই তো... তাই...'

'এটা মিত্তি, তোমার উপর রাগ করতে যাবে, কি অভিসন্ধি...' আলমের হয়ে কেউ একজন বললে। 'যার সময় সমাচার ভালো সে কিনবে...এতে আর আশ্চর্যটা কই বা...'

'তাই বলি তাই বলি...' নগা ঢালি মাথাটা একটু বেশি দোলাতে লাগল, এরপর সে বললে, গলা খাঁকরে, 'ওগো তোমরা পাঁচজন শোন, আমার অভিসন্দি, আলম যেমন চষচে চষুক, হাজার হোক ওর বাপ পিতেমোর জমি তো...আমি, আমি, সেদিক দেখবো, ও জন হিসেবে নিক—রোজগণ্ডা দেব...আমার মন হয় ও ভাগে চাষ করুক...আমি ওকে তিনপো ধান দেব—'তিনপো' বলেই সে বোকা হয়ে গেল; তার মত একটি পাকা লোক এটা কি করলে, কাকে সে

হাতে রাখতে চেষ্টা করলে, তাই ফিরে ফিরতি শুদ্ধ করে বললে—'অবশ্য এই প্রথমবার, যখন বলেছি তখন আমার এককথা, আমি নগা ঢালি, আমায় মন্দ বলতে পারবে না বাপু...আমার আক্কেল আছে...আমি ভালো লোক কি বল'—সে বেশ বড় মুখ করে এ কথা বলেছিল। তদ্দণ্ডে সকলেই তার এরূপ বদান্যতা দয়ায় সত্যিই আপ্লুত হয়েছিল, লোকটা হয় ভালো। কেবলমাত্র আলম একটু অধীর।

নগা আবার বললে, 'কি রাজি তো? হাল গোরু কি তোমার...'

'না...ওর নয়'—অন্য একজন বলল।

'কুচ্‌পরোয়া নেই—আমার চারখানা আছে, চারটে, তুমি নেবে এস, একটু যত্ন আত্তি কোরো, নিজেরা তো খাও—আমি ভালো লোক আলম,' সে সুচিন্তিতভাবে বলেছিল।

যখন সে শুনছিল, ওতঃপ্রোতভাবে দেখা গেল সে কিছু ভরাট। যখন সে শুধু স্থিরভাবেই সোজাসুজি বলেছিল, 'না'

একথায় সকলে শুনে বলেছিল সমস্বরে 'না?' শুধু নগা, ভুরুতে তার চুল নেই—ভুরু তুলে, চোখ বড় বড় করে বললে, 'না!'

'না'

'তাহলে তুমি চষবে না, বেশ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে, আমি কিন্তু ভালো লোক...তোমরা পাঁচজন সাক্ষী কিন্তু'

তখন আলম নিজেকে ভেঁজে নিয়ে বললে, 'আমি শালা আর ওমুখো যাব না আমাব যা হয়েছে, আমি শালা...' খানিক অভিমান হয়তো বোঝা গেল।

'তাহলে তুমি কি কাম...কাম করবে ..কি করবেটি শুনি, ভিক্ষে কবতে হবে যে'

'আল্লা যা করবে...'

'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি আলম'

'না, আমি জমিতে আর পা দেব না'

সব শেষ হয়ে গেল। সে দৃঢ়। তাহলে সে চাষ আবাদ আর করবে না, আলম তাদের মধ্যে একজনকে বললে, 'ওগুলো এনে দিবি?' একজন তার গোরু জোড়া, হাল এনে দিলে, সে লাঙল ঘাড়ে করে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। কিছু খানিক আগিয়ে অনেক কথাই তার একবার মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চাষী খাতকের স্মরণশক্তি কতটুকু, সাক্ষী দিলে তার কথা স্বতন্ত্র, তাদের স্মরণশক্তি বিস্ময়কর। বলদজোড়া মন্থর গতিতে চলেছে, সেও চলেছে। সে ভারী ভারী, কভু হাল্কা।

ক্রমশ সে দেখলে সে আর অন্য কেউ নয় তার বউ! মাথায় একটা ছোট পোঁটলা, হাঁড়ি হাতে, অন্য হাতে বাঁকের সরঞ্জাম। সে তার বউ আর তার বউয়ের চোখে জল, চ্যাপ্টা মুখটি, নাকে রূপার ছোট একটি নোলক, চোখের লাল রক্তাভ শিরানিচয়—হাত দিয়ে ধরা মাথার পোঁটলা। সে কাঁদছে চোখে তার জল। আলমকে দেখে পাশের গাব গাছের তলে বসল, জিনিসগুলো নামিয়ে রাখলে, আর কাঁদতে লাগল। কেলো নড়তে নড়তে এসে একটু পাশেই বসল। বউটার চোখ দিয়ে জল পড়ছেই, পরে আঁচলের কাপড় দিয়ে সে নাক মুছেছিল। আলমের কান্না পাচ্ছে না, সে কেঁদে কাঁদনকুচী হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, কিছুই নয়—সে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছে, তাদের চরিত্তির বেয়াড়া, ভিতরে সমস্তই অসাড়। সে যদি মরে ভূত হয় তখনও সে উদোই। সে একটা রাম-পাঁঠার মতন—যেমন বউটা দেখেছিল, আলমের মুখটি হাড়ির মতো; সে কিছু ভাবছিল, বস্তুত তা নয়, সে বললে, 'আমাদের কি হবে গো...'

সে একথায় ক্ষেপে উঠল, কিন্তু দাঁড়াল না, টিটকিরি দিয়ে বললে, 'তোমার তো পোয়া বারো, রাঁড় হ'গে ঢেমনী মাগী!' একথা বলেছিল যেমন কেবল। ঠান্ডা মেজাজে বললে, 'তাই তো ভাবছি।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'কেলোরে কেলো আমাদের কি সর্বনাশ হল রে বাপ!'

সে কেঁদে উঠল, কেলো ন্যাজ নাড়ল। 'আল্লারে, জমি যদি আমাদের হত...' বউটা ভৌতিকভাবে বলে উঠল।

'মর-মাগীর বুদ্ধি...' মেয়েমানুষের বুদ্ধি, তাই কখনও হয়...অন্যপক্ষে সে ভেবেছিল জমি যদি কেলোর মতো হত তার পিছন পিছন যেত ছায়ার মতো। এরূপ ভাবতে তার চোখ ছলছল করে উঠেছিল। কালো কেলো ল্যাজ নাড়তে লাগল। আবার একদফা তার মনে হল, মেয়েমানুষের বুদ্ধি... জমি কখনও চাষার হয়, জমি কি খাতকের বাপকেলে সম্পত্তি।

'চল না, আমরা একদফা বাবুদের কাছে যাই।'

'তারা শালারা ভারী খ্যাচড়—শালারা...'

'খ্যাচড়...তারা মাগ-ভাতারে ঘর করে না? ছেলে তারা বিওয় না?'

'নারে বউ অন্য পথ দেখতে হবেই।'

'তুই যদি মানুষ হস্ তো শালাদের কেটে জল খা,' কতটা কার্যকরী বা কতটা নেবে তা সে জানত না, তেমন করে বউ বলে নি, শুধু কথার ফেরে কথাই।

আলম বউয়ের দিকে কিয়ৎক্ষণ চেয়েছিল; ঝাটিতে ঝাটিতে সে গম্‌গম্ করে উঠল, রগদুটো গরম, ঠান্ডা হাওয়া নেই। সত্যি সে ক্ষেপে উঠেছে আপাত তাই খেয়াল হয়।

'দূর তাই কখনও হয়, কত শালার লোক লস্কর...'

বউটা এককথায় বোকার মতন ছিল, এর উত্তর কোন, সে কথার উত্তর তা সে ভেবে পায়নি।

সে কি প্রশ্ন করবে তা ভেবেই পাচ্ছিল না, যখন কথাটা কথাই আর খামখা সে তাই গোরু-খোঁজা করে কিছু না পেয়ে বললে, পুঁটুলির গেরো খুলতে খুলতে বলেছিল, 'নে চাট্টি মুখে দে...'

'এত সকালে রান্না হল কি ভাবে,' আলম অবাক হয়েছে—এর জন্যে বউ বললে, 'ভাগ্‌গি আজ কি মন করল চাট্টি বেঁধে ফেললুম...কি আর ছাই! কালাকার মান ভরতা, লংকা পোড়া আছে...'

'তুই...'

এখন খাওয়া শেষ। আলম বলল—'চ দু ছটাক পানি খাইগে, টিপকলে...' বাবুরা সজ্জন তারা মা-বাপ তাই টিউবওয়েল, নেহাত তাদের কল্যাণীয় কীর্তি। কিন্তু বউয়ের কথাটা তার চলতে ফিরতে ফুটছিল। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে সে দাঁতে দাঁত ঘষছিল, যাই সাবাড় করে দিগে যাই...। সে বড্ডই একা, সে একা চিরদিন, সে যে কি করে। একটা হেঁসো তার নেই। হাটখোলার অন্ধকারে বউটা বসে আছে, উপরে ভয়ঙ্কর অন্ধকার, আকাশ মাথায় মাথায়—নীচে কুলকাঁটা অন্ধকার আর দুর্যোগময়ী যামিনী।

তার এক সময় মনে হল, পিছনে খাল বরাবর তার জমিটা আছে, তার ভয় হল জমিটা কি ভূত হয়েছে, তার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। তাকে নাগালে পায় পায়, খানিক পথ আলম দৌড়ায়। জমিটি ভূত হয়েছে, অনেকটি পথ যেয়ে সে থেমেছিল। ফাঁকা মাঠ, উপরে আকাশ, নীচেও আকাশ।

শুনেছি শেষটা এমনিভাবে হয়।

ফাঁকা খানিক মাঠের পরেই সর্দারের বাড়ি। সে এসে বাঁশের টাঙানো দরজা খুলল। বাড়ির

মধ্যে ছোট একটু বেগুনের চাষ, প্রকাণ্ড বড় একটা মহিষের মাথা, চুন মাখানো, অন্ধকারে কটকটে, তারপর পর পর তিনটে ডাগর ডাগর মরাই। এক্ষণে সে থামলে একদফা কি ভাবলে গাদা গাদা খড়, বিষ্টুর সময় সমাচার ছিল। তবু সে সাহস করে ডাকলে, 'খুড়ো, ও বিষ্টু খুড়ো'—

আলো নড়ে উঠল। একটা বড় ছায়া মাটির দেওয়ালে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিষ্টু ঘরেই ছিল, 'কে?'

'আমি আলম...'

'তা এত রাত্তিরে কি মনে করে...যা দুজ্জোগ...' অনিচ্ছা প্রকাশ পেল।

'এসোই না—' তবু সে জোর করে বললে।

মনে মনে একটি কথা ধাক্কা দিচ্ছে যে, সাবাড় সাবাড়। মাথায় টোকা দিয়ে এল বিষ্টু...অন্ধকার... সারি দেওয়া ইট টপকে টপকে...কাছে এসে বললে, 'ওঠো ঠাকুরদালানে।'

বেগুনের চাষের ওপাশে দক্ষিণমুখো দালান, তাতে ওরা উঠল। এসে বললে, 'তামাক (গাঁজা) ফুরিয়েছিল কি ভাগ্যি—আবার নিধু কয়ালের বাড়ি ছুটি—দুজ্জোগ...নেশা...নাও ভালো করে তৈরি কর দিকি,' বলে সে বিড়ির বাক্স থেকে আধা সিগারেট বার করলে।

এসব কথায় সে ক্রমশ সোজা হয়ে যাচ্ছিল, একবার চকিতে মনে হল "ঘরে" বউটা একা, যেতে হবে। অন্যমনা হয়েছিল। বিষ্টু বললে, 'শুনলাম সব কথা, মাতলা থেকে ফিরে শুনলুম,' আর বেশি সে বলতে চাইলে না।

সে চুপ করে থাকলে। এবং সে দৃঢ় হয়ে এল, কিছুক্ষণ কেটেছে। সে কঁকিয়ে বলতে লাগল, 'আমার একটি অভিসন্ধি আছে খুড়ো, তুমি না এলে হবে না, তুমি হলে আমাদের কোম্পানি—তোমাকে তোমাকে চাই—'

'ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার!' আলম হাসলে। 'আমরা চল খুড়ো—আমরা ক্ষেপে উঠি, ক্ষেপে উঠি,' অমোঘ কথা অন্ধকারে ফাটল। সে বলতে লাগল, 'ক্ষেপে না উঠলে আর ভরসা নেই, আমরা খাব কেমন করে, বাঁচব কি করে, চল আমরা সবাই ক্ষেপে উঠি, অত্যাচার কোন মান্‌সে করে—আমার জমি নেই, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি—অজন্মায় বিবেক দিয়েছি—জলে দিয়েছি—চাষী খাতক উচ্ছেদ! আমরা ক্ষেপে না উঠলে উপায় নেই খুড়ো. খুড়ো তুমি আমাদের কোম্পানি যে।' সে উৎসাহী হয়েছিল, কিছু কিছু জল আসছিল চোখে, তার উল্লাসে এক চোখে।

অন্যপক্ষে বিষ্টুর তরকা লাগল। সামনের আটচালা পেরিয়ে, রাঁধুনী ফোঁড়নের গন্ধ আসছিল, তিনটে ডাগর মরাই পার হয়ে ঠান্ডায় হাওয়ায় আরো জমে উঠেছিল ভারী।

'তুমি খুড়ো, শুনেছি তোমার মুখে, বেজার মরা ঘোড়া নিয়ে গিয়ে একাই—তোমার গুণপনা শুনেছি, তুমি 'দু-মোহনী' বাবুদের মেরে তকমা ভেঙে দিয়েছিলেন, তোমার সাহস কত কত—তুমি কোম্পানি, চল ক্ষেপে উঠি, আমাদের আর গতিক নেই, আমরা সবাই ক্ষেপে উঠব।'

তখন নিজের প্রশংসা আর যথেষ্ট ভালো লাগছিল না। বিষ্টু সর্দার কল্কেটি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'ওসব তাতে কাজ নেই, জলে বাস করি কুমীরের সঙ্গে বখেড়া, তার উপর বাত দাঁতে ব্যথা, তোমায় ভালো কথা বলি—আমায় যা বললে বললে, আর কাউকে বোলো না, ছ-আনির বাবু যার নাম বাবু প্রশাদ চন্দর মিত্তির—শালা শুনতে পেলে...'

এমত কথায় আলম গম গম করে উঠেছিল। এক ঝটকায় সে ক্রুদ্ধ হতে থাকল। সে অন্ধকারে বিষ্টুকে দেখবার চেষ্টা করলে, 'ভীতু' সে বলেছিল যেমন। আর সে বললে মনে মনে,

'আপন মামীমা যাকে নষ্ট করেছে, যে শালা দিব্যি থাকে, মামীর বিষয়সম্পত্তির জন্যে নিজের মাগ ছেলেকে ভাসিয়ে দেয়—সে মানুষ অদ্যপাতে গেছে'—একথা সত্যিই সে যদি বলেছিল, প্রথমে অতগুলো মরাই দেখে থমকেছিল, এও হয় তার মনে হয় সে লক্ষ্মীমন্ত লোক।

সে লাফ দিয়ে দালান দিয়ে নীচে নামল, আর একটু হলে পড়ে যেত। বিষ্টু আহা আহা করে উঠল। আলমের গতিক খারাপ, সে তিক্ত হয়েছে, এ দরদ খারাপ লেগেছে। সে মাটির দরজার সামনে দাঁড়াল, ঘাড় ফিরিয়ে একবার অন্ধকার দালানের দিকে দেখল, সে কিছু বলবার চেষ্টা করছিল, 'খুড়ো তুমি মানুষ নও; তুমি শালা বাইয়ের ভেড়ুয়ার অদম্'। জায়গাটা নিস্তব্ধ অন্ধকার কতক বস্তু। সে টাঙানো দরজাটাকে একহাতে দিয়ে ঠেলে তুলত, তেমনি তুললে। পার হল। রাস্তায় নেমে বিড়বিড় করে বললে, 'শালা নাঙ্! আমি ক্ষেপে উঠবই'। মুরগীর ঘরটা থেকে, কোঁক কোঁক খর খর শব্দ হল। একটা কেউ বাছুর সরাচ্ছিল, আলম চমকে উঠল যখন সে ভিতরে ঢুকে পড়েছে, থতোমতো খেয়েছিল বুঝি বা। ওদিকে সম্মুখে দাওয়ায় একটা ছোট মেয়ে উলঙ্গ হাতে লম্ফ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, উত্তরের গোয়াল থেকে—এবার সে গোরুটাকে নিয়ে আসছিল, 'চল্ চল্' শোনা যাচ্ছিল। আলমকে সে এবার দেখতে পেলে, বললে, 'আলম ভাই...'

'হুঁ' বলে এসূত্রে মনে হল, আমরা পরস্পর ভাই...ভাই।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে বড়, ওঠ দাওয়ায় উঠে বোসো, তামাক খাও,' তার গলায় সমবেদনা ছিল।

এবং এ কথায়, সে উঠে নিজেই মাদুরটা পাতলে, হাঁকল 'ওগো তামাক কই আলিজান ভাই—'। একবার ভেবেছিল, গরীব দুমুটো পায় না, তার তো ক্ষেপে উঠাই উচিত!

গোরুটা টানতে টানতে এনে এপাশে শুকনো দাওয়ার একপাশে উঠিয়ে রেখে বললে, 'ওই কুলুঙ্গীতে—আমি পা ধুয়ে আসছি।' তখন সে কল্কে ধরিয়েছে, ফুঁয়ে তার মুখটা ভয়ঙ্কর, মুখের খানিক গরম ঠেকছে, তুষের আগুন মালসায়, মনেও তার ঠিক এইভাব—অন্য কিছু নয়, মনে তার এমনি দুর্য্যোগ কেননা সে বারম্বার ভাবছে—'ক্ষেপে উঠতে হবে, হবেই হবে নির্ঘাত আমরা ক্ষেপে উঠবই নিশ্চয়।' কখন আলিজান এসে ওখানে বসেছিল, সে টের পায় নি, সে কল্কেতে ফুঁ দিচ্ছে দিচ্ছিল। খানিকটা আলো তার মুখে।

আলিজান বললে, 'বল, বল আলম ভাই, এ কদিন কোথায় ছিলে, বৃত্তান্ত কি?'

বৃত্তান্ত কথাটা সে প্রতিধ্বনিত করে হাসল বুঝি, 'বৃত্তান্ত বউটাকে নিয়ে মহা মুশকিল, কাজ নেই—সবাই ভাবে, অজ্ঞাতশীল লোক, চোর ছ্যাঁচড় হবে। জন খাটব! লোকের অভাব কই? তিন আনা রোজ' গা পাব কোথায়, সারা দেশময় লোক থৈ থৈ। ভিক্ষে দেবে কে, বলে কাজ করগে। গতর নেই...'

'বড় অকাল, কি যে হবে কে জানে, না খেতে পেয়ে মারা যাব...তোমার বৃত্তান্ত শুনে আমি তো শুকিয়ে গেছি...কিস্তি কিস্তি কত কিস্তি যে পড়েছে...কি যে করব।'

আলম আর তর সইল না। সে ঠিক এখান থেকে শুরু করল, 'উপায় আছে ভাইজান—উপায় আছে, আমি ঠাওর করেছি, আজ আমি মরেছি—কাল, আল্লা জানে, কার পালা, শালা বাবুরা কি ছেড়ে কথা কইবে!...তাদের ঝড় বয়ে গেছে, ক্ষেপে ওঠা ছাড়া আমাদের আর গতিক নেই, উঠতেই হবে, একজোট হয়ে চল ক্ষেপে উঠি; লাটের লোক ক্ষেপে উঠলে রক্ষে থাকবে না, কোন্ শালা ঠেকায়, শালা বাবুদের দাঁড়া ভেঙে দেব না...শালা ঢ্যামনা, রাঁড়খোর মাতাল...' থেমে একটা নিশ্বাস নিয়ে বলতে থাকল, 'বউ বলছিল, জমি যদি আমাদের হত, তখন ভাবলুম শালা সাধে কি বলে মেয়েমানুষ...ভাবি ঠিক বলেছে—আমার বাবার বাবা এসেছিল, হাঁসিল করলে গতর·

দিয়ে, আমি তার বংশ—নিব্বংশে হলুম উচ্ছেদ! দেখ মজা ভারী মন্দ না...আলিজান ভাই তুমি না বোলো না, বিষ্টু খুড়োর মতো—যে শালা নাঙ। সম্পত্তির জন্যি নাঙ হল, সে মানুষ—আমরা একজোটে ক্ষেপে উঠব।' সে দুচোখেই আজ এখন দেখতে পাচ্ছে।

একথা তাকে টঙ্কার দিলে, মাঝখানে সে আড় হয়ে শুয়েছিল, সে আড় হয়ে শুয়ে থেকে উঠে বসেছিল। সে হুঁকোটা ফের হাত করল, আলম টানতে থাকল, রোমাঞ্চিত আলিজান কি বলবে তা সে ঠিক জানত না, বললে, 'উচিত কথা বলেছ ভাই, আমরা জানি তোমার অভিসন্দি ভালো, বুঝি সব, কিন্তু ভাই আলম, আমরা যে বড্ড একা, সবাই আমরা বড্ড একা,' একথা তার মুখ দিয়ে আপনা থেকে বেরিয়েছিল, 'আরও ভেবে দেখ আমি মরে গেলুম...কিন্তুন দুজনে কি কিছু হয়, বাবুরা যা শুরু করেছে...তাতে ইস্থির শালা এ গরুতেও থাকে না। ক্ষেপেওঠা তো দরকার, কিন্তু আমরা যে বড় একা রে,' থেমে বললে, 'উপরন্তু চাষী খাতক ছাপোষা মানুষ ছেলেপুলে বউ, এদের মুখ চেয়ে আমি কিছু করবার লায়েক নই, হ্যাঁ যদি সবাই জোট হয়—আমি যাব প্রাণ দোবো,' কথাটা তাকে ধাক্কা দিয়েছিল। তাহলেও মধ্যে একটা ফাঁক ছিল, 'একা' কথাটা এই ব্যপদেশে বড্ড পীড়াদায়ক, 'একা' কথাটা স্বাভাবিক ভাবে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সবিশেষ জড়িত। সত্যই তারা বড় একা, তারা কত লোক...আলিজান, সে, নিধু, বলরাম, পাঁচু...এত লোক তবু তারা একা, কেন? তারা অনেক অনেক; বললে, 'বেশ আমি অন্যদেরকে জিগ্যেস করে আসি'—সে যারপরনাই খুশী হয়েছিল।

একজন হয়েছে তো, তার বুকে দশ মরদের বল। সে সেই রকম হুঁসোর মতো চলছে, ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, তারা জিতবেই, তারা ক্ষেপে উঠবেই। পালাগানের শব্দ আসুছিল, নিধু পালা গায় আর ভারী ভালো গায়, নামডাক তৎজন্য অনেক যোজন দূর।

বাহিরে থেকে উল্লাসে ডাকলে, 'বন্দু ঘরে নাকি—'

'কে বন্দু নাকি? এসো, এসো—'

দাওয়ায় সে উঠে পা ঝাড়া দিলে। নিধু বললে, 'কি খবর তোমার? হাঁ ব্যাপার কি—'

'গান গাইছিলে—'

'একটু গরম হচ্ছিলুম, যে মাঘের শীত—তা খাওয়া হয়েছে?'

'তা এক রকম হয়েছে,' একটু সলজ্জ ভাবে বললে।

'বন্ধুর কাছে লজ্জা—নিশ্চিত খাওয়া হয়নি, দিদি কই—'

'সে আছে—আমার মানে বউয়ের এক কুটুম্বর বাড়ি—'

'ও! তা তুমি খাবে—এখানে, তোমার বদ্‌না তো আছে, ওই ঝুলছে, নাও তামাক খাও, আমার বড় দুঃখু তোমার জন্যে কিচ্ছুটি করতে পারলুম না গো, আমি বড় দুখী কাঙাল আলম, তুমি তো জানো—ভাত হয়েছে—এখুনি ডাকবে তুমি মুখহাত ধোও—'

'তোমার কাছে বন্ধু—আমি এক দরবারে এসেছি, একটু নিবিষ্ট হয়ে শুনতে হবে।' এখানে তার প্রথম লজ্জা করছিল, জোর সে বলার মধ্যেই ফিরে পেলে, 'বন্ধু আমরা ক্ষেপে উঠতে চাই, অন্য গতিকে নেই, ক্ষেপে আমাদের উঠতেই হবে, বিহিত একটা করব—মরণপণ তুমিও লাগো, কাঙাল দুখী আর থাকব না ক্ষেপে উঠব—আমি ওই শালা বিষ্টুর কাছে গিয়েছিলুম, কোম্পানি লোক সে তাই; সে বললে—আর কাউকে বোলো না এসব কথা, আর আমার দাঁতে ব্যথা।'

এতে করে নিধু হালদার বিপদ বুজল—বললে, 'সর্বনাশ বন্ধু সর্বনাশ করেছ। কেন তোমার

কি অজানা, ও শালা মামীর গোলাম আজকাল ঘন ঘন বাবুদের বাড়ি যাচ্ছে পত্তনী নেবার জন্যে, সে উঠবে ক্ষেপে? তুমি গুড়ে বালি ঢেলেছ—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ক্ষেপে উঠা দরকার কিন্তু তাই বলে আমাকে এসে আগে বললে না কেন? আমরা গরীব গরবারা কাঙালরা মিটিং করতুম—পঞ্চায়েৎ বসাতুম—তুমি পালাও বন্ধু তোমার রক্ষে নেই—কালই হয়তো তোমার মুণ্ডু কেটে ফেলবে, ছ-আনি বাবু কি প্রবল বাপুরে, তুমি চাট্টি খেয়ে সরে পড়। কেন আলিজান তোমায় একথা বলে নি যে বিষ্টুকে বোলো না? আমরা কিছুই করতে পারি না ভাইরে, যতদিন না উপরের লোকটা মাটিতে আসে দাঁড়ায়, কাঙাল আমরা বড় কাঙাল ভাইরে, তুমি কি করলে...!'

আলমের তড়কা লাগল। নিধু হালদার মিছে কথা বলে না, তাই তার কিছু হয় নি—আলম ঠাণ্ডায় হিম, সে কাঁপতে লাগল। বললে, 'সবার প্রথমে আমি বিষ্টু সর্দারের বাড়ি গিছি—'

নিধু হালদার তখন আইঢাই করতে লাগল। আর কিছু সে বললে না, বললে, 'তুমি পালাও বন্ধু —তুমি পালাও এদেশ ছেড়ে পালাও—'

'কিন্তু বিষ্টু তো চাষী, খাতক ছিল,' সে জোর করে বললে, বিশ্বাস রাখতে চাইলে, 'ছিল...'

'আজ সে ধনী—তার তিনটে ডাগর বড় বড় মরাই—৫০০ বিঘে জমি—সে পাতলা কাপড় পরে, সে ক্ষেপে উঠবে? তুমি কি করেছ বন্ধু—নাও খেয়েদেয়ে পালাও—কে জানে সে হয়ত নিজেই বাবুদের বাড়ি গেছে—'

'আমি তাহলে খাব না, খেতে আমার দেরি হয় তা জানো—আমি নিয়েই যাই—পাতায় দাও গামছায় বেঁধে নেব—'

বড্ড একা, কিন্তু ভগবানের সন্তান আর পরস্পর ভাই—তাদের বুকে বল নেই—তারা কি কালকূটের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না? তারা নিঃসঙ্গ, সত্যিই বড্ড একা একা—। আল দেওয়া জমির মতো একা—জমি তো সব এক!

অন্ধকার পথ হাঁটতে হাঁটতে চলেছে, সে কি করবে—বউকে খাওয়াবে কি...। গতর আছে বলে ভিক্ষে কেউ দেয় না। হায়রে দু-চোখ যদি তার অন্ধ হত—সে কি ভিক্ষে করতে পারত। কাঁধের পুটুলিতে খাবারের গন্ধ আসছে, তাতে মূলো ছিল, সে মূলো ভালোবাসে। যখন তার একটির পর একটি কথা মনে হচ্ছিল। কেউ ক্ষেপে উঠল না ক্ষেপবে না। ক্ষেপে ওঠা কিবা সহজ ধকল, চূড়ান্ত চূড়ান্তরে। ভিক্ষা ছাড়া তার গতিক নেই, বয়স যথেষ্ট যখন, রোগে রোগে সে কমজোরী।

বন্ধুর দেওয়া ভাতের গন্ধ আসে, একদা মনে হয় সে জিতেছে এই তো খাবার। তার এক চোখ, তাই এইটুকুই।

এই ভাবে শেষ হয়েছে শুনি

টুলটুলী সে অনেকক্ষণ ছেড়েছে। এটা জয়না। সে খাসমহলের সড়কে, ওপাশে জয়নার উঁচু ভেড়ী—জয়নার জনমনিস্যী প্রায় জঙলী ছিল। এটা জয়নার রাখ ডুমনীর বাড়ি, সে রোজা, ঝাড়ফুঁক করে, ওষুধ বিষুদ জানে। কুকুরগুলো এখন তার পিছনে ফেউ লেগেছে। মাটির ছোট পাঁচিল, সামনে এসে দাঁড়াল। এদের কুকুরটাও ডেকে উঠল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—সে দেখে, অদূরে মনসা গাছতলে একটা দক্ষিণারায়ের মূর্তি, কি ভয়ঙ্কর মূর্তি! সে ডাকল—

'ডুমনী! ও ডুমনী!'

'কিরে—কে—'

'আমি টুলটুলীর আলম, শাজাদের বেটা আলম—আলম'

'কি খবর,' একটা রোগা মেয়েছেলে বেরিয়ে এল; সকালে সর্ব্বাঙ্গে উল্কী দেখা যেত, দেখলেই মন মানে কিছু ভেল্কী জানে, জানে বৈকি, বুড়ো বয়স চোখে কাজল—'কিরে—আস্ ভিতরে আস্'।

আলম দাওয়ায় উঠে তাকে তার কথা বললে, বুড়ী তামাক খেয়ে কল্কেটা তাকে দিয়ে বললে—'তবে আমি কি করব—বল্?'

'আমারে এমন একটা ওষুদ দে, যাতে—মনের সাদে ভিক্ষে করতে পারি—বউটাকে খাওয়াতে হবে, একটা চোখ আছে—পয়সাকড়ি কিছুটি নেই কিন্তুন্ রাখ ডুমনী।'

'আচ্ছা কাল আসিস্—তোর যখন এমন হাল তুই পয়সা না দিস্—'

'আজই দাও—কাল আমি আর এদিকে আসতে পারব না—'

রাখ ডুমনী কি সব গাছগাছড়া বার করলে—আলমের ঔৎসুক্য, চেনবার চেষ্টা—একবার সে বাইরেও গেল। আলম অন্ধকারে একবার আঁতকে উঠছিল। কিন্তু তাকে কে যেমন ধরে রেখেছিল। ঔষধ তৈরি হয়, শিলটা ঘড়ঘড়, ডুমনী ওষুধ বাটে। খোলায় ওষুধ নিয়ে আলমকে সামনে বসিয়ে, সে বিড়বিড় করে কি বললে, বললে, 'তোর নাম?'

'শাজাদের বেটা আলম'

চোখে তিন বার ফুঁ দিলে, বললে, 'খা...'

আলম খেলে। ঝল্সানো লংকার ঝাঁঝে সে আউরে উঠল, ডুমনী আলোটা তার সামনে এনে আঙুল খাড়া করে বললে, 'কটা আঙুল, বোল্ কটি আঙুল?'

আলমের দেখতে চেষ্টা, দুচোখই তার বাঁ চোখ হয়েছে, বাঁ চোখে ছিল এতাবৎ অন্ধকার। বললে, 'দেখতে পাচ্ছি না—'

'হামার ওষুদ—বল এটা কি?' গোটাকতক ধান ছিল—'ধানরে বেটা (ধানের রঙ হলুদ না!) যা তোর খুব ভিক্ষে মিলবে, বাবুদের দয়া হবে—' আমায় পৌঁছে দেবে কে—রাখ ডুমনী মা আমার—'

'সে ভাবনা নেইক্, বদনীয়ার বাপ যাবে, চৌকীদার,' সে ওখান থেকে ডাকলে, 'হে-বদনীয়াগে, বাপকে বল্ একটি অন্দাকে হাটখোলা পৌঁছে দেবে।'

টীউবওয়েলের শব্দ আসে, এটা কি টুলটুলী? বাবুরা হয় সজ্জন। টীউবওয়েলের কলের শব্দ আসে, কে যে যেমন জল নেয়, এটা কী টুলটুলী! ছ-আনির বাবুরা সজ্জন।

'দেখ বউ—এবার ভিক্ষে মিলবে রে আমি রাখ ডুমনীর ওষুধ খেয়েছি—জমি গেছে তাতে কি —খাবার আর ভাবনা নেই—খুব ভিক্ষে পাব রে আমার উপর সবার দয়া হবে রে—' এখনও তার গলায় লাঙলের শশব্দ, গলার আওয়াজে আওয়াজে।

বউ খুশী হয়েছিল।

চতুরঙ্গ ১৯৪৮

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনেরো যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে। পাড়াপড়শী সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের এর আগের বউ বছর খানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজুখাতুন তিরিশে না পৌঁছোলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজুখাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালির শেখদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজুখাতুনের আছেই বা কি। বাক্স সিন্দুক ভরে যেন কত সোনাদানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত খেত-খামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে মাজুখাতুন। ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠা খানেক, আর কাছে একখানি পড়ো পড়ো শণের কুঁড়ে। এই তো বিষয়-সম্পত্তি, তারপর দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানাকাটা পরীব মতো চেহারা। দজ্জাল মেয়েমানুষের আট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজুখাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।

সিকদার বাডির, কাজি-বাড়ির বউঝিরা হাসাহাসি করল, 'তুক করছে মাগি, ধূলাপড়া দিছে চোখে।'

মুন্সীদের ছোটবউ সাকিনা বলল, 'দিছে ভালো করছে। দেবে না? এমন মানুষের চোখে ধূলাপড়া দেওয়ানেরই কাম। খোদা তো পাতা দেয় নাই চোখে। দেখছো তো কেমন ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া চায়। ধূলা ছিটাইয়া থাকে তো বেশ করছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, চাউনিটা একটু তেরছা মোতালেফের। বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ করে ঘোরে তার চোখ। অল্পবয়সি খুবসুরত চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি সাতকুড়ি। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম লেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠারো উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে পরতে কষ্ট দেয়, মার ধোর করে এই সব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইডুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। আসলে বয়স বেশি আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেই জন্যই ইচ্ছা করে নিজে ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয়ে যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দায় নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। এক নজরেই বুঝেছিল যে, সেও নজরে পড়েছে। চেহারাখানা তো বেমানান নয় মোতালেফের। নীল লুঙ্গি পরলে ফরসা ছিপছিপে চেহারায় চমৎকার খোলতাই হয় তার, তাছাড়া এমন ঢেউ-খেলানো টেরিকাটা

বাবরিই বা এ তল্লাটে ক'জনের মাথায় আছে। ফুলবানুর সুনজরের কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফের। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম শেখের বাড়িতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে গত বার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার আর না দেখে শুনে যার তার হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম। গাঁটের কড়ি যা খরচ করতে হয়েছে মেয়েকে তালাক নেওয়াতে গিয়ে, সুদে আসলে তো পুরিয়ে নিতে চায়। গুনাগার চায় সেই লোকসানের। আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ সে গুণাগার দু'এক কুড়ি নয়, পাঁচকুড়ি একেবারে। তার কমে কিছুতেই রাজি হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোত্থেকে।

মুখ ভার করে চলে আসছিল মোতালেফ। আশশেওড়া আর চোথ-উদানের আগাছার জঙলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হল ফুলবানুর সঙ্গে। কলসি কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিক করে একটু হাসল ফুলবানু, কি মিঞা গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি?

'চলব না? শোনলা নি টাকার খাককাই তোমার বা-জানের!'

ফুলবানু বলল, 'হু, হু, শুনছি। চাইছে তো দোষ হইছে কি? পছন্দসই জিনিস নেবা বা-জানের শুনা, আর দাম দেবা না?'

মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বা-জানের নয়, বা-জানের খাইয়ার। হাটে বাজারে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'

মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান, পালায় উইঠা বসব। মুঁঠ ভইরা ভইরা সোনা জহরত ওজন কইরা দেবা পালায়। বোঝব ক্ষেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মানুষের মুঠ।' মোতালেফ হন হন করে চলে যাচ্ছিল। ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব?'

এদিক ওদিক তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মানুষের। মনুষ্যের তেজ দেখতে চায়, বুঝ্‌ছ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে বুঝেছে।

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম কুকাম কইরো না মিঞা, জমি খেতে বেচতে যাইও না।

বেচবার জমি খেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ, বলল, 'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার?

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'

গাঁয়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে দেখলে মোতালেফ। গেল মল্লিকবাড়ি মুখুজ্যেবাড়ি, সিকদারবাড়ি, মুন্সীবাড়ি—কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেফের। ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ করে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতর সূচনাতেই পাড়ায় চার পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের

বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গত বছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড়কুড়ি গাছ বেশি হল। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনত কম নয়, এক একটি করে এতগুলি গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে তুলে জুতসই করে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুঁততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি তবে তো রাতভরে টুপটুপ করে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি অনেক খেজমৎ। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এ তো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হল।

অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে-নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে, কাচির পোঁচে গাছের গোড়াসুদ্ধ কেটে নিলেই হল। এর নাম খেজুরগাছ কাটা। কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোনো ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিকে ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুঁড়িতে ঘাটের পইঠা হবে, ঘরের পইঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাত ভরে।

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফকে নিজে হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এ-সব তত্ত্বকথা আর বিধি-নিষেধ ও তার মুখের। রাজেকের মতো অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধারে-কাছে ছিল না। যে গাছের প্রায় বারো আনা ডালই শুকিয়ে এসেছে সে গাছ থেকেও রস বেরুত রাজেকের হাতের ছোঁওয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়ত আধ-হাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠত। তার হাতে খেজুর গাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থরা। গাছের কোনো ক্ষতি হত না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছর কয়েক ধরে রাজেকের সাকরেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সঙ্গে সঙ্গে। সাকরেদ দু'চারজন আরো ছিল রাজেকের—সিকদারদের মকবুল, কাজিদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মতো হাত পাকেনি কারো। রাজেকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মতো।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না বাঁশের বাখারির ভারায় ঝুলিয়ে, রস জাল দিয়ে গুড় করবার মতো মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে,—কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি জোগাড় করে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালিগুড়ে পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের ওপর। শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় আর গুড় থেকে পসরায় কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজমৎ মেহনত। কিন্তু বছর দুই ধরে বাড়িতে সেই মানুষ নেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দু'বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজুখাতুনের ঝাঁপ-আঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছো নাকি মাজুবিবি?

ঘরের ভিতর থেকে মাজুখাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা?'

'আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছ বুঝি? কষ্ট কইরা উইঠা যদি ঝাপটা একবার খুইলা দিতা, কডা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মাজুখাতুন উঠে ঝাপ খুলে দিয়ে বললে, 'কথা যে কি তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজুখাতুনেরে। রস জ্বাল দিয়া দিতে হবে। কিন্তু সেরে চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মিঞা। তার কমে পারব না। গতরে সুখ নাই এ বছর।

মোতালেফ মিষ্টি করে বলল, 'গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।'

মাজুখাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মিঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোলো আনা দিতে চাই, রাজি হবা তো নিতে?

মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজুখাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গ তামাশা থুইয়া দাও মিঞা। কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া।'

মোতালেফ বলল, শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্যেই। কিন্তু শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মাজুবিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটান যায়?'

ইশারা ইঙ্গিত রেখে এরপর মোতালেফ আরো স্পষ্ট করে খুলে বলল মনের কথা। কোনোরকম অন্যায় সুবিধা সুযোগ নিতে চায় না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা করে নিতে যেতে চায় মাজুখাতুনকে। ঘর গেরস্থলির ষোলো আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজুখাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তারপর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গ তামাশার আর মানুষ পাইলা না তুমি। ক্যান, কাঁচা বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইয়া গেল নাকি দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে।'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান মাজুবিবি। কম বয়সি মাইয়া পোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজুখাতুন, বলল, 'সাঁচাই নাকি! আর আমি?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা?'

তখনকার মতো মোতালেফকে বিদায় দিলেও তার কথাগুলি মাজুখাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না। অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনের ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। মোতালেফের সঙ্গে পরিচয় অল্পদিনের নয়। রাজেক যখন বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যখন কাজকর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়িতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশোনা দুজনের। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কোনো গভীরতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হালকা ঠাট্টা তামাশা চলত, কিন্তু তার বেশি এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো। মোতালেফের ঘরে ছিল বউ, মাজুখাতুনের ঘরে ছিল স্বামী। স্বভাবটা

একটু কঠিন আর কাটাখোট্টা ধরনেরই ছিল রাজ্জেকের। ভারি কড়া-কড়া চাঁছা-ছোলা তার কথাবার্তা। শীতের সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি আনত মাজুখাতুনের উঠোনে আর মাজুখাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালিগুড়। হাতের গুণ ছিল মাজুখাতুনের। তার তৈরি গুড়ের সের দু'পয়সা বেশি দরে বিক্রি হত বাজারে। রাজ্জেক মরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশির ভাগ খেজুর গাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু'এক হাঁড়ি রস কোনবার ভদ্রতা করে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ কিন্তু আগেকার মতো হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠোন। গতবার মাসখানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দু'আনা করে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের মাজুখাতুন গুড় চুরি করে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রি করাচ্ছে সেই গুড়, ষোলো আনা জিনিস পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মনান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজুখাতুনকেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধ-বুড়োদের দলের আরো করেছে দু'একজন কিন্তু মাজুখাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে যার একটু বেশি বাড়াবাড়ি রকমের ইয়ার্কি দিতে এসেছে তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজুখাতুন। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ানো যায় না। তাকে তাড়ালেও তার কথাগুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খুবসুরত মুখও কারোও নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোতালেফকে আরো আসতে হল দু'এক সন্ধ্যা, তারপর নীল রঙের জোলাকি শাড়ি পরে, রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো মাজুখাতুন।

ঘরদোরের কোন শ্রী ছাঁদ নেই, ভারি অপরিষ্কার অগোছাল হয়ে রয়েছে সব। কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাজুখাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার কাজে। ঝাঁট দিয়ে দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠোনের, লেপেপুছে ঝকঝকে তকতকে করে তুলল ঘরের মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরণীর দিকে তাকাবার সময় নেই মোতালেফের, সে আছে গাছে-গাছে। পাড়ায় আরো অনেকের—বোসদের, বাঁড়ুজ্যের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে ভাগ করে দিচ্ছে রস। পাঁকাটির একখানা চালা তুলে দিয়েছে মাজুখাতুনকে মোতালেফ উঠানের পশ্চিমদিকে। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড় বড় মাটির জালা বসিয়ে সেই চালঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রস জ্বাল দেয় মাজুখাতুন। জ্বালানির জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ, জোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাতে কি কুলোয়। মাজুখাতুন এর ওর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পলো ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো করে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই। বিশ্রাম নেই। খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেকদিন পরে মনের মতো কাজ পেয়েছে মাজুখাতুন, মনের মতো মানুষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি করে আসে চড়া দামে।

বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফেরা যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। তল্লা বাঁশের একেকটি করে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারাদিনের ময়লা রস চোঙাগুলির মধ্যে জমা থাকে। চোঙা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায় না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে তামাক মাখাবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ'আনা সের। দু'বেলা দুবার করে এতগুলি গাছে উঠতে নামতে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পউষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকালবেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে। পায়ের নিচে দুর্বার মধ্যে চিক চিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়াপড়শিরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ কিন্তু বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিন-রাত এমন কলের মতো পরিশ্রম করতে এর আগে তাকে দেখা যায় নি কোনোদিন। ব্যাপারটা কি? গাছ কাটা অবশ্য মনের মতো কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এল ঘরে?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু'হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালির গুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হল চরকান্দায় এলেম শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলে রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তারপর কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশ টাকার নোট, বলল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মিঞাসাব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের?'

মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার—'

তাজা করকরে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোণায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায় নি কোথাও, কোন জায়গায় ছাপ লাগেনি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কি করব মিঞা। তুমি তো শোনলাম নেকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতিনের ঘরে যাবে ক্যান্ আমার মাইয়া। যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে, মারামারি কাটাকাটি কইরা মরবে দিন রাইত।

মোতালেফ মুচকি হাসল। বলল, 'তার জন্যে ভাবেন ক্যান মিঞাসাব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজুখাতুন তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিয়ে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ করে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিস আছে মিঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল থেকে দেখতে শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকি ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলালো ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মিঞা? এদিকে আমি রইলাম পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে ঢুকাইলা আর একজনারে।'

মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকিয়ে করি কি!'

মালের দায়ে জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে

পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কি করে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি করে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি করে।

ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাঁচাইলা জানও বাঁচাইলা, কিন্তু গায়ে যে আর একজনের গন্ধ জড়াইয়া রইল তা ছাড়াবো কেমনে।'

মনে এলেও মুখফুটে এ কথাটা বলল না মোতালেফ যে মানুষ চলে গেলে তার গন্ধ সত্যিই আর একজনের গায়ে জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তাহলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, 'গন্ধের জন্য ভাবনা কি ফুলবিবি। সোডা সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পইঠায় পা ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতর গুনা ঘইসা ঘইসা বদ বন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি?'

মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না তো কি মিছা? শুইখা দেইখো তখন নতুন মানুষের নতুন গন্ধে ভুর ভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলের গন্ধে, ফুলের গন্ধে, ভুর ভুর করবে. কেবল সবুর কইরা থাক আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, 'বেসবুর মানুষ ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দু'মাসের বেশি সবুর করতে হল না ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শিকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজুবিবির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার ব্যবহার ভারী আপত্তিকর।

মাজুখাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ; ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সুন্দর মোতিমিঞা, ভিতর সুন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরি তোমার মনে? গুড়ের সময় পিপড়ার মতো লাইগা ছিলা, আর গুড় যেই ফুরাইল অমনি দূর দূর!'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই মোতালেফের; ধৈর্যও নেই।

আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতোই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিশ্বাসে। পাড়াপড়শি বলল, 'এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের।'

ফুর্তির অন্ত নেই মোতালেফের মনে। দিনভর কিষাণ কামলা খাটে। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে আঁচল ধরে ফুলবানুর, 'থুইয়া দাও তোমার রান্ধন-বাড়ন ঘরগেরস্থলি। কাছে বসো আইসো।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুর সবুর! এ কয়মাস কাটাইলা কি কইরা মিঞা?'

মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া।'

নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর. একটু নিশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও। 'গাছির আদর গাছেই সইতে পারে।

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু গাছির কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায়। ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে।'

মাজুখাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো পড়ো শণের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতোই দিন কাটবে। কিন্তু দিন যদিবা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ

করে ছেড়েছে। পাড়াপড়শিরা এসে সাড়ম্বরে সালঙ্কারে মোতালেফ আর ফুলবানুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিরস্কারের সুরে বলে, 'নাঃ বউ বউ কইরা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'

বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজুখাতুনের। মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন কয়েক পরে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারী মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারী মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কমবয়সি ছুড়ি-টুড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না। তাই মাজুখাতুনের মতো একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউই তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়স কত হবে তার?'

ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সিই হবে। পঞ্চাশ, এক-পঞ্চাশ।'

মাজুখাতুন খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ ওই রকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।

তারপর মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে? খেজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান! ওসব কাম কোনো কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান বউ, 'গাছি' ছাড়া, রসের ব্যাপারি ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজুখাতুন ঠিক উলটো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুর গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজুখাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহলে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশি দেরি করতে চায় না।'

মাজুখাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কি।'

দেরি বেশি হলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজুখাতুন। পার হয়ে গেল নদী!

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নির মতো ফাঁৎ ফাঁৎ নিশ্বাস ফেলত, চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন রাইত, তার হাতগুনা, তো বাঁচলাম, কি কও ফুলবানু?'

ফুলবানু, হেসে বলল, 'পেত্নিরে খুব ডরাও বুঝি মিঞা?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না। পেত্নি তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।'

'ক্যান পরীরে আবার ডর কিসের তোমার?'

'ডর নাই? পাখা মেইলা কখন উড়াল দেয় তার ঠিক কি!'

ফুলবানু বলল, 'না মিঞা, পরীর আর উড়াল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই সব

পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইন্‌ষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এই রকম থাকলে হয়।'

মোতালেফ বলল, 'চোখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকবে।'

দিনরাত ভারী আদরে তোয়াজে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন্ মাছ খেতে ভালোবাসে ফুলবানু হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার করে কেনে সেই মাছ। ডিমটা, আনাজটা, তরকারিটা যখন যা পারে হাট-বাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি হাটে আনে পান সুপারি খয়ের মশলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আন ক্যান, তুমি তো বেশি ভক্ত না পানের। দিন রাইত খালি ফুড়ুত ফুড়ুত তামাক টানো।'

মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জন্যে। দিন ভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'ক্যান, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙ্গা না যে, পান খাইয়া রাঙ্গাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধর। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙ্গাইয়া নেও।'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর একজনের পানখাওয়া- ঠোঁটের রস লাগে।

নিজের ভুঁই খেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। কিন্তু ভালো কিষাণ বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মতো নয়। সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কিষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, পাট কাটে, পাট জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারী খেজমৎ খাটুনি খাটে। ফরসা রং রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বর্গা জমির পাট খুব বেশি ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুন্সীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিঘেচারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ-দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ। পাট ছাড়াতে ভারী উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'

ফুলবানু বলে, 'হইল তো বইয়া গেল, রইদে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া গেলা, আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে! কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মিঞা।'

নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাঁকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ-দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়। সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলি পাওয়া যাবে তাহলে। কিন্তু মোতালেফ রাজি নয় তাতে, অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষের দিকে আউশ ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ—এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাচি চলে না তার। হাত বড় 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভারী কাতর মোতালেফ। একেক দিন পিঠে বগলে জোঁক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে পারো না মিঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জোঁক ফেলাবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়িতে।'

যেখানে যেখানে জোঁক মুখ দিয়েছিল সে সব জায়গায় সযত্নে চুন লাগিয়ে দেয় ফুলবানু,

আরো পাঁচজন কিষাণের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচভাগের একভাগ। ধামায় করে পৈঁকায় করে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় করে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একেকবার বলে, 'ভারী কষ্ট হয় বউ, না?'

ফুলবানু বলে, 'হু, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না! কার নাগাল কথা কও তুমি মিঞা। গেরস্থ ঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি?'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ে। এ কাজে নাম ডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে সে-ই সেরা। এবারেও বাঁড়ুজ্যেদের কুড়িদেড়েক গাছ বেড়ে গেল।

গাছ কাটাবার ধূম লেগে গেছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের সময় নেই তেমন ফুলবানুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতার। ধার দেনা শোধ দিতে হবে, সারা বছরের রসদ জোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মতো দিনভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুমে ভেঙে আসে চোখ। দু'হাতে ঠেলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবানু, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছটে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর কোনো অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবানু। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো ডালপাতা আর খড় বয়ে আনে মোতালেফ। ফুলবানুকে বলে, 'রস জ্বাল দাও,—যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিস হওয়া চাই বাজারের।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবানুর, বুক কাঁপে। দু'এক হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়েছে সে বাপের বাড়িতে, কিন্তু এত রস একসঙ্গে সে কোনোদিন দেখেনি, কোনোকালে জ্বাল দেয়নি।

মোতালেফ তার ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কি, আমি তো আছিই কাছে কাছে—আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া কইয়া দেব। মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জালার মধ্যেও তেমন করা চাই।'

কিন্তু উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, নিবু নিবু করে উনানের আগুন, তেমন করে টগবগ করে না জালার রস। সারা দুপুর উনানের ধারে বসে বসে চোখ-মুখ শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, রূপ ঝলসে যায়, তবু গুড় হয় না পছন্দমতো। কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনোদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইরা কইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝো না। এই গুড় হইছে, এই নি খইদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে, 'কেনবে না ক্যান। বেচতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুশি হয় না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইস বাজারে। তুমি আইস বেইচা। খুবসুরত মুখের দিকে চাহিয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে। বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু'চার-দিনের মধ্যেই কোনোরকমে চলনসই গুড় তৈরি করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে

অচল রইল না। কিন্তু দর ওঠে না গতবারের মতো, খদ্দেররা তেমন খুশি হয় না দেখে।

পুরোনো খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, 'এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মিঞা? গত হাটে নিয়ে দেখলাম গেল বছরের মতো সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জিহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে, আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রইছে। এবারে তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'

বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মতো এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে, তবু কেন দর উঠছে না, লোকে দেখে খুশি হচ্ছে না, খেয়ে খুশি হচ্ছে না, গুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্যে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা আরো বার কয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইরা কইরা ফোঁটা দেইখো নামাবার সময় হইল কিনা, ঢালবার সময় হইল কিনা রস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে, 'হু হু, চিনুছি। আর বক বক কইরো না, ঘুমাইতে দেও মাইন্‌ষেরে।'

হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজুখাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজুখাতুন এমন করে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কোত্থেকে একবোঝা জ্বালানি মাথায় করে নিয়ে এল মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাঁকাটির চালার দোরের কাছে, 'কি রকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোন জবাব এল না ফুলবানুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কি রকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড়? সারে সারে গোটা পাঁচেক জালার রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সবচেয়ে দক্ষিণ কোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কি করে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ভিতর থেকে। বুকের মধ্যে জ্বালাপোড়া করে উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চিৎকার বেরুল,—'কই, কোথায় গেলি হারামজাদি?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবানু। বেলা বেশি হয়ে যাওয়ায় দু'দিন ধরে স্নান করতে পারেনি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড় চড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান করে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চিৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর। একমুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুঠি করে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদি, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুণা বাইরাইয়া আইলা'

তুমি বিদ্যাধরী, এই জন্যই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জন্যে!'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিয়ো না।'

'ও, হাতে মারলে মান যায় বুঝি তোমার?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটা কঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মারলে তো আর মান যাবে না শেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভারি বদরাগি মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম শেখ এল চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসালো, বকলো, ধমকালো, মেয়েকেও নিন্দামন্দ কম করল না।

ফুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বা'জান তোমার সাথে—এমন গোঁয়ার মাইন্‌ষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে-শুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আশকারা দিলেই ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থঘরে অমন বারবার অদল-বদল আর ঘর-বদলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু'দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি। দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেলও। খানিক বাদেই আবার যেচে আপস করল মোতালেফ। সেধেভেজে মান ভাঙাল ফুলবানুর। পরদিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু। দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল, 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোনো রকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলজান।'

ফুলবানু বলল, 'কষ্ট আবার কি।'

কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা; তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। বলেও জানে, শোনেও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বতর প্রায় শেষ হয়ে আসে; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না; কিন্তু তা নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ি এসে আর তর্কবিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ করে বসে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মতো যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাঁকাটির মতো খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মতো খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা ফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।

একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারের নাদির শেখের সঙ্গে।

'সেলাম মিঞাসাব।'

'আলেকম আসলাম।'

মোতালেফ বলল, 'ভালো তো সব, ছাওয়ালপান ভালো তো—?'

মাজু খাতুনের কথাটা মুখে এনেও আনতে পারল না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল,

'হু মিঞা, ভালোই আছে সব। খোদার দয়ায় চইলা যাইতেছে কোনো রকম সকমে।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত করে বলল, 'ছাওয়ালপানের জৈন্যে সের দুই তিন গুড় লইয়া যান না মিঞা। ভালো গুড়।'

নাদির হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনোকালে খারাপ হয় না।'

হঠাৎ ফস করে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মিঞা, সে দিনকাল আর নাই।'

অবাক হয়ে নাদির একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমনতরো ব্যাপারি! গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ নিজে করে?

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'

'দামের জন্যে কি? দুই সের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানরে খাইতে। কয়েন জানি, চাচায় দিছে।'

নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কি মিঞা, আপনার বেচবার জিনিস, দাম না দিয়া নেব ক্যান আমি।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিয়া তো যায়েন আইজ খাইয়া দ্যাখেন, দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস কাটাবার জন্যে বলতে হয় এসব কথা, গুড়ের গুণপনার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলি কত মিথ্যা, পরের হাটে এসব খদ্দের আর পারতপক্ষে গুড় কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলা-কওয়ায় একসের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজি হয় নাদির, আর বাকি দু'সেরের পয়সা গুনে দেয় জোর করে মোতালেফের হাতের মধ্যে।

মাজুখাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, কিন্তু আমি ও গুড় ছোব না হাত দিয়া, তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক হাট যায়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজুখাতুন নিষেধ করে দিয়েছে নাদিরকে, 'খবরদার, ওই মাইন্‌ষের স্যাথে যদি ফের খাতির নাতির কর, আমি চইলা যাব ঘরগুনা। রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'

মনে মনে মাজুখাতুনকে ভারী ভয় করে নাদির। কাজে-কর্মে সরেস, কথায়-বার্তায় বেশ কিন্তু রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দুটি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু'হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে খেয়া নৌকায় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপটানো কুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে; 'বাড়ির আছেন নাকি মিঞা?'

হুঁকো হাতে নাদির বেরিয়ে এল ঘর থেকে; 'কেডা? ও, আপনে? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান মিঞাসাব?'

মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির কিন্তু মনে মনে ভারী শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজুখাতুনের জন্য। যে মানুষের নাম গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই

স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজুখাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও এ বাড়িগুনা, এখনই নাইমা যাইতে কও। একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে? কোনো মুখে উঠল আইসা এখানে?'

নাদির ফিশ ফিশ করে বলে, 'আস্তে আস্তে—একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শুনতে পাবে। মাইন্‌ষের বাড়ি মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা হয় নাকি। কুকুর বিড়ালডারেও তো অমন কইরা খেদায় না মাইন্‌ষে।'

মাজুখাতুন বলল, 'তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর বিড়াল থেকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থেকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ কর. রস খাওইয়াতে যে আইল আমারে, একটুও ভয়ডর নাই মনে, একটুও কি নাজশরম নাই?'

একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজুখাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এক রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দামন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারের মধ্যেও কোথাও যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে: মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে; মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়ি দুটি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মিঞাসাব, শোনবেন নি একটু?'

নাদির লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল. 'বসেন মিঞা, বসেন। ধরেন, তামাক খান।'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা কন বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই কন না, দোষ কি তাতে।

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবার মুখ আমার নাই। কন যে মোতালেফ মিঞা খাওয়াবার জন্যে আনে নাই রস, সেইটুকু বুদ্ধি তার আছে।'

নাদির কিছু বলবার আগেই মাজুখাতুন ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'তয় কিসের জন্যে আনছে?'

নাদিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ, বলল, 'কয়ন যে আনছে জ্বাল দিয়া দুই সের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মিঞা। নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারের কাছে। এ বছর একছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটে বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হইছে তার।' গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর-দুটি চোখ ছল ছল করে উঠেছে। চুপ করে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হল না।

হঠাৎ যেন হুঁস হল নাদির শেখের, বলল, 'ও কি মিঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না? আগুননি নিবা গেল কইলকার?'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মিঞাভাই, নেবে নাই।'

সাইমিয়া ক্যাসিয়া

অমিয়ভূষণ মজুমদার

পাহাড়ের দু'টো দেয়ালের মধ্যে এই সরু গলি দিয়ে বনমোরগ তার হারেম নিয়ে কিছুক্ষণ আগে চলে গিয়েছে। তাদের পিছনে পিছনে নেমে আসছিলাম। বুটের নিচে স্যাঁতসেঁতে পাতার ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আজও দেখলেম পথের বাঁকটায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে সে। তার পায়ের তলায় হাত ছয়েক নিচু একটা খাদ। সেই খাদে একটা ফুল-সমেত গাছ। অনেক ফুল। গাছটার দিকে চেয়ে সে স্থির হয়ে বসে আছে। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এমন স্থির।

বললুম, আজও দেখছি।

সে মৃদু হেসে ফুলন্ত গাছটাকে দেখিয়ে দিলো।

বললুম, কাল বললেই পারতে। ওটাকে সাইমিয়া বলে, ক্যাসিয়া সাইমিয়া।

ফুলটা গোলাপি দেখছি। কখনো হলদে ফুল হয় নাকি? গোলাপির মধ্যে দু'-চারটে হলুদ বা সোনালি?

উচিত নয় হওয়া।

সে তার শাদা কেশর-সমেত কদমফুলের মতো মাথাটা ঝাঁকালো।

বললুম, কেউ যদি গ্র্যাফ্‌টিং করে তবে গোলাপি কুঁড়িতে ভরা ডালগুলোর মধ্যে এমন একটা ডাল দেখা যেতে পারে যেটায় হলদে ফুল ফুটেছে।

সে গ্র্যাফ্‌টিং বিষয়ে জানতে চাইলো, বুঝিয়ে বললুম।

সে বিড়বিড় করে বললো, উত্তুরে কুকুর যখন চিল্লানী শূকরীকে মাতৃত্ব দেবে তখন অমিতাভ আর থাকবে না পৃথিবীতে।

শুনতে না পাওয়ার ভান করাই ভালো। ভাষাটা বিদেশি নয় শুধু, বিদেশের সান্ধ্যভাষা।

বললুম, তোমাকে সংক্ষেপে বলি। আমাদের দেশে স্বেন হেডিন, এমনকি ইয়ংহাজব্যান্ডের মতো ভ্রমণকারী নেই বটে, কিন্তু আধুনিক কালেও দু'একজন ছিলো না এমন নয়। এই সেদিন নিষিদ্ধ দেশ, তিব্বতেও আমাদের শরৎ দাশ গিয়েছিলো। নিরাপদে ফিরেও এসেছিলো। আমরা জানি শরৎ দাশ তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজের বাণিজ্যপথ খুলতে গিয়েছিলো। ইয়ংহাজব্যান্ড পরে তাকে অনুসরণ করে। আরো পরে তাদের বাণিজ্যপথ সীমান্ত-সংক্রান্ত ঠাণ্ডা যুদ্ধে হারিয়ে যায়। আমরা জানি শরৎ দাশের নিষিদ্ধ দেশে প্রবেশ এবং সেখানে অবস্থানের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য অন্তত দু'জন লামার প্রাণদণ্ড হয়েছিলো। এইটুকু ইতিহাস।

সে আবার তার কদমফুলের মতো মাথাটা ঝাঁকালো। আমার কথাটা তার মনে ধরেনি।

বললুম, আর আমি এক পর্যটকের সাক্ষ্য থেকে জানি লাসার কিছুদূরে একটা গুহা আছে। যার সম্বন্ধে সেখানকার লোকের ধারণা অতীশ সেখানেই বাস করতেন নির্বাণ লাভ পর্যন্ত।

সে এবার আমার দিকে দৃষ্টিটা স্থির করলো। দু'এক মিনিটের চাইতেও বেশি। তার চাঁপা রঙের ময়লা আলখেল্লার নানা ভাঁজের একটিতে হাত ঢুকিয়ে মালা বার করলো। তার অর্থ আমার চাইতে আর কে ভালো জানে? মালাটা আঙুলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াবে, আর তারপর

সে নামতে আরম্ভ করবে তার আস্তানার দিকে। একে উৎরাই তাতে পাহাড়ে অভ্যস্ত পা; তাকে ছুট দৌড় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তখন তার পিছনে ছোটা যায় বটে, কিন্তু তাকে আলাপচারীর উপযুক্ত ভঙ্গি বলে না বোধ হয়। সে উঠে দাঁড়ালো। হাসলো। হাসিটা বর্ণনার উপযুক্ত : চোখের প্রান্ত থেকে প্রান্ত স্নিগ্ধ শান্ত একটা ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে। ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলালো—এটাই বিদায়-অভিনন্দন। কখনো সময়কে ব্যর্থ হতে দেয় না। চিন্তা করছিলো—যাকে ধ্যানও বলা যেতে পারে উপযুক্ততর শব্দের অভাবে। তারপরে আমার সঙ্গে আলাপ করেছে। এর পরের কাজ আস্তানায় ফিরে পুঁথি পড়া। পথ চলাটা কাজ নয়, দু'টো কাজের মধ্যে সেতু, সুতরাং তা'কে যত ছোটো করা যায় তা করতে হবে। তাই এমন ক্ষিপ্রগতি।

লোকটি দলের মধ্যেও স্বতন্ত্র। তার হাসি, মাথা দোলানো, পাহাড়ি অঞ্চলের লামাদের হাতে যে ঘূর্ণমান প্রার্থনাযন্ত্র থাকে তার বদলে মালাও কখনো কখনো—যেন হ্রদান্তরের সময়ে এক জাতীয় হাঁসের ঝাঁকে অন্য জাতীয় একটি হাঁস এসে পড়েছে।

তার ইতিহাসজ্ঞান সঠিক। অতীশ দীপঙ্কর বাঙালি, সে বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলো তা সে জানে। ইয়ংহাজব্যান্ড, হোয়াইটের আগে বাঙালি পর্যটক গিয়েছিলো আধুনিক কালের তিব্বতে তা সে জানে। সে লাসার চিনা আম্বনদের কথা জানে। দলাই লামাদের ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়—এক সময় দলাই লামা থাকবে না এ প্রবাদ যে একশ বছর আগেই প্রচারিত ছিলো, চিনা আম্বনরা যে দলাই লামা বাছাইয়ের ব্যাপারে ভেজাল চালাতে চাইতো, চিনা-তিব্বতে মামা ভাগনে সম্বন্ধ, কখনো যাজক-যজমানের, এমন সব মত সে সমর্থন করে। সে বলেছে কিছুদিন আগে যখন তিব্বতীরা চিনাদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য আধুনিক রাইফেল চেয়েছিলো ইংরেজরা তখন টালবাহানা করেছে, কার্পণ্য করেছে। নতুবা সেবারেই চিনকে নির্লোভ করে দেয়া যেতো। তা হলেও দলাই লামাকে ইংরেজরা দার্জিলিং শহরে আশ্রয় দিয়েছিলো এজন্য তিব্বতীরা কৃতজ্ঞ ছিলো। এ সবই ইতিহাসে পাওয়া যায়।

কিন্তু লোকনাথ? অবশ্য তার মুখে শোনা নামটির আক্ষরিক অনুবাদ করে যা পাওয়া যায় তাতে লোকনাথ, লোকপাল, নরনাথ ও নরপাল এই চারটি নামই তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু এরকম কোনো লোক কি তাদের দেশে গিয়েছিলো বজ্রযোগিনী থেকে? যায়নি তা বলা যায় কি করে? একই সঙ্গে স্কাউন্ড্রেল এবং মহাপুরুষ এমন লোক সব দেশেই জন্মায়। বাংলাদেশে জন্মাতো না তা বলা যায় না। শরৎ দাশের আগে কিম্বা পরে আর কাউকে বাংলাদেশের ইংরেজ গভর্নর পাঠায়নি বাণিজ্যপথ খুলতে, যার অন্য নাম গোয়েন্দাগিরি হতে পারে, এ কে হলপ করে বলবে? হয়তো তার উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করেনি কিম্বা খুব বেশি করেছিলো বলে ফাইলের তলে চাপা পড়ে তার নাম চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। হয়তো বা তার জন্যও দু'একজন লামাকে প্রাণ দিতে হয়েছিলো। ধর্ম না-মেনেও তা নিয়ে বিশদ আলোচনা, কমিসরিয়েটের দক্ষ এবং দুঃসাহসী চাকরি, নিছক গোয়েন্দাগিরি এগুলো অন্তত বাঙালির পক্ষে অসম্ভব ছিলো না তা সে বজ্রযোগিনী কিম্বা বাঁকুড়ার হোক।

লোকনাথ অবশ্যই একটা তিব্বতি খচ্চর যোগাড় করেছিলো। সে তার নাম রেখেছিলো দধিকর্ণ। খচ্চরটার কান দু'টো শাদা ছিলো কিন্তু সেজন্যই নামটা নয়। বিড়াল যেমন গাছে ওঠে খচ্চরটাও তেমন পাহাড়ে উঠতে পারতো। এই নামকরণ থেকে লোকনাথের মনের

আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে? প্রবাদ এই দধিকর্ণ একবার একটা ব্রিজের পচা কাঠের মেঝে ভেঙে আট-ন' ফুট নিচে পড়ে যায়। লোকনাথ বলেছিলো ঃ এই অবস্থায় যখন দধিকর্ণকে পাথর কাদা আবর্জনা থেকে উদ্ধার করা হলো তখন তিনবার পিছনের পা ঝেড়ে, একবার সামনের পা ঝেড়ে নাকি পাহাড়ের উৎরাই উঠতে শুরু করেছিলো আবার। লোকনাথের সঙ্গে থাবা-থাবা কুইনাইন, কয়েক বোতল হুইস্কি এবং দু'দুটো গুলি-গাদা আর্মি পিস্তল ছিলো। মাথায় কান-ঢাকা টুপি, গায়ে হলুদ রঙের আলখেল্লা। লোকনাথের গায়ে রঙ পীতাভ ছিলো। একরকম লোমনাশক চূর্ণ ব্যবহার করে দাড়িগোঁফ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো সে। প্রায় এক বছর তার মিশনসংক্রান্ত কাজকর্ম করে লোকনাথ ফিরে এসেছিলো। সীমান্তের পাহাড়ে যখন সে পৌঁছেছে তখন তার কানে সংবাদ এলো, তাকে যে লামারা আশ্রয় দিয়েছিলো তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। তখন সে সেই লামাদের দেশের দিকে ফিরে আঙুল মটকে আঙুল ঝেড়ে ফেলেছিলো। তারপর কী ভেবে তার একটা সার্ভিস পিস্তলের চোখ খালি করে দিয়েছিলো আকাশমুখো। এটা কি অভিশাপ অথবা নাটকীয় কায়দায় 'মরুকগে যাক' বলা?

যে লামারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো তাদের একজন একটু বিশিষ্ট ছিলো। সে ভারতীয় ভাষা পালি সংস্কৃত কিছু-কিছু শিখেছিলো। বিদেশি ভাষা জানার একটা অসুবিধে এই—বিদেশি পেলে তার সঙ্গে তার ভাষার কথা বলতে মুখ সুড়সুড় করে। আর লোকনাথ টুলো পণ্ডিত না হলেও দু'-এক পদ পালি বা সংস্কৃত এমন কি না জানতো?

কিন্তু এসব আলোচনা হয়েছিলো গল্পটা শুনবার পরে। গল্পটাই আগে। তারও আগে যদি কিছু থাকে তবে সেটা বটানি-চর্চা।

গুঁড়িটা দুধের মতন শাদা হযে ওঠে আর তখন থলো থলো গোলাপি ফুলে গুঁড়ি, ডালপালা সব ঢেকে যায় এ-রকম গাছ দেখেছো!

বলতে যাচ্ছিলুম, ইউক্যালিপটাস খোসা ছাড়লে তেমন হয় বটে, কিন্তু ইউক্যালিপটাসে আমি তেমন ফুল দেখিনি।

সে আজ খাদের গাছটাকে দেখিয়ে দিলো, যদিও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় বলে এর গুঁড়ি ডালপালা সবই বেশ কালচে রঙের।

ক্যাসিয়া সাইমিয়া এর নাম।

এর পরই গল্প; ইতিহাস এবং লোকনাথকে নিয়ে আলোচনা অনেক পরে। পেমার বাড়িটা দেখলে পরিত্যক্ত অথবা ভুলে যাওয়া গ্রাম্য সরাইখানার কথা মনে হবে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাওয়ার প্রধান সড়ক থেকে এবং পাহাড়ের পায়ের অন্য বাড়িগুলো থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে, বরং পাহাড়ের একটা ভাঁজে, নিজের এক টুকরো উপত্যকায় একা, কিন্তু তা হলেও হঠাৎ দেখলে সরাইখানা বলে মনে হয়। সরু সরু ধুলো-ঢাকা পায়ে-চলা দু'টো রাস্তা তার বাড়ির কাছে এসে মিশেছে। সেটাও একটা কারণ বটে, কিন্তু আসলে বাড়িটার নিঃসঙ্গতাই সরাইখানার স্মৃতি মনে এনে দেয়। যে-কেউ এখানে গোপন আশ্রয় নেবার কথা ভাবতে পারে। অন্যদিকে লজিস্টিকের বিচারে এটা একটা ছোটো ট্রান্সমিটারের গোপন আড্ডাও হতে পারে। কিন্তু এসব গল্পটার শেষটা জানি বলেই বলতে পারছি। এখন সে কথা থাক।

সামনে, যাকে স্কাইলাইন বলে, সেখানে একটা পাহাড়ের কাঁধ। ঠিক এখানেই কালো পাটকিলে পাহাড়টার গায়ে বেশ খানিকটা জায়গা শাদা, না জানা থাকলে ধস নামার চিহ্ন বলে মনে হবে।

পেমার বাড়ি থেকে অন্য রকম দেখতে পাওয়া যায়। কিম্বা দেখতে পাওয়া যায় কথাটা ঠিক হলো না। পেমা জানে বলেই বলতে পারে তার বাড়ির বাইরের দিকের বারান্দা থেকে সোজা পথে দু'ফার্লং আর ঘোরা উৎরাইয়ের পথে হেঁটে দু'মাইল গেলে ওখানে একটা কোয়ার্টজ জাতীয় পাহাড়ের গুহা আছে। সোজা কথায় বলতে হবে ধূমল রঙের একটা চমরি বাছুরের শাদা কপাল, পাঁশুটে-শাদা জিভ; জিভের সরু হয়ে আসা ডগাটা নীচের পথটার ধারে নেমে এসেছে। শহর থেকে পনেরো-ষোলো মাইল দূরের এই নির্জন পাহাড়টাকে বাচ্চা-চমরি বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু তুলনার অর্থ এই নয় যে প্রতিটি বিন্দুতে মিলতে হবে। গুহাটার মুখের কাছে যে কাঠগোলাপের ঝোপ আছে তাকে না হয় বাচ্চা-চমরির কপালের পশম বলা গেলো, কিন্তু যাকে জিভ বলা হয় তার উপরে একটা গাছ আছে। তাকে কি চমরির জিভে জড়ানো একটা পল্লব বলবে?

পেমার কাছে এটা আশ্চর্য লাগে শক্ত শাদা পাথরে কি করে এই গাছটা বেঁচে চলেছে। পুরনো কথাটা মানতে হলে তা প্রায় ষাট-সত্তর বছর বয়স হলো গাছটার। নিজে থেকেই হয়েছে। বাড়েনি, বুড়ো হয়নি, মরেও যায়নি। এ জাতীয় গাছ এদিকে দেখাও যায় না। গুঁড়ির একেবারে গোড়ার মাপ দু' হাত হবে। কাণ্ডটা বেলচার হাতলের মতো পশ্চিম থেকে পুবে বেঁকে গিয়েছে। সেখান থেকে ডালপালা শুরু। ছবিতে যেমন সাজিয়ে আঁকা হয় তেমন সাজানো ডালপালা। গুঁড়িটা শাদা। বসন্ত আসতে না-আসতেই থলো-থলো গোলাপি ফুলে আপাদমস্তক ঢেকে যায় গাছটার। গোড়া থেকে তিন-চার হাত বড়জোর বাকি থাকে। আর থলো-থলো গোলাপি ফুলের মধ্যে কখনো কখনো নাকি দুটো ডালে সোনালি ফুল ফোটে। পেমা দেখেনি, থেনডুপ দেখেছে। অন্তত তাই বলে সে। হলুদ এমন যে তাকে সোনালিই বলতে হয়।

পেমার মাথায় চ্যাটালো খড়ের টুপি। টুপির নীচে থেকে লম্বা পিগ্‌টেল পিঠের উপরে ঝুলছে। তার কাঁধে জলের বাঁক, বাঁকের দু' দিকে দু'টো তামার হাঁড়িতে জল। গায়ে ময়লা, ব্যবহারে জীর্ণ হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা আলখেল্লা, আলখেল্লার নীচে পেশীবহুল, দীর্ঘ তামাটে রঙের পা দেখা যাচ্ছে।

ছ' ফুট উঁচু শক্ত সমর্থ দেহ। দু'মণ বোঝা সে অনায়াসেই বইতে পারে। আর শক্ত সমর্থ হয়ে ওঠার কারণও আছে। ভুলে যাওয়া সরাইখানার মতো এই বাড়িতে পঁচিশ বছর ধরে একেবারে একা জীবিকা অর্জন করা, এমনকি এই বাড়িটাকে তৈরি করাও বলা যেতে পারে নিজের দু'হাত দিয়ে। বাড়ির পিছন দিকের পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে যব, রসুন, রাইশাকের ক্ষেত তৈরি করা—এক কথায় পাথরের চাইতেও কঠিন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে সে এখন লড়াইবাজ।

পথ এখানে খাড়াই পাক খেয়ে উঠেছে। কিন্তু সময় বাঁচানোর জন্য পেমা দু'হাতে বাঁকের দু' মাথার দড়ি ধরে প্রায় দু'ফুট উঁচু একটা পাথরের উপরে পা রাখলো, অবলীলায় তার উপরে উঠে দাঁড়ালো, তারপর আবার ডান পা রাখলো আর একটি পাথরের মাথায়। যেন ঘরের সিঁড়ি এমন করে পেমা উঠে এলো চড়াইয়ের ঘোরা পথকে ফাঁকি দিয়ে।

তার বাড়ির সামনে একটা রোগাটে খচ্চর, আর বাছুর সমেত তিনটি চমরী গাই। গোবরের

ডাঁইটার উপরে একটি মাদি শুয়োর। আধপচা গোবরের তীব্র গন্ধটা নাকে এলো পেমার, চমরির ঘামের গন্ধও। হাত তুলে শুয়োরটাকে ধমকালো পেমা—হুস, হ্বাই! বুড়ি চমরীটা ডাকলো, ম্মু!

পেমা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠলো। কাঁধ থেকে বাঁকটা নামালো। যত শক্তসমর্থ দেহ হোক, আধ মাইল খাড়াই পথ দু'মণ জল তুলে আনা খুব সহজ কথা নয়। বারান্দার ধারে পথের উপর পাথর রেখে দুপুরের ঝড়ো বাতাসকে রুখবার প্যারাপেট। তার উপর বুক রেখে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিতে লাগলো পেমা। আলখেল্লার ভাঁজ থেকে মোটা কাগজে জড়ানো হাতে পাকানো সিগারেট বার করে ধরালো সে। অসংস্কৃত কড়া তামাকের তীব্র গন্ধ—এত তীব্র যে অভ্যাস সত্ত্বেও পেমাও খক খক করে কেশে উঠলো, থুপ করে কফ ফেললো।

তারপর তার চোখ পড়লো বাচ্চা-চমরীর মাথায়, বাচ্চা-চমরীর জিভে জড়ানো গাছটার উপরে। থেনডুপ বলে, সে নাকি ওই গাছটায় গোলাপি ফুলের মধ্যে একবার হলুদ ফুল দেখেছিলো। তা অনেক বছর আগে, ত্রিশ বছর তো হবেই।

তা দেখো, পেমা সিগারেট হাতে নিয়ে স্বগতোক্তি করলো, ও গাছটা সাইমিয়া তা বুঝতে আর বাকি নেই। কংমো বলেছে। এখানে কেন? সখ করে কেউ লাগিয়ে থাকবে। গাছের গুঁড়ি শাদা কেন? গাছটার কাছাকাছি শাদাটে রঙের পাথর, ধুলোও সুতরাং শাদা। হাত দিয়ে ঠুলি বানিয়ে চোখের উপর রেখে পাহাড়টাকে খুঁজলো পেমা। থেনডুপকে দেখতে পাবে ভেবেছিলো সে। জিভের উপরে দাঁড়িয়ে থাকলে চোখে পড়তো। সে হয়তো ওদিকেই গিয়েছে, কোথায় যাবে তা ছাড়া? (হঠাৎ দুঃখের ছায়া পড়লো তার মুখে) থেনডুপ সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারে না! কাঁকড়ার মতো চলে সে।

পেমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে এলো, জলের বাঁকটা কাঁধে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। উনুনের উপরে হাঁড়ির ঢাকনাটা নড়ছে, বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো রসুন আর আধসেদ্ধ মাংসের মিষ্টিগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। উনুনের পাশে চায়ের হাঁড়িটা থেকেও মৃদু মৃদু ধোঁয়া উঠছে। আর একটু ফুটবে মাংস-যবের সুপ। ঘরের এক কোণে তরকারি আনাজের খোসা জমানো ছিলো বালতিতে। সেটা হাতে করে বের হলো। বাড়ির পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে বাড়ির মেঝের তলায় ঢুকলো। ক্যাঁ ক্যাঁ করে একদল জানোয়ার ডেকে উঠলো—সাত-আটটি শুয়োর ধাড়ি-বাচ্চা। বালতিটা উপুড় করে দিলো পেমা। হুস, হ্বাই।

কর্তব্য শেষ করে পেমা উঠে এলো, কিন্তু একটার পর আর একটা কাজ। যে জলটা সে ঘরের কাজে ব্যবহার করে সেটা রসুন ক্ষেত থেকে সরিয়ে রাইশাকের ক্ষেতের দিকে চালিয়ে দিতে হবে। তার মানে ছোটো একটা বাঁধ বেঁধে নতুন করে নালি কাটা। ছোটো হাতলের কোদাল হাতে নেমে গেলো সে ক্ষেতে। রসুন এবার ভালো হয়েছে তার; টোপা-টোপা, রসালো। ভাবতে জিভে জল আসে। যবের রুটি, নুন, আর পর-পর তিন বাটি চা, তাতেই দু'মণ জল আধ মাইল তুলে আনা যায়। নতুন আলুর ক্ষেতটা চোখে পড়লো। কোদাল চালাতে চালাতে পেমা ভাবলো আলুগুলো যদি রসুনের মতো হয়! দু'কাঠা পরিমাণ জমি। পাহাড় থেকে দখলে আনতে ছ'মাসের পরিশ্রম গিয়েছে। তিন মাসের সবটুকু চমরীর গোবর মিশিয়েছে সে ক্ষেতটুকুতে। এখানে যে আলু হবে সেটাও সাধারণ নয়। শাও টি বলেছে গ্র্যাফটিং করে মিশ্র জাত তৈরি হয়েছে।

এই কথাটাই যেন তাকে দাঁড় করিয়ে দিলো। নিবে আসা সিগারেটে জোরে একটা টান দিলো সে। তীব্র কাঁচা তামাকপাতা পোড়ার গন্ধ ছড়িয়ে ধোঁয়াটা মুখ থেকে বার হতে হতেই হাসি দেখা দিলো সেখানে। এখান থেকে গাছটাকে দেখতে পাওয়া যায় না, তবে যে দিকে মুখ করে সে দাঁড়িয়েছে সেদিকেই গাছটা থাকার কথা।

সাইমিয়া গাছটায় গোলাপি ফুলের মধ্যে কদাচিৎ যদি সোনালি ফুল দেখা যায় তবে তার কারণ গ্র্যাফ্‌টিং। গাছটা যে লাগিয়েছিলো সে গ্র্যাফ্‌টিং জানতো। আর এ বিষয়ে সে থেনডুপকে চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে পারে। তার শুয়োরের পালে দুটোর রঙ একেবারে শাদা, অন্যগুলো বাদামী। তার কারণ কংমোর বুড়ো শাদা শুয়োরটা। শাও চি এসব বিষয় তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। কে আবার শাও চি? কংমোর ছেলে, যে তাকে হান্‌ভাষার পুঁথিগুলো পড়তে দেয়। শাও চি হাসতে হাসতে বলেছিলো, আমাকেই দেখো, আমি কি একেবারেই হান্? তা নয়, তবু তাদের মতো। তা হান্‌রা আমাদের চাইতে ধূর্ত বটে।

নালার কাজ শেষ করে পেমা ঘরে উঠে এলো। কপাল থেকে আঙুল দিয়ে ঘাম মুছে ফেললো। আজ সে স্নান করবে। কালকের বাসি জলটাকে সে কাজে লাগাতে পারবে, নালাটা তৈরি হয়ে গেছে। স্নান মানে ক্ষেতে জল দেয়ার আর এক নাম।

অবশ্য, আবার স্বগতোক্তি করলো পেমা, একথা কেউ অস্বীকার করছে না যে বজ্রযোগিনী থেকে কেউ এসেছিলো। তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো থেনডুপের ঠাকুরদা। সেজন্যই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো। তখন দেখে বিদেশিকে আসতে দেয়া রাষ্ট্রদ্রোহ মনে করা হতো। পঁচাত্তর বছর আগে চমরীর জিভের উপরেই মোঙ্গলঘাতক থেনডুপের ঠাকুরদা গিয়াৎসোর মাথা কেটে ফেলেছিলো, হয়তো সাইমিয়া গাছটা যেখানে উঠেছে, সেখানেই। এ গল্পটা এ অঞ্চলে সকলেই জানে। আর গিয়াৎসোর নাম খানিকটা ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করে এ অঞ্চলের লোকে, এমনকি বুড়ো কংমোও। কিন্তু তাই বলে কি গিয়াৎসোর আত্মা ক্রমশ ঊর্ধ্বে উঠছে আর গোলাপি ফুলের সংখ্যা বাড়ছে? গোলাপি ফুল যদি লামার রক্ত হতো তাহলেও অর্থ থাকে, কিন্তু আত্মা?

শরীরটাই আসল। হাঁড়িটা উনুন থেকে নামালো পেমা। এ পৃথিবীর সব কিছুই শরীর। যা শরীরে ধরা পড়েনি, তা নেই। চায়ের হাঁড়িটা উনুনে বসালো সে। তার চমরী গাই, তার শুয়োর আর কোদাল, জাঁতা, জলের হাঁড়ি, পাথর, পাহাড়, রাইশাক, কার না শরীর আছে? এমনকি গিয়াৎসোরও শরীর ছিলো। নতুবা ঘাতক কি নষ্ট করতে পেরেছিলো?

পিছন দিকে বারান্দায় বড়ো একটা জলের হাঁড়ি বসানো। এখানে পেমা স্নান করে থাকে আর এই নির্জন সরাইখানায় তাতে তার অসুবিধাও নেই। গায়ের আলখেল্লাটা থেকে সে কৌশলে দুটো হাত দুটো কাঁধ বার করলো। খ্যাস খ্যাস করে খানিকটা গা চুলকে নিলো। তারপর জল ঢালতে লাগলো এ হাত, ও হাত, এ কাঁধ, ও কাঁধ। ভয়ংকর ঠাণ্ডা জল। গা থেকে ধোঁয়া উঠছে মনে হলো সোজা হয়ে দাঁড়ালো পেমা, বেণীর চুলগুলো আলগা করে দিলো মাথার পিছনে হাত দিয়ে। আর তখন দেখা গেলো শক্তির আশ্রয় দুটো বাহুর মূলে, চওড়া কাঁধের নীচে সোনার কলসের মতো স্তন দু'টি এখনো পরিপুষ্ট। গোড়া থেকে জানা সত্ত্বেও এখনই যেন প্রমাণ হলো পেমা স্ত্রীলোক। আর সোনার কল্‌স বলার সার্থকতা আছে। কবজি থেকে আঙুলের ডগা, হাঁটু থেকে পায়ের পাতা দেখে আন্দাজ করা যায়নি যে এমন সোনালি

রঙের ত্বক। আলখেল্লাটা কোমর থেকে নামিয়ে পায়ের তলা দিয়ে গলিয়ে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো পেমা। কুমারির মতো মসৃণ উদর তার। ঝুপ-ঝুপ করে জল ঢালতে ঢালতে সে দেখতে পেলো কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে জলের ধারা নীচের ডোবায় জমে নালা বেয়ে ক্রমশ রাইক্ষেতের দিকে বয়ে যাচ্ছে।

স্নান শেষ করে সে শোবার ঘরে চলে এলো। ঘরের কোণে একটা আঁকড়া থেকে জামা পেটিকোট নামিয়ে নিয়ে পরলো। সে এবার চা খাবে। এখন দিনে পাঁচ-সাত বার চা খাওয়া আর বিলাসিতা নয় তার কাছে। অবশ্য শহরের ধনী লামাদের মতো বিশ বার চা খেতে চায় না সে। অতগুলো চমরী যাব, তার যখন তখন চা খেতে আটকায় কীসে? তাছাড়া তার এই শোবার ঘরটাই দেখো। দেখলে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের কথাই মনে হবে। ছ'পায়া চৌকির উপরে কম্বলের বিছানা, পায়ের কাছে গায়ে দেবার কম্বল ভাঁজ করা। সেখানা শাদা আর ভেড়ার লোমের। ওদিকের ব্র্যাকেটে আর এক প্রস্থ জামা পেটিকোট, অবশ্য তা দামি না হতে পারে। ব্র্যাকেটের পাশে কুলুঙ্গি, তাতে দু-একখানা ছাপানো চটি বই। বইগুলোর পাশে একটা চিনা টেবল-ল্যাম্প। এদিকে একটা কাঠের তোরঙ্গ, তোরঙ্গের উপরে প্রার্থনা-যন্ত্র। এটা থেনডুপের মায়ের কাছে পাওয়া। এদিকেও একটা কুলুঙ্গি। কুলুঙ্গিতে একটা মাঝারি বড়ো কাচের বোতল। কুলুঙ্গির উপরে দেয়ালের গায়ে মরচে-ধরা একটা সার্ভিস পিস্তল কোমরবন্ধ সমেত।

সতেরো বছর বয়স তখন পেমার—থেনডুপকে লামারা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। সতেরো থেকে বেয়াল্লিশ এই পঁচিশ বছর পেমা নিজের শরীরের পরিশ্রমে এই সম্পন্ন গৃহস্থের ভাবটা তৈরি করেছে। বাড়িতে খাবার লোক একা সে, অবশ্য, এ জন্যেই পরিশ্রমের ফলে সঞ্চয় হয়েছে।

পেমার মুখে হাসি দেখা দিলো। সতেরো বছরে কি হালকা-পলকা চেহারা ছিলো তার। কি ভয়ই পেতো সে। থেনডুপকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই থেনডুপের মা মারা গেলো। এখন যেটা রসুনের ক্ষেত সেখানেই একা-একা গর্ত খুঁড়ে শাশুড়ির দেহটাকে বসিয়ে মাটি চাপা দিয়েছিলো পেমা। থেনডুপের দাদা দোর্জেলোমা খবর পেয়ে তিনমাস পরে এসেছিলো, মন্ত্র পড়েছিলো। তার সঙ্গের একজন লোক বলেছিলো কাজটা ভালো করেনি পেমা, ওতে আত্মার রাগ হয়। কিন্তু কি উপায় ছিলো? তখন লামাদের ভয়ে অপরাধী থেনডুপের পরিবারকে এমনকি কংমোরাও সাহায্য করেনি। শাশুড়ি কি রাগ করেছে? রসুনের ক্ষেত তার ভালোই হয়েছে, বরং একদিন সে স্বপ্ন দেখেছিলো শাশুড়ি হাসছে। সে যে থেনডুপের ত্রিশ বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তার ঘরবাড়ি সংস্কার করাচ্ছে, এসব দেখেই শাশুড়ি যেন সুখী হয়েছে। ছেলের ভালো দেখলে সব মা-ই খুশি হয়—তা সে রসুনের জমির তলা থেকে হলেও।

চা করতে রান্নাঘরে ঢুকলো পেমা। কিন্তু এখনো থেনডুপের কোনো চিহ্নই নেই। সে কি থেনডুপের উপরে বিরক্ত হবে? পঁচিশ বছর জেল খেটে ছ'মাস হলো থেনডুপ ফিরেছে। বিরক্ত হওয়ার অনেক কারণ ঘটেছে ইতিমধ্যে; কিন্তু পেমা বিরক্ত হয়নি, কিছুতেই সে বিরক্ত হবে না। থেনডুপ বোধহয় আজ নীচের সড়কের দিকেই গিয়েছে। এই কথাটাকে নিজের মনের মধ্যে একবার ঘুরিয়ে নিলো পেমা। কাজটা ভালো হয়নি। বা ঠিক ভয় নয়—তা হলেও অস্বস্তি তো বটেই। নীচের পুব-পশ্চিম সড়ক দিয়ে আজ এমন দু'-একখানা গাড়ি যেতে দেখেছে পেমা,

যা এর আগে কোনোদিন সে দেখেনি। থেনডুপ যদি সেখানে গিয়ে থাকে তবে এই আধ মাইল উঠে আসতে এক ঘণ্টা লাগবে। ততক্ষণে অনেকবার চা জুড়িয়ে যাবে।

নিজের জন্য চা ঢেলে নিয়ে তাতে এক থাবা মাখন ভাসিয়ে পেমা চায়ের পাত্র হাতে করে বাইরের দিকে সিঁড়ির উপরে গিয়ে বসলো। আগের চিন্তায় ফিরে এলো পেমা ঃ শুধু ভয় নয়, তখন সেই সতেরো বছর বয়সে সে বোকাও ছিলো। বোকা মানুষ যদি একা থাকে তবে ভুলও করে। পেমার মুখে লজ্জার চিহ্ন দেখা গেলো। এখন সে জানে ওটা ইংরেজি মদের বোতল। কয়েক বছর আগে মাখন-উৎসবে সে শহরে গিয়েছিলো, উদ্দেশ্য ছিলো থেনডুপকে গোপনে সংবাদ দেয়া যে সে এখনো বাড়িঘর ধরে বসে আছে, আর চেষ্টা করে দেখা কোনো ফিকিরে তাকে বার করে আনা যায় কিনা। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একটা দোকানে একটা বোতল দেখে পেমা চমকে উঠেছিলো। পাশের লোকটি, অনেকক্ষণ থেকেই পেমার সঙ্গে না ডাকা সত্ত্বেও ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছিলো, বলেছিলো, ওটা ইংরেজি মদ, ভিস্কি নাম। তার শোবার ঘরে কুলুঙ্গিতে যে বোতলটা আছে সেটা পঁচাত্তর বছরের পুরনো বটে, কিন্তু ছবি পর্যন্ত এক। ওটাও ভিস্কির বোতলই। বোধগয়ার জল নয়। ওর দু'-এক ফোঁটা খেলে সব রোগ সারে না, ঢক্-ঢক্ করে অনেকটা খেলেও কোনো মেয়ে অন্তঃস্বত্বা হয় না। অথচ সে দু'বার ভুল করেছিলো। বোতল খুলতেই তার এক ঘণ্টা লেগেছিলো, দস্তার ঝালাইয়ের নীচে চাঁচের ঢাকনা, তার নীচে মোম কাগজ, তার নীচে কর্ক। কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিয়েছিলো সে মুমূর্ষু শাশুড়ির মুখে। পরম শান্তিতে তাঁর চোখ দু'টো বুজে এসেছিলো, মুখে হাসি ফুটেছিলো, কিন্তু তাতে রোগের আরোগ্য হয়নি। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার ভুল করেছিলো পেমা। অসম্ভব রকমে একা, অপরিসীম নিঃসঙ্গ বোধ হতো তার। শাশুড়ির মৃত্যুর পর বোতলটা তেমন করে আর মুখ বন্ধ করা হয়নি যেমন থেনডুপের ঠাকুমা করিয়েছিলো গিয়াৎসোর মৃত্যুর পরে! এক রাত্রিতে বোতল থেকে তার অর্ধেকটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলেছিলো পেমা। কয়েকদিন অসুস্থ ছিলো সে, আর কিছু হয়নি। বরং মাখন-উৎসবে যে পুরুষটা ঘুরঘুর করছিলো পেমার পাশে পাশে, প্রশ্রয় দিলে সে যা ঘটাতে পারতো ভিস্কির বোতলটা তা পারেনি, কিন্তু সে-রকম অধিকার একমাত্র থেনডুপের, একমাত্র তারই।

এ থেকে প্রমাণ হয় না শরীরই সব? শরীর থেকেই শরীর জন্মায়। এই ইংরেজি মদের বোতলটা আর তার উপরে সেই মরচে-ধরা আর্মি পিস্তলটা প্রমাণ করে লোকনাথ, কিম্বা তাকে যাই বলো, সে এসেছিলো। আর তাকে আশ্রয় দিতে গিয়েই গিয়াৎসোর ছোটোভাই রিম্পোচে লামাকে শহরে আর গিয়াৎসোকে এখানে সামনের এই চমরীর জিভে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো।

স্নানের কবোষ্ণ আরাম। তারপর এই উত্তপ্ত চায়ের পাত্র—এটা একটা আরামদায়ক বিশ্রাম হতে পারে। সে এখন শান্ত হয়ে কিছু ভাবতেও পারে। একা থাকলে কেউ-কেউ নিবিষ্ট হয়ে চিন্তা করতে শেখে। পেমার এ বিষয়ে একটু সুবিধা ছিলো। সে থেনডুপ এবং শাশুড়ির কাছে স্থির হয়ে বসে থাকার ভঙ্গিটা আয়ত্ত করেছিলো। একে অন্য কথায় ধ্যান বলা যেতে পারে। [illegible] সময়ে অনেকটা সাজানো গোছানো ভাবে চিন্তা করতে পারে। এটাই কি অতীতের সঙ্গে তার একমাত্র যোগসূত্র?

অথচ লোকনাথ, কিম্বা যাই বলো, এসেছিলো। পেমা যেন তাদের সেই পঁচাত্তর বছরের পুরনো মিছিলটাকেও চোখে দেখতে পেলো। দুপুরে দু'টোয় দুর্ধর্ষ ঝড় উঠেছে। পাথরের কুচি

উড়ছে ছিটেগুলির মতো। ঝড়ের গতি ঘণ্টায় একশ' মাইল। আপাদমস্তক ঢাকা, এমনকি মুখেও মুখোস। তা সত্ত্বেও দাঁড়ানো যায় না, এগোয় কার সাধ্য। এর চাইতে প্রাণঘাতী তুষার-ঝড়ও ভালো।

গিয়াৎসোর ভাই রিম্পোচে লামা বললো, সন্ধ্যার আগেই লা'তে পৌঁছনো দরকার, অথচ এক-পাও এগোনো যাচ্ছে না।

গিয়াৎসো বললো, প্রবাদ যদি সত্যি হয়, তবে তার এই প্রমাণ হবে যে ঝড়ের মধ্যে এগিয়ে গেলে তবে আমরা তার দেখা পাবো।

গিয়াৎসো তার রেশমের ঝড়-মুখোসের আড়ালে হাসলো কি না বোঝা গেলো না।

খচ্চরের পিঠে লাফিয়ে উঠলো রিম্পোচে। গিয়াৎসো তার পিছনে রওনা হলো। কিছুদূরে তাদের অনুচরেরা। ন্যাড়া উপত্যকাটা পার হলো তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই। পাহাড়ের আড়াল পেলে। ঝড়ের শব্দটা কানে আসছে, কিন্তু ঝড়টা গায়ে লাগছে না আর।

গিয়াৎসো বললো, নামগিয়াল, অমিতাভ আর একবার পুনর্জন্ম নেবে এ প্রবাদ সম্বন্ধে তুমি কি পড়েছো?

প্রবাদটা প্রাচীন, তবে পনেরো পুনর্জন্মের জায়গায় সতেরো হবে না, তা বলা যায় না।

গিয়াৎসো বললো, আমাদের দেশে বিদেশি ঢুকলেই পুনর্জন্ম হওয়াও শেষ হবে?

রিম্পোচে বললো, না, ওটা ভয় দেখানোর জন্য বলা। চিনা আম্বনরা চায় না, নেপালিরাও চায় না তারা ছাড়া আর কোনো বিদেশি ঢোকে আমাদের দেশে।

কিন্তু কবে পুনর্জন্ম শেষ তার তো একটা প্রবাদ আছে।

সে এরকম নয়। উত্তুরে কুকুর যখন চিল্লানি শূকরীকে সন্তান দেবে, তখন। গিয়াৎসো মাথা দোলালো। সেও শুনেছে, সেও জানে। তখনই, উত্তুরে হিংস্র কুকুরের পাল যখন আসবে তখনই এদেশ আর স্বপ্নের দেশ থাকবে না। কিন্তু সময় হয়ে যাচ্ছে। রিম্পোচে পিছনে ফিরে অনুচরদেব হাতের ইশারায় তাড়াতাড়ি এগোতে বলে নিজের খচ্চরটার পেটে পায়ের গুঁতো দিয়ে সেটাকে জোরে ছুটিয়ে দিলো।

গিয়াৎসোও তাই করলো। রিম্পোচের কাছে পৌঁছে আবার সে বললো, আচ্ছা খবরটা ঠিক তো?

ঠিক, ঠিক, একশ' বার ঠিক। আমাদের অন্তত সাত-আট জন চর খবর এনেছে। সে দক্ষিণ থেকে আসছে গিয়াৎসের পথ ধরে। শহরে জানে না এমন কেউ নেই, আর তুমি কিনা সন্দেহ করছো। সৈন্যদলকে হুকুম দেয়া হয়েছে দেখলেই সাবাড় করতে কিম্বা ধরা দিলে কয়েদ করতে।

শেষ পর্যন্ত যদি না আসে? গিয়াৎসোর মুখ হতাশায় বিবর্ণ দেখালো।

ভয় পাবে? সে জানে চররা খবর পেয়েছে। ভয় পাবে না এটাই একটা প্রমাণ যে সে অতীশের লোক।

লা'র মুখে দাঁড়িয়েছে দু'টি খচ্চর, তাদের পিঠে গিয়াৎসো আর রিম্পোচে। কিছু দূরে তাদের ছ'জন সশস্ত্র অনুচর। পথে গুপ্তচরের ভয়, সৈন্যদলের ভয়। ডাকাতের ভয়।

গিয়াৎসো বললো, এই শেষবার, রিম্পোচে। আচ্ছা বলো আমরা কি সেই আদিকাল থেকে অতীশের গুহা পাহারা দিচ্ছি? আমরা মানে আমাদের বংশ।

রিম্পোচে সিঙ্কের মুখোসটা সরালো মুখ থেকে। বললো, তুমি সন্দেহের পাহাড়, গিয়াৎসো। সব লামা হয়ে গেলে বংশের ধারা নষ্ট হয়ে যাবে। এরকম অনেকবার হয়েছে। পরে আর একজন বুঝতে পারে অতীশের গুহার কাছের জায়গাটাই তার জায়গা। নতুন করে বাড়ি তোলে, বংশ বাড়ায়। যেমন আমাদের কাকা করেছিলো।

গিয়াৎসো বললো, হায় হায়! এবার দেখো তুষার-ঝড় উঠে পড়লো।

অতীশও ঝড়ের মধ্যে এসেছিলেন।

ঠিক এমন সময়েই লা'র মুখে শোনা গেলো ঃ হুম মণিপদ্মে, হুম মণিপদ্মে। গিয়াৎসো রিম্পোচের মুখের দিকে চেয়ে হাসলো। খচ্চর থেকে নেমে দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ালো। এক হাত অন্য হাতের আস্তিনে ঢুকিয়ে, মাথা সামনের দিকে নোয়ানো। শাদা কান দুটো খাড়া করে একটা খচ্চর ক্লান্ত ভঙ্গিতে তবু লাফ দিয়ে লা'র মুখের পাথরটার উপরে উঠে দাঁড়ালো। তার পিঠের উপরে ভারতীয় শ্রমণের কানঢাকা টুপি পরা একজন কেউ।

রিম্পোচে এগিয়ে গেলো। দধিকর্ণ থেকে নামলো ভারতীয় শ্রমণ। রিম্পোচে প্রাকৃত লেখাপড়া করেছিলো, হান্‌দের ভাষা জানতো, এমনকি দক্ষিণ মহাদেশের ভাষাও কিছু-কিছু জানতো। সেই ভাষার দু-একটি প্রার্থনাও।

সে এক পা এগিয়ে গিয়ে মাথাটা সামনের দিকে আরো নুইয়ে বললো, বুদ্ধং শরণং...

লোকনাথ বললো, গচ্ছামি; সংঘং শরণং গচ্ছামি।

গিয়াৎসো এগিয়ে গিয়ে লোকনাথের জামার প্রান্ত তুলে চুমু খেলো।

এবার দক্ষিণের মিছিল উত্তরে ফিরলো। সামনে সশস্ত্র লস্কর। ডাইনে রিম্পোচে। বাঁয়ে গিয়াৎসো, মাঝে লোকনাথ।

পিছনে তুষারের ঝড়। মিছিল এগিয়ে চললো। আর—অমিতাভায় লোকনাথায়, অমিতাভায় অমিতাকারুণ্যে লোকনাথায়। এ রকমই কি একটা কিছু তখন শোনা গিয়েছিল। পেমার শাশুড়ি কখনো উচ্চারণ করতো। থেনডুপ উচ্চারণ করতে গিয়ে ধরা পড়লে হাসে। না, এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট দেখতে পায় পেমা সেই মিছিল। সে দেখতে পেলো পথের উপরে কিছু একটা নড়ছে। 'কিছু একটা' না বললে কাঁকড়া বলতে হয়। কাঁকড়ার মতো চলে সে। থেনডুপকে এখন আর মানুষ ব'লে মনে হয় না। এই দিনের আলোতেও।

কাল সন্ধ্যাবেলার কথাই ধরো। গিয়াৎসোদের নিয়ে থেনডুপের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিলো। বারবার তখন তার মনে হয়েছিলো এ কি সেই? এ কি সেই থেনডুপ? মুখের আদলে তার কথাই মনে হয় বটে, কিন্তু—। পঁচিশ বছর আগে যে চলে গিয়েছিলো সে ছিলো কুড়ি বছরের এক যুবক চাষী, হাসতো কথায় কথায়, রসিকতা করতো কথায় কথায়। আজ কোমরের কাছে দোমড়ানো এই রুগ্‌ণ বৃদ্ধ? একটা চূড়ান্ত অনুভূতির বর্ণনা থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারা যায়। থেনডুপ ফিরে আসার একমাস পরে। সেদিন সকাল থেকেই পেমা নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করলো। অথচ সেই উষ্ণ বিকেলের শয্যায় আচ্ছাদনহীন নিজের শরীর থেনডুপকে উৎসর্গ করতে গিয়ে হঠাৎ যেন পেমা ঘৃণায় শিউরে উঠেছিলো। ছি-ছি এ কি করছে? থেনডুপের বিছানায় এ কাকে এনেছে সে? এ কি বিশ্বাসঘাতকতা? কিন্তু গ্লানি এবং ঘৃণাই!

অবশ্য, পেমা পথের উপরে থেনডুপের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখলো, প্রতিটি পদক্ষেপেই কি

যন্ত্রণা থেনডুপের, অবশ্য, ভাবলো পেমা; থেনডুপ-স্মৃতির মুখোস ছিঁড়ে বাস্তবের থেনডুপকে প্রকাশ করতে পারতো, কিম্বা স্মৃতির থেনডুপের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারতো। যদি সে—। কিন্তু তা কি করে হবে? সাড়ে তিনফুট উঁচু, পাঁচফুট লম্বা তিনফুট। চওড়া একটা অন্ধকার ঘরে যাকে পঁচিশ বছর কাটাতে হয়েছে, সে কি আর সোজাভাবে দাঁড়াতে পারে? কোমর দুমড়ে গিয়েছে, উরু দু'টো শুকিয়ে পায়ের গুলের সমান, আর যাকে পেমা ফুলের কলি বলতো তার অস্তিত্বই নেই। চমরী ষাঁড়দের অমন করা হয় বটে।

থেনডুপকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। সে তার কয়েদখানার কথা তুললে হাসে কিন্তু কংমোর ছেলে শাও চি বলেছে সেই ঘর নাকি অন্ধকূপের চাইতেও ভয়ানক।

হঠাৎ যেন মেরুদণ্ড বেয়ে একটা দুঃসহ উত্তাপের জ্বালা উঠে এসে পেমার হৃৎপিণ্ডকে জ্বলন্ত লোহার বেড়ে পরিয়ে দিলো। এত পরিশ্রমেও যা দেখা যায়নি, সমস্ত কপালটা ঘামে ভিজে উঠলো—তার ছ'ফুট উঁচু শরীরটাকে কেউ যেন একা সাড়ে তিন ফুট উঁচু ঘরে অনন্তকালের জন্য আটকে রেখেছে। দাঁড়ানোর উপায় নেই, পা মেলে শোবার উপায় নেই, শুধু বসে থাকা, বসে থাকা।

পেমা ডান পা'টাকে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিলো, বুড়ো আঙুলটাকে উঁচু করলো। নিতম্ব থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত পেশি তার বাধ্য, অনুগত, মুখের কথার দরকার হয় না, ইচ্ছা অর্ধস্ফুট হতেই ঢেউ তুলতে শুরু কবছে। কিন্তু লজ্জিত হলো পেমা। থেনডুপ যদি দেখতে পেয়ে থাকে! অথচ থেনডুপকে বিড়বিড় করে হুকুম করতে হয় তার পা দু'খানাকে। এটা অবশ্য মুদ্রাদোষও হতে পারে। একটা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে এক পঁচিশ বছর শুধু বসে কদাচিৎ আধশোয়া অবস্থায় যাকে কাটাতে হয়েছে তার নিজের সঙ্গে কথা বলার মুদ্রাদোষ জন্মাতে পারে। কিন্তু তাই বলে—এখনো হয়তো থেনডুপ প্রতি পদক্ষেপে বলে চলেছে ওঠো থেনডুপ, এটা একটা পাথর, হ্যাঁ, এই তো উঠতে পেরেছো, এবার নামো, আবার ওই পাথরটায় ওঠো, ওঠো, ওঠো এ কষ্ট কিছুই নয়, থেনডুপ, না পারলে চলবে কেন?

এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে থেনডুপের শরীরটা একটা বুড়ো, অশক্ত, বদমেজাজী চাকর, যার কাঁধে চেপে আসল থেনডুপ অমন হুকুম করতে থাকে? আসল থেনডুপ? সে কি এখনো কুড়ি-একুশ বছরের মতোই তরুণ সুন্দর সুঠাম; কখনো কখনো যে থেনডুপের চোখের হাসিতে এখনো এক মুহূর্তের জন্য দেখা দেয় জানলা দিয়ে সিগাৎসের বড়ো লামা যেমন দর্শন দান করেন?

পেমা মাথা দুলিয়ে নিজের এই অসম্ভব কল্পনাকে অস্বীকার করলো। সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলো। থেনডুপের অশক্ত শরীরটাকে সাহায্য করা দরকার।

কাল সন্ধ্যাবেলায় থেনডুপ যা বলেছিলো তা ভাবতে গিয়েই তার চিন্তা অন্যপথে চলে এসেছে। থেনডুপ স্বীকার করেছিলো কাল, জেলখানায় সে নিজের সঙ্গে কথা বলতো। সে নিজেকে বলতো; থেনডুপ, বিশ বছর হলো, আর দশ বছর পরে; থেনডুপ, চব্বিশ বছর হলো আর ছ'বছর পরে। আর তোমার পেমা, তোমার সেই পুবদেশের বউ তোমার জন্য আরো সুন্দর হয়ে অপেক্ষা করছে। কখনো কখনো থেনডুপের সন্দেহ হতো পেমা কি পুরুষের লোভ নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখতে পারবে? দেবীরাও পারে না। তখন থেনডুপ নিজেকে খুব ধমক দিতো, সারাদিন উপবাস থাকতো। অবশেষে একদিন সে বললো, বলতে পেরেছিলো

নিজের মনকে, থেনডুপ, পেমা যদি অন্য কোনো পুরুষকে নেয়, আশীর্বাদ করো। অন্য একদিন হঠাৎ এই সাইমিয়া গাছটার কথা মনে পড়ে। তারপর থেকেই তার কষ্টও কমে যেতে থাকে। কষ্ট হলেও সে বলতো, থেনডুপ, গাছটার কথাই ভাবো, গাছটাই গিয়াৎসো। অভ্যাসে এসে গিয়েছিলো। কষ্ট হলেই গাছটা ফুল ফুটিয়ে দাঁড়াতো মনের মধ্যে, আর সেই জেলখানার অন্ধকারে কখনো কখনো হঠাৎ তার দু'-একটা ফুল সোনালি হয়ে উঠতো।

পেমার চিন্তায় বাধা পড়লো। এখন থেনডুপকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মানুষ যখন চলে তার পা দু'টো সোজা হয়ে পড়ে মাটিতে। থেনডুপের পা দুটো পড়ছে কোনাকুনি, কোমর থেকে মাথাটা এগিয়ে আছে রাস্তার সমান্তরাল, যেমন চমরীর থাকে।

আবার সেই আগুনের বেড়াটায় লেগে পেমার হৃৎপিণ্ডটা জ্বলে পুড়ে গেলো, ছটফট করে দাপাতে লাগলো সে। আর এ-সবই সময়মতো পেমা ছ'-সাত শ' টাকা যোগাড় করতে পারেনি বলে। তাই বলে শাও চি। লামাটাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে খাদে ফেলে দেয়ার অভিযোগে যখন ওরা থেনডুপকে ধরে নিয়ে গেলো তার তিনদিন পরে একজন এসে বলেছিলো প্রতিবেশী কংমোকে, ছ'শ' টাকা হলে থেনডুপের মুক্তি কেনা যায়। কিন্তু এর চাইতে মৃত্যুদণ্ড ভালো ছিলো। গিয়াৎসোর মতো মৃত্যু ভালো। থেনডুপ কি গিয়াৎসোর চাইতেও বড়ো বিশ্বাসঘাতক? মৃত্যু? শিউরে উঠলো পেমা। না, না। থেনডুপ ফিরে এসেছে সেই ভালো। হোক বিকলাঙ্গ, তবু সে থেনডুপ। পেমার চোখে জল এসে গেল।

থেনডুপ এসে পড়েছে। চমরীর বাছুরটা অবাক হয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। মুক্তি পাওয়ার পর যে খচ্চরটার পিঠে চাপিয়ে থেনডুপকে সে শহর থেকে এনেছিলো সেটা কান খাড়া করে কি শুঁকছে। হঠাৎ বাছুরটা ল্যাজ তুলে ছুটে পালালো, খচ্চরটা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে দূরে সরে গেলো, বয়স্ক চমরী দুটো হ্মু করে একসঙ্গে ডেকে উঠে দাঁড়ালো।

থেনডুপ অবাক হলো এই ডাকাডাকি, এই আকস্মিক চাঞ্চল্যে। তারপর হেসে ফেললো। বিড়বিড় করে বললো ভয়? ভয় পেয়ো না, ভয় বিদ্বেষ একই। যাকে ভয় পাবে তাকেই হিংসা করতে ইচ্ছা হবে, যাকে হিংসা করেছো তাকেই ভয় পাবে।

পেমা বললো, কিছু বললে?

থেনডুপ লজ্জিত হলো। যেন নতুন বউয়ের সামনে মুদ্রাদোষ প্রকাশ করে ফেলেছে। বললো, একটা জিনিস পেলাম।

কি জিনিস?

জড়ানো সরু তারের জাল খানিকটা বার করলো থেনডুপ জামার ভাঁজ থেকে।

এ আবার কি এমন জিনিস? এরই জন্যে এতো দেরি?

তোমার চৌকির তলায় লুকানো যন্ত্রটা এবার কথা বলবে। জামার ভাঁজ থেকে একখানা চটি বই বার করলো থেনডুপ, হান্‌দের লেখা পুঁথি দেখো, আমাকে পড়ে শুনিয়ো।

সে হবে খাওয়ার পরে।

ঘরে এসে পেমা বললো, স্নান করবে?

যদি বলো।

পেমা স্নান করিয়ে দিলো থেনডুপকে। পিঠ, কোমর উরু ডলে ডলে দিলে গরম জল দিয়ে। এতে কি রক্তের প্রবাহ ফিরতে পারে পঁচিশ বছরের শুকিয়ে যাওয়া শিরায়? নিজের পরিপুষ্ট

হত দু'খানা পেমার চোখে পড়লো। বুড়ি বলবে কোন মূর্খ? কিন্তু, হঠাৎ যেন তার চোখে জল আসবে মনে হলো—তাদের ছেলে-পুলে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই আর নেই। এই তো, সে দেখতেই পাচ্ছে।

থেনডুপকে পোশাক পরিয়ে চৌকিতে বসালো পেমা। হাত-পায়ের জল মুছতে মুছতে বললো, আসলে গাছের বীজ না হলে গাছ হয় না। থেনডুপ, তোমার এই সাইমিয়া কেউ লাগিয়েছিল ওখানে বাচ্চা চমরীর জিভে।

সাইমিয়া বলছো? অসম্ভব কি?

শোবার ঘরের মেঝেতে লম্বা জলচৌকিটার উপরে কাপড় বিছিয়ে থালা রাখার জায়গা, মেঝেতে আসন বিছিয়ে বসবার জায়গা করলো পেমা। শাশুড়ির প্রার্থনা-চক্রটাকে রাখলো জলচৌকির ওপরে। প্রদীপ জ্বালালো একটা চমরীর মাখনে। বড়ো দু'টো বাটিতে মাংস, রসুন দেয়া যবের গাঢ় সুপ। ধোঁয়া উঠছে। থেনডুপকে পাশে নিয়ে খেতে বসলো পেমা। এবার থেনডুপ প্রার্থনা করবে।

পেমাই অবশ্য এই প্রার্থনার জন্য দায়ী। থেনডুপ ফিরে এলে সব আবার আগেকার মতো হোক বলে পুরনো প্রার্থনার প্রথাটাকে সেই চালু করেছিলো। আজও সে প্রার্থনার যন্ত্রটাকে এনেছে।

কিন্তু থেনডুপ আজ প্রার্থনার কথা মনে মনে বললো কি না বললো, এক মুহূর্ত চোখ বুঁজে থেকেই খেতে শুরু করলো।

পেমা তার পুরনো কথায় ফিরে এলো, আর গোলাপি ফুলের মধ্যে যদি কখনো হলুদ ফুল ফোটে তারও কারণ আছে। ওকে গ্র্যাফ্‌টিং বলে। বিশ্বাস না করো আমাদের বাদামি শূকরের পালে শাদা বাচ্চা দু'টোকে দেখো। আমাদের পাটকিলে শূকরীটাকে কংমোর বুড়ো শাদা মদ্দাটাকে দেখিয়েছিলাম। শুধু শাদা নয়, কেমন বড়ো হয়েছে, না?

থেনডুপ বললো, তা হয়।

পেমা বললো, আর সেই লোকটা, যাকে লোকনাথ বলো, আচ্ছা, তার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা? সে যে সীমান্ত পার হ'য়ে আঙুল ঝেড়েছিলো আমাদের দেশের দিকে চেয়ে, পিস্তলের একটা চোঙ খালি করেছিলো আমাদের দেশের আকাশের দিকে—তার অর্থ কী? সে কি গিয়াৎসো আর রিম্পোচে লামাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য অভিশাপ?

থেনডুপ বাটি থেকে কাঠের চামচ দিয়ে গরম সুপ খানিকটা মুখে দিলে। স্নানের পরে এই সুস্বাদু আহার। তৃপ্তিতে শরীরে একটা বিশ্রামের ভাব আসছে। এ অবস্থায় চোখ বুঁজে চিন্তা করা চলে। থেনডুপ কি চকিতের জন্য সেই মিছিলটাকেই দেখতে পেলো? ডাইনে রিম্পোচে, বাঁয়ে গিয়াৎসো, পিছনে তুষার-ঝড়। যা কিছুক্ষণ আগে পেমা দেখেছে।

কিন্তু সে বললো হয়তো বলেছিলো, মরুক গে যাক।

তাহ'লে? আর ওই বোতলটাকে তুমি কি মনে করো? জানো ওটা ইংরেজি চোলাইয়ের বোতল।

বুধগয়ার জল নয়? থেনডুপ হাসলো।

ছাই-ছাই। পেমার তামাটে গাল লাল দেখালো। একরাতে আধবোতলের সবটুকু শেষ করেছিলাম গলায় ঢেলে। হলো কিছু? হলে তো দেখতেই পেতে, থেনডুপ। এতদিনে বাইশ বছরের যোয়ানটি হতো।

হাসিতে থেনডুপের চোখ দু'টো মিটমিট করলো।

একটু থেমে বললো আবার পেমা, সে যে ইংরেজের বাণিজ্যের জন্য আসেনি তা কি তুমি বলতে পারো? ওটা বুধগয়ার জল নয়, ইংরেজি চোলাই। মিথ্যা হলো না ব্যাপারটা?

অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বললো থেনডুপ, আমি জানি। গিয়াৎসো জানতো। সেই তুষার ঝড়ের রাত্রিতে, একশ' বছরে সেরকম ঝড় হয়নি, অতীশের গুহার মুখও ঢেকে গিয়েছিলো। শহর থেকে গিয়াৎসো ফিরছিলো দু'দিন পরে। সারা দুপুর বরফ কেটে একটা জানলা বার করে তবে নিজের বাড়িতে ঢুকতে পেরেছিলো সে। তখন ওই ইংরেজি চোলাই গিয়াৎসোর স্ত্রীকে খেতে দিয়েছিলো লোকনাথ।

পেমা একবার অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। তুমি জানো? এ সবই জানতে?

কিছুক্ষণ আর কথা না বলে খেতে লাগলো। তারপরে হঠাৎ যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো থেনডুপ বললো, সকালে যে তার এনেছি সেটার দু'টো মাথা দু'টো ব্র্যাকেটে লাগাও। ওকে এরিয়েল বলে।

থেনডুপের নির্দেশমতো ঘরের সিলিংয়ে এরিয়েল লাগালো পেমা। যন্ত্রটাকে টেনে বার করে দিলো থেনডুপের সামনে। থেনডুপ যন্ত্রের সঙ্গে এরিয়েলের তারের মাথা লাগাতেই সেটা একটু গোঁ-গোঁ করে উঠলো।

বাহ্, তুমি যন্ত্রের কাজ শিখলে কোথায়? পেমা অবাক হয়ে গেলো।

যে তার দিয়েছে সে-ই বলে দিয়েছে।

এতে কি গান শোনা যাবে? শাও চি-র বাড়িতে এমন একটা আছে।

কথাও শোনা যাবে। তোমার ঘরের মাথায় ওরা একটা শুঙ্গ লাগিয়ে দেবে। আর এ যন্ত্রটায় একটা চোঙ বসাবে। তখন কথাও বলা যাবে।

কার সঙ্গে কথা বলবে যে দু'মাস হলে যন্ত্রটা এনে রেখেছো?

থেনডুপ নিঃশব্দে হাসলো।

পেমা খেতে বসলো। বললো, রসুনগুলো আমাদের ক্ষেতের। হান্‌দের বইতে চাষের কথা আছে। তেমন করে লাগিয়েছিলাম। কেমন মাখনের দলার মতো মোলায়েম নয়? আর একটু নাও, অনেক আছে হাঁড়িতে।

কাঠের হাতা দিয়ে পেমা থেনডুপের থালাতে খানিকটা মাংস, রসুন সমেত সুপ তুলে দিলো। সে আবার বললো, গিয়াৎসো জানতো? আশ্চর্য লাগছে না তোমার ভাবতে?

থেনডুপ হেসে বললো, জানতো, গিয়াৎসোর স্ত্রীর কাছে কোন পশম ভালো, কোন পশমের কেমন দাম এসবও জিজ্ঞাসা করতো লোকনাথ। আর তা জানার পরেও লোকনাথকে আর ছ'মাস লুকিয়ে রেখেছিলো গিয়াৎসো। পেমার মুখের দিকে চাইলো সে। হাসলো। তারপর বিড়বিড় করে বললো, মুখের ছাদ, জিহ্বা আর দাঁত, এরই সাহায্যে শব্দ; কিন্তু এদের কোনোটাই এমনকি সবটা মিলেও শব্দ নয়।

পেমা বললে, তুমি কিন্তু সেই লামাকে তিনশূলী কোদাল দিয়ে মারতে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ। আমি কি গিয়াৎসো? সে আমার পুবদেশি বউকে অত্যন্ত খারাপ কথা বলেছিলো।

তাতে তোমার পেমার কি ক্ষতি হয়েছিলো?

হয়তো ক্ষতি হতো না। থেনডুপ যেন পঁচিশ বছরের দূর দেশটাকে এক্ষুণি দেখতে পেলো,

কিন্তু তখনই আবার ফিরে এলো, ওখানে এমন কিছু আর নেই যা নিয়ে চিন্তা করা যায়।

রেডিও ট্রানস্‌মিটারটা গোঁ-গোঁ করে উঠলো। কে যেন ঘরঘরে কিন্তু চড়া গলায় কী বলে থেমে গেলো। দুম্‌দাম্‌ করে শব্দ হলো কিছুক্ষণ ধরে।

থেনডুপ বললো, লামাদের উপদেশ দেয়ার মতো ভঙ্গি তার যদিও সে কোনোদিনই লামা নয়—রিম্পোচে লামা অদ্ভুত জ্ঞানী ছিলো। সে কনফুসির পুঁথি পড়েছিলো, ইৎসির পুঁথি পড়েছিলো। অতীশের অনেক পুঁথি আগাগোড়া মুখস্থ ছিলো তার। আর শুনলে অবাক হবে যে দক্ষিণ মহাদেশের ভাষা জানতো, যে ভাষায় নিজে বুদ্ধ ভগবান উপদেশ দিয়েছিলেন। আর লোকনাথও সেই ভাষা জানতো। লোকনাথের সঙ্গে কথা বলে পরে সে বলেছিলো লোকনাথ ভগবান বুদ্ধের ভাষাতেই তাঁর উপদেশ বলতে পারে। অতীশের পরে কে আর তা বলেছে আমাদের দেশে? বরফের ঝড়ে পড়লে তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু জানলা দিয়ে বরফের মতো আর কাকে পবিত্র দেখায়? আগুন তোমাকে পোড়ায় বটে, কিন্তু আগুন প্রাণবর্ধক; আর তার রং?

হঠাৎ ট্রানস্‌মিটারে কথা শোনা গেলো আবার। স্পষ্ট চড়া গলায় কেউ কিছু বলছে।

আরে! আরে! থেনডুপ উঠে দাঁড়াতে গেলো। এখনই, আশ্চর্য।

বিস্ময়ে পেমার মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিলো। সেটা বন্ধ করতে ভুলে গেলো সে। এসব কী?

রেডিওতে উত্তুরে হান্‌দের ভাষায় কেউ কিছু বলছে।

কি বলছে? ভালো করে শোনো তো, ভালো করে। উত্তেজিত হয়ে উঠলো থেনডুপ।

পুবদেশি মেয়ে পেমা হান্‌দের ভাষা বোঝে। নীচু হয়ে কান পাতলো ট্রানস্‌মিটারের কাছে।

হঠাৎ পেমা ভয়ে বিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়ালো। সে বললো, সর্বনাশ, সর্বনাশ। আমাদের শহর হান্‌রা দখল করেছে। লামারা পালাচ্ছে। পথে পথে যুদ্ধ হচ্ছে। সে বিছানার কাছে ছুটে গেলো। কম্বল টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে একটা পুটুলি বাঁধতে শুরু করলো।

থেনডুপ বললো, পালাচ্ছো?

হায়, হায়, এখন কি করি! কোথায় পালাবো! দিশেহারা হয়ে বললো পেমা!

থেনডুপ বললে, তুমি কি হান্‌দের পুঁথি পড়োনি? তাদের মতো রসুন চাষ শেখোনি? সে সব বইয়ের কোনো পৃষ্ঠায় তুমি কি পড়োনি, সব মানুষ সমান?

কিন্তু রসুন চাষের সঙ্গে হান্‌ সৈন্যদের কি সম্বন্ধ? আর মানুষ সমান তো উত্তুরে হান্‌দের দেশে।

তুমি যা বলো ওরাও তাই বলে—শরীরই সব। থেনডুপ হাসলো, যার শরীর নেই তার কিছুই নেই।

আমাদের দেশ, আমাদের দেশ।

সাম্য ছাড়া অবিদ্বেষ হয় না। থেনডুপ বিড়বিড় করে নিজেকে শোনালো, বিদ্বেষ থেকে ভয়, ভয়ের অন্য নাম মৃত্যু।

পেমা বললো, তুমি জানতে হান্‌দের আসার কথা?

নতুবা কোথা থেকে হান্‌দের বই আনলাম তোমার জন্যে?

পেমা কোমরে হাত দিয়ে অবাক হয়ে থেনডুপের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর তার মুখে হাসি দেখা দিলো। শরীরের আড়ষ্ট ভাবটা ঢিলে হলো। সে ধীরে ধীরে বললো, আমি পড়েছি,

শাও চি চাষ-আবাদের যে-বই দিয়েছিলো তাতে বড়ো রসুন চাষের কথা ছিলো। আর তাতে সাম্যের কথাও ছিলো। থেনডুপ, সাম্য ভালো। কেউ কারো উপরে অত্যাচার করবে না। ছ'শ টাকা না পাওয়ার জন্য যাকে খুশি তাকে জেলখানায় রাখা যাবে না। শাও চি-র স্থির বিশ্বাস। কিন্তু আমার ভয় করে। ভয়েই যেন পেমার আপাদমস্তক একবার শিউরে উঠলো।

ট্রানস্মিটারে আবার শোনা গেলো, এবার স্পষ্ট আর হুকুমের সুরে ঃ লামারা পালাচ্ছে। তারা দেশদ্রোহী। তাদের যারা আশ্রয় দেবে, তাদেরও দেশদ্রোহী বলে গণ্য করা হবে। গ্রামের লোকেরা মনে রেখো—এরাই তোমাদের উপরে অত্যাচার করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

পেমার মুখে একটা টানা হাসি ফুটে উঠলো। অত্যাচার, অত্যাচার। থেনডুপ, তুমি লামাকে খাদে ফেলোনি। হয়তো চাষ করার তিনশূলী কোদালের ভয় দেখাতেই চেয়েছিলে তুমি। সে-ই তোমাকে পিছন থেকে ধরার জন্যে খাদের ধারে ধারে এগিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু বিচারক লামারা তা শোনেনি। কারণ সেই মেয়েমানুষের মাংসলোভী লামা খাদে পড়ে শামুকের মতো ভেঙে গিয়েছিলো।

থেনড়ুপ বললো, সকালে জল আনতে গিয়ে কিছু দেখেছিলে নীচের সড়কে?

পেমা মনে করার চেষ্টা করে বললো, দু'-একখানা গাড়ি।

ভালো করে দেখেছিলে? অন্তত পঞ্চাশখানাকে যেতে দেখেছি আমি। কিন্তু আজই ঘটে গেলো!

ট্রানস্মিটার আবার ঘোষণা করলো ঃ এইমাত্র খবর পাওয়া গেলো উত্তর পাহাড়ের দিকে একজন বড়ো জাতের লামা পালিয়েছে। সে নরহত্যার অপরাধ করেছে। সে দেশদ্রোহীও বটে। তাকে কেউ আশ্রয় দিও না। তাকে আশ্রয় দেওয়া বা পালাতে সাহায্য করা দেশদ্রোহের অপরাধ হবে।

ওরা কি সাম্য নিয়ে আসছে? আচ্ছা থেনডুপ, ওরা কি সব অন্যায় দূর করবে? পুরনো অন্যায়ও?

তা পারে। নতুন অন্যায়ের শিকড় পুরনো অন্যায়। নতুন অন্যায়কে দূর করতে হলে হয়তো শিকড় উপড়োতে হবে। খাবার বাসনপত্র সরাও এখন। পটু হাতে কাজ শুরু করলো পেমা, নিমেষে শেষ করলো। কিন্তু সর্বাঙ্গ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রান্নাঘরে গিয়ে সে চায়ের জল চাপিয়ে এলো। একবার বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর শোবার ঘরে থেনডুপের সামনে ফিরে এলো। কাজ করার জামার পকেট থেকে কুচনো তামাকপাতা আর কাগজ নিয়ে থেনডুপের চৌকির পায়ার কাছে বসলো। সিগারেট পাকাতে গিয়ে তার হাত কাঁপছে। হঠাৎ তার চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠলো। বললো সে, আচ্ছা, থেনডুপ, তোমার অন্যায় বিচারের বিচার হবে?

থেনডুপ বসে বসে দুলতে লাগলো। তারপর হাসলো। হেসে বললো, যদি তুমি তেমন বিচার চাইতে পারো।

তারপর আবার সে নিঃশব্দে হাসলো—একটানা আলোর মতো হাসি।

হাতে পাকানো সিগারেটটা দু'হাতের তেলোয় গড়িয়ে নিয়ে ছোটো একটা উদ্‌গার তুলে সিগারেট মুখে দিলো পেমা। আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, থেনডুপ গত বছর মাখন-উৎসবে শাও চি আমাকে একখানা হান্‌দের পুঁথি কিনে দিয়েছিলো। সেই বই পড়ে রসুন

লাগিয়েছি ভালো হয়েছে, শুয়োরের বাচ্চাগুলোও কেমন বড়ো হয়েছে তা তুমি দেখেছো। সেই বইয়ের প্রথমেই সাম্যের কথা আছে—রসুন আর শুয়োরের বেলায় যদি বইয়ের কথা সত্য হয়—সাম্যের কথা মিথ্যে হবে কেন?

অদ্ভুত শান্ত গলায় থেনডুপ বললো, সাম্য ভালো। সাম্য এলে বিদ্বেষ থাকে না। আর বিদ্বেষ থেকে ক্রোধ আর ভয় জন্মায়। সুতরাং সাম্য একটা পথ। পেমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো; সে বললো, মুখের ধোঁয়া অলসভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, হ্যাঁ, থেনডুপ তুমি বলেছিলে বটে সেই জেলখানায় যতদিন তোমার রাগ ছিলো ততদিন ভয় আর বিদ্বেষ ছিলো। তারপর একদিন তোমার রাগ গেলো। গিয়াৎসো যেন সোনালি ফুল হয়ে উঠলো তোমার মনে। তারপর বিদ্বেষ গেলো। তারপরে ভয়কে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। তারপর থেকে জেলখানার আর কোনো কষ্টই রইলো না তোমার।

ঝির-ঝির করে হেসে ফেললো পেমা। ধোঁয়ায় বেদম হয়ে খক্-খক্ করে কাশলো। উঠে গিয়ে কফ্ ফেললো। ফিরে এসে বললো, থেনডুপ, তুমি দেখো আমি বিচার চাইতে পারবো। হানদের বই আনবো? পড়ে শোনাবো তোমাকে সাম্যের কথা? এ ভারি মজার ব্যাপার—পড়তে পাবি, কিন্তু তুমি শুনে যত বোঝো, আমি পড়ে তা বুঝি না।... কিন্তু তুমি কি গিয়াৎসোর মতো মিছিল করবে নাকি? তোমাদের বংশে সেই কতদিন থেকে অতীশের প্রবাদ। গিয়াৎসো গেলো লোকনাথকে আনতে। আর ভয়, বিদ্বেষ, এসব কথার সঙ্গে, লোকনাথের নাম জড়ানো। তুমিও সাম্যের কোনো লামাকে আনতে যাবে নাকি? হো-হো-হো করে হেসে উঠলো পেমা।

নিঃশব্দে থেনডুপও হাসলো। বললো, আসবে কেউ তা শুনেছি। আমাদের বাড়িটাকে নাকি ওরা ভালো রকমে ব্যবহার করতে পারবে। কাজে লাগার মতোই বাড়ি। কিন্তু আজই শুরু হয়ে যাবে ভাবিনি।

আ, থেনডুপ, ওরা এলে কি খেতে দেবো? কি দিয়ে অভ্যর্থনা করবো? আজ না এলেই ভালো। আমাকে তৈরি হতে সময় দাও।

রসুন, নুন, ঝাল, মাংস, যবের গুঁড়ো আর চা কোনোটার অভাব তোমার?

একটু ভাবলো পেমা। বললো, আমি কিন্তু তোমার বিচারের বিচার চাইবো তো তুমি দেখে নিও। কিন্তু মনে রেখো গিয়াৎসোকে দেশদ্রোহী বলা হয়েছিলো। থেনডুপ বললো, আমার সম্বন্ধে তোমার ভয় হচ্ছে নাকি? ভয় না করাই ভালো। এসব ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে হয়।

দু'খানা হাত পিছনে রেখে তার ওপরে শরীরের ভার ঢেলে দিয়ে পা দু'খানাকে সামনে বিছিয়ে দিলো পেমা।

এখন তুমি তাদের সম্বন্ধে সব কথা বলতে পারো আমাকে।

কিন্তু পেমার বিশ্রাম করা হলো না। হঠাৎ মেঝের নীচে ক্যাঁ ক্যাঁ করে চিৎকার উঠলো। মাদী, মদ্দা, বাচ্চা সবগুলো শুয়োর একসঙ্গে চ্যাঁচাচ্ছে, দাপাদাপি করছে। নেকড়ে? পেমা উঠে দাঁড়ালো তড়াক করে। তখনই আবার বসে পড়ে ঘরের মেঝের ফোকরে চোখ রাখলো। ইশারা করে বললো, মানুষ, আশ্চর্য, সাম্যের মানুষরা ওখানে কেন? তা নয়? তবে চোর? শুয়োর-চোর এই দিনদুপুরে!

বলতে যত সময় লাগে তার চাইতে কম সময়ে ঘটনাটা ঘটে গেলো। ক্ষেত থেকে পাথর আলগা করার তিনশূলী কোদালটা ঘরের কোণ থেকে নিয়ে তরতর করে নেমে গেলো পেমা।

কিছুক্ষণ তাকে ধমকালো সে। তারপর একজন লোককে ধাক্কাতে ধাক্কাতে উপরে নিয়ে এলো।

চাষীদের মতো ময়লা জামা পরা, সারা গায়ে ধুলোমাটি; বয়স অনুমান ষাট; মাথার চুল শাদা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো। আর হাতের মসৃণপ্রায় রক্তবর্ণ আঙুলগুলো দেখলে বোঝা যায় তাকে চাষীদের কাজ করতে হয় না।

ভয়ে তার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে, কপালে ঘাম। কাঁপছে সে।

থেনডুপ বললো, কে তুমি? তোমাকে দেখে শুয়োর-চোর বলে মনে হয় না।

লোকটা বললো, না আমি চোর নই। তোমরা আমার স্বদেশবাসী; আমাকে তোমরা রক্ষা করো।

থেনডুপ বললো, ভয় নেই, তোমার ভয় নেই; কিন্তু কে তুমি?

লোকটা কিছু বলার আগে এদিক-ওদিক চাইলো। ঢোক গিললো। দু'দিকের দরজাই খোলা। সামনের দিকের দরজা দিয়ে পথের খানিকটা চোখে পড়ে। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়ায় লোকটা চমকে উঠলো। অমিতাভের দোহাই, দরজাগুলো বন্ধ করে দাও। সে যেন নিজেই দবজা বন্ধ করবে এমনভাবে এগিয়ে গেলো সেদিকে।

থেনডুপ বললো, তুমি বসো, এখানে ভয় নেই। পেমা দরজা দুটোকে বন্ধ করে দাও।

পেমা দুটো দরজাই বন্ধ করে দিলো। লোকটা একটা জলচৌকির উপরে বসলো। সে যে কত ক্লান্ত এবার তা বোঝা গেলো। বসেও সে থরথর করে কেঁপে উঠলো।

থেনডুপ বললো, তোমাকে কিছু খেতে দেবো?

লোকটা বললো, ভগবান বুদ্ধের দোহাই, তোমরা আমার স্বদেশবাসী, আমাকে বাঁচাও। কি হয়েছে তা তো বলছো না। পেমা বললো।

লোকটা বললো, তোমরা কি কিছুই খবর রাখো না? অথবা চাষাদের এই রীতি। তাদের চাইতে যারা ভালো তারা যখন স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তারা তখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়োর পালে।

তা পালে, থেনডুপ হেসে বললো, কিন্তু তোমার বিপদটার কথা না জানলে কি করে তোমাকে সাহায্য করবো তাও বুঝতে পারছি না।

লোকটা বললো, উত্তুরে কুকুররা এসে পড়েছে সে খবর কি তোমরা পাওনি? আমাদের সব গেলো, উদ্ধারের আর আশা নেই। উত্তুরে কুকুরদের দাঁত ঝকঝক করছে, জিভ থেকে লাল গড়াচ্ছে। তারা আমাদের দেশের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

পেমা বললো, কাদের কথা বলছো, সাম্যবাদীদের?

তাই বলে বটে নিজেদের তারা। কিন্তু আমি তাদের রাক্ষুসে ক্ষুধা দেখেছি। নরকের কুকুর, যদি উত্তুরে কুকুর না হয়।

কিন্তু, থেনডুপ বললো, এখানে কোনো কুকুর নেই। তোমার পোশাক দেখে যাই মনে হোক, কিন্তু কথার কায়দা, চেহারা থেকে ধরা পড়ছে তুমি সাধারণ লোক নও। এমনকি তোমার জুতোজোড়ার দামও একশ' টাকা হবে।

লোকটা ভয় পেয়ে ফ্যাকাসে মুখে উঠে দাঁড়ালো আবার। কিন্তু ভয় গোপন করার চেষ্টা করলো যেন। বললো, তুমি যখন বুঝতে পেরেছো, বলি তাহলে। আমি শহরের উত্তর দিকটা রক্ষা করার চেষ্টা করছিলাম। আমার সৈন্যদলের যারা পালায়নি, তারা মরেছে। আমি পালিয়েছি। আমাকে ধরার জন্য লোক পাঠিয়েছে ওরা। আর সবাই পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। আমাদের মতো

কয়েকজন শেষ চেষ্টা করছি হানদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করতে। যদি আমি এবার বেঁচে যাই, তোমাদের কথা মনে রাখবো। যত টাকা চাও দেবো তোমাদের। পাঁচশ, ছ'শ, হাজার।

থেনডুপ হেসে বললো, তা দিও। পেমা আমাদের অতিথির জন্য একটু চা করে আনো। অনুমতি করো আমার স্ত্রী তোমার জন্য চা আনুক। বসো তুমি।

পেমা চা করে আনতে গেলো। লোকটা আবার বসলো জলচৌকির ওপরে। থেনডুপ কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলো, কিছুক্ষণ যেন নিজের মধ্যে ডুবে হাতড়ে হাতড়ে কি খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ যেন তার চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খুব আগ্রহ নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো, তোমাকে, অথবা ঠিক তোমার মতো একজনকে যেন এর আগে কোথাও দেখেছি।

অসম্ভব নয়; শহরে গেলে, রাজ্যের নানা কাজেই আমাকে দেখে থাকবে। থেনডুপ কিছুক্ষণ ভাবলো; আগন্তুকের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলো; আবার তার মুখের দিকে চাইলো। হাতজোড় করার ভঙ্গিতে এক হাত দিয়ে অন্য হাত চেপে ধরলো। যেন তা করে সে হাত দুটোকে আটকে রাখতে চাইছে। ধীরে ধীরে বললো, আচ্ছা তুমি বিচারক ছিলে না?

আগন্তুক চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললো, তুমি ঠিকই চিনতে পেরেছো। তা হলে বুঝতে পারছো, আমার উপকার করলে তা তোমার বৃথা যাবে না? দেশ আর অমিতাভ দুইয়েরই কৃপালাভ করবে তুমি।

থেনডুপ বিড়বিড় করে বললো, গিয়াৎসো, তোমার গাছের কথা ভাবতে ভাবতে এ মুখটাকে ভুলে গিয়েছিলাম; কিম্বা লামার পোশাকের বদলে চেনা যায়নি।

আগন্তুক বললো, কিন্তু এখন পর্যন্ত তুমি বলোনি কি করে তুমি আমাকে বাঁচাবে। বিড়বিড় করে কি বলছো। তুমি তো শরীরের দিক দিয়ে একেবারেই অকেজো দেখছি। তোমার মেয়েমানুষটিকে না হয় ডাকো, সেই কিছু বুদ্ধি দিক।

থেনডুপ আবার বিড়বিড় করে বললো, অকেজো, একেবারেই অকেজো। মানুষের মতো দাঁড়াতেও পারি না। পেমা চা নিয়ে আসুক। সে নিশ্চয়ই, ব্যবস্থা করবে। তোমার পরিচয় পাওয়ার পর তোমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আমি অকেজো হয়ে পড়েছি। বিদ্বেষকে তাড়ালে কি কাজের শক্তিও চলে যায়? অথবা কে জানে?

ঠিক এই সময়েই মোটরগাড়ির গোঙানি ভেসে এলো। পর-পর কয়েকটি, যেন কলভয় এগিয়ে চলেছে। পেমার বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে যেন শব্দটা ভেসে এলো। যেন এদিকেই আসছে সেই মিছিল। আগন্তুক চমকে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের কোণের দিকে ছুটে গেলো। মৃতদেহের মতো রক্তহীন মুখ থেকে দুটো দাঁত বেরিয়ে পড়লো। নিজের হাত মোচড়াতে লাগলো সে। হলো না, হলো না; তুমি কথা বলছো না কেন? ওই গাড়ির শব্দে বুঝতে পারছো না আমার উদ্ধারের আশা শেষ হয়ে গেলো। বলো, কিছু একটা বলো। তোমাদের শুয়োরের খোঁয়াড়ে থাকতেও আপত্তি নেই। দোহাই তোমার, আমাকে কোনোরকমে লুকিয়ে রাখো।

থেনডুপ বললো, আচ্ছা তোমার থেনডুপ গিয়াৎসো নামে কারও বিচার করার কথা মনে পড়ে? একজন লামাকে নাকি খাদে ফেলে দিয়েছিলো সে। এরকম কিছু মনে পড়ে?

হাঃ, এটা কি এমন সব ঠাণ্ডা আলাপ করার সময়। সব মিটে গেলে একদিন আমার প্রাসাদে যেয়ো, অনেক মামলার গল্প বলবো। আমি দু'হাজার মামলা বিচার করেছি। ডাকো না তোমার মেয়েমানুষটাকে, দেখো সে কি বুদ্ধি দেয়। আমাকে এ যাত্রা কোনোরকমে বাঁচাও।

থেনডুপ বললো, তুমি ভালো করে মনে আনার চেষ্টা করো। তার নাম ছিল থেনডুপ, থেনডুপ গিয়াৎসো। আর সেদিনও কোনো কারণে তুমি এমনি অধীর ছিলে। বিচারের সব দিকে দেখবার মতো সময় ছিল না। কি একটা রাজকার্য ছিলো। তোমার বিচারে থেনডুপের ত্রিশ বছরের জেল হয়েছিলো।

আগন্তুক বললো তা হয়, এমনই হয়ে থাকে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে, যদি তাতে তুমি সুখী হও। পরে মনে হয়েছিলো সাজাটা বেশি হয়ে গেলো হয়তো। কিন্তু তুমিই বলো এখন কি এসব আলাপ করার সময়?

থেনডুপ ভাবতে লাগলো। বারবার তার মুখটা বিকৃত হলে যেন সে ভয়ংকর শক্ত একটা কিছুকে মুখের মধ্যে কায়দা করার চেষ্টা করছে। সময় সম্মুখ দিকে আর এগোচ্ছে না, বরং পিছন দিকের টানে একই জায়গায় পাক খেয়ে ঘুরছে।

কিন্তু আজ পেমার এই সরাইখানার মতো বাড়িতে আধুনিক কাল ঢুকে পড়বে তার লক্ষণ তো লুকনো ট্রান্সমিটারেই। গোঁ গোঁ করে একটা মোটরের শব্দ জেগে উঠলো। টপ্-গিয়ারে চলার শব্দ যেমন হতে পারে, যেন খুব কাছেই। আন্দাজ হয় নীচে বড়ো সড়ক থেকে গাড়িটা যেন উপরের দিকে উঠবার চেষ্টা করছে। পেমার এই সরাইখানার মতো বাড়িটার দিকেই এগিয়ে আসছে!

দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, আগন্তুক হাহাকার করে উঠলো, বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও। তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি।

কিন্তু কিছু সে বলার আগেই পেমা এলো অতিথির জন্য চা নিয়ে। তার মুখে খুশি, চেষ্টা করেও তা গোপন করতে পারছে না। সে যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু বাইরের লোকের সামনে দ্বিধা বোধ করছে। অতিথির সামনে চা দিয়ে কিন্তু সে বলে ফেললো, বড়ো সড়ক থেকে একটা মোটর আমাদের এদিকের ছোটো রাস্তায় উঠবার চেষ্টা করছে। জানলা দিয়ে দেখা যায়।

থেনডুপ বললো, তা কি উঠতে পারে? ওরা কি দধিকর্ণের মতো কোনো টাট্টু?

পেমা বললো, ওরা কি সাম্যের লোক?

থেনডুপ বললো, হয়তো। তুমি জানলা দিয়ে দেখো। আগেই দরজা খুলো না। থেনডুপ গিয়াৎসোর নাম না বললে তো নয়ই। আমি ততক্ষণ আমাদের অতিথির সঙ্গে কথা বলে নিই।

গাড়ির শব্দ আগন্তুক শুনতে পেয়েছিলো। সে বুঝতে পেরেছিলো মোটর কাদের হতে পারে। পেমার কথায় তার আর সন্দেহ রইলো না। চূড়ান্ত হতাশায় কপাল চাপড়াতে লাগলো সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো। প্রায় কান্নার স্বরে বললো, ফাঁদ, ফাঁদ, হা ভগবান বুদ্ধ, শেষে ফাঁদে পড়ে—বলো তোমরা কি সাম্যবাদী? বলো, তাই বলো। তোমরাও কি বিদ্রোহী?

থেনডুপ বললো, পেমা, যাও, যাও, আমি অতিথিকে চা খাইয়ে নিই।

পেমা হাসিমুখে বললো, আমি কিন্তু তোমার বিচারের বিচার চাইবো। আর শাও চি এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে। সেই আমাকে বলেছে তোমার বিচারটা আদৌ বিচারই হয়নি।

থেনডুপ হেসে ঘাড় নেড়ে বললো, সে হবে, সে হবে। তুমি দরজাটা আগলাও। পেমা চলে গেলে থেনডুপ বললো, আমরা সাম্যকে ভালোবাসি। এটা তোমার এতক্ষণ বোঝা উচিত

ছিলো। এই ট্রান্সমিটারটাকে দেখো। আর ওপাশের কুলুঙ্গিতে হান্ ভাষায় লেখা বই আছে। আমার স্ত্রী হান্‌দের পদ্ধতিতে ভালো রসুন ফলিয়েছে। আর বিদ্রোহ? তা, হ্যাঁ, গিয়াৎসোর সময়েও এরকম বলা হয়েছিলো। তোমার কি জানা আছে সেই লোকনাথের সময়ে কি হয়েছিলো?

কিন্তু পেমার শান্ত সরাইয়ে বর্তমান কাল এসে পড়েছে। বাইরে ঝড় উঠলে বন্ধ ঘরেও যেমন দমকায় দমকায় শব্দ ভেসে আসে, তেমনি করে অস্থিরতা আর উত্তেজনার দমকা আঘাত এসে লাগছে। ভয়ংকর রাগের চিৎকারে ট্রান্সমিটারটা যেন কেঁপে উঠলো। ক্রুদ্ধ হান্ ভাষায় কথা ভেসে এলো। অভিজ্ঞতা থাকলে বুঝতে পারতো থেনড়ুপ শব্দটা কাছের কোনো মোটর থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। ট্রান্সমিটারটা গোঁ-গোঁ করে বললো, এদিকে একজন লামা পালিয়েছে। লোকটা তথাকথিত প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা। মুক্তিফৌজের দু'জন অফিসার এবং পঁচিশ জন সৈন্যকে হত্যা করেছে সে। তাকে যে লুকিয়ে রাখবে অথবা পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।

চূড়ান্ত হতাশায় আগন্তুক স্থির হয়ে গেলো। বিড়বিড় করে বললো, আমি, আমি; আমার কথাই বলছে। আমার আর নিষ্কৃতি নেই।

নিঃশব্দে থেনড়ুপ হাসলো। তার হাসিটা কিরণের মতো তার চোখের দু'প্রান্তে স্থির হয়ে রইলো খানিকটা সময়। তারপর সে বলে গেলো, তোমাকে দেখছি আমাদের পরিবারের কলঙ্কিত নামের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে হবে। জুতো খোলো। ওই জুতোজোড়াই তোমাকে ধরিয়ে দেবে। পেমার জুতো দেখো ওই কোণে, মস্ত বড়ো, আর দেখতেও এমন কিছু সুন্দর নয়, তা হলেও ও দু'টোকে পরে নেওয়া উচিত। ওই তিনশূলী কোদালটা নাও। আমার হাতে ওরকম একটাকে হাঁকড়াতে দেখেই ত্রিশ বছর আগে সেই বেচারা লামা পালাতে গিয়ে খাতে পড়ে মরেছিলো। ওতে আত্মরক্ষা আর ছদ্মবেশ দুই-ই হবে। বাইরের বারান্দায় ঝুড়ি বাঁধা বাঁক আছে, দেয়ালের গায়ে পেমার খড়ের টুপি। তোমার অবস্থায় এ দু'টোকেই আমি সঙ্গে রাখতাম। পথে বেরিয়ে বাচ্চা চমরীর মাথার দিকে চলতে শুরু করো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে বাদামি কয়লা কুড়োতে যাচ্ছে। জেনে রাখো মাইল দু'-এক উত্তর-পুবে একটা পুরনো বাদামি কয়লার খাদ আছে। আর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবে হ্যাঁ কলঙ্কের কথাই—তুমি পেমার বাবা। মেয়ের নামটা মনে রেখো—পেমা গিয়াৎসো। বলবে, তুমি থেনড়ুপ গিয়াৎসোর শ্বশুর। পরিবারের ইতিহাসটা জেনে নাও, নইলে জেরায় দাঁড়াতে পারবে না। গিয়াৎসোর প্রাণদণ্ড হয়েছিলো ইংরেজ গোয়েন্দাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য। তারই নাতি থেনড়ুপ গিয়াৎসোর ত্রিশ বছরের জেল হয়েছিলো এক বড়োগোছের লামাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দেয়ার অপরাধে। আর দেরি নয়, আর দেরি নয়...

আগন্তুক নিজের জুতো খুলে পেমার জুতো পরে ফেললো। থেনড়ুপ তাকে উৎসাহ দিতে লাগলো।

থেনড়ুপ বললো, আমি হলে কিন্তু রাত্রি পর্যন্ত বাচ্চা চমরীর জিভ বেয়ে তার মুখে ঢুকে থাকতাম। কারণ এ দিকটা খুব নির্জন। পথে বেশি লোক চলাচল করে না যে তাদের দলে মিশে এগিয়ে যাওয়া যাবে। তা ছাড়া পাহাড়ের উপরে অনেক দূর থেকে দেখতেও পাওয়া যায়।

মাটিমাখা তিনশূলী কোদাল নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো বিচারক লামা।

দরজার ভেতর থেকে চাপা গলায় বললো থেনডুপ, বেরিয়ে পড়ো। বাঁকটা কাঁধে নাও। টুপিটা মাথায় চেপে বসাও। চাষীদের স্বরে কথা বলো। মনে রেখো তুমি পেমার বাবা।

অনেকক্ষণ গল্পটা হলো। অনুমান করছিলুম এবার বোধ হয় লোকনাথের দধিকর্ণ সম্বন্ধে কিছু শোনা যাবে। কারণ তখন বেলা দুপুর, আহারের পরে এখন পেমার বাড়িতে বিশ্রামের সময়। সর্বাঙ্গ দিয়ে দিনের আলোর উত্তাপটাকে গ্রহণ করার ভঙ্গিতে থেনডুপ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। মোটরগাড়ি, ট্রান্সমিটারের শব্দে আগন্তুকের ব্যাপারটাতে যে আলোড়ন উঠেছিলো তা পেমার হারিয়ে যাওয়া সরাইখানার মতো এই বাড়িটাকে অতিক্রম করে চলে গেলো এমন ধারণা হয়েছিলো। বায়ুমণ্ডলের বিক্ষোভ যেমন শান্ত সমুদ্রের তুলনায় নগণ্য, এই আধুনিক সময়ের ঝড়কেও পেমার বাড়ির অনন্ত সময়ের তুলনায় তেমন কিছু হবে বলেই অনুমান হলো।

কিন্তু হঠাৎ পেমা বাইরের বারান্দায় হাততালি দিয়ে উঠলো। তার বাড়ির সামনে একটা জঙ্গি জীব সত্যি উঠে আসতে পেরেছে আর তা এমন সহজে যে পারবে তা আগে থেকেই যেন ঠিক করা ছিলো। সেই জিপ থেকে একজন হান্ মেজর আর ছ'জন হান্ সৈন্য লাফিয়ে নামলো। তাদের দেখে অ্যাপ্রিকট গাছটার নীচে চমরীগুলো তাদের দিকে ড্যাব্‌ডেবে চোখে চেয়ে রইলো।

পেমা বললো, দেখো, দেখো, চমরীগুলোও ভয় পায় না। ওরাও নাকি বোঝে। সাম্য এলে ভয় থাকবে না। কি যেন বলো তুমি—

থেনডুপ বললে, পেমা ঘরে এসো। নিজেকে দেখিও না। অপেক্ষা করো। ওদের রীতিনীতি বুঝতে দাও। দু'ঘণ্টা এমন কি বেশি সময়? এখন নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে।

থেনডুপের কথা মেনে আমরাও গল্পটাকে নীরবতার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে পারি। যদিও সে নীরবতা পেমার বাড়ির অভ্যস্ত নীরবতা নয়, বরং অন্য এক দৃশ্যে যেন আলোড়নটাই এসে পড়েছে যা পেমার বাড়ি পার হয়ে গেলে বলে ভুল হয়েছিলো।

সৈন্য নিয়মমাফিক মাপাজোখা পথে চলে ঃ ইতিমধ্যে দু'জন পেমার বাড়ির ছাদে ট্রান্সমিটারের উঁচু শৃঙ্গ তুলে দিয়েছে, অ্যাপ্রিকট গাছটার নীচে চমরীগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে গর্ত খুঁড়ে রান্নার যোগাড় করে নিয়েছে দু'জন, বাকী দু'জন বাড়ির চারিদিকে সরজমিনে তদন্ত করছে। রাইশাকের কচি-কচি পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খেলো তারা, শুকিয়ে-আসা রসুনগাছগুলোকে উপড়ে উপড়ে তুলে কাঁচা রসুনগুলো খেতে লাগলো। একজন ভাতের দলা বার করলো ঝোলা থেকে রসুনের সঙ্গে খাওয়ার জন্যে। জানলা দিয়ে তা দেখে পেমা হেসে বাঁচে না। একদল শিশু যেন, অথচ দেখতে কতবড়ো জোয়ান। কিন্তু হঠাৎ হাসিটা মুছে গেলো পেমার মুখ থেকে। একটা বাচ্চা শুয়োর খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো। ওদের একজন রাইফেল তুলে ধরলো। এক ঝলক আগুন, দুম করে একটা শব্দ, কিছু ধোঁয়ার সঙ্গে একটা করুণ আর্তনাদ। বাচ্চা শুয়োরটা পা ছুঁড়তে লাগলো ক্ষেতের ধারে। আর ঠিক তখনই কিনা পেমা ভেবেছিলো জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ওদের ছেলেমানুষি রসুন খাওয়াকে উৎসাহ দেবে। মুখে একটা ব্যথার চিহ্ন নিয়ে পেমা সরে এলো জানলা থেকে— বাচ্চা শুয়োরটাই যেন ব্যথায় থরথর করছে পেমার হৃৎপিণ্ডে।

এদিকে বাইরের বারান্দায় থেনডুপের সঙ্গে কথা বলছে মেজর। থেনডুপ আর সে মুখোমুখি দু'টো জলচৌকিতে। থেনডুপের মুখে একটা হাসি দেখা দিয়েছে—স্থির উজ্জ্বল একটা

হাসি সে কিছু ভাবছে, আর ভাবনাটা অত্যন্ত সুন্দর কিছুর, যেন তা কিরণ হতে পারে। পেমা দরজার ফাঁকে চোখ রাখলো। তার মুখ থেকে ব্যথার চিহ্নটাও চলে গেলো; ব্যথার দরজা দিয়েই সুখ আসে অনেক সময়।

মেজর তখন তার টুপিটা খুলেছে—সুন্দর চকচকে চুলগুলোকে অনাবৃত করে। পেমার মনে হলো এই হান্ মেজরের মতো এমন সুন্দর আর কাউকে সে দেখেনি। মুখের দিকে চেয়ে দেখো, বিদ্বেষ নেই, ভয় নেই। অমিত কারুণ্যে...। ঠিক বলেছে থেনড়ুপ। সাম্য না এলে বিদ্বেষ যায় না, বিদ্বেষ যতদিন ভয় ততদিন থাকবেই। আর একথাও ঠিক যে থেনড়ুপ তার ঠাকুরদা গিয়াৎসোর মতো নতুন কিছুকে চিনে নিতে পারে। হ্যাঁ সাম্যের কথাই বলছে তারা।

গিয়াৎসোর স্ত্রী নিশ্চয় নিজের ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছিলো, নিজের পোশাকও যখন লোকনাথকে নিয়ে ফিরে এসেছিলো গিয়াৎসো আর রিম্পোচে লামা। সেটাই স্বাভাবিক নয়? আর বোধহয় তারও তা করা উচিত, কারণ এখনই হয়তো থেনড়ুপ তাকে মেজরের জন্য চা নিয়ে যেতে বলবে।

তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে কাঠের তোরঙ্গটা খুলে সিল্কের জামা আর ব্রোকেডের পেটিকোট বার করে পরলো পেমা। সেই কবে বানিয়েছিলো মাখন-উৎসবে পরার জন্যে, আজ পর্যন্তও পরার সুযোগ আসেনি। কিন্তু আজকের মতো উৎসব আর কি হয়? রান্নাঘরের চুল্লিতে আরও কিছু ঘুঁটে দিয়ে চায়ের হাঁড়িটা চাপালো তাতে।

আবার পা টিপে টিপে দাঁড়ালো সে দরজার এপারে, কান রাখলো দরজার ফাঁকে। আবার চোখ পড়লো তার মেজরের মুখের ওপর। রোদে ঘুরে ঘুরে সে মুখটা একটু বা লাল। কপালের ওপর ঢেউ খেলানো চুল, টানা চোখ দুটোতে যেন স্বপ্নের আবেশ। হঠাৎ একটা সলজ্জ সুন্দর অনুভূতি পেমার বুকের মাঝখানটাতে জেগে উঠলো; আহা, তার যদি কোনোদিন ছেলে হতো, হয়তো এমনটাই হতো সে এতদিনে। কিন্তু কোনোদিনই সে ছেলেকে আদর করতে পায়নি, কি করে তা করতে হয় তা কি সে জানে?

এরপরে চা নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলো থেনড়ুপ। পেমা তো প্রস্তুতই ছিলো। চা নিয়ে গেলো পেমা, থেনড়ুপ তখন মেজরের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলো।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে মেজর বলে গেলো সাম্যের কথা, আর অবাক হয়ে শুনলো পেমা আর থেনড়ুপ, সাম্য এলে বিদ্বেষ আর থাকবে না। কেউ কাউকে হিংসা করার কারণই খুঁজে পাবে না; অন্যায় অবিচার আর থাকবে না; ভয় কোথায় তখন? সে তখন নরকে, যদি নরক বলে কিছু থাকে। এই বলে অফিসারটি হাসলো। আর পেমার তখন মনে হলো একেই বোধহয় সর্বাঙ্গসুন্দর বলে।

পেমা বললো, আগে যে সব অন্যায় হয়েছে তার শিকড়ও তোমরা তুলে ফেলতে পারো?

হবে, কমরেড, তাও হবে। শুধু বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করা হবে না, যেমন ধরো যে লামা এদিকে পালিয়েছে তাকে কিম্বা তাকে যে আশ্রয় দেবে তাকে ক্ষমা করা হবে না।

দুপুর পার হয়ে এখন বিকেল। রান্না শুরু করেছে পেমা। যত রকম রান্না সে জানে, সাধ্যমতো তা সবই করবে। জীবনে এতটা পরিপূর্ণ সুখ কি সে পেয়েছে? বর্তমান ভবিষ্যৎ সার্থক। ইতিমধ্যে শীতের তুষারেও পাকে এমন যবের কথা জিজ্ঞাসা করে নিয়েছে সে এক অবসরে। আর মেজর আশ্বাস দিয়েছে সে সবই আসবে। আর অতীত? তারও ন্যায়বিচার হবে।

ততক্ষণে বাড়ির ছাদের শুঙ্গ থেকে তার এসেছে ট্রান্সমিটারে। নীচে অ্যাপ্রিকট গাছের তলায় সৈন্যদের রান্নার সুগন্ধ ভেসে আসছে। মেজর দেয়ালে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসলো। এটা ঠিক একটা ক্যাম্প হেড্ কোয়ার্টার্সের মতোই—এই সরাইখানা।

থেনডুপ বললো মেজরকে, সে একবার বাইরে যাবে পারিবারিক প্রয়োজনে। কমরেড মেজর যেন এ বাড়িকে নিজের বাড়ি বলেই মনে করে। পেমা রইলো। সে কমরেডের সুখ-সুবিধার সব ব্যবস্থাই করে দেবে। পুবদেশী মেয়ে, সে অফিসারের ভাষা শুধু বলতে পারে না, পড়তেও পারে।

পেমা স্বীকার করে মাথা দোলালো খুশিতে।

পেমা একটা রান্না শেষ করে আর একটা রান্না চড়ালো। থেনডুপ চিন্তা করতে বসলো রান্নাঘরের সামনেই। চিন্তায় যেন অতীত আর বর্তমানকে সে একত্রিত করছে।

যবের গুঁড়ো ঠাসতে বসেছিলো পেমা। কিন্তু হাত দুটোকে থামিয়ে হাসিহাসি মুখে কিছু ভাবলো সে, তারপর খানিকটা মাখন নিয়ে নীচে নেমে গেলো যেখানে সৈন্যরা রান্না করছে। কোমর ভাঁজ করে ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে তাদের রান্নার তদারক করলো। ভাঙা-ভাঙা হান্ ভাষাতে বুঝিয়ে দিলো রান্নায় মাখন দেয়ার কথা। আর হাসলো ওদের আনাড়িপনায়। যেমন তরতর করে নেমে গিয়েছিলো তেমনি হিল্লোল তুলে সে ফিরলো রান্নাঘরের দিকে। থমকে দাঁড়ালো। একেবারে অবাক হয়ে গেলো। তার বাড়ির ছাদে মস্ত একটা শুঙ্গ লাগিয়েছে দেখে, আর তার পাশেই একটা লাল পতাকা। টকটকে লাল। গিয়াৎসোর সাইমিয়া ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেলেও এত গভীর লাল দেখায় না। লালের জমিতে কি একটা আঁকাও আছে বটে। অবাক, অবাক, লালের মধ্যে ফুটে ওঠা সোনালি ফুল যেন। আচ্ছা! দাঁড়াও, থেনডুপকে বলবে সে এদিকেও দেখো গোলাপি ফুল সোনালি হয়ে উঠছে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো পেমা। তার ছ'ফুট উঁচু শরীরে স্বাস্থ্য যেন আনন্দের জোয়ার তুলছে এখন। খুশি, খুশি, এমন খুশি সে আর কবে হতে পেরেছে। মেজরের সামনে এসে মাথা নুইয়ে সে বললো, যেমন নাকি অভিজাত রমণীরা করে থাকে বলে সে শুনেছে, চা, একটু চা আর?

ফুটন্ত হাঁড়ি থেকে চা করে আনলো পেমা আবার।

মেজর হাসিমুখে বললো, তোমার বাটিও নিয়ে এসো। বেশ লাগছে এই বিকেল।

মুখোমুখি চা নিয়ে বসলো পেমা আর মেজর। দেখো, একেই তো সাম্য বলে, মনে মনে বললো পেমা। সে এক সামান্য চাষীর মেয়ে আর এ এক মুক্তিফৌজের মেজর। ভাবতে না ভাবতে পেমা বলে ফেললো, তোমার মতো শান্ত, সুন্দর কেউ হয় কল্পনাই করিনি, দেখা দূরে থাক। তোমার গালে কি একটু হাত বুলিয়ে দেয়া যায়?

মেজরের ঘাড়, গলা লাল হয়ে উঠলো তা শুনে।

পেমা ভাবলো ঃ সময়ে তার ছেলে হলে সে এতদিনে এমনটাই হতে পারতো, আর সে অনেকদিন পরে ফিরে এলে এমন করেই আদরের কথা বলতো সে। চা শেষ করেই আবার রান্নাঘরে গেলো সে। কত রান্নাই সে করবে। এমন উৎসব যে তার জীবনে আসবে তা কে জানতো?

অদ্ভুত শান্ত, স্তব্ধ এই বাড়িটা। বর্তমান তো এসেই পড়েছে, তবু তা যেন থিতিয়ে যাচ্ছে

কোনো কিছুর প্রভাবে, স্রোত হয়ে বইতে পারছে না। বিকেলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে দিন। তার এক বিশেষ নীরব প্রভাব যেন। শুয়োরগুলো, চমরী কয়েকটিও ডাকছে না। নীচে ওরা রান্না করতে করতে কথা বলছে হয়তো, তার শব্দও কানে আসছে না। যদিও ধোঁয়ার সঙ্গে তৃপ্তিদায়ক আহারের সুগন্ধ ভেসে আসছে কখনো। চমরীগুলো তাদের কাছেই শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে যেন ঘুমের ঘোরে। এ শান্তি, যাকে অবিদ্বেষ বলে, এই তো সমতা, যাকে সাম্য বলে।

মেজর উঠে দাঁড়ালো। যেন এই কবোষ্ণ স্নিগ্ধতাকে আর একটু অনুভব করার জন্যই বাড়ির ভিতর দিকে চলে এলো সে। পিছন দিকের সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। পড়ন্ত রোদে ঘুমন্ত একটা রাইশাকের ক্ষেত। আশ্চর্য শান্তি এই বাড়িটাতে। মনে হয় দু'মাইল দূরে কোনো ঝিঁ ঝিঁ ডাকলেও এখান থেকে শোনা যাবে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যায়। বুগ-বুগ করে একটা ক্ষীণ শব্দ উঠছে কোথায়। কিছু ফুটছে রান্নাঘরে। সেদিকেই এগিয়ে গেলো সে।

হঠাৎ মেজরের চোখে পড়লো মধ্যের ঘরের জলচৌকির পাশে নতুন একজোড়া দামী রাইডিং বুট। কেউ মাত্র দু'-একবার ব্যবহার করেছে। বেশ শৌখিন তো? মেজরের মুখে হাসি ফুটলো যেন। নিজের পা জুতোজোড়ার পাশে রেখে দেখলো, না বড়ো হয়। থেনডুপ কি এমন জুতো পরতে পারে? না। তা হলে এটা ওই মেয়েমানুষটার। কি চেহারা! এমন ছ'ফুট চেহারার মেয়েমানুষ হয় নাকি? সৌখিনও আছে খুব, পোশাক দেখছো না? চাষীদের মতো বদ গন্ধও নেই গায়ে। আর চলাফেরা দেখছো? ঢেউ উঠছে না? মেজরের গালের পাশ দু'টো লাল হয়ে উঠলো। রান্নাঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখলো সে। উনুনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রান্না করছে পেমা। তার সুগঠিত কিছু বা স্থূল নিতম্বই চোখে পড়লো মেজরের।

মেজর ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে বাইরের বারান্দায় বসলো আবার। কাঁধ থেকে ফিতে সমেত বাইনোকুলারটাকে খুলে রাখলো পাশে। সরু একটা হাতে পাকানো সিগারেট ধরালো। তা যাই বলো, ভাবলে সে, চারিদিকে অনুর্বর পাহাড় হলেও আবহাওয়াটা আরামদায়কই বটে। খুব কষ্ট হবে না এদেশে থাকতে। আর একেবারেই অনুর্বর বলাও যায় না। রাইশাকের ক্ষেতটাই তার প্রমাণ। ওখানে ওই রাইশাক জন্মানো সহজ ব্যাপার না হলেও, ভালোই হয়েছে। বাইরে থেকে যে কর্কশ ও রুক্ষ, তার মধ্যে উর্বরতা লুকিয়ে থাকে। তিন-চার দিন আগে তার ইউনিটের পোলিটিক্যাল অফিসার বলছিলো বটে চারদিকের প্রতিকূলতার মধ্যে এদের এখনও নির্বংশ হতে দেখা যায়নি, যদিও এদের অর্ধেক পুরুষই যৌবন আসবার আগেই সন্ন্যাসী হয়ে যায়। বাধাও দিচ্ছে এরা। তা থেকে বুঝতে পারা যায় কোথাও এদের নতুন হয়ে ওঠার মতো শক্তি লুকানো আছে। অবশ্যই পোলিটিক্যাল অফিসার এদের জাতের প্রশংসা করছিলো না। সিগারেটে টান দিলো মেজর। মুক্তিফৌজের অফিসার হলে কিছুটা তাত্ত্বিক হতে হয়। সে রকম চিন্তার অভ্যাস রাখতে হয়। মেজরের মন তত্ত্বে পৌঁছে গেলো ঃ মানে, ওই রাইশাক ফলিয়েছে এই মেয়েমানুষটাই। যদিও তা স্বামীকে দেখে সন্ন্যাসীর চাইতে অপটু মনে হচ্ছে। অর্থাৎ এদেশের অর্ধেক পুরুষ সন্ন্যাসী হয়ে গেলেও এদের দেশের চাষী মেয়েদের মধ্যে জাতের উর্বরতা লুকানো আছে। আর সে জন্যই নতুন হয়ে থাকছে, পুরোনো হয়ে মরছে না জাতটা। তা দেখো, এ বাড়ির এই মেয়েমানুষটাকে। উর্বরতায় কোনো সন্দেহ আছে?

আর ঠিক তখনই সিদ্ধমাংসে রসুন আর সিমের বিচি ছেড়ে দিয়ে পেমা আবার বাইরে এলো। এখন ওটা কিছুক্ষণ ফুটবে, সেই অবসরে কিছুটা ভেবে নেওয়া যাক। সে যে কিছু

ভাবছিলো তা বোঝা গেলো। চিন্তাটা তার মুখে হাসি হয়ে ফুটেছে। থেনডুপের বিচারের বিচার হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। এখন মনকে এই নতুন দিনের আলোকে আর একটু প্রসারিত করে দেখা যায়।

মেজরের সামনে গিয়ে বসলো পেমা, বললো, আমি কি ভাবি তা বলতে পারি। শাও চি বলেছে তোমাদের আর আমার ভাবনায় অনেক মিল আছে।

মেজর বললো, বলো।

পেমা বললো, শরীরই সব। আমি যা দেখি, যাকে হাতে ধরতে পারি, তাকেই বিশ্বাস করি। যার শরীর নেই, তার কিছু নেই।

মেজর যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

পেমা বললো, চমরী, খচ্চর, মাটি, পাথর সব কিছুরই শরীর আছে।

ও তুমি বোধ হয় বাস্তুতন্ত্রের কথা বোঝাতে চাইছো। আমি বুঝতে পারিনি। মেজর একটা দমবন্ধ করা কুণ্ঠা কাটিয়ে উঠলো!

পেমা নির্নিমেষে মেজরের দিকে চেয়ে রইলো। এত সুন্দর! সাম্য ছাড়া এমন সুন্দব মানুষ হয় না। কিম্বা সাম্যের মানুষ বলেই এত সুন্দর লাগছে। কারণ সাম্য মানেই অক্রোধ আর অভয়।

পেমা বললো, এটা কি, চশমা?

না, কমরেড, বায়নোকুলার, দূরের জিনিস দেখা যায়।

দেখি, দেখি। একজন যুবতীর মতো কৌতূহলে খুশিতে তরল হয়ে উঠলো পেমা।

এই দু'টো ফোকরে চোখ লাগিয়ে দেখো।

দূরের কিছু দেখবার জন্য পেমা বারান্দার ধারের প্যাবাপেটের কাছে উঠে গেলো। বায়নোকুলার চোখে লাগিয়ে বললো, নীচে ওদের রান্না স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কমরেড, তুমি কিছু শেখোনি। মেজর হো-হো করে হাসলো। সে উঠে গিয়ে পিছন থেকে বায়নোকুলারটাকে পেমার চোখের সামনে ধরে বললো, দেখতে পাচ্ছো?

পেমা উল্লসিত হয়ে উঠলো, বা, বা, ওরা ওখানে।

কি হলো, কারা? মেজর কমরেডের মতো সান্নিধ্যে এসে ঝুঁকে পড়ে বায়নোকুলারের মধ্যে দেখতে গেলো।

থেনডুপ, থেনডুপ। ওখানে গিয়াৎসোর গাছেব কাছে। ঝর-ঝর করে হেসে উঠলো পেমা।

থেনডুপ, মানে তোমার সেই বেমানান পুরুষ? তা সে ওখানে কেন? দেখি, দেখি। বায়নোকুলার নিজের হাতে নিয়ে তাতে চোখ রাখলো মেজর।

তার মুখে তখন বিচিত্র বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। ফিরে দাঁড়িয়ে সে পেমার মুখের দিকে চাইলো। এমনভাবে সে ইতিপূর্বে পেমাকে যেন দেখেনি। যেন তন্ন-তন্ন করে দেখছে। হঠাৎ যেন গলার কাছ থেকে ছলাৎ করে খানিকটা রক্ত উঠে কানের গোড়া পর্যন্ত লাল করে দিলো পেমার। সে তখন রান্নাঘরের দিকে ছুটে পালালো।

আর মেজর তখন বায়নোকুলার তুললো চোখে আবার। অনেকটা সময় ধরে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে দেখলো। তার মুখে নানারকমের ছায়া পড়তে লাগলো। তারপর সে সৈন্যদের ডেকে নিয়ে নীচুগলায় কি পরামর্শ করলো, কিছু নির্দেশ দিলো।

মেজর আবার বাড়ির মধ্যে চলে এলো। অদ্ভুত সেই নিস্তব্ধতাই আবার তার স্নায়ুকে স্পর্শ করলো, কিন্তু এবার সে স্পর্শ যেন তাকে চমকে চমকে দিলো। এটাই তো স্বাভাবিক। নিয়তই এই পৃথিবীতে একটা দ্বন্দ্ব থেকে যাবে। অথচ নিস্তব্ধতার মায়ায় যেন তাব স্নায়ুগুলো একে কবোষ্ণ স্থিতিশীলতায় ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। যেন জীবনের কোনো একটি মুহূর্তও নির্দ্বন্দ্ব হতে পারে। যেন থেনডুপ আর পেমা সাম্যকে প্রশংসা করেছে বলেই তাদের বিশ্বাস করা যায়। মেজর হাসলো মিটমিট করে। কেশে গলা সাফ করে সে হাঁকলো, এই শোনো।

পেমা বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে।

মেজর ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে, বললো, এই জুতোজোড়া কার? এই দামী চামড়ার নতুন রাইডিং বুট?

তুমি চাও, কমরেড? পেমা কোমল করে বললো, নাও, তুমি তা হলে।

এটা কার জানতে চাইছি। হাসির আড়ালে দাঁতগুলো একটু বা কিড়মিড় করলো মেজরের। এখানে আর কে থাকে?

আমি আর থেনডুপ।

অথচ এ জুতোজোড়া তোমার নয়, থেনডুপের তো নয়ই। আচ্ছা যাও। সতর্ক পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো মেজর। একটু পরেই সে আবার হাঁক দিলো এই শোনো, শুনে যাও।

সে যে নিজের আবিষ্কারে খুশি হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি? কারণ এই আবিষ্কার আর একবার পৃথিবীর সব কিছুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব প্রমাণিত করেছে। পরে এক সময়ে এ বিষয়ে সে তার ইউনিটের পোলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে কথা বলবে।

পেমা এবার একটু চিন্তিত মুখেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। কোথায় গেলো থেনডুপ।

মেজর বললো, তোমাদের বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র আছে? অবাক হয়ে গেলে? এই ধরো, এই রিভলবারের মতো ছোটো কিছু? মেজর বিড়বিড় করে বললো, এ মাগী বোধহয় জানে না বায়নোকুলারে আমি কি দেখেছি।

পেমা এবার হাসতে পারলো। বললো, না মেজর। কোদাল কাস্তে ছাড়া কোনো অস্ত্রই নেই।

আচ্ছা যাও।

কিন্তু ভাবলো মেজর ঃ চেহারায় যতই শক্তসমর্থ হোক মেয়েমানুষ বই তো নয়। ভয়ের কি আছে! যদিও সে বিশ্বাস করে অদ্বান্দ্বিক কাজ করেছিলো। অবশ্য শোবার ঘরটা দেখা হয়নি। ওদিকের নিস্তব্ধতা যদিও ভয়ের মতো স্নায়ুগুলোকে স্পর্শ করে। নিঃশব্দে পায়ে পায়ে মেজর শোবার ঘরে ঢুকে পড়লো।

ভাবলো সে, পোলিটিক্যাল অফিসারের এই তত্ত্বের কথাও মনে রাখতে হবে—এই দেশে যেখানে অর্ধেক পুরুষই সন্ন্যাসী হয়ে যায় আর অর্ধেকের বেশিই অনুর্বর পাহাড়, সেখানে জাতটা পুরানো হয়ে একেবারে মরে না গিয়ে থাকে যদি, তবে বুঝতে হবে এ দেশের রুক্ষ মাটিতে আর এই রকম সব কর্কশ চেহারার মেয়েমানুষদের মধ্যে উর্বরতা আর প্রাণশক্তি কোথাও লুকানো আছে। অর্থাৎ তা হলে মুক্তির পথে এরাই বাধা হবে।

বিছানা উলটে ফেলে খুঁজলো মেজর। হেঁট হয়ে চৌকির তলায় দেখলো। হঠাৎ তার চোখ পড়লো দেয়ালে। নিমেষে যেন তার স্নায়ুগুলো লোহার স্প্রিং-এর মতো ঝলকে উঠলো।

হাসিমুখে সে বেরিয়ে এলো। হ্যাঁ প্রমাণ হয়েছে! তাত্ত্বিক হিসাবে সে নাম করতে চায় না, কিন্তু তত্ত্বের সার্থকতার একটা প্রমাণ সে সংগ্রহ করেছে।

শোনো, এই মাগী শুনে যাও। হৃষ্ট কণ্ঠে হাঁক দিলো মেজর।

রান্নাঘর থেকে পেমা আবার বেরিয়ে এলো। হেসে বললো, তোমাকে বলতে পারি ও জুতো কার।

এখনই জানতে পারবো। তা হলে তোমাদের বাড়িতে অস্ত্র নেই, কোদাল-কাস্তে ছাড়া?

অন্য অস্ত্র দিয়ে আমরা কি করবো?

ডান হাত দিয়ে নিজের রিভলবারের মুঠোতে হাত রেখে বাঁ হাতে পেমার ব্লাউজের কলার চেপে ধরলো মেজর। টানতে টানতে নিয়ে গেলো শোবার ঘরে। দেয়ালের দিকে দেখিয়ে দিলো।

ওটা কি? কার ওটা?

মেজর ভাবলো ঃ বিশ্বাস মানেই স্থিতি, থেমে যাওয়া। আর থেমে যাওয়াটা সাম্য নয়। হাসিটা লক্ষ্য করেছিলো? হ্যাঁ এখানেই মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের প্রতিপক্ষ এই শক্ত চেহারার নারী। বলো ওই পিস্তল কার? মেজর ঘুরে দাঁড়ালো।

ভয়ে, লজ্জায়, টানাটানিতে পেমা বেদম হয়ে উঠেছিলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, ছাড়ো ছাড়ে। বলছি ওটা কার।

পেমা জোর করে ছাড়াবার চেষ্টা করলো, আর থেনডুপের সঙ্গে যাকে দেখলাম?

থেনডুপের সঙ্গে? কখন দেখলে?

তা হলে আছে একজন স্বীকার করছো?

কই, আমি—থতমত পেমা থেমে গেলো। ভাবলো সে থেনডুপ হঠাৎ 'পারিবারিক কারণ' বলে গেলোই বা কেন? সে কি সেই হতভাগা লামাটার খোঁজে গিয়েছে?

পেমার এই চিন্তা তার চোখে-মুখে দ্বিধা, আশঙ্কা গোপন করার ইচ্ছা হয়ে ফুটে উঠলো। একটা প্রতিরোধ সম্ভবত তার দেশের ঠাণ্ডা পাহাড়গুলোর ভাবলেশহীন নৈর্ব্যক্তিকতার ছাপ তার মুখে ফুটিয়ে তুললো।

কি, কথা বলছো না? অধীর মেজর বাঁ হাত দিয়ে ঘুসি মারলো পেমার চিবুকে। বলবে? বলবে?

টলতে টলতে পেমা সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু চৌকির পায়ায় পা রেখে সে কোণটাতেই ধপ্ করে বসে পড়লো।

ওঠ্, শয়তানী মাগী। মেজর ব্লাউজের সামনেটা ধরে টেনে তুললো পেমাকে। একজন অফিসার যখন কথা বলে, তখন পা ছড়িয়ে বিছানায় শোয়ার সময় নয়। ওঠ্, ওঠ্, বল, থেনডুপের সঙ্গে ওটা কে? কার জুতো ঘরে? ওটা কার পিস্তল? এই ইংরেজি মদের বোতল কার?

পেমা ভাবলো ঃ এটা কেমন ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না? থেনডুপ যা খুশি করুক তাতে ওর কি? এই সামান্য ওজনের লোকটা কি তাকে এমন করে ভয় দেখাবে, অপমান করবে?

পেমার পুরুষালি চোয়াল কঠিন হয়ে উঠলো।

আর মুক্তিফৌজের মেজর ভাবল ঃ এই শক্ত চেহারার মেয়েমানুষটার সঙ্গে একা একা মোকাবিলা করতে সে পারবে কি? মেয়েমানুষ নয় যেন মেয়েদৈত্য। আর তা হলে আক্রমণের প্রথম সুযোগটাই তার নিজের নেয়া উচিত। তখনই আবার ঘুঁষি মারলো মেজর, এবার পেমার নাকে।

ঘুঁষির ধাক্কা বিছানার উপরে ফেলে দিলো পেমাকে। চিৎ হয়ে পড়েছিলো সে, চৌকির রেলিংয়ে শব্দ করে মাথাটা ঠুকে গেলো। গলার মধ্যে ঘড়ঘড় করে উঠলো। নিমেষে সব কিছু যেন মুছে গেলো চোখের সামনে থেকে।

মেজর রিভলবার খুলে এগিয়ে গেলো। সে সে রাগে ক্ষেপে গেছে তা তার হাঁ-করা মুখ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। একটা কালো বিদ্যুৎ-শক্তি যেন অনুভব করলো সে। কঠোর উষর পাহাড়ের নিভৃতে এই দেশের যে প্রাণশক্তি তাকে যেন অনুভব করা যাচ্ছে। কলঙ্কিত করাই এ জাতির প্রাণশক্তিকে আঘাত করার সব চাইতে সহজ উপায়।

আবার যেন পেমার ভারী দেহটাকে টেনে তুলতে গেলো সে, কিন্তু তখনই হয়তো পেমার উজ্জ্বল ত্বক চোখে পড়লো তার, কিম্বা পেমার ছড়ানো পা দু'খানা। তীব্র কালো অন্ধ আক্রোশে মেজরের তত্ত্ব আর অনুভূতি এক হয়ে গেলো, আর তখন তার দু'হাতের নৃশংসতায় পেমার পেটিকোট ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো।

ঘরটা অন্ধকার বোধ হলো পেমার। ক্লান্তি, ব্যথা, সে কি অসুস্থ? কবে অসুস্থ হলো সে?- হাতটা তুলে বুকের উপর রাখলো সে। সে কি এতক্ষণ একটা কুকুরের স্বপ্ন দেখছিলো? ঠিক যেন শুয়োরকে কামড়াচ্ছিলো কুকুর। ক্যাঁ-ক্যাঁ করে যেন কে চেঁচাচ্ছিলো। তারপর সব যেন ভয়ে আর বোধ হয় নেশাতেও আচ্ছা অসাড় হয়ে গিয়েছিলো। সেই ইংরেজি ভিস্কির বোতল খালি করার পর যেমন হয়েছিলো। কিন্তু কুকুর? হঠাৎ মনে পড়লো একটা হাঁ-করা কুকুর যেন তার গলায় কামড়াতে চাচ্ছিলো আর আচ্ছন্ন হওয়ার আগে সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলো। তার মুখেও যেন কুকুরটার লালা লেগে আছে। হাত দিয়ে মুখের লালা মুছতে গিয়ে উহু উহু করে উঠলো পেমা। হাতটাকে চোখের সামনে আনলো সে। রক্ত? তখন একমুহূর্তে যেন ঘোরটা কেটে গেলো। রক্ত, তার রক্ত? বিছানা থেকে এক ঝটকায় ধনুকের বাঁশের মতো উঠে পড়লো সে। নিজের জামা পেটিকোটের দিকে চেয়ে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। কিন্তু এবার? প্রথম কাজ নিশ্চয়ই এসব বদলে নেয়া। জামা বদলাতে বদলাতে হঠাৎ তার হাত থেমে গেলো। তারপর? তারপর, তারপর? দরজা খুলে বাইরে যেতে হবে তো? আর তা কি এর পরে পাওয়া যায়? তাই তো। রান্না চড়ানো আছে। কিন্তু—। এখন থেনডুপকে দরকার। তার সঙ্গেই পরামর্শ করা দরকার। থেনডুপ, কোথায় গেলো থেনডুপ? তাকেও কি কুকুর—

পোশাক বদলে দৃঢ় পায়ে পেমা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলো। হ্যাঁ, তার পা দু'খানা যথেষ্ট দৃঢ়। বৃথাই সে দু'মণ জল আধ মাইল তুলে আনে না। এবার একটু সতর্ক হতে হবে। চৌকির পায়ায় পা বাধলে চলবে না। আর নিজের বাড়িতে সে কুকুরের কামড় সহ্য করে? আবার চিবুকে হাত ছোয়ালো সে। হাতের তেলোয় আবার রক্ত লেগে গেলো। কঠোর কঠোর কঠোর হয়ে উঠলো পেমার চোয়াল। আচ্ছা, তখন কেন বুদ্ধি এলো না। পেমা দরজাটাকে একটু ফাঁক করে দেখলো। তখন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিলো না? সব যেন হঠাৎ নিবে গিয়েছিলো, তারপর তার মনে হলো সে যেন শরীর ছেড়ে অন্য কোথাও। যেন দেখতে পাচ্ছিলো একটা কুকুর হাঁ করে তাকে কামড়াতে গিয়ে লালায় তার মুখ ভিজিয়ে দিচ্ছে; আর তার গলার মধ্যে অব্যক্ত কান্নায় কে যেন কাঁদছে। যেমন দড়িতে বাঁধা অসহায় শূকরী করতে পারে। আর তা সবই যেন পাশে থেকে সে দেখছে নিজে।

দরজার বাইরে পা দিয়েই সে থমকে দাঁড়ালো। সে কি সেই প্রবাদ? উত্তুরে কুকুর আর চিল্লানি শূকরী।...

রান্নাঘরের পরিচিত গন্ধ এলো নাকি। দুই ফুসফুস ভরে সে নিঃশ্বাস নিলো। তাতে তার সবল পুষ্ট দেহের শিরাগুলো যেন স্ফীত হয়ে উঠলো। না, এসব প্রবাদ সে মানে না। ছাই। কিন্তু এখন থেনডুপকে দরকার। উত্তুরে ভাষার কথাই ধরো, সে নিজে বারবার পড়েও কিছু বোঝে না; রসুনের কথা ছাড়া আর কিছু কি বুঝেছে? থেনডুপ পড়তে পারে না, কিন্তু শোনামাত্রই বোঝে। থেনডুপকেই দরকার।

শয়তান। হঠাৎ কথাটা মনে হলো পেমার। শয়তান। উত্তুরে কুত্তা। সেই লামাটা বলেছিলো। তার মনের মধ্যে কি যেন একটা রাগ গোঁ-গোঁ করে উঠলো। রান্নাঘরের কপাট ধরে দাঁড়িয়ে সে দম নিতে লাগলো। আর সতর্ক হয়ে রইলো। আবার?

কিন্তু আশ্চর্য, একেবারে নিঃশব্দ। চলে গেলো নাকি? কেন? লজ্জায়? থু থু। পেমা আস্তে আস্তে সারা বাড়িটাই ঘুরে এলো। তার সরাইখানার মতো বাড়িটা একেবারেই নিঃশব্দ। এমনকি যারা রান্না করছিলা অ্যাপ্রিকট গাছটার নীচে—না সেখানে এখনো একজন আছে বটে।

কি করতে পেরেছো? উত্তুরে কুকুর? কি করতে পারে? ভেবেছিলো পেমার এই ছ'ফুট শরীরটা থেতলে যাবে। আর থেনডুপের কথা বলে দেবে সে। কিন্তু কোথায় গেলো থেনডুপ? বরং সাবধান করে দিয়েছে। এবার আর জাপটে ধরতে সঙ্কোচ থাকবে না। গলা টিপে ধরবো দু'হাতে। শয়তান।

এরা কি শয়তান সকলেই?

আশ্চর্য। শয়তান আর মিথ্যেবাদী। সেই ইংরেজদের বাণিজ্য-গোয়েন্দার কথা ভাবো। অথচ কে ভেবেছিলো অমন সুন্দর চেহারাটা একটা মিথ্যা?

পেমার কি সাবধান হওয়া উচিত ছিলো না? সেই বায়নোকুলা দেখার সময়েই। সেটাকে হঠাৎ মনে না করলে, তুমি সতর্ক হতে। আর কথায় কথায় সে লাল হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু মিথ্যা কি ধরা যায়? গিয়াৎসোর স্ত্রীও বুধগয়ার জল মনে করেছিলো ইংরেজ চোলাইকে।

কিন্তু থেনডুপ কোথায়? থেনডুপের সঙ্গে ও কাকে দেখেছে? সত্যি কাউকে দেখেছিলো? তা হলে সেই হতভাগা লামাটাই। পেমা বারান্দা থেকে ঘরে এলো। হঠাৎ তার মনে পড়লো মেজর যখন তাকে দ্বিতীয়বার ডেকেছিলো তখন বেরোতে গিয়ে দরজার পাশে ঝোলানো নোনা মাংসের বড়ো চাংড়াটাকে দেখতে পায়নি বটে। তখনই ভাবতে গিয়ে কারণটাকে প্রায় ধরে ফেলেছিলো সে। পেমা রান্নাঘরে এলো। ঠিক তাই। রসুনের সেই দ্বিতীয় থোবাটা নেই। আর এই দেখো ছোটো হাঁড়িটাও দেখা যাচ্ছে না।

তা হলে থেনডুপ তাই করেছে? পেমার মনে পড়লো বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে থেনডুপ যখন বাড়ির মধ্যে এসেছিলো তখন সে বিড়বিড় করে রান্না আর খাওয়ার কি তুলনা দিচ্ছিলো। বলেছিলো যেন ঃ রাঁধছো তো কিন্তু তাতেই তো সকলের খাওয়া হলো না। তা হলে থেনডুপ কি সেই লামাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে গিয়েছে? অন্য সময় হলে পেমা থেনডুপের এই কথাগুলোকে কি আর কানে তুলতো না? কিন্তু সাম্যের এই উজ্জ্বল অফিসারের সান্নিধ্যে তার মনে যে কলরব উঠেছিলো তা অন্য সব ভাষাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলো।

বারান্দায় ফিরে এসে পেমা প্যারাপেটের উপর দিয়ে বাচ্চা চমরীকে দেখতে চেষ্টা করলো।

দিনের আলো এখন ম্লান হয়ে আসছে। সাইমিয়া গাছটার পল্লবগুলোকে নীলের বদলে কালো দেখাচ্ছে। থেনডুপকে ওখানেই বায়নোকুলারে দেখেছিলো পেমা। আর মেজরও দেখেছিলো; তার সঙ্গে কি লামাকেও।

ওদিকেই এখন যাওয়া দরকার। সারাদিন ওরা রেডিওতে বলেছে—লামাদের সাহায্য করলে বিপদ হবে। বিশেষ করে এই হয়তে সেই লামা, যে দু'জন অফিসার আর পঁচিশজন হান্ সৈন্যকে হত্যা করেছে। তাই কি? তা কি হতে পারে?

পেমা জলের হাঁড়ির কাছে গেলো। জল তুলে তুলে চিবুকের রক্ত ধুয়ে ফেললো। কপালে জল দিলো কি না দিলো, মাথায় একটা রুমাল বেঁধে নিলো।

পেমা বাইরের বারান্দা পর্যন্ত এসে সিঁড়ির উপরে বসলো। একটু ভেবে নেয়া দরকার। এখন একেবারে শান্ত হওয়া ভালো। থেনডুপ যেমন কখনো কখনো শান্ত হয়ে যায়। গাছটা আবার চোখে পড়লো। ওই সাইমিয়াটাকে—সোজা কথাতেই বলা যাক—এ পরিবার গিয়াৎসো মনে করে। তা হয় না। মানুষ থেকেই মানুষ জন্মাতে পারে, গাছের বীজ, থেকে গাছ। ওটা একটা বাজে গল্প যে গিয়াৎসো গাছ হয়ে আছে। আর লোকনাথ যাই বলে থাক না কেন, কোথায় ভালো পশম পাওয়া যায় সে তার খোঁজই করতো। সে জন্যই এসেছিলো এইদেশে।

হঠাৎ যেন মনকে অভ্যস্ত চিন্তার খাতে এনে ফেললো পেমা। দ্রুত সুসংবদ্ধ চিন্তা করে যেতে লাগলো সে ঃ গিয়াৎসো গাছ নয়। গিয়াৎসো কি রকম তা বোঝা যায়। স্ত্রীর কাছে পশমের কথা, ইংরেজি মদের কথা জানতে পেরেও লোকনাথকে সে ক্ষমা করছিল। বিচারের সময়ে লোকনাথের খোঁজ করেছিলো শহরের লামারা। বলেছিলো তাকে ধরিয়ে দিলে তারা দু'ভাই হয়তো মাপ পাবে। গিয়াৎসো বলেনি। বললে লোকনাথ 'মরুকগে যাক' বলে এদেশ থেকে সে চলে যেতে পারতো না। কিন্তু গিয়াৎসো গাছ না হলেও, কোনো মানুষকে যদি গাছ হতে হয়, তবে গিয়াৎসোর পক্ষেই তা সম্ভব। আর থেনডুপ যেন গিয়াৎসোর মতোই। না হলে সেই বিচারককে হাতে পেয়েও—পেমাকে একবার চা করতে, একবার গাড়ি দেখতে দূরে সরিয়ে কি কথা হচ্ছিলো তা কি পেমা শোনেনি?—হাতে পেয়েও থেনডুপ তাকে পালানোর উপায় বলে দেয়? খাওয়ানোর জন্য জীবন বিপন্ন করে? গিয়াৎসোর মতোই, কিম্বা, আর কে এমন গিয়াৎসোর কাছাকাছি? আর গিয়াৎসোর গাছ হওয়ার গল্পের মূলেই সেই মিথ্যাবাদী ইংরেজের চর। অবাক কাণ্ড, চমরীর দুর্গন্ধ সারে যেমন রসালো রসুনগুলো জন্মায়; সেই নাকি আবার মনে করিয়ে দিয়েছিলো ভগবান বুদ্ধের বাণী আর তা যেমন তাঁর মুখ থেকে প্রথম বেরিয়েছিলো। লোকনাথায়....অমিতকারুণ্যে...। পেমা উঠে দাঁড়ালো। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো। অ্যাপ্রিকট গাছটার পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেলো। সে অনুভব করলো মেজর আর তার পাঁচজন সৈন্য নিশ্চয়ই থেনডুপকে খুঁজতে গিয়েছে। বেশ খানিকটা আগেই রওনা হয়েছে তারা। ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়ালো পেমা। চিন্তা করে নিলো এদিক-ওদিক চেয়ে। গাড়ি করেই গেছে তারা। পাহাড়ি অসমান পথে গাড়ি খুব ছুটবে না, তা হলেও নীচের সড়ক থেকে এখানে উঠতে যখন পেরেছিলো, তখন বাচ্চা চমরীর জিভ পর্যন্ত বেশ উঠবে। অন্তত মানুষের চাইতে তাড়াতাড়ি। না, পাকদণ্ডির পথে গেলে হবে না। খাড়াই বেয়ে খাদ টপকে সোজা উঠতে হবে চমরীর জিভে। ওদের আগেই পৌঁছানো, চাই যদি থেনডুপকে সাহায্য করতে হয়।

পেমার সামনে একটা বড়ো খাড়া পাথর। লাফিয়ে উঠে পেমা পাথরটার মাথা ধরলো।

জিমন্যাস্টের মতো কৌশলে শরীরটাকে টেনে তুললো। খানিকটা ছুটে চললো সে পাথর টপকে টপকে। এ পথটা একেবারে অজানা নয় পেমার, যদিও কেউ চলে না। এখন একটু হাঁপাতে হচ্ছে তাকে, কিন্তু অনেকটা দূরে উঠে পড়েছে সে। হয়তো একসময়ে, ধরো অতীশের সময়ে, এই খাড়াই—এটাই পথ ছিলো, পরে ভেঙে গিয়েছে।

থেনডুপকে বলতে হবে, সবই বলতে হবে। গিয়াৎসোর স্ত্রী যেমন লোকনাথের পশমের খোঁজখবর নেয়ার কথা, আর বুধগয়ার জলের রহস্য স্বামীকে বলে দিয়েছিলো। কিন্তু থেনডুপ কি—? মেজরকে ক্ষমা করা যাবে? কি করা উচিত?

এখন সে একটু হাঁপাচ্ছে কিন্তু তা তো এই পাহাড়ে ওঠার পরিশ্রমেই। চিবুকটা একটু কেটেছে বটে, কিন্তু তার কথা এতক্ষণ মনেও ছিলো না। পরিশ্রমেই সে হাঁপাচ্ছে। গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। নতুবা কি ক্ষতি করতে পারে হান্ মেজর?

পেমার মনের মধ্যেই কে যেন কোথা থেকে বলে উঠলো ঃ তুমি শরীরকেই এতদিন বিশ্বাস করে এসেছো, তাই নয়? ইতিপূর্বে তুমি মেজরকে দেখে নিজের সন্তানের অভাব অনুভব করোনি? তাই যদি—হঠাৎ লজ্জায় যেন ভেঙে পড়লো পেমা, আর যেন চলতে পারবে না।

সেই শয়তান হান্ মেজর নিশ্চয়ই জানবে না। কিন্তু থেনডুপ? থেনডুপ কাউকেও বিদ্বেষ করে না এটা তার সম্বন্ধে নতুন কথা নয়। কিন্তু—পেমা চিন্তাটাকে ছাড়িয়ে উঠবার জন্যে প্রাণপণে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলো। কখনো লাফিয়ে, কখনো কখনো হাতে পায়ে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু যদি থেনডুপ ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করে, তোমার এই পাহাড় জয় করা দৈত্যের মতো শক্তি তখন কোথায় ছিলো?

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পেমা বলতে লাগলো, কৃপা করো, থেনডুপ, কৃপা করো থেনডুপ।

আরও কয়েক ধাপ এমন করে উঠতে পারলেই সে পৌঁছে যাবে। গিয়াৎসোর মতো থেনডুপ নতুন করে অবিদ্বেষ আর অভয়কে অভ্যর্থনা করতে চেয়েছিলো। আর থেনডুপেরই আজ বিপদ। কি হবে? কে জানে?

পেমা বললো স্বগতোক্তির মতো ঃ থেনডুপ, বিশ্বাস করো, আমি তখন কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। সে কান্না আমার নিজেরই। কিন্তু যে কাঁদছিলো সে ছাড়াও আর একটা আমি যেন কোথা থেকে জুটে গেলো।

সব শুনে থেনডুপ হয়তো বিড়বিড় করে বলবে, বিদ্বেষ করো না, ভয় আর বিদ্বেষ একই। থেনডুপ তো চমরীকেও তেমন করে অভয় দেয়।

কিন্তু থেনডুপ, বলো, তুমি কি এরপরেও সাম্যকে বিশ্বাস করবে? না কি বলবে বরফের ঠাণ্ডায় কষ্ট হয়, বরফ না থাকলে মরুভূমি। কিম্বা মিথ্যাবাদীরাও সত্যকে বয়ে আনতে পারে? তুমি কি বলবে সাম্যই অবিদ্বেষ?

ওই তো ওদের দেখা যাচ্ছে। হান্ সৈন্যরা সবাই চমরীর জিভেই জুটেছে দেখো। একটা বড়ো পাথর ধরে ঝুলে ঝুলে অবশেষে পেমা নিজেকে টেনে তুললো তার ওপরে। এখন সে শুধু হাঁপাচ্ছেই না। ঝুলতে ঝুলতে হাতে আঙুলগুলো অবশ হয়ে খুলে যাচ্ছিলো প্রায় খাদটার ওপরেই।

আর তাকে লোকনাথ কিম্বা যাই বলো, দধিকর্ণ যার খচ্চরের নাম, সে ইংরেজদের গোয়েন্দাই ছিলো, অথচ পশমের দালাল যদি নরম করে বলো। যে নাকি খচ্চরের বিড়ালের

নাম দিতে পারে সেও তথাগতের কথা বয়ে আনে—বিদ্বেষ না থাকলে ভয়ও থাকে না। আর সেই মন্ত্রে ভয় চলে গেলে একজন মানুষ পঁচিশ বছর জেলখানার গুমটিতে একা-একা বেঁচে থাকতে পারে, শরীর শুকিয়ে গেলেও মনের মধ্যে সোনালি ফুল ফোটে। আশ্চর্য, তুমি কি করে তা পারলে থেনডুপ, ভয়কে এমন জয় করতে? বিচারককেও আর বিদ্বেষ করলে না? যদিও তুমি জানতে লোকনাথ হয়তো ইংরেজের গোয়েন্দাই ছিলো আর এদেশ ছাড়বার সময় সে—হয়তো 'মরুকগে যাক' বলেই—তার পিস্তলের চোঙ এদিকের আকাশের দিকে খালি করে দিয়েছিলো। মিথ্যাবাদীরাও, খুনীরাও সত্যকে বয়ে আনতে পারে? অথবা কথাটাই মূল্যবান? কারণ মুখ জিভ দাঁত শব্দ তৈরি করলেও তারা কেউই—তারা কেউই শব্দ নয়। লোকনাথ—অমিতকারুণ্যে লোকনাথায় অমিতাভায় অমিতকারুণ্যে—

ও কি! আহা! ও কি, আহা, আহা, পেমা আর্তনাদ করে উঠলো।

থেনডুপকে বেঁধেছে ওরা গিয়াৎসোর সাইমিয়া গাছটার সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে। আর সেই লামাটাকেও। সেও ধরা পড়েছে। থেনডুপের বাঁধা শরীর টেনে তুলে সোজা করে গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধেছে। আ, দেখো, কতটা লম্বা শরীর থেনডুপের। আহা, ওর বাঁকানো জমাট ধরা কোমর কি এই শক্ত বাঁধনের চাপ সইতে পারে? আহা আহা।

হান্ সৈন্যরা উঠে দাঁড়ালো, তারপর মার্চ করে ফিরে চললো তাদের মোটরের দিকে।

চমরীর জিভে রক্ত গড়াচ্ছে আবার। আর সাইমিয়া গাছটার ফুল পাতা সমেত কত ডালপালা ভেঙে পড়েছে। এবারেও দু'জন। তাদের একজন অন্তত স্বদেশকে ভালোবেসেছিলো। আর থেনডুপ, আহা, গাছটার সঙ্গে কি ভয়ঙ্কর চেপে ওকে বেঁধেছে, দেখো এখন মাথাটা আবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। থেনডুপ তুমি কি আদৌ ভয় পেতে জানতে না? কি করে তোমার বিচারককে বিদ্বেষ না করে নির্ভয় হলে!

আর সবই যেন সে পুরানো গিয়াৎসোর গল্প।

থে-ন-ডু-প। আ-আ-হা-আ-আ। আর্তনাদ করে উঠলো পেমা।

বিদ্বেষ না থাকলে ভয় থাকে না, বিদ্বেষই ভয়। আর অবিদ্বেষই সাম্য। কেউ যদি বিড়বিড় করে বলছে। অথবা মৃদুকণ্ঠের নরম কথা কেউ যদি একবার শোনে বাতাসের মৃদু মর্মরে, বারবার তা শুনতে পাবে।

সেই দধিকর্ণের সোয়ারে শুরু আর হান্ মেজরে শেষ। স্কাউড্রেল, যদি তা বলো। কিন্তু এবারেও কি কেউ গাছ হয়ে উঠবে? গোলাপি ফুলের মধ্যে কেউ সোনালি ফুলের একটা স্তবক দেখতে পাবে? যেভাবে গাছটা ভেঙেছে তার পরেও? কিম্বা এটাই হয়তো দু'টো গল্পের তফাৎ হয়ে থাকবে।

অথবা এ বিষয়ে কে বলতে পারে—

গন্ধরাজ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রেললাইন ছাড়িয়ে কতদূর ময়ূরাক্ষী? আরও কত দূরে?

কাঁকর-ছড়ানো মাটি। অসুর-মুণ্ডের মতো ছোটো-বড়ো টিবি ছড়িয়ে আছে আচক্রবাল। যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনো এক রণক্ষেত্রের স্মরণ-চিহ্ন এই মাঠ। কোনো কোনো টিবির ওপরে লক্ষ্মীছাড়া চেহারার এক আধটা খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে। হাঁপানি রোগীর গলায় অতিকায় মাদুলির মতো এক একটা হাঁড়ি ঝুলছে কোনো-কোনোটাতে। রুক্ষ মাটির যা শ্রী—এক ফোঁটাও রস গড়ায় বলে মনে হয় না।

ক্যান্‌ভাসার শ্রীসুধাংশু চক্রবর্তী, হাল সাকিন বারোর সাত ছকু খানসামা লেন, জিলা কলকাতা—একবার থমকে দাঁড়াল। এ জেলায় এই তার প্রথম আবির্ভাব। শুনেছিল ময়ূরাক্ষী পার হয়ে—একটা শাল-পলাশের বন ছাড়ালেই ব্রজপুর গ্রাম। ময়ূরাক্ষী নদী, শাল-পলাশের বন, গ্রামের নাম ব্রজপুর। তিনটে একসঙ্গে মিলে মনের মধ্যে একটা কল্পলোক গড়ে উঠেছিল দস্তুরমতো। সুধাংশু চক্রবর্তী কল্পনাতে আরও খানিক জুড়ে নিয়েছিল এদের সঙ্গে সঙ্গে। হোক শীতকাল, থাকুক চারদিকে শস্যহীন মৃত্যুপাণ্ডুতা—তবু ব্রজপুর এদের চাইতে অনেকখানি আলাদাই হবে নিশ্চয়। তার গাছে গাছে কোকিল ডাকতে থাকবে, ফুলের গন্ধ বয়ে বেড়াবে বাতাস, তার মাঠে মাঠে শ্যামলী ইত্যাদি ধেনুরা চরে বেড়াবে। বেণু বাজবে এবং সন্ধ্যে হলেই শ্বেতচন্দন ঘষা একখানি পাটার মতো পূর্ণচাঁদ উঠে আসবে আকাশে।

কিন্তু কোথায় কী।

আপাতত মাঠ আর মাঠ। দেড় বছরের পুরনো জুতোটা নতুন জুতোর মতো মচ্ মচ্ আওয়াজ করছে তলার কঠিন কাঁকরে। এদিকে কি ডালভাঙা ক্রোশ? তিন মাইল পথ যে আর ফুরোয় না।

সামনেই ছোটো খাল একটা। রাস্তাটা তার মধ্যে গিয়ে নেমে পড়েছে অনেকখানি ঢালুতে। হোক মরা খাল—তবু তো এতক্ষণে জলের দেখা পাওয়া গেল। মনে হচ্ছিল, সে বুঝি বোখারা-সমরখন্দের কোনও মরুভূমির ভেতর দিয়ে পথ হাঁটছে।

একটা গরুর গাড়ি ছপ্‌ছপিয়ে উঠে এল খাল পেরিয়ে। চাকা থেকে তরল কাদা গলে গলে পড়ছে তার। গাড়োয়ান সাঁওতাল। খোলা ছইয়ের ভেতরে রুপোর হাঁসুলিপরা একটি কালো মেয়ে বসে আছে—নিবিড় চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে সে তাকাল সুধাংশুর দিকে। এক ফালি জলের সঙ্গে একটি তরল দৃষ্টি যেন সুধাংশুর সারা শরীরটাকে জুড়িয়ে দিলে।

—ভাই, ময়ূরাক্ষী কতদূর?

গাড়ির ভেতরে মেয়েটি হেসে উঠল। গাড়োয়ান আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে দেখল সুধাংশুর। বিদেশি।

বললে, এটাই তো ময়ূরাক্ষী নদী।

—অ্যাঁ! এই নদী!

কয়েক বছর আগে যে সুধাংশু চক্রবর্তী বাস করত মেঘনা নদীর ধারে এবং অধুনা বাস্তুহারা হয়ে সে বারোর সাত ছকু খানসামা লেনে বাসা বেঁধেছে, তার পক্ষে এটা শোনবার মতো খবর বটে। নদী এর নাম। এবং কাব্য করে একেই বলা হয় ময়ূরাক্ষী।

কিন্তু বিস্ময়টা ঘোষণা করে শোনাবার মতো কাছাকাছি কেউ ছিল না। গরুর গাড়িটা ততক্ষণে বাঁধের মতো উঁচু রাস্তাটার ওপরে উঠে গেছে—শুধু খোলা ছইয়ের মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে সাঁওতাল মেয়েটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে এখনও।

আপাতত নদী পার হতে হচ্ছে তা হলে।

খেয়া পাড়ি দেবার সমস্যা নেই—সাঁতারও দিতে হবে না। এক হাতে জুতো, আর এক হাতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে ধরলেই চলবে। সুধাংশুও তাই করল। পায়ের তলায় কিছু দলিত শ্যাওলা, ভাঙা ঝিনুকের টুকরো আর এঁটেল কাদা অতিক্রম করে সে ওপারে পৌঁছল। জুতোটা একরকম করে পরা গেল বটে, তবে পায়ের গোড়ালিতে আঠার মতো চটচট করতে লাগল।

নদী তো মিটল। এবারে শাল-পলাশের বন?

সেও কাছাকাছিই ছিল, কিন্তু এর নাম বন? গোটা কয়েক মাঝারি ধরনের গাছ দাঁড়িয়ে আছে জড়াজড়ি করে। সুসঙ্গের পাহাড়ে-দেখা নিবিড় মেঘবর্ণ অরণ্য স্বপ্নের মতো ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে। এটা পার হলেই ব্রজপুর। সুধাংশুর কল্পনা ফিকে হতে শুরু করেছে।

ব্রজধামই বটে, তবে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পরে।

লাল মাটির দেওয়াল—কিংবা টিনের চাল। খান দুই নোনাধরা দালান। একটা প্রকাণ্ড বটগাছের চারিদিকে অজস্র পোড়া মাটির ছোটো ছোটো ঘোড়া। ও জিনিসটা সুধাংশু আগেই চিনেছে—ধর্মঠাকুরের ঘোড়া এগুলো।

কিন্তু ঘোড়া জ্যান্তই হোক আর মাটিরই হোক সে কখনও কথা কয় না এবং যুগের মাহাত্ম্যে ধর্মঠাকুর সম্প্রতি নির্বাক। পতিতপাবনী এম-ই স্কুলের হেড্‌মাস্টার নিশাকর সামন্তের হদিশটা পাওয়া যাবে কার কাছ থেকে? কাছাকাছি কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। দুপুরের রোদে গ্রামটা ঘুমিয়ে আছে যেন।

আরও দু পা এগোতেই একটি ছোটো দোকান।

তোলা উনুনে খোলা চাপিয়ে একটি লোক খই ভাজছে। বাঁশের খুন্তি দিয়ে নাড়ছে গরম বালি। পট্-পট্ করে ধান ফুটছে—মল্লিকা ফুলের মতো শুভ্র খইয়ের দল খোলা থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ছে চারপাশে।

সুধাংশু তাকেই নিবেদন করল প্রশ্নটা।

—স্কুল? —দু তিনটে বিদ্রোহী খইয়ের আঘাতে মুখখানেক বিকৃত করে লোকটা বললে, এগিয়ে যান সামনে। লাল রঙের বাড়ি। ওপরে টিনের চাল। বাঁক ঘুরলেই দেখতে পাবেন।

এ বাঁকটা আর ডালভাঙা ক্রোশ নয়—কাছাকাছিই ছিল এবং টিনের চালওয়ালা লাল রঙের বাড়িটাও আর বিশ্বাসঘাতকতা করল না। আশায়-আনন্দে উৎসুক পা চালিয়ে দিলে সুধাংশু। 'দি গ্রেট ইন্ডিয়ান পাবলিশিং কোম্পানির' মালিক অক্ষয়বাবু আগেই চিঠি দিয়েছেন নিশাকর সামন্তকে। দু'জনে কীরকম একটা বন্ধুত্ব আছে। নিশাকর সামন্ত তাঁর ওখানে সুধাংশুকে আশ্রয় দেবেন এবং তাঁরই বাড়িতে দিন চারেক থেকে আশেপাশের স্কুলগুলোতে বইয়ের ক্যান্‌ভাস

করবে সুধাংশু। স্কুলের দর্শন পেয়ে তাই স্বভাবতই প্রসন্ন হয়ে উঠল মনটা। অর্থাৎ থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে, কিছু খাদ্য জুটবে এবং হাত-পা ছড়িয়ে আরামে ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে ঘণ্টা কয়েক।

স্কুলে টিফিন পিরিয়ড চলছে খুব সম্ভব। বাইরে দাপাদাপি করছে একদল ছোটো ছোটো ছেলে। একটা টিনের সাইনবোর্ড কাত হয়ে ঝুলছে স্কুলের নাম। পিটা মুছে গেছে—মনে হচ্ছে অতীতপাবনী।

জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে যাওয়া বারান্দাটা পার হয়ে সুধাংশু এসে ঢুকল টিচার্স-রুমে। খান কয়েক কাঠের চেয়ার—মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল। কাচভাঙা আলমারিতে ছেঁড়া-খোঁড়া খান ত্রিশেক বই, র‍্যাকে সাজানো গোটা কয়েক ম্যাপ। আলমারির মাথা থেকে তিন-চারখানা বেতের ডগা উঁকি মারছে। আর এই দীনতার ভেতরে সম্পূর্ণ বেমানানভাবে শোভা পাচ্ছে দেওয়ালে একটি সুহাসিনী সুন্দরী মহিলার মস্ত একখানা অয়েলপেইন্টিং। খুব সম্ভব উনিই পতিতপাবনী।

ঘরে পা দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুধাংশু। কলাইকরা বড়ো একখানা থালায় একটি লোক তেল আর চিনে বাদাম দিয়ে মুড়ি মাখছে প্রাণপণে। খুব সম্ভব দপ্তরী। ছ'জোড়া চোখ লোলুপভাবে তাকিয়ে আছে তার হাতের দিকে। টিফিনের ব্যবস্থা।

সুধাংশু একবার গলা খাঁকারি দিলে।

ছ'জন মানুষ একসঙ্গে ফিরে তাকালেন। শীর্ণকান্তি জীর্ণদেহ ছ'টি খাঁটি স্কুল-মাস্টার আসন্ন টিফিনের ব্যাপারে ব্যাঘাত পড়ায় স্পষ্ট অপ্রীতি ফুটে উঠেছে তাঁদের চোখে।

সমবেত ছ'জনের উদ্দেশ্যেই কপালে হাতটা ঠেকাল সুধাংশু। তারপর বললে, নমস্কার। আমি কলকাতা থেকে আসছি।

ততক্ষণে তার কাঁধে কলেজ-স্কোয়ারের স্ফীতোদর ছিটের ঝোলাটি চোখে পড়েছে সকলের। একজন চশমাটা নাকের নীচের দিকে ঠেলে নামালেন খানিকটা। বিরসমুখে বললেন, বইয়ের এজেন্ট তো?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বসুন একটু।

একটা খালি টিনের চেয়ার ছিল একটেরেয়। সুধাংশু বসতেই ঠক-ঠক করে দুলে উঠল বারকয়েক। একটা পায়া একটু ছোটো আছে খুব সম্ভব।

—আমি নিশাকরবাবুর কাছে এসেছিলাম—কলাইকরা থালায় মুড়ি মাখবার শব্দটা সুধাংশুর অস্বস্তিকর মনে হতে লাগল।

—হেড্‌মাস্টারমশাই?—প্রথম সম্ভাষণ যিনি করেছিলেন, তিনিই বললেন, তিনি তিন মাসের ছুটিতে দেশে আছেন। তাঁর খুড়িমা মারা গেছেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি সেরে তারপর বিষয়-সম্পত্তির কী সব ঝামেলা মিটিয়ে তবে ফিরে আসবেন।

চমকে উঠল সুধাংশু। ঢোক গিলল একটা।

—দিন চারেক আগে আমাদের পাবলিশার অক্ষয়বাবু তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন—

একটা [illegible] করে খানিক মুড়ি নিজের দিকে টেনে নিয়ে আর একজন বললেন, সেটা নিশ্চয় রি-ডাইরেক্টেড হয়ে সাঁইথিয়ায় চলে গেছে—আপনি ভাববেন না।

না, ভাবনার আর কী আছে। মুড়ি চিবোনোর শব্দে সুধাংশু আবার ঢোক গিলল। মধ্য দুপুরের তীব্র ক্ষুধা এতক্ষণে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠেছে তার। নিশাকরবাবুর বাড়িতে থাকার এবং খাওয়ার কথা লিখেছিলেন অক্ষয়বাবু—এই দুপুরেও অন্তত দুটি ভাতের একটা নিশ্চিন্ত আশা মনের মধ্যে জেগেছিল তার। সুধাংশু এতক্ষণে বাস্তবভাবে অনুভব করল—ব্রজপুর সত্যিই অন্ধকার। তার কানু মথুরায় নয়—সাঁইথিয়ায় বিদায় নিয়েছেন।

কিছু ভাবতে না পারার আচ্ছন্নতায় সুধাংশু ঝিম ধরে বসে রইল কতক্ষণ। কী অদ্ভুত লোলুপভাবে যে মুড়ি খাচ্ছে লোকগুলো। একজন আবার টুকটুকে একটা পাকা লঙ্কায় কামড় দিচ্ছে—সুধাংশুর শুকনো জিভের আগায় খানিকটা লালা ঘনিয়ে এল। রিফ্লেক্স্ অ্যাক্শন। আঃ—অত শব্দ করে অমনভাবে চিবোচ্ছে কেন ওরা? ওদের খাওয়া কি শেষ হবে না কখনও?

আর থাকা যায় না। ওই একটানা শব্দটা অসহ্য।

—বই দেখবেন না?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ নিশ্চয়। —তিন চারজন ঘাড় ফেরালেন। মুড়ির পাত্রগুলো শূন্য হয়ে যাচ্ছে দ্রুতবেগে। দু'জন উঠে গেলেন হাত ধুতে।

—এই দেখুন—মুড়ি ছড়ানো টেবিলটার ওপরেই একরাশ বই ছড়িয়ে দিলে সুধাংশু।

—ওঃ! গ্রেট ইন্ডিয়ান পাবলিশিং? আপনাদের অনেকগুলো বই তো আমাদের রয়েছে মশাই!—

ধুতির কোঁচায় হাত মুছে একজন একটা বই তুলে নিলেন ঃ 'জ্ঞানের আলো', 'স্বাস্থ্য সমাচার', 'ভূগোলের গল্প'—সবই তো আছে আমাদের।

—এবারেও যাতে থাকে, সেইজন্যেই আসা—অনুগত বিনয়ে সুধাংশু হাত কচলাল ঃ তা ছাড়া আমাদের নতুন ট্রানশ্লেসনের বইটা দেখেননি বোধ হয়? বাই কে-পি পাঁজা, এম-এ, বি-টি, হেডমাস্টার, বামুনপুকুর এইচ ই স্কুল—

—হুঁ!

—বাড়িয়ে বলছি না স্যার, বাজারের যে কোনো চল্‌তি বইয়ের সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখুন। সিম্‌প্লেস্ট প্রোসেস্ নতুন নতুন আইটেম, একটা ওয়ার্ডবুকও আছে সঙ্গে—

ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজল। অবশিষ্ট টিচারেরা গোগ্রাসে মুড়ি শেষ করলেন।

প্রথম লোকটি হাই তুললেন ঃ আপনি আপাতত এই এরিয়ায়ই তো আছেন? কাল তা হলে একবার দশটার দিকে আসুন। তখনই কথাবার্তা হবে। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার—এবার আমার ওপরেই ভার। আচ্ছা—নমস্কার—

—নমস্কার।—অগত্যা থলের মধ্যে বইগুলো পুরে সুধাংশু উঠে পড়ল।

আসুন। অর্থাৎ আবাহন নয়—বিসর্জন। আপনি যান, কিন্তু যাওয়া যায় কোথায়?

গ্রামটা যখন মাঝারি, তখন জেলা বোর্ডের একটা ডাকবাংলো কোথাও থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এই জীর্ণ চেহারার দীন ক্যান্‌ভাসার—চৌকিদার কি আমল দেবে? আর যদি বা থাকতেও দেয়—খাওয়া ছাড়াও দৈনিক দুটো টাকা চার্জ তো নির্ঘাত। স্কুল বইয়ের ক্যান্‌ভাসারের পক্ষে দৈনিক দু'টাকা দিয়ে ডাকবাংলোয় থাকা আর বারোর সাত ছকু খানসামা লেন থেকে চৌরঙ্গির ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠা—এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ নেই কিছু।

অতএব—

[illegible] আবার স্টেশনের দিকে যাত্রা? উঁহু, সেও অসম্ভব। এ এরিয়াতে আশেপাশে পাঁচ-ছটা স্কুল রয়েছে। তাদের বাদ দিয়ে চলে গেলে নিস্তার নেই। অক্ষয়বাবু ঠিক টের পেয়ে যাবেন এবং অক্ষয়বাবু কড়া লোক।

ক্ষিদেয় পেটের নাড়িগুলো দাপাদাপি করছে। সেই খইয়ের দোকানটাকে মনে পড়ল। কয়েকটা কালো ছিটেধরা চাঁপা কলাও ঝুলতে দেখেছিল সেখানে। কিঞ্চিৎ ফলারের ব্যবস্থা হবে নিশ্চয়।

শুধু চাঁপা কলা নয়, মোষের দুধও ছিল এবং একটু মোদো-গন্ধধরা ভেলিগুড়। পনেরো পয়সায় খাওয়াটা নেহাত মন্দ হল না। আচমকা সুধাংশুর মনে হল, এমন খই-কলার ফলার কাছাকাছি থাকতে দুপুরবেলা খানিক শুকনো মুড়ি কেন চিবিয়ে মরে মাস্টারেরা?

শীতের নরম রোদ। পেটে খাবার পড়ে গা এলিয়ে আসছে। একটু শুতে পারলে হত।

কাছেই ধর্মঠাকুরের বটগাছ। ছিমছাম জায়গাটি। দেবতার স্থান, অতএব সার্বজনীন সম্পত্তি। এখানে হত্যে দেবার নাম করে খানিকক্ষণ গড়িয়ে নিলে কেউ আপত্তি করবে না নিশ্চয়।

যা ভাবা—তাই কাজ। ব্যাগের ভেতর থেকে সন্তর্পণে ভাঁজ করা র‍্যাপারটা সে বের করে আনল। পথে বিছানাটা এক জায়গায় রেখে এসে ভারী ভুল করেছে সে। নিশাকরবাবুর ওখানে বিছানা নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই—বন্ধু লোক!—অক্ষয়বাবু বুঝিয়েছেন।

ফিরেই যেতে হবে। থানা গাড়তে হবে তিন মাইল দূরের স্টেশনেই। ওখান থেকে যতটা 'এরিয়া' কভার করা যায়। ব্যাগটা মাথায় দিয়ে বটগাছের তলায় শুয়ে পড়ল সুধাংশু। ধর্মঠাকুরের মাটির ঘোড়াগুলো কেমন পিট-পিট করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কতক্ষণ?

—ও মশাই—কত ঘুমুবেন? উঠুন—উঠুন—

ঘোড়াগুলো ডাকছে নাকি? সুধাংশু ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

—আপনি এখানে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন, আর আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিন্—চলুন এবার—

ঘোড়া নয়। একটি মানুষ এবং স্কুলের একজন মাস্টার।

—কেন বলুন তো?

সুধাংশুর মনে পড়ল, এই লোকটিকেই টিচার্স-রুমে বসে মুড়ির সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা চিবুতে দেখেছিল সে।

মাস্টার মিটি-মিটি হাসলেন : আছে মশাই, ব্যাপার আছে। সাধে কী আর এসেছি—ওপরওলার হুকুমে।

—ওপরওলার হুকুমে।—সুধাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার?

—ছোঃ।—মাস্টার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : ওকে কে পরোয়া করে মশাই? সেক্রেটারির কুটুম বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হয়েছে—নইলে ওর বিদ্যে তো ম্যাট্রিক অবধি। গুণের মধ্যে খালি সেক্রেটারির কান ভারি করতে পারে। আমিও শশধর বাড়ুয্যে মশাই—আই-এ পাশ করেছি, হেডমাস্টারের লেখাতে ভুল ধরেছি দু-দুবার। গজেন বিশ্বাসকে আমি গ্রাহ্যও করি না।

—তবে কার তলব? থানার দারোগার নয় তো?—এবার ভয়ে সুধাংশুর গলা বুজে এল।

—দারোগা আবার কেন?—শশধর বাঁড়ুয্যে হা-হা করে হেসে উঠলেন ঃ আপনি কি চোর ডাকাত? দারোগা নয়—ম্যাজিস্ট্রেট ডেকেছে। চলুন।

ম্যাজিস্ট্রেট। রহস্য অতল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুধাংশু উঠে পড়ল।

এবং কী আশ্চর্য—যেতে হল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নয়, শশধর বাড়ুয্যের বাড়িতে।

বাড়ি রাস্তার ধারেই। সামনে একটি ফুলের বাগান। লাল মাটির দেওয়াল আর টিনের চাল। একটি ছোটো ধানের মরাই আর এক পাশে।

বাইরের ঘরে ঢুকেই সুধাংশু থমকে গেল। শশধর বাড়ুয্যের বাড়িতে এতখানি আশা তার ছিল না।

একখানি তক্তপোশের ওপরে পরিষ্কার একটি সুজনী পাতা। সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিল এবং পাশে একটি চেয়ার। আর সবচেয়ে আশ্চর্য—টেবিলের ওপরে কোণাভাঙা সস্তা একটি কাচের ফুলদানিতে সপত্র একগুচ্ছ গন্ধরাজ! এই শীতকালে গন্ধরাজ!

কিন্তু গন্ধরাজের চাইতেও বিস্ময়কর অভ্যর্থনার এই আয়োজনটা। মনে হচ্ছে—সুধাংশুর সম্মানেই ঘরখানাকে এমন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন কনে দেখতে এসেছে সে।

শশধব বললেন, বসুন, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাকছি।—বলেই আবার হেসে উঠলেন হা-হা করে। তারপর পা বাড়ালেন ভেতরের দিকে।

সুধাংশু থ হয়ে রইল। এ আবার কোন্ পরিস্থিতি। একটা দুর্বোধ্য নাটকের মতো ঠেকছে সব। অসময়ের গন্ধরাজের একটা মৃদু সৌরভ রহস্যলোক সৃষ্টি করতে লাগল তার চারদিকে।

––মণ্টুদা—চিনতে পারছ না?—কপালের ওপর ঘোমটাটা একটুখানি সরিয়ে শ্যামবর্ণ একটি তরুণী মেয়ে ঢুকল ঘরে। হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল।

তটস্থ হয়ে সুধাংশু উঠে দাঁড়াল। মন্টুদা—কে মন্টুদা?

—দেখুন, আমি তো আপনাকে—

—চিনতে পারোনি—না? কিন্তু আমি তোমাকে দূর থেকে দেখেই চিনেছি। সকলের চোখকে ফাঁকি দিতে পারো—কিন্তু আমাকে নয়। কেমন ধরে আনলাম—দেখো।

একটা ভুল হচ্ছে—মারাত্মক ভুল। বলবার চেষ্টায় বার দু'তিন হাঁ করল সুধাংশু।

—আহা-হা, আর চালাকি করতে হবে না। তোমাকে আমি জব্দ করতে জানি। বেশি দুষ্টুমি করো তো সব ফাঁস করে দেব—মেয়েটি মৃদু হাসল ঃ দাঁড়াও—তার আগে তোমার চা করে আনি। দিনে এখনও সে পনেবোবার চা খাওয়ার অভ্যাসটি আছে তো? না—রত্নার শাসনে এখন কমেছে একটু?

রত্না? এবার আর হাঁ-টা সুধাংশু বন্ধ করতে পারল না।

—ঐ দেখো, সাপের মুখে চুন পড়ল।—মেয়েটি সকৌতুকে হেসে উঠল।

গায়ে একটা জামা চড়িয়ে শশধর ফিরে এলেন। মেয়েটি একটুখানি নামিয়ে আনল মাথায় ঘোমটা।

শশধর বললেন, তুমি তা হলে চায়ের ব্যবস্থা করো ওঁর জন্যে। আমি একবার ঘুরে আসি বাগ্‌দিপাড়া থেকে। দেখি বিল থেকে দুটো চারটে কই মাছ ওরা ধরে এনেছে কিনা।

—দেখুন শশধরবাবু—

—পরে দেখব মশাই। এখন সময় নেই—

শশধর বেরিয়ে গেলেন।

মেয়েটি হাসল ঃ পালাবার ফন্দি? ও হবে না। অনেকদিন পরে ধরেছি তোমাকে। এখন চুপ করে বসো। আমি চা আনছি—

অতঃপর আবার সেই বিব্রত প্রহর যাপনের পালা সুধাংশুর। এ কী হচ্ছে—এ কোথায় এল সে। মণ্টুদা বলে তার কোনো নাম আছে একথা সে এই প্রথম শুনল। এবং রত্না! সেই-ই বা কে? বারোর সাত ছকু খানসামা লেনে যে তার ঘর আলো করে রয়েছে, তাকেও তো সে এতকাল নিভাননি ওরফে বুলু বলেই জানত।

একটা ভুল হচ্ছে—ভয়ঙ্কর ভুল। ভুলটা ভেঙে দিয়ে এই মুহূর্তে ভদ্রলোকের মতো সরে পড়া উচিত।

কিন্তু—

কিন্তু চা আসছে এবং এ-সময় এক কাপ চায়ের নিমন্ত্রণ তুচ্ছ করবার মতো মূঢ়তাকে সে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। চা-টা খাওয়া শেষ হলেই এক ফাঁকে ঝোলাটা কাঁধে করে সে উঠে পড়বে। তারপর এক দৌড়ে শালবন ছাড়িয়ে ময়ূরাক্ষী পার হতে আর কতক্ষণ!

সামনে ফুলদানি থেকে গন্ধরাজের মৃদু সৌরভ ছড়াচ্ছে। শীতের ফুল! সমস্ত ঘরে একটা রহস্যময় আমেজ ছড়িয়ে রেখেছে। পড়ন্ত বেলায় ঘরময় শীতল ছায়া ঘনাচ্ছে। মশার গুঞ্জন উঠেছে। র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে সুধাংশু অভিভূতের মতো বসে রইল।

ভেতর থেকে গরম ঘিয়ের গন্ধ আসছে। খাবার তৈরি হচ্ছে—এবং নিশ্চয় তারই সম্মানে। সুধাংশুর মুখে আবার লালা জমে উঠল। রিফ্লেক্‌স্ অ্যাকশন। খই জিনিসটা লঘুপাক, কিন্তু চাঁপা কলা আর মোষের দুধও যে এমন অবলীলাক্রমে হজম হয়ে যায়—সে রহস্যই বা কার জানা ছিল। চায়ের প্রলোভনটা আরও শক্ত পাকে জড়িয়ে ধরল ঘিয়ের গন্ধ। রাত্রে স্টেশনের হোটেলে তো জুটবে ট্যাঁড়শ-চচ্চড়ি আর কড়াইয়ের ডাল—এক টুকরো মাছ যদি পাওয়া যায়, তার স্বাদ মনে হবে পিস্‌বোর্ডের মতো। তার চাইতে এখান থেকে যথাসাধ্য রেশন নিয়ে নেওয়া যাক। হোক ভ্রান্তিবিলাস, তবু ধরে নেওয়া যাবে এটা বাংলাদেশের পুরনো আতিথেয়তার নমুনা মাত্র।

গন্ধরাজের সৌরভ ছাপিয়ে লুচির গন্ধ আসছে। সুধাংশু প্রতীক্ষা করে বসে রইল।

একটু পরেই একহাতে সধূম লুচির থালা, আর একহাতে লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল মেয়েটি।

—এত কেন?

—খাওয়ার জন্য।—মেয়েটি হাসল ঃ নাও—আর ভদ্রতা কোরো না। সামনেই গাড়ু-গামছা রয়েছে—ধুয়ে নাও হাতমুখ।

যা হওয়ার হোক। এস্‌পার কি ওস্‌পার। মেঘনার ধারের সুধাংশু চক্রবর্তী আর বিস্মিত হবে না ঠিক করল। দেশ ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালানোর চরম বিস্ময়টাকেই যখন রপ্ত করতে হয়েছে—তখন শিশিরে আর ভয় নেই তার।

বেপরোয়া হয়ে লুচি-বেগুন ভাজায় মনোনিবেশ করল সে।

মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়েছিল, আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—কত রোগা হয়ে গেছ আজকাল।

শুনে রোমাঞ্চ হয় যে সুধাংশুও একদিন মোটা ছিল!

মেয়েটি বললে, সেই দশ বছর আগে যখন রত্নাকে নিয়ে পালিয়েছিলে, সেদিন কত কথাই উঠেছিল গ্রামে, কিন্তু আমি তো জানতাম—যা করেছ, ভালই করেছ!

রত্নাকে নিয়ে পালানো! হে ভগবান, রক্ষা করো! সুধাংশুর গলায় লুচি আটকে আসতে লাগল। তাদের হেড্‌মাস্টার থাকলে এখন সাক্ষী দিয়ে বলতেন, স্কুলে বরাবর গুড কন্ডাক্টের প্রাইজ পেয়েছে সে!

—কাকিমা তো অগ্নিমূর্তি!—মেয়েটির চোখে স্মৃতির দূরত্ব ঘনিয়ে আসতে লাগল ঃ আমাকে এসে বললেন, কণা, তুই দুঃখ পাসনি। ওর কপালে অনেক শাস্তি আছে—দেখে নিস্। সত্যি বলছি মণ্টুদা—বিশ্বাস করো আমাকে। আমি খুশি হয়েছিলাম। জাত বড়ো নয়—রত্না সত্যিকারের ভালো মেয়ে। আর তোমাকেও তো জানি। প্রাণে ধরে রত্নাকে তুমি কখনও দুঃখ দেবে না।

আহা, এই কথাগুলো যদি বুলু শুনত! তার ধারণা, স্বামী হিসেবে যে বস্তুটি তার কপালে জুটেছে, পুরুষের অপদার্থতম নমুনা হচ্ছে সেইটিই।

—সত্যি, রত্নার কষ্ট চোখে দেখা যেত না। সৎমা কী অত্যাচারই করত ওর ওপরে। কতদিন খেতে পর্যন্ত দেয়নি। তবু মেয়েটা মুখ ফুটে একটা কথা পর্যন্ত বলেনি কখনও। এমন ঠাণ্ডা লক্ষ্মী মেয়ে আর হয় না। জাতটা কিছু নয় মণ্টুদা—জীবনে সত্যিই তুমি জিতেছ!

অজানা-অদেখা রত্নার জন্যে এবারে সুধাংশুরও দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে পড়ে গেল, ঝগড়া করবার আগে কোমরে হাত দিয়ে বুলুর সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা।

লুচির থালা শেষ হতে সময় লাগল না।

—আর দু'খানা এনে দিই মণ্টুদা?

—না—না—সর্বনাশ!

কণা বলে চলল, তোমার চেহারা বদলেছে মণ্টুদা—কত ভারী হয়েছে গলার আওয়াজ। তবু আমি কি ভুল করতে পারি? সেই চোখ, সেই কোঁকড়া চুল, সেই মুখের আদল, সেই হাঁটবার ভঙ্গি। বাড়ির সামনে দিয়ে যখন ধর্মখোলার দিকে চলে যাচ্ছিলে, তখনই আমি চিনে ফেললাম। তারপর উনি যখন স্কুল থেকে ফিরে এসে বললেন যে, কলকাতা থেকে বইয়ের এজেন্ট এসেছে, তখনই আর বুঝতে কিছু বাকি রইল না। এখনও তো সেই বইয়ের কাজই করছ?

—হু!—সংক্ষিপ্ততম উত্তরই সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা।

—শোনো—কণার গলার স্বর নীচু হয়ে এল ঃ আমি ওকে বলেছি, তুমি সম্পর্কে আমার মামাতো ভাই। —কণা অর্থগভীর হাসি হাসল ঃ তুমি কিন্তু আসল ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়ো না—কেমন?

—না—না!—সুধাংশু আন্তরিকভাবে মাথা নাড়ল ঃ তা কখনও বলতে পারি! তা হলে আজ এবং উঠি আমি। রাত হয়ে যাচ্ছে—আমাকে আবার স্টেশনে যেতে হবে।

—বা রে, ভেবেছ কী তুমি? এম্‌নি ছেড়ে দেব? ওঁকে মাছ আনতে পাঠালাম—দেখলে না? আমার রান্না খেতে তুমি কত ভালবাসতে—এরই মধ্যে ভুলে গেলে? ও সব হবে না। যাও দেখি—কেমন যেতে পারো।

—কিন্তু বিছানাপত্র কিছু সঙ্গে নেই—

কণা গরিব হতে পারে, কিন্তু তোমাকে শুতে দেবার মতো একখানা লেপ আর একটা বালিশ তার জুটবে। বেশি ভদ্রতা কোরো না আমার সঙ্গে—বুঝেছ?

বুঝেছে বৈকি সুধাংশু। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রতারকের একটা চমৎকার ভূমিকায় নমে পড়েছে সে। এখন আর সহজে পালাবার উপায় নেই। শশধর তাকে কখনওই দেখেনি এবং কণা তাকে মণ্টুদা বলে প্রমাণ করার জন্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। অতএব জালিয়াতিটা অন্তত আজ রাতে ধরা পড়বে না। কাল ভোরেই তাকে পালাতে হবে—এবং এ এরিয়া ছেড়ে। তারপরে অক্ষয়বাবু রইলেন আর সে রইল।

বাগানে টিনের গেট খুলে কে ভেতরে ঢুকল। পাওয়া গেল চটির আওয়াজ।

শশধর ফিরে এলেন। হাতের বাঁধা ন্যাকড়াটার মধ্যে উত্তেজিত দাপাদাপি চলছে।

উল্লসিত হয়ে শশধর বললেন, অতিথি-সেবার পুণ্যে আজ ভাল মাছ পাওয়া গেল কণা। দশটা বড়ো বড়ো কই। কণার মুখ হাসিতে ভয়ে উঠল।

—মণ্টুদার ভারী প্রিয় মাছ। মনে আছে মণ্টুদা—রেলের বাঁধের তলা থেকে একবার তুমি আর আমি ছিপ দিয়ে এক কুড়ি কই ধরেছিলাম? তারপর বাড়িতে ফিরে মার হাতে সে কী পিট্টি!

শশধর সস্নেহ হাসি হাসলেন। ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারটায় ঃ ভাই বোনে মিলে খুব দুষ্টুমি হত বুঝি? তা বেশ, কিন্তু শিবেনবাবুকে এখনও চা দাওনি?

শিবেনবাবু! সুধাংশু আর একবার ঢোক গিলল। নিজের নামটা প্রায় অষ্টোত্তর শতনামের গণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে।

—তুমি আসবে বলেই দেরি করছিলাম।

—দাও—দাও। —শশধর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঃ বিকেলের চা-তো এখনও জোটেনি ওঁর। কুটুম মানুষ—বদনাম গাইবেন।

—মণ্টুদা খুব ভালো ছেলে—কারও বদনাম করে না—কণা ভেতরে চলে গেল।

খাওয়ার দিক থেকে কিছুমাত্র ত্রুটি হল না। বারোর সাত ছকু খানসামা লেনের সুধাংশু চক্রবর্তী এমন টাটকা কই মাছ চোখে দেখেনি দেশ ছাড়বার পরে। এ অঞ্চল নাকি কাঁকরের জন্যে বিখ্যাত, কই চালে তো একটি দানা কাঁকরেরও সন্ধান পাওয়া গেল না!

শশধর গল্প করলেন অজস্র। দেশের কথা, স্কুলের কথা। যোগ্যতায় বি-এ ফেল হেড্‌মাস্টার নিশাকর সামন্তের পরেই তাঁর স্থান—এ কথাও ঘোষণা বার বার। শুধু সেক্রেটারির কুটুম ওই গজেন বিশ্বাস। মামার জোরেই অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার—নইলে একটা ইংরেজি সেন্‌টেন্সও কারেক্ট করে লিখতে জানে নাকি?

—আপনাকে ভাবতে হবে না মশাই। আপনি আমার কুটুম—গ্রেট্ ইণ্ডিয়ানের সব বই আমি ধরিয়ে দেব স্কুলে। ও দায়িত্বটা এখন আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।

বাইরে কন্‌কনে শীতের রাত। ভারী হাওয়ায় অসময়ের গন্ধরাজের গন্ধ। মাটির দেওয়ালে কেরোসিনের আলোর কাঁপনলাগা ছায়া। বিমিশ্র অনুভূতি বিজড়িত একটা স্তব্ধ মন নিয়ে সুধাংশু আধশোয়া হয়ে রইল লেপের মধ্যে। আশ্চর্য। জীবনটা এত আশ্চর্য—কে জানত!

মণ্টুদা?

কণা ঘরে ঢুকল।

—জেগেই আছি। শশধরবাবু কী করছেন?

—ওঁর তো এখন মাঝ-রাত। পড়া আর মড়া। শুনছ না—নাক ডাকছে?—কণা খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল ঃ ওই নাকের ডাকের ভয়ে পাড়ায় চোর আসতে পারে না।

সুধাংশু অপ্রতিভের মতো হাসল। টেবিলের পাশ থেকে চেয়ারটা নিয়ে বসল কণা। কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগল লণ্ঠনের বাড়ানো কমানো চাবিটা। কিছু একটা বলতে চায়—বলতে পারে না।

সুধাংশু সংকুচিত হয়ে আসতে লাগল মনের ভেতরে। আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখল কণার দিকে। এক কালে সুশ্রীই ছিল মুখখানা। এখন পরিশ্রম আর চিন্তার একটা ম্লান আবরণ ছড়িয়ে পড়েছে তার ওপরে।

তারপর ঃ

একটা কথা বলব ভাবছি মণ্টুদা। বলব কিনা বুঝতে পারছি না।

—বলো। অত সংকোচের কী আছে?

—না, তোমার কাছে সংকোচের আমার কিছুই নেই।—কণা ভেতরের দিকে মাথা ফিরিয়ে একবার কী দেখল, যেন কান পেতে শুনল শশধরের নাকের ডাকটা। তারপর মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসল ঃ রত্না অমন করে মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে তোমার ঘরে হাঁড়ি ঠেলার ব্যবস্থাই যে আমার পাকা হয়ে গিয়েছিল সে কথা কি তুমি ভুলে গেলে?

সুধাংশু শিউরে উঠল। লণ্ঠনের আলোয় আশ্চর্য দেখাচ্ছে কার চোখ। ঘন বর্ষার মেঘের মতো কী যেন টলমল করছে সেখানে। কণা বললে, ভয় নেই তুমি ভেবো না—আমি রাগ করেছি। আমি তো জানি রত্না কত ভালো মেয়ে!—কণার চোখ থেকে টপ করে এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল বুকের ওপর ঃ আমি সুখে আছি, খুব সুখে আছি মণ্টুদা!—

আঁচল দিয়ে চোখ মুখে ফেলে কণা আবার হেসে উঠল। শ্রাবণের মেঘ-রৌদ্রের লীলার মতো তার হাসি-কান্না দেখতে লাগল সুধাংশু।

কণা বলে চলল, দশ বছর পরে দেখা, ভেবেছিলাম, কথাটা বলা ঠিক হবে না। তারপর ভেবে দেখলাম, পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলতে পারি।—গলায় স্বর নামিয়ে কণা বললে, মণ্টুদা, কুড়িটা টাকা দেবে আমাকে?

কুড়ি টাকা। ক্যান্‌ভাসার সুধাংশু চক্রবর্তী সভয়ে নড়ে উঠল।

আঁচলের গিঁট থেকে একটা চিঠি বের করলে কণা। বললে, এইটে পড়ো।

সুধাংশু বিমূঢ়ের মতো হাত বাড়িয়ে নিল চিঠিখানা। বোলপুর থেকে কোন্ এক বিনু চিঠি দিয়েছে দিদিকে। তার ম্যাট্রিকের ফি এ মাসেই দিতে হবে—দিদি যেন একটা ব্যবস্থা করে দেয়।

হতবাক হয়ে চিঠিটার দিকে সে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

—অবাক হয়ে গেলে তো? দশ বছর আগে যে ছোট্ট বিনুকে দেখেছিলে, সে আর ছোটোটি নেই। ম্যাট্রিক দেবে এবার। ভালো ছেলে—ভালো করেই পাশ করবে। অথচ ফিয়ের টাকা নিয়ে মুশকিল। বাবার অবস্থা তো সবই জানো—কোনোমতে আধপেটা খেয়ে আছেন। অথচ এদের কাছেও চাইতে পারি না। নিজেরই সংসার চলে না, তবু বাবাকে যখন পারেন দু' পাঁচ টাকা পাঠান। এই কুড়িটা টাকার জন্যে ওঁকে আর কীভাবে চাপ দিই বলো?

সুধাংশু তেমনি নির্বাক হয়ে রইল।

কোমল গভীর গলায় কণা বললে, একদিন তোমার কাছে সবই আমার চাইবার দাবি ছিল মন্টুদা। আজ সেই সাহসেই কথাটা বলতে পারলাম। রত্নাকে আমি সবই তো দিয়েছি—কণার চোখে জল চকচক করতে লাগল ঃ মোটে কুড়িটা টাকাও কি আমি চাইতে পারব না?

অভিনেতা সুধাংশুর কাছে অভিনয়টা কখন সত্যি হয়ে উঠল সে নিজেই জানে না। তেমনি গভীর গলায় সেও বললে, নিশ্চয় কণা—নিশ্চয়।

বালিশের তলায় রাখা মানিব্যাগটার দিকে হাত বাড়াল।

—এখুনি?—কণা বললে, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। তুমি কলকাতা গিয়েও বিনুকে পাঠিয়ে দিতে পারো। ঠিকানাটা নিয়ে যাও বরং।

ব্যাগটা বের করে এনে সুধাংশু বললে, না—না। অঢেল কাজ নিয়ে থাকি, কলকাতায় গিয়ে ভুলে যেতে কতক্ষণ? টাকাটা তুমিই রাখো কণা।

শীতের হাওয়ায় ঘরে গন্ধরাজের মৃদু সুরভি। দেওয়ালে ছায়া কাঁপছে। আশ্চর্য তরল কণার চোখ। জল গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু এবার আর সে তা মুছতে পারল না।

*   *   *

শাল-পলাশের বনে ভোরের কুয়াশা। পায়ের তলায় শিশিরভেজা ধুলো। ময়ূরাক্ষী আর কতদূরে?

ঠান্ডা নরম রোদে—শালের পাতায় সোনালি ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে আর মন্থর পা ফেলে চলতে চলতে হঠাৎ ক্যান্‌ভাসার সুধাংশু চক্রবর্তীর মনে হল—অভিনয়টা সত্যি সত্যি করেছে কে?

—সে—না কণা? কে বলতে পারে, এই পরিচয়ের ছদ্মবেশটা কুড়িটা টাকা আদায় করার একটা চক্রান্ত কিনা?

কিন্তু তা হলে কি এত মিষ্টি লাগত গন্ধরাজের গন্ধটা? এই সকালে কি এত সুন্দর দেখাত এই শাল-পলাশের বন? আর সামনে—সামনে ওই তো ময়ূরাক্ষী। ময়ূরের চোখের মতোই সোনার আলো-ছড়ানো কী অপরূপ নীল ওর জল।

এই কুড়িটা টাকার হিসেব সহজে বোঝানো যাবে না ব্যবসায়ী অক্ষয়বাবুকে। এ এরিয়ার কাজও সবই তো পড়ে রইল। আর অক্ষয়বাবু কড়া লোক।

এর ঋণ শোধ করতে হবে এক মাস রেশন না এনে, কণার চোখের জলের দাম শোধ করে দিতে হবে বুলুকে। পিঠের বোঝাটার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুধাংশুর। এত বই—রাশি রাশি বই! শুধু চিনির বলদের মতো বয়েই বেড়ায় সে—তার নিজের ছেলের কর্পোরেশনের স্কুলে পড়ার খরচ জোটে না। তবু একজন তো ম্যাট্রিকের ফি দিতে পারবে—একজন তো কৃতী হতে পারবে জীবনে।

কুড়িটা টাকার চেয়ে ঢের বেশি সত্য বুকের পকেটে এই গন্ধরাজ দুটো। অসময়ের ফুল। কাচের ফুলদানিটা থেকে চুরি করে এনেছে সুধাংশু—পালিয়ে এসেছে ভোরের অন্ধকারে। যে অন্ধকারে ব্রজপুর একটা স্বপ্নমাধুরী নিয়ে পেছনে পড়ে রইল।

সামনে ময়ূরাক্ষী। কী আশ্চর্য নীল সোনালি ওর জল।

বিমল কর

হিমাংশু স্বামী, যূথিকা স্ত্রী। ওর বছর পাঁচেকের ছোটো-বড়ো। দেখলে মনে হবে, ব্যবধান পাঁচের নয়, আট কিংবা দশের। মেয়ে পাশে থাকলে এ-হিসেবটাও গোলমাল হওয়া বিচিত্র নয়। পুতুল যদি পনেরোয় পা দিয়ে থাকে, আর যূথিকা সত্যি-সত্যিই গর্ভধারিণী হয় ও-মেয়ের, তাহলে বলতে হবে, রোগা খাটো চেহারায় মেয়েরা বেশ বয়স লুকাতে পারে। যেমন যূথিকা। অবশ্য যূথিকা কখনও বয়স লুকোবার চেষ্টা করত না। বরং পুতুল যে তার মেয়ে—এ কথা হাবে-ভাবে সাজে-পোশাকে পরিস্ফুট করার ঝোঁকটা তার স্বভাব দাঁড়িয়েছিল। এই চেষ্টা সত্ত্বেও পুতুলের মা যূথিকাকে মোটেই পঞ্চদশী কন্যার জননী বলে মনে হত না। বরং এই ধরনের সাজ-পোশাকে ওর রোগা, খাটো চেহারার ওপর শালীনতা ও আভিজাত্যের একটা সুষমা ফুটিয়ে তুলত। যা দেখলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক, পনেরো বছরের মেয়ের মা সাজার চেষ্টাটা ওর কৃত্রিম। আসলে, পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত সজ্জার আশ্রয়ে একটি খাটো লঘু নারীদেহের মেদ-শুষ্ক দুর্বল অস্থিগুলো আশ্চর্যভাবে আত্মগোপন করত এমন কি, পানপাতা ঢঙের ছোটো একটি মুখে ব্যাধির যে-বিবর্ণ রেখাঙ্কন স্বভাবতই দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা—তাও ঢাকা পড়ে যেত। বলা মুশকিল, যূথিকার মনের সুগোপন কোণে ওরই অজ্ঞাতে এই দ্বিতীয় বাসনা ছিল কিনা—যদিও আচরণে উলটোটাই প্রকাশ পেত।

স্ত্রীর তুলনায় স্বামী বিপরীত মেরু। যূথিকা একত্রিশ হলে হিমাংশুর ছত্রিশ হওয়ার কথা। স্বতন্ত্রভাবে ওকে দেখলে পরিণত যৌবনের দীপ্তিতে চোখ ঝলসে যায়। সুগঠিত অঙ্গ; স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ। সর্বাঙ্গে তার সেই প্রাণবন্ত যৌবনের খুশি, হাসি আর হিমাংশু ত সব সময়েই হাসছে। সকাল-দুপুর-সন্ধে-সব সময়; সর্বত্রই। একটা মানুষ যে এত হাসতে পারে, ওকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এমনিতেই গলার স্বরটা ভরাট। জোরে হাসলে বাতাসের ঢেউ এমনভাবে গলা দিয়ে বাইরের হাওয়ায় এসে শব্দ তুলত যা শুনলে মনে হবে—এক জোড়া পায়রা আগল-দেওয়া ঘরে ডানার শব্দ তুলে উড়ছে। এমন হাসি দিনে অসংখ্যবার শোনা যায় হিমাংশুর পাশে থাকলে; যদিও সব সময়ের হাসিটা তার ঠোঁটে গালে লেগে থাকে, চোখেও কিছুটা। অনেকের এ হাসি পছন্দ অনেকের নয়। যেমন, পুতুলের খুবই ভালো লাগে; যূথিকার লাগে না। বরং দেখা গেছে—মাঝে মাঝে রীতিমত বিরক্ত হয় যূথিকা, কড়া সুরে ধমক দেয়; বলে, "ইস্ অমন বিকট শব্দ করে কি হাস?...." অফিস যাবার মুখে হিমাংশু তখন হয়ত রুমালটা ট্রাউজারের পকেটে পুরছে, খুবই ব্যস্তভাব; তবু এক লহমা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখে বিস্ময় তুলে বলে, "বল কি—যে হাসি এককালে বাঁশির চেয়ে মধুর মনে হত তোমার, আজ তা বিকট হয়ে গেল!" একটু হয়ত অপ্রতিভ হয় যূথিকা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে জবাব দেয়, "এককালে রঙ্গ করার বয়স ছিল—করতুম। তা বলে আজও কি তোমার মতন ছেলেমানুষি করতে হবে?" স্ত্রীর কথায় আর একদফা হেসে দমকা হাওয়ার মতন বাইরে এসে দাঁড়ায় হিমাংশু, পাশের ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকে, পুতুল, রেডি? আমি নীচে নামলাম। তাড়াতাড়ি

আয়।" কথা শেষ হতে না হতে দেখা যায় তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে হিমাংশু নীচে গেছে। পুতুল সবে বারান্দায়। মা-মেয়েতে চোখাচোখি হয়। যূথিকা পাশ কাটিয়ে নীচে নামতে থাকে। হঠাৎ তারপর সিঁড়ির মাঝবাঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হিমাংশু পায়ে ক্লিপ লাগিয়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে অপেক্ষা করছে; চোখ সিঁড়িতে। যূথিকা বিরস চোখে তাকিয়ে শুরু করে, "তুমি যাও, পুতুল যাবে না।" ..."যাবে না! কেন?" হিমাংশু বুঝেও না-বোঝার ভান করে। অসহ্য বিরক্তি মেশানো গলায় যূথিকা এবার জবাব দেয়, "এক কথা একশো বার বলতে আমার ভালো লাগে না। কতবার না বলেছি, ওকে তুমি সাইকেলের পেছনে চাপিয়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবে না!" হিমাংশু চকিতে একবার স্ত্রীর মাথা টপকে দেখে নেয় ঃ পুতুল এক সিঁড়ি এক সিঁড়ি করে নিঃশব্দে মার প্রায় পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে-মুখে চট করে একটু অপরাধের ভাব ফুটোয় হিমাংশু, "আজ কীভাবে যে একটু দেরি হয়ে গেল গো—বুঝতেই পারলাম না! পুতুলের স্কুলের বাসটাও ফিরে গেল। কিন্তু—অযথা স্কুল কামাই করা কি ভালো হবে? ওর বাবার আজ অঙ্কের ক্লাস। কি রে, আজ না-হয় নাই গেলি, পুতুল!" বাপের কথায় মা ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তাকায়। কান্না-কান্না মুখ করতে তিলমাত্র দেরি হয় না মেয়ের। আস্তে অথচ শব্দটা যাতে বাবার কানে যায় ততটুকু চড়িয়ে পুতুল বলে, "অঙ্কের ক্লাস কামাই গেলে বড্ড যা-তা করে বলে মিস্ সরকার।" যূথিকা চূড়ান্ত শাসনের সুরে জবাব দেয়, "সে-কথা আগে মনে থাকে না; হেলাফেলা করে কেন তুমি স্কুলের বাস ফেল করো? শুনবে বকুনি, শোনাই উচিত।" একটু থেমে যূথিকা এবার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'ট্রাম-বাসে পৌঁছে দিতে বললে এক্ষুনি তো বলবে তোমার অফিসের লেট হয়ে গেছে। বুড়োধাড়ি মেয়েকে সঙ্ সাজিয়ে সাইকেলের পেছনে করে রাস্তা দিয়ে না নিয়ে গেলে তোমার বাহার হয় না। যাও, যা খুশি করগে।" কথা শেষ করেই যূথিকা ওপরে উঠতে থাকে—মেয়ে, স্বামী কারুর দিকে ফিরে তাকায় না। না তাকাক যূথিকা। পুতুল হরিণগতিতে নীচে নেমে এসে বাবার পাশটিতে দাঁড়ায়। হিমাংশু মুচকি হেসে মেয়েকে সদরের দিকে পা বাড়াতে ইঙ্গিত করে।

মেয়ে শাসনের রাসটা ইদানীং যূথিকা শক্ত করেই ধরেছে। ফলে, সাইকেলের পেছনে চেপে স্কুল যাওয়াই শুধু নয়, আরো অনেক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নিত্যই স্বামীকে ভর্ৎসনা করছে যূথিকা। মেয়েকেও। তবু যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে। গায়ে মেখেও মাখে না। শতেক রকম ফন্দি করে এড়িয়ে যায় সমস্ত শাসন। কাজেই যূথিকার তরফ থেকে প্রায়ই কথা ওঠে।

মেয়েদের সাঁতারে ফার্স্ট হয়েছিল পুতুল। কাপ গেল, মেডেল পেল; সুইমিং কস্টিউম পরা ছবি উঠল তার। কাপ মেডেল দেখে যূথিকা অখুশি হয়নি। কিন্তু যেদিন পুতুলের সেই বিজয়িনী ছবিটা নিয়ে এল হিমাংশু, যূথিকার সারা মুখ কুঁচকে উঠল। মেয়ের অসাক্ষাতে ছবিটা বাক্সের অন্ধকারে চালান করে দিয়ে বলল যূথিকা স্বামীকে, "আচ্ছা, মেয়ের তোমার বয়স বাড়ছে না কমছে?"

"কেন?" হিমাংশু অবাক হয়ে চোখ তোলে।

"কেন কি, ওই নেংটিটা পরিয়ে কেউ ছবি তোলে ডাগর মেয়ের? ছি-ছি।"

"নেংটি? নেংটি আবার কোথায় পেলে তুমি? ওটা ত সাঁতারের জামা। বাঃ আমারও ত অমন জামা আছে, ছবিও আছে, দেখোনি নাকি তুমি?"

"তোমার থাকে থাক, মেয়ের থাকবে না।" যূথিকার গলায় এবার স্পষ্ট আদেশ, "হেদোর

জলে সাঁতার কেটে মেয়ের তোমার জীবন কাটবে না; তাকে ঘর-সংসার করতে হবে—ছিঃ ছিঃ, কি জঘন্য ছবি! পাঁচজনে ত চোখ দিয়ে তাই গিলে খাবে।"

"কি যে বল?" হিমাংশু স্ত্রীর কথায় হেসে ফেলে, "রসগোল্লা না পান্তুয়া যে গিলে ফেলবে। তবে হ্যাঁ, দেখবে। দেখানোর জন্যেই ত ওই ছবি; ওতে তোমার মেয়ের গর্ব। আর যদি অন্য কথা বল, তবে বাপু, সত্যি কথাই ত, ভালো চেহারা দেখবার জন্যই।" একটু থেমে আবার, "এই ধর-না তোমার-আমার কথা। বিয়ের আগে দাদু, মা—দুজনই তোমায় দেখেছিলেন; লুকিয়ে চুরিয়ে আমিও। আর দিব্যি করে বল তুমি আমাকেও দেখেছিলে কিনা? হুঁ-হুঁ, বাব্বা—এত দেখাদেখি, ভালোলাগা তবেই না বিয়ে?"

স্বামীর বাক্যবিনাসের তরলতায় যূথিকার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হতে চলেছিল। তাড়াতাড়ি অন্তিম উষ্মাটুকু প্রকাশ করে ও বলল, "সব কথা নিয়ে হ্যালহেলে ভাব আমার ভালো লাগে না। ওসবের বয়স পেরিয়ে গেছে, এখনো তোমার এই ছেলেমানুষী কি ভালো লাগে, না মানায়?" কথা শেষ করে যূথিকা আর দাঁড়ায় না; চলে যায়।

স্ত্রীর কথায় মুচকি হাসে হিমাংশু। ও লক্ষ করেছে—যূথিকা দিনে অন্তত দু'পাঁচবার চেষ্টা করে, হিমাংশু যে ছেলেমানুষীর বয়স কাটিয়ে প্রায় প্রবীণত্বের সীমানায় এসে পৌঁছেছে, সেটা স্মরণ করিয়ে দেবার। অথচ হিমাংশু জানে, এটা বাড়াবাড়ি যূথিকার। জোর করে বয়স পাকাবার চেষ্টা। বাস্তবিক, কি এমন বয়স ওর বা যূথিকার! নেহাত এক সেকেলে দাদুর পাল্লায় পড়ে গোঁফ ঘন হওয়ার বয়সে, সেই কুড়িতে কলেজে পড়ার সময়ই তাকে বিয়ে করতে হয়েছিল পনেরো বছরের যূথিকাকে। নয়তো আজ তার বা যূথিকার এমন একটা বয়স হয়নি, যাতে বুড়োটে মেরে যেতে হবে। বরং আজকাল ছেলেরা কে-ই বা ত্রিশ বত্রিশের আগে, আর মেয়েরা তেইশ-চব্বিশের আগে বিয়ে করে? একটু বয়সে বিয়ে হওয়াই ভালো—হিমাংশুর আজকাল এই ধারণা। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় তার বা যূথিকার কিছু ক্ষতি হয়েছে বই কি? একটা আশ্চর্য সিরসিরে তারুণ্যের আনন্দ যদিও বিয়ের সময় ওদের ঘিরে ছিল, বিয়ের পরেও তবু ষোলো বছরে মা হয়ে যূথিকা মরতে বসেছিল। কি কষ্ট তার, কি ভয় হিমাংশুর। ভেবে ভেবে ভয়ে দুশ্চিন্তায় হিমাংশুর চেহারা শুকিয়ে গিয়েছিল, এমন সাঁতারু বুকের ফুসফুসটাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কালি ধরেছিল চোখের নীচে। যাক, ঈশ্বরের কৃপায় প্রচুর অর্থ-সামর্থ্য ব্যয় করার পর যূথিকা বেঁচে উঠল। আবার সে ফিরে এল এই আলোয়, হিমাংশুর স্পর্শানুভূতির গণ্ডির মধ্যেই। কিন্তু সে-যূথিকা আর নয়। মিষ্টি, মোলায়েম চেহারা আর নেই; বিবর্ণ, শুষ্ক, অস্থিসার, দীপ্তিহীন। তার শরীরে একটা গোলমেলে অঙ্গই চিরকালের জন্যে বিকল করে দিলে ডাক্তাররা। দ্বিতীয় কোনো পুতুলের সম্ভাবনা থাকল না আর ওর জীবনে। না থাকুক; এক পুতুলই যথেষ্ট। যাকে হারাবার আশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, সেই যখন ফিরে এল তখন হৃতস্বাস্থ্য, বাঁ-পা টেনে টেনে হাঁটা নির্জীব স্ত্রীই এক মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের আনন্দস্বাদ বয়ে এনেছে হিমাংশুর জীবনে। খুঁত নিয়ে কে তখন মাথা ঘামায়? হিমাংশু ঘামায়নি; আজও ঘামায় না বোধহয়। খালি এইটুকুই মনে হয়, দুর্বল স্বাস্থ্যের আর সম্ভবত শারীরিক গোলমালের জন্য যূথিকার স্বভাবেও কেমন একটা নির্জীবত্ব এসে পড়েছে দিনে দিনে।

সে-তুলনায় হিমাংশু অবশ্য ছেলেমানুষই, অন্তত ছেলেমানুষের মতন চঞ্চল, চপল দুরন্ত স্বভাবের। এর জন্যে যদি দোষারোপ করতে হয়, তবে তার স্বতঃস্ফূর্ত জীবনীশক্তিকেই করা

উচিত। প্রখর যৌবনের অমিত তাপে তার প্রাণশক্তি উথলে উঠেছে, উপড়ে পড়ছে। তা নিয়ে কি করবে হিমাংশু তাই যেন ভেবে পায় না। অফিস শেষে সাইকেলটাকে হাওয়ার গতিতে রাস্তার পাশ ছুঁয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, র‍্যাকেট হাতে খেলতে নামলে হার্ড সার্ভিসে অপর পক্ষকে নাস্তানুবুদ করে তোলে, প্রতিটি অঙ্গ মত্ত হয়ে ওঠে টেনিস বলের চকিত বিচরণে। এতেই সে শেষ নয়, বা এতটুকুতেই। সুইমিং ক্লাবে আজও সে ট্রেনার; ব্যাকস্ট্রোকে সাঁতারু যুবকদের ভীতিস্থল। ছোটোদের দল হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় চাঁদা উঠোতে, পুজোর প্যান্ডেল সাজাতে। বন্ধুরা ধরে নিয়ে যায় তাদের আড্ডায়, চৌরঙ্গি পাড়ায় পানীয়-কক্ষে কখন হয়তো। শেষের জিনিসটা সম্পর্কে তার আকর্ষণ বা অনুৎসাহ কোনোটাই নেই। কেমন একটা ঝোঁকের মাথায় চলে যায়। আর দেখা যায়, এমন দিনে বেশ রাত্রিতেও কার্জন পার্কে চক্কর মারছে হিমাংশু। মনে মনে হিসাব কষে যতক্ষণ না স্থির ধারণা জন্মাচ্ছে পুতুল ঘুমিয়ে পড়েছে, ততক্ষণ ট্রামে উঠবে না ও। রাগ করলেও যূথিকার কাছে ক্বচিৎ-কদাচিৎ এ-অপরাধের মার্জনা আছে। ভয় পুতুলকে। পাছে পুতুল বুঝতে পারে, বাবা তার মদ খেয়েছে—সেই ভয়ে অনেক রাত করে অসাড় পায়ে হিমাংশু বাড়ি ঢোকে; উঁকি দিয়ে দেখে, মেয়েটা ঘুমিয়েছে কিনা। বিছানায় শুয়ে সেদিন নিজের ওপর যত রাগ, তত ঘৃণা হিমাংশুর। ছি-ছি এমন নেশার দরকার কি, যাতে মেয়ের কাছে যেতে লজ্জা, মেয়েকে পাশে ডাকতে ভয়। সারা সন্ধে মেয়েটা নিশ্চয় কান পেতে বসে থেকেছে, পড়ার টেবিলে বসে বই খুলে রেখেছে অযথাই, একটা অক্ষরও চোখে দেখেনি। খেতে বসে খুঁতখুঁত করেছে। শেষ পর্যন্ত অভিমানভরেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। মনটা ভয়ংকর রকম মুষড়ে পড়ে হিমাংশুর। শুয়ে শুয়ে প্রতিজ্ঞা করে আর নয়—বন্ধুদের এই বাজে ফূর্তির পাল্লায় পড়ে নেশা-টেশা আর করছে না সে।

পরের দিন ভোর হতে না-হতেই মেয়েকে নিয়ে আদরের আতিশয্য শুরু হয়ে যায়। যেন প্রায়শ্চিত্ত করছে হিমাংশু। সকাল-দুপুরটুকু কোনোরকমে কাটল, বিকেল থেকে বাপ-মেয়ে পাশাপাশি ছায়ার ছায়ায় জোড়া। দোতলার খোলা বারান্দায় ফুলের টবে জল দিচ্ছে হিমাংশু, একদমে দুশো-আড়াইশো ক্রশ স্কিপ করে পুতুল ঘন ঘন শ্বাস টানছে, মুখ লালচে। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে সেজেগুজে বেড়াতে বেরোয় মেয়েকে নিয়ে হিমাংশু। ট্যাক্সি চড়, টফি কেন, গল্পের বই চাও ত তাই ঃ রিবন পেনসিল গ্রামোফোনের রেকর্ড—যা চাও।

এমনি এক প্রায়শ্চিত্তের দিনে সকাল থেকে যা শুরু হয়, যূথিকা তা মোটেই সহ্য করতে পারে না। মুখ ফুটে স্পষ্ট করে বলাও যাচ্ছে না কিছু। এক পিসতুতো বোন এসেছে ওর দিল্লি থেকে আজ সকালেই। বিকেল পর্যন্ত থাকবে; তারপর যাবে তার ভাইয়ের বাসায়। সেই বোন, শিপ্রা যার নাম দিল্লির কোনো এক মেয়ে-কলেজে পড়ায়, এখনো কুমারী। যূথিকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে শিপ্রা। ওর সংসারের খুঁটিনাটি দেখছে আর গল্প করছে দিল্লির, আত্মীয়স্বজনের। আর বলতে কি, এরই ফাঁকে তার রোল্ডগোল্ডের চশমার ফাঁক দিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে বাপ আর মেয়েকে। যূথিকাও সেটা লক্ষ্য করছে। কিন্তু অবস্থাটা এমন, কিছুই বলা যায় না। সবচেয়ে বেশি রাগ হয় যূথিকার ক্যালেন্ডারের লাল তারিখের ওপর। এত ছুটি যে কেন থাকে অফিস আর স্কুলের, যূথিকা বুঝতে পারে না। না থাকত ছুটি আজ, মেয়ে নিয়ে অত ঘটাপটা করে আদিখ্যেতা করার অবসর জুটত না হিমাংশুর। ছি, ছি শিপ্রাদি দেখছে ত। ভাবছে, কে জানে। নিশ্চয় ভালো কিছু নয়। আভাসে, যেন শিপ্রাদি বুঝতে না পারে, তেমন

ইঙ্গিতে, তবু কয়েকবার চেষ্টা করল যূথিকা হিমাংশুকে সরিয়ে নেবার—কিন্তু কেউ গায়ে মাখল না সে-কথা। প্রকাশ্যে কিছু বলতেও সঙ্কোচ হয়। কে জানে শিপ্রাদি যদি তেমন একটা খারাপ চোখে না নিয়েও থাকে, যূথিকার কথায় হয়তো অন্যরকম একটা ধারণা হবে। অগত্যা রুষ্ট হলেও ভয়ংকর একটা অস্বস্তি চেপে রেখে যূথিকাকে সহজভাবেই সব দেখতে হয়, সহ্য করতে হয়। ওদিকে, ফাঁকা উঠোনে শীতের রোদ্দুরে, বালতিতে ঠাণ্ডা গরম জল মিশিয়ে হিমাংশু তরল সাবানের ফেনা দিয়ে পুতুলের চুল ঘষে দেয়, পা-হাত রবারের স্পঞ্জ দিয়ে রগড়ে তেল উঠিয়ে ধবধবে করে, অলিভ অয়েল মাখায়।

বেলা গেল, দুপুরও। বিকেলের দিকে শিপ্রাদির ভাইপো গাড়ি নিয়ে হাজির। জোর তাগিদ তার। তাড়াতাড়ি চলে গেল শিপ্রাদিও।

খানিক পরে দেখা যায়, বাপ-মেয়ের সাজগোজও শেষ হয়েছে! এবার তাঁরা বেরুবেন। যূথিকা থমথমে মুখে সব দেখে যাচ্ছে, একটাও কথা বলেনি। বলবে না, এই তার প্রতিজ্ঞা বোধহয়। শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং তারপর। আজ যেন সেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, ধূমায়িত হচ্ছে ভেতরে ভেতরে।

যাবার আগে হিমাংশু স্বভাবমতন কিছু টাকা চাইল। চাবিটাই দিয়ে দিল যূথিকা। তারপর কাপড় কাচতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। ফিরে এসে দেখে, হিমাংশুরা চলে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে এরই মধ্যে। বেশ অন্ধকার।

একটু রাত করেই ফেরে হিমাংশুরা। পায়ের শব্দ শোনে ঘরে বসে যূথিকা। হাসিখুশি মুখ আর একটা অয়েলপেপারে মোড়া প্যাকেট হাতে ঘরে ঢোকে হিমাংশু একাই। চেয়ারে বসতে বসতে প্যাকেটটা যূথিকার দিকে এগিয়ে দেয়—, "নাও দেখ ত কেমন হল তোমারটা!"

হাত বাড়াবার আগ্রহ দেখা যায় না যূথিকার। নিস্পৃহভাবে ও বসে থাকে, নির্বিকার মুখে। ধৈর্য ধরতে পারে না হিমাংশু। অয়েলপেপারের আচ্ছাদন খুলে ফেলে পশমের জামাটা এবার এগিয়ে দেয়। যূথিকা দেখে অল্প একটু সময়, তারপর কেমন একটা অভ্যাসবশে হাত বাড়িয়ে জামাটা টেনে নেয়।

জামা দেখছে না মনে মনে কিছু ভাবছে যূথিকা, ঠাওর করা মুশকিল। হয়তো ভাবছে এবং ভাবনটাই ওর আড়ষ্ট হাতকে অল্প একটু চঞ্চল করেছে; যার ফলে পাট খুলে গেছে পশমের জামার। নরুন-সরু হাসির ছোঁয়া যূথিকার ঠোঁটে ফুটি-ফুটি করছে যেন।... এমন সময়টিতে দেখা গেল পুতুলকে, দরজার গোড়ায়, একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যূথিকার। চোখাচোখি হল মা আর মেয়েতে। মার চোখ মেয়ের সর্বাঙ্গ লেহন করল। আর পরমুহূর্তেই যূথিকার সারা মুখ থমথমে হয়ে আসে, একটু রোদের আভাস ফুটতে-না-ফুটতেই আকাশ যেন আবার কালো মেঘে ছেয়ে যায়। থমথমে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয় যূথিকা। ভুরুর ওপর আঁচড় কেটে অদ্ভুত একটা বিরক্তি চোখের পাতায় এসে জমেছে। দৃষ্টিটা এখন তার দেওয়ালে; তীরের ফলার মতো ছুঁচালো হিংস্র একটা টিকটিকির মুখের ওপর। হাতের আঙুলগুলোও যে জ্বালা করছে, এতক্ষণে স্পষ্ট যেন অনুভব করতে পারে যূথিকা। তবে তাই হবে, মোলায়েম পশমে নয়, তুষের আগুনেই অজান্তে হাত রেখেছিল ও।

ছুঁড়েই দিয়েছে, নাকি হাত থেকে খসে পড়েছে ঠিক বোঝা যায় না, দেখা গেল পশমের জামাটা যূথিকার পায়ের তলায় মেঝেতে পড়ে। এক পলক মার দিকে তাকিয়ে, এগিয়ে এল

পুতুল, টুপ করে জামাটা কুড়িয়ে নিল। চোখেমুখে তার অনেক বিস্ময়, কিছু কাতরতা। কী হল মার? পছন্দ হয়নি? এমন আকাশ নীল রঙ জামাটার, গলার কাছে দু-সুতোয় তোলা সাদা ফুল আর লতার কাজ, দামও প্রায় বাইশ, বাস্তবিক যা সুন্দর, খুবই পছন্দ হয়েছে ওদের—ওর আর ওর বাবার; তাই কিনা অপছন্দ মার? মনটা মুষড়ে পড়ে পুতুলের। তবু চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে থাকে, মোলায়েম পশম মুঠোয় ভরে, বোকার মতন, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে।

হিমাংশু মেয়েকেই দেখছে, সেই মেয়েকে যার নাম পুতুল, দেখতেও পুতুলের মতনই—অমনই নধর গঠন, সুডৌল, সুশ্রী। টিয়াপাখি রঙের নিউ স্টাইল সোয়েটার পুতুলকে যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে, এতই অপরূপ যে, হিমাংশু মেয়ের দিকে তাকিয়ে তন্ময়, তদ্‌গত। ওই যে পুরু জমাট রক্তগোলাপ—পুতুলের সোয়েটারের বুকের ওপর নকশা তোলা—ওই গোলাপের লাল আভা যেন পুতুলকে আলো করে তুলেছে; তার গায়ের সবুজ, মুখ-চোখ হাত-পা'র লালচে সাদায় সেই আলোর ঢেউ ফেনার মতোন ছড়ানো-ছিটানো।

খুশিতে উপচে উঠে হিমাংশু ডাক দেয়, "গ্র্যান্ড! কাছে আয়, কাছে আয় ত পুতুল দেখি—"

হিমাংশুর উচ্ছ্বাস আর ঘরের আলো দুই যেন বেশ তীব্র। কাজেই যূথিকা চোখ না ফিরিয়ে পারে না। আর আশ্চর্য, হিমাংশু কাছ ঘেষে দাঁড়াবার আগেই যূথিকা মেয়ের চোখে চোখ রেখে তাকিয়েছে বিষাক্ত দৃষ্টিতে।

পুতুল মার কুঞ্চিত চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায়। সামনে বাড়ানো পা আস্তে আস্তে টেনে নেয় পিছনে। হঠাৎ সব যেন আড়ষ্ট হয়ে এসেছে ওর।

মেয়ের মুখ থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে স্ত্রীর ওপরই রাখতে হয় হিমাংশুকে। আর সেদিকে তাকিয়ে চট করে ফিরিয়ে নেওয়াও সম্ভব হয় না। সহাস্য, উজ্জ্বল, মুগ্ধ একটি মুখ ধীরে ধীরে মলিন হয়ে আসে।

যূথিকা একপাও সরে আসে নি, একটুও নড়ে নি—শুধু ঘাড় ফিরিয়েছিল যতটুকু ততটুকুই ফিরিয়ে রেখেছে এবং মেয়েকেই দেখছে এখনো, ঠিক তেমনি ভাবেই, অসহ্য একটা বিরক্তিতে। বোঝা যায়নি যূথিকা এবার কথা বলবে, ঠোঁট নাড়তেই বোঝা গেল। একটা চিকন স্বর থেমে থেমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল, ঘরের সুপ্তি নিষ্করুণ একটি আদেশের কাঠিন্যে থমথমে হয়ে ভেঙে পড়ল।

"ও ঘরে গিয়ে জামা ছেড়ে চুপচাপ বসগে যাও। শালটা গায়ে জড়িয়ে নিও।"

চোখ নামিয়ে নিয়েছে পুতুল অনেক আগেই। মার আকাশ-নীল রঙের পশমের জামার বোতামটাই অনর্থক খুঁটে চলেছে ও। বড্ড শক্ত, নখ বসে না। দাঁত দিয়ে কামড়াতে পারলেই যেন বেশ হত।

পুতুল ফিরেই যাচ্ছে, হিমাংশুর কথায় দাঁড়াল।

"তোমার শাসনের ঠেলায় বাপু অস্থির! তোর মার জামাটা দে ত পুতুল।" হিমাংশু হাত বাড়ায়। পুতুলকে বাবার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে আসতে হয় আবার। আসতে আসতেই বাবার কথা আবার কানে যায়, "পুতুলের গায়ে কেমন মানিয়েছে সোয়েটারটা বললে না? এবারে এই ডিজাইনটাই নতুন এসেছে।"

মার দিকে না তাকিয়েও পুতুল বুঝতে পারে, ভালো লাগেনি মার; কিছুতেই ভালো লাগতে পারে না।

"টাকাগুলোকে খোলামকুচির মতন ভাব তুমি!"—যূথিকা বলছে, পুতুলও শুনে যাচ্ছে, "ছাইভস্ম কিনে আনছ, যা-তা ভাবে খরচ করছ। বলার কিছু নেই, ভালো লাগে না বলতে আমার।"

জানা কথাই, মা এই ধরনের কিছু বলবে। পুতুল তাড়াতাড়ি বাবার হাতে মার জামাটা কোনোরকমে ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যায়।

পুতুল চলে যেতে হিমাংশু যূথিকার দিকে তাকাল। যূথিকাও স্বামীর দিকে। দু'তিন পা সরে এসে বিছানায় বসে পড়ে ও।

"কি হল তোমার আবার?" হিমাংশু জানতে চায়, "অযথা মেয়েটাকে ধমকালে কেন?"

"ধমকালেই বা কি—!" যূথিকা হাত বাড়িয়ে হিমাংশুর হাত থেকে জামাটা টেনে নেয়। বিছানার এক পাশে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, "তোমার মেয়ের এসব ধিঙ্গিপানা আমার ভালো লাগে না! তুমি ওকে দিন দিন কী করে তুলছ? আমি ভেবেই পাই না—এরপর কী হবে?"

"ও, এই! সেই পুরনো কাসুন্দি;" খানিকটা স্বস্তি পায় হিমাংশু। মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে! কোলের ওপর থেকে গরম শালটা তুলে বিছানার ওপর রেখে দেয়। আরাম করে সিগারেট ধরায় একটা।

যূথিকা তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখে। স্বামীর ভাবভঙ্গি থেকে মনের কথাটাও বোঝা যায়। অর্থাৎ হিমাংশু যে তার কথাগুলো পরম অবহেলায় সরিয়ে রাখল, যূথিকা তা বুঝতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে রাগটা দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে ওঠে ওর।

"এসব তোমায় ছাড়তে হবে।" যূথিকা আদেশের সুরে বলে।

"কি?"

"মেয়ে নিয়ে এই ন্যাকামো!"

হিমাংশু স্ত্রীর দিকে চেয়ে এবার হেসে ফেলে; বলে, "মুশকিলে ফেললে। মেয়ের মাকে নিয়ে ন্যাকামি করতে চাইলেই কি তুমি রাজি হবে?"

যূথিকা ধমক দিয়ে ওঠে, "সব সময় তোমার এই তাচ্ছিল্যভাব আমার ভালো লাগে না।"

"কি-ই বা আমার ভালো লাগে তোমার?" হিমাংশু উঠতে উঠতে বলল "ওই তো জামাটা আনলাম তোমার—ওটাই কি ভালো লেগেছে?"

"উঠো না; বসো।" যূথিকা হাত বাড়িয়ে স্বামীর পাঞ্জাবির হাতা ধরল, "আমার জন্য তোমায় জামা কিনে আনতে বলিনি।"

"না বললেই কি আনতে নেই?" হিমাংশু আবার বসে পড়েছে, "ইচ্ছে করে, আদর করেও তো মানুষ কিনে আনে।"

"আমার বেলায় ইচ্ছেও নয়, আদরও নয়"—যূথিকা কুটিল সুরে বলছে, নিষ্ঠুরের মতন, ধারাল গলায়, "নেহাতই না আনলে নয়, বাধ্য হয়ে মন রাখতে এনেছ।"

হিমাংশু চুপ। যূথিকার মুখ থেকে দৃষ্টিটা তুলে নিয়েছে। এখন দেওয়ালের টিকটিকিটা তার লক্ষ্যে।

যূথিকার গলায় একটা শিরা নীল হয়ে ফুটেছে, কাঁপছে দপদপ। একটু থেমে কথাগুলো যেন গুছিয়ে নিল ও।

"এভাবে আমায় তুমি ভোলাতে চাও কেন? আমি কি ছেলেমানুষ?"

"বোধহয় তাই।" হিমাংশু আবার একবার চেষ্টা করল সহজ হবার। ফিকে একটু হাসি

টেনে বলল, "তুমি আজকাল অল্পতেই বড়ো চটে ওঠ। তোমাদের মা-মেয়ের দুটো জামা কিনে এনে কি এমন অপরাধ করেছি, বুঝছি না।"

"বুঝবে না, বুঝবে না—" যূথিকা অধৈর্য হয়ে উঠেছে, "মেয়ের তোমার গরম জামার অভাব আছে কিনা তাই একটু আঁটবুক, আধ কোমরে মেমজামা কিনে আনলে? ছি ছি, চোখেরও একটা ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে মানুষের!"

"ফ্রকের সঙ্গে অমন জামাই ত পরে; মানানসই বলেই না কিনেছি।"

"যে পরে পরুক, আমার মেয়েকে আমি পরতে দেব না। বেহায়াপনার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তোমরা বাপবেটিতে। কী ভাবে লোকে—ছি-ছি! পনেরো বছরের আইবুড়ো মেয়েকে তুমি—তুমি—" যূথিকা ঠোঁটের কথাটা যেন চেপে নিয়ে অনেক কষ্টে অন্য কথা টানল, "তুমি ফ্রক পরিয়ে রাস্তা-ঘাট ঘুরিয়ে আনছ।" ঘৃণায় নাক, চোখ, মুখ কুঁচকে ওঠে যূথিকার।

"বয়সটা এমন কি বেশি?" হিমাংশুকেও যেন আজ তর্কের নেশায় পেয়েছে, "শাড়ি সামলাতে পারবে কেন পুতুল?"

"আমরা কিন্তু পেরেছি।" যূথিকার গলায়, ঠোঁটে শ্লেষ ফুটছে তীক্ষ্ণতর হয়ে, "পনেরো বছরেই আমার বিয়ে হয়েছে, ষোলো বছরে মা হয়েছি। শুধু শাড়ি নয়, মেয়েও সামলেছি।"

বলার কথা আর খুঁজে পায় না হিমাংশু। তর্কের নেশাটাও হঠাৎ থিতিয়ে যায়। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে যেন ও পনেরো বছরের সেই কিশোরী যূথিকাকে খোঁজবার চেষ্টা করছে এবং তুলনা করবার চেষ্টা করছে এই একত্রিশ বছরের যূথিকার সঙ্গে।

যূথিকাও উঠে পড়েছে। স্বামীর পাশে বসে থাকার মতন ধৈর্য নেই আর তার। অদ্ভুত একটা রিরি সারা গায়ে-মনে। অস্বস্তিকর, অসহ্য জ্বালা। বাইরে শীত; তবু সেই শীতের হাওয়ায় গিয়ে না দাঁড়ালে ঘামের মতন লেপটে থাকা এই অস্বস্তিকর জ্বালা থেকে যেন মুক্তি নেই।

বাঁ পা-টা টেনে টেনে যূথিকা চলে যায়। হিমাংশু তাকিয়ে দেখে।

তারপর দুটো দিন যূথিকা গুম হয়ে থাকে। যতদূর সম্ভব কম কথা বলে, গলার স্বর খাদে নামিয়ে সংসারে তার উপস্থিতিটাকে নিরাসক্ত রাখতে চায়। তিন দিনের দিন গুমট ভাবটা কাটতে শুরু করে, পরদা চড়ে যূথিকার স্বরের। আড়ালে বাপ আর মেয়ে মজা পাওয়ার হাসি হাসে। ওরা জানে, যূথিকার রাগের বহর কতখানি, তার পরিণতি কোথায়। এবার জেরটা একটু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল, এই যা। তা হোক, গুমট ভাবটা কাটার সঙ্গে সঙ্গে হিমাংশু আর পুতুল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। এখন কিছুদিন শাসনের রাসটা একটু আলগাই থাকবে। যূথিকার স্বভাবই তাই। মেয়ে-বাপ—দুজনেই তা জানে। আর সেই কথা ভেবে দুজনেই পরম খুশি।

চারদিনের দিন পড়ল শনিবার। জানা গেল দুপুরে যূথিকা যাবে শিপ্রাদিদির বাসায়। ফিরবে সন্ধেবেলায়। পুতুল স্কুল থেকে ফিরে এসে বাড়িতে একাই থাকবে, হিমাংশু যেন অফিসের ছুটির পর আড্ডা মারতে না গিয়ে সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসে।

স্কুলের বাসে ওঠার আগে পুতুল চুপি চুপি হিমাংশুকে তারিখটা স্মরণ করিয়ে দেয়, "আজই কিন্তু থার্টিন্থ বাবা; ভুলো না। সেই রসিদটা আমি তোমার শার্টের বুকপকেটে রেখে দিয়ে গেলাম।"

রসিদের কথা ভোলেনি হিমাংশু, কিন্তু অফিসের পর অন্য এক ঝামেলায় পড়ে তার দেরি হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে বেশ বিকেল। পুতুল তখন ঝি রাসমণির সাহায্যে পিঠের ওপর সাপের মত দুই বেণী ঝুলিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বাবার হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে খুশির দাপটে পুতুল বললে, "আমি ভাবছিলাম তৈরিই হয়নি বোধহয়, দর্জিদের কাণ্ড ত। তুমি এত দেরি করলে কেন, বাবা?"

মেয়ের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে হিমাংশু চেয়ারে বসল পা ছড়িয়ে। টানটান হয়ে। ঝুপ্ করে বাবার পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল পুতুল। তড়িৎ হাতে জুতোর ফিতে খুলে, মোজা খুলে—জুতো জোড়া হাতে করে উঠে দাঁড়াল। ঘরের এক কোণে রাখল। বলল, "আমি তোমার চা করে আনি, হ্যাঁ—তুমি একটু জিরোও।"

"তা না হয় জিরচ্ছি। কেমন করল ওটা দেখলি না?"

"দেখব দেখব। দাঁড়াও না। তোমায় চা দিয়ে নিই আগে। হাত-মুখ ধুয়েই একবারে পরব।" সাপের মতন দুই লিকলিকে বেণী নাচিয়ে পুতুল ছুটল চা তৈরি করতে।

চা শেষ করে হিমাংশু আরাম করে সিগারেট ফুঁকল। উঠে ট্রাউজার ছেড়ে ধুতিটা জড়িয়ে নিল। বাইরের ফাঁকা দালানে অন্ধকার নেমেছে ততক্ষণে। তাতে কী? বেশ একটা আমেজ আর আরাম লাগছে। হিমাংশু চেয়ারের ওপর এলিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকল। টুক করে আলো জ্বলে উঠল ঘরের। চোখ খুলে হিমাংশু দেখে, পুতুল একেবারে ঘরের মাঝটিতে দাঁড়িয়ে, আলোর তলায়। সদ্যপরিচ্ছন্ন ধবধবে মুখটিতে ফুটফুটে হাসি। চোখের তারায় ফুলঝুরির দীপ্তি। গায়ে তার সদ্য-আনা ক্রিমসন রঙের সেই লুজ ফ্রক। চুলের একটা বিনুনি গলার পাশ দিয়ে বেঁকা হয়ে বুকের মাঝটিতে এসে পড়ছে—আগায় যার সাদা জরির রিবন তৈরি ফুল। ঝিক্‌মিক্ করছে আলোয়। ঠিক যেন একটি লতান ডাঁটার ওপর এক থোকা ফুল ফুটে রয়েছে। আশ্চর্য, আশ্চর্য সুন্দর এই পুতুল। কি নিখুঁত অঙ্গ! কপাল, মুখ, চোখ, ঠোঁট, গলা—সব যেন সামঞ্জস্য করে কেউ এঁকেছে নিপুণ তুলিতে। দুটি হাত—যত নিটোল তত কোমল; দুটি পা তাও যেন লালচে মোমের ছাঁচে গড়া মসৃণ মোলায়েম, মধুর।

"মন্দ করে নি, না বাবা?" পুতুল লাজুক হাসি হাসে।

মেয়ের গলার স্বরে তন্ময়তা ফিকে হয় হিমাংশুর।

"ওয়ান্ডারফুল! রঙটা তোকে বিউটিফুল মানিয়েছে।"

"একটু কিন্তু বেশি ঢিলে করে ফেলেছে, যাই বল—।" মেয়ে খুঁত ধরছে এবার।

"নাম যখন লুজ ফ্রক তখন ত একটু ঢিলে-ঢালা হবেই, বোকা—!"

"বই-কি, তা বলে এত! এই দেখ না; হাঁটুর কাছটা ঘাগরা মতন হয়ে গেছে, আর পিঠের কাছটায় বড্ড বেশি কাপড় রেখেছে, বুকের কাছে একটা কুঁচি দিতে হবে নিজেকেই—।" পুতুল একে একে টুকটাক খুঁত ধরিয়ে দিচ্ছে।

হিমাংশুকে উঠতে হয়। এত খুঁত যখন, তখন একবার ভালো করে দেখতে হয় অবশ্য। মেয়ের কাছটিতে এসে দাঁড়ায় ও। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে। ফ্রকের কাপড়ের ঝুলের অংশটা একবার উঁচু করে একটু। মেয়ে বলে, "হ্যাঁ—ওই পর্যন্ত হলে ভালো হত।" হিমাংশু মাথা নাড়ে, "ঠিক।" তারপর বুক। হিমাংশু বুকের দু-পাশের কাপড় দু-হাতের আঙুল আলতো করে ধরে কাপড়ের বিস্তৃতিটা পরখ করে সঙ্কুচিত করে বুকের বস্ত্রাংশটা।—"কুঁচি দিয়ে নিলে কি ভালো দেখাবে রে—বরং একটু ছোটো করতে দিয়ে এলে হয়।"—"না না, দরকার কি," পুতুলের আপত্তি, "আমি হাতেই এমন সুন্দর করে একটা হানিকম্বের কাজ করে দেবো। দেখো—।" এরপর কোমর। সত্যি ঝেড়প বড়ো করেছে, কাপড় রেখেছে একরাশ। হিমাংশুর

দুই বিঘতের মধ্যে পুতুলের কোমরটা আঁট হয়ে থাকে। কি সরু, সুন্দর কোমর পুতুলের—হিমাংশু পরখ করে, ভাবছে, "তুই এবার একটু আধটু নাচ শিখলেই ত পারিস, পুতুল—যা সরু কোমর তোর"।... পুতুল আনন্দে আত্মহারা ঃ "সত্যি নাচ শিখতে ভীষণ ইচ্ছে আমার। আমাদের ক্লাসের রেখা, ছন্দা ওরা ত শেখে, কোথায় যেন। কিন্তু আমি যেন একটু ভারী বাবা; ওরা বেশ হালকা।"..."ভারী?" হিমাংশু হো হো করে হেসে ওঠে, টপ্ করে কোমরে বিঘত জড়িয়ে শূন্যে তুলে নেয় মেয়েকে। আচমকা মাটি থেকে পা উঠে যেতেই পুতুল ভয়ে হিমাংশুকে আঁকড়ে ধরে—তা হাত হিমাংশুর মাথার চুলে ঘাড়ে টলে পড়ে। ক্রিমসন রঙের লুজ ফ্রকের আড়ালে হিমাংশুর নাক, চোখ, মুখ সব ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু একটা অট্টহাসির অনেকখানি শব্দ ঘরের বাতাসে।

পুতুলকে নামিয়ে দিতেই সে গা মুখ ঘুরিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে গিয়ে হঠাৎ কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। অর্ধস্ফুট শব্দ বেরুল, "মা!"

তাকাল হিমাংশু। দরজার গোড়ায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যূথিকা আর শিপ্রা। মনে হল, ওরা অনেকক্ষণই এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

"কখন এলেন আপনারা?" হিমাংশু শিপ্রার মুখে চোখ ফেলে হাসল, আসুন—

"এসেছি অনেকক্ষণ, মেয়ে নিয়ে যা মত্ত ছিলেন, বুঝবেন কি করে?" শিপ্রার ঠোঁটের পাশে একটু বাঁকা হাসি খেলে গেল।

আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই যূথিকা শিপ্রাকে টেনে পাশের ঘরে চলে যায়।

আগের দিন কিছু না বললেও আজ শিপ্রা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা তুলল, "তোর মেয়ের বয়স কত হল রে যূথি?"

"পনেরো।" বিরস, গম্ভীর মুখ যূথিকার।

"দেখলে যেন আরো একটু বেশি মনে হয়। তা বড়ো-সড়ো হয়েছে; ওকে ফ্রক পরিয়ে রাখিস কেন? চোখে কটকট করে লাগে।"

"সাধ করে কি পরিয়ে রাখি?" যূথিকা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তিক্তস্বরে বলছে, "ওর বাবার শখ, মেয়েকে শাড়ি পরতে দেবে না।"

"বাবার শখ?" ঠোঁট উলটে শিপ্রা একটা বিশ্রী শব্দ করল, "হিমাংশুর এই শখ নিজের চোখেই দু'দিন দেখলাম।" আবার একটু থামল শিপ্রা, তারপর গলার স্বর নীচু করে যেন উপদেশ দিচ্ছে, এমনভাবে বলল, "জিনিসটা মোটেই ভালো নয় যূথি। এসব আসকারা তুই দিবিনে। এ এক ধরনের কমপ্লেক্স।"

যূথিকা শেষ কথাটা বুঝল না। শিপ্রাদির চোখের দিকে তাকাল।

"মানে?"

"মানে—? ও, সে তুই বুঝবি না।" শিপ্রা যূথিকার অজ্ঞতাকে উপেক্ষা জানিয়ে অনুকম্পার হাসি টেনে আনল, ঠোঁটে, "আসলে যূথি...এই—এই—ধরনের রুচি কি বলব যেন একে—হ্যাঁ, এই ধরনের রুচি খুব খারাপ, নোংরা।"

যূথিকা কয়েক মুহূর্ত ফ্যাকাশে, অর্থহীন চোখে তাকিয়ে থাকে শিপ্রাদির মুখের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়ায় আস্তে আস্তে। আলমারি খুলে টাকা বের করে। খান পাঁচেক দশ টাকার নোট এনে শিপ্রার মুঠোর মধ্যে গুঁজে দেয়।

"এতে হবে তোমার?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ; যথেষ্ট। আমি তাহলে উঠি যূথি। বেশি রাত হলে বাড়ি খুঁজতে বিপদ হবে। টাকাটা তোকে দিল্লি ফিরে গিয়ে পাঠাব কিন্তু।"

"সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও না!"

"না, না, দরকার নেই। একাই বেশ, যেতে পারব। চলি, হ্যাঁ—।" শিপ্রা চলে যায়। নীচে নেমে বিদায় দিয়ে আসে যূথিকা।

ওপরে উঠে শাড়িটা বদলে নিয়ে কোনোরকমে বাথরুমে গিয়ে তপ্ত চোখে মুখে, হাতে-পায়ে অনেকখানি জল ঢালে, তারপর সেই সপসপে ভিজে অবস্থাতেই বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। বাতি নিভিয়েই।

যূথিকা যে সেই শুয়ে পড়ল আর উঠল না, কথা বলল না। রাত বাড়ল। পুতুল এসে ডাকল মাকে। কেমন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে ভাঙা চাপা গলায় যূথিকা বলল, "তোমরা খেয়ে-দেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। রাসমণিকে বল, সব গোছগাছ করে নীচের চাবি রেখে দিয়ে যাবে।"

রাত বেড়ে চলেছে। ঘড়িতে দশটা বেজে গেল। পুতুল এসে শুয়ে পড়ল মার পাশে। ধোয়ামোছা সেরে রাসমণি ওপরে এসে চাবি রেখে গেল। বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল দরজা। হিমাংশু অনেকক্ষণ হল পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। ও-ঘর এ-ঘরের মধ্যে যে দরজা তাতে কপাট থাকলেও সে কপাট বন্ধ হয় না; একটা পর্দা শুধু ঝোলে। ও-ঘরেই হিমাংশু শোয়, তার নিজস্ব কাজকর্ম করে। স্বামীর শোয়া-বসার জন্য, পুতুল বড়ো হবার পর, যূথিকা নিজের হাতেই এ-ব্যবস্থা করেছে।

হিমাংশুর ঘরে আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই সে ঘুমোয়নি। হয় কোনো বইয়ে, না হয় ক্রসওয়ার্ড পাজলে ডুব দিয়েছে।

ঘড়ির কাঁটায় শব্দ ঠেলে রাত গভীর হয়ে আসে। সব নিস্তব্ধ। শীতের রাত। সমস্ত পাড়াটাই এতক্ষণে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। এ বাড়িটাও। একটা বেড়াল সিঁড়ি দিয়ে পালিয়ে গেলে তার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, কেউ খিল খুললে, জানলার ছিটকিনি দিলেও খুট করে আওয়াজ ওঠে। এমন কি, পুতুল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেশে উঠছে—সেই খসখসে ভাঙ্গা আওয়াজ নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে কানে লাগে। অনেকখানি ঠাণ্ডা খড়খড়ির ফাঁক দিয়েও যেন যূথিকাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে। বারোটাও বেজে গেল। ঘড়ির সেই ঘণ্টা পেটার শব্দটা যেন বারোটা মুগুর পিটে গেল ঘরের অন্ধকারে। ধকধক করে যাচ্ছে যূথিকার বুক, খসখসে একঘেয়ে কাশি কেশে চলেছে পুতুল। ফট করে বাতি জ্বলে উঠল। যূথিকার বিছানার পাশে হিমাংশু।

দেখছে বই-কি হিমাংশু—পাশাপাশি মা আর মেয়েকে। যূথিকা ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে, বালিশের ভাজের তলায় মুখ চাপা, ডান হাতটাও গালের ওপর দিয়ে কপাল বেয়ে বালিশের প্রান্তে এগিয়ে রয়েছে। কিচ্ছু ভালো করে দেখা যায় না। চোখের পাতা বোজা।

মার দিকে মুখ করে কাত হয়ে ঘুমচ্ছে পুতুলও। ক্রিমসন রঙের সেই লুজ ফ্রক এখনো তার অঙ্গে। গায়ের লেপটা সরে গেছে—অর্ধেক দেহটাই তার খোলা। হিমাংশু আরো একবার মুগ্ধ চোখে মেয়েকে দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সাদা চাদর আর বালিশের ফেনার মধ্যে সূর্যাস্তের রঙ চোপান একটি ঢেউ যেন। হয়ত দুঃস্বপ্ন দেখে ঠোঁট খুলে কেমন একটু ককিয়ে উঠে থেমে গেল পুতুল, আবার কাশল খুকখুক করে। নড়েচড়ে উঠে ফের শান্ত। রাত্রে কাশিটা আবার

বেড়েছে মেয়েটার। যেভাবে শোয়, রোজই হয়ত ঠাণ্ডা লাগে। গলার কাছটায় অত খোলা না রাখলেই কি নয়। হিমাংশু হাত বাড়িয়ে গলার কাছটায় জামার টিপকলটা এঁটে দেয় পুতুলের। লেপটা টেনে দেয় গলা পর্যন্ত। কতকগুলো চুল কপালের পাশ দিয়ে চোখে এসে পড়ছিল। বারান্দার দিকের দরজাটা ফাঁকা হয়েছিল। বন্ধ করে দেয় হিমাংশু। ছিটকিনি তুলে দেয়। বাতি নেবায়। তারপর পরদা সরিয়ে যায় নিজের ঘরে।

বিছানার দিকে এগোতে যাচ্ছে হিমাংশু, হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে টান দিল চাদরে।

মুখ ফেরাতেই দেখে যূথিকা।

"তুমি ঘুমওনি?" হিমাংশু অবাক।

"না।" ঘুম থেকে ত নয়ই যেন খুব জ্বর থেকেও উঠে এসেছে, তেমনি শুকনো টকটকে ওর চোখ-মুখ, তেমনি বিশ্রী ঝাঁঝ আর তিক্ততা তার গলায়।

"কি করছিলে তবে এতক্ষণ?" হিমাংশু আবার এগুতে চায়।

"তোমার কীর্তি দেখছিলাম।" যূথিকা আবার বাধা দেয়।

"কীর্তি!" অবাক চোখে চায় হিমাংশু।

"তাই।" ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ে ধরেছে যূথিকা।

"স্পষ্ট করে বল যা বলতে চাও, হেঁয়ালি করো না। আমার ঘুম পাচ্ছে।" হিমাংশু এই প্রথম বিরক্ত হল।

"বলবই ত।" যূথিকা স্বামীর চাদর ছেড়ে দিল, অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টিতে তাকাল এদিক-ওদিক। তারপর হঠাৎ, যে-কপাট এতকাল খোলাই থাকত রাত্রে, সেইপাশে কপাটটা পরদা সরিয়ে বন্ধ করে দিল। এক মুহূর্ত থামল। কি ভাবল সে, কে জানে। দু-পা এগিয়ে সুইচটা অফ করে দিল। মুহূর্তে সারা ঘর অন্ধকারে ভরে গেল। খালি একপাশের এক খোলা জানালা দিয়ে বাইরের একটু আলোর আভাস জেগে থাকল।

"বাতি নেবালে কেন?" অন্ধকারেই বিছানার পাশে এগিয়ে গিয়ে বসলে হিমাংশু।

"অন্ধকারই ভালো। আলোয় তোমার মুখের দিকে তাকালে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়।"

হিমাংশু কতদূর বিস্মিত হয়েছে অন্ধকারে ঠাওর করা যায় না।

"রাত দুপুরে কি পাগলামি শুরু করলে, যূথি? কি যা তা বলছ?"

"পাগলামি নয়, যা বলছি তা তোমায় শুনতেই হবে। আমি আর পারছি না—আমার সহ্যশক্তি আর নেই—নেই।" যূথিকা সত্যিই বুঝি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে," তোমরা দু'জনে—মেয়ে আর বাপে মিলে আমায় শেষ করে ফেলছ। কি চাও তুমি, আমি চলে যাই, আমি মরে যাই?"

"এসব কি বলছ!"

"ঠিক কথাই বলছি। তুমি কি বল ত, মানুষ না পশু? পুতুল না তোমার মেয়ে?"

অন্ধকারেও হিমাংশু একবার চমকে উঠে স্ত্রীকে দেখবার চেষ্টা করল।

"রাত দুপুরে তুমি এই কথা বলতে এসেছ?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ। রাত দুপুরে তুমি যেমন লুকিয়ে পনেরো বছরের মেয়ের ঘুমন্ত চেহারা দেখতে যাও।"

"যূথি"—হিমাংশু কি যেন বলতে চায়। কিন্তু তার গলায় স্বর চাপা দিয়ে যূথিকার তীক্ষ্ণ,

অসম্ভব তিক্ত, একরাশ অভিযোগ স্রোতের মতন বেরিয়ে আসে।

"তুমি বাপ হতে পার, কিন্তু সে মেয়ে; তার রূপ আছে, বয়স আছে, তার কী নেই, কী হয়নি। জান না তুমি? তবু, এই মেয়ে নিয়ে তোমার বেহায়াপনা রোজ রোজ আমি দেখে যাচ্ছি। বাইরের লোক এসেও আজ দেখে গেল। ছি, ছি, ছি। কোন্ আক্কেলে তুমি ওর বুকে মুখ গুঁজে থাক, কোমর জড়িয়ে ধর।" যূথিকার হাঁফ ধরে যায়। তবু অনেক কষ্টে দম নিয়ে আবার সে বলে, "এতদিন বুঝিনি, আজ বুঝতে পেরেছি, মেয়েকে ফ্রক পরাবার বায়না তোমার কেন।"

"চুপ কর, চুপ কর, যূথি!" অন্ধকারেই হিমাংশু দাঁড়িয়ে উঠেছে। কাঁপছে তার গা, গলা।

"করব বইকি, চুপ ত করবই, চিরকালের মতনই। এত পাপ তোমার মনে তবু আমি থাকব ভেবেছ! আমি"—

যূথিকা আর পারে না, কান্নায় তার গলা একেবারেই বুজে এসেছে। অনেকটা ফোঁপানো আবেগের অদ্ভুত একটা ছমছমে শব্দ উঠিয়ে, আশ্চর্য করুণভাবে ডুকরে উঠে অন্ধকারেই ও চলে যায়। একটা শব্দ শুধু ওঠে। পাশের কপাট খুলে আবার বন্ধ হওয়ার শব্দ। সেই শব্দটা যেন হিমাংশুর বুকের হৃৎপিণ্ডে এসে আঘাত করে।

ক'টি তো মুহূর্ত। কিন্তু এই অল্প একটু সময়ের ব্যবধানে হিমাংশু এই ঘর, পরিবেশ, সংসার, স্ত্রী-কন্যা সমস্ত থেকে ছিটকে এক বীভৎস অন্ধকারে গিয়ে পড়ে। সেখানে কিছু কী আছে? বাতাস, আলো? কিচ্ছু না। শুধু সাপের কুণ্ডলীর একটা হিমস্পর্শ, আর প্রতি পলকে শত সহস্র বিষাক্ত দংশন। যার বিষে এখনো সে অসাড়, যার ক্রিয়ায় এখনো সে অচেতন এবং যে-দংশনে তার স্নায়ু মৃত।

নিছক একটা মানসিক প্রাণ এখনো আশ্চর্যভাবে গিরি-গোপন শীর্ণ জলপ্রবাহের মত ক্ষীণ স্রোতে বয়ে যাচ্ছে। শুধু এইটুকু মাত্র অনুভূতিতেই হিমাংশু এখনো কানের কাছে যূথিকার সেই তীক্ষ্ণ নির্মম নিষ্ঠুরের মতো শানিত কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে। আর শুধু শোনা নয়, যূথিকার প্রত্যেকটি অভিযোগ অদ্ভুতভাবে একটি একটি করে অসংখ্য ছবি ফুটিয়ে তুলছে। জীবন্ত করছে বহু ঘটনা, বহু মুহূর্ত, বহু অবচেতন অভীপ্সা। পুতুলের বুকে মুখ গুঁজে হিমাংশু হাসছিল বটে, কিন্তু কোথায় একটা সুধার স্পর্শ যেন ছিল। ঠিক, ঠিক—পুতুলের হাঁটুর ওপর থেকে বস্ত্র সরিয়েছেও, কিন্তু চোখে পড়ছে—একটি অন্য আকাশ, কি ফুল, সুডৌল রক্তশ্বেত একটি মেঘ, কি পাপড়ি। অস্বীকার করবে কি হিমাংশু, পুতুলের চুল, চোখ, সর্বাঙ্গের ঘ্রাণ ওর চিত্তে যে শিহরণ জাগিয়েছে তার মধ্যে কোনো আনন্দের স্বাদ ছিল না?

কোনো কিছুই অস্বীকার করবে না হিমাংশু; করতে চায় না আজ। এই নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কার কাছে কি গোপন রাখতে পারে সে? নিজেকে? তারই ত অংশ পুতুল। নিজেকে গোপন করার অর্থই ত পুতুলের কাছে নিজেকে গোপন করা। হিমাংশু তা পারে না। যদি মনের সঙ্গোপনে জট পাকিয়ে গিয়ে থাকে অজ্ঞাতে, অদ্ভুত কোনো কামনার আবর্ত সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সব আজ প্রকাশ হোক।

জানলাটা হট করে খুলে দেয় হিমাংশু। শীতের কুয়াশায় সমস্ত আচ্ছন্ন; পাশের বাড়িটাও হারিয়ে গেছে। হয়ত অমনিই হবে—স্নেহের আর পিতৃত্বের কুয়াশায় হিমাংশুর সত্য পরিচয় ঢাকা ছিল। আবার যেন একটা বিষাক্ত ছোবল খেয়ে ওর চিন্তাটাই অসাড় হয়ে এল।

বাতি জ্বালবে নাকি হিমাংশু? এত অন্ধকার! যেন একরাশ অশরীর প্রেতস্পর্শ ওকে ঘিরে রয়েছে। একটু আলো আসুক। হিমাংশু অস্থিরভাবে অন্ধকারে হাত বাড়ায়। হঠাৎ চমকে উঠে হাত সরিয়ে নেয়। না, না অন্ধকারেই ভালো। আলো নয়। আলো এসে হিমাংশুকে প্রকাশ করে দেবে, নিজেকেই নিজে দেখতে পাবে, স্পর্শ করতে পারবে। কুৎসিত একটা গলিত কুষ্ঠকে কি স্পর্শ করা যায়—না, প্রকাশ করা যায়! ঘিনঘিন করে ওঠে হিমাংশুর গা, মন, হাত, পা। থাক, অন্ধকারেই থাক। আর যেন আলো না ফোটে। হা ঈশ্বর!

পলে পলে পলাতক সময় এসে রাত চুরি করে নিয়ে যায়। কখন যেন হিমাংশুর খেয়াল হয় তার চোখ, মুখ, মাথা সব পুড়ে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা, জ্বালা। একরাশ ছুঁচ ফুটে চলেছে মাথায়। কোথায় যেন, কোথায় যেন? হিমাংশু শক্ত মুঠিতে চুল চেপে ধরে টানে। টানে। আঃ কি, আরাম।

জলের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে প্রত্যেকটি শিরা, প্রতিটি স্নায়ু। একটু জল।

হিমাংশু কেমন করে যেন বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে বেরিয়ে আসে। হুট করে ছুটে পালায় বেড়ালটা। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া এসে গায়ে মাথায় চোট দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আরো একটু সম্বিৎ ফিরে পায় হিমাংশু। বুক টেনে টেনে নিঃশ্বাস নেয়। দাঁড়িয়ে একবার আকাশ দেখে, কয়েকটা তারা। তারপর টুক করে বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে যায়। তারপর একটু মৃদু শব্দ। ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দেয় হিমাংশু।

বাথরুমে এসে দাঁড়াতেই হিমাংশুর খেয়াল হয়—কাচের উঁচু জানলা দিয়ে একটু ফরসা এসে ঢুকছে। পা পা করে এগিয়ে যায়, জল নয়, আয়নার দিকে। আয়নায় অস্পষ্ট, খুব অস্পষ্টভাবে মুখ দেখা যাচ্ছে তার। একেবারে কাছটিতে এসে দাঁড়ায় হিমাংশু। আয়নার বুকে একটা জল ধোওয়া শ্লেট-রঙের ছবি ফুটেছে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে হিমাংশু সেই ছবির মধ্যে কাকে বুঝি খুঁজছে।

গালে হাত তুলতেই ছবির মধ্যে থেকে সেই ছায়াকৃতি লোকটাও নড়ে ওঠে—হিমাংশু সে নয়, কারণ হিমাংশু পিতা, কিন্তু ও অন্য লোক, যে পিতা নয়, পশু। যার দৃষ্টি—ঈশ্বর, যার দৃষ্টি সুস্থ মানুষের নয়, জানোয়ারের।

হিমাংশুরই অসম্ভব ঘৃণা হয় তার ওপর—। শুধু ঘৃণাই নয়; তাকে ধিক্কার দেয় হিমাংশু, ইচ্ছে হয় ওর টুঁটি চেপে ধরে, ওর রক্তের পঙ্কিল গন্ধে...আশ্চর্য, আরো কি ফর্সা হয়েছে আকাশ— নাকি একটু আলো আসছে কোথাও থেকে। আয়নার ছবিটা আরো স্পষ্ট, আয়নার নীচের একটা সরু ব্র্যাকেটে সাজান দাড়ি কামানোর সাবান, ডেটল, ক্ষুর, সেই রবারের হ্যান্ডেল, ব্রাশ সব ফুটে উঠেছে।

জানোয়ারের চোখে চোখ রাখতেই আর ইচ্ছে হচ্ছে না হিমাংশুর। ওর রক্তের পঙ্কিল গন্ধ যেন ভেসে আসছে। বিকৃত মুখভঙ্গী করে হিমাংশু ব্র্যাকেটের ওপর থেকে ক্ষুরটা তুলে নেয়।

রক্তের স্বাদ আছে, কিন্তু গন্ধ আছে নাকি? নেই? কিন্তু ভ্যাপসা পচা ঘার মতন গন্ধ আসছে কোথা থেকে? পঙ্কিল রক্তের, কলুষ নিঃশ্বাসেরও হতে পারে। হতে পারে ওই পশুটার।

হিমাংশু আর সহ্য করতে পারছে না। ঘিনঘিনে গন্ধটা তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে গেছে এমন কি বুঝি রক্তেতেও মিশে গেছে।

মণিবন্ধের একটা শিরায় ক্ষুরটা জোর করে চেপে ধরল হিমাংশু। তারপর ছোট্ট একটু টান। ছত্রিশ বছরের অমিত তাপে তপ্ত একটা যৌবনের উষ্ণ শোণিত ফিনকি দিয়ে ছুটে এল। আঃ,

কি টনটনে আরাম। কি আরাম, কি শান্তি; যেন হু হু করে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। আরো একটু দ্রুত মুক্তি চাই, দ্রুত। এবার ডান হাতের মণিবন্ধে গভীরভাবে ক্ষুরটা টেনে দেয় হিমাংশু।

টুপ টুপ...জল কি পড়ছে নাকি? সিরসির করছে নাকি গা? ঘুম কি আসছে এতক্ষণে? হয়তো কিছুই না, সব ভুল—সব ভুল। তবু এ আশ্চর্য আরাম। যেন অনেক কলুষ রক্ত বিশুদ্ধ হাওয়ায় এসে শুদ্ধ হচ্ছে, তারই আরাম; একটা পুঁজ রক্ত ভরা ফোড়া থেকে আশ্চর্য যাদুবলে যেন সব কষ্ট কেউ শুষে নিচ্ছে, তারই স্বস্তি।

আরো একটু আলো এসেছে না ঘরে। হিমাংশু চমকে যায়। ইস্, এ যে অনেক রক্ত। কোথাও তা কালো রঙ নেই, সেই কুৎসিত কালো, যাতে পাপের বীজ লুকিয়ে থাকে। নেই, নেই—? হিমাংশু তবু খোঁজে, সতর্ক চোখে। যদিও কেমন যেন আচ্ছন্নতা আসছে এবং কান্নাও।

তবে কি নিষ্ঠুর সত্যটা ফাঁকি দিয়ে গেল? হিমাংশুর দুর্বল শরীরটা আর একবাব যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। আর এবার ক্ষুরের আগা দিয়ে শিথিল, কম্পিত স্খলিত হাতে গলায় একটা টান দেয়।

ধীরে ধীরে এতক্ষণে গভীর তন্দ্রা নেমেছে হিমাংশুর মনে, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাও ছড়িয়ে পড়েছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তৃষ্ণাটা তালুর কাছে এসে ঠেলে ওঠে।

বেসিনের কাছে হাত বাড়াবার চেষ্টা করে হিমাংশু, পারে না। মাথা ঢুলে আসে, মেঝেতেই লুটিয়ে পড়ে।

অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা পুরু ভারী লেপের মতন পা-মাথা সব ঢেকে ফেলেছে। বুক চুইয়ে যেন একটা প্রশ্বাস আসে; একটা নিঃশ্বাস যায়। অদ্ভুত একটা আবেগ গলার কাছে পুঁটলির মতো পাকিয়ে গেছে।—আর ঘুম—গভীর, গভীরতর আচ্ছন্নতা। এই আচ্ছন্নতার মধ্যেই আকাশ যেন দেখতে পেল হিমাংশু, খানিকটা আকাশ এবং ক্রিমসন রঙের একটি মেঘ।—মেঘ।—মেঘ। না, মেঘ নয় মেয়ে। হিমাংশুর মেয়ে যার নাম পুতুল, বয়স পনেরো বছর নয়, পনেরো দিন। অসহায়, উলঙ্গ, নির্বোধ একটি রক্তপিণ্ড। কে? মেয়ে। ...পনেরোটি পাপড়ি যেন আরও খুলে যায়, একে একে—একটি একটি করে—আর এক-একটি পাপড়িতে একটি করে বছর বিকশিত হয়ে ওঠে। পুতুল শুধু তিলে তিলে গড়ে উঠেছে—হিমাংশুর হাতে হাতে। কল্পনায়, বাস্তবে। যা শুধু শীর্ণ শাখা তাকে শাখায় শাখায় প্রসারিত করে, পত্রপল্লবে সাজিয়ে, পুষ্প সম্ভারে ছেয়ে দিতে—হিমাংশু তার জীবনের সমস্ত সুষমা, শ্রম, স্নেহ অকৃপণভাবে ব্যয় করে চলেছে। কেন? এ কে? তার মেয়ে? এ কি ভিন্ন? হ্যাঁ, দেহ থেকে ভিন্ন। কিন্তু তবু ভিন্ন নয়, রক্তের সেই আশ্চর্য লীলার কাছে ওরা এক, সেই আত্মায় ওরা অভিন্ন। ওর আত্মায় এর জন্ম, এর জীবন, এর লীলা। আর হিমাংশু জানে এই অভিন্নতাকেও একদিন ভিন্ন করতে হবে; এই আত্মাকেও। কী নিষ্ঠুর। গ্রন্থিমোচনের আশঙ্কায় হিমাংশু ভয় পায়। ভয় পায় কেন? পাবে না—? পাবে বইকি কারণ পুতুলও শেষে একদিন যূথিকা হয়েই সংসারে ফুটে উঠবে—ষোলো বছরে যার জীবন, যৌবন, প্রেম, উদ্দীপনা, আনন্দ—সব অন্ধকার করে নেমে আসবে একটি চিরাচরিত অভ্যাস—যা কুটিল, জটিল, সতত সন্ত্রস্ত। আর তখন? তখন হিমাংশু শূন্য; যেমন আজ, জীবনের সেই ছেলেবেলার সুখ, স্বপ্ন, মুক্তি সমস্ত থেকে সে শূন্য—যেমন বিতাড়িত যূথিকার উত্তপ্ত অনুরাগ থেকে। হিমাংশুর হৃৎপিণ্ডে এতক্ষণে একটা সাহস এল, ভাসমান মনে

একটি আশ্রয়। না, তবে এই ত কারণ, যা পনেরো বছরের পুতুলকে ছোটো দেখেছে, ছোটোই ভেবেছে। প্রার্থনা করেছে নিঃশব্দে, নিত্যদিন ঃ পুতুল, আমার পুতুল, আমার কাছে ছোটোটি থাক চিরকাল—ঈশ্বর, তুমি ওর যৌবন দিয়ো না, প্রজাপতির রঙ ছুঁড়ো না ওর মনে। ও যে আমার সেই ছেলেবেলা, আমার সেই সুখ, সেই মন আর আনন্দ। সেই আত্মা, একটি শুধু অক্ষয় স্মৃতি। পনেরো বছরে যূথিকাকে নিয়ে আমি যা হারিয়েছি, যূথিকা যা হারিয়েছে তার স্পর্শ কেন দেবে নিষ্ঠুরের মতন ওকেও?

হিমাংশু শেষে ঘুমের ঢেউয়ে ভেসে যাবার আগে চেষ্টা করল উঠে দাঁড়াবার, বাথরুমের দরজা ভেঙে ছুটে গিয়ে পুতুলকে বুকে জড়িয়ে ধরবার। কিন্তু তাই কি সে পারে? পারে না। মন দিয়ে স্মৃতিকে জীবন্ত করা যায়, আত্মাকেও, কিন্তু দেহকে?

হিমাংশু একবার চোখের পাতা খুলেছিল একটু আর সেই একটু জুড়ে বাইরের ফরসার মধ্যে একটি বিনুনি ঝোলানো ক্রিমসন রঙের মুখ ছিল, একটি মুখ যা হিমাংশুর আত্মার। যে-ছবি ও নিজেই দেখেছে আর কেউ নয়। কেউ না।

ঝড়

শক্তিপদ রাজগুরু

ক'দিন হলো রে এ মাসে তোর উর্বশীর?

সিগারেটে টান দিয়ে র‍্যাকের আড়ালে প্রশ্ন করে অসীম রেকর্ড সেকশনের পাঁচুকে। পাঁচু ফাইলের আড়ালেই ঢাকা থাকে, ওই লাট বন্দী ফাইলগুলোই তার নিরাপদ ব্যূহ। ওর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকে পাঁচুলাল। সারা অফিসের রেকর্ড সাপ্লায়ার সে। তাকবন্দী ঘরজোড়া ফাইল তার নখদর্পণে। কার কখন কত নম্বর ফাইল দরকার পাঁচুকে যোগান দিতে হয়।

অসীমের কথায় পাঁচু ইশারায় তাকে চুপ করতে বলে একটা খাতায় তারিখগুলো দেখিয়ে বলে—চারদিন হয়ে গেছে। এখনও দেখা নেই। বড়বাবুর পেয়ারের লোক হলে তোরও এমন এফ এল হতো রে!

অসীম মন্তব্য করে—ও সব এ জন্মে আর হবে না রে! শাড়ি তো পরি না।

ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘরে। অফিসের বাবুরা সব এসে গেছে। কাজও শুরু হয়েছে, হঠাৎ আবছা অন্ধকার ঘরটা যেন কি আলোর আভায় কিছুটা উল্লাস হয়ে ওঠে। বুড়ো গিরিধারীবাবু ফাইলে মন দিয়ে নোট লিখছিল, চাইল চোখ তুলে। পটলবাবু ফাইলে আড়ালে রেসের পাঁজি বই খুলে ঘোড়ার কুষ্ঠি ঠিকুজি মিলিয়ে 'সিওর টিপস্' বের করছিল, সেও চাইল।

বড়বাবু গোবিন্দলাল-এর কণ্ঠস্বর সরব হয়ে উঠেছিল। কেষ্টবাবুর ফাইল নিয়ে বড়সাহেব তাকে ডেকে বেশ কড়কেছে। গোবিন্দবাবু এমনিতে ফিটফাট মানুষ। দেহের বাঁধনও বেশ শক্তপোক্ত, বয়সের ছাপটা ওর দেহে কায়েম হযে বসেনি। মনটা এখন বেশ শৌখিন, পোশাকপত্র দেখেই সেটা বোঝা যায়. বিয়ে-থা করেনি গোবিন্দলাল। মাথার চুলগুলোতেও পাক ধরেনি, তেড়ির বাহারও আছে। অবশ্য তরুণ অসীমরা আড়ালে বলে—ব্যাটা কলপ মেখেছে। এ হেন গোবিন্দবাবুর শৌখিন মেজাজটা বেশ চড়ে ছিল। কেষ্টবাবুকে কড়কায়—কি কাজ করেন মশায়? ঘুমোন? বড়সাহেবকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে আমাকে? এসব দিয়ে চলবে না—বদলি করে দেব আপনাকে।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে যেন আলোর ঝলক ওঠে। গোবিন্দলালের উত্তপ্ত মেজাজ আর চড়া কণ্ঠস্বর নিমেষে বদলে যায়।

—আরে, এসো, এসো। ভাবলাম আজ বুঝি এলেই না।

নন্দিতা ঘরে ঢুকে ওর শূন্য চেয়ারে বসে হাঁপাতে থাকে। ফর্সা নিটোল গালে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ছোঁয়া, দামী ব্যাগটা রেখে চোখ থেকে রঙিন সান-গ্লাস খুলে শিলিং ফ্যানটার দিকে চাইল।

গোবিন্দবাবু হাঁক পাড়ে—শিবু, পাখাটা বাড়িয়ে দে, ফুলস্পিড করে দে।

পাখাটাও এবার কি উত্তেজনায় ঝড়ের বেগে ঘুরতে থাকে। নন্দিতা বলে—উঃ, কি জ্যাম। গাড়ি আর চলেই না।

গোবিন্দবাবু সায় দেয়—তা সত্যি, আসা-যাওয়াটা একটা প্রবলেম হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সামনে শীর্ণ নাক বের-করা কেষ্টবাবুকে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কথাটার জের

ধরে বলে গোবিন্দলাল—যান। বৃষকাষ্ঠের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন মশায়? ফাইল পড়ে নোট দেবেন। যত্তো সব।

কেষ্টবাবু বলে—ফাইলটা তো মিস্ রায়ের, ওকেই দিই—

এবার গোবিন্দলাল গর্জে ওঠে—ফাইলে কি কারো নাম লেখা আছে? ডিপার্টমেন্টের কাজ। আপনিই ওই ফাইল করবেন।

বড়বাবুর মর্জি, সুতরাং কেষ্টবাবু পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে টেবিলে ফিরলো। ততক্ষণে যার করণীয় ফাইল সেই মিস্ নন্দিতা রায় উঠে পড়েছে, পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য আর চটকে যাওয়া মেকআপ্ সঠিক কবরার জন্য লেডিজ রিটায়ারিং রুমের দিকে চলেছে।

...গোবিন্দবাবু তার দেহের ছন্দময়তার গভীরে যেন হারিয়ে গেছে। তার ঘুমন্ত মনে হঠাৎ কি যেন একটা নীরব সাড়া জাগে। মনের এই বিচিত্র ভাবান্তর তাকেও বিস্মিত করেছে। কবে তার অজান্তেই গোবিন্দবাবু ফেলে আসা যৌবনের দিনে ফিরে গেছে। কলেজ ছেড়ে সবে কলকাতায় এসেছে চাকরির সন্ধানে। তেমন চাকরি তখন জোটেনি, দু'তিনটে টুইশানী করতো এক বন্ধুর মেসে থেকে। মাধবীকে তখনই দেখেছিল। তার এক ছাত্রীর দিদি—কখন কীভাবে মাধবী তার জীবনে এসেছিল জানে না। প্রেম বোধহয় আসে গোপনে, অজান্তে। নীরবে চলে তার প্রস্তুতি।

...সেদিনের সেই স্মৃতিমুখর উজ্জ্বল মুহূর্তগুলো হারিয়ে গিয়েছিল তরুণ গোবিন্দলালের জীবন থেকে। কিন্তু আজ মনে হয় হারায়নি। মাধবী তার জীবন থেকে সরে গেছে কবে কোন অতীতে। ভেবেছিল গোবিন্দলাল, শূন্য জীবনের নিঃস্বতাকে বয়েই চলতে হবে তাকে। চলেছিলও। হঠাৎ তার সেকশনের নন্দিতা যেন সেই দিনগুলোকে তার মনে ফিরিয়ে এনেছে, এতকালকার জীবনের এক বিষণ্ণ অপরাহ্ণকে কি আলোয় উদ্ভাসিত করেছে।

...ফোনটা বেজে ওঠে কর্কশ শব্দে। গোবিন্দলালের স্বপ্নজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মনে হয় জীবনটা রসকষহীন কর্কশ, তার অন্যমন যেন স্বপ্ন দেখে কি স্নিগ্ধ সবুজের, এখানে যার কোনো অবকাশই নেই।

—হ্যালো! ফোনটা তুলে সাড়া দিতেই গোবিন্দলালের কানে যেন বাজপড়ার শব্দ ভেসে আসে। বড়সাহেব নিজে ফোন ধরে একটা ফাইল নিয়ে আলোচনার জন্য ডাকছে। গোবিন্দলাল চেয়ার ছেড়ে উঠে বলে—যাচ্ছি স্যার!

ফোন রেখে কাছাটা গুঁজতে গুঁজতে দৌড়লো বড়বাবু গোবিন্দলাল।

....রিটায়ারিং রুমে এসময় ভিড় থাকে না। মেয়েরা সবাই যে যার সেকশনে কাজে ব্যস্ত। নন্দিতার মতো আয়াসে অনেকেই নেই। ছেলেদের সঙ্গে সামনে তাদের পরিশ্রম করতে হয়। নন্দিতা জেনেছে সহজভাবে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে মুক্ত বিহঙ্গীর মতো বাঁচার মন্ত্রটাকে। জানে সেই পুঁজি তার আছে। তাই জীবনকে সে অন্য চোখে দেখে।

নন্দিতা আয়নার দিকে চেয়ে মুখে হালকা পাউডারের পাফ্‌টা বুলোতে থাকে। সুগৌর গায়ের রং, মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল সংযত খোঁপা বাঁধনে বেঁধে আধো শিথিল করে মোমরং ঘাড়ে ফেলা, স্লিভলেস ব্লাউজই বেশি পছন্দ করে নন্দিতা। কারণ সে দেখেছে তার নিটোল [illegible] ছন্দময় দুটো হাতের অনাবরিত অংশটা তাকে আরও মোহময়ী করে তোলে।

এই রূপই তার মূলধন। এর জন্য এসেছে সুশান্ত, ভবদেব, অরিন্দম, আরও অনেকে। হঠাৎ আবিষ্কার করেছে নন্দিতা ওই বয়স্ক গোবিন্দবাবুর চোখেও এক নতুন সাড়া। আর নন্দিতা সেটাকে কাজে লাগাতে চেয়েছে, সুবিধেই হয়েছে তাতে।

নন্দিতা এই চাকরি নিতে চায়নি। রূপের পসরা তার মনে এনেছে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ, নীরব অহঙ্কার, কিছু স্বার্থপরতাও। সেই বাধাগুলো তার মনে এনেছে অতৃপ্তির জ্বালাই, মনে হয় যা তার পাওয়া উচিত ছিল তা আদৌ পায়নি।

বাবা ছিলেন কোনো সওদাগরি অফিসের পদস্থ কর্মচারী, বিদেশ ঘুরে মনটাকেও উদার করেছিলেন, মাও অতি আধুনিকা হয়ে উঠেছিল স্বামীর পদমর্যাদা আর অর্থে। আজ বাবা নেই—তবু বাড়িটা রয়েছে, রয়েছে কিছু ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স আর দীঘার সৈকতে একটা বাড়ি। গাড়িখানাকে বিক্রি করে দিতে হয়েছে।

নন্দিতা বি-এ পাশ করেছিল সাধারণভাবে, কারণ পড়াশোনার চেয়ে কলেজের বন্ধুদের নিয়েই বেশি মেতে উঠেছিল, স্তাবকও জুটেছিল অনেক। নন্দিতা সেই স্বপ্নেই ডুবেছিল, ফলে এম-এ পড়া আর হয়নি। প্রকাশ সরোগীর বাবার বড় কারখানা, অরিন্দমের কাকা এয়ার ইন্ডিয়ার বিগ বস্। ভেবেছিল নন্দিতা, এয়ার ইন্ডিয়াতেই এয়ার হোস্টেসের কাজ পাবে, কিন্তু তেমন আশা না পেয়ে এই চাকরিটাই নেয়।

মা চেয়েছিল মেয়ে বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করুক, কিন্তু নন্দিতাই রাজি হয়নি। জীবন সম্বন্ধে তার ধারণাটা অন্যরকম, এখন থেকেই বিশেষ একজন পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হতে সে রাজী নয়। বন্দী জীবনকে সে ঘৃণা করে—তার মনের আকাশে সে চায় মুক্ত-বাধা বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়তে। তাই বাইরের জগতের পথ খোলা রাখার জন্যই এই চাকরি আপাততঃ নিয়েছে। আর এই চাকরির বন্দী জীবনেও কিছুটা মুক্তির আভাস পাবার জন্যই ওই ফুরিয়ে যাওয়া গোবিন্দলালকে ও মেনে নেবার ভান করে।

ঘড়িতে একটা বাজছে, দেড়টা থেকে আবার টিফিন। সুতরাং উঠলো নন্দিতা। সেকশনে এসে দুটো ফাইল টেনে নিয়ে বসলো। কানে আসে তার চাপা কথার সুর। রেকর্ড রুমের ওপাশে ফাইলের ব্যূহের আড়ালে অসীম, পাঁচুলাল, শিবুরা মন্তব্য করে—কাজে বসলেন এতক্ষণে!

শিবু বলে—টিফিন শেষ হলেই তো বের হবেন। চালা বাবা—

...গোবিন্দলাল নিজের টেবিলে বসেও চাপা মন্তব্যগুলো শোনে। নন্দিতাকে নিয়ে নানা আলোচনা হয় তা জানে। নন্দিতাও মাসে তিন-চার দিন আসে না, গোবিন্দবাবু হাজিরা খাতায় ওর নামে ঢ্যাড়াটা কাটে না, দু'চারদিন ঘরটা ফাঁকাই থাকে। হঠাৎ একদিন দেখা যায় নন্দিতা সই করে শূন্যস্থান পূর্ণ করে রেকর্ড ঠিকঠাক করে দিয়েছে, কিন্তু পাঁচুর ব্যক্তিগত খাতায় সেই দিনটা নোট হয়ে গেছে সে খবর জানে না গোবিন্দলাল নন্দিতাও।

বৈকাল নামছে। গোবিন্দলাল-এর কোনো বন্ধুর মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন, বারবার করে যেতে বলেছে বন্ধু। তাই গোবিন্দলাল বড়সাহেবকে বলে চারটার আগেই বের হয়েছে। নিউমার্কেট থেকে কিছু উপহার কিনে যাবে ঢাকুরিয়ায় সেই বন্ধুর বাড়ি।

গোবিন্দলাল নিউমার্কেট থেকে বের হয়েছে। ট্রামে বাসে খুব ভিড়। ট্যাক্সিই করতে হবে। হঠাৎ ওদিকে নন্দিতাকে দেখে চাইল।

নন্দিতা অবশ্য অফিস থেকে রোজই এসময় বের হয়। গোবিন্দলাল আপত্তি করেনি। কারণ নন্দিতা যখন তার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে নীরব কালো চোখের তারায় সাড়া তোলে তখন গোবিন্দলালের মনে ঝড় ওঠে, তার মসৃণ অনাবৃত বাহুমূল, বুকের মালভূমির বন্ধুরতা গোবিন্দের অতৃপ্ত মনে কি সাড়া আনে।

—আজ আসি! নন্দিতার কথার সুর গুঞ্জরণ তোলে। গোবিন্দলাল জানে পাঁচু অসীম কোম্পানী আড়ালে নানা মন্তব্যই করে, কিন্তু গোবিন্দলাল নন্দিতাকে ফেরাতে পারে না। বরং তার সব সুযোগ সুবিধা নেওয়াটাকে নীরবে সমর্থন করে। করে তৃপ্তি পায় মনে মনে।

—ওমা আপনি!

নন্দিতা এ পাড়ায় বৈকালে প্রায়ই আসে। অনেক সন্ধ্যা কাটে তার অরিন্দম, না হয় প্রকাশ-এর সঙ্গে কোনো রেস্তোরাঁয়, না হয় ওদের গাড়িতে গিয়ে হাজির হয় গঙ্গার ধারে, চাঁদনী রাতে ময়দানে ঘোরে। আজও এসেছে। গোবিন্দলাল নন্দিতাকে দেখে খুশিতে চমকে ওঠে—তুমি! এখানে?

নন্দিতা নিপুণ অভিনেত্রীর মতো মুখে-চোখে উচ্ছলতার আবেশ এনে বলে—এসেছিলাম উল কিনতে।

গোবিন্দলাল বলে—ট্যাক্সি ধরছি, বাড়ি ফিরবে তো! তোমার বাড়ি তো ঢাকুরিয়াতেই। ওদিকেই যাচ্ছি, চলো পথে নামিয়ে দেব।

নন্দিতা একটু ঘাবড়ে যায়। আজকের সন্ধ্যার হল্লাটাই মাটি হয়ে গেল। তবু জানে নন্দিতা লোকটাকে একটু হাতে রাখা দরকার। আর ওই বয়স্ক লোকটাকে নিয়ে একটু খেলা করতেও যেন মজা পায় সে। বলে নন্দিতা—আপনি আবার কষ্ট করবেন?

গোবিন্দ কৃতার্থ হয়। বলে—কষ্ট আর কি! ওদিকেই তো যাচ্ছি। চলো।

ট্যাক্সিটা যেন উড়ে চলেছে। মুগ্ধ গোবিন্দলাল-এর মনে হয় কোথায় কোনো অজানা সবুজে সে হারিয়ে গেছে।

গোবিন্দলালের মনে পড়ে ফেলে আসা দিনের কথা। সে আর মাধবী এমনি করে সন্ধ্যার দিকে আঁধারে আসতো ময়দানে। বাতাসে আজ নন্দিতার উড়ন্ত বেশ খোঁপার সুরভির সঙ্গে সেদিনের মাধবীর চুলের গন্ধ মিশে আছে। নন্দিতা দেখছে ওকে। শুধোয় হাল্‌কা কণ্ঠে—কি এত ভাবছেন? অফিসের কথা?

গোবিন্দলাল এতদিন ওই অফিসের নীরস ফাইলের ভিড়ে হারিয়ে গেছল। নিজেকেও ভুলে গেছল। আজ যেন তার হারানো সেই অতৃপ্ত মনকে খুঁজে পেয়েছে। গাড়ির ঝাঁকানিতে ওর দেহটায় মাঝে মাঝে নন্দিতার কোমল দেহের স্পর্শ লাগে, কি বিচিত্র অনুভূতিতে বিভোর হয় বঞ্চিত, ব্যর্থ গোবিন্দলাল। মনে হয় অসার চিন্তাতেই হারিয়েছিল নিজেকে। নন্দিতার কথায় বলে—ওসব আর ভালো লাগে না। ওই আপিস, ফাইল, বড়সাহেবের কচকচি ছেড়ে মনে হয়, কোথাও চলে যাই কিছুদিন। হাঁপিয়ে উঠেছি নন্দিতা।

নন্দিতা দেখছে ওকে। ওর মনের অতলে ঝড়টাকে যেন আরও প্রবলতর করে তোলাতেই তার আনন্দ। বলে নন্দিতা—তাই নিন না ছুটি! এত পরিশ্রম করেন কেন?

গোবিন্দলাল দেখছে ওকে। গোবিন্দলাল ওর কণ্ঠে সমবেদনার সুর শুনে খুশি হয়। বলে—তা

ট্যাক্সিটা এসে পৌঁছে ব্রিজের এপারে। গোবিন্দলাল বলে—চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

...নন্দিতাদের বাড়িটা এককালে বেশ জমজমাটই ছিল। অনেকখানি জায়গায় ছিল সাজানো বাগান। আজ সেখানে নেমেছে বিবর্ণতা। কয়েকটা আমগাছে সবে মুকুল ধরেছে, সন্ধ্যায় হিমেল বাতাস মুকুলের সৌরভে ভারি হয়ে উঠেছে, তাতে মিশেছে বাতাবি ফুলের সুবাস।

নন্দিতা যেন এমনি ভিজে সুবাস ভরা কোনো মুহূর্তের প্রতীক। বলে—চা খেয়ে যাবেন না?

গোবিন্দের বাসনাও ছিল আরও কিছুক্ষণ ওকে কাছে পাবার। কিন্তু বিয়ে বাড়ি হয়ে আবার তাকে ফিরতে হবে সেই বাগুইহাটির খালধারের বাড়িতে। তাই যেতে হবে তাকে। গোবিন্দলাল বলে—আজ তাড়া আছে, পরে একদিন এসে চা খাওয়া যাবে।

আসার আমন্ত্রণটা নিজেই রেখে গেল।

নন্দিতা গেট পার হয়ে বাড়ির দিকে এগোলো, হঠাৎ ড্রইংরুম থেকে অরিন্দমকে বের হতে দেখে চাইল। অরিন্দম শুধোয় ট্যাক্সিটাকে যেতে দেখে—কে নামিয়ে গেল?

— মানে! অরিন্দম অবাক হয়। হাসছে নন্দিতা, হাসির বেগে কাঁপছে ওর সারা দেহ, উদ্ধত বুক। নন্দিতা ওর গালে হাত বুলিয়ে হাল্‌কা সুরে বলে—বড্ড জেলাস তুমি অরি, মাই সুইট বয়! চলো—ঘরে চলো। সব বলছি।

স্বপ্ন নিয়েই ফিরেছে গোবিন্দলাল, যেন বাগুইহাটির মরা খালে সামান্য জলকাদার বুকে চাঁদেব আলো পড়েছে, বাতাসে কি সুর ওঠে। আজকের সন্ধ্যায় সেই সুবাস, নন্দিতার সমবেদনাব সুর, তার কোমল দেহের নিবিড় সান্নিধ্য গোবিন্দলালের মনের সব রুদ্ধ আগল খুলে দিয়েছে। কাজ নয়—কাজের মাঝেও সে যেন সুন্দর কিছু অবকাশ খোঁজে। সার্থক অবকাশ। থমকে দাঁড়িয়ে আরও কিছু পেতে চায় সে, তার শূন্য অঞ্জলি ভরে নিতে চায়। আজ জীবনকে উপভোগ করতে চায় শেষপাদে এসে গোবিন্দলাল।

অফিসের ওই ঘণ্টা কয়েকের সান্নিধ্য গোবিন্দলালকে এক পূর্ণতায় ভরিয়ে দেয়। নন্দিতাও সেটা বুঝেছে। তাই তার আসা যাওযাই হয় অফিসে, তার ভাগের ফাইলগুলো অন্য টেবিলে চারিয়ে দেয় গোবিন্দবাবু, তাকে কিছুই করতে হয় না। প্রজাপতির মতো রঙিন শাড়ির ডানা মেলে ঘোরে মাত্র।

অসীমরা বলে—বুড়োর ভীমরতি ধরেছে, দে ব্যাটাকে এগিয়ে, তারপর মজা দেখবি।

গোবিন্দলাল-এর সাহস ধাপে ধাপে বাড়ছে। সেদিন রবিবার সকালে কী ভেবে বাগুইহাটি থেকে সোজা ঢাকুরিয়ার বাগান-ঘেরা বাড়িটায় গিয়ে হাজির হয়। যেতে ঠিক চায় নি, তবু বার বার মনে জেগেছে নন্দিতার কথা, দু'দিন অফিস আসেনি। কে জানে অসুস্থ ও বোধহয়। একটা খবর নেবার অজুহাতেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। কড়া নাড়ছে—মনে হয় এখুনি নন্দিতাই হাজির হবে তার সামনে, কিন্তু হাজির হয় ওদের বাড়ির বুড়ো চাকরটা। —দিদিমণি তো নেই!

হতাশ হয় গোবিন্দ—কোথায় গেছেন?

চাকবটা জানায়—দীঘায় গেছেন মায়ের সঙ্গে। ক'দিন থাকবেন সেখানে। মায়ের শরীরটা ভালো নেই কিনা।

গোবিন্দলাল কি ভাবছে। দীঘা! নীল সমুদ্র, রূপালি বালিয়াড়ি আর ঝড়ো বাতাস, ব্যাকুল ঝাউবনের ছবিটা ভেসে ওঠে। অতীতে একবার অফিস থেকে গেছল বেড়াতে, সেখানে আজ রয়েছে নন্দিতা। গোবিন্দলাল-এর সারা মনে একটা ব্যাকুলতা জাগে।

নন্দিতার এমন 'ফ্রেঞ্চ লিভ' তো সাধারণ ব্যাপার, অফিসে এ নিয়ে কেউ কথা বলে না,

কিন্তু ওর অন্তর্ধানের পর গোবিন্দলালের ছুটি নেওয়ায় অনেকেই অবাক হয়। গোবিন্দলাল এতাবৎ অফিসে ছুটি নেয়নি। ব্যাচিলার মানুষ, সংসারের ঝামেলা নেই, তাই অফিসই ছিল তার ধ্যান জ্ঞান। হঠাৎ সাত দিনের ছুটি নিতে অসীম, পাঁচু কোম্পানী বলে—কি গো শীতলদা, যুগলেই ডুবছেন নাকি?

শীতলবাবু ফাইল থেকে চোখ তুলে বলে—হাবুডুবুই খাবে এবার বুড়ো!

কথাটা ভাবছে গোবিন্দ।

বহুদিন পর ছুটি পেয়েছে। ট্যুরিস্ট বাসটা কলকাতার ইটকাঠ-এর সীমা ছাড়িয়ে হাই-ওয়ে ধরে ছুটে চলেছে, সকালের আলোভরা সবুজ চারিপাশ, স্নিগ্ধ শান্তির স্পর্শ লাগে দেহে মনে। গোবিন্দলাল স্বপ্ন দেখে। দীঘার নির্জন ঝাউবনে ঘুরবে সে আর নন্দিতা। সুন্দরী মেয়েটিও তাকে দেখে অবাক হবে। সেই নিভৃত অবকাশে গোবিন্দলালই কথাটা পাড়বে। কি এমন বয়স হয়েছে তার। পঞ্চাশ বৎসর! এখনও শরীর ভেঙে পড়েনি, শক্তপোক্ত কাঠামো তার। আর নন্দিতার বয়স পঁচিশ তো হবেই। মেয়েদের বয়স বোঝা যায় না। বেশিও হতে পারে।

আর পাত্র হিসেবে গোবিন্দলাল খারাপও নয়। নিজের বাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও মন্দ নেই, গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড মিলিয়ে লাখখানেক তো হবেই, উপরি প্রায় হাজার টাকার মতো পেনসন—

নন্দিতা হয়তো অরাজী হবে না। সকালের আলো রূপালী রং ধরেছে, বাসটা চলেছে দীঘার দিকে। কটেজও বুক করা আছে সেখানে। ক'দিন স্বপ্নজগতে বাস করবে সে।

নন্দিতা আর অরিন্দম হঠাৎ চলে এসেছে দীঘায়। নন্দিতার মাও এসেছে, কিন্তু বাতের ব্যথায় সে কাতর। বাড়িতেই থাকে। নন্দিতা বের হয়ে যায় সকালে, অরিন্দমও এসেছে এখানে। কোনো নামী হোটেলে উঠেছে সে। নন্দিতার স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। অবিন্দমের চেষ্টাতেই তার এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে বিমান সেবিকার চাকরি হয়ে গেছে, সামনের মাস থেকেই জয়েন করবে বোম্বাই-এর ট্রেনিং সেন্টারে। তারপর দেশ-বিদেশে পাড়ি জমাবে মুক্ত বিহঙ্গীর মতো। জীবনকে দেখবে বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে। তারই প্রস্তুতি যেন শুরু করেছে দীঘার নীল সমুদ্রের রূপালি বালুচর আর ঝাউবনে।

অরিন্দম আর নন্দিতা বের হয়ে বেশ করে, ঝাউবনের ছায়ায় বসে ওরা দুজনে বিয়ার গিলে সমুদ্রে নামে, সাধারণতঃ এইদিকে কেউ আসে না সমুদ্রস্নান করতে। ওরা দু'জনে নিভৃতে বিয়ারের ঈষৎ ঘোর-লাগা চোখে দুজনে দুজনকে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা করে। অরিন্দম দেখছে নন্দিতাকে। পরনে দেহের রেখাগুলো সোচ্চার, সাঁতারে নামবার আগে নন্দিতা সুইমিং কস্টুম পরেছে। নিটোল হাত, পা-নিতম্ব প্রায় অনাবৃত। অরবিন্দের চেহারাতেও পৌরুষের ভাব প্রকট। সুগঠিত দেহ, সুইমিং সর্টস্ পরে আরও সুন্দর দেখায় তাকে। নন্দিতা কৃত্রিম রাগত স্বরে বলে—হাঁ করে কি দেখেছিলে?

হাসে অরবিন্দ। বলে—এমনিই। সেদিনের সেই সন্ধ্যাবেলা প্রেমিক টিকে তো আর দেখছি না?

নন্দিতা কলকলিয়ে ওঠে—হিংসা হচ্ছে নাকি!

অরিন্দম ওর অর্ধনগ্ন সোচ্চার দেহটাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—তা একটু হয় বৈকি। আমার এই ঐশ্বর্যকে অন্য কেউ দেখুক এ কি সহ্য হয় কোনোদিন? সে ব্যাটা কে বল তো?

—ওমা, খুনোখারাপিই করবে নাকি? তার দরকার হবে না। সেটা বুড়ো একটা হাঁদারাম,

আগেকার অফিসের বড়বাবু—একটু চটক দেখিয়ে অফিস ফাঁকি দিতাম মাত্র। উঃ, কি হরিবল হাঁদারাম ওই বুড়ো।

হাসছে অরিন্দম। ওর বলিষ্ঠ দেহের বাঁধনে ছায়াঘন নির্জনে বাঁধা পড়েছে নন্দিতা, স্বেচ্ছাবন্দি হয়েছে ওর পুরুষালী অত্যাচারের আনন্দে।

থমকে দাঁড়ালো গোবিন্দলাল। দীঘায় পৌঁছে এখানে ওখানে নন্দিতার সন্ধান করে ব্যর্থ হয়ে সমুদ্রধারের পথ দিয়ে ফিরছিল তার কটেজের দিকে। হঠাৎ ঝাউবনের নির্জনে কাদের হাসি-উছল সুরে কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে ঘন গাছের আড়ালে। এখান থেকে ওদের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠেছে। নন্দিতাই—এই উছল অর্ধনগ্ন লাস্যময়ী নন্দিতার রূপ দেখেনি এর আগে, চিরন্তন ব্যাকুল কামনাময়ী মেয়ের কোনো পুরুষের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে নিঃশেষ নির্লজ্জ আত্মসমর্পণও দেখেনি আগে। আর সেই নাটকের নায়িকা ওই নন্দিতাই, তার সম্বন্ধে কথাগুলো কানে আসে গোবিন্দলালের। সারা মনে ঝড় ওঠে—সমুদ্রের ওই গর্জন, ঝাউবনের ঝড় তার মনের সব আশা স্বপ্নকে কি তাণ্ডবে তছনছ করে দেয়।

দুটি তরুণ তরুণীর উছল কলরব ওঠে সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙা গর্জনে—জলে ভিজে রূপালী জলপরীর মতো দেখাচ্ছে নন্দিতার সুগঠিত উদ্ধত বুক, পেলব হাত, মসৃণ জঙ্ঘা, ছন্দময় নিতম্ব। অরিন্দমের আলিঙ্গনে কি খুশিতে হারিয়ে যেতে চায় নন্দিতা অজানা জগতে, হতাশ রিক্ত মন গোবিন্দলাল বুঝেছে সেই জগতে প্রবেশপথ তার অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। ফিরছে সে কটেজের দিকে।

পরদিনই গোবিন্দলালকে অফিসে আসতে দেখে অবাক হয় অসীম, পাঁচুর দল। মুখখানা গম্ভীব, থমথমে। চুলগুলো কলপে আর পরিপাটি নয়, মাঝে মাঝে পাকা চুলগুলো ঠেলে উঠেছে। হুঙ্কার ছাড়ে—সব ফাইল আপটু ডেট চাই আজই। অসীম, তোমার পেমেন্ট কমপ্লিট করতে হবে দুদিনের মধ্যে, আর কেষ্টবাবু, ফাইলে গড়বড় দেখলে চার্জশিট করা হবে।

ওদিকের চেয়ারটা খালিই রয়ে গেছে। নন্দিতা আর ফেরেনি। অসীমই খবর আনে, স্টাফ সেকশনে নাকি নন্দিতা রায় রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে বিলেতে ভালো চান্স পেয়েছে।

বড়বাবু গোবিন্দলাল ভরাটি গলায় বলে—লেট হা গো টু হেল। তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন হে। কাজ করো।

গোবিন্দলাল ও প্রসঙ্গ মন থেকে মুছে ফেলতে চায়, তবু বারবার মনে পড়ে সুগোর মোহময়ী একটি মুখ, ডাগর দুটো কালো চোখের নীরব চাহনি—তার পাশে সুইমিং কস্টুম পরা লাস্যময়ী একটি মেয়েকে। বিচিত্র এক স্বপ্নজগতকে—যা তার জীবনে আজ দূরের স্বপ্নই।

সমরেশ বসু

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তাছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্ত-ঘাতকের দল—চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে। লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলেছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চিৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলেছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী গাড়ি। তারা গুলি ছুঁড়ছে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এক জায়গায়। ডাস্টবিনটা উলটে এসে পড়েছে গলি দু'টোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা লোক। মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরস্ফিুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না—'আল্লাহ্-আকবর' কি 'বন্দেমাতরম্'। হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত-পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে।....নিশ্চল নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধহয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হলো। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা...ওপাশ থেকেও উঠে এলো ঠিক তেমনি একটা মাথা মানুষ। ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ নিশ্চুপ। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা—ধীর...। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এলো না। এবার দু'জনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল—হিন্দু না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয়তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দু'জনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে।

একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে—হিন্দু না মুসলমান?

—আগে তুমি কও। অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে।...

প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে—বাড়ি কোন্‌খানে?

—বুড়িগঙ্গার হেইপারে—সুবইড়ায়। তোমার?

—চাষাড়া—নারাইনগঞ্জের কাছে।...কী কাম কর?

—নাও আছে আমার, না'য়ের মাঝি।—তুমি?

—নারাইনগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে অন্ধকারের মধ্যে দু'জনে দু'জনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে।... হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও একটা শোরগোল ওঠে। শোনা যায় দু'পক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দু'জনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

—ধারে-কাছেই য্যান লাগছে। সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

—হ, চল এইখান থেইক্যা উইঠা যাই। মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল ঃ আরে না না—উইঠা না। জানটারে দিবা নাকি?

মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোনো বদ অভিপ্রায় নেই তো! সুতামজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই বলল—বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাক।

মাঝির মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি? তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো—ক্যান্?

—ক্যান? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল—ক্যান্ কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল।—যামু না কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল—তোমার মতলবডা তো ভালো মনে হইতেছে না। কোন্ জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারণের লেইগা?

—এইটা কেমুন কথা কও তুমি? স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—ভালো কথাই কইছি ভাই; বইয়ো, মানুষের মন বোঝো না?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কী ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হলো শুনে।

—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?

শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও যেন কাটে মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো। অন্ধকার গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ ছেলেমেয়েদের কথা...তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচে—কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত হাসাহাসি, কথা কওয়াকওয়ি—আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে? কি অভিশপ্ত জাত। সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিঃশ্বাস পড়ে।

—বিড়ি খাইবা? সুতা-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমতো দু'একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ্য করেনি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খস্‌খস্ শব্দের। মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ-ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

—হালার ম্যাচবাতিও গেছে সেঁতাইয়া।—আর একটা কাঠি বের করল সে। মাঝি যেন খানিকটা অবসুর হয়েই উঠে এলো সুতা-মজুরের পাশে।

—আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহি নি—আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু'একবার খস্‌খস্ করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

—সোভান্ আল্লা!—নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি।...ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

—তুমি...?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দু'জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট্ করে উঠে দাঁড়াল। বলল—হ্ আমি মোছলমান।—কী হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—কিছু হয় নাই, কিন্তু...

মাঝির বগলের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কী আছে?

—পোলা মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখানা শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব, জানো?

—আর কিছু নাই তো!—সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

—মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখ।—পুঁটুলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

—আরে না না ভাই, দেখুম আর কী। তবে দিনকালটা দেখছ তো? বিশ্বাস করন যায়—তুমিই কও?

—হেই ত হক্ কথাই। ভাই—তুমি কিছু রাখ-টাখ নাই তো?

—ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটা সুঁইও নাই। পরানটা লইয়া অখন ঘরের পোলা ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতা-মজুর তার জামা-কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দু'জনে বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনোযোগ-সহকারে দু'জনে ধূমপান করল খানিকক্ষণ।

—আইচ্ছা ... মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

—আইচ্ছা আমারে কইতে পার নি—এই মাই'র-দ'ইর কাটাকুটি কিয়ের লেইগা?

সুতামজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উৎকণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ ত' তোমাগো ওই লীগওয়ালোগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটুক্তি করে উঠল—হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?

—আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল-সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুড় পায়ের উপুড় পা দিয়া হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মারলাম আমরাই।

—মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নইলে এমুন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেম্‌বায়?—নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু'হাত দিয়ে হাঁটু দু'টোকে জড়িয়ে ধরে।

—হ।

—আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বলল—অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমুন্দি; নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কি? জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েবমশায় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান হজরতের হাত, বখশিশ দিত পাঁচ, নায়েব কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে।

সুতা-মজুর কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যেন বড়ো রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

—কী করবো? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটলিটাকে বগলদাবা করে।

—চল, পালাই। কিন্তুক যামু কোন্‌দিকে? শহরের রাস্তাঘাট তো ভালো চিনি না।

মাঝি বলল, চল যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর খামু না—ওই ঢ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

—হ। ঠিক কথাই কইচ। কোন্‌দিকে যাইবা কও—আইয়া তো পড়ল।

—এই দিকে।—

গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি। বলল, চল, কোনো গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাহলে আর ডর নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবারে পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুটফুট করছে। দুইজনেই একবার থমকে দাঁড়াল—ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এমোড়-ওমোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়ে এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের

বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে, উঁকি ঝুকি মারতে মারতে আবার তারা বেরুল।

—কিনারে কিনারে চল। সুতা-মজুর বলে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

—খাড়াও।—মাঝি চাপা গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

—কী হইল?

—এদিকে আইয়ো—সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পানবিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

—হেদিকে দেখ।

মাঝির সঙ্কেত মতো সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ-বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কি যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়া মধ্যে হাত মুখ নেড়ে। বারান্দার নীচে ঘোড়ার জিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলি পা ঠুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে—ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। আর একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই গাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল।—তবে?

—তাই কইতাছি তুমি থাক, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইবে না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বাড়িত যাইবা গা।

—আর তুমি?

—আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে।—আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কী হইল না হইল আল্লাই জানে। কোনোরকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

—আরে না না মিয়া, কর কী? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে।—কেমনে যাইবা তুমি, আঁ? আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

—ধইরো না ভাই, ছাইড়া দেও। বোঝো না তুমি কাইল ঈদ্, পোলামাইয়ারা সব আইজ চান্দ দেখছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিন্‌ব, বাপ্‌জানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই—পারুম না—মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

—যদি তোমায় ধইরা ফেলায়?—ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

—পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখান থাইকা য্যান উইঠো না যাই...ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থালে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব।— আদাব।

—আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুকধুকুনি তার কিছুতেই

বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগবান—মাঝি য্যান বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে। অনেকক্ষণ তো হলো, মাঝি বোধহয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা 'পোলামাইয়ার' কত আশা নতুন জামা পরবে, আনন্দ করে পরবে! বেচারা 'বাপজানের' পরান তো। সুতা-মজুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?'—সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে? মাঝি তখন—

—হলট...

ধ্বক করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কী যেন বলাবলি করছে চিৎকার করে।

—ডাকু ভাগতা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুডুম্, গুডুম্। দুটো নীলচে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলামাইয়ার, তার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিন। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

রমাপদ চৌধুরি

ফৌজি সংকেতে নাম ছিল বি এফ থ্রি থার্টি টু। BF 332। সেটা আদপে কোনো স্টেশনই ছিলো না, না প্ল্যাটফর্ম, না টিকিটঘর। শুধু একদিন দেখা গেল ঝকঝকে নতুন কাঁটাতার দিয়ে রেললাইনের ধারটুকু ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ব্যস্, ওইটুকুই। সারা দিনে আপ-ডাউনের একটা ট্রেনও থামতো না। থামতো শুধু একটি বিশেষ ট্রেন। হঠাৎ এক-একদিন সকালবেলায় এসে থামতো। কবে কখন সেটা থামবে, তা শুধুই আমরাই আগে থেকে জানতে পেতাম, বেহারী কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমরা পাঁচজন।

স্টেশন ছিলো না, ট্রেন থামতো না, তবু রেলের লোকদের মুখে মুখে একটা নতুন নাম চালু হয়ে গিয়েছলো। তা থেকে আমরাও বলতাম 'আন্ডা হল্ট'।

আন্ডা মানে ডিম। আন্ডা হল্টের কাছ ঘেঁষে দুটো বেঁটেখাটো পাহাড়ি টিলার পায়ের নীচে একটা মাহাতোদের গ্রাম ছিলো, গ্রামে-ঘরে মুরগি চরে বেড়াতো। দূরে, অনেক দূরে ভুরকুন্ডার শনিচারী হাটে সেই মুরগি কিংবা মুরগির ডিম বেচতেও যেতো মাহাতোরা। কখনো সাধের মোরগ বগলে চেপে মোরগ-লড়াই খেলতে যেতো। কিন্তু সেজন্য বি এফ থ্রি থার্টি টুর নাম আন্ডা হল্ট হয়ে যায়নি।

আসলে মাহাতো গাঁয়ের ডিমের ওপর আমাদের কোনো লোভই ছিল না।

আমাদের ঠিকাদারের সঙ্গে রেলওয়ের ব্যবস্থা ছিল, একটা ঠেলা-ট্রলিও ছিল তার, লাল শালু উড়িয়ে সেটা রেলের ওপর দিয়ে গড়গড়িয়ে এসে মালপত্র নামিয়ে দিয় যেতো। নামিয়ে দিয়ে যেতো রাশি রাশি ডিম। বেহারী কুক ভগোতীলাল আগের রাত্রে সেগুলো সেদ্ধ করে রাখতো।

কিন্তু সেজন্যেও নাম আন্ডা হল্ট হয়নি। হয়েছিল ফুল-বয়েলড্ ডিমের খোসা কাঁটাতারের ওপারে ক্রমশ স্তূপীকৃত হয়ে জমেছিলো বলে। ডিমের খোসা দিনে দিনে পাহাড় হচ্ছিল বলে।

ফৌজী ভাষার বি এফ থার্টি টু-র প্রথমেই যে দুটো অ্যালফাবেট, আমাদের ধারণা তা কোনো সংকেত নয়, ব্রেকফাস্ট কথাটার সংক্ষিপ্ত রূপ।

রামগড়ে তখন পি ও ডবলু ক্যাম্প, ইটালিয়ান যুদ্ধবন্দীরা সেখানে বেয়নেটে আর কাঁটাতারে ঘেরা। তাদেরই মাঝে মাঝে একটা ট্রেনে বোঝাই করে এ পথ দিয়ে কোথায় যেন চালান করে দিতো। কেন এবং কোথায়, আমরা কেউ জানতাম না।

শুধু আমরা খবর পেতাম ভোরবেলায় একটা ট্রেন এসে থামবে।

ঠিকাদারের চিঠি পড়ে আগের দিন ডিমের ঝুড়িগুলো দেখিয়ে কুক ভগোতীলালকে বলতাম, তিনশো তিন ব্রেকফাস্ট।

ভগোতীলাল গুনে গুনে ছ'শো ষাট আর গোটা পঁচিশ ফাউ বের করে নিতো। যদি পচা বের হয়। তারপর সেগুলো জলে ফুটিয়ে শক্ত ইঁট হয়ে গেলে তিনটে সার্ভার কুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে খোসা ছাড়াতো।

কাঁটাতারের ওপারে সেগুলোই দিনে দিনে স্তূপীকৃত হতো।

সকালবেলায় ট্রেন এসে থামতো, আর সঙ্গে সঙ্গে কামরা থেকে ট্রেনের দু'পাশে ঝুপঝাপ নেমে পড়তো মিলিটারি গার্ড। সঙ্গিন উঁচু করা রাইফেল নিয়ে তারা যুদ্ধবন্দীদের পাহারা দিতো।

ডোরা-কাটা পোশাকের বিদেশি বন্দিরা একে একে কামরা থেকে নেমে আসতো বড়োসড়ো মগ আর এনামেলের থালা হাতে।

দুটো বড়ো বড়ো ড্রাম উলটে রেখে সে দুটোকেই টেবিল বানিয়ে সার্ভার কুলি তিনজন দাঁড়াতো। আর ওরা লাইন দিয়ে একে একে এগিয়ে এসে ব্রেকফাস্ট নিতো। একজন কফি ঢেলে দিতো মগে, একজন দু'পিস করে পাউরুটি দিতো, আরেকজন দিতো দুটো করে ডিম। ব্যস্, তারপর ওরা গিয়ে গাড়িতে উঠতো। কাঁধে আই. ই. খাকী বুশ-শার্ট পরা গার্ড হুইস্‌ল্ দিতো, ফ্ল্যাগ নাড়তো, ট্রেন চলে যেতো।

মাহাতোরা কেউ কাছে আসতো না, দূরে দূরে ক্ষেতিতে জনারের বীজ রুইতে রুইতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে দেখতো।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর ভগোতীলালের জিম্মায় টেন্ট রেখে আমরা কোনো কোনো দিন মাহাতোদের গ্রামের দিকে চলে যেতাম সবজির খোঁজে। পাহাড়ের ঢালুতে পাথুরে জমিতে ওরা সরষে বুনতো, বেগুন আর ঝিঙেও।

আন্ডা হল্ট একদিন হল্ট-স্টেশন হয়ে গেল রাতারাতি। মোরম ফেলে লাইনের ধারে কাঁটাতারে ঘেরা জায়গাটুকু উঁচু করা হলো প্ল্যাটফর্মের মতো।

তখন আর ধু-ধু পি ও ডবলু নয়, মাঝে মাঝে মিলিটারি স্পেশালও এসে দাঁড়াতো। গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট পরা হিপ পকেটে টাকার ব্যাগ গোঁজা আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল। মিলিটারি পুলিশ ট্রেন থেকে নেমে পায়চারি করতো, দু-একটা ঠাট্টাও ছুঁড়তো, আর সৈনিকের দল তেমনি সারি দিয়ে মগ আর থালা হাতে একে একে এসে রুটি নিতো, ডিম নিতো, মগ ভরতি কফি। তারপরে যে যার কামরায় আবার উঠতো, খাকী বুশ শার্টের গার্ড হুইস্‌ল্ বাজিয়ে ফ্ল্যাগ্ নাড়তো, আমি ছুটে গিয়ে সাপ্লাই ফর্মে মেজরকে দিয়ে ও. কে করতাম।

ট্রেন চলে যেতো, কোথায় কোন্ দিকে আমরা কেউ জানতে পারতাম না।

সেদিনও এমনি আমেরিকান সোল্‌জারদের ট্রেন এসে দাঁড়াল। সার্ভার কুলি তিনটে ডিম রুটি কফি সার্ভ করেছিলো। ভগোতীলাল নজর রাখছিলো কেউ ডিম পচা কিংবা রুটি স্লাইস-এন্ড বলে ছুঁড়ে দেয় কিনা।

ঠিক সেই সময় আমার হঠাৎ চোখ গেল কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে।

কাঁটাতারের থেকে আরো খানিক দূরে মাহাতোদের একটি নেংটি-পরা ছেলে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে দেখছে। কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা ছেলেটাকে একটা বাচ্চা মোষের পিঠে বসে যেতে দেখেছি একদিন।

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলো ট্রেনটা। কিংবা রাঙা-মুখ আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিলো।

একজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ 'হে-ই' বলে চিৎকার করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে নেংটি-পরা ছেলেটা পাঁইপাঁই করে ছুটে পালালো মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে। কয়েকটা আমেরিকান সৈনিক তখন হা হা করে হাসছে।

ভেবেছিলাম ছেলেটা আর কোনো দিন আসবে না।

মাহাতোরা কেউ আসতো না, কেউ না। ক্ষেতিতে কাজ করতে করতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা শুধু অবাক-অবাক চোখ মেলে দূর থেকে দেখতো।

কিন্তু তারপর আবার যেদিন ট্রেন এলো, ট্রেন থামলো, সেদিন আবার দেখি কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা কাঁটাতারের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে আরেকটা ছেলে, তার চেয়ে আরেকটু বেশি বয়েস। গলায় লাল সুতোয় ঝুলোনো দস্তার তাবিজ, ভুরকুণ্ডার হাটে একদিন গিয়েছিলাম, রাশি রাশি বিক্রি হয় মাটিতে ঢেলে, রাশি রাশি সিঁদুর, তাবিজ (তামার পিতলের দস্তার), বাঁশে ঝোলানো থাকে রঙিন সুতলি, পুঁতির মালা। একটি ফেরিওয়ালাকে দেখেছি কখনো কখনো এক হাঁটু ধুলো নিয়ে, কাঁধে অগুন্তি পুঁতির ছড়া, দূর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে যায়।

ছেলে দুটো অবাক-অবাক চোখ মেলে কাঁটাতারের ওপারে দাঁড়িয়ে আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিলো। প্রথম দিনের বাচ্চাটার চোখে একটু ভয়, হাঁটু তৈরি, কেউ চোখে একটু ধমক মাখালেই সে চট করে হরিণ হয়ে যাবে।

আমি হাতে ফর্ম নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলাম, সুযোগ পেলে হেসে হেসে মেজরকে তোয়াজ করছিলাম। একজন সৈনিক তার কামবাব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মগে চুমুক দিতে দিতে ছেলে দুটোকে দেখে পাশের জি আই-কে বলল, অফুল!

আমার এত দিনে মনে হয়নি। ওরা তো দিব্যি ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, গুলতি নয়তো তীরধনুক নিয়ে খাটাশ মারে, নাটুয়া গান শোনে, হাঁড়িয়া খায়, ধনুকের ছিলার মতো কখনো টানটান হয়ে রুখে দাঁড়ায়। নেংটি পরা সরু শরীর, কালো, রুক্ষ। কিন্তু ব্যাটা জি. আই-এর 'অফুল' কথাটা যেন আমাকে খোঁচা দিলো। ছেলে দুটোর ওপর আমাব খুব বাগ হলো।

সৈনিকদের কে একজন গলা ছেড়ে এক কলি গান গাইলো, দু-একজন হা-হা কবে হাসছিলো, একজন চটপট কফির মগে চুমুক দিয়ে সার্ভার কুলিটাকে চোখ মেরে আবাব ভরতি করে দিতে বললে। গার্ড এগিয়ে দেখতে এলো আর কত দেরি। পাঞ্জাবি গার্ড কিন্তু দিব্যি চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে কথা বললে মেজরের সঙ্গে।

তারপর হুইস্‌ল্ বাজলো, ফ্ল্যাগ নড়লো, সবাই চটপট উঠে পড়লো ট্রেনে, হাতে চওড়া লাল ফিতে বাঁধা মিলিটারি পুলিসরাও।

ট্রেন চলে গেলে আবার সেই শূন্যতা, ধূ-ধূ বালির মধ্যে ফণিমনসার গাছের মতো শুধু সেই কাঁটাতারের বেড়া।

দিন কয়েক পরেই আবার একটা ট্রেন এলো। এবার পিও ডবলু গাড়ি, ইটালিয়ান যুদ্ধবন্দীরা রামগড় থেকে আবার কোথাও চালান হচ্ছে। কোথায় আমরা জানতাম না, জানতে চাইতাম না।

ওদের পরনে স্ট্রাইপ-দেওয়া অন্য পোশাক, মুখে হাসি নেই, রাইফেল উঁচিয়ে সারাক্ষণ ওদেরি ট্রেনটা চারদিক থেকে গার্ড দেওয়া হতো। আমাদেরও একটু ভয়-ভয় করতো। ভুরকুণ্ডায় গল্প শুনে এসেছিলাম, একজন নাকি ধুতিপাঞ্জাবি পরে পালাবার চেষ্টা করছিলো, [illegible] কী। বাঙালি বলেই আমার আরও ভয়-ভয় করতো।

ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর লক্ষ্য করলাম, কাঁটাতারের ওপারে শুধু সেই বাচ্চা ছেলে দুটো নয়. খাটো কাপড়ের একটা বছর পনেরোর মেয়ে, দুটো পুরুষ ক্ষেতের কাজ ছেড়ে এসে

দাঁড়িয়েছিলো। ট্রেন চলে যাওয়ার পর ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করলো, হাসলো, কলকল করতে করতে ঝরণার জলের মতো মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে চলে গেল।

একজন, দু'জন, পাঁচজন—সেদিন দেখি জন দশেক মাহাতো গাঁয়ের লোক ট্রেন আসতে দেখে মাঠ থেকে দৌড়তে শুরু করেছে। ট্রেনের জানলায় খাকী রং দেখেই বোধহয় ওরা বুঝতে পারতো। দিনে দু'খানা প্যাসেঞ্জার মেল ট্রেনের মতো হুস করে বেরিয়ে যেতো, দু-একখানা গুডস্ ট্রেন ঠুংঠুং করতে করতে। তখন তো কই থামবে ভেবে মাহাতো-গাঁয়ের লোক আসতে না ভিড় করে।

একদিন গিয়ে বলেছিলাম মাহাতো বুড়োকে, লোক পাঠিয়ে আমাদের আন্ডা হল্টের তাঁবুতে বেচে আসতে সবজি আর চিংড়ি, সরপুঁটি, মৌরলা।

বুড়ো হেসে বলেছিলো—ক্ষেতের কাজ ছেড়ে যাবো নাই।

তাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কালো কালো নেংটি-পরা লোকগুলোকে, খাটো শাড়ির মেয়েগুলোকে। শুধু খালি-পা মাহাতো বুড়োর পায়ে একটা টাঙি-জুতো, গেঁয়ো মুধার কাছে বানানো টাঙি-জুতো, এসে সারি দিয়ে ওরা কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে দাঁড়ালো।

ট্রেন ততক্ষণে এসে গেছে। ঝুপঝাপ নেমে পড়ে আমেরিকান সৈনিকের দল সারি দিয়ে চলছে মগ আর থালি হাতে।

দুশো আঠারো ব্রেকফাস্ট তখন রেডি বি এফ থ্রি থার্টি টু-তে। বি এফ থ্রি থার্টি টু মানে আন্ডা হল্ট।

তখন একটু শীত-শীত পড়তে শুরু করেছে। দূরের পাহাড়ে কুয়াশার মাফলার জড়ানো গাছগাছালি শিশির ধোয়া সবুজ।

একজন সৈনিক ইয়াঙ্কিগলায় মুগ্ধতা প্রকাশ করলো।

আরেকজন কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁটাতারের ওপারের রিক্ততার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো। হঠাৎ কফির মগটা ট্রেনের পা-দানিতে রেখে সে হিপ পকেটে হাত দিলো। ব্যাগ থেকে একটা চকচকে আধুলি বের করে ছুঁড়ে দিলো মাহাতোদের দিকে।

ওরা অবাক হয়ে সৈনিকটার দিকে তাকালো, কাঁটাতারের ভিতরে মোরমের ওপর পড়ে থাকা চকচকে আধুলিটার দিকে তাকালো, নিজেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, তারপর অবাক হয়ে শুধু তাকিয়েই রইলো।

ট্রেনটা চলে যাবার পর ওরা নিঃশব্দে ফিরে চলে যাচ্ছিলো দেখে আমি বললাম, সাহেব বখশিশ দিয়েছে, বখশিশ তুলে নে।

সবাই সকলের মুখের দিকে তাকালো, কেউ এগিয়ে এলো না।

আমি আধুলিটা তুলে মাহাতো বুড়োর হাতে দিলাম। সে বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর সবাই নিঃশব্দে চলে গেল। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

আমার এই ঠিকাদারের তাঁবেদারি একটুও ভালো লাগতো না। জনমনুষ্য নেই, একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়ায় না, তাঁবুতে ভগোতীলাল আর তিনটে কুলি। নির্জন, নির্জন। মাটি রুক্ষ, দুপুরের আকাশ রুক্ষ, আমার মন।

মাহাতো-গাঁয়ের লোকেরাও কাছে ঘেঁষতো না। মাঝে মাঝে গিয়ে সবজি কিংবা চুনো মাছ কিনে আনতাম। ওরা বেচতে আসতো না, কিন্তু ভুরকুণ্ডার হাটে যেতো তিন ক্রোশ পথ হেঁটে।

দিন কয়েক কোনো ট্রেনের খবর ছিলো না। চুপচাপ, চুপচাপ।

হঠাৎ সেই কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা একদিন এসে জিগ্যেস করলো, টিরেন আসবে না বাবু?

হেসে ফেলে বললাম, আসবে, আসবে।

ছেলেটার আর দোষ কি, বেঁটে বেঁটে পাহাড়, রুক্ষ জমি, একটা দোহাতী ভিড়ের বাস দেখতে হলেও দু'ক্রোশ হেঁটে যেতে হয় খয়েরগাছের ঝোপের মধ্যে দিয়ে। সকালে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন একটুও স্পিড না কমিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে যেতো, বিকেলের ডাউন ট্রেনটাও থামতো না, তবু কয়েক মুহূর্ত জানলায় জানলায় ঝাপসা মুখ দেখার জন্যে আমরা তাঁবুর ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতাম। মানুষ না দেখে আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম।

তাই আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল ট্রেন আসছে শুনলে যেমন বিব্রত বোধ করতাম তেমনি আবার স্বস্তিও ছিলো।

দিন কয়েক পরেই প্রথমে এলো খবর, তার পরদিন মিলিটারি স্পেশাল। ঝুপঝাপ করে জি. আইরা নামলো, সারি দিয়ে সব ডিম রুটি মগ-ভরতি কফি নিলো।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে মাহাতো গাঁয়ের ভিড় ভেঙে পড়েছে। বিশ হতে পারে, তিরিশ হতে পারে, হাঁটু সমান বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কত কে জানে। খাটো শাড়ির মেয়েগুলোও বোকা-বোকা চোখ মেলে তাকিয়ে ছিলো। ওদের দেখে আমার কেমন ভয়-ভয় করলো। ভগোতীলাল কিংবা সার্ভার কুলি তিনটে মাহাতো গাঁয়ের দিকে যেতে চাইলে আমার বড়ো ভয়-ভয় করতো।

প্ল্যাটফর্ম তো ছিলো না, শুধু উঠতে নামতে সুবিধের জন্যে লাইনের ধারটুকু মোরম ফেলে উঁচু করা হয়েছিলো। আমেরিকান সৈনিকরা কফির মগে চুমুক দিতে দিতে পায়চারি করছিলো। দু-একজন স্থির দৃষ্টিতে মাহাতো-গাঁয়ের কালো কালো মানুষগুলোকে দেখছিলো।

হঠাৎ একজন ভগোতীলালের দিকে এগিয়ে গিয়ে হিপ পকেট থেকে ব্যাগ বের করলো, ব্যাগ থেকে একখানা দু'টাকার নোট, তারপর জিগ্যেস করলে, কয়েন্স্ আছে? নোটভাঙানো খুচরো সৈনিকরা কেউ রাখতেই চাইতো না, পয়সা ফেরত না নিয়ে দোকানী কিংবা ফেরিওয়ালা কিংবা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলতো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাঁচিতে গিয়ে কয়েকবার দেখেছি।

এক-আনি, দু-আনি আর সিকি মিলিয়ে ভগোতীলাল ভাঙিয়ে দিচ্ছিলো, হঠাৎ দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে ভিড়ের ভিতর থেকে কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা সেই ছেলেটা হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে কি চাইছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভগোতীলালের কাছ থেকে সেই খুচরো আনি দু-আনিগুলো মুঠোর মধ্যে নিয়ে সেই আমেরিকান সৈনিক মাহাতোদের দিকে ছুঁড়ে দিলো।

আমার তখন সাপ্লাই ফর্ম ও. কে. করানো হয়ে গেছে, গার্ড হুইস্‌ল্ দিয়েছে।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে, অমনি মাহাতোদের দিকে ফিরে তাকালাম।

ওরা তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো, তাকিয়ে ছিলো। তারপর হঠাৎ লাল মোরমের ওপর, ছড়ানো পয়সাগুলোর ওপর কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা আর গলায় লাল সুতলিতে দস্তার তাবিজ বাঁধা ছেলেটা।

সেই মুহূর্তে টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো ধমক দিয়ে বলে উঠলো, খবরদার। এমন জোরে চিৎকার করলো যে আমি নিজেও চমকে উঠেছিলাম।

কিন্তু বাচ্চা দুটো ওর কথা শুনলো না। তারা দু'জনে তখন যে যত পেরেছে আনি দু-আনি কুড়িয়ে নিয়েছে। মুখ খোসা-ছাড়ানো কচি ভুট্টার মতো হাসছে। মেয়ে-পুরুষের সমস্ত ভিড় হাসছে।

টাঙি জুতো পরা মাহাতো বুড়ো রেগে গিয়ে তাদের ভাষায় অনর্গল কি সব বলে গেল। মেয়ে-পুরুষের ভিড় হাসলো।

মাহাতো বুড়ো রাগে গজগজ করতে করতে গাঁয়ের দিকে চলে গেল একাই। মাহাতো-গাঁয়ের লোকগুলোও চলে গেল কলকল কথা বলতে বলতে, খলখল হাসতে হাসতে।

ওরা চলে যেতেই আন্ডা হল্ট আবার নির্জন নিস্তব্ধ শূন্যতা। আমার এক-একসময় ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেতো। দূরে দূরে পাহাড়, মহুয়ার বন, খয়েরের ঝোপ পার হয়ে একটা ছোট্ট জলচোঁয়ানো ঝরণা, মাহাতো-গাঁয়ের সবুজ ক্ষেত। চোখ জড়িয়ে যায়, চোখ জুড়িয়ে যায়। তার মধ্যে কালো কালো নেংটি পরা মানুষ।

এদিকে মাঝে মাঝেই আমেরিকান সোলজারদের ট্রেন আসে, থামে, ডিম রুটি মগ-ভরতি কফি খেয়ে চলে যায়। মাহাতো গাঁয়ের লোক ভিড় করে আসে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে সারি দিয়ে দাঁড়ায়।

—সাব বখশিশ, সাব বখশিশ!

একসঙ্গে অনেকগুলো দেহাতী গলা চিৎকার করে উঠলো।

মেজরের কাছে ফর্ম ও. কে করাতে গিয়ে আমি চমকে ফিরে তাকালাম।

দেখলাম, শুধু বাচ্চা ছেলে দুটো নয়, কয়েকটা জোয়ান পুরুষও হাত বাড়িয়েছে। খাটো শাড়ির একটা তুখোড় শরীরের মেয়েও।

একদিন সবজি নিতে গিয়েছিলাম, ওই মেয়েটা হেসে হেসে জিগ্যেস করেছিলো, টিরেন কবে আসবে।

এক-একদিন অকারণেই ওরা দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো, অপেক্ষা করে চলে যেতো।

কাঁধে-স্ট্রাইপ তিন চারটে আমেরিকান ততক্ষণে হিপ পকেট থেকে মুঠো মুঠো আনি দু-আনি বের করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা করেনি, ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো পয়সাগুলোর ওপর। হুড়োহুড়িতে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে হাত-পা ছড়ে গেল কারও, কারও বা নেংটির কাপড় ফেঁসে গেল।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম ওদের। মনে হলো মাহাতো-গাঁয়ের আধখানাই এসে জড়ো হয়েছে। সবারই মুখে ফূর্তির হাসি, সবাই কিছু-না কিছু পেয়েছে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও সেই টাঙি-জুতোর মাহাতো বুড়োকে দেখতে পেলাম না। মাহাতো বুড়ো আসেনি। সেদিন ওর আপত্তি ওর ধমক শুনেও পয়সাগুলো ফেলে দেয়নি ছেলে দুটো। তাই বোধ হয় রেগে গিয়ে আর আসেনি।

আমার ভাবতে ভালো লাগলো বুড়োটা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে একা-একা মাটি কোপাচ্ছে।

আমাদের দিন, কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমাদের পাঁচজনের দিন আন্ডা হল্টের তাঁবুর মধ্যে কোনোরকমে কেটে যাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে এক-একদিন সৈনিক বোঝাই ট্রেন আসছিলো,

থামছিলো, চলে যাচ্ছিলো। মাহাতো-গাঁয়ের লোক ভিড় করে এসে কাঁটাতারের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াতো, হাত বাড়িয়ে সবাই 'সাব বখশিশ, সাব বখশিশ' চেঁচাতো।

হঠাৎ এক-একদিন মাহাতো বুড়োকে দেখতে পেতাম। কোনো দিন ক্ষেতের কাজ ফেলে দু হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হনহন করে এগিয়ে আসতো, রেগে গিয়ে ধমক দিতো সকলকে। ওর কথা শুনছে না বলে কখনো বা অসহায় প্রতিবাদের চোখ গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতো।

কিন্তু ওর দিকে কেউ ফিরেও তাকাতো না। সৈনিকরা হিপ পকেটে হাত দিয়ে হা-হা করে হাসতে হাসতে মুঠো-ভরতি পয়সা ছুঁড়ে দিতো। মাহাতো-গাঁয়ের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়তো সেই পয়সাগুলোর ওপর, নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ঝগড়া বাধা... দেখে সৈনিকরা হা-হা করে হাসতো।

শেষে পর পর কয়েক দিনই লক্ষ্য করলাম টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো আর আর আসে না। মাহাতো বুড়ো ওদের দেখে রেগে যেতো বলে, মাহাতো বুড়ো আর আসতো না বলে আমার এক ধরনের গর্ব হতো। কারণ, এক একসময় ওই লোকগুলোর ব্যবহারে আমরা—আমি আর ভগোতীলাল খুব বিরক্তি বোধ করতাম। ভিতরে ভিতরে লজ্জা পেতাম। ওদের কালোকুলো দিন-দরিদ্র বেশ দেখে সৈনিকের দল নিশ্চয় ওদের ভিখিরি ভাবতো। ভাবতো বলেই আমার খুব খারাপ লাগতো।

সেদিন কাঁটাতারের ওপার থেকে ওরা বখশিশ বলে চিৎকার করছে, কাঁধে আই ই খাকী বুশ-শার্টের গার্ড জানকীনাথেব সঙ্গে আমি গল্প করছি, আমাদের পাশ দিয়ে একজন অফিসার মচমচ করে যেতে যেতে চিৎকার শুনে থুতু ফেলার মতো গলায় বলে উঠলো, ব্লাডি বেগার্স।

আমি আর জানকীনাথ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমাদের মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল। মাথা তুলে তাকাতে পাবলাম না। শুধু অক্ষম রাগে ভিতরে ভিতরে বলে উঠলাম।

ব্লাডি বেগার্স, ব্লাডি বেগার্স।

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো মাহাতোদের ওপর। ট্রেন চলে যেতেই আমি ভগোতীলালকে সঙ্গে নিয়ে ওদের তাড়া করে গেলাম। ওরা কুড়োনো পয়সা ট্যাকে গুঁজে হাসতে হাসতে পালালো।

তবু ওদের জন্যে সমস্ত লজ্জা আমি একটা অহঙ্কারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে সেই অহঙ্কারটা আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো মাহাতো বুড়োর চেহারা নিয়ে।

কিন্তু সেদিন আমার বুকের মধ্যের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

ভুরকুণ্ডায় ঠিকাদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে খবর পেয়েছিলাম।

সার্ভার দু'জন কুলি তখন টেবিল বানানো ড্রাম দুটোকে পায়ে ঠেলে ঠেলে আস্তা হল্টের কাঁটাতারের ওপারে সরিয়ে দিচ্ছিলো। তাঁবুর দড়ি খুলছিলো আরেকজন। ভগোতীলাল ড্রামটার গায়ে একটা জোর লাথি মেরে বললে, খেল খতম, খেল খতম।

হঠাৎ হইহল্লা শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি মাহাতো গাঁয়ের লোক ছুটতে ছুটতে আসছে।

আমরা অবাক হয়ে তাকালাম তাদের দিকে। ভগোতীলাল কি জানি কেন হেসে উঠলো।

ততক্ষণে কাঁটাতারের ওপারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেছে ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হুইস্‌ল্‌ শুনতে পেলাম, ট্রেনের শব্দ কানে এলো।

ফিরে তাকিয়ে দেখি ট্রেনটা বাঁক নিয়ে আন্ডা হল্টের দিকেই আসছে, জানলায় জানলায় খাকী পোশাক।

আমরা বিব্রত বোধ করলাম, আমরা অবাক হলাম। তা হলে কি খবর পাঠাতেই ভুলে গেছে ভুরকুণ্ডার আপিস? না, যে খবর শুনে এসেছি সেটাই ভুল?

ট্রেনটা যত এগিয়ে আসছে ততই একটা অদ্ভুত গমগম আওয়াজ আসছে। আওয়াজ নয়, গান। একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল সমস্ত ট্রেন, ট্রেন ভরতি সৈনিকের দল পরস্পরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছে।

বিভ্রান্তের মতো আমি একবার ট্রেনটার দিকে তাকালাম, একবার কাঁটাতারের ভিড়ের দিকে। আর সেই মুহূর্তে চোখ পড়লো সেই মাহাতো বুড়োর দিকে। সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতো বুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে, সাব বখশিশ, সাব বখশিশ!

উন্মাদের মতো ভিক্ষুকের মতো তারা চিৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতো বুড়ো।

কিন্তু আমেরিকান সৈনিকদের সেই ট্রেনটা অন্য দিনের মতো এবারে আর আন্ডা হল্টে এসে থামলো না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর মতোই আন্ডা হল্টকে উপেক্ষা করে হুস করে চলে গেল।

আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না।

ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতোর-গাঁয়ের সবাই ভিখিরি হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো—সব ভিখিরি হয়ে গেলো।

দুজনে

মহাশ্বেতা দেবী

একজন এলেন কেষ্টনগর লোকালে, আরেকজন এলেন কল্যাণী লোকালে। একজন আরেকজনকে দেখতে পেয়েই উঠে আসছিলেন, আরেকজন হাত নেড়ে বসতে বললেন।

তারপর হাতের ব্যাগের ভারে হাঁপাতে হাঁপাতে কল্যাণী এসে রমেশের পাশে বসলেন।

কতক্ষণ এসেছ?

এই তো এলাম। সঙ্গে ওগুলো কি?

সজনে ডাঁটা। ওদের তো খাওয়া হয় না এসব।

রাখো তো! বয়েই মরবে। তোমার ছেলের বাড়ি সজনে ডাঁটা রাঁধবে কে? ফেলেই দেবে।

তুমি কিছু আননি?

কি আনতাম? মুড়ির মোয়া? তাও করতে পারেনি অনু। ওর ছেলের জ্বর, সময় পায় না।

আমারও তো সেই অবস্থা। তনু বলে, তারা কি পাঠায়, যে তুমি বয়ে বয়ে নিয়ে যাও?

খুব কথা শোনায়, না?

রমেশের গলাটা বড়ো অসহায় শোনায়।

না, তেমন কি আর....তনু তো বরাবরই...

জামাই কি বলে?

সেই এই কথা। বাড়ির ব্যবস্থা হল?

হ্যাঁ গো, বাড়ির ব্যবস্থা হবে?

সবই তো বিনুর হাতে।

একেবারে সব তুলে দিলে!

কি করতাম?

রমেশ মৃদু হাসেন। বলেন চল, দোকানে গিয়ে চা খাই। তোমার তো চায়ের শখ আজও!

দুজনেই যেন জেনেশুনে অভিনয় করছেন। কল্যাণী ছেলেমানুষের মতো বলেন, চল, তাই চল। চায়ের সঙ্গে ওই যে মচমচে বিস্কুট! চা খাওয়ালে পানও খাওয়াতে হবে।

হাসিতে ছলছল করেন কল্যাণী। যেন তাঁর বয়স বাহাত্তর নয়, যেন রমেশ সাতাত্তুরে বুড়ো নন। যেন ছেলেমেয়েরা ওঁদের দু'মেয়ের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন নি। যেন মাসের প্রথম শনিবার ওঁরা ছেলের কাছে টাকা নিতে আসেন না।

সবটা যেন ভীষণ মজা।

রমেশও সহাস্যে বলেন, খাওয়াব পান! ভাব কি? প্রতিদিন গোপাল ভাণ্ডারে খাতা লিখি, রীতিমতো পঞ্চাশ টাকা রোজগার করি। পকেটে পয়সা আছে।

আমি তো কিছুই করি না।

তনুর সংসারে রাঁধো, তা-ছেলে-মেয়ে দেখো, ভেবে দেখো মাস গেলে টাকা চাইতে পারো কি না!

তাই চাওয়া যায়?

চাইলে বুদ্ধির কাজ করতে।

চা খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে দু'জনে এগোল। শেয়ালদা থেকে বাস ধরে যাদবপুর, তারপর রিকশা চেপে গল্‌ফ গ্রিন। কোম্পানির দেওয়া ফ্ল্যাট। ড্যুপ্লেক্স বাড়িতে ওঁরা নীচেই বসে থাকেন। নীচের ঘরটা বসার ঘর। বিনুদের কাছে কত রকম লোক আসে। রবিবার বলে কথা। আরেকটা ছোটো ঘরও আছে। সে ঘরে দু'টি ঝি থাকে। সে ঘরেই উঠে যেতে হয় লোক এলে।

বিনুকে নীচে পাওয়া যায়। নন্দিতা অনেক বাদে ভেবে নেমে আসে। তারপর আহারাদি। একটি করে খাম পায় দু'জনে। রমেশের বুক ধুকধুক করে। হৃৎপিণ্ড অথবা হৃদয় এত চাপ সইতে পারে না আর। বড্ড আগে রমেশের দৌড় শুরু হয়েছিল তো। হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড অনেক ব্যবহারে জীর্ণ এখন।

খাম খুলে কি দেখবেন?

এবার দেড়শো নেই, একশো আছে?

খাম খোলেন না। অত ছোটো হতে পারেন না। তারপর দু'জনে আবার রিকশা চেপে বাসে চড়ে শেয়ালদা যান।

নন্দিতা বলে, ট্রেনে যাদবপুব আসতে পারেন না?

রমেশ মৃদু হাসেন।

ওই বাস, রিকশা, কল্যাণীকে কিছু বেশিক্ষণ কাছে পাওয়া।

একটি রাতও থাকতে বলে না বিনু।

শেয়ালদায় কল্যাণীকে ট্রেনে তুলে দেন রমেশ।

নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন ট্রেনের জন্যে।

রিকশায় চেপে রমেশ বলেন, ওদের দোষ নেই কল্যাণী। আমারই দুর্বুদ্ধি। কেন ওদের কথা শুনতে গেলাম!

কল্যাণী তেমনি হেসেই বলেন, বার্ধক্যে শুনতেই হয়।

কিন্তু আমরা তো না শুনতেও পারতাম।

এখন...ভেবে...কি লাভ!

শুধু দুজনে যদি একসঙ্গে থাকা যেত।

কল্যাণী সে কথা চাপা দিয়ে বলে ওঠেন, দেখ দেখ! আম গাছটায় কত মুকুল ধরেছে।

আর মুকুল!

দুজনেরই মনে ভাসে গোরাবাজার ছাড়িয়ে জমিদারী এলাকায় অনেকখানি জমির উপর একটি একতলা বাড়ি। তিনটি আমগাছ, একটিতে আর ফল ধরে না। বহরমপুরে পৈতৃক জমি ছিল বলে সস্তার দিনে রমেশের বাবা যে চার কামরার একতলা বাড়ি করেন, রমেশের সময়েই তা জীর্ণ হয়ে যায়।

তবু নিজের বাড়ি। ছেলে মেয়ে চলে গেল, নিজেরাই ছিলেন। থাকতেই পারতেন।

বিনু একদিন অনেক স্বপ্ন এনে হাজির করেছিল।

রমেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

রীতিমতো সম্মেলন বসে গিয়েছিল।

বিনু, অনু, তনু!

আট কাঠা জমির উপর দু'কাঠা জোড়া বাড়ি। তাও ঝুরঝুরে। বাবা যে পেনশন পান, তাও নয়।

একটা বড়ো কোম্পানির মেজো সাহেব বিনুর মুখে এ কেমন কথা? বিনু কোনো কাজ পাচ্ছিল না বলেই তো রমেশ বাপ হয়ে সেই আশ্চর্য আত্মত্যাগ করেছিলেন।

ডাক্তারী সার্টিফিকেট দিয়ে নিজেকে 'আর কর্ম করিতে অক্ষম' বলে সকলের হাতে পায়ে ধরে নিজেকে রিটায়ার করিয়ে বিনুকে ঢোকালেন বিদ্যুৎ বোর্ডে।

টাউনেই চাকরি, এম. এল. এ. চেনা, রমেশবাবুর বাবা ছিলে নামকরা হেডমাস্টার! বিনুর চাকরি করে দিতে তুলারামবাবু বলেছিল, এটা যে কি করলেন!

ভুল করলাম?

আজকাল ছেলে কি বাপকে দেখে?

বিনু তেমন ছেলে নয়।

দেখুন!

এখানেই থাকবে, সাইকেলে আপিস যাবে, এখন তো এমন সুযোগ ভাবাই যায় না!

দেখুন! রাজনীতি করা ছেলে!

না, তেমন রাজনীতি বিনু করে না।

দেখুন!

বিনু তেমন রাজনীতি কখনো করেনি, যার জন্য বিপন্ন হতে হয়। ও-যে তাদেব সঙ্গে থাকত, তাদের মন জোগাতে। কোথা থেকে কি যোগাযোগ করেছিল ওই জানে। কেমন করে ওই আমদানি-রপ্তানি আপিসে ঢুকে গেল, ঢুকিয়ে দিল পরিমল, যে নাকি মস্ত বিড়ি মার্চেন্টের ছেলে এবং 'বিড়ি' নামের গন্ধ কাটাতেই বোধহয় কলকাতায় এক বিদেশি জেনারেটর কোম্পানির এজেন্ট হয়েছে।

বিনু যখন বলেছিল, কাজ ছেড়ে দিচ্ছে, রমেশবাবুর মাথা ঘুরে গিয়েছিল, বসে পড়েছিলেন চৌকিতে।

তার মানে! তিন বছরও তো হয়নি।

তাতে কি?

কোনো গোলমাল হয়েছে?

কল্যাণী বলেছিলেন, বল্ বাবা, তোর বাবাকে বল্। ওঁর সঙ্গে সকলের চেনা আছে। দরকার হলে কালুবাবুকে বলবেন!

সম্পূর্ণ অচেনা এক বিনু অচেনা গলায় হেসেছিল তাচ্ছিল্য ভরে, ঘর-দোর কাঁপিয়ে।

কালুবাবু-টাবু আউট, মা! ওসব বুড়োহাবডা খাদিমার্কা নেতারা আউট। এখন অন্যরকম সব।

নয় তাই হল। কাজ ছাড়বি কেন?

অনেক ভালো কাজ পেয়ে গেছি।

রমেশবাবু তখনো বোঝেন নি।

কি কাজ? কত বেতন? সরকারি কাজের মতো সিকিউরিটি আছে? পরিমল নাচায় আর তুই নাচিস?

সিকিউরিটি! এই ভাঙা বাড়িতে থাকো, এই পচা টাউনে বাস করো, এটা কি জীবন?

কি বলতে চাও তুমি, আমি জীবন কাটাই নি?

কাটিয়েছ। পোকামাকড়ের মতো।

বিনু! কার সঙ্গে কথা বলছিস? তোর জন্যে লোকটা চাকরি ছেড়ে দিল, তোর মুখ চেয়ে...

বিনু ভীষণ রাগে বলেছিল, সে জন্যেই তো! আমার জন্যে উনি যে একটা মস্ত ত্যাগ করেছেন, সে কথা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে। আমি সহ্য করতে পারছি না।

পরিমল! একটা ধান্দাবাজ ছেলে!

আজ যে মাসে বিশ হাজার কামাচ্ছে, কোম্পানির পয়সায় জাপান যাচ্ছে, সল্টলেকে যে বাড়ি করেছে....আরে। তোমাদের বুঝতে হবে যে আমি কত লাকি! পরিমল আরো ওপরে উঠছে। আরো ওপরে উঠবে। মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠ বসে।

আমরা! আমরা কি করব?

আমি টাকা পাঠাব।

তুই কি পাবি, যে পাঠাবি?

শুরু করছি তো তিন হাজারে!

বিনু বিজয় গর্বে হেসেছিল।

তি-ন-হা-জা-র!

এটা শুরু। এর পরে আমিও উঠব।

এমনি করেই বিনু চলে যায়। আর শহর সুদ্ধ চেনা মানুষ রমেশকে বলতে থাকে, শত পুত্রে সম এক ছেলে হে তোমার। লাইন ধরে ফেলেছে। তোমার মতো ভাগ্যবান কে?

না, পাঁচশো টাকা প্রতিমাসে এসেছে। দু'বছরের মাথায় বিনু বিয়েও করেছে। গাড়ি চালিয়ে দার্জিলিঙে মধুচন্দ্রিমায় যাবার সময়ে নন্দিতাকে দেখিয়ে নিয়ে গেছে। থাকতে পারে নি। ফরাক্কায় ডাকবাংলো বুক করা আছে। নন্দিতা ঠিক আধঘণ্টা ছিল।

দেয়ালে অনু তনুর বিয়ের বসুধারা চিহ্ন দেখে বলেছিল, কি অপূর্ব! হিন্দু বিয়ে!

আর বাড়িটা দেখে বলেছিল, কি অপূর্ব! যেন পথের পাঁচালি সিনেমার মতো।

সন্দেশ-নিমকি-রসগোল্লা কিছু খায়নি নন্দিতা। কল্যাণী ওকে বসিয়ে শাঁখা কিনে এনেছিলেন, পরিয়ে দিয়েছিলেন।

শাঁখ বাজাবেন, পাঁচজনকে ডাকবেন, ওরা সে সময়ই দেয় নি। বিনু বলেছিল, নন্দিতা আমাদের জেনারেল ম্যানেজারের মেয়ে। ও নিজেও একটা ব্রিটিশ ফার্মে চাকরি করে।

ঘোড়াটে মুখে হেসে নন্দিতা বলে, করত।

হ্যাঁ, এখন আর...

রমেশবাবু বলেছিলেন, বিয়ের পর আর...

না না, যখনি চাইবে, কাজ পেয়ে যাবে।

হুশ করে গাড়ি চালিয়ে ওরা চলে গিয়েছিল। গাড়িতে উঠে বিনু বলেছিল, বিয়েটা হঠাৎ হল। জানতে পারি নি।

রমেশবাবু বার বার মাথা নেড়েছিলেন। এমন যে হয়, এমন যে হতে পারে, সবই ওঁর অজানা। এই বিনুই কি অনু-তনুর বিয়েতে কোমরে গামছা বেঁধে মাছের টুকরো গুনে গুনে তুলছিল? বলেছিল, কাপড়-চোপড় কিনবে বিমলের দোকানে। ও সস্তায় দেবে?

বীরনগরে অনুর শ্বশুরবাড়ি আর কল্যাণী ঘোষপাড়ায় তনুর শ্বশুরবাড়ি এই বিনুই যেত?

টাউনের লোকও বলল, বিনু খুব রাইজ করেছে। অনু-তনুও বলল, দাদাই দেখাল।

রমেশ বলেছিলেন, কল্যাণী! আমি তুমি যতদিন। তারপর ওরা এ বাড়িতে পা রাখতেও আসবে না।

তাই আর আসে?

যাক। যা হয় করবে।

বিনু কিন্তু মাঝে মাঝে আসত। ফরাক্কা যাবার পথে, মালদা যাবার পথে।

ঝিলিক দিয়ে যেত।

কল্যাণী আর রমেশ সে সময়টা খুব কাছাকাছি আসেন।

রমেশ বুঝতে চেষ্টা করতেন, তাঁদের কি কি অসহ্য লাগত বিনুর কাছে। কেন সে নোঙর কেটে বেরিয়ে গেল?

কেন, কেন, কেন?

কল্যাণীর হাতের সুক্তো খেয়ে তাঁর মুখ স্বর্গীয় তৃপ্তিতে ভরে যেত। সাধ্যে কুলোলে তিনি নতুন বাজার থেকে ইলিশ কিনতেন। আমের দিনে পিতৃপুরুষকে আম উৎসর্গ করে আম মুখে দিয়ে বলতেন, এই কি সাদৌলা? বহরমপুরের আমেও ভেজাল ঢুকে গেল! সাদৌলা আনতেন বাবা। আমের গায়ে টিকিট মারা থাকত, ঘড়িতে একটা বাজলে খাবেন।

বাড়ির বাগানে হেঁটে বলতেন, এই গাছটা ফল দেয় না আর। আমি মরলে এই গাছের কাঠে...

এসব কি খুব মন্দ জিনিস? মানুষকে উঠতে দেয় না? সূর্যও ওঠে, মানুষও ওঠে। মানুষরা এখন সূর্য হতে চায়। বিনুদের কাছে ওঠার মানে হল টাকা-গাড়ি-বাড়ি-সম্পদ।

দুঃখের কথা হল, রমেশও নিজেকে কোনোদিন গরিব ভাবেন নি। এক সময়ে প্রাইভেট বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি ছিল। পরে সরকার বিদ্যুৎ নিয়ে নিল। সরকারি কাজ করছি, নিজের ভিটেয় থাকি। বাগানের কোণে চালা করে দিয়েছি, হলধর রিকশা টানে, ওর বউ কাজকর্ম করে। আমি একজন ভদ্রলোক। শান্তিতে আছি।

বিনু যে শান্তিকে এমন তুচ্ছ ভাবল? তাঁকে বলল, পোকামাকড়ের জীবন কাটাচ্ছ পচা টাউনে?

তুলারামের ছেলে খেলারামও উঠছে। সেও সেদিন বলে গেল, এখন মুষ্টিভিক্ষায় তুষ্ট থাকলে চলবে না কাকাবাবু। বাড়িটুকু, চাকরিটুকু, ওই টুকু টুকু করতে করতেই বাঙালি শেষ হল। এখন বড়ো স্বপ্ন দেখতে হবে, বড়োভাবে ভাবতে হবে, আপনারা বড্ড সেকেলে হয়ে আছেন।

চলতে চলতে রমেশ বললেন, খেলারাম আমাকে সেকেলে বলছিল। মনে আছে? ওঃ, ছোঁড়ার বাক্য কি!

কল্যাণী তরুণীর মতো হেসে বললেন, সেকেলেই তো! নতুন ছাঁদের ফ্ল্যাটে থাকবে, ফ্যাশানী ঘরদোর হবে, সেটা ভাবতেই পারছ না।

তুমি ভাবতে পারছ?

এই দেখো! কবে আর আমি কি ভেবেছি বলো? তুমি ভাবিয়েছ, আমি ভেবেছি।

হ্যাঁ রমেশবাবুই ভেবেছিলেন।

বিনু-তনু-অনু-নন্দিতা সকলে উঠেছিল বিনুর গাড়িতে। বিনুর এ গাড়িটা আরও নতুন, আরও বড়ো। ড্রাইভারের পোশাক দেখে কল্যাণী বলেছিলেন, চা নিন।

বিনু বলেছিল, অবাক করে দিলাম তো? মা! দুটো ইলিশ এনেছি আর তনুটা কিনল কাঁচা আম। মাছ ভাজা, মাছের পাতুরি আর কাঁচা আমের ঝোল। রাতে হবে খিচুড়ি।

নন্দিতা বলেছিল, ডিভাইন!

রাতে থাকবি তো?

জায়গা কোথায়?

ঘর বিছানা, সবই আছে।

গরম লাগবে মা! আমি আর নন্দিতা ট্যুরিস্ট লজে চলে যাব, ড্রাইভারও।

যা বুঝিস!

তনু কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অফিসকর্মী। ওর স্বামী অধ্যাপক। ওরা যে বাড়িতে থাকে, সেই চমৎকার বাড়িটি কিনে নিচ্ছে। অনুর স্বামী কৃষ্ণনগরে পূর্তবিভাগে কর্মী, ইউনিয়ন নেতা। বীরনগরে অনু শিক্ষিকা, জবরদস্ত গৃহিণী। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে ওখানেই একতলা বাড়ি করেছে, গোছানো সংসার।

বিনু আর নন্দিতার দুই ছেলে।

অনুর এক ছেলে, এক মেয়ে। তনুর দুইটি মেয়ে।

বিনুর দুই ছেলেই কোথায় যেন কোন পাহাড়ের দেশে বোর্ডিঙে থাকে। পৌত্রদের রমেশ ও কল্যাণী বারদুয়েক দেখেছেন। সত্রাজিত, শত্রুজিত, ওরফে বানি ও বনি ঠাকুরদা ঠাকুমার বাংলা কথা বোঝেনি। ওঁরাও ওদের কথা বোঝেননি। বোর্ডিঙে না রাখলে নাকি নন্দিতার ভীষণ পরিশ্রম হয়। খুব ব্যস্ত সামাজিক জীবনও ওর। তাছাড়া বাপকে বাড়িতেও পার্টি দিতে হয়, ছেলেদের ওসব দেখা ভালো নয়।

বিনু বলেছিল, অমন স্টেটে স্কুল। কলকাতায় তো ওসব নেই। পাহাড়ে চড়বে, খেলাধুলো করবে।

রমেশ ভেবেছিলেন, কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েটে পড়ে বিনুই যদি নন্দাঘুণ্টি উঠে যেতে পারে, ওর ছেলেরা এভারেস্ট অবধি উঠবে।

তা এবারে ছেলে মেয়ে বউকে কাছে পেয়ে কল্যাণী আর রমেশ খুবই অভিভূত হয়ে যান।

নন্দিতার কাছে সবই অপূর্ব! মাটিতে বসে খাওয়া, মাছের তেল কি লাভলি! মা! আপনি স্বচ্ছন্দে কলকাতায় কোনো পচা জায়গায় বেঙ্গলি রান্নার ক্লাশ করতে পারেন।

তনু বলেছিল, মা ক্লাশ করবেন?

রমেশ বলেছিলেন, মন্দ নয়।

খাওয়াদাওয়ার পর বিনু রমেশকে স্বপ্ন দেখাতে বসে।

এ বাড়িটার বয়স?

একশত হবে। বা কিছু বেশি।

জমি?

দশ কাঠা, জানোই তো।

শোনো, পরিমল আর আমি এখন বাড়ি তৈরির প্রোমোটার। কলকাতায় দুটো বাড়ি তুলছি

তোর নিজের?

না না, দশতলা বাড়ি, চল্লিশটা করে ফ্ল্যাট থাকছে। এটা সাইডে বিজনেস। মনে হচ্ছে এই ব্যবসাটাই শেষ অবধি...দুটো বাড়িতেই আমাদের একটা করে ফ্ল্যাট থাকছে।

তুমি তো থাকো কোম্পানির ফ্ল্যাটে।

ভাড়া দেবো। কত টাকা পাবো জানো?

না, বিনু।

যাকগে। এ বাড়িটা কি করবে?

আমি কিছুই করব না। আমাদের পর তোমরা যা করবে তাই হবে।

না।

বিনু আবার আরেকরকম গলায় বলেছিল, তোমরা আমাদের জন্যে অনেক করেছ। আমরা তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তান। এখন আমরা চাই, শেষ জীবনটা তোমরা একটু ভালো থাকো।

আমরা তো ভালোই আছি।

না বাবা। একে ভালো থাকা বলে না।

হাউসিং এখানকার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা।

বিনু বলে এবং চুপ করে কিছুক্ষণ। রমেশ যেন গুরুত্বটা বোঝেন, সেই জন্যে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, বড়ো সমস্যা।

মানুষের আবাসনের জন্যে ছেলের এই উদ্বেগ দেখে রমেশ অবাক হন। বাসস্থান না থাকা বড়ো কষ্ট।

আমার তো বাড়ি আছে।

আমরা মনে করি, এ বাড়িটা ভেঙে এখানে স্বচ্ছন্দে চমৎকার আটতলা বাড়ি তোলা যায়। প্রতি তলায় চারটে করে ফ্ল্যাট হবে। একতলা বা দোতলায় তোমাদের, আমার, অনুর, তনুর একটা করে ফ্ল্যাট থাকবে। আমি তো বাস করতে আসছি না। আমার ফ্ল্যাটের ভাড়া তোমরা পাবে, চমৎকার নতুন বাড়িতে থাকবে, আরাম পাবে। একতলায় থাকলে তো একটু জমিও পাবে, কি বলো?

হলধরের কি হবে?

হলধর একদিন বাড়ির মালিক হবে, সেই ভয়ই বিনুকে এখন তাড়া করছে। বিনু সহাস্য মুখে বলে, ফ্ল্যাটের লোক চাকরদের ঘর-কল-পায়খানা পাচ্ছে। ওরা তোমার ভাগের ঘরটাতে থাকবে?

সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।

বাবা! যারা এক্কেকটা ফ্ল্যাট দেড় লাখ টাকায় কিনবে, তাদের টাকা দিয়েই বাড়ি হয়ে যাবে সে তুমি বুঝবে না।

বাড়ির নামটা মুছে যাবে?

কেন, ঠাকুরদার নামটাই থাকবে সরোজ ভবন।

আমরা যাবো কোথায়?

কয়েক মাসের ব্যাপার তো। তুমি আর মা, অনু, তনুর কাছে থাকবে, আমি খরচ দেবো

বিনু আর পরিমলের বি. পি. হাউসিং অত্যন্ত ঝটপট কাজ করছে। কলকাতায় তোমায় শিলাদিত্য আর সাথী অ্যাপার্টমেন্ট দেখিয়ে দেবো। দেখলেই বুঝবে।

দেখি! ভাবি।

রমেশ ভাবছিলেন আর ভাবছিলেন। বিনু আসছিল আর আসছিল। অবশেষে একদিন রমেশ রাজি হলেন। দু'জনে একজায়গায় থাকছেন না, তাও তো বেশিদিনের ব্যাপার নয়।

সে সময়ে অনু আর তনুর কত কথা!

আমার ছেলেমেয়ে দাদুকে পেলে বর্তে যাবে। বহরমপুরে এলেই তো কত আনন্দ করে, তাই কি আনতে পারি? আমার চারটে ঘর, বড়ো বারান্দা, শ্বশুরবাড়ি জমজমাট।

আমার মেয়েরাও দিদিমাকে ভালোবাসে খুব। মায়ের কাছে থাকলে ওদের শিক্ষাও ভালো হবে। সঙ্গ বলে কথা!

জামাইরা কি মনে করবেন?

কিসের কি! দাদা তো হাতখরচা দেবেই। আর তোমাদের আশীর্বাদে আমাদের তেমন অবস্থাও নয়, মনও নয় যে বাবা-মা থাকলে সেটা ভার বোঝা মনে করব।

কল্যাণী বোকার মতো বলেছিলেন, যার যার বাড়ি আছে, এখানে ফ্ল্যাট নিয়ে করবে কি?

বিনু বলেছিল, ওটা ওদের প্রাপ্য মা।

এমনি করেই শুরু হয়েছিল অধ্যায়। কল্যাণী ও রমেশ দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে থাকেন নি কখনো।

অনু। বাবার জন্যে ইসবগুলের ভুষি ভেজাস। সে লোক কিন্তু মশলা ঝাল খায় না।

তুমি ভেবো না তো মা! বাবা কি খায় তা কি আমি জানি না? তনুও তোমাকে দেখবে। বাবা ওখানে যাবে, আমি এখানে আসব, তোমাকে নিয়ে যাব।

বিনু বলেছিল, আরে আমি যাবো, তোমরা আসবে। সেই তো বহরমপুরে পড়ে আছ। এই বাবদে খানিক ঘোরাও হবে।

পি. বি. কোম্পানি, না বি. পি. কোম্পানির কথা চলছিল যতদিন, ততদিন রমেশ আর কল্যাণীর আদর ছিল খুব। বিনু মাসে মাসে টাকা দিচ্ছে। তনু বলে, বাবা সকালে হাঁটো, ছেলে-মেয়েকে সেই জবাকুসুম সঙ্কাশং মন্ত্রটা শিখিয়ে দিও তো? ভালো জিনিস ওরা শেখে না।

অনু কিঞ্চিৎ গুঁপো ছিল। ওর ছেলে মেয়েও বারোতে না পৌঁছতেই গুঁপো। সূর্যমন্ত্র শিখতে ওদের ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক নয়। দু'জনেই ক্যাসেটে হিন্দি গানের অনুরক্ত। রমেশের ধারণা ছিল, জামাই আপিসে যক্ষরক্ষ এবং বাড়িতে অতীব নিরীহ।

পরে বুঝলেন, জামাইয়ের কোণের ঘরে আত্মনির্বাসন থাকার কারণ প্রত্যহ একই সঙ্গে কারণসেবা ও শ্যামার তৈলচিত্র পূজা। কেন না, খেতে বসে সে একদিন রমেশকে বলল, যদ্দিন পারিস খেয়ে নে বেটা। তোর বেটিকে তুই চিনিস না, আমি চিনি।

অনু কি দুঃখী? অনু কি নীরবে নির্যাতিতা? তাও তো নয়। সংসারে তার প্রবল আসক্তি এবং অচিরে যে সে বহরমপুরে ফ্ল্যাট পাচ্ছে, সে কথা জামাইকে যথেষ্ট শোনায়।

জামাই বলে, দুহিতা হলেই বাপকে দুইবে। তুমিও দুইছ, আমার মেয়েও দুইবে।

তনুও কল্যাণীকে কম যত্ন করেনি। তনু বড়োই কৃপণ, লোকজন রাখে না। নিজেই রাঁধে,

ঠিকে ঝি দিয়ে বাড়ি চালায়। কিন্তু কল্যাণীর জন্যে পাকা পেঁপে, সন্দেশ, পানের সরঞ্জাম, কোনো ত্রুটি রাখেনি। ওর কষ্ট দেখে কল্যাণীই হেঁসেলের ভার নিয়েছিলেন।

পি. এবং বি. উভয়ে যতদিন মিলিত ছিল, ততদিন রমেশের ও কল্যাণীর ও নির্বাসনটা ছিল খেলা খেলা। বাড়ি হবে, ওঁরা চলে যাবেন।

কিন্তু উভয়ে এখন মুখ দেখাদেখি নেই। সেই থেকে ক্রমে ক্রমে, অবস্থাটা বদলে গেছে।

রমেশ অনেকবার বলেছেন, আমরা চলে যাই বিনু। আমরা মরে গেলে যা ইচ্ছে কোর।

তা হয় না বাবা।

বাড়ির তো কিছুই হয়নি।

হবে কেন? জমিদারী এলাকার কি চটক আছে? লালদীঘির ওধারে পরিমল জমি কিনেছে, আমাদের ফ্ল্যাটের মক্কেলদের ভাগিয়ে নিয়েছে। আমিও করব, দেখিয়ে দেবো। তোমার ঠাকুরদার যেমন কাণ্ড, জমি কিনল ওখানে!

জমিদারী এলাকা মানে পথ খারাপ, বিদ্যুৎ কম, মাঝে মাঝে বস্তি।

রমেশ খুবই বিব্রত বোধ করেন।

কিছু একটা করতে হবে। মাসে মাসে টাকা দেয়াও তো...

দেড়শো করে তিনশো। বিনুর বাড়ির কাজের মেয়ে দুটিই পায় আড়াইশো করে। নন্দিতার কুকুরের খরচও বোধহয় পাঁচশো। রমেশের মনে হয়, একদিন কল্যাণীকে তিনি ঘরে এনেছিলেন, কল্যাণী তাঁর পরম অনুগত স্ত্রী। সেই কল্যাণীকে তিনি একটা জটিল আবর্তে ফেলে দিয়েছেন, নিজেও তলিয়ে যাচ্ছেন নীচে।

বাবা ও মা অস্থায়ী নন, স্থায়ী এখন, জানার সঙ্গে সঙ্গে অনু আর তনুও বাস্তববাদী হয়ে যায়।

বাবা যখন আছেন, বাজারটা দোকানটা...

রোজ মাছ না খেলেই এ বয়সে ভাল...

মা। রান্নায় অত তেল ঢেলো না...

দাদা তো দিচ্ছে, এ রবিবার মাংসটা নয় মা আনাক...

এ সব কথা দু'জনের মনেই ভাসে আর ডোবে।

কল্যাণী!

বল না।

সেই সিনেমাটার মতো হয়ে গেল সব?

কোনটা গো?

মনে করতে পারি না। ছেলেটা আর মেয়েটা...

হ্যাঁ, স্টেশনে দেখা করত।

আমাদের এই বয়সে...

কল্যাণী মুখ অন্যদিকে ফেরান। আস্তে বলেন, বাড়ি এসে গেছে, আর কথা থাক।

তখন যে সব দিয়ে দিলাম...

তনু বলছিল, মা। তোমার যে ক্যাশ সার্টিফিকেট ছিল, সে টাকাটা ধার পেলে বাড়িটা সারাতাম।

ওই তো ছয় হাজার টাকা, তাও চায়।

বলছিল...

হ্যাঁ, তিনজনকে ভাগ করে দিয়ে আমরা...

থাক, চল।

বাড়িতে ঢুকতে আজকাল রমেশের পা ওঠে না। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসির হররা কানে আসে।

বাইরের ঘরে অবাক, অবাক দৃশ্য। ক্যাসেটে বাজনা, হাসির হররা, বিয়ারের মগ হাতে কয়েকটি নারী ও পুরুষ। বিনু মুখটা হাঁ করে ও বন্ধ করে। নন্দিতা মগটি নামিয়ে রেখে চলে, একদম মনে ছিল না! এই যে এঁরা বিনুর মা আর বাবা। এঁরা আমাদের নতুন ব্যবসার পার্টনার। নন্দিতা প্রোমোটার্স অ্যান্ড হাউসিং...আসুন আসুন এগুলো কি?

সজনে ডাঁটার ব্যাগটা দেখে নন্দিতা হেসে বলে, ভীষণ হেল্‌থ বাতিক বিনুর মা-র...

বিনু চাপা গর্জনে বলে, ওগুলো কিচেনে দিয়ে দাও। সত্যি মা! তোমাদের এই স্মল টাউন মেন্টালিটি...

নন্দিতা ওঁদের ঠেলতে থাকে ও বলতে থাকে, আসছি ভাই রীতা! এই সব সবুজ সবুজ জিনিস যে কি ভাল...

রীতা চেঁচিয়ে বলে, জলদি এসো!

আসছি..সব সময়ে এই সব জিনিস .

ওঁদের ঘরে ঢুকিয়ে নন্দিতা দরজা বন্ধ করে। তারপর বলে, চিঠি পাননি?

কিসের চিঠি?

বাঃ, আজ আসবেন না, সকালে লোক আসবে, আমরা বাইরে খাব...আমি নিজে দুজনকে লিখিয়েছি বিনুকে দিয়ে, পোস্ট করেনি নিশ্চয়ই।

কল্যাণীর মাথা ঘোবে। রমেশ ক্ষীণ স্ববে বলেন, পাইনি তো! পেলে কি আর...

এখন?

আর এলেন যদি, এমন জঘন্য পোশাকে...আমরা কি টাকা দিই না? রীতা অলসো আমার কাজিন। ওরা যে কি ভাবল! আমি কি যে বলব?

এ সময়ে দড়াম করে বিনু ঢোকে।

এ সবের মানে?

শুনেছ, ওঁরা নাকি চিঠি পাননি।

বাজে কথা!

বাজে কথা নয় রে, পাইনি চিঠি।

বিনু খুব নাটকীয় ভাবে চুল মুঠো করে, ছাড়ে।

তারপর বলে, নিনি। যাও ওখানে। আমি দেখছি।

পকেট থেকে অনেক একশো টাকার নোট বের করে বিনু, গুনে গুনে তিনশো টাকা দেয়। তারপর বলে, আমাকে যথেষ্ট বেইজ্জত করেছ, এ ঘর থেকে বেরিও না দয়া করে আমরা না বেরুনো পর্যন্ত। মেরিকে বলে দিচ্ছি, কিছু একটা রেঁধে দেবে। ছি ছি ছি! ওদের সঙ্গে ব্যবসায় নামছি, যাদবপুর, নিউ আলিপুর, বহরমপুর, বর্ধমান, সর্বত্র হাইরাইজ তুলব। রীতা নিজে কার মেয়ে জান? ওদের সামনে...এ রকম পোশাকে ...সোশাল ডিজাস্টার হয়ে গেল...

বিনু বেরিয়ে যায়।

ওঁরা বসে থাকেন বাক্যহারা হয়ে।

যদি মিলিয়ে যেতে পারতেন?

যদি পালিয়ে যেতে পারতেন?

রমেশ মাথাটা হাতের ওপর রাখেন।

মাথা ঘুরছে? জল খাবে?

রমেশ মাথা তোলেন। বিচিত্র ও দুর্বোধ্য হাসেন। বলেন, না না, জল খাব না। কথা বোল না। বসে থাকো।

কিছুক্ষণ বাদে মেরি ঢোকে। নন্দিতা মায়ের সরবরাহ করা কাজের লোক। পরনে নাইলন. চুলে বেণী, ম্যাচ করা জামা, পায়ে চটি। সর্বদা সুসজ্জিত না থাকলে বিনুদের ইজ্জত থাকে না

খানা বানায়েঁ মেমসাব?

রমেশ হাত নেড়ে 'না' বলেন।

বেরোবার দরজা তো একটা, না?

এক হি দরোজা।

ও ঘরে বাজনা উদ্দাম, উদ্দাম।

মেরি বলে, বিয়ার পার্টি চলতা হ্যায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ওদিকে যাও। ওদিকে কত কাজ!

স্ন্যাক তো বনা দিয়া।

বেশ। যাও এখন।

রমেশ রুমাল বের করে মুখ মোছেন। বলেন, ওঠো. চলো। বারোটা বাজে।

ওরা যে...

চলই না। ওরা এখন যদি দুটোয় বেরোয়।

বিনু যদি...

চলো দেখি। রমেশ চৌধুরি মরে নি এখনো।

কিন্তু এখন ফিরলে মেয়েরা...

ওঠো।

রমেশ ও কল্যাণী ওঠেন। দরজাটা ওরা ওদিক থেকেই বন্ধ করেছে। এখন রান্নাঘর দিয়ে বেরিয়ে বাইরের ঘর দিয়ে...

ঘরে ভারি পর্দা, সিগারেটের ধোঁয়ায় কুয়াশা। বিনু বলে, আরেকটা নাও, আরে! বিয়ার তো সে ঘরেই ঢোকেন রমেশ ও কল্যাণী।

এ কি...তোমরা?

চললাম বিনুবাবু। নমস্কার।

হাত জোড় করে বিনুকে নমস্কার করে বেরিয়ে যান রমেশ ও কল্যাণী। এ ঘরে সবাই নিমেষের জন্যে স্থিরচিত্র হয়ে থাকে। বিনুর মুখটা বোকা বোকা দেখায়।

পথে বেরিয়ে রিকশা। তারপর যাদবপুর স্টেশন। স্টেশনের কাছে একটি খাবারের দোকানে ঢোকেন রমেশ।

মিষ্টি দই একশো করে, দুটো রাজভোগ। আগে দু'গেলাস জল দিও ভাই, বড়ো পিপাসা।

কয়েক ঘণ্টা আগেকার হাস্যমুখী কল্যাণী এখন নির্বাক।

খাও খাও, সময় নেই।

কল্যাণী আস্তে বলেন, কোথায় যাবে?

কোনো কথা নয়।

তারপর শেয়ালদা। রমেশ টিকিট কিনে আনেন। বলেন, চলো বসি গিয়ে।

তুমি কি করছ, বলবে?

তোমাকে নিয়ে পালাচ্ছি। ইলোপ কি তরুণ-তরুণীদের একচেটিয়া? আমি আর তুমি পালাচ্ছি।

কোথায়?

সেই, বিনুর ভাষায় পচা শহরে।

জামা...কাপড়?

পারলে হলধর নিয়ে আসবে। পারলে ওরা দিয়ে যাবে। জামাকাপড়। কিনে নেব। গরিব যেমন কেনে।

তারপর?

চারটে ঘরের দরকার কী? দুটো ভাড়া দেব, বাইরের আঙিনায় দোকানঘর তুলে দেব চারটে। তুমি থামো তো! মদন বক্সী আছে, হাসির বর আছে, ব্যবস্থা করে দেবে।

কিন্তু...ছেলে...মেয়ে...

নো অ্যাপার্টমেন্ট। দান-দাতব্য করে যাব। যা হয় করব। তুমি আমাকে ভাব কী? কালই উকিল বাড়ি যাব।

কল্যাণীর বুক মথিত করে বড়ো নিশ্চিন্তের একটি নিঃশ্বাস উঠে আসে। তিনি রমেশকে চমকে দিয়ে হেসে বলেন, পান কিনে নাও বাপু। পথটা কি শুকনো মুখে যাব?

রমেশ হাসেন। বলেন, কাল বিনুবাবু চমক খাবে। তারপর মজাটা দেখো।

কল্যাণীও হেসে ফেলেন।

সাতাত্তর বছরের এক কালো, পাকানো বুড়ো আর বাহাত্তুরে এক বুড়ির হাসিতে এমন ঢলাঢলি আর গলাগলি দেখে মাথার ওপরের ঘড়িটা অবাক হয়।

আর লালগোলা প্যাসেঞ্জার এসে পড়ে। এমনভাবে চলেন ওঁরা, যেন শুধু দু'জনের জন্যেই ট্রেনটা এসেছে।
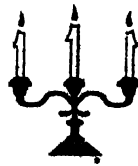
পানিপথের দরগায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

নাসিরুদ্দিন খানচৌধুরি এবেলায় তোপখানায় ঝিলে হাঁস মারতে বেরিয়েছিলেন। সঙ্গে বিশ্বস্ত বান্দা আবদুল। আজকাল বন্দুক নিয়ে বাইরে বেরুনোর ঝুঁকি আছে। থানার সেপাইদের হাত থেকেও মস্তান দুর্বৃত্তরা মাস্কেট বন্দুক ছিনিয়ে নিচ্ছে। গ্রামগঞ্জে একেবারে মগের মুল্লুক ইদানিং। পয়সাকড়িওয়ালা লোকেরা দুরু-দুরু বুকে রাত কাটায়। অথচ কুতুবগঞ্জের খানচৌধুরির হাতে এসময় বন্দুক। এর অনেকগুলো কারণ।

খানচৌধুরি এলাকার পঞ্চায়েত-প্রধান। তাঁর পোষ্য একটি মস্তান বাহিনী আছে। আর এই আবদুল, খুনে দাগী মারকুট্টে তাগড়াই চেহারার প্রৌঢ় বয়স্ক লোকটি, সেই বাহিনীর বরাবর লিডার। তার পরনে ঢোলা হাফপ্যান্ট, এর কারণ একপকেটে ভোজালি আর অন্য পকেটে একটি চিনা পিস্তল সব সময় গা ঢাকা দিয়ে থাকে। দরকার হলেই গোখরো সাপের চেয়ে দ্রুত গর্ত থেকে ফোঁস করে বেরিয়ে পড়ে এবং ছোবল দিতে একসেকেণ্ডও লাগে না। পুলিশ আসে। তদন্ত হয়। চার্জশিট আর আদালতে পৌঁছায় না। যদি বা পৌঁছায়, আইনের ফুটো গলিয়ে আইনজীবীদের জোরালো ফুঁয়ের ঝড়ে ছেঁড়াপাতার মতো কুচি-কুচি হয়ে উড়ে যায়।

খানচৌধুরির চেহারাখানিও তাগড়াই। চাঁছাছোলা গাল ও চিবুক, কিন্তু গোঁফটি খোগলাই। বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবে। খাড়া নাক। একমাথা ঝাঁকড়া চুলে ফিল্ম হিরোর ফ্যাশান। পরনে এখন ধুতি পাঞ্জাবি ও প্যান্ট শার্টের বদলে সেকেলে ব্রিচেস—যা তাঁর দাদু খানবাহাদুর দবিরুদ্দিনের এবং যে দবিরুদ্দিন বিশের দশকে এই কুতুবগঞ্জে প্রথম অষ্টিন গাড়ি চড়ে আনাগোনা করতেন এবং যিনিও ছিলেন এই নাতির মতোই বন্দুকবাজ, উড়ন্ত পাখি গুলিবিদ্ধ করে জেলার ইংরেজ কালেক্টরকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

নাসিরুদ্দিনের সেই লক্ষভেদী ক্ষমতা নেই। কারণ এলাকায় শিকারযোগ্য পাখ-পাখালি বা জন্তুজানোয়ারের আকাল। তার বদলে অবশ্য মানুষ আছে। তবু মানুষের বুকে ছেঁদা করার জন্য আবদুলই যথেষ্ট। নাসিরুদ্দিন জনসেবক মানুষ। মানুষের রক্তে হাত রাঙানো তাঁর শোভা পায় না।

তোপখানার ঝিলটি আসলে বেহুলা নামে নদীটিরই পুরনো খাত। তার পাড়ে নাকি মোগলবাদশাহ আকবরের আমলে জায়গিরদার কুতুবুদ্দিন খানচৌধুরির তোপখানা ছিল। এখন জঙ্গলে জঙ্গলে ঠাসা সরকারি খাস মাটি। টুকরো ইঁট, পাথর বা লাইনকংক্রিটের ছাবড়া ছড়িয়ে আছে। গাছ-গাছালির শেকড়বাকড়ে গাঁথা পুরনো সেই কংক্রিটের ছাবড়ায় ভীতু ও কোমল আগাছা রোদ্দুরের জন্য মাথা কোটে। নীচের ঝিলে শালুকপদ্ম পাণিফল আর শোলাঝাড়ের ফাঁকে দৈবাৎ এক পানকৌড়ি কী ধূর্ত ডাহুক চোখে পড়ে। গরিব গুরবো মেয়েরা হেঞ্চাকলমির শাক তোলে। ডুব দিয়ে তোলে গুগলি কী ঝিনুক। এখনও হেমন্তের শেষে অভ্যাসে উড়ে এসে বসে ছোট্ট একটি বুনোহাঁসের ঝাঁক। মানুষজনের ভিড়ভাট্টা দেখে কেটে পড়ে ঝটপট। তবু

থেকে যায় দলছুট, বেয়াড়া আর মরিয়া কোনো দম্পতি। শোলাঝাড়ের আড়ালে ক্যামাফ্লেড করে ভেসে থাকে।

জঙ্গলের ওধারে আবদালাদের বসতি। ওরা মুসলমান মৎসজীবী সম্প্রদায়। এলাকার মুসলমানদের কাছে অছ্যুত। ওরা বর্ষা থেকে হেমন্তকাল মাছ ধরে শুটকি তৈরি করে। দুর্গন্ধে ওদিকটায় যাওয়া দায়। আর লোককথাগুলোও যেমন, মেয়েগুলোও তেমনি ডানপিটে। বড়ো এককাট্টা সমাজ ওদের।

বেহুলা নদীটি এই চৈত্রে শুকনো। বুকে বালির চড়া। আনাচে-কানাচে ঝিরঝিরে একফালি কালো জলরেখা। পাড়ের বাঁধে হিজল জাম জারুল জিয়ালার সারি। ডাইনে নেমে বোরোধানের সবুজ ক্ষেতের ভিজে আলে গামবুটের ছাপ ফেলে নাসিরুদ্দিন টিবির মতো উঁচু তোপখানার জঙ্গলে যখন ঢুকলেন, তখন সূর্য পেছনে কুতুবগঞ্জের ওপারে নেমেছে। উত্তাল হাওয়ার জঙ্গল কাঁপছে। জঙ্গলের ভেতর কাঠকুড়োনি মেয়েদের চলাফেরায় সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা শাদা একটি রাস্তা হয়ে গেছে। আবদুলের দিকে ঘুরে একটু হাসলেন নাসিরুদ্দিন। এই বেতমিজ! খামোকা হয়রান করছিস না তো?'

বান্দা আবদুল জিভ কেটে বলে, 'ছ্যারের সঙ্গে তামাসা কত্তে পারি? আপনচোখে দেখে যেয়েছি।'

'কী দেখতে কী দেখেছিস ব্যাটা!'

'খোদার কসম, ছ্যার। একজোড়া হাঁস—একটা লয়কো। দু-দুটো।' 'চল্, দেখি।'

মানুষজনের ভিড় দেখে হাঁসদম্পতি দিনমান গা ঢাকা দিয়ে থাকে। শেষ বেলায় ঝিল থেকে শেষ মানুষটি উঠে গেলে তারা স্বাধীনতা ফিরে পায়। স্বাধীনতায় সাঁতার কাটে। ডানা থেকে জল ঝাড়ে। ঝিলের জল তখন স্বাধীনতাময়—যে স্বাধীনতা নিসর্গ লোকে ছড়িয়ে আছে, যে-স্বাধীনতায় সূর্য ওঠে এবং অস্ত যায়, বীজ থেকে অঙ্কুর গজায়, বৃষ্টি ঝরে। পাখপাখালি পোকামাকড় যে-স্বাধীনতার বন্দনা করে।

ঝিলের জলে এখন স্বাধীনতা। নাসিরুদ্দিনের হাতে বন্দুক। আবদুলের দুই পকেটে ভোজালি ও পিস্তল। নীচে ধূসর ঝিলের দিকে টিবির জঙ্গল থেকে আবদুল আঙুল বাড়ায়। ফিসফিসিয়ে বলে, 'ওই দেখুন স্যার। ঠাওর করে দেখুন। ওই যে কালো মতোন।'

নাসিরুদ্দিন দেখতে দেখতে বলেন, 'একটা কেন রে? তুই বলেছিলি দুটো।'

'জোড়াটা দামের আড়ালে আছে হয়তো। এক্ষুনি বেরুবে।'

বন্দুক তুলে তাক করেন নাসিরুদ্দিন। আবদুলের চোখের ঢেলা ঠেলে বেরোয়। মানুষের গলায় ভোজালি চালাতে কী সীসের গুলিতে বুক ছ্যাঁদা করে দিতে যার কুতকুতে চোখদুটো কোমল থাকে, একটা পাখির জন্য তা ঠেলে ওঠে। উত্তেজনায় দম আটকে যায়। ফিসফিসিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'লেট করবেন না ছ্যার।'

আলো কমে গেছে। ঝাপসা হয়ে এসেছে ঝিলের আবহমণ্ডল। সন্ধ্যায় ছাইরঙে ঢেকে গেছে সবকিছু। কালো পাখিটি স্থির কিংবা একটু নড়াচড়া করছে, ঠিক বোঝা যায় না। নাসিরুদ্দিন ট্রিগারে চাপ দেন। বন্দুকের গর্জন আর বারুদের কটু গন্ধে নিসর্গ আলোড়িত হয় কয়েক মুহূর্ত। শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নাসিরুদ্দিন। কালো পাখিটিকে শোলাঝাড়ে আটকে যেতে দেখলেন। বললেন, 'যা, নিয়ে আয়।'

আবদুল দৌড়ে নেমে গেল।

নাসিরুদ্দিন দাঁড়িয়ে আছেন, বন্দুকের বাঁট মাটিতে, নলটি হাতের মুঠোয় ধরা। সিগারেট ধরালেন লাইটার জ্বেলে—হাওয়া বড়ো বেয়াদপি করছে। হিজল গাছে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে আছেন। দেখছেন, আবদুল থমকে দাঁড়িয়ে আছে। জলে নেমে হাঁসটিকে কুড়োতে যদি হাফপ্যান্ট ভেজে, ভোজালি দিয়ে একটা লম্বা কেটে নিক। শোলা ঝাড়টি কিনারে থেকে তেমন কিছু দূরে নয়। তবু হারামজাদা ওভাবে দাঁড়িয়ে কী দেখছে?

নাসিরুদ্দিন রুষ্ট হয়ে নেমে যান। ঢালু পাড়ে চিকন চাপ-চাপ দূর্বাঘাস। গামবুটের চাপে চেপ্টে যেতে থাকে। নীচে নেমেই গর্জন করেন, 'আই ব্যাটা!'

তখন আবদুল হাতে ইশারা করে। নাসিরুদ্দিন অবাক হন। আবদুল তাকে ডাকছে। কেন?...

উঁচু ঢিবির ওপর আবদালাপাড়া। নীচে নদী বেহুলা। তিনদিকে বহুদূরে ছড়িয়ে আছে সোলা মেলা মাঠ। কোথাও ধূসর, কোথাও দাগড়া-দাগড়া সবুজ পোঁচ। আকাশের গায়ে দাগ কেটে চলে গেছে এগারো হাজার ভোল্ট বিদ্যুতের লাইন। বেলাশেষের উদ্দাম হাওয়ার দূরের পাম্পিংযন্ত্রের গরগর শব্দ একবার কাছে ভেসে আসে, একবার দূরে সরে যায়। হাওয়া শব্দটা নিয়ে খেলা করছে।

ঘর দশেক বসতি। একটি খেড়ো মসজিদ। নিমতলায় এক পিরের দরগা। দরগাটি মাটির। সদ্য চুনকাম করা হয়েছে। চৈত্রের শেষ রবিবার ওখানে মানত মানবে আবদালারা। উনি জলের পির। জলেই ওঁর বাস। নদী খালবিল শুকোলে তখন দরগায় ফিরে আসেন। পাঁচু আবদালার ওপর ভর করেন। ঝাঁকড়-ঝাঁকড় চুলে ভরা মাথাটি দুলিয়ে পাঁচুর গলায় জলবাসী পীর ভবিষ্যদ্বাণী করেন। লোকে বলে পানিপির। এলাকার হিন্দু মৎস্যজীবীরাও মানত দিতে আসে।

জরিনা দাঁড়িয়ে দরগার সামনে। ছেলেপুলে বিয়োতে পারেনি বলে শুধু মরদ গফুর আবদালা নয়, পাড়াপড়শিরাও গালমন্দ করতে ছাড়ে না। মরশুমে মাছ ধরতে গিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরলেই জরিনার নামে গালমন্দ, 'ওই আঁটকুড়ির মুখ দেখে গিয়েই এমন হল। গোফুরে ওকে তালাক দ্যায় না ক্যানে? ওকে যাদু করেছে ডাইনি মেয়েটা।

এবার পাঁচুচাচার ভর উঠলে জরিনা স্পষ্ট কথাটি জানতে চাইবে, কী গোনা করেছিল সে যে এতসব বছর বিয়োনি মেয়ে আবদালা পাড়ায়, আর তার জঠরখানি খালি থেকে যাচ্ছে?

পাঁচু আসছিল নদীর দিক থেকে। থমকে দাঁড়ায় আনমনা মেয়েটাকে দেখে। পাঁচুর হাতে পলুই আর খালুই। কালীতলার দহের কাছে তোপখানার ঝিলের মুখ। মুখে জমাট চড়া পড়ে উলুকাশের জঙ্গল। ওখান থেকে ঝিলটা বেঁকে গেছে ধনুকবাঁকা হয়ে। বন্দুকের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। বন্দুকবাজদের জ্বালায় আজকাল পাখপাখালি নির্বংশ। শেয়ালটিও ডাকে না। ঝিলের দামের দিকে ছিল পাঁচুর দৃষ্টি। দাম নড়তেই ঝপাস করে পলুই নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল। একটা শোলমাছ ধরে পড়েছে। একাদোকা মানুষ। সামনে গফুরের বউটাকে দেখে ঠিক করে তাকেই অর্দ্ধেক দেবে। দিতেই হবে।

'জরিনাবিটি!'

আনমনা জরিনা চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ায়। মিষ্টি হেসে বলে, 'কী চাচা?' আঁটকুড়ির মুখ দেখে যাওনিতো?'

পাঁচু আবদালা জিভ কেটে বলে, 'উ কী কথা মা জননী? বলতে নাই।' সে খালুই থেকে

তাজা শোলমাছটি বের করে দ্যাখ্যায় গফুরের বউকে। ডেকে বলে, 'আয় মা, আমার ডেরায় আয়। আর্দ্ধেক তোকেই দেব।'

'ক্যানে গো চাচা?'

যখন পলুই ফেললাম ঝিলের পানিতে, তখনই মনেমনে কিরে করেছিলাম কী, গাঁয়ে ঢুকেই পেত্থমে যাকে দেখব, তাকেই আর্দ্ধেক দেব।'

'ও! তা নৈলে দিতে না।' জরিনা খি খি করে হাসে। আচলচাঁপা হাসি। পাঁচু জিভ কেটে বলে, 'দিতাম। তোকে দিতাম। গাঁয়ের মধ্যে তোর মতন ভালো মেয়ে আর কাউকে তো দেখি না।'

কথাটা ভালো লাগে জরিনার। পেছন-পেছন যায়। দরগার পাশেই পাঁচু আবদালির ঘর। ঘর মানে নেহাত একটা কুঁড়ে। মানতের যা পয়সা কড়ি পড়ে দরগার সামনে, তা সে জমিয়ে রাখে। কোথায় রাখে, সেটা নিয়ে জল্পনা চলে আবদালাপাড়ায়। নিশ্চয় কোথাও পুঁতে রাখে।

ঘর থেকে ছোট্ট বঁটি বের করে পাঁচু বলে, 'তুই-ই বরঞ্চ কাটাবাছা করে দে বিটি। আমার জন্যে খানিক রাখিস।'

জরিনা মাছটিকে আছাড় মারে। নিস্পন্দ হয়ে গেলে বঁটিতে কাটতে থাকে। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। পাঁচু দরগায় পিদিম জেলে দিতে যায়। ফিরে এলে লণ্ঠন জ্বালে। জরিনা বলে, 'আলো কী হবে চাচা? আমার কাজ শেষ। এই নাও, যা দেবার দাও।'

'তুই আপন হাতে আমাকে যা দেবার দে বিটি।'

জরিনা মাথা নাড়ে। 'উঁহু, তুমি বেঁটে দাও।

অগত্যা পাঁচু বাঁটতে আসে। নিজের জন্য একভাগ রেখে দু'ভাগ জোর করে গফুরের বউযেব আঁচলে তুলে দেয়। তাবপর বলে, 'গোফরো কতি গেল রে? তাকে বলিস তো একবার দেখা করতে।'

জরিনা বলে, 'হাঁসগুলানের জন্যে গুগলি তুলতে যেয়েছে ঝিলে।'

'এই অবেলায়?'

'বিকেলবেলায় বাড়ি এল কোত্থেকে।' জরিনা বাঁকা মুখে বলে। 'মাছ মারার ব্যাটা এখন কুতুবগঞ্জের বাজারে আড্ডা মারতে যায়। তাড়ি গিলে চুর হয়ে এল আজ। ও কি মানুষ?

পাঁচু মনে মনে হাসে। বউকে বড্ড ডরায় গফুর।...

জরিনা বাড়ি ফিরে দ্যাখে, এখনও মরদ ফেরেনি। একটুখানি বুক কাঁপে তার। তাড়ি গিলে নেশার চুর লোকটাকে তেড়েমেড়ে গুগলি তুলতে পাঠাল। জলে ডুবে মারা পড়েনি তো?

তারপরই সে আপন মনে হাসে। জলমানুষ যারা, তাদের আবার জল-থল?

জল পেলে নেশা কেটেই যাবে। যাও।

জরিনা উঠোনের উনুনের পাশে রাখা পাথরে টুকরোয় মাছ ঘষতে বসে। শোল মাছের ঝোল খাইয়ে লোকটাকে তাক লাগিয়ে দেবে।...

কিন্তু দিনশেষের আবছায়ায় নাসিরুদ্দিন যে কালো জিনিসটাকে আবদুলের কথায় গুলিবিদ্ধ করেছিলেন, আসলে সেটি একটি মানুষের মাথা।

রাত দশটায় কৃষ্ণপক্ষের ফালি চাঁদটুকু উজ্জ্বল হলে আবদুল, মন্টু, রশিদ আর চণ্ডী ফিরে খিড়কির দরজা দিয়ে। পাঁচিলঘেরা ফুল-ফলের গাছপালায় সাজানো বাড়িটার গেটে মার্বেলফলকে লেখা আছে: 'খানবাহাদুর মঞ্জিল।' ঠাকুরদা দবিরুদ্দিনের স্মৃতির তৈরি ঝকঝকে

নতুন দোতলা প্রাসাদ। পুরনো আমলের একতলা দালানের ভিতের ওপর কিছুটা, আবার কিছুটা এপাশে-ওপাশে নতুন ভিতের ওপর দাঁড়ানো সবুজ রঙের সৌধ। সারারাত ঝলমল করে আলোর সাজে। সামনে লন, গাড়ি বারান্দা। ডাইনে বাঁয়ে ফুলবাগিচা। পেছনে দেশি-বিদেশি ফলের গাছের বাগান। একটি চৌকোণা ছোট্ট পুকুরও আছে যা সুইমিং পুল নামে অভিহিত, যদিও কেউ বাথস্যুট পরে সাঁতার কাটে না। কিন্তুপাম্প চালিয়ে সারাবছর জলে পূর্ণ রাখা হয়। চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এই প্রাসাদ বাড়িটি এখন গ্রামনগরী কুতুবগঞ্জের গর্ব।

নাসিরুদ্দিন পেছনের চৌকো ছোট্ট পুকুরটির ধারে সিমেন্টের বেদীতে বসেছিলেন। এ রাতে এদিকের আলো নেভানো। খিড়কির দরজাটি খোলা। মালী পরিবার বাস্ করে বাড়ির সামনের দিকে গেটের পাশে। সেখানে গ্যারেজঘর, ড্রাইভার ও দারোয়ানের ঘর, কোণার দিকটায় মালীপরিবার। গেট বন্ধ। কৃষ্ণচূড়া আর কাঠমল্লিকার ছায়ার তলায় বিদ্যুতের আলোর কুচি, মাথায় ফিকে হলুদ জ্যোৎস্না। আবদুলরা ফিরে এলে নাসিরুদ্দিন গেটের দিকটায় চোখ দ্রুত বুলিয়ে নিলেন। ওরা সবাই শুয়ে পড়েছে। জাতীয় সড়ক দিয়ে গজরাতে গজরাতে চলে গেল দূরপাল্লার একটি বাস। গেটের দিকটা জ্বালাপোড়া করে দিয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

চারটি ছায়ামূর্তির সামনে নাসিরুদ্দিন হঠাৎ একটু ভয় পেলেন। চারটি পোষা ডালকুত্তা যদি হঠাৎ কোনোদিন তাঁরই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জানোয়ার নিয়ে সার্কাসের খেলা দেখানো।

আবদুল চাপা হাসল নাসিরুদ্দিনের সম্বিৎ ফিরল। আস্তে বললেন, 'কী করলি?'

আবদুল ঘাসে বসে পড়ল। চণ্ডী বলল, আবদুলদার মাথা আছে বটে! নৈলে খুব ঝামেলা হত।'

বিরক্ত নাসিরুদ্দিন বললেন, 'ধুস! পুঁতলি কোথায়?'

রশিদ বলল, 'কবরে।'

'কবরে মানে?'

আবদুল হাত নেড়ে বলল, 'ছ্যারকে যা বলার সব বলছি। তোরা এখন আয় দিকি বাপ! রশিদ! মন্টে আর চণ্ডীর সঙ্গে তুই যাসনে। ওরা যাক এক রাস্তায়, তুই ভিনরাস্তায়। কাল দেখা হবে।'

তিনজনে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল, যে পথে এসেছিল। নাসিরুদ্দিন শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বললেন, 'দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয় আবদুল!'

'যাচ্ছি।' সে খিল খিল করে হাসতে লাগল।

নাসিরুদ্দিন ধমক দিলেন, 'হাসির কী আছে? দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয় আগে!'

অগত্যা আবদুল দরজা বন্ধ করতে গেল। নাসিরুদ্দিন ঘুরে দোতলায় তাঁর শোবার ঘরের জানালার দিকে তাকালেন। টেবিলল্যাম্প জ্বলছে ঘরে। পর্দা ফাঁক হয়ে আছে। নেমে আসার সময় দেখেছিলেন পর্দায় জানলাটি ঢাকা। সেলিনা বেগম তিন বছরের দস্যি ছেলেকে বুকে চেপে শুয়েছিলেন। সিলিং ফ্যান মাথার ওপর আস্তে ঘুরছিল। রাতের দিকে এখনও একটু ঠাণ্ডার আমেজ পাওয়া যায়। তাছাড়া পুব-দক্ষিণ কোণার ঘর। সারা রাত চৈত্রের হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আবদুল এসে আবার ঘাসের ওপর বসল। নাসিরুদ্দিন বললেন, কোথায় পুঁতলি?

'কবরে।'

কবরে মানে?

আবদুলের দাঁতে জ্যোৎস্না ঝকমক করতে থাকল।...'তোপখানার জঙ্গলেই হঠাৎ কথাটা মনে পড়েছিল। আরে তাই তো! আজই বিকেলবেলা শাদুল্লাকে হাসপাতাল থেকে এনে কবর দিলে! টাটকা কবর। কাদামাটি সরিয়ে গোফ্রো আবদালাকে ঢোকালেই হল। আবার কাদামাটি চাপিয়ে ঠিকঠাক করে দিলেই হল। আগের দিনে শেয়ালের ভয়ে কবরে কাঁটাগাছ পুঁতে দিত। আজকাল শেয়ালও নাইকো। কাঁটাগাছও পোঁতে না।'

নাসিরুদ্দিন হাসলেন। 'তোর বুদ্ধি আছে আবদুল!'

আবদুল গল্পটা বলতে থাকল। কবরের টাটকা কাদামাটি, খড় আর বাঁশের সারি সরিয়ে গোফুরকে ঢুকিয়ে কেমন করে পেটের রুগী শাদুল্লার ওপর শুইয়ে দিয়েছে, কেমন করে আবার বাঁশগুলো সাজিয়ে খড় চাপিয়ে তার ওপর কাদামাটি দিয়ে কবরটির গড়ন ঠিকঠাক করেছে এবং একটুও ভুল হয়নি, কারণ মণ্টু ও চণ্ডী হিন্দু ছেলে হলেও রশিদ সঙ্গে থাকায় কত সুবিধে হয়েছে—এইসব বিবরণ। আবদুল নিখুঁত বননায় পাকা। তার হাতের কাজও তেমনি পাকা।

নাসিরুদ্দিন বললেন, 'ভোরে একবার তবু গিয়ে দেখে আসিস।'

'যাব বৈকি।' আবদুল বলল, 'তবে শাদুল্লার কবর দেখতে কেউ যাবে না জেনে রাখুন।'

'কেন? ওর ছেলেরা বা ওর বউ যদি—'

'বুড়ো লোকটা মরে ওদের মনে শান্তি দিয়েছে। বুঝলে না ছ্যার?' আবদুল হাত বাড়াল। 'এবারে একটা সিগাবেট দ্যান, টানি!'

'কাদা মেখেছিলি নিশ্চয়। ধুলি কোথায়?'

'ঝিলে। দ্যান, সিগারেট দ্যান!'

আবদুল নীচেব তলায় একটা ঘরে থাকে। পুরুষানুক্রমে এ বাড়ির বান্দা সে। তিনবার বিয়ে কবেছিল। তিনবার তালাক দিয়েছে। মেয়েদের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আবদুলের।...

নাসিরুদ্দিন ঘরে ফিরে থমকে দাঁড়ালেন। সেলিনা বেগম পুবে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সাড়া পেয়ে ঘুরলেন। নাসিরুদ্দিন বললেন, 'ঘুমোও নি! কী ব্যাপার?'

'আর কতকাল এসব করবে?' সেলিমা বেগম আস্তে প্রশ্নটা করলেন।

'কী সব?'

'ন্যাকামি কোরোনো!' সেলিনা ঝাঁঝালো স্বরে বললেন। 'সন্ধে থেকে তোমার আজ কেমন ছটফটানি লক্ষ্য করছি। নিশ্চয় আবার কাউকে—'

নাসিরুদ্দিন রুক্ষস্বরে বললেন, 'শাট আপ! বাড়াবাড়ি কোরো না। মেয়েদের সব তাতে নাক গলাতে নেই।'

সেলিনা ভাঙ্গা গলায় বললেন, 'কিন্তু যেদিন উল্টে তোমার কিছু হবে, সেদিন আমি কি করব?' কলেজ জীবনে প্রেম করে মফস্বল শহরের এক আইনজীবীর এই কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন নাসিরুদ্দিন। দেখতে দেখতে তিরিশ বছর কেটে গেল। তিনটি ছেলে তিনটি মেয়ের মা হয়েছেন সেলিনা। বড়ো ছেলে কলকাতার কলেজে পড়ে। একটি মেয়ে শান্তিনিকেতনে পড়ছে। মেজ ছেলে স্থানীয় স্কুলের ছাত্র। এখনই দুর্দান্ত মস্তান। ছোটো ছেলে খাটে শুয়ে আছে। বাকি দুটো মেয়ে সদর শহরে দাদামশাইয়ের বাড়িতে থেকে সেখানকার গার্লস স্কুলে পড়ে। কুতুবগঞ্জে এখনও গার্লস স্কুল হয়নি। চেষ্টা চলছে, নাসিরুদ্দিন লড়ছেন। লড়ছেন বাবুপাড়ার বাবুমশাইরাও।

নাসিরুদ্দিন ওই কণ্ঠস্বর শুনেই সপ্রেমে স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এক মুহূর্তের জন্য ইচ্ছে হল, আজকের অ্যাকসিডেন্টটা বলে মনের ভার হাল্কা করেন। কিন্তু পারলেন না। সেলিনা বেগম তাঁকে এখন প্রেমিক করে ফেলেছেন। প্রেমের কোমল সুন্দর গালিচায় রক্তের ছোপ ফেলাটা উচিত হবে না। তবে অ্যাকাসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। তিনি তো লোকটাকে খুন করতে চান নি। তারই বরাত। তিনি নিমিত্ত মাত্র।...

থানার উঁচু বারান্দায় বিশাল টেবিলের সামনে বসে ও সি হিতে শরঞ্জন একটি ফাইল দেখছিলেন। সদ্য ফিরেছেন পাশের একটা গ্রামে হাঙ্গামার তদন্ত সেরে। ঘোমটা ঢাকা একটি মেয়ে আর তার সঙ্গে রোগা পাঁকাটি চেহারার লোক, ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল আর গোঁফদাড়ি—যাকে পাগল বলেই ভুল হতে পারে, নীচের লনে কর-জোড়ে দাঁড়াল। হিতেশরঞ্জন বললেন, 'দ্যাখো তো হবিবুর, কী চায় ওরা?'

কন্সটেবল হবিবুর বলল, 'তুমি আবদালা পাড়ার পাঁচু না?'

'জি হুজুর।'

'কি হয়েছে?'

পাঁচু বলল, গোফরোকে অবিশ্যি চিনলেও চিনতে পারেন। তবে সে চোর-চোট্টা নয়কো। এই মেয়েটা হল গোফরোর বউ।'

হবিবুর হা হা করে হাসল। 'গোফরো পিটিয়েছে বুঝি?'

জরিনা আর চুপ করে থাকতে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্না জড়ানো স্বরে বলল, 'আজ তিন দিন আমার মরদের খবর নাইকো হুজুর। সন্ধে বেলা হাঁসের জন্যে তোপখানার ঝিলে গুগলি তুলতে গেল। আর বাড়ি ফিরল না।'

পাঁচু বলল, 'চোরচোট্টা কি না আপনারা ভালোই জানেন হুজুর! খামোকা একটা মানুষ নিপাত্তা হয়ে যাবে, ই কী কথা! দোষের মধ্যে শুধুই তাড়িটা-গাঁজাটা খেত এই যা!

হবিবুর বড়োবাবুর উদ্দেশ্যেই বলল, 'গোফুর স্যার। শুঁটকি মাছ বেচে বেড়াতে দেখেছি। সেই গোফুর তিনদিন নিখোঁজ।'

হিতেশরঞ্জন মেয়েটিকে দেখছিলেন। দেখতে মন্দ না। ঘোমটার ফাঁকে সরল বোকাসোকা মেয়েমানুষের মুখ। বললেন, 'আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি খোঁজ নিয়েছ?'

পাঁচু বললে, 'সে কি আর নিইনি হুজুর? কুত্থাও খবর নাইকো।'

হবিপুরের উদ্দেশে বড়বাবু বললেন, 'অ্যাকসিডেন্ট তো হয়নি হাইওয়েতে?'

হবিবুর বলল, 'আমাদের এরিয়ায় তেমন কিছু হয়নি স্যার—অন্তত এসপ্তায় কিছু হয়নি।'

বড়োবাবু ডাকলেন, 'এখানে এস। ওগো মেয়ে!' এখানে এস।

পাঁচু ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ি বেয়ে উঁচু বারান্দায় ওঠাল। ধপাস করে বসে পড়ল জরিনা। আবার ফুঁপিয়ে কান্না। হিতেশরঞ্জন ভুরু কুঁচকে দেখছিলেন ওকে। এলাকায় মারদাঙ্গা খুনোখুনি বেড়েই চলেছে। তবে তিনি অন্য কিছু খুঁজছিলেন মেয়েটির মধ্যে। অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করে স্বামীকে খুন করিয়ে ন্যাকামি করতে এসেছে নাকি। জেরা শুরু করলেন হিতেশরঞ্জন। কিছু কথার জবাব পাঁচু দিতে চেষ্টা করলে তাকে চোখ কটমট করে ধমক দিলেন। পাঁচু কোণঠাসা হয়ে বসে রইল।

সাব ইন্সপেক্টার হরিদাস সাধুখাঁ অফিসঘর থেকে বেরিয়ে কথা শুনছিলেন। জেরা শেষ

হলে বড়োবাবু তাকে বললেন, 'মিসিং ডায়রি লিখে নিন তো হরিদাসবাবু! রেডিও মেসেজ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন অন্যান্য স্টেশনে। ওগো মেয়ে, যাও ওঁর সঙ্গে।'

পাঁচু ও জরিনা অফিসঘরে ঢুকলে হবিবুর চাপাস্বরে বলল, 'মেয়েটার ক্যারেক্টার ভালো নয় স্যার।'

হিতেশরঞ্জন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তাই বুঝি?'

'হু'—আবদালাপাড়ার লোকের কাছে শুনেছি।'

'সে লোকটা কে?'

হবিবুর ঝটপট বলল, 'সেটা ঠিক শুনিনি স্যার! খুঁজলে বেরুবে। তবে পাড়ার কারুর সঙ্গে মেয়েটার বনিবনা নেই। আর গোফরোও এক হারামজাদা—রোজ বিকেলে তাড়ি খেতে আসে বাজারে।'

'খোঁজ নাও তো ভালো করে।' হিতেশরঞ্জন ফাইলে চোখ রাখলেন ফের।...

নাসিররুদ্দিন খানচৌধুরি তাঁর তিনবছরের কনিষ্ঠপুত্রটির সঙ্গে রঙীন বল নিয়ে খেলা করছিলেন। লনের কোমল ঘাসের ওপর টলমল করে হেঁটে বেড়াচ্ছিল পিংকু নামে ডাগরডোগর শিশুটি। বাবার দিকে বল ছুঁড়ে খিলখিল করে হাসছিল। বিকেলের রোদ্দুর মখমল ঘাসে ঝলমল করছিল। এমন সময় বন্ধ গেটের গরাদের ওধারে দুটি মানুষকে দেখতে পেলেন নাসিরুদ্দিন। নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন।

দারোয়ান করিম কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছে না। বলছে, 'এখন ছ্যারের সঙ্গে দেখা হবে না। কাল দশটা এগারোটায় পঞ্চায়েত আপিসে যেও।'

নাসিরুদ্দিন বলটি হাতে নিয়ে হাঁক দিলেন, 'কী করিম?'

করিম বলল, 'আবদালাপাড়ার পাঁচু ছ্যার!'

বুকের ভেতর ঠাণ্ডা একটা বল গড়িয়ে গেল নাসিরুদ্দিনের। জীবনে কত খুনখারাপির হুকুম দিয়েছেন, একটুও বুক কাঁপেনি। অথচ কদিন থেকে কী একটা গোপন সন্ত্রাস তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘুম হচ্ছে না। ভালো করে খেতে পারছেন না। সেলিনাকে সব খুলে বলতে ইচ্ছে করছে, তবু পারছেন না।

বললেন, 'ভেতরে আসতে দে ওদের।'

পাঁচু আর জরিনা এসে সামনে দাঁড়াল। জরিনার মুখ ঘোমটা ঢাকা। পাঁচু আদাব দিয়ে বলল, 'গফুরকে চেনেন কি না জানিনা। হুজুর। তারই বউ। সেলাম কর মা চৌধুরিসাহেবকে।'

জরিনা কপালে হাত ঠেকাল। নাসিরুদ্দিন চমকে উঠলেন। বছর কুড়ি-বাইশের বেশি বয়স নয়। ছিপছিপে গড়নের যুবতী মেয়ে। বন্য ও সরল সৌন্দর্য্যের ওপর গাঢ় বিষাদের ছাপ।

পাঁচু বলল, 'গোফরো তিনদিন থেকে নিপাত্তা হুজুর। তাই থানায় গিয়েছিলাম মেয়েটিকে নিয়ে—যদি কিছু কিনারা হয়!'

'থানায় গিয়েছিলে?' নাসিরুদ্দিন আস্তে বলল, 'কী বলল পুলিশ?'

পাঁচু কাঁচুমাচু মুখে হাসবার চেষ্টা করল। 'কাগজে লেকে তো নিলে। পথে আসতে আসতে খেয়াল হল, একবার চৌধুরিসায়েবের কাছে যাই। অনুগ্রহ করে যদি হুজুর থানায় একটু বলে দেন।'

নাসিরুদ্দিনের পায়ের কাছে এসে পিংকু বলটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করল তারপর বলটি পেয়ে সে জরিনার দিকে ছুঁড়ে দিল। জরিনা বলটি তার হাতে তুলে দিল কয়েক পা এগিয়ে। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নাসিরুদ্দিন বিব্রত মুখে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছে কিছু বলে যায় নি গোফুর?'

জরিনা কান্নার মধ্যে বলল, 'তোপখানার ঝিলে হাঁসের জন্য গুগলি তুলতে গেল বিকেলবেলা। কিনারায় গুগলিগুলান জড়ো করা ছিল। লোকটা নাইকো।'

'বলো কী!'

পাঁচু বলল, 'জি হুজুর। হ্যারিকেন হাতে ঝিলের ধারে দু'জনে এলাম। তখনও জ্যোৎস্না ওঠেনিকো। দেখি কী, এতগুলান গুগলি জড়ো করা আছে, মানুষটা নাইকো। ই বড় ধন্দর কথা হুজুর।'

'থানায় বলেছ?'

'জি।'

'ঝিলের পানিতে খুঁজেছ? ডুবেটুবে—'

কথার ওপর জরিনা বলল, 'গাঁসুদ্ধু লোক ঝিলের পানি খুঁজছে হুজুর।'

পাঁচু বলল, 'ডুবে মারা গেলে অ্যাদ্দিনে ভেসে উঠত।'

নাসিরুদ্দিন শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে। এসো তোমরা। বড়োবাবুকে বলব'খন। ওরা চলে যাচ্ছিল, ফের ডাকলেন, 'শোনো!'

দু'জনে ঘুরে দাঁড়াল। তখন নাসিরুদ্দিন বললেন, 'ওর চলছে কী করে? গোফুরের অবস্থা কেমন ছিল?'

পাঁচু বলল, 'বড়ো কষ্টে পড়েছে মেয়েটা। গোফরে হারামজাদা তো মদমাতাল লোক ছিল। যা রোজগার করত, সব উড়িয়ে দিত। ঘরে চাট্টি শুঁটকিও নাইকো যে বেচে খাবে।'

'কাল একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে আসতে বলো ওকে—পঞ্চায়েত অফিসে। কেমন? যদি পারি, কিছু টাকাকড়ি পাইয়ে দেব।'

ওরা চলে গেলে পিংকুকে কোলে তুলে নিলেন নাসিরুদ্দিন। সামনের দোতলার ব্যালকনিতে সেলিনাবেগম দাঁড়িয়ে আছেন। ওব মুখে কী একটা দেখলেন নাসিরুদ্দিন। বুকে আবার ঠাণ্ডাহিম একটা বল গড়িয়ে গেল।..

ক'দিন পরের কথা।

চৈত্রমাসের শেষ রবিবার আবদালাপাড়ার 'পানিপিরের' দরগায় পাঁচু আবদালার ভর উঠেছে। এলাকার হিন্দু মৎসজীবীরাও পানিপিরের দরগায় এদিন মানত দিতে আসে। পিরবাবার দয়ায় তারা জলের শস্য কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বেঁচেবর্তে আসে। হিন্দু-মুসলমানের ভিড়ে ছোট্ট বসতিটি গমগম করে। সামনের চটানে ছোটোখাটো একটা মেলাও বসে যায়। একটা বিকেলের এই মেলায় পাপর ভাজার গন্ধ ভাসে। তালপাতার বাঁশি বাজে, মনোহারি-ওয়ালারাও চট বিছিয়ে বসে থাকে। দরগার সামনে মানতকারীদের ভিড়। পাঁচু আবদালা মাথা দোলাচ্ছে। মানত করে বসে দুটো হাত হাঁটুতে রেখে ঝাঁকড়া মাথাটিকে চক্কর খাওয়াচ্ছে চরকির মতো। এ পাঁচু সে-পাঁচু আবদালা নয়, স্বয়ং জলবাসী এক অশরীরী মহাত্মা—তাঁর নাম পানিপির। পাঁচুর মুখ দিয়ে তিনিই কথা বলছেন। সে-কথা বোঝা সহজ নয়। শুধু বোঝে ওই জলচরা মানুষ যারা, তারাই। এবার

কোন মাসে কোন জলায় কেমন মাছ হবে, আকাশ কেমন বর্ষাবে—তারই বৃত্তান্ত।

জরিনা দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়েছিল কুতুবগঞ্জের জহুরিবাবুকে দিয়ে। হুজুর চৌধুরিসাহেব একশো টাকা—যাতা কথা নয়কো, নগদ একশো টাকা 'ছ্যাংছান' করেছেন। সেই টাকা পেয়ে জরিনা ভেবেছে, গঞ্জের বাজারে গিয়ে পানসিগারেটের দোকান খুলবে। মরদের কথা ভাবতে গিয়ে তবু হঠাৎ দমে যায়। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে কান্নার গোটা। ঝরমরিয়ে চোখ দিয়ে ভেঙ্গে বেরিয়ে যায় বর্ষার মেঘের মত। মধ্যরাতে চোখ মুছে আবার ভাবে, যদি হঠাৎ কোনোদিন ফিরে আসে লোকটা, কী অবাক না হবে—তার বউ পানওয়ালি সেজে বসে আছে পিচ রাস্তার ধারে।

মেলার ভিড়ে ঘুরছিল জরিনা। হাতে টাকা এসেছে। কী কিনি, কী কিনি এই অস্থিরতা। শুঁটকির কটু গন্ধ ঘুচে গেছে চৈত্রের উত্তাল হাওয়ায়। পাঁপর ভাজার গন্ধ বসেছে চেপে। আজ আবদালাপাড়ায় একটা সুদিনের দিন। এই দিনটির প্রতীক্ষায় থাকে এলাকার যত সব জলচরা মানুষজন। পানিপিরের সামনে খুচরো পয়সার ঝকমকানি দেখে জরিনার মনে পড়ে সে একটা আধুলি মানত করেছিল।

আধুলি কেন, একটা টাকাই দেবে বরং। নোটটা চাদরে রেখে সেলাম করতেই শোনে মাথাদোলানো পানিপিরের কণ্ঠস্বর।

...তোপখানার ঝিলে গিয়েছিল গোফরো। আর গিয়েছিল পাঁচু আবদালা। বন্দুকের আওয়াজ শুনেছিল। ঝিলের ধারে গুগলি-গুলান জড়ো করা ছিল।

জরিনা ডুকরে কেঁদে বলে, 'পানিবাবা! আমার মরদ কতি গেল?'

পানিপির ফের বলেন, 'তোপখানার ঝিলে গিয়েছিল গোফরো। আর গিয়েছিল পাঁচু আবদালা। বন্দুকের আওয়াজ শুনেছিল ঝিলের ধারে গুগলিগুলান জড়ো করা ছিল।'

কেউ কিছু বুঝতে পারে না। মুখ তাকাতাকি করে পরস্পর। জরিনা কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'দশটাকা মানত দিই পানিবাবা! বলো, আমার মরদ কতি গেল?'

পানিপিরের জড়ানো গলায় কথা এলোমেলো হতে থাকে ক্রমশ শুধু 'বন্দুকের আওয়াজ' কথাটি বোঝা যায়। জরিনা এবার পিরবাবার পায়ে মাথা কুটতে থাকে। মেয়েরা তাকে টেনে সরিয়ে আনে। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য জলচরা মানুষজন অন্য বার্তা শুনতে চায় জলবাসী অশরীরী মহাত্মার কাছে। গোফুর, পাঁচু, বন্দুকের আওয়াজ, জড়োকরা গুগলি-সবই তুচ্ছ এখন। দয়া করে বৎসরান্তে পিরবাবা যখন এসেছেন, তখন 'বন্দুকের আওয়াজ' কথাটার মানে খুঁজে কে দেখতে চায়? কেউ না।

জরিনাকে মেয়েরা সান্ত্বনা দিতে একান্তে নিয়ে যায়। আর জরিনাও পানিপিরের মতো ভাঙ্গা জড়ানো কণ্ঠস্বরে বিড়বিড় করে 'বন্দুকের আওয়াজ...বন্দুকের আওয়াজ, বুলো?'

আবদালাপাড়ার সবচেয়ে কুঁদুলি বুড়িটাও ফোঁস করে নাক ঝেড়ে বলে, 'চুপ কর মা! চুপ করদিকিনি! বাবা পানিপিরের হেঁয়ালি বোঝে সাধ্যি কার?'...

এক ধরনের অসুখ

মতি নন্দী

দয়ানন্দ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এইভাবে : 'জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, হিন্দু আত্মীয়স্বজনহীন, যে কোন জাতির মেয়েকে বিবাহেচ্ছু। পাত্রী স্বয়ং পত্র লিখুন।''

ঠিকানা ছিল বক্স নম্বরে। তিনদিন পরে কাগজের অফিস থেকে দয়ানন্দ ছেঁচল্লিশটি চিঠি নিয়ে আসে। অফিস ছুটির পর মনুমেন্টের কাছে মাঠে বসে একে একে চিঠিগুলি পড়ে, তিনটি বেছে রাখে।

একটি চিঠি সন্তানহীনা বিধবার। স্বামী মারা যাবার পর একমাত্র ছেলেটি তিন বছরের হয়ে মারা যায়। এখন স্কুল-শিক্ষিকা, গ্র্যাজুয়েট। লিখেছে ঃ ''থাকি শ্বশুর বাড়িতেই। দ্যাওর বিয়ে করেছে, ভালো চাকরি করে, এ বাড়িতে আপাতত আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, বাপের বাড়িতে সৎমা। আমার বয়স আঠাশ, বিয়ে হয়েছিল আঠারো বছরে, সেই স্মৃতি আর কিছুই মনে নেই।''

দয়ানন্দ ভাবল, বিধবা, অন্য পুরুষের বাচ্চাও পেটে ধরেছে। তবু চিঠিটায় কেমন মায়া রয়েছে, টানছে। প্রায় বাল-বিধবাই বলা যায়, তার ওপর সন্তান হারিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে শোকে তাপে এতগুলো বছর কাটিয়ে বিয়েয় বসতে চাইছে। শ্বশুর বাড়িতে নিশ্চয় ভালো ব্যবহার করে না, বাপের বাড়িতে গেলে নির্ঘাৎ হাঁড়ি ঠেলে আর সৎ ভাইবোনদের মানুষ করতে করতে একদিন শুকিয়ে মরে যাবে। উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দেবারও কেউ নেই। এইসব মেয়েদের মধ্যে স্নেহ, প্রেম, মমতা বেশি থাকে। তাইতো দরকার।

দ্বিতীয় চিঠিতে লেখা ঃ ''আমরা নয় ভাইবোন। বাবা সাড়ে ছয় শত টাকা মাহিনা পান। আড়াই বছর পর রিটায়ার করিবেন, বড়ো বোনের বিবাহ হইয়াছে। ভগ্নিপতি স্কুল শিক্ষক, মেজো বোনেরও বিবাহ হইয়াছে, লাভ ম্যারেজ, বাবা কোন বাধা দেন নাই। আমি সেজো, ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়িয়াছি। বয়স চব্বিশ, সংসারের কাজ আমিই করি। মা হাঁপানিতে ভুগিতেছেন। আমি সুন্দরী। দয়া করিয়া যদি বিবাহ করেন তাহা হইলে খুবই উপকার হয়। প্রণাম জানিবেন।''

চিঠিতে একজায়গায় কাটা। ভুগছেন-টাকে কেটে 'ভুগিতেছেন' লেখা। দয়ানন্দ ভাবল কাজটা কার? সম্ভবত বাবা রিভাইজ করে দিয়েছে। লিখেছে ক্লাস সেভেনে পড়ি। অর্থাৎ ফোর হবে। চব্বিশ বছরটা নির্ঘাৎ ছাব্বিশ। হোক, এইসব মেয়েরা একটু বোকা ধরনের হয় বটে কিন্তু অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। আমার মতো গেরস্ত লোকের পক্ষে এই ভালো। অন্তঃকরণ সাদা হবে, অসুখ-বিসুখের ঝামেলা থাকবে না, সেবাযত্ন করবে মন দিয়ে। লিখেছে আমি সুন্দরী। কি ছেলেমানুষ! বোধহয় রঙটা ফর্সা আর মাথায় খুব চুল। মায়ায়-মমতায় দয়ানন্দর বুক ভারী হয়ে উঠল।

তৃতীয় চিঠি দয়ানন্দকে লোভে ফেলল। লিখেছে আঠারো বছরের এক কলেজের মেয়ে ঃ ''সাক্ষাতে সব বলব। আপনার সাথে কোথাও দেখা হতে পারে কি?'' বেশি কথা লেখেনি। ঠিকানা দিয়েছে কাঁচরাপাড়ার।

দয়ানন্দ এক কথা চিঠিটাকে নাকচ করে দিতে পারে। শুধু বয়স আর বিদ্যেবুদ্ধির বহর দিয়ে তার কি হবে। কেন বিয়ে করতে চায়, সেইটাই লেখেনি। সাক্ষাতে সব বলবে, কেন,

লিখে দিলেই তো পারত। গোলমাল আছে। তাহলে আর একে দিয়ে কি হবে। বিয়ে করে তো আরো গোলমালে পড়তে হবে।

কিন্তু অন্যকিছুও তো হতে পারে। কৌতূহল দয়ানন্দকে নাকানি-চোবানি দিতে শুরু করেছে। স্কুল ফাইনালটা তো পাস করা, তাহলে চাকরিও তো খুঁজে পেতে করতে পারে, নাকি বাড়ির অবস্থা ভালোই। তবে বিয়ে করতে চায় কেন। লটঘট করেছে? সামাল দিতে একটা স্বামীব দরকার?

দয়ানন্দ ভাবল খুব বেঁচেছি, ভাগ্যিস মনে পড়ল! তাহলে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। রবিবাবু সেদিন তো একটা গল্প বলল, তাদের পাড়ার একটা ছোকরা শেষমেশ আত্মহত্যাই করে ফেলল। বৌটার খুব চটক ছিল, বিয়ের পরও কলেজের ছেলে বন্ধুরা আসত। দয়ানন্দ আন্দাজ করতে পারে, আঠারো বছরের এই কলেজে পড়া মেয়েটা নিশ্চয় চটকদার। ছেলে বন্ধুটন্ধু তো আছেই।

তবে বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ে করতে চাইছে যখন, বাড়িতে বাপ-মা হয়তো নেই, কিংবা কোন আত্মীয়ের পোষ্য, জোর করে টাকার লোভে বিয়ে দেওয়া যায়, যাকে বলে মেয়ে-বিক্রি—সে রকম কেস নয়তো?

দয়ানন্দর মাথা তালগোল পাকিয়ে গেল। অনেকক্ষণ বসে সে ভাবল। এদিকে গড়ের মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ক্লাবের মালীরা ক্রিকেট পীচ জলে ভিজিয়ে খুঁটি পুঁতে ঘিরে দিয়েছে। আশেপাশে কিছু লোক বসে, কেউ একা, কেউ বা আড্ডায়। ঠিক মতো শীত এখনো পড়েনি। দয়ানন্দর দিকে তাকাতে তাকাতে একটি স্ত্রীলোক দুবার ঘুরে গেল। কালো ওভারকোট গায়ে পায়চারী করছে পুলিশ। চা-ওয়ালাকে ডাকার ইচ্ছে হচ্ছিল, বরং মেসে গিয়েই খাবো, এই ভেবে দয়ানন্দ উঠে পড়ল। হিম লাগানোটা ঠিক হচ্ছে না, শ্লেষ্মার ধাত। মাথায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সে ছুটল ট্রামের উদ্দেশে। গলির মধ্যে মেস। তিরিশ বছর এই বাড়িতেই। দয়ানন্দ আছে সাতাশ বছর। সব থেকে পুরনো বোর্ডার, তাই ম্যানেজারের পরেই ওর খাতির। আলাদা ঘর, যা আর কারুর নেই। ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলেই দয়ানন্দ শুয়ে পড়ল। রাত্রের খাবার যেমন ঢাকা তেমনিই রইল। একবার শুধু উঠেছিল, কাঁচরাপাড়ায় চিঠি লেখার জন্য।

শনিবার যা কখনই করে না, দয়ানন্দ আজ তা করে বসল। পাট ভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরে অফিসে গেল। অফিস থেকে ঠিক দুটোয় বেরিয়ে গুটি গুটি এসে পৌছল ময়দানে। যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতি স্তম্ভের চাতালে দাঁড়িয়ে চারপাশে মন দিয়ে তাকাল। স্তম্ভের গায়ে হাত খানেক চওড়া ব্লক। একটু নিচে সিঁড়ির ধাপ। রুমাল দিয়ে বার কয়েক ঝেড়ে সে বসল।

সামনের জমিতে কিশোরদের গুটি পাঁচ-ছয় দল ক্রিকেট খেলছে। ওপাশে কাঠের তক্তায় ঘেরা মাঠ। পানওয়ালা দয়ানন্দর কাছে এসে শুধিয়ে গেল। না, পান সিগারেট সে জীবনে ছোঁয়নি। বাদামওয়ালা যাচ্ছিল তাকেই ডাকল।

ক'টা বাজল? দয়ানন্দ ঘড়ি ব্যবহার করে না, ঘাড় ফিরিয়ে, চৌরঙ্গীতে মেট্রোপলিটনের বাড়ির গম্বুজের ঘড়িতে সময় দেখতে চেষ্টা করল। ঠিক বোঝা গেল না, বোধ হয় আড়াইটে। সময় দেওয়া আছে তিনটায়।

এলে এইদিক দিয়ে আসতে হবে। শেয়ালদা থেকে ধর্মতলা, তারপর হাঁটতে হাঁটতে এখানে। একটু দূরই হয়ে গেল। তবে জায়গাটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা।

বাদাম খেতে ভালো লাগছে না। গলা শুকিয়ে টান ধরছে। দয়ানন্দ চা-ওয়ালার খোঁজে

চারধারে তাকাল। একটু দূরে, টেবিলে সোডা লিমনেডের বোতল সাজান দোকান। গিয়ে খেয়ে এলে হয়। ইচ্ছে সত্ত্বেও দয়ানন্দ উঠল না। শরীরটা আলগা লাগছে। দেহের ভিতর ঝন ঝন করে হাড়ের জোড়গুলো খুলে পড়ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে আবার সময় দেখতে চেষ্টা করল। আড়াইটে যেন মনে হচ্ছে। পাঁচিলের উপরে, দুধারে হেঁট মাথা দুই সৈনিক। কুচকুচে কালো রং পোশাকেরও। দেহের সামনে দুটি হাত, তালু জমির দিকে ফেরান। মুখ নামান রাইফেলের বাঁট ধরা ছিল ওই তালুতে। দুজনেই অস্ত্রহীন। রাইফেল দুটো কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।

ফুরফুরে হাওয়া আসছে গঙ্গার দিক থেকে। আজ আর আলোয়ান সঙ্গে নেই। খোলা রোদে হাওয়া এখন মন্দ লাগছে না। ছেলেদের এবং দ্রুত বাঁক ফেরা মোটর টায়ারের ক্বচিৎ চিৎকার ছাড়া স্থানটিতে কোন কোলাহল নেই।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটি ছেলে চাতালে বসল। বল লেগেছে। ট্রানজিস্টার হাতে এক পথিক মাঠ পেরোচ্ছে। রাজ্যপাল ভবনের ফটকে পিস্তলধারী পুলিশ আনমনে আকাশে তাকিয়ে। বহুদূর থেকে একবার সম্মিলিত উল্লাসধ্বনি ভেসে এল, কোন মাঠে কেউ হয়ত আউট হল।

চোখ বুজে এসেছিল দয়ানন্দ। খট-খট আওয়াজে চোখ মেলল। পিছন দিকের চাতাল দিয়ে কেউ আসছে। আড়ষ্ট হয়ে সামনে তাকিয়ে রইল সে। আওয়াজটা কাছে এসে থামল। আর সেই মুহূর্তে দয়ানন্দর মনে হল, কি দরকার ছিল চিঠি দেবার, কি দরকার ছিল বিজ্ঞাপন দেওয়ার; বেশ তো দিনগুলো এক রকম করে কেটে যাচ্ছিল। বেশ তো কেটে যাচ্ছিল। লোভী, কামুক, ঠিকই হয়েছে।

নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে মরীয়া হয়ে দয়ানন্দ চোখ ফিরিয়ে তাকাল। শুকনো আলুর খোসার মত দোমড়ান মুখ এক যুবক, হাতে সেল্‌স্‌ম্যানদের ব্যাগ, দাগধরা সাদা প্যান্ট, সবুজ সার্ট দয়ানন্দকে তাকাতে দেখে সেও তাকাল। অত্যধিক ধূমপানে ঠোঁট কালো, বাঁ হাতের উল্কিতে নামের আদ্যক্ষর। মাথায় প্রচুর চুল। দয়ানন্দর কাছে ধুলোর ওপরই বসল। পা দুটো ছড়িয়ে ব্যাগটা মাথায় দিয়ে আধশোয়া হল। চোখ বুজল।

দয়ানন্দ হাল্কা হয়ে গেল। গোটা শরীরই জমাট বেঁধে গেছল, এবার ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়তে শুরু করল। একটা বল চাতালে পড়ে লাফাতে লাফাতে আসছে। দয়ানন্দ পা এগিয়ে দিল আটকাবার জন্য। আটকাল না, জুতো ঘেঁষে স্তম্ভের গায়ে ধাক্কা দিল। সেল্‌স্‌ম্যান চোখ খুলল।

"কটা বাজে আপনার ঘড়িতে?"

লোকটা হাত তুলে দেখে বলল, "তিনটে পাঁচ।"

দয়ানন্দ চারপাশে তাকাল। রাস্তা পার হবার জন্য দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। এদের মধ্যে কেউ কি? না, ওপারে ইডেন গার্ডেনে যাচ্ছে। আর একটি মেয়ে একা মন্থরগতিতে চলেছে। ওই কি?

"এ বছরে কোন টেস্ট ম্যাচ নেই।"

সেলসম্যান কথা বলছে। দয়ানন্দ মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল।

"তাই বুঝি?"

ছোকরা অবাক হল যেন। ভারিক্কি সুরে বলল, "প্রত্যেক বছরই দেখে দেখে অভ্যাস হ গেছে, এক বছর বাদ গেলে কেমন যেন লাগে।"

য়ানন্দ রাস্তার ওপারের মেয়েটিকে লক্ষ্য করেছিল। হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে গেল।

'খারাপ লাগে?"

ছোকরা হাসল। "সেই ফরটি এইটে গডার্ডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ টীম থেকে দেখছি। মারাত্মক নেশা। দেখুন না, কাজকম্মো নেই, পাদুটো ঠিক মাঠে টেনে আনল।" ছোকরা সেল্‌সম্যানই বটে। গায়ে পড়ে বকবক শুরু করেছে। এক বিহারী পরিবার ছোকরাটির কাছ ঘেঁষে বসল। শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ফিরছে। এত কাছে বসাটা ওর খুব অপছন্দ লেগেছে, তাই দয়ানন্দর দিকে কিছুটা সরে গেল।

"অদ্ভুত ভাইটালিটি। ট্যাঁকে বাচ্চা নিয়ে যাদুঘর থেকে চিড়িয়াখানা পর্যন্ত গোগ্রাসে দেখে বেড়াবে। আমরাও ছোটবেলায় এরকম ছিলাম।"

"সব দেখা জানা হয়ে গেলে সময় কাটানোটা যে কি বিশ্রী ব্যাপার।"

এতক্ষণে দয়ানন্দ কথা বলল। অনুমোদনের ভঙ্গিতে ছোকরা ঘাড় নাড়ল।

"বিশেষত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।"

এবার দয়ানন্দ ঘাড় নাড়ল। বিহারী পরিবারের কনিষ্ঠ সভ্যটি চীৎকার শুরু করছে। কর্তাটি ওকে থামাতে কোলে নিয়ে লিমনেডের রঙীন বোতলের সারি দেখিয়ে ব্যস্ত রাখছে। অবশেষে ঝালমুড়ি-ওয়ালাকে ডাকল।

"অবশ্য যাঁরা ফ্যামিলিম্যান, ছেলে মেয়ে, ঘর-সংসার করে তারা সময় কাটিয়ে দেয়।" দয়ানন্দর এই মন্তব্যের কোন জবাব এল না, ছোকরা হাতঘড়ি দেখে পা দুটো ছড়িয়ে দিল।

একটু যেন শীত করছে। ইডেনের দেবদারুর ছায়া লম্বা হয়ে ছুঁতে আসছে। পথচারীদের সংখ্যা বাড়ছে না। ময়দানের এই দিকে বেশি লোক বেড়াতে আসে না।

"কটা বাজে।"

ছোকবা শুনতেই পেল না। স্থির দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে কিছু ভাবছে। মেট্রোপলিটনের ঘড়ি দেখার জন্য দয়ানন্দ ঘাড় ফেরাতে গিয়েই—হাসপাতালের আউটডোরে ঝিমোয় বা মিছিলের শ্লোগানে গলা দেয় বা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে ধার করে জিনিস কেনে, এমনি এক পরিচিত চেহারা দেখতে পেল। জাম রঙের পাট ভাঙা তাঁতের শাড়ি, হাতে ঝোলানো পশমের স্কার্ফ, খাটো হাতের ব্লাউড। কখন এসে দাঁড়িয়েছে কে জানে। এক দৃষ্টে কিশোরদের এলেবেলে ক্রিকেট খেলা দেখছে। ঘড়ি দেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। দয়ানন্দ বুঝতে পারল এ সেই। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে যেন কেউ জিজ্ঞাসা করলেই বলবে এই তো এই মাত্র। অদ্ভুত শব্দ করে সেল্‌স্‌ম্যান ছোকরা হাই তুলল, মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

"বাস-ট্রামের ভিড়টা বোধহয় এখন কমেছে, শনিবার তো।"

"হুঁ।"

ছোকরা নির্লজ্জ। দয়ানন্দ সামনে তাকাল।

কিছুক্ষণ পরে ডানদিকে। চোখাচোখি হতেই মেয়েটি খেলা দেখতে শুরু করল। দয়ানন্দ আর খেই পাচ্ছে না, এবার কি করা উচিত। কাছে গিয়ে কি বলবে আমিই সেই বিজ্ঞাপনদাতা, আপনাকে আসতে বলেছি। নাকি ও নিজেই এসে বলবে, আমিই সেই, যাকে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু ও আমাকে চিনবে কি করে? আমারই যাওয়া উচিত। কিন্তু একটা অপরিচিত মেয়ের কাছে গিয়ে কথা বললে এই ছোকরা কি ভাববে?

বলটা কিছুদূর দিয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। ছোকরা লাফিয়ে উঠে গিয়ে ধরল। একদল ছেলে চীৎকার করছে, "এদিকে ছুঁড়ে দিন, আমাদের বল।" বলটা ও ছুঁড়ল। দূরে ঘেরা মাঠের কাঠের

বেড়ায় গিয়ে বলটা লাগল। শব্দটা পাওয়া গেল মুহূর্ত কয়েক পরে। একটি ছেলে বল আনতে ছুটল, আর একজন জোরে গালি দিল।

"উপকার করলুম কি না, তাই ধন্যবাদ জানাল। আজকালকার ছেলেদের নেচারটা দেখলেন তো।"

দয়ানন্দ লক্ষ্য করল ছোকরার কথায় মেয়েটি মুখ টিপে হাসল।

"কি উপকারটা করলেন? এমনই ছুঁড়লেন যে বল কুড়োতে ওদের আবার ছুটতে হল।"

দয়ানন্দর কথায় ছোকরা অপ্রতিভ হল। ভাবটা কাটিয়ে উঠতে ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আপনার ডানদিকে লক্ষ্য করেছেন?"

দয়ানন্দ মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটিকে দেখল একবার। ঠায় এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে।

"ব্যাপার বুঝেছেন?"

দয়ানন্দ মাথা নাড়ল। ছোকরা আর একটু কাছে সরে এল।

"এসব হল পার্টিশানের ফল। আগে কিন্তু এসব দেখিনি। সেই ফর্টিএইট থেকে তো ময়দানে যাতায়াত করছি। ময়দানে আর ভদ্রলোকদের আসার উপায় নেই।"

"ঠিক বুঝলাম না কি বলতে চাইছেন।" দয়ানন্দ যা শুনল তার অর্থ পরিষ্কার, তবু মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল।

ছোকরা অল্পবিস্তর আহত বোধ করেছে। এমন সোজা ব্যাপার না বুঝতে পারায় দয়ানন্দকে সে আস্ত নির্বোধ ঠাওরে বলল, "ভদ্র মেয়েদের পোশাক কি এই রকম হয়? ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।"

চোখে চোখ রেখে দয়ানন্দ বলল, "পরিষ্কার করে বলুন।"

স্বরে কাঠিন্য ছিল।

ছোকরা ভ্রূ তুলল, কাঁধ ঝাঁকাল।

"এও যদি না বুঝতে পারেন, তাহলে আর কিছু বলার নেই। তবে আমি নিঃসন্দেহ। যদি প্রমাণ চান তাও দেখিয়ে দিতে পারি।"

দয়ানন্দ চমকে উঠল। ব্যাপারটা কোন পর্যন্ত গড়াতে পারে তা বুঝে ভয় পেল। মেয়েটি সম্পর্কে যতটুকু কথা হয়েছে, তাতেই ওকে যথেষ্ট অপমান করা হয়েছে। দয়ানন্দর মনে হল, অপমানের অধিকার তো তাদের নেই। ছোকরা কিছু করতে চায়। কত সহজে বলল, দেখিয়ে দিতে পারি। খারাপ কিছু করার ক্ষমতা আমরা কি সহজেই না পেয়ে গেছি।

এসব কোথা থেকে আমরা পেলাম?

"কি দাদা, চুপ রইলেন যে।"

"কিন্তু আপনার ধারণাই যে অভ্রান্ত, বুঝলেন কিসে?"

দয়ানন্দর গলা কেঁপে গেল। শরীরের ভিতরটা কাঁপছে। ছোকরাকে কিছু করা থেকে নিরস্ত করতে হবে, এইটুকু সে বুঝেছে।

"দেখুন সেজেগুজে, একা এই রকমভাবে কি আমার আপনার বাড়ির মেয়েরা দাঁড়াতে পারে? যদি বেড়াতে এসে থাকে, বেড়াচ্ছে না কেন? কেন এইভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে?"

উত্তেজিত হয়ে ছোকরা গলা চড়াল। দয়ানন্দ আরও ভয় পেল। চট করে দেখল, মেয়েটি ওদের দিকে পিছু ফিরে একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে।

"কিন্তু এমনও তো হতে পারে ও অপেক্ষা করছে, কারুর জন্য। এইখানেই তার সঙ্গে দেখা করার কথা।"

"কার সঙ্গে দেখা করতে?"

"আমি কি হাত গুনতে জানি যে বলব?"

"নিশ্চয় প্রেমিক-ট্রেমিক।"

"হ্যাঁ, হতে পারে।"

"হাসালেন মশায়, এসব ক্ষেত্রে প্রেমিকরাই দু'ঘণ্টা আগে এসে পায়চারী করত। আপনার যদি এরকম হত?"

কথায় কথায় যেন ছোকরা অনেকটা থিতিয়ে এসেছে। এইভাবে কথার জালেও যদি ধরা দেয়, দয়ানন্দ ভাবল, তাহলে আটকে রাখা যায়। ততক্ষণে মেয়েটিও নিশ্চয় চলে যাবে। এখন ওর চলে যাওয়াই ভালো।

"আমার হলে? ধরুন বাইরে থেকে আসছে, ট্রেন লেট করল, এটা মোটেই আন্‌ন্যাচারাল ব্যাপার নয়। তাছাড়া অ্যাক্‌সিডেন্ট ঘটতে পারে। কে জানে, যার জন্য অপেক্ষা করছে সে হয়ত এখন হাসপতালের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে পড়ে আছে।"

"কোয়ায়েট ন্যাচারাল, কিন্তু এ সবই অনুমান।"

দয়ানন্দ রেগে উঠল। "আমারটা অনুমান আর আপনারটাই যথার্থ, না? আমাদের টিকে থাকার মতো এতবড় একটি সত্যি ব্যাপার, সেটাও কি অনুমানের উপর নির্ভর করে নয়? সব ব্যাপারই যে আমরা জেনে গেছি বা আমাদের চোখের সামনে ঘটবে এমন কোন কথা নেই। অনুমানে বুঝতে হয়, আর তাইতেই প্রমাণ হয় আমরা কে কতটা শিক্ষিত, সভ্য।"

ঠকঠক করে দয়ানন্দর বাইরের শরীর কাঁপছে। আরো অনেক কথা ভিতরে দাপাদাপি করছে। ফলে দুই চোখ বিস্ফারিত, কপালে চিটচিটে ঘাম।

"ভালো কথা, কার অনুমান ঠিক হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে যাক।"

কথা শেষ করেই ছোকরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখ মেরে তীক্ষ্ণ শিস দিল।

"এসব কি, এসবের মানে কি?" দয়ানন্দ ওর কাঁধদুটো ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে ছোকরা অত্যন্ত নিস্পৃহ স্বরে বলল, "অশিক্ষিত, অসভ্য অনেক কিছুই তো বললেন, তাহলে ওকেই জিজ্ঞাসা করি।"

"কি জিজ্ঞাসা?"

জবাব না দিয়ে ছোকরা উঠে দাঁড়াতে গেল। "না।"

চীৎকার করেই দয়ানন্দ ওর মুখে সজোরে চড় মারল। পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল ও। শুধু দপ্‌দপ্‌ করছে রগের পেশি। "আমি" দয়ানন্দ উঠে দাঁড়াল, "আমিই যাচ্ছি।"

ওকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দয়ানন্দ মেয়েটির দিকে এগোল।

চীৎকার শুনে মেয়েটি তাকিয়েছিল! চড় মারতে দেখে দু'এক পা এগিয়েছিল। দয়ানন্দকে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

"আপনি", হাঁপাচ্ছে দয়ানন্দ। "আপনি এখানে কি করতে দাঁড়িয়ে আছেন?" মেয়েটির চোখে মুখে বিস্ময় ফুটল।

"এভাবে এসব জায়গায় খারাপ মেয়েরা দাঁড়ায়।"

"একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা। তিনিই আমাকে এখানে আসতে বলেছেন। কিন্তু আপনি গায়ে পড়ে এসব কী বলছেন?" ঝাঁঝালো স্বরে মেয়েটি বলল।

"এই রকম জায়গায় যে দেখা করতে বলে, তার মতলব মোটেই ভালো নয়। আপনি বদমাসের পাল্লায় পড়েছেন। ওই যে ছোকরাটি, যাকে চড় মারলাম, ওই আপনাকে আসতে বলেছে। ওকে আমি চিনি। এইভাবে ও অনেক মেয়েকে ভুলিয়ে সর্বনাশ করেছে। আপনি এখনি চলে যান।"

শুনতে শুনতে মেয়েটির মুখে ভয় ফুটল। চারপাশে তাকিয়ে ইতঃস্তত করল। দয়ানন্দের মুখের দিকে বারেক তাকাল। তারপর হনহন করে রওনা হল। দয়ানন্দ পিছন থেকে দেখল ওর কনুইয়ের কাছে আঁচড়ের খড়ি ওঠা দাগ। কোন এক সময়ে চুলকে ছিল।

সেল্‌সম্যান ছোকরা ব্যাগটা হাতে নিয়ে দয়ানন্দর পাশে এসে দাঁড়াল। ওর মুখের উপর চোখ মেলে বোবা হয়ে রইল দয়ানন্দ।

"কে ঠিক?"

জবাব না দিয়ে ভূতে পাওয়ার মতো দয়ানন্দ ফিরে এল যেখানে বসেছিল। পাশে তাকাল, বিহারী পরিবারটি কখন উঠে চলে গেছে। ইডেনের দেবদারু থেকে বাদুড় উড়ল। জাহাজ ভোঁ দিচ্ছে। রাজ্যপাল ভবনের ফটক দিয়ে গুর্‌গুর্‌ শব্দে মোটর বাইক বেরোল। যা ঘটল এর জন্য একজনই দোষী। দয়ানন্দর মাথা নুয়ে পড়ল। একজনই মাত্র দায়ী। আমার মূলে কোথাও পচ ধরে আছে। নয়তো বুক ফুলিয়ে বলা যেত আমিই সেই, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, হিন্দু, আত্মীয়স্বজনহীন যে কোন জাতির মেয়েকে বিবাহেচ্ছু পাজী, বদমাস, জোচ্চোর।

"আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

টেনে টেনে টেনে দয়ানন্দ মাথাটাকে তুলল। দৃষ্টি জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই ছোকরা। গালে হাত বুলোতে বুলোতে মুচকি হাসছে। কিলবিল করে নড়ে বেড়াচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া। ধীরে ধীরে ধীরে মাথাটাকে আবার নুইয়ে দয়ানন্দ বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন।"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দময়ন্তীর জন্য একটা কিছু উপহার কিনতে হবে। দুপুর থেকেই অশেষ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কী উপহার কেনা যায়? উপহার ঠিক করা এক মস্ত বড়ো ঝামেলা। শাড়ি-গয়না উপহার দেওয়াটা যেন কী রকম বোকা বোকা ব্যাপার। দয়মন্তী তা নেবেও না বোধহয়, বরং খুব অবাক হয়ে যাবে। কিংবা আহত হতে পারে মনে মনে। সেদিকটায় খুব সাবধান থাকতে হবে। উপহারটাকে কিছুতেই যেন বিনিময় মনে না হয়।

কয়েকদিন আগেই দময়ন্তী তাকে একটা পাঞ্জাবী উপহার দিয়েছে। পাঞ্জাবীটা সে নিজেই সেলাই করেছে। এসব কাজ দয়মন্তী খুব ভালো পারে। নিজে হাতে তৈরি করে কোনো জিনিস উপহার দিতে দোষ নেই। যদিও পাঞ্জাবীর কাপড়টা খুব দামী, সেটা দময়ন্তীকে কিনতেই হয়েছে, কিন্তু তার জন্য তো অশেষ আর দাম দিতে চাইতে পারে না। এটা দময়ন্তীর একটা শিল্পকর্ম।

অনেক ভেবে চিন্তে অশেষ একটা পারফিউম দেবে ঠিক করলো। জিনিসটা ছোট্টখাট্টো হবে, আর সব মেয়েই পারফিউম পছন্দ করে। দময়ন্তীর অবশ্য সাজপোশাকের দিকে তেমন মন নেই। অনেক সময়ই কাছে রুমাল থাকে না, আঁচল দিয়ে মুখ মোছে।

নিউ মার্কেটের যে দোকানটা থেকে অশেষ নিয়মিত ব্লেড কেনে, সেই দোকানটায় গিয়ে হাজির হলো অফিস ছুটির পর। দোকানের মালিক অশেষের চেনা। অশেষ আজ ব্লেডের বদলে পারফিউম চাইলো বলে মালিকটি বেশ অবাক হলেন।

তিনি দু'তিন রকম পারফিউম বার করতেই অশেষ আবার বললো, ছেলেদের নয়, মেয়েদের।

অনেক দেখে শুনে একটার গন্ধ তার বেশ পছন্দ হলো। জিনিসটা বিলিতি। মোটামুটি মাঝারি ধরনের দাম।

সেটা কিনতে গিয়েও অশেষ একটু থমকে গেল। কিছু একটা তার মনে পড়লো। সে জিজ্ঞেস করলো, এ রকম আর আছে?

মালিক বললেন, ঠিক এ রকম তো আর নেই।

অশেষ বললো, আমার ঠিক এক রকম দুটি চাই।

সে রকম পাওয়া গেল না। অশেষ তা হলে একটাও কিনবে না। দোকানের মালিক রীতিমত অবাক। তবু তিনি বললেন, আচ্ছা দাঁড়ান, আমি অন্য দোকান দেখে আসছি। যদি অন্য কোথাও থাকে—

তিনি খুঁজে পেতে আর একটি ঠিক ওই রকম জিনিস নিয়ে এলেন। অশেষ দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এলো। দুটি পারফিউমের শিশি রাখলো দু'পকেটে।

দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা করবার কথা ঠিক সাড়ে ছ'টায়। ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে পড়াশোনা শেষ করে সে এসে দাঁড়াবে থিয়েটার রোডের মোড়ে।

দময়ন্তী আগেই এসে পৌঁছে গেছে। তার হাতে একগাদা বই, কপালের ওপর কয়েক গোছা চুল উড়ে এসে পড়েছে। মুখে একটা ক্লান্ত ভাব। কিন্তু অশেষকে দেখেই সে উজ্জ্বলভাবে হাসলো।

দময়ন্তীর গায়ের রং বেশ কালো, একমাত্র হাসির সময়ই তার গায়ের রঙের কথা মনে থাকে না।

অশেষের দেরী হওয়ার জন্য দময়ন্তী একটুও রাগ করলো না। সে নিজেই রাস্তা পেরিয়ে এসে বললো, আমার বইগুলো একটু ধরো তো, আঁচলটা ঠিক করে নিই।

অশেষ ট্যাক্সি ছাড়েনি, সেটা রাস্তার পাশে দাঁড়ানো। অশেষ দময়ন্তীকে বললো, উঠে পড়ো চট্‌পট্।

—কোথায় যাবো?

—সে দেখা যাবে। উঠে পড়ো তো।

—আমি কিন্তু কোনো রেস্টুরেন্টে যাবো না। আমার খিদে পায়নি।

কিন্তু অশেষ তো কোনো রেস্টুরেন্টে যাবে বলেই ঠিক করে রেখেছে। তা ছাড়া আর কোথায় যাওয়া যায়? আর কোথায় দু'জনে মুখোমুখি বসে কথা বলা যায়—যেখানে আর কেউ এসে বিরক্ত করবে না।

ট্যাক্সি এসে রেস্টুরেন্টের সামনেই থামলো। দময়ন্তী বললো, তবু তুমি এখানে এলে? বললাম না, আমার একটুও খিদে পায়নি। ন্যাশনাল লাইব্রেরির ক্যান্টিনে তিনখানা সিঙাড়া খেয়েছি।

—তা হলে আর কোথায় যাবো?

—চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। চলো না, আমবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। ময়দান দিয়ে হাঁটতে পারি।

—সে পবে দেখা যাবে। এখন এখানেই এসো।

দময়ন্তী খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই ভেতরে ঢুকলো। ভেতরটায় চাপা অন্ধকার। কয়েকটি টেবিলে নারী-পুরুষ বসে আছে। কিন্তু কারুর কথাব কোনো শব্দ শোনা যায় না।

একটা টেবিল খালি পাওয়া গেল। দময়ন্তীর খিদে না থাকলেও অর্ডার দিতে হলো একগাদা খাবারের। শুধু শুধু তো আর এসব জায়গায় বসে থাকা যায় না।

টেবিলে বসেই দময়ন্তী হাত বাড়িয়ে অশেষের একটা হাত চেপে ধরলো। আবার হেসে বললো, তোমাকে আমি খুব বিরক্ত করি, তাই না?

—কেন?

—তুমি রাস্তায় কেন আমার সঙ্গে হাঁটতে চাও না, আমি জানি। তবু মনে থাকে না, প্রত্যেকবার ভুলে যাই।

—কেন হাঁটতে চাই না?

—কারণ আমি দেখতে ভালো না। তোমার পাশে আমাকে মানায় না।

অশেষ গম্ভীর মুখ করে বললো, ঠিক ধরেছো তো! কোনো রাজকন্যা-টন্যা ছাড়া আমি আর কারুর সঙ্গে হাঁটতেই পারি না!

দময়ন্তী বললো, দূর বোকা। রাজকুমারীরা রাস্তায় হাঁটতে যাবে কেন? তারা কখনো এই ধুলোভরা রাস্তা দিয়ে হাঁটে? তা ছাড়া, তুমি আজকাল আর সে-রকম রাজকুমারী পাচ্ছো কোথায়? সবই তো চলে গেছে গল্পের বইয়ের মধ্যে। এবার আসল কারণটা বলবো? তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ভয় পাও, কারণ কেউ তোমাকে দেখে ফেলতে পারে।

অশেষ বললো, এই কারণটা অনেকটা ঠিক। তবে এই রকম কারণে সাধারণত মেয়েরাই ভয় পায়। একটা ছেলের ভয় পাওয়া ঠিক যেন মানায় না।

—তুমি পাও, কারণ মণিকা যদি কখনো তোমাকে দেখে ফেলে আমার সঙ্গে!

এটা অশেষ একেবারে অস্বীকার করতে পারলো না। কারণ, মণিকা তার বোন। সে দময়ন্তীর বিশেষ বান্ধবী। মণিকা ঘুণাক্ষরেও জানে না যে অশেষের সঙ্গে দময়ন্তীর কোনো সম্পর্ক আছে।

তবু দুর্বল যুক্তি দেবার চেষ্টায় বললো, মণিকা এই সময় এদিকে আসবে কেন?

—ওর চেনাশুনো কেউও তো দেখে ফেলতে পারে!

কথাটা বলেই দময়ন্তী মুখটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললো, এখানে তো আমাদের চেনাশুনো কেউ নেই। এখানে তোমাকে একটা চুমু খাবো? ভীষণ ইচ্ছে করছে।

অশেষ একটু চমকে উঠে বলল, এত লোকজনের মধ্যে?

—তাতে কী হয়েছে? আমি কাউকে গ্রাহ্য করি না।

—ঠিক আছে, খাও। দেখি তোমার কত সাহস!

ঠোঁটদুটো গোল করে দময়ন্তী একটা ভঙ্গী করলো। তারপর বললো, এই তো খেলাম মনে মনে। কেউ দেখতে পেল না।

অশেষ পকেটে হাত ঢোকালো। এই কি উপহারটা দেবার সময়? নাকি আর একটু পরে? ঠিক সময় মতন হওয়া দরকার।

বেয়ারা এসে খাবার দিয়ে গেল। তখন ওরা চুপচাপ। দময়ন্তী কিন্তু তখনো অশেষের হাতের ওপর থেকে নিজের হাত সরিয়ে নেয়নি। অশেষের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করছে।

অশেষ বললো, একটু কিছু খাও, তুমি।

দময়ন্তী সে কথা গ্রাহ্য না করে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের অফিসের সেই গণ্ডগোলটা মিটে গেছে?

—না, ঠিক মেটেনি। সহজে মিটবেও না।

—আমি তোমাদের মালিককে গিয়ে একদিন বলবো, কেন এরকম অসভ্য ব্যবহার করছেন?

অশেষ হেসে উঠলো। অদ্ভুত পাগলের মতন কথা। কোনো মেয়ে হঠাৎ তার প্রেমিকের অফিসের মালিকের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে পারে? এসব কথা দময়ন্তীরই শুধু মাথায় আসে।

দময়ন্তী বললো, এক কাজ করো, তুমি ওই চাকরি ছেড়ে দাও! যে চাকরিতে মনের কোনো সুখ নেই, সেখানে চাকরি করার কোনো মানে হয়?

—চাকরি ছেড়ে দিলে খাবো কি?

—আমি চাকরি করে তোমাকে খাওয়াবো?

—সেটাও তো একটা চাকরি। তুমি জানো না, কোনো চাকরিই ভালো নয়।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অশেষ দময়ন্তীর হাতে একটু চাপ দিয়ে বললো, তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি।

এ তো জানা কথাই। দু'জনে যে দু'জনকে ভালোবাসে, তা তো মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। তবু বারবার মুখে বলতে ইচ্ছে করে। ভালোবাসা শব্দটা নিজের কানেও শুনতে ভালো লাগে।

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, তুমি আমাকে কেন ভালোবাসো বলো তো?

অশেষ বললো, ও আবার কী কথা! কেন ভালোবাসি, তা আবার মুখে বলা যায় নাকি?

—তবু! আমি একটা সাধারণ মেয়ে, দেখতে ভালো নয়, সবার সঙ্গে ঝগড়া করি—

অশেষ দময়ন্তীর চোখের দিকে স্থির চোখ রেখে বললো, তুমি যে তুমিই, সেইজন্যই তোমাকে আমি ভালোবাসি।

এ সবই [illegible] কথা পৃথিবীতে বহুবার বলা হয়ে গেছে। তবু সেই প্রায়ান্ধকার রেস্টুরেন্টে [illegible] বসে, দু'জনে খানিকটা ঝুঁকে এসে যখন এই কথা বলে, তখন ওদের চোখে চোখে একটা আলাদা জগৎ তৈরি হয়ে যায়। তখন ওদের রক্তে তরঙ্গ ওঠে, সেই মুহূর্তে ওরা দারুণ সুখী। পৃথিবীতে এরও দাম আছে।

দময়ন্তীর হাতে একটু টমাটো সস্ লেগে গেছে। বেয়ারা ন্যাপকিন দেয়নি। সে অশেষের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, তোমার রুমালটা দাও তো!

রুমালের জন্য পকেটে হাত দিয়ে অশেষ ভাবলো, এইটাই সেই মুহূর্ত।

প্রথমে সে রুমালটি বার করে দিল। দময়ন্তীর হাত ও মুখ মোছা হয়ে যাবার পর সে ছোট্ট কাগজের বাক্সটা বার করলো। লাজুক ভাবে বললো, তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি!

দময়ন্তী বেশ অবাক! সেটা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলো, এটা কি? সেন্ট? কোথায় পেলে? এ তো দারুণ দামী জিনিস!

অশেষের মাথায় চট্ করে একটা মিথ্যে কথা এসে গেল। তার এক বন্ধু জাহাজে কাজ করে। সে তো বলতেই পারে যে তার বন্ধু জাহাজ থেকে এনে দিয়েছে। তাহলে ব্যাপারটা খুব সহজ দেখায়।

কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও অশেষ থেমে গেল। এই রকম আনন্দের মুহূর্তে সে কেন মিথ্যে কথা বলবে! যত নিরীহই হোক, তবু তো মিথ্যে।

সে বললো, কিনেছি।

দময়ন্তী শিশির মুখটা খুলে গন্ধ নিল। বুক ভরা নিঃশ্বাস টেনে বললো, আঃ দারুণ, এত সুন্দর গন্ধ, এ জিনিসটা এতো ভালো—

দময়ন্তী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো একেবারে। দময়ন্তী ছটফটে স্বভাবের মেয়ে, সে মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারে না। তার সারা শরীর দিয়ে আনন্দ ফেটে বেরোয়। এই আনন্দটুকু দেখতে খুব ভালো লাগে অশেষের।

বাঁ হাতের কব্জিতে খানিকটা পারফিউম লাগিয়ে বারবার শুঁকতে লাগলো দময়ন্তী। তারপর জিজ্ঞেস করলো, তুমি এটা কবে কিনলে? আজ?

—হ্যাঁ। কেন?

—তুমি একটা দোকানে গিয়ে মেয়েদের পারফিউম চাইলে? শুধু আমার কথা ভেবে? আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না।

—কেন, আমি একটা আধটা ছোটোখাটো জিনিস কিনতে পারি না। বুঝি?

—তবু, শুধু আমারই জন্য, শুধু আমার কথা ভেবে...আমার এত আনন্দ হচ্ছে!

অবশ্য ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্যি নয়। প্রথমে দময়ন্তীর কথা ভেবেই পারফিউমটা কিনতে গিয়েছিল অশেষ। তারপরই তার মনে পড়েছিল মণিকার কথা। মণিকা তার ছোটো বোন। একমাত্র বোন। মণিকার সঙ্গে একসময় দারুণ ভাব ছিল দময়ন্তীর। কী একটা কারণে এখন দারুণ ঝগড়া হয়ে গেছে। ঝগড়ার কারণটা দময়ন্তী কোনোদিন মুখ ফুটে বলে না। মণিকার কাছেও জিজ্ঞেস করা যায় না। এখন দুজনে মুখ দেখাদেখিই প্রায় বন্ধ। অথচ অশেষ যে দু'জনকেই

ভালোবাসে। প্রেমিকা আর বোন—এই দুজনকে ভালোবাসা দু'রকম, কিন্তু দুটোই তো খুব তীব্র। মণিকাও তার দাদাকে ভালোবাসে অন্ধের মতন। দাদার কাছে সে কোনো কথাই লুকোয় না, একমাত্র দময়ন্তীর সঙ্গে তার ঝগড়ার কারণটা ছাড়া। অশেষও মণিকার কাছে কিছুই লুকোয়নি, একমাত্র এই দময়ন্তীকে ভালোবাসার কথাটা ছাড়া।

দময়ন্তীর জন্য পারফিউমটা কিনতে গিয়ে অশেষ তাই মণিকার জন্যও একটা কিনেছিল। দুজনকেই সে ভালোবাসে, তাই দু'জনকে একই উপহার দেবে। মণিকা আর দময়ন্তীর মধ্যে ভাব থাকলে—এ কথাটা দময়ন্তীকে এক্ষুণি বলে দিত অশেষ। কিন্তু এখন বলে ফেললে হয়তো দময়ন্তীর আনন্দটা একটু কমে যাবে।

তবে, অশেষের ধারণা, মেয়েলি ঝগড়া বেশিদিন টেকে না। আবার হঠাৎ মণিকার সঙ্গে দময়ন্তীর একদিন ভাব হয়ে যাবে ঠিকই। এর মধ্যে আর মাথা গলিয়ে লাভ নেই। কিছুটা সময় কেটে যাক বরং।

দময়ন্তী বললো, আমার এত ভালো লাগছে, আমার কী ইচ্ছে করছে জানো! ইচ্ছে করছে তোমাকে খুব আদর করতে। কোথাও পাশাপাশি শুয়ে... আদরে আদরে তোমাকে পাগল করে দেবো।

অশেষের কানদুটো একটু গরম হয়ে এলো। এইসব কথা সাধারণত মেয়েরা বলে না, ছেলেরাই বলে। কিন্তু দময়ন্তীর মুখে কোনো আগল নেই। সে লজ্জা পায় না। গৌতম সান্যালের ফাঁকা ফ্ল্যাটে একদিন সে আর দময়ন্তী সত্যিই শুয়েছিল। সেদিন দময়ন্তী একটুও লজ্জা পায়নি। সে বলেছিল, সেক্স জিনিসটা খুব স্বাস্থ্যকর জিনিস। শরীর-মন কী রকম হালকা ঝরঝরে হয়ে যায়। কেন আমরা প্রায়ই এত কাছাকাছি আসি না?

এসব কথার জন্য দময়ন্তীকে মোটেই নির্লজ্জ বলা চলে না। তার ব্যবহারে একটা অস্বাভাবিক সরলতা আছে। কোনো রকম ন্যাকামি সে পছন্দ করে না।

দময়ন্তী বললো, আমি তো আর কিছুই চাই না, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না, তোমার জীবনে ভাগ বসাতে চাই না, শুধু তোমাকে একটু আদর করতে আর আদর পেতে চাই।

—কেন বিয়ে করতে চাও না! আমি কি এতই অযোগ্য?

—আমাকে বিয়ে করলে তুমি অসুখী হবে। তোমার বোন আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আমরা ব্রাহ্মণ নই বলে তোমার মা-ও আমাকে পছন্দ করবেন না। আমি তবে সেখানে গিয়ে কি করবো?

—আমরা যদি আলাদা বাড়ি নিয়ে থাকি?

—তা হলে তোমাদের সংসার ভেঙে যাবে। আমি কেন সে রকম স্বার্থপরের মতন কাজ করবো? ভালোবাসা তো মানুষকে স্বার্থপর করে না!

—কিন্তু আমি যে তোমাকে চাই, দময়ন্তী!

—আমিও তোমাকে চাই। তা বলে আমি স্বার্থপর হতে চাই না। আমি জানি, তুমি আলাদা হয়ে থাকতে পারবে না। কেউ কেউ পারে, সবাই পারে না। তোমার মা, বাবা, ভাই-বোনকে ছেড়ে থাকতে তুমি সব সময় কষ্ট পাবে মনে মনে। সেই জন্যই তো বললাম, আমি কিছুই চাই না। শুধু আমাকে একটু ভালোবাসতে দেখে তো।

অশেষ আর কিছু বললো না। এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মণিকার সঙ্গে দময়

ঝগড়া একদিন না একদিন মিটে যাবেই। বন্ধুতে বন্ধুতে ওরকম ঝগড়া হয়। আবার ভাব হয়ে যায় গলায় গলায়। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিল মিটিয়ে অশেষ উঠে পড়লো।

গৌতম সান্যালের ফ্ল্যাটে আর যাওয়া যাবে না। তার মা বোনেরা এসে গেছে বেনারস থেকে। তবে এখন কোথায় যাওয়া যায়? অশেষ নিজেও দারুণ ছটফটানি অনুভব করছে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা গঙ্গার ধারে চলে এলো। কখন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই এ জায়গাটা এখন বেশ ফাঁকা। গাছের তলায় নির্জন বেঞ্চ পাওয়া যায়। এখানে কেউ ওদের দেখছে না। দময়ন্তী অশেষের শার্টের বোতাম খুলে সেখানে হাত বুলোয়। তারপর একবার সেখানে তার মুখ রাখে।

অশেষ তার মুখটা তুলে আনে নিজের মুখের কাছে। চুম্বনটি বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। দু'জনের হাত পরস্পরের পিঠে যেন গেঁথে যায়।

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার পর দময়ন্তী বললো, এই যাঃ!

—কি হলো?

—সেই পারফিউমটা? তুমি যেটা দিলে?

—আনোনি?

—না তো। ও মা, ছি ছি, তুমি প্রথম একটা উপহার দিলে, আর আমি সেটা ফেলে এলাম।

—কোথায় ফেলে এসেছো? খুঁজে দ্যাখো ব্যাগের মধ্যে।

দময়ন্তী তার হাত ব্যাগের সমস্ত জিনিস উল্টে ফেলে খুঁজলো। না, সেটা নেই। দময়ন্তী বললো, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

অশেষ সান্ত্বনা দিয়ে বললো, যাক্ গে, এমন কিছু দাম নয়—পরে আর একটা—

দময়ন্তী কান্না মেশানো গলায় বললো, আমার কাছে ওটার অনেক দাম। তুমি আজ প্রথম আমাকে একটা জিনিস উপহার দিলে, আর আমি সেটাই মনের ভুলে—

—কোথায় রেখেছিলে?

—টেবিলের ওপর একবার রেখেছিলাম মনে আছে। তারপর হঠাৎ এমন তাড়াহুড়ো করে চলে আসা হলো। তুমি দেখোনি?

—না তো।

—চলো।

—কোথায়?

—আবার ওই রেস্টুরেন্টে ফিরে যাবো।

—এখন আর ওখানে গিয়ে কোনো লাভ আছে? এর মধ্যে আরও কত লোক এসেছে।

—তবু আমি একবার যাবোই।

অশেষের আর ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দময়ন্তী সাংঘাতিক জেদী। সে যা বলবে, তা করবেই। গঙ্গার ধারের এমন নিরালা মুহূর্ত ছেড়ে আবার ফিরে যেতে হবে সেই রেস্টুরেন্টে।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল না, হেঁটেই যেতে হলো অতটা পথ। ওরা যখন সেখানে পৌঁছোলো, তখনই একজোড়া ছেলেমেয়ে বেরুচ্ছে। ছেলেটি অশেষের চেনা। তাদের সঙ্গে কলেজে পড়তো এক ইয়ারে, অন্য সাবজেক্ট ছিল, কিন্তু ইউনিয়নের পাণ্ডাগিরি করতো বলে ওর মুখ চেনা ছিল

সকলের। চাঁদা তোলার নামে পয়সা চুরির কী একটা বদনামও রটে ছিল মনে আছে।

পাছে ছেলেটি তাকে দেখতে পায়, তাই অশেষ একটু পাশ ফিরে দাঁড়ালো। ওরা বেরিয়ে যাবার পর সে আর দময়ন্তী ভেতরে ঢুকলো।

তাদের টেবিলটা এখনো ফাঁকা। দময়ন্তী চটপট সেটার কাছে পৌঁছে গেল। কিন্তু সেন্টের শিশিটা নেই।

বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হলো। না, সে কিছু জানে না। সে তো দেখেনি। আরও তিন চারজন বেয়ারা ভিড় করে এলো। সেন্টের শিশি? না, কেউ দেখেনি।

এই টেবিলে আর কেউ বসেছিল? হ্যাঁ। এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বসেছিল, এই তো এইমাত্র বেরিয়ে গেল, এক মিনিটও হয়নি।

তা হলে ওরাই নিয়েছে। ছেলেটির চুরির বদনাম ছিল, ও কি একটা দামী সেন্টের শিশি দেখলে ছাড়বে? নিশ্চয়ই ওটা দেখেই টপ করে পকেটে ভরে নিয়েছে মেয়েটির অজান্তে। তারপর পরে কোনো এক সময় ওটাই মেয়েটিকে উপহার দিয়ে চাল মারবে। বিনা পয়সায় উপহার।

দময়ন্তী আর অশেষ চোখে চোখে তাকালো।

তা বলে অশেষ তো আর এক্ষুণি ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে তো আর বলা যায় না, আপনার পকেট সার্চ করবো, দেখি একটা সেন্টের শিশি আছে কিনা!

দময়ন্তীর চোখে প্রায় জল এসে গেছে।

অশেষ তার হাত ধরে বললো, চলো।

বাইরে বেরিয়ে এসে দময়ন্তী বললো, ভালো লাগছে না, আমার আর একদম ভালো লাগছে না। তুমি মনে করে শুধু আমার জন্য আজ একটা জিনিস কিনলে, সেটাই আমি......

ওরকম একটা সেন্ট তো কালই আবার কিনে দেওয়া যায়। কিন্তু দময়ন্তী সে কথা বুঝবে না। ওর কাছে একটা জিনিসের শুধু দামেই তার মূল্য নয়—কোন্ সময় কখন দেওয়া হলো, সেটাই আসল কথা।

পকেট থেকে সিগারেট বার করতে গিয়ে অশেষের হাতে আর একটা প্যাকেট ঠক্ করে লাগলো। সে চমকে উঠে দময়ন্তীর দিকে তাকালো। দময়ন্তী কিছু টের পায়নি তো! সে-ও তো কম নির্বোধ নয়, দ্বিতীয় শিশিটার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল এতক্ষণ। এটাই তো দময়ন্তীকে দিয়ে দিলে হয়। মণিকাকে কাল আর একটা কিনে দিলেই হবে। দময়ন্তীর আজকের আনন্দটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। ইস্, গঙ্গার ধারেই এ কথাটা কেন যে মনে পড়েনি! তা হলে আর এত দূর আসতে হতো না।

সে মিষ্টি হেসে বললো, তোমার যা ভুলো মন, মাঝে মাঝে তোমার শাস্তি পাওয়াই উচিত।

দময়ন্তী বললো, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

—থাক আর মরতে হবে না।

পকেট থেকে দ্বিতীয় শিশিটা বার করে বললো, এটা কি?

দময়ন্তী স্তম্ভিত হয়ে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে জিনিসটার আশা একদম ছেড়ে দিয়েছিল।

—তুমি এটা লুকিয়ে রেখেছিলে?

—লুকিয়ে রাখবো কেন? তুমি ভুল করে টেবিলে ফেলে যাচ্ছিলে, তাই দেখে আমি পকেটে ভরে নিলাম।

—তুমি কি অসভ্য। এতক্ষণ সে কথা বলোনি? শুধু শুধু আমাকে—

—বললাম না, তোমার শাস্তি পাওয়া দরকার। তা ছাড়া আমি সামান্য একটা জিনিস উপহার দিয়েছি, সেটার জন্য যে তোমার এতটা আগ্রহ—সেটা দেখতেও আমার খুব ভালো লাগছিল—

এই সময়, সাদা কোট পরা একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। লোকটি এখানকার স্টিউয়ার্ট।

সে বললো, স্যার, আপনারা কি এক শিশি পারফিউম ফেলে গিয়েছিলেন? বেয়ারারা মেরে দিতে পারে বলে সেটা আমার কাছে রেখেছিলাম। ওরা আমাকে এইমাত্র বললো—

লোকটা কোটের পকেট থেকে শিশিটা বার করে অশেষের হাতে দিয়ে আবার চলে গেল।

দময়ন্তী বিহ্বলভাবে তাকালো অশেষের দিকে।

অশেষ আর কী বলবে? সব কথা এখন বুঝিয়ে বলা যাবে না। তাই সে চালাক সাজার চেষ্টা করে বললো, ম্যাজিক, ম্যাজিকের চোটে আমি একটা শিশিকে দুটো বানিয়ে ফেললাম। দেখলে তো আমার ক্ষমতা?

দময়ন্তী হাসলো না। তার মুখখানা ম্লান হয়ে গেছে। তার অপার সরলতা দিয়েও এই রহস্যের মর্ম বুঝতে পারলো না।

* যে ঈশ্বর আবিষ্কার করেছে সে মূর্খ, যে ঈশ্বরের প্রচার করে সে বদমাইস আর যে ঈশ্বরের উপাসনা করে সে বর্বর। রামস্বামী পেরিয়ার

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

'মুখে পানের খিলি ঠুসে, সেজে গুজে চল্লে কোথায় দিদিমণি?' 'আহা! কথার ছিরি দেখ! বউ আবার কবে থেকে দিদিমণি হল! বয়েস না হতেই ভীমরতি?'

'তোমার ওই হুমদো মুখটা দেখলেই, কেন জানি না, ভোরের স্কুলের দিদিমণির কথা মনে পড়ে যায়। কি করব বলো!'

'একটা ছুঁচলোমুখোকে বিয়ে করলেই পারতে। ওই রকম একজনের সঙ্গে অনেকটা এগিয়েও তো ছিলে। লেঙ্গি খেয়ে ফিরে এসেছো। এখন আর পস্তালে কি হবে খোকা!'

'তোমার মুখেরও একটা ভাস্কর্য ছিল, ওই ফ্রিজ আসার পর থেকে পুডিং খেয়ে খেয়ে তোমার মুখটাও পুডিং-এর মতো হয়ে গেছে।'

'আব নিজের মুখটা! বাড়িতে বড় আয়নার তো অভাব নেই। একবার তাকিয়ে দেখতে পারো তো! বুলডগ কেটে বসানো। হাসলে মনে হয় হায়না হাসছে।'

'আমাকে লোক চরিয়ে খেতে হয়। ভয়াল ভয়ঙ্কব মুখ আমার প্রফেসানের অ্যাসেট। কিন্তু তোমাব মুখ দেখলে কবিতার লাইন শুকিয়ে যায়।'

'সারা জীবন ওই এক লাইন কবিতাই তো মুখস্থ দেখলুম, চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। ও আর শুকোবে কি? শুকিয়েই তো আছে। এদিকে যে ক'গাছা চুল ছিল তাও তোমাদের এখানকার জলের গুণে টাক পড়ে গেল। কবে থেকে বলছি, চুল গজাবার নানা রকম মলম না তেল না কি সব ভালো ভালো জিনিস বাজারে বেরিয়েছে, নিয়ে এসো। তা এ কান দিয়ে ঢুকছে, ও কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার কথা তো কানে যাবে না। ওই পাশের বাড়ির প্রেমা বললে, ধিতিং ধিতিং করে ছুটতে। একেই বলে স্ত্রী আর পরস্ত্রী। বাঙালির সেই আদি ব্যামো আর গেল না।'

'কথাটা যখন তুললে তখন অঙ্কে তুমি কতটা মাথামোটা বুঝিয়ে দি। প্রত্যেকেরই স্ত্রী অন্যের পরস্ত্রী। যেমন তুমি আমার স্ত্রী; কিন্তু প্রেমার স্বামীর কাছে তুমি পরস্ত্রী। স্ত্রী না থাকলে আসে কোথা থেকে! সহজ সরল হিসেব।'

'তুমি মাথার তেল আনবে? তোমার জ্ঞানের কথা আমি অনেক শুনেছি। শুনে শুনে কান পচে গেছে। আমার এখন চুল চাই। চুল।'

'তুমি জীবনে শুনেছ, টাকে কখনও চুল গজায়! টাকে যে চুল গজিয়ে দিতে পারবে সে নোবেল পুরস্কার পাবে। টাকে চুল গজায় না বুড়ি। ও সব কথার কথা।'

'তোমার ওই প্রেমাঠাকুরানীর সামনেটা ফাঁকা হয়ে আসছিল, দেড়শো টাকা দিয়ে অমিয়বাবু একটা ফর্মূলা করিয়ে এনে দিয়েছেন, তাতে ওই ভাইটালাইজার আছে, ভিটামিন ই আছে, আরও সাংঘাতিক সাংঘাতিক মশলা আছে। সাত দিন লাগাতে না লাগাতেই ঝিন ঝিন করে চুল বেরোতে শুরু করেছে।'

'তোমার মাথা! মনে নেই, যৌবনে একবার ফর্সা হতে গিয়ে তুমি আমার হাতে হ্যারিকেন

ধরিয়ে ছেড়েছিলে। ভিটেমাটি চাঁটি হবার উপক্রম। শেষে আফগান ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ। মুখে এমন এক ফর্মুলা ঘষলে, মুখটাই ব্যাঙের পিঠের মতো হয়ে গেল। ফোসকা ফোসকা, গোটা গোটা। সেই চর্মরোগ সারাতে চোখে সরষে ফুল। তুমি আর এই বয়েসে টাকে চুল গজাতে যেও না মাধু। কি আর হবে? তোমার কি আর প্রেমে পড়ার বয়েস আছে? কেউ আর ফিরে তাকাবে না শঙ্করী। নাম করো। বালিকে নাম করো হরের্নামৈব কেবলম। হিসেব মেলাতে বসে যাও ভবসুন্দরী শমন আসার সময় হয়েছে।'

ভোলানাথ, পাড়ার সকলের ভোলাদা। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে। স্ত্রী মাধুরী বয়েসে বছর দশেকের ছোটো। এক সময় ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। চল্লিশে পা রেখে ক্রমশই মোটা হতে শুরু করেছেন। ছেলেপুলে নেই। দুজনের ছোট্ট সংসার। মাঝারী মাপের নতুন ঝকঝকে একটি বাড়ি। সুখের সংসারই বলা চলে। দুঃখ একটাই। ছেলেপুলে হল না। তা না হোক। ভোলানাথের তেমন দুঃখ নেই। আজকালকার ছেলেমেয়ে আনন্দের চেয়ে নিরানন্দেরই কারণ। বাপ-মায়ের তোয়াক্কা করে না। বদমেজাজী। অসভ্য। অবাধ্য। পাড়ার দাদার কথা মানবে বেদবাক্যের মতো। বাপ-মায়ের কথা উড়িয়ে দেবে ফুঃ করে। বলবে, 'তোমরা কি বোঝো। চুপ করে বসে টিভি দ্যাখো।'

ভোলানাথ মাঝারী গোছের অ্যাডভোকেট। এলেম যথেষ্টই ছিল। আর একটু খাটলে এক নম্বর অ্যাডভোকেট হওয়া অসম্ভব ছিল না। তেমন লোভ নেই। চলে গেলেই হল। আর ঈশ্বরের কৃপায় ভালোই চলছে।

ভোলানাথের গুরু স্বামী কৃপানন্দ শিষ্যকে বলেছেন, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত যত কিছু, সবই জানবে পাপ। তোমার লোভ বাড়াবে। জীবনটা নষ্ট করে দেবে। ঈশ্বর মানে আনন্দ। পরমানন্দ। ধন নয়, জন নয়। যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি নয়। চাইবি আনন্দ, আনন্দ। কেবলানন্দ।'

আনন্দ কাকে বলে, সে বিষয়ে ভোলানাথের ইদানীং অনেক সংশয় দেখা দিয়েছে। যুবকরা প্রেম করে আনন্দ পায়। সিনেমায় বিবসনা সুন্দরীর নৃত্য দেখে আনন্দ পায়। মাধুরী টাকে চুল গজাবে ভেবে আনন্দ পায়। ভোলানাথের কিসে আনন্দ তিনি নিজেই জানেন না। জটিল কোনও মামলা পেলে তাঁর আনন্দ হয়। কিন্তু তেমন জটিল মামলা আজকাল আর আসে না। তিনি ক্রিমিনাল সাইডে আছেন। ক্রাইমও বেড়েছে। মামলা নেই। মানুষ খুন আজকাল আর ধর্তব্যেই আসে না। কেস ওঠে। সাক্ষীর অভাবে ফেঁসে যায়।

পুরনো আমলের একটা গাড়ি ভোলানাথের বাহন। গাড়ি চালান ব্রজবাবু। গাড়ির মতোই প্রাচীন। তবে হাত ভালো। রাতে তেমন চোখ চলে না। সন্ধ্যের মুখে গাড়ি গ্যারেজ হয়ে যায়। সেই কারণে ভোলানাথ নৈশ আনন্দ উপভোগ করতে পারেন না। বাড়িতে বসে আইন ওল্টাতে হয়। তাতে জ্ঞান যেমন বাড়ছে, আনন্দ সেই অনুপাতে কমছে। বউ পুরনো হলে বিশ্বস্ত হয় ঠিকই, কিন্তু আনন্দের নয়। রসের কথা কওয়া যায় না। বলে, যত বয়েস বাড়ছে তত ভীমরতি হচ্ছে। ঠাকুর দেবতার বই আছে। বাজে সময় নষ্ট না করে পড়ো, পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করো। একেবারে খালি হাতে গিয়ে দাঁড়াবে! ভালো লাগে না, তাও ভোলানাথকে গীতার কর্মযোগ ওল্টাতে হয়। সে যে কী ভীষণ শাস্তি!

গুরু কৃপানন্দকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাবা, মনকে কি করে বশে আনা যায়?'

গুরু বলেছিলেন 'ব্যায়াম করে।'

'তার মানে ডন বৈঠক, কুস্তি?'

'দেহটাকে খালি খাটিয়ে যা ক্রীতদাসের মতো। আরাম হারাম হ্যায়।'

'আর কোনও উপায় নেই প্রভু?'

'আর একটা উপায় আছে বাপ। সেটি হল মনটাকে শক্ত করা।'

'কি ভাবে?'

'যেমন ধর, কাউকে নিমন্ত্রণ করে সামনে বসে, তুই যা ভালোবাসিস খাওয়াবি গন্ডে-পিন্ডে। নিজে কিছু স্পর্শ করবি না। সুন্দরী রমণীর সঙ্গ করবি, দেহ স্পর্শ করবি না। সুযোগ পেলেই যাকে তাকে এটা ওটা দান করবি। তোর মনটাকে উপবাসে রাখবি। তিন বছর এইভাবে চালাতে পারলে মন হয়ে যাবে চেন-বাঁধা কুকুর। মন তোর প্রভু নয়। তুই মনের প্রভু।'

ভোলানাথ মাঝে মাঝে কসরত করেন। করলেও মন এখনও তাঁর প্রভু। যা বলে তা না শুনে উপায় থাকে না। যেমন আজ সকাল থেকেই মন বলছে, 'বিমলার কাছে যা। খুব আনন্দ পাবি।'

অনেকক্ষণ ধরেই বলছে। ভোলানাথ শুনেও শুনছেন না। তবু মন বলছে, সন্ধ্যের দিকে ঘণ্টা দুয়েক ভালোই কাটবে। কি ম্যাদামারা হয়ে আছিস। শরীরের যেমন আয়রন, ভিটামিন, মিনারেলস, মনের তেমনি ফূর্তি। আরে বাবা, আজ আছিস, কাল থাকবি না। পুরুষ আর প্রকৃতির খেলাটা দেখ।

বাঙালি মন মাঝে মাঝে আবার ইংরেজি বলে, 'এনজয় লাইফ।'

তা ঠিক। কে বলতে পারে! কালই হয় তো ফটাস করে বেলুন ফেটে যাবে। হার্টের অসুখ। ক্যানসার। দু'পক্ষের রাজনৈতিক বোমাবাজির মাঝখানে আচমকা পড়ে যাওয়া। দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ। জীবন-মৃত্যুর কথা কে বলতে পারে!

আদালতের দিকে গাড়ি এগোচ্ছে। সারাজীবন সেই এক একঘেয়ে ব্যাপার, মামলা, মক্কেল, এজলাস, জজসাহেব। মি লর্ড, মাই প্লেন্টিফ। আইনের হাজার কচকচি।

না, আজ সন্ধ্যেবেলা বিমলা। আজ একটু অন্যরকম ব্যাপার হবেই। এমন সুন্দর বসন্ত। ভোলানাথ মনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেললেন।

আদালতের সামনে গাড়ি থেকে নেমে ব্রজকে বললেন, 'আজ আর গাড়ি এনো না। গ্যারেজ করে দাও। আমার ফিরতে দেরি হবে।'

ব্রজবাবু বললেন, 'সময়টা বলুন না। মা আবার রাগ করবেন আমার উপর।'

'রাগ করবে কেন?'

'আপনার বয়েস হচ্ছে। বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত মা ছটফট করেন। তিনটের পর থেকেই ঘরবার করতে থাকেন। বলেন, দিনকাল ভালো নয়। যত দেরিই হোক সময়টা আমাকে বলুন। গাড়ি নিয়ে আসবো।'

'সময়টাই তো আমি বলতে পারছি না। একটা কঠিন মামলা আছে। একটা আপিলের ড্রাফ্‌ট করতে হবে। তুমি মাকে বোলো, আমি আনন্দর গাড়িতে ফিরে যাবো। চিন্তার কোনো কারণ-নেই। বুঝলে?'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ভোলানাথ বিশাল বিশ্রী আদালত বাড়িতে ঢুকে গেলেন। ব্রজ দু'মিনিট অপেক্ষা করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তার কিছু করার নেই। মুহুরী অরবিন্দ বললেন, 'কেসটা একবার পড়বেন তো!'

'কটায় উঠবে?'

'বারোটার আগে নয়।'

'[illegible] এজলাসে?'

'[illegible] তারাপদ বোসের এজলাসেই উঠবে।'

'তুমি একবার সুপ্রিয়কে পাঠিয়ে দাও।'

জুনিয়ার সুপ্রিয় এসে গেল। স্মার্ট ছেলে। চোখে-মুখে কথা বলে। এই লাইনের উপযুক্ত। মেয়ে থাকলে ভোলানাথ জামাই করত। যাক, সে পথ ঈশ্বর মেরে দিয়েছেন।

'সুপ্রিয়, নন্দদুলাল সরকারের কেসটা নাটশেলে-বলো তো।'

'নন্দদুলাল সরকার পয়সাঅলা লোক। বাড়ি-গাড়ির মালিক। ওষুধের হোলসেলার। দুটো রিটেল দোকান আছে শহরের দু'প্রান্তে।'

'বয়েস?'

'ফিফটি ফাইভ।'

'তারপর?'

'বাইশ বছর বয়েসে নন্দদুলালের বিয়ে হয় বড়োলোকের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'উত্তরবঙ্গে।'

'কি রকম বড়োলোক?'

'কাঠের ব্যবসায়ী। এক সময় চা বাগান ছিল। এখন আর নেই।'

'জীবিত না মৃত?'

'দু'বছর আগে মারা গেছেন।'

'কি ভাবে?'

'মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান ও শারীরিক অত্যাচারে।'

'বয়েস?'

'প্রায় পঁচাত্তর।'

'রাইপ ওল্ড এজ।'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ও পক্ষে লড়ছে কে?'

'বড়ো ছেলে।'

'কি করে?'

'বাপের পয়সা ওড়ায়।'

'বেশ, নন্দদুলালে ফিরে এস।'

'নন্দদুলালের ব্যবসা এখন জমজমাট। শহরের অন্যতম ধনী। গোটা তিনেক গাড়ি, কিন্তু নিঃসন্তান। নন্দদুলালকে সবাই মানী লোক বলেই জানে। প্রভাব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট।'

'নন্দদুলাল এখন কোথায়? বেল পেয়েছে?'

'না।'

'পুলিস কি কি চার্জ এনেছে?'

'স্ট্রেট মার্ডার চার্জ।'

'আজকাল এই এক রেওয়াজ হয়েছে। স্ত্রী আত্মহত্যা করলেও মার্ডার চার্জ আনবে। কারুর স্ত্রী আত্মহত্যা করতে পারে না? আগে করত না!'

'করত স্যার। তবে দু'ধরনের আত্মহত্যা আছে। এক, মানসিক অবসাদে। আর এক, [illegible] অত্যাচারে। নন্দদুলাল আর তার স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। আদর্শ দম্পতি। সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে দু'জনকে দেখা যেত। হাসি খুশি। মহিলা খুব মিশুকে ছিলেন। সদালাপী। মানসিক অবসাদের কোনও চিহ্নও ছিল না। সুতরাং প্রথম কারণে আত্মহত্যার থিওরি দাঁড় করানো মুশকিল।'

'তুমি তাহলে কি বলতে চাও?'

'এটা হত্যা স্যার। সেন্ট পারসেন্ট হত্যা।'

'কি রকম?'

'কাজটা নন্দদুলাল খুব ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা অনুসারে পথঘাট বেঁধে করেছে।'

'কি রকম?'

'নবমীর দিন সবাই যখন পুজোর আনন্দে মেতে আছে, সবাই যখন উৎসবের মেজাজে, সেই সময় নন্দদুলাল জানলাবন্ধ রান্নাঘরে বেশ কিছুক্ষণ গ্যাস খুলে রেখে, সিলিন্ডারের মুখ বন্ধ করে, দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে ফিরে এল।'

'সময়?'

'সকাল। প্রায় ছটা।'

'তারপর?'

'নন্দদুলাল ফিরে এসে স্ত্রীর ঘুম ভাঙিয়ে বললে, ওঠো, ওঠো, শিগগির চা চাপাও, আমাদের যেতে হবে না!'

'কোথায় যেতে হবে?'

'ঠিক ছিল বাই রোড দার্জিলিং যাবে।'

'অক্টোবরে দার্জিলিং!'

'সেপ্টেম্বরের শেষে।'

'হ্যাঁ। এবার ছিল আরলি পুজো। তারপর?'

'নন্দদুলাল স্ত্রীকে তাড়া দিয়ে চা চাপাতে পাঠাল। মহিলার পরনে ছিল ফিনফিনে নাইলনের নাইটি। ঘরে ঢুকে ঘুম-চোখে দেশলাই জ্বালানো মাত্রই পুরো ঘরটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। মহিলা ছুটে বেরোতে গিয়ে দেখলেন দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।'

'তারপর?'

'তারপর অভিনয়। মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে, নন্দদুলাল দরজা খুলে চিৎকার-চেঁচামেচি করে, নিজেকে সামান্য পুড়িয়ে এক হই হই কাণ্ড করে বসল। পাশের পুজোপ্যান্ডেলে তখন ঢাক বাজছে।'

'তারপর?'

'তারপর নন্দদুলাল পড়ে রইল হাসপাতালে। বেশ কিছুদিন।'

'পোস্টমর্টেম রিপোর্ট?'

'ভেরি সিমপল। বার্ন ইনজুরি। সেই রাতেই ক্রিমেশান হয়ে গেল।'

'তা, এই সব তথ্য আসছে কোথা থেকে। বানানো গল্প? রহস্য রোমাঞ্চ?'

'না, নন্দদুলালের কনফেসান?'

'কনফেসান? কার আছে?'

'হাসপাতালের নার্সের কাছে।'

'তবে আর কি। ঝুলিয়ে দিলেই হয়।'

'না। তা হয় না। আমরা তাহলে আছি কি করতে। নন্দদুলাল সুস্থ হয়ে উঠে স্বীকারোক্তি অস্বীকার করেছে। সে অত সহজে মরতে চায় না।'

'আমাদের তাহলে কি করতে হবে?'

'হত্যাকে আত্মহত্যা করতে হবে।'

'করে দেব। ফি পেলেই আমরা হয়কে নয়, নয়কে হয় করবো।'

চারটের সময় ভোলানাথ বেরিয়ে এলেন আদালত থেকে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। মনে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। নন্দদুলাল হয়ে যেতে কতক্ষণ? বিমলা। এই ধরনের প্রায় প্রতিটি ঘটনার পেছনে একটা করে বিমলা থাকবেই।

সিগারেটে দুটো টান মেরে ফেলে দিলেন। এগিয়ে গেলেন পথের দিকে।

'এ কি ব্রজ? তুমি? গাড়ি গ্যারেজ করোনি?'

'না। মা বলেছেন, যত রাতই হোক আপনাকে ফেরত নিয়ে যেতে হবে। দিনকাল ভালো নয়। আপনার হার্টের অবস্থাও ভালো নয়।'

ভোলানাথ গাড়িতে উঠলেন।

স্বামী কৃপানন্দ বলেছেন, সংসাব হল সোনার খাঁচা। দানাপানি পাবে। নিভৃত একটা আলয পাবে। অন্য পাখিব ঠোক্করেব হাত থেকে বাঁচবে। নীল আকাশের দামালপনা সংসাবীব নয। ওই খাঁচায় বসে নামগান কবো। আর প্রার্থনা কবো জীবন্মুক্তির। সহধর্মিণীতে সন্তুষ্ট থাকো। নারী নরকস্য দ্বার।

ভোলানাথ বললেন, 'ব্রজ, ওই সামন্তব দোকানেব সামনে গাডিটা দাঁড় করাও।'

ভোলানাথ নামলেন। সামন্ত হাত জোড় কবে বললে, 'আসুন, আসুন।'

'হ্যাঁ হে, চুল গজাবার কি সব লোশান বেরিয়েছে আজকাল?'

'বেরিয়েছে। বেবিযেছে।'

সামন্ত দু'রকমের দুটো ফাইল সামনে রাখল।

'আপনার জন্যে নেবেন স্যার?'

'আমার? টাকই তো আমার বিউটি। গৃহিনীর জন্যে।'

'এর সঙ্গে দু'অ্যামপুল ভিটামিন ই মিশিয়ে নিলে খুব কাজ হয় শুনেছি। প্ল্যাসেনট্রেকসও মেশাতে পারেন।'

গাড়িতে উঠলেন ভোলানাথ। বেশ সরেস লাগছে। খাঁচার পাখি খাঁচাতেই সুখে থাকে। বিশ বছরের জীবন আগামী দশ-বিশ বছরের ভবিষ্যৎ তৈরি করেই রেখেছে।

'ব্রজ, টাকে চুল গজায়?'

'কি জানি স্যার!'

'আমার গজাবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'ধ্যুর, টাকে কখনও চুল গজায়? যা হয়ে যায়, তা হয়ে যায়, এই হল দুনিয়ার নিয়ম।'

ভোলানাথ হো হো করে হাসতে লাগলেন।

অনুপ্রবেশ

প্রফুল্ল রায়

এখনও ভালো করে ভোর হয়নি, রোদ উঠতে অনেক দেরি, এই সময় দলটা নর্থ বিহারের উঁচু হাইওয়ে থেকে নিঃশব্দে, পোকার মতো চুপিসাড়ে কাচ্চী অর্থাৎ কাঁচা সড়কে নেমে আসে।

দুই পরিবারের নানা বয়সের মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে মোট আটটি মানুষ। এক পরিবারে ফরিদ এবং তার দাদী হাবিবা। অন্যটায় রাশেদাবা। রাশেদা, তার আব্বা, আম্মা, দুই ছোট ভাই আর এক বয়স্ক রুগ্‌ণ ফুফু অর্থাৎ পিসি।

পুরুষদের পরনে লুঙ্গি বা পাজামা, শার্ট, তার ওপর চাদর কিংবা মোটা রোঁয়াওলা পুলওভার। মেয়েরা পরেছে ঢোলা সালোয়ার কামিজ আর চাদর। সবার মাথায় বা হাতে নানা লটবহর— টিনের ঢাউস বাক্স, বেতের টুকরি, বাঁশের ঝুড়ি, কাপড়ের ব্যাগ, পোঁটলা-পুঁটলি, ইত্যাদি।

এরা ছাড়া সকলের আগে আগে রয়েছে মধ্যবয়সি শওকত। সে ফরিদের দূর সম্পর্কের চাচা এবং আটজনের মনুষ্যবাহিনীটির গাইড। ফাল্গুনের আধাআধি কেটে গেল। তবু বিহারের এই অঞ্চলে শীতের মেজাজ খানিকটা থেকেই গেছে। বিশেষ করে সন্ধের পর থেকে রোদ ওঠার আগে পর্যন্ত সময়টায়।

কিছুক্ষণ আগে চাঁদ ডুবে গেছে। মাথার ওপর বিশাল আকাশ জুড়ে রুপোর বুটির মতো অগুনতি তারা। এককোঁটা মেঘ নেই কোথাও। তবে অন্ধকারের সঙ্গে সাদা কুয়াশা মিশে চারিদিক ঝাপসা হয়ে আছে। অদৃশ্য, টানটান স্রোতেব মতো ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে হু হু করে। গায়ে লাগলে কাঁটা দেয়।

কাঁচা সডকের দু'ধারে ঝোপঝাড়, উঁচু উঁচু ঝাঁকড়া পিপর গাছ। তারপর দুপাশেই ফাঁকা মাঠ। দূরে বা কাছাকাছি গাঁ আছে কিনা বোঝা যায় না। যেদিকে যতদূর চোখ যায় সব অসাড়, নিঝুম। ঘুমের আরকে সমস্ত চরাচর ডুবে আছে।

চারপাশে অন্ধকারে আলোর ছুঁচের মতো ফোঁড়া দিয়ে দিয়ে হাজার জোনাকি উড়ছে। পিপর গাছের ফোকর থেকে মাঝে মাঝে কামার পাখিদের কর্কশ চিৎকার ভোররাতের অগাধ শান্তিকে চুরমার করে দিচ্ছে। এ ছাড়া এই স্তব্ধতার মধ্যে একটানা সাঁই সাঁই একটা শব্দ অনবরত শোনা যাচ্ছে। সেটা হল রাশেদার ফুফু আনোয়ারার বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা হাঁপানির টানের আওয়াজ। বোঝা যায়, তার চিরস্থায়ী শ্বাসকষ্টটা মারাত্মক বেড়ে গেছে।

চাপা ক্ষীণ গলায় টেনে টেনে আনোয়ারা জিজ্ঞেস করে, 'আউর কিতনি দূর শওকতভাই?' কথা শেষ করে জোরে জোরে হাঁপাতে থাকে সে। এখানে, এই আকাশের নীচে এত বিশুদ্ধ বাতাস, তবু তার অকেজো ফুসফুসকে চাঙা করে তোলার পক্ষে যে পর্যাপ্ত নয়।

শওকত চলার গতি কমায় না। চলতে চলতেই দ্রুত পেছন ফিরে একবার তাকায় শুধু। বলে, 'এই নজদিগ। জোরে পা চালিয়ে এসো।'

'আর যে পারছি না। বহোত কমজোর লাগছে। চোখের সামনে বিলকুল সব আন্ধেরা, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। জরুর মাটিতে পড়ে যাব।' আনোয়ারার গলার ভেতর থেকে কথাগুলো গোঙানির মতো বেরিয়ে আসতে থাকে।

'উপায় নেই বহেন। সুরয ওঠার আগে আমাদের পৌছুতেই হবে। এখনও লগভগ তিন মিল (মাইল) রাস্তা।' বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নেয় শওকত, 'দুনিয়ার কারো নজরে পড়ার আগেই এই সড়ক পেরিয়ে যেতে হবে। কেউ দেখে ফেললে বহোত মুসিকত।'

এরপর আনোয়ারার আর কিছু বলার থাকে না। তার মাথা টলছিল। তবু তারই মধ্যে প্রাণপণে, দুর্বল, জীর্ণ শরীরের শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে অন্ধের মতো এলোপাথাড়ি পা চালাতে থাকে।

আনোয়ারার ঠিক পেছনেই ছিল ফরিদ। তার মাথায় প্রকাণ্ড টিনের ট্রাংক, ডান হাত দিয়ে সেটা ধরে রেখেছে। বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা বড় চটের ব্যাগ। সে আনোয়ারাকে লক্ষ করছিল। টলতে টলতে আনোয়ারা যখন প্রায় হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে, সেই সময় বাঁহাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে ফরিদ। বলে, 'আমাকে ধরে ধরে চলুন ফুফু।'

'আনোয়ারা বলে, 'তোমার মাথায় এত ভারী সামান। আমি হাত ধরলে সামলাতে পারবে না।'

'পারব।'

ফরিদের বাঁ হাত এবং কাঁধের ওপর শরীরের ভার রেখে হাঁটতে থাকে আনোয়ারা। বলে, 'বেটা ফরিদ, আমার কী মনে হচ্ছে জানো?''

ফরিদ বলে, 'কী?'

'শেষ পর্যন্ত আর পৌছুতে পারব না। তার আগেই এই সডকের ধাবে আমাকে তোমাদের গোর দিতে হবে।'

'এ সব বলতে নেই। আমরা সবাই জিন্দা পৌছুব। হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলুন।'

আনোয়ারা আর কিছু বলে না। তার ফুসফুসের ভেতর থেকে সাঁই সাঁই আওয়াজটা বেরুতেই থাকে।

মালপত্র এবং একটি মানুষের ভার নিয়ে চলতে চলতে ফরিদের মনে হয়, পরিচিত দুনিয়ার বাইরে কোনো তুখোড় বাজিকরের ম্যাজিকে তারা বহুদূরের অচেনা ঘুমন্ত এক গ্রহে এসে পড়েছে।

তিনদিন আগে টাউটেরা মাথাপিছু দুশো টাকা আদায় করে তাদের আটজনকে পশ্চিম বাংলার বর্ডার পার করিয়ে দেয়। এপারেও সেই একই ব্যবস্থা। প্রতিটি মানুষের জন্য দুশো টাকাই গুনে দিতে হয়, এক পয়সাও কমবেশি না।

বর্ডার থেকে সোজা কলকাতায়। সেখান থেকে ট্রেনে কাটিহার। কাটিহার থেকে ব্রাঞ্চ লাইনের একটা ট্রেনে সন্ধেবেলা ফরিদরা কামতাপুরে এসে নেমেছিল। সেখানে অপেক্ষা করছিল শওকত। সে-ই তাদের খানিকটা রাস্তা বয়েল গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসে। তারপর মাঝরাত থেকে শুরু হয়েছে অনবরত হাঁটা। শওকতের কথা যদি ঠিক হয়, আরো মাইলতিনেক তাদের হাঁটতে হবে।

ফরিদের বয়স তেইশ। তার জন্ম সাবেক ইস্ট পাকিস্তানে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ছ'বছর আগে।

সে শুনেছে, সাতচল্লিশে ইন্ডিয়া দু ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদা মুদাস্‌সর আলি বিবি এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে বিহার থেকে ঢাকায় চলে যায়। ছেচল্লিশে বিহারে যে মারাত্মক দাঙ্গা হয়েছিল, সেই সময় তাদের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফরিদদের কেউ মারা না গেলেও, চেনাজানা অনেকেই খুন হয়েছিল। তখন চারিদিকে শুধু হত্যা, আগুন, রক্তস্রোত, লাশের পাহাড়, অবিশ্বাস, ঘৃণা আর উন্মত্ততা। এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় আতঙ্কে মুদাস্‌সরদের শ্বাস আটকে আসছিল। একটা মুহূর্তও আর নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুটো বছর ধরে

যেটা তাদের স্বদেশ, তা ফেলে এক শীতের রাতে তারা পালিয়ে গিয়েছিল। পেছনে পড়ে থাকে জমিজমা এবং পোড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপ।

ঢাকায় গিয়ে বেশিদিন বাঁচেনি মুদাস্‌সর আলি। এক বছরের ভেতরেই তার এন্তেকাল হয়। তখন তার একমাত্র ছেলে রহমত পূর্ণ যুবক। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। প্রথমদিকে এটা সেটা করে নানারকম উঞ্ছবৃত্তিতে দিন কেটেছে। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সংসারটাকে বাঁচাবার জন্য জিনের মতো খেটে গেছে সে। হাতে কিছু টাকা জমলে এবং আরো কিছু 'করজ' নিয়ে একটা রেডিমেড পোশাকের দোকান দেয়। দু-তিন বছরের মধ্যে ব্যবসা জমে ওঠে। এরপর একমাত্র বোন মালেকার বিয়ে দিয়ে নিজেও শাদি করে রহমত। শাদির সাত বছরের মাথায় ফরিদের জন্ম।

নানা দুর্যোগ এবং টালমাটালের পর জীবনটাকে রহমত যখন মোটামুটি গুছিয়ে এনেছে, সেই সময় পর পর দুটি মৃত্যু তাকে অনেকটা টলিয়ে দিয়ে যায়। প্রথমে মারা যায় মালেকা, তারপর ফরিদের আম্মা আমিনা। এই শোকও একসময় থিতিয়ে আসে। তবে মন এতই ভেঙে গিয়েছিল যে ঘর-সংসার বা রোজগারেব দিকে তেমন নজর ছিল না। নেহাত যেটুকু না করলে নয়; সেটুকুই করে গেছে। বাড়িতে ফরিদকে আগলে রাখত তার দাদী হাবিবা।

এইভাবেই কোনোরকমে চলে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। একই ধর্ম, তবু বাঙালি আর অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তখন চরম অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ। ঠিক যেমনটি দেখা গিয়েছিল দেশভাগের ঠিক আগে আগে সেই ভয়াবহ দাঙ্গার দিনগুলোতে। তখন প্রতিপক্ষ ছিল অন্য ধর্মের মানুষ। পাকিস্তানের খুনি সাঁজোয়া বাহিনী ব্যারাক থেকে ট্যাঙ্ক, মেশিনগান আর অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। গাঁয়েগঞ্জে এবং শহরে শহরে গড়ে উঠেছিল প্রবল প্রতিরোধ। তখন সারাদিনই চারিদিকে গুলির শব্দ, ট্যাঙ্কের কর্কশ আওয়াজ, বারুদের গন্ধ, লাশের পাহাড়, রক্তের নদী, ধর্ষণ, হত্যা, আগুন আর বিপন্ন বিধ্বস্ত মানুষের আর্ত চিৎকার।

রহমত আলি নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ। রাজনৈতিক কূটকচাল তার মাথায় ঢুকত না। নিজের দোকান আর ভাঙাচোরা সংসারের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অন্য কোনোদিকে তার নজর যেত না। কিন্তু চারপাশে যখন আগুন জ্বলছে, তার আঁচ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। একদিন তার দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হল, প্রচণ্ড মারও দেওয়া হয় তাকে, নেহাত আয়ুর জোরে সে বেঁচে যায়।

একদিন নিরাপত্তার কারণে হিন্দুস্থান থেকে ঢাকায় চলে এসেছিল সে। পূর্ব পাকিস্তানকেই গভীর আবেগে নতুন স্বদেশ ভেবে নিয়েছিল। মনে হয়েছে, সব আতঙ্ক ভয় অনিশ্চয়তা আর দুর্ভাবনা কেটে গেল। কিন্তু এবার তারা কোথায় যাবে?

একদিন মুক্তিযুদ্ধ থামে। জন্ম নেয় নতুন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাতাস থেকে বারুদের গন্ধ, মাটি থেকে রক্তের দাগ মুছে যায়। কিন্তু উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কে বিদ্বেষ সন্দেহ আর ঘৃণাটা থেকেই যায়।

তবু বেঁচে তো থাকতে হবে। রহমত জোড়াতালি দিয়ে আবার দোকান খোলে কিন্তু আগের মতো বেচাকেনা নেই। কামাই ভীষণ কমে যায়।

এদিকে স্থির হয়েছিল, পাকিস্তান উর্দুভাষী বিহারী মুসলমানদের ঢাকা থেকে নিয়ে যাবে। দু-

চারজনকে নিয়েও যায় কিন্তু কয়েক লাখ মানুষ বাংলাদেশে পড়ে থাকে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে।

দিনের পর দিন কেটে যায়। বছরের পর বছর। পাকিস্তান থেকে রহমতদের নেবার জন্য প্লেন বা জাহাজ কোনোটাই আসে না। এদিকে ফরিদ বড় হচ্ছিল। ক্রমশ স্কুল পেরিয়ে সে কলেজে যায়। কিন্তু বি এ পরীক্ষায় বসার আগেই রহমত আলি দশ দিনের জ্বরে মরে গেল। এরপর পড়ার খরচ জোগাবে কে? ফরিদ কলেজ ছেড়ে দেয়। শুধু পয়সার অভাবের জন্য না, তীব্র হতাশায় তখন সে ভুগছে। কষ্ট করে বি এ-র ডিগ্রিটা জোগাড় করতে পারলেও তার চাকরি হবে না। বাংলাদেশে তার ভবিষ্যৎ কী?

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখতে দেখতে সতেরো বছর কেটে যায়। ইন্ডিয়ার পার্টিশনের সময় যে বিহারী মুসলমানেরা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই এখনও স্বপ্ন দেখে, লাহোর করাচি বা ইসলামাবাদ থেকে যে কোনোদিন প্লেন এসে তাদের তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে তাদের বিশ্বাসে রীতিমতো চিড় ধরে গেছে। আর তারা করাচি লাহোরের প্লেনের ভরসা করে না। রাত্তিরে মীরপুরের উর্দুভাষীদের এলাকায় বসে গোপনে পরামর্শ করে, ইন্ডিয়াতে পূর্ব-পুরুষের ভিটেয় ফিরে গেলে কেমন হয়? তারা খবর পেয়েছে পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাতচল্লিশে যে উর্দুভাষীরা করাচিতে চলে গিয়েছিল সেখানকার আদি বাসিন্দারা তাদের আদৌ পছন্দ করে না। উড়ে এসে জুড়ে বসা মোহাজিরদের সম্পর্কে তাদের প্রচণ্ড বিরূপতা। দাঙ্গা এবং খুন সেখানে লেগেই আছে। রুটির ভাগ কে আর অন্যকে দিতে চায়?

বেশ কিছুদিন পরামর্শের পর তারা মনঃস্থির করে ফেলে। সুদূর লাহোর ও করাচি থেকে বিহারের এই গ্রামগুলি—যেখানে পুরুষ পরম্পরায় তাদের বাপ-দাদারা বাস করেছে—অনেক বেশি পরিচিত এবং কাছের। কিন্তু মুখের কথা খসালেই তো সেখানে যাওয়া যায় না। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আইন কানুন যা-ই থাক, দুনিয়ায় টাউটেরাও থাকে। রাতের অন্ধকারে তারা মীরপুরে হানা দিতে শুরু করে। তারাই জানিয়ে দিয়েছিল প্রথমে কোথায় গিয়ে উঠতে হবে। এমন একটা জায়গার খোঁজ টাউটেরা দিয়েছিল যার আশে-পাশে বসতি নেই। তা ছাড়া একসঙ্গে অনেকের যাওয়া বিপজ্জনক। লোকের চোখে পড়ে গেলে হইচই হবে। তাদের পরামর্শ হল, ছোট ছোট দলে আট-দশজন করে যাওয়া অনেক নিরাপদ। কিছুদিন পর যাওয়া বিলকুল বন্ধ। তারপর প্রতিক্রিয়া দেখে ব্যবস্থা করা হবে।

ছক মাফিক প্রথম দলটা আসে পনেরো দিন আগে। তাদের সঙ্গে এসেছিল শওকত। সে চটপটে, চৌকশ, ঠান্ডা মাথার মানুষ। তারপর থেকে প্রায় রোজই দু-তিনটে করে ফ্যামিলি আসছে। আজ এসেছে ফরিদরা।

রাশেদাদের আজ আসার কথা ছিল না। তার ফুফু আনোয়ারার খুবই শ্বাসকষ্ট চলছিল। ঠিক হয়েছিল, সে কিছুটা সুস্থ হলে পরের কোনো একটা দলের সঙ্গে ওরা আসবে। তবু যে আসতে হল, তার কারণ রাশেদা।

রাশেদার সঙ্গে ফরিদের শাদির কথাবার্তা এবং দেনমোহর অনেক আগে থেকেই পাকা হয়ে আছে। শাদিটা যে হয়নি তার কারণ ফরিদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা ভাবতে পারে না ফরিদ।

রাশেদা চায়নি তাদের ঢাকায় ফেলে আগেই ফরিদরা চলে যায়। কেঁদেকেটে এবং জেদ ধরে এমন এক কাণ্ড সে করে বসে যে শেষপর্যন্ত তার আব্বা এবং আম্মাকেও বাক্স বিছানা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।

আগে থেকেই ঠিক করা আছে, কামতাপুর স্টেশনে রোজ অপেক্ষা করবে শওকত। সীমান্তের ওপার থেকে যারা আসবে তাদের জায়গামতো নিয়ে যাবে। আজও সে ফরিদদের নিয়ে চলেছে।

মুখ বুজে চুপচাপ সবাই হাঁটছিল। হঠাৎ রাশেদার আব্বা রমজান ডেকে ওঠে, 'শওকতভাই'—

মুখ না ফিরিয়েই সাড়া দেয় শওকত, 'হাঁ—'

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানকার হালচাল কেমন?'

'এখনও গোলমাল হয়নি। তবে—'

'কী?'

'আমরা যে এসেছি, সেটা মনে হয় লোকে জেনে গেছে।'

খানিকটা পেছনে, মাথায়, মাথায় বাক্স আর কাঁধের ব্যাগ সামলে আনোয়ারাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছিল ফরিদ। এখন শরীরের সব ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়েছে আনোয়ারা।

শওকতের কথাগুলো কানে আসতেই চমকে ওঠে ফরিদ। রমজান জবাব দেবার আগেই সে বলে, 'শুনেছিলাম জায়গাটা ফাঁকা মাঠ, ওখানে লোকজন থাকে না।'

শওকত বলে, 'বিলকুল ঠিক।'

'তা হ'লে?'

ফরিদের প্রশ্নটার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না শওকতের। সে বলে, 'আরে বেটা মানুষের আঁখ আর কানের মতো খতারনাক চীজ দুনিয়ায় আর একটাও পাবে না। জঙ্গলেই যাও কি দরিয়াতে গিয়েই লুকোও, কারো না কারো নজরে পড়ে যাবেই। একজন দেখে ফেললে দশ আদমীর কানে উঠতে কতক্ষণ! লম্বা লম্বা পায়ে রাস্তার দৈর্ঘ্য খানিকটা কমিয়ে দিয়ে আবার সে বলে, 'পরশু খালিদ চার 'মিল' দূরে বারহৌলির বাজারে আটা ডাল নিমক মরিচ কিনতে গিয়েছিল। সেখানে শুনে এসেছে, লোকেরা আমাদের ব্যাপারে বলাবলি করছিল। আমরা কোত্থেকে এসেছি, আচানক মাঠের দখল নিলাম কি করে—এই সব। বুঝতেই পারছ, জরুর কেউ না কেউ আমাদের দেখে গেছে।'

পুরো তিনটে দিন ভালো করে খাওয়া হয়নি, ঘুম হয়নি। ট্রেনে বাসে, সাইকেল রিকশায় বয়েল গাড়িতে এবং পায়ে হেঁটে অনবরত তারা চলেছেই, চলেছেই। অসীম ক্লান্তিতে হাত-পা এবং কোমরের জোড় যেন আলগা হয়ে গেছে। ধুঁকে ধুঁকে এবড়োখেবড়ো কাঁচা সড়কে টক্কর খেতে খেতে কোনোরকমে শরীরটা খাড়া রেখে তারা হাঁটছিল। শওকতের কথাগুলো তাদের শিরদাঁড়ার ভেতর অনেকখানি আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেয়। সবার প্রতিনিধি হিসেবেই যেন রমজান বলে, 'এখানে থাকতে পারব তো শওকত ভাই?'

শওকত গলায় জোর দিয়ে বলে, 'কোসিস তো করনা পরেগা। ডরো মাত রমজান ভাই। একটা কিছু ব্যবস্থা জরুর হয়ে যাবে।'

কিশ ফুট পেছনে আসতে আসতে রমজানের দিকে সসম্ভ্রমে তাকায় ফরিদ। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই মানুষটাকে দেখে আসছে। সে শুনেছে, সাতচল্লিশে বিহারের দেহাত থেকে আরো হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সে-ও ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। অতি সাধারণ, গরিব

বিহারীরা গোড়ার দিকে যে ঢাকায় গুছিয়ে বসতে পেরেছিল সে জন্য শওকতের ভূমিকা কম নয়। সবার জন্য সুযোগ সুবিধা আদায় করতে একে ধরা, ওর কাছে আরজি জানানো, তাকে সেলাম ঠোকা—কী না করেছে সে। আবার চল্লিশ বছর বাদে এই যে প্রায় রোজ ছোটো ছোটো দলে মানুষ বর্ডার পেরিয়ে তাদের পূর্বপুরুষের দেশে চলেছে, তাতেও তার প্রবল উৎসাহ। কখনও ভেঙে পড়ে না শওকত, হতাশায় তার শিরদাঁড়া দুমড়ে যায় না, কোনো অবস্থাতেই হার মানতে শেখেনি। জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত আশাবাদী এই মানুষটাকে শ্রদ্ধা করে ফরিদ।

এদিকে রমজান আর কিছু বলে না। গভীর উৎকণ্ঠা তার ভেতরকার শেষ জীবনীশক্তিটুকুকে যেন চুরমার করে দিতে থাকে।

তারা চলেছে তো চলেছই।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় অন্যমনস্ক হয়ে যায় ফরিদ। স্কুলে এবং কলেজে খানিকটা ইতিহাস পড়েছে সে। হিন্দু বা বৌদ্ধ আমলের কথা সে বলতে পারবে না। সেই সব সময়ে তাদের বংশের আদি পুরুষেরা কোথায় ছিল কি-ই তাদের পরিচয়, সে সম্পর্কে আদৌ কোনো ধারণা নেই ফরিদের। গত দুশো বছরের কথাই সে শুধু বলতে পারে, কয়েক জেনারেশন ধরে তখন তারা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার প্রজা—ভারতীয় মুসলমান। দেশভাগের পর ঢাকায় গিয়ে তারা হয়ে যায় পাকিস্তানি। তারপর নিশ্চিন্তভাবে না হলেও বাংলাদেশে থাকার কারণে হয়তো বা বাংলাদেশি। আর এই মুহূর্তে ভোরের ঝাপসা আকাশের তলায় ইন্ডিয়ার মাটির ওপর যখন পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে তখন তাদের কী আইডেনটিটি, সে জানে না।

ইতিহাসের সেই আদিযুগের দেশহীন পরিচয়হীন অভিযানকারীদের মতো তারা চলেছে একটি স্বদেশের জন্য, একটি সুনিশ্চিত আইডেনটিটির সন্ধানে। আদৌ তা পাওয়া যাবে কিনা, কে বলবে!

সূর্য ওঠার আগে আগে কাচ্চী অনেকটা তফাতে রেখে বিশাল এক পড়তি জমির মাঝখানে পৌঁছে যায় ফরিদরা।

এখানে বাঁশ টালি চট আর বাতিল পুরোনো টিন দিয়ে তিরিশ চল্লিশটা ঘর তোলা হয়েছে। ঢাকা থেকে আগে যারা চলে এসেছিল, এই ঘরগুলো তাদের।

নির্জন নিঝুম মাঠের মাঝখানে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা এই ছন্নছাড়া উপনিবেশে এখনও কারো ঘুম ভাঙেনি।

শওকত বলে, 'পৌঁহচ গিয়া। তিন রোজ বহোত তখলিফ গেছে তোমাদের। এবার আরাম করো।'

ঘাড় এবং মাথা থেকে লটবহর নামিয়ে সবাই মাটিতেই শরীর এলিয়ে বসে পড়ে। তাড়াতাড়ি ময়লা চাদর পেতে আনোয়ারাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। এতটা আসার ধকলে তার বুকে এখন একসঙ্গে দশটা হাপর ওঠানামা করছে।

ফরিদ একধারে বসে অসীম আগ্রহে চারিদিক লক্ষ্য করছিল। শওকত সঠিক খবরই দিয়েছে। এখান থেকে যেদিকে যতদূর চোখ যায়, কোথাও মানুষজন বা দেহাতের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে একদিকের কাঁকুরে ডাঙা ততদূর ছড়ানো। আরেক দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে মজা বিল। শ্যাওলা আর লম্বা লম্বা ডাঁটিওলা জলজ ঘাসে সেটা বোঝাই।

বিলের ধার ঘেঁষে প্রচুর ঝোপঝাড় আর বিরাট বিরাট সিমার এবং কড়াইয়া গাছ। গাছগুলোর মাথায় অগুনতি বক ডানা মুড়ে চুপচাপ বসে আছে।

এদিকে গলা তুলে শওকত ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে, 'আরে ওসমানভাইয়া, রুস্তম, নবাবজান, রহিমা চাচী—আর কত ঘুমোবে। ওঠ ওঠ, উঠে পড়ো। ওরা এসে গেছে।'

প্রথমে দু-একজন, তারপর একে একে শ'খানেক মানুষ ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে আসে। ফরিদদের দেখে বলে, 'আ গিয়া তুমলোগ?'

রমজান নির্জীব স্বরে বলে, 'হাঁ। লেকেন বিলকুল মর গিয়া।'

ওসমান বলে, 'হাঁ, পয়দল অনেকটা রাস্তা আসতে হয়। পা আর কোমরের হাড্ডি বেঁকে যায়। পথে কোনো গোলমাল হয়েছে?

'নেহী।'

'ইন্ডিয়ান লোকজন সন্দেহ করেনি?'

'নেহী।'

'না করারই কথা। ইতনা বড়ে দেশ। করোর করোর (কোটি কোটি) আদমী। এখানে কে কার খবব বাখে!'

এরপর ঠিক হয়, আগে এসে যারা ঘর তুলেছে, তাদের কাছে ভাগাভাগি করে ফরিদরা দু-চারদিন থাকবে। তারপর বারহৌশির বাজার থেকে টালি বা পুরোনো টিন কিনে এনে নিজেদের ঘর তুলে নেবে।

ফরিদ দূরমনস্কর মতো সবার কথা শুনছিল। আসলে বর্ডার পেরিয়ে এপারে আসতে আসতে তিনদিন আগে একধরনের উত্তেজনা টের পায় সে। এখন, এই বিশাল মাঠের মাঝখানে এসে আচমকা সেটা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। সে শুনেছে, এখান থেকে মনপথল গাঁ খুব দূরে নয়। মনপথল থেকেই চল্লিশ বছর আগে তার দাদা বিবি-ছেলেমেয়ে নিয়ে ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। পূর্বপুরুষের সেই গ্রামটা দেখার জন্য প্রচণ্ড অস্থিরতা এই মুহূর্তে একগুঁয়ে জিনের মতো তার কাঁধে যেন চেপে বসেছে।

হঠাৎ ফরিদ জিজ্ঞেস করে, 'শওকতচাচা, মনপথল গাঁও কোথায়?'

অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে ফরিদের দিকে তাকায় শওকত। বলে, 'এখান থেকে চার 'মিল' তফাতে বারহৌলি বাজার। সেখান থেকে আরো দু 'মিল' গেলে মনপথল, কেন জানতে চাইছ?'

'আমি আমাদের গাঁও দেখাতে যাব।'

শওকত বলে, 'এখন না বেটা। আরো কিছুদিন দেখি, হালচাল ভালো করে বুঝি। গাঁও তো নজদিগ রইলই। সময় হলে যখন ইচ্ছা যেতে পারবে। আমারও তো ওই একই গাঁও, আমিও এখন পর্যন্ত যাইনি।'

এখানে যারা এসেছে তাদের সবাই মনপথল এবং তার চারপাশের গ্রামগুলো থেকে একদিন ঢাকায় চলে গিয়েছিল। তারাও শওকতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জানায়, এখন পর্যন্ত কেউ পুরোনো পিতৃভূমি দেখতে যায়নি। শুধু নিজেদের পুরোনো গাঁওতেই না, অন্য কোনোদিকেও তারা পা বাড়ায়নি। ভয়ে ভয়ে, চাপা আতঙ্ক নিয়ে এই কাঁকুরে জমিতেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তবে দু-একজন খুব সতর্ক ভঙ্গিতে বারহৌলি বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিল।

এদের মনোভাব বুঝতে পারছিল ফরিদ। কেউ কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চায় না। চল্লিশ বছর আগে এটা তাদের দেশ ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন তারা এ দেশের কেউ না। পিতৃভূমি বা জন্মভূমি দেখতে গিয়ে যদি বিপন্ন হতে হয় তাই সেদিকে কেউ পা বাড়ায়নি।

ফরিদ আর কিছু বলে না।

শওকত এবার তাদের ব্যবস্থা করে দেয়। হাবিবা আর ফরিদ তাদের ঘর না তোলা পর্যন্ত থাকবে ওসমানদের সঙ্গে। রাশেদা আর আনোয়ারা থাকবে নবাবজানদের কাছে। রাশেদার দুই ভাই এবং আব্বা-আম্মার দায়িত্ব নেবে রুস্তম আর গহর শেখ।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরগুলোর সামনে ফরিদরা শওকতকে ঘিরে ছড়িয়ে বসে। আজ আর ঢাকা থেকে কেউ আসবে না, তাই শওকতের কামতাপুরে যাওয়ার তাড়া নেই।

মাথার ওপর ঝকঝকে নীলাকাশ। সূর্য তার ঢালু গা বেয়ে পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে। রোদে তাত থাকলেও গা পুড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রচুর উলটোপালটা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে। ফাল্গুনের রোদের সঙ্গে হাওয়া থাকায় মোটামুটি ভালোই লাগছে সবার।

ইন্ডিয়ায় তাদের ভবিষ্যৎ কী, এই নিয়ে কথা হচ্ছিল।

ফরিদ বলে 'শওকতচাচা, কতদিন আমরা এখানে লুকিয়ে থাকতে পারব? তুমিই আসতে আসতে বলেছিলে, আমাদের খবর অনেকে জেনে গেছে। তারাই আমাদের টেনে বের করবে। কে জানে ভাগিয়ে দেবে কিনা। তা ছাড়া আরো একটা কথা ভাবার আছে।'

শওকত জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'ঢাকা থেকে আমরা কে আর ক'টা পয়সা আনতে পেরেছি! কামাই না করলে না খেয়ে মরতে হবে। সে জন্যেও এখান থেকে বেরুনোটা জরুরি।'

ফরিদের কথাগুলো অনেককে নাড়া দিয়ে যায়। তারা সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক ঠিক'।

শওকত গভীর আগ্রহে ফরিদের কথা শুনছিল এবং অন্যদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। সে আস্তে আস্তে বলে, বেটা তুমি যা বললে, সব আমার মাথায় আছে। লেকেন সবুর। আমি এখানকার একটা লোকের খোঁজ পেয়েছি। মনে হচ্ছে, তাকে দিয়ে আমাদের অনেক মুশকিল-আসান হবে। দো-চার রোজের ভেতর তার সঙ্গে দেখা করব।'

অন্য সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফরিদ জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা কে?'

শওকত জানায়, তার নাম এখন বলা যাবে না। সে পলিটিক্যাল পার্টির জবরদস্ত লিডার। তার নামে এ অঞ্চলে বাঘ আর বকরি একঘাটে জল খায়। সে-ই একমাত্র তাদের বাঁচাতে পারে। তবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব সহজ ব্যাপার না।

ফরিদ এবং আরো অনেকে শ্বাসরুদ্ধের মতো জিজ্ঞেস করে, 'এর খবর তোমাকে কে দিল?'

শওকত বলে, 'বর্ডারের এপারে ওপারে কত ধান্ধায় কত দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে, জানো? ধরে নাও তাদের কারো কাছ থেকে খবরটা পেয়েছি।'

ফরিদের সংশয় কাটে না। সে বলে, 'যদি লিডারের সঙ্গে দেখা করতে না পারো?'

'করতেই হবে। এটা আমাদের বাঁচা-মরার সওয়াল।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ফরিদ বলে, 'আরেকটা কথা বলব শওকত চাচা?'

শওকত বলে, 'একটা কেন, দশটা বিশটা, যে ক'টা ইচ্ছা—বলো।'

'এই মাঠে পড়ে না থেকে আমাদের গাঁওগুলোতে চলে যাওয়াই তো ভালো। যারা আমাদের জমিনের ওপর বসে আছে তাদের হাতে-পায়ে ধরলে একটু থাকার জায়গা দেবে না?

ফরিদের সারল্যে হেসে ফেলে শওকত। ছেলেটা প্রচুর লেখাপড়া করলেও অনেক ব্যাপারে একেবারেই ছেলেমানুষ, যেন বহুকাল আগের 'বচপনেই' থেকে গেছে। তার হয়ত ধারণা, দুনিয়াটা পিরদরবেশে থিক থিক করছে। এদের কাছে হাত পাতলেই যা ইচ্ছা পাওয়া যাবে। শওকতদের মতো মানুষ যারা না ইন্ডিয়ান, না বাংলাদেশি, না পাকিস্তানি, যারা একটু আশ্রয়ের জন্য লুকিয়ে-চুরিয়ে পুরোনো স্বদেশে ঢুকে পড়েছে, এখন যদি ফেলে-যাওয়া জমির অংশ চাইতে যায় তার ফলাফল কী হতে পারে, চোখের সামনে ছবির মতো তা দেখতে পায় শওকত। সে ফরিদের কাঁধে একটা হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে, 'ফরিদ বেটা, কেউ এক 'ধুর' জমিনও দেবে না। যা খোয়া গেছে তা কোনোদিনই ফেরত পাওয়া যাবে না। সমঝা?'

ফরিদরা আসার পর তিন দিন কেটে যায়। এর মধ্যে আরো কিছু মানুষ বর্ডারের ওপার থেকে চলে এসেছে।

আজ চতুর্থ দিন। সকাল উঠে বাসি রুটি আর আখের গুড় দিয়ে নাস্তা করে লোক আনতে কামতাপুরে চলে গেছে শওকত।

আর বেলা আরেকটু চড়লে ফরিদ ঠিক করে ফেলে, মনপখলে আজ যাবেই। পূর্বপুরুষের জন্মভূমি তাকে যেন প্রবল আকর্ষণে সেদিকে টানতে থাকে।

এখন যে যার ঘরের সামনের তকতকে ফাঁকা জায়গাটায় ঢিলে-ঢালা বসে কথা বলছে। পুরুষদের রোজগার-ধান্ধার ব্যাপার নেই। মেয়েদের অবশ্য কাঠকুটো জ্বেলে ভাজি চাপাটি বানাতে হয়। তবু তাদের তেমন তাড়া থাকে না। ভূগোলের হট্টগোল থেকে বহুদূরে এই মাঠের মাঝখানে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনরাত শুধু মুখ গুঁজে পড়ে থাকা ছাড়া আপাতত কারো বিশেষ কিছু করার নেই।

ফরিদ পায়ে পায়ে বিলের দিকে চলে যায়। ওসমানের কাছ থেকে আগেই সে জেনে নিয়েছিল কিভাবে বারহৌলি যেতে হবে। আর বারহৌলিতে একবার পৌঁছুতে পারলে লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে ঠিক মনপখলে চলে যেতে পারবে।

বিলের কাছাকাছি ফরিদ যখন এসে পড়েছে, সেই সময় শুনতে পায়, 'এই শুনো—'

ঘুরে তাকাতেই ফরিদ দেখতে পায় রাশেদা। বেতের মতো পাতলা, ধারালো চেহারা তার। নাকমুখ কাটা কাটা। গায়ের রঙ পাকা গমের মতো। বড় বড় চোখ দুটিতে আশ্চর্য জাদু যেন মাখানো। বয়স উনিশ কুড়ি। ঢাকায় থাকতে মেয়েটা সেই কবে থেকে তাকে নজরে নজরে রেখেছে। তার চোখ এড়িয়ে কিছু করার বা কোথাও একটা পা ফেলার উপায় নেই।

রাশেদা কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

ফরিদ ভেবেছিল মনপখলে যাওয়ার ব্যাপারটা কাউকে জানাবে না। বলে, 'কই কোথাও না। এই এখানে একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম।'

'ঝুট!'

'মতলব?'

'তুমি মনপখল যাচ্ছ।'

ফরিদ হকচকিয়ে যায়। বলে, 'নেহী নেহী, কে বললে?'

পলকহীন তাকিয়ে ছিল রাশেদা। সে বলে, 'আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। ধরা যখন পড়েই গেছে, তখন কী আর করা। ফরিদ বলে, 'সে অনেক দূর। যেতে ছ মাইল। ফিরতে আবার ছ মাইল। তোমার কষ্ট হবে।'

'হোক কষ্ট, আমি তো আর তোমার পায়ে হাঁটব না।'

'না না, ভালো করে ভেবে দ্যাখো।'

'তোমার কোনো বাহানা শুনব না। আমি যাবই। জানো তো রাশেদা কেমন জিদ্দি!'

অগত্যা হাল ছেড়ে দিতে হয় ফরিদকে।

বিলের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড় চিরে একটা সরু কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে আধ মাইলের মতো হাঁটলে পাকা সড়ক বা পাক্কী। এই পাক্কীটা সোজা গিয়ে ঠেকেছে বারহৌলিতে।

কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পাক্কীতে ওঠে দুজনে। দুপাশে ফসলকাটা ফাঁকা মাঠ, আকাশে অজস্র পাখি দেখতে দেখতে আর কথা বলতে বলতে যখন তারা বারহৌলি পৌছোয়, দুপুর হতে তখনও বেশ দেরি।

জায়গাটা রীতিমতো গমগমে। ছোটোখাটো টাউনই বলা যায় বারহৌলিকে। প্রচুর লোকজন। বিজলি বাতি এসে গেছে। সাইকেল রিকশা আর বয়েল গাড়িতে ছয়লাপ। ফাঁকে ফাঁকে অটো আর স্কুটারও চোখে পড়ে। রাস্তার বেশির ভাগই পাকা। দুধারে একতলা দোতলা অগুনতি বাড়ি। অবশ্য টিনের এবং টালির ঘরও অজস্র। এরই একধারে জমজমাট বাজার।

মনপখলে গিয়ে খাবারটাবার কিছু পাওয়া যাবে কিনা, কে জানে। ফরিদরা বাজারে এসে মিঠাইয়ের দোকান থেকে বালুশাই, লাড্ডু আর পুরি কিনে, দোকনদারের কাছ থেকে মনপখলে যাওয়ার রাস্তার হদিস জেনে নিয়ে যখন বেরিয়ে আসে সেই সময় দূর থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসে। ফরিদরা দাঁড়িয়ে যায়।

প্রথমদিকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর দেখা যায় রাস্তার মোড় ঘুরে স্লোগান দিতে দিতে বিরাট একটা মিছিল আসছে। এবার কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যায়।

'আলগা চুনাওমে আজীবলাল সিংকো—'

'ভোট দেঁ ভোট দেঁ।'

'সমাজসেবক আজীবলাল—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

আজীবলাল—

'যুগ যুগ জীয়ে।'

'আজীবলালকা চিহ্ন—'

'হাথী ছাপ জিন্দাবাদ।'

'হাথী পর—'

'মোহর মারো, মোহর মারো।'

রাশেদার কানের কাছে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় ফরিদ বলে, 'এখানে চুনাও (নির্বাচন) আসছে।'

'নির্বাচন, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি ঢাকাতেও তারা দেখেছে। এসব তাদের কাছে অজানা কিছু নয়। রাশেদা আস্তে মাথা নাড়ে, নিচু গলায় বলে, 'হাঁ।'

একসময় স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটা ফরিদদের সামনে দিয়ে চলে যায়। তারপর ওরা আর দাঁড়িয়ে থাকে না। বাঁদিকের একটা সরু রাস্তায় ঢুকে এগিয়ে যায়। বাজার এবং বারহৌলি টাউনের শেষ সীমা পেছনে ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যে ফরিদরা একটা চওড়া পিচের সড়কে এসে ওঠে। মিঠাইওয়ালা বলে দিয়েছিল, এই সড়কটা মনপত্থলের পাশ দিয়ে চলে গেছে।

এখানেও রাস্তার দু ধারে ফাঁকা ফসলের খেত। দূরে দূরে ঘন গাছপালার ভেতর কিষাণদের গাঁ।

এ রাস্তায় প্রচুর গাড়িঘোড়া। দূরপাল্লায় বাস, বয়েল কি ভৈসা গাড়ি, সাইকেল রিকশা, ট্রাক আর রোগা হাড্ডিসার ঘোড়ায়-টানা এক-আধটা টাঙা। এক কিনার দিয়ে, গাড়িটাড়ির পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে দুজনে সোজা হাঁটতে থাকে। মনপত্থলের দিকে যত এগোয়, আবেগে এবং উত্তেজনায় ফরিদের বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যায়। রাশেদা কী ভাবছে, বোঝা যায় না। ফরিদের পাশে পাশে সে যেন চঞ্চল পাখির মতো উড়ে চলে।

মাইল দুই হাঁটার পর ওরা মনপত্থলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। রাস্তার একজনকে জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়, এবার পাকা সড়ক থেকে নেমে ফরিদদের ডানদিকে যেতে হবে। মাঠের ভেতর দিয়ে খানিকটা গেলেই মনপত্থল গাঁও।

মাঠে নেমে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে হাঁটতে থাকে ফরিদ। তার পাশে একইভাবে উড়ে উড়ে চলেছে রাশেদা। কিছুক্ষণের মধ্যে এরা পৌঁছে যায়।

হালুইকর বলে দিয়েছিল, মনপত্থল গোয়ার বা গোয়ালাদের গাঁ। চারিদিকে অজস্র গোরু-মোষ চরতে দেখে তা-ই মনে হয়।

এখন দুপুর। সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। রোদের ঝাঁজ বেড়ে গেছে অনেকটা। তবে আগের মতোই জোরালো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

মনপত্থলে পৌঁছে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢোকে না ফরিদ। সীমানার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। অগত্যা রাশেদাকেও থমকে যেতে হয়।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফরিদের আবেগ এবং উত্তেজনা রাশেদার মধ্যেও যেন চাড়িয়ে যেতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর রাশেদা বলে, 'কী হল, গাঁওয়ে ঢুকবে না?'

চমকে উঠে ফরিদ বলে, 'হাঁ চলো।' যেতে যেতে গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে দেয় সে, হুঁশিয়ার, আমরা যে ঢাকা থেকে এসেছি কাউকে বলবে না। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

গ্রামে ঢুকে খানিকটা গেলেই বিরাট পুকুর। ফরিদ বলে, 'এই তালাও-এর ধারে বসে আগে খেয়ে নিই। তারপর কোথায় আমাদের পুরোনো ঘরবাড়ি জমিন ছিল, খোঁজ করব।'

পুরি মিঠাই এবং পুকুরের জল খেয়ে তারা পিতৃভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

ফরিদের জন্ম পূর্ব পাকিস্তানে। আগে আর কখনও সে এখানে আসেনি। ঢাকায় থাকতে আব্বা বা দাদীর কাছে মনপত্থলের কথা অনেকবার শুনেছে কিন্তু তখন কোনোরকম টান অনুভব করেনি। বহুদূরে উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চলের নগণ্য অজানা এক ভূখণ্ডের জন্য তার প্রাণ উথলে ওঠেনি। পিতৃভূমি তার কাছে তখন নিতান্তই কথার কথা, ঝাপসা একটা আইডিয়া মাত্র। কিন্তু

এখানকার মাটিতে পা দিয়ে ফরিদ টের পায়, না জন্মালেও বা আগে না দেখলেও তার অস্তিত্বের শিকড়টি মনপখলেই থেকে গেছে।

একটা ব্যাপার ভেবে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল, সাতচল্লিশে পার্টিশানের পর তার দাদা এবং রাশেদার দাদা এই গ্রাম থেকে সর্বস্ব খুইয়ে ঢাকায় চলে যায়। ঠিক চল্লিশ বছর বাদে তাদের দুই নাতি-নাতনি আশ্রয়ের খোঁজে, হয়ত বা আইডেনটিটির সন্ধানে এখানে চলে এসেছে।

একগুঁয়ে অভিযানকারীর মতো ফরিদ এবং রাশেদা মনপখলের ঘরে ঘরে হানা দিতে থাকে। কিন্তু এখানকার বাসিন্দা যাদের বয়স কম তারা কেউ বলতেই পারল না, ফরিদের দাদা মুদাস্‌সর আলি এবং রাশেদার দাদা সামসুদ্দিন হোসেন নামে আদৌ কেউ এখানে ছিল কিনা। তবে তারা শুনেছে, কিছুকাল আগে এই গাঁওয়ে কিছু মুসলমান থাকত, আজাদির পর তারা কোথায় চলে গেছে, কে জানে। তবে এখন আর কোনো মুসলিম ফ্যামিলি এখানে নেই।

কিছুটা হতাশ হলেও অদম্য উৎসাহে খোঁজ চালিয়েই যায় ফরিদরা। শেষ পর্যন্ত মনপখলের সবচেয়ে প্রাচীন লোকটি তাদের জানায় মুদাস্‌সর আলি এবং সামসুদ্দিন হোসেন এই গাঁওতেই থাকত। সে তাদের চিনতোও।

ফরিদের রক্তের ভেতর দিয়ে বিজলি চমকের মতো কিছু ঘটে যায়। সে বলে, 'মেহেরবানি করে বলুন তাদের ঘর কোথায় ছিল—' উত্তেজনায় আবেগে আগ্রহে তার গলা কাঁপতে থাকে।

বুড়ো লোকটা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'কিছু নেই বেটা।' তারপর আঙুল বাড়িয়ে দূরে যে জায়গাটা দেখিয়ে দেয় সেটা ফাঁকা শস্যক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, ঘরবাড়ির কোনো চিহ্ন নেই কোথাও।

সেখানে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ফরিদ আর রাশেদা। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফিরে যায়।

বিকেলের ঢের আগেই তারা বারহৌলি বাজারে চলে আসে। এবারও দেখা যায় আরেকটা লম্বা মিছিল স্লোগানে স্লোগানে আকাশ চৌচির করে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।

'দেশভকত রামবনবাস চৌবে—'

'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।'

'এম্লে বনেগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'মন্ত্রী বনেগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'রামরাজ লায়েগা কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'চৌবেজিকা চিহ্ন পেঁড় পর—'

'আগলে চুনাওমে মোহর মারো, মোহর মারো।'

'তুমহারা হামারা উম্মিদবার কৌন?'

'রামবনবাস চৌবে।'

'যবতক চান্দ্ সূরজ হোঁগা—'

'তবতক চৌবেজিকা নারা হোগা।'

'চৌবেজি—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

রামবনবাসের নিবাচনী মিছিল আজীবলালের মিছিলের চেয়ে কিছুটা বড় এবং বেশি জমকালো। কিন্তু সেদিকে ফরিদের লক্ষ্য ছিল না। সে শুনেছে মনপথলে তাদের বেশ বড় বাড়ি ছিল। পাকা মেঝে, ইটের দেওয়াল, চাল অবশ্য টিনের। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কী দেখে এল তারা? গভীব হতাশা চারিদিক থেকে যেন তাকে ঘিরে ধরতে থাকে।

সন্ধের আগে আগে, আকাশে দিনের আলো থাকতে থাকতেই ফাঁকা কাঁকুরে ডাঙার মাঝখানে তাদের সেই ছন্নছাড়া আস্তানায় পৌঁছে যায় ফরিদরা।

দিন সাতেক কেটে গেল।

এর মধ্যে ওপার থেকে আরো শ'খানেক মানুষ এসে পড়েছে। বাঁশ চট টালি ইত্যাদি জোড়াতাড়া দিয়ে আট-দশটা নতুন ঘরও খাড়া করা হয়েছে। আরো ক'টা বানাবার তোড়জোড় চলছে।

সব মিলিয়ে এখন এখানে আড়াই শ'র মতো মানুষ। ঠিক হয়েছে, আপাতত বেশ কিছুদিন সীমান্তের ওধার থেকে লোক আসা বন্ধ থাকবে।

আজ সকালে নাস্তা সেরে শওকত, ফরিদকে বলে, 'আমার সঙ্গে তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে বেটা।'

কোনো প্রশ্ন না করে ফরিদ বলে, 'যাব'।

কিছুক্ষশ পর তারা বেরিয়ে পড়ে। বিল এবং কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পাক্কীতে উঠে শওকত বলে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, জানো?'

এ দিকটা ফরিদের চেনা। এই রাস্তা দিয়েই ক'দ্দিন আগে বাবহৌলি হয়ে সে আর রাশেদা মনপথল গিয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিতভাবে এখনও ফরিদ জানে না শওকত তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে—বারহৌলিতে না মনপথল? জবাব না দিয়ে উৎসুক চোখে শওকতকে লক্ষ্য করতে থাকে সে।

শওকত নিজেই তার প্রশ্নের উত্তব দেয়, 'আমরা যাচ্ছি বারহৌলি টৌনে। সেই পলিটিকাল লিডারের সঙ্গে দেখা করতে। বড়ে আদমী, আংরেজি উংরেজি বলতে পারে। সঙ্গে একজন 'লিখিপড়ি' লোক থাকা দরকার। তাই তোমাকে নিয়ে এলাম।' শওকত একনাগাড়ে বলে যায়, 'ভেবে দেখলাম, আর দেরি করা ঠিক না। কখন কী হাঙ্গামা বেধে যাবে, হয়ত এখান থেকে আবার ভাগিয়ে দেবে। তাব আগে লিডারকে ধরতে হবে। সিধা ওঁর পায়ে পড়ে যাব।'

শওকত খুবই দূরদর্শী, অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান। ষাট বছরের জীবনে ভারত পাকিস্তান আর বাংলাদেশে অজস্র দাঙ্গা গণহত্যা দেশভাগ অস্থিরতা আর উন্মাদনার সাক্ষী সে। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখিয়েছে।

শওকতের কথাগুলো ফরিদকে বুঝিয়ে দেয়, ইন্ডিয়ায় থাকতে হলে পলিটিক্যাল প্রোটেকশানটা একান্ত জরুরি। আর সেই উদ্দেশ্যেই আজ সে তাকে নিয়ে চলেছে।

ফরিদ আচমকা বলে ওঠে, 'আমরা কার কাছে যাচ্ছি চাচা? আজীবলাল সিং, না রামবনবাস চৌবে?' বলেই টের পায় গোলমাল করে ফেলেছে। সে যে বারহৌলির দিকে গিয়েছিল, আর বারহৌলিতে গেলে নিশ্চয়ই মনপথলে হানা দিয়েছে, এটা এবার ধরা পড়ে যাবে।

শওকত অবাক হয়ে ফরিদের দিকে তাকায়। বলে, 'ওঁদের নাম তুমি জানলে কি করে? বারহৌলিতে এসেছিলে?'

ফরিদ মুখ নিচু করে মাথা হেলিয়ে দেয়। চোখের তারা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শওকতের। সে বলে, 'মনপত্থলেও গিয়েছিলে, তাই না?'

ফরিদ আধফোটা গলায় বলে, 'হ্যাঁ'।

শওকত অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'ঠিক আছে, পরে মনপত্থলের কথা শোনা যাবে। এখন বলো, আজীবলাল সিং আর রামবনবাস চৌবের কথা কার কাছে শুনেছ?'

ফরিদ সেদিনের দুটো মিছিলের কথা জানায়।

শওকত বলে, 'ও, আচ্ছা। আমরা এখন রামবনবাস চৌবের কাছেই যাচ্ছি।'

বারহৌলি টাউনের এক মাথায় বাজার, আরেক মাথায় 'চতুর্বেদী ধাম'। বিশাল কম্পাউন্ডের মাঝখানে পুরোনো আমলের দুর্গের মতো প্রকাণ্ড তেতলা বাড়িটার মাথায় রামসীতা মন্দির। কম্পাউন্ড ঘিরে দশ ফুট উঁচু এবং তিনফুট চওড়া দেওয়াল। সামনের দিকে লোহার পাল্লা দেওয়া বিরাট গেট। সেখানে পাকানো গোঁফওলা বিপুল চেহারার ভোজপুরি দারোয়ান হাতে বন্দুক এবং গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে দিনরাত পাহারা দেয়।

শওকতরা 'চতুর্বেদী ধাম'-এ পৌঁছে দারোয়ানকে জানায় রামবনবাস চৌবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

দারোয়ান ভুরু কুঁচকে দু'জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়ে, 'ভাগ শালে—'

শওকতেরা চলে যায় না, সামনে কাকুতিমিনতি করতে থাকে। দারোয়ান ভেতরে ঢুকতে দেবে না, তারাও নাছোড়বান্দা। দারোয়ানের মেজাজ ক্রমশ চড়তে থাকে, সেই সঙ্গে তার গলাও। চিৎকার করে সে বার বার হুঁশিয়ারি দেয়, না গেলে গুলি করে শওকতদের মাথা বিলকুল ছাতু করে দেবে।

এই সময় ভেতর থেকে গম্ভীর মোটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'দারবান, উ লোগোকো অন্দর আনে দো।'

গেটের পর অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা হুড-খোলা প্রাচীন আমলের মোটর, দুটো জিপ আর ঘোড়ায়-টানা ফিটন দাঁড়িয়ে আছে। দুটো নৌকর মোটর আর ফিটন ধোয়ামোছা করছে।

দূরে মূল বাড়িটার একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঢালা বারান্দায় ইজিচেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে ডাক এডিশানের কাগজ পড়ছিলেন রামবনবাস। পাশে একটা নিচু টেবিলে আরো অনেকগুলো খবরের কাগজ পর পর সাজানো। আর আছে দু-চারটে জরুরি ফাইল, কলম, দামি কাগজের রাইটিং প্যাড। নিচে একটা মোরাদাবাদি ফরসি, কলকের মাথা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছে।

রামবনবাসের বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। মজবুত স্বাস্থ্য। এই বয়সেও চুলটুল বেশি পাকেনি, দাঁতগুলো অটুট। খাড়া নাক, ধারালো মুখ। শরীরে অতিরিক্ত মেদ নেই। চোখে অবশ্য চশমা রয়েছে।

বারান্দাটা মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে। শওকতেরা ভয়ে ভয়ে, প্রায় দমবন্ধ করে রামবনবাসের কাছাকাছি নিচের জমিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘাড় ঝুঁকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'সেলাম হুজৌর—'

রামবনবাস সোনার ফ্রেমের ওপর দিয়ে তীব্র চোখে তাদের দেখতে দেখতে বলেন, 'কী হয়েছে? শোর মচাচ্ছিলে কেন?'

'হুজুর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দারবান আসতে দিচ্ছিল না।'

'কারা তোমরা? তোমাদের তো আগে কখনও দেখিনি।'

শওকত জানায়, তারা এখানে নতুন এসেছে। তবে চল্লিশ বছর আগে এ অঞ্চলেরই বাসিন্দা ছিল।

কপালে ভাঁজ পড়ে রামবনবাসের। তিনি বলেন, 'মতলব?'

কিভাবে দেশভাগের পর তারা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, তারপর বাংলাদেশ হওয়ার পর ঢাকায় তাদের কী হাল হয়েছে এবং এখানে ফিরে না এসে তাদের উপায় ছিল না, ইত্যাদি বিস্তারিত জানিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে থাকে শওকত।

রামবনবাসের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটে যায় যেন। খাড়া উঠে বসেন তিনি। বলেন, তোমরা লুকিয়েচুরিয়ে ইন্ডিয়ায় ঢুকেছ। ঘুসপেঠিয়া—ইনফিলট্রেটরস! জানো এটা কত বড় বেআইনি

শওকত এবং ফরিদ হাতজোড় করে একেবারে নুয়ে পড়ে। শওকত রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'হুজৌর মা-বাপ, আমাদের বাঁচান। ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। এখানে যদি থাকতে না পারি, বালবাচ্চা নিয়ে শেষ হয়ে যাব। এখন আপনার মেহেরবানি।'

অনেকক্ষণ কী ভাবেন রামবনবাস। তারপর বলেন, 'তোমরা কত লোক এসেছ?'

'লগভগ আড়াই শো হুজুর।'

'আরো আসবে?'

'হাঁ।'

'কত আসতে পারে?'

'বহোত আদমী। তবে এদিকে আর সাত আটশো'র বেশি আসবে না।'

একটু চুপ করে থাকার পর রামবনবাস আবার জিজ্ঞেস করেন, 'আমার খবর তোমাদের কে দিলে?'

টাউটদের নাম করে না শওকত। সসম্ভ্রমে শুধু বলে, 'দুনিয়ায় আপনার নাম কে না জানে। এখানে পা দিয়েই আপনার কথা শুনেছি মালিক।'

চাটুবাক্যে মোটামুটি খুশিই হন, রামবনবাস। তবে বাইরে থেকে তো বোঝার উপায় নেই। বলেন, 'আচ্ছা, এখন যাও।'

শওকত ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের কী হবে মালিক?'

'আমাকে ক'দিন ভাবতে দাও।'

রামবনবাস চলে যেতে বলেছেন, তবু দাঁড়িয়ে থাকে শওকতেরা।

রামবনবাস বিরক্ত হয়েই এবার বলেন, 'কী হল, গেলে না?'

শওকত মাথা আরো নুইয়ে দিয়ে বলে, 'হুজুর, আমরা যে এসেছি অনেক জেনে গেছে। তারা যদি ঝঞ্ঝাট বাধায়?'

'চার রোজ বাদ তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করো।'

শওকতের আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। 'জি'—বলে এবং বারকয়েক সেলাম ঠুকে তারা বিদায় নেয়।

রামবনবাস চৌবে স্পষ্ট করে তাদের কোনো ভরসা দেননি। অবশ্য চারদিন পর আসতে

বলেছেন। তখন তিনি কী বলবেন, কী করবেন, বোঝা যাচ্ছে না। শওকতের গা ঘেঁষে চলতে চলতে উৎকণ্ঠায় দম আটকে আসতে থাকে ফরিদের। ইংরেজি বলার জন্য শওকত তাকে নিয়ে এসেছিল কিন্তু তার দরকার হয়নি। এতক্ষণ রামবনবাসের হাভেলিতে সে ছিল নির্বাক দর্শক। এবার হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে, 'চৌবেজিকে বলে কি ভালো হল চাচা?'

চিন্তাগ্রস্তের মতো শওকতও হাঁটছিল। ফরিদের প্রশ্নের ধাঁচটা ধরতে না পেরে বলে, 'মতলব?'

'ওরা পলিটিকাল লোক। যদি বিপদে ফেলে দেয়?'

'অর্থাৎ রাজনীতি করা লোকেরা কতটা বিশ্বাসযোগ্য, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে ফরিদের। শওকত বলে, 'কাউকে না কাউকে সাহারার জন্যে তো বলতেই হবে। পলিটিকাল লিডার ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। এখন দেখা যাক।'

ফরিদ আর কিছু বলে না।

চারদিন নয়, ঠিক দু'দিন পর সকালবেলায় দুটো ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা, হট্টাবট্টা চেহারার লোক এসে লাঠি ঠুকে চ্যাঁচায়, 'কৌন হো শওকত মিঞা আউর ফরিদ আলি?'

মাঠের মাঝখানে সৃষ্টিছাড়া এই বসতিতে মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। শওকত এবং ফরিদ ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমরা। কেন?'

'চৌবেজি তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছেন।'

চারদিনের বদলে দু'দিনের ভেতর কেন এই তলব, বুঝে উঠতে পারে না শওকত। ভীরু গলায় সে জানতে চায়, 'মালিক কেন যেতে বলেছেন, আপনারা জানেন?'

'নেহী।'

আর কোনো প্রশ্ন করে না শওকত। চারপাশের ত্রস্ত মানুষগুলোকে খানিকটা ভরসা দিয়ে ফরিদকে নিয়ে লোক দুটোর সঙ্গে বারহৌলি চলে যায়।

দু'দিন আগে 'চতুর্বেদী ধাম'-এর একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো বারান্দায় একাই ছিলেন রামবনবাস। আজ তাঁকে ঘিরে গদি-মোড়া আরামদায়ক চেয়ারে চার-পাঁচজন বসে আছেন। চেহারা এবং পোশাক-আশাক দেখে আন্দাজ করা যায় তাঁরা মান্যগণ্য বিশিষ্ট সব মানুষ। উঁচু গলায়, উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করছিলেন। শওকতদের দেখে তাঁরা থেমে যান।

রামবনবাস বলেন, 'এদের কথাই আপনাদের বলেছিলাম।'

তাঁর সঙ্গীরা স্থির চোখে শওকতদের লক্ষ্য করতে থাকেন। একজন বলেন, 'এরাই তা হলে ঘুসপৈঠিয়া (অনুপ্রবেশকারী)। এদের কথা আমার কানে আগেই এসেছে। বিলের পাশে পড়তি জমি দখল করে ঘর তুলে বসেছে এরা।'

আরো ক'জন সায় দিয়ে বলেন, 'আমরাও খবরটা পেয়েছি।'

শুনতে শুনতে ভয়ানক ঘাবড়ে যায় শওকত আর ফরিদ। গলগল করে ঘামতে থাকে।

রামবনবাস শওকতকে বলেন, 'আজ তোমাদের একটা জরুরি কাজে ডাকিয়ে এনেছি। সেদিন তোমরা বলেছিলে, লগভগ আড়াইশ আদমী ওপার থেকে এসেছে।'

কাঁপা গলায় উত্তর দেয় শওকত, 'জি।'

এবার রামবনবাস তাঁর সঙ্গীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা মনে করছেন, আগলা চুনাওতে [illegible]লাল ভালো ভোট পাবে।

সবাই সমস্বরে জানান, হ্যাঁ।

'কতগুলো সিওর ভোট হাতে থাকলে আমি জিততে পারি?'

'কমাসে কম ছ'সাত শ।'

'ঠিক বলছেন?'

'হ্যাঁ, জরুর।'

রামবনবাস আবার শওকতদের দিকে মুখ ফেরান। বলেন, 'সেদিন বলেছিলে ওপার থেকে আরো ছ'সাত শ আদমী এখানে আসবে। এসে গেছে?'

'নেহী মালিক। শুনেছি কিছুদিন পর থেকে আসতে থাকবে।' শওকত শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রামবনবাস বলেন, 'এখানে আট মাস পর যে চুনাও হচ্ছে, তা জানো?'

শওকত ফরিদকে দেখিয়ে বলে, 'জানি না। তবে বারহৌলি বাজারে ও দুটো চুনাওব মিছিল দেখেছে। একটা আপনার, আরেকটা আজীবলাল সিংয়ের।'

'হাঁ।' রামবনবাস নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'এত আগে কেউ চুনাও নিয়ে মাথা ঘামায় না। লেকেন আজীবলাল ময়দানে নেমে গেছে। আমার পক্ষে হাত পা-গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব না। ভূচ্চরটা জেতার জন্য দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।' বলেই গলার ভেতর থেকে মোটা আওয়াজ বের কবেন, 'হুঁশিয়ার, ওদের পাল্লায় পডবে না।' ভীত মুখে শওকত বলে, 'নেহী মালিক, নেহী।'

'আব শোনো, আগলা চুনাওতে আমাকে তোমরা ভোট দেবে। আমার চিহ্ন পেঁড়। পরে যারা ওপাব থেকে আসবে তাদেরও আমাকে ভোট দিতে হবে।'

এই সময় নিজের মধ্যে খানিকটা সাহস জড়ো করে ফরিদ বলে, 'লেকেন মালিক আমরা ঘুসপৈঠিয়া, আমরা এদেশে ভোট দেব কী করে?'

তার মনোভাব বুঝতে পাবছিলেন রামবনবাস। বে-আইনি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার নেই। তিনি বলেন, 'সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। লেকেন হুঁশিয়ার, আমাকে ভোট না দিলে তোমরা জিন্দা গোরে চলে যাবে।'

পাশ থেকে শশব্যস্তে শওকত বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ মালিক, আপনাকে আমরা ভোট দেব, এই জবানের এদিক ওদিক হবে না। লেকেন আমাদের কী হবে? ফরিদ ক'দিন আগে মনপখল গিয়েছিল। সেখানে আমাদের বাপ-দাদার ঘর বরাবর করে এখন চাষ হচ্ছে। আমরা কোথায় থাকব? কী করব?'

'ওখানে কিছু করা যাবে না। ভোটটা আগে দাও, ইন্ডিয়ান বনো। তারপর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

শওকত আর ফরিদ চুপ করে থাকে।

রামবনবাস আবার বলেন, 'আজ যে-সব কথা হল কাউকে বলবে না। মুহ্ বিলকুল বন্ধ।'

'হাঁ মালিক।'

আরো কিছুদিন কেটে যায়। এর মধ্যে ওপার থেকে আরো কয়েক শো লোক এসে পড়ে।

এদিকে নির্বাচনের কারণে এ অঞ্চলের আবহাওয়া ক্রমশ তেতে উঠতে থাকে। তারই ভেতর এক ঝিম-ধরা দুপুরে দুটো লোক এসে ভোটার্স লিস্টে তাদের নাম তুলে নিয়ে যায়। আরো কয়েক দিন বাদে রামবনবাসের সুপারিশে তাদের রেশনকার্ড হয়ে যায়।

দিন মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল। উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, ভয় আতঙ্ক—সবই ছিল কিন্তু কেউ এসে

এতকাল ঝঞ্ঝাট বাধায়নি। কিন্তু ভোটার লিস্টে নাম ওঠা এবং রেশনকার্ড হয়ে যাবার পর একদিন বিকেলে আজীবলালের শ'তিনেক লোক চিৎকার করতে করতে হানা দেয়।

'ঘুসপেটিয়া হিন্দুস্থানসে—'

'দফা হো, দফা হো।'

'বিদেশি—'

'ভারত ছাড়ো, ভারত ছাড়ো।'

ঘণ্টাখানেক হল্লা করে লোকগুলো চলে যায়।

তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে শওকত আর ফরিদ বারহৌলিতে 'চতুর্বেদী ধাম্'-এ চলে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ার্ত মুখে সব ঘটনা রামবনবাসকে জানায়।

রামবনবাস এতটুকু উত্তেজিত হন না। নিস্পৃহ সুরে বলেন, 'শোর মচানে দো শালে লোগোকো। ভোটার লিস্টে তোমাদের নাম উঠেছে, রেশন কার্ডও হয়ে গেছে। এখন তোমরা ইন্ডিয়ান। কোনো ভুচ্চরের ছোঁয়ার ক্ষমতা নেই তোমাদের চামড়ায় হাত ঠেকায়। চিন্তা মাত করনা। শুধু আমার ভোটের কথাটা মনে রেখো।'

'জি। জান গেলেও ভুলব না।'

শওকতের সঙ্গে কাঁকুরে ডাঙার মাঝখানে তাদের সেই সৃষ্টিছাড়া বসতিতে ফিরে যেতে যেতে ফরিদের মাথায় সেই ভাবনাটাই বার বার ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। ব্রিটিশ আমলে তারা ছিল ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানি, তারও পর বাংলাদেশি। চুনাও-এর কারণে চল্লিশ বছর বাদে তারা নতুন আইডেনটিটি পেয়ে যায়। এখন তারা আবার ভারতীয়।

দূরমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে চুনাওকে হাজারবার সেলাম জানায় ফরিদ।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ই বিপাকে পড়েছি হে। ঘিলুতে লোকটার এই একটা কথাই পাক খাচ্ছে। তাও মনে মনে। কী বিপাকে, কিসের বিপাক কেউ জানে না। মাসখানেক ধরে এই একটা কথাই পাক খায়। ছনের চালে কাক এসে বসে থাকে—হুস করলে উড়ে যায়,—কিন্তু এই বিপাক উড়ে যায় না। আবাদে আখাম্বা ষাঁড় দৌড়ায়, হাতে লাঠি নিয়ে তাড়া করলে, সেও দৌড়ায়। পাখপাখালি গমের জমিতে উড়ে এলে হাঁ হাঁ করে তেড়ে যায়, পোকামাকড়ের বড় উপদ্রব। তার এক কথা, বিষম বিপাকে পড়েছি হে।

এই বিপাক মাসখানেক ধরে দৌড় করাচ্ছে তাকে। তা তুই আবাগির বেটি বুঝলি না, তোর বাপ মুখ দেখায় কী করে! শিরে বজ্জাঘাত। এখন আমি তাকে পাই কোথা!

—হা শুনছ বাবা!

—কে?

—আমি তোমার খুড়ামশায়।

—কিছু কবেন।

—আরে দেবীর খোঁজ জানো!

—ওতো নলহাটির কাছে কোথায় থাকে!

—তারে যে একখান খবর পাঠাতে হয়।

তারপরই চুপ, খবর কেন! কিসের খবর!

মাখন কুণ্ডু দেবী-ঠাকুরের খবর জানতে চায় কেন! খবর পাঠাতে চায় কেন!

পাড়া প্রতিবেশীরা কেমন চুপ মেরে গেছে। সৃষ্টিছাড়া কাজ হয়ে গেল যে, উঠোনের মাঝখানে অপকম্মটা সেরে গেল। ধূপ ধুনোর তো খামতি নেই। সকাল থেকে তার কাজ, জমিতে যে দিনে যা লাগে সবকিছুর জন্য ছোটাছুটি। গোরুর দুধ ধরে—তা অভাব অনটন আছে, ছানি মানি ধানি তিন কন্যে, বড় পুত্র কাঁচরাপাড়ায় কলে কাজ করে, হপ্তার ছুটিতে এলে যেতে চায় না—লাগোয়া ঘরটায় উঠতি যুবকেরা তখন ভিড় বাড়ায়—কিসের গরমে সে বোঝে। শরীরে গরম ধরলে এটা হয়।

মানুষটা সব বুঝেও চুপচাপ ছিল। ছানি মানি ধানি তিনজনাই সোমত্ত, গায়ে গরম ধরে গেছে। পুরুষ মানুষ বড় সংক্রামক ব্যাধি, এলেই গায়ে তাপ বাড়ে। তা বাড়ছিল, বেশ কথা। বাড়তে বাড়তে আগুন লেগে যাবে, মুখপুড়ি রাক্ষুসী তোর এ কথাটা মনে এল না। পেটের মধ্যে, আগুন গিলে বসে আছিস, কে নেভায়।

সহসা তার আর্তনাদ, কার কাম ক দিকি, মুণ্ডু ছিঁড়ে আনি!

ছানি মুখ থুবড়ে বসে পড়েছিল সেদিন। বমি, গা গোলায়, তা তুই কুমারী মেয়ে, আমিতো বসে নেই—বয়স হলে গোরু বাছুরের মতো পাল খাওয়াতে হয়, মনুষ্য সমাজে বাস, শাঁখা, সিঁদুর লাগে, আর লাগে হলুদ বাটা, আম্র পল্লব—শামিয়ানা টানাতে হয়, তার নীচে আগুনের

কুণ্ডু, হোম দু-হাতের মিলন, তারপর যদৃচ্ছ আচরণ, যেমন খুশি পা তুলে নামিবে, উপুড় করে কিংবা উটের মতো মুখটি তুলে হাঁটো, কিছু বলার নেই—মাথা উঁচু করে হাঁটতে কষ্ট হয় না।

আগুন থাকলেও জ্বলে না।

—কার কাম? বল! বল পোড়াকপালি সর্বনাশী, দা খানা কোথায়, না বলিস তো দা দিয়ে গলাখানা কেটে ফেলব।

ছানি কী বলবে। ডাগর চোখে তাকিয়ে আছে। ধানি মানি বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে।—ও বাবা কী করছ, ও বাবা তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? বাবা বাবা!

মাখন কুণ্ডু তেড়ে যাচ্ছে আর বলছে, তার আগে আমি কেন গলায় দড়ি দিলাম না। তোদের মা থাকলে সে সব সামলাত! আমি কার কাছে যাই, কী করি। আবার হুংকার, বলবি না, কে করল। কোনো পাষণ্ডের কাজ। আমার এমন সুন্দর কন্যেটাকে নষ্ট করে দিল।

ছানি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। কিছু বলে না! খাচ্ছে না। দুপুরে দরজা বন্ধ করতেই গোলমাল, ও বাবা শিগগির, এসো। ক্ষোভে দুঃখে মাখন নিজের জমির আলে মুখ গামছায় ঢেকে শুয়েছিল। খায়নি স্নান করেনি, কোনোদিকে বের হয়ে যাবে ভাবছিল—তুই হলিগে ধরিত্রী। আবাদের সময় পার হয়ে যাচ্ছে বুঝি। তা পাত্রপক্ষের এত জুলুম আমি অভাবী মানুষ সামলাই কী করে!

—কী হল!

—শিগগির এস। দিদি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

আতঙ্ক। সে মাথার গামছাখানা হাতে নিয়ে ছুটেছিল। সুখো মিঞা রাস্তায়। গোরুর গাড়ি নিয়ে শহরে যাচ্ছে—তার সামনে পড়ে গিয়ে মানি ধানি জমির মধ্যে নেবে গেল।—বড়ভাই ছুইট্টে গ্যালো! কী ব্যাপার!

ধানি শাড়ির আঁচলে গা ঢাকছিল। বাবা দৌড়াচ্ছে। কথা কবার সময় নাই। ছুটতে ছুটতেই বলল, শকুন উড়তাছে সুখা ভাই।

—কোনখানে?

—বাড়ির মাথায়।

আসলে এই শকুনের ওড়াউড়ি তারা বড় হতে না হতেই টের পায়। চোখ দেখলে টের পায়। দিদি এখন পেটে আগুনের আগুরা নিয়ে বসে আছে, পেটে আগুনের আগুরা এবং এসব মনে হলেই ধানি মানির মনে হয়, সব শকুন। সব কটা শকুন। দেবীদা, অমর, গোপাল ছানু সব। ওরা কী টের পেয়ে গেল। দাদাটাও মাসখানেক বাড়ি আসছে না। কী যে করে। শাড়ির আঁচল সামলে তালগাছটার নীচে আসতেই কেমন আতঙ্ক—পা অসাড়। তবু টেনে টেনে যখন উঠোনে হাজির, দেখল দিদি আবার অক অক করে বমি করছে।

ধানির মনে হল, বমি পেয়েছে বলে রক্ষা, দরজা খুলে বমি করতে বের হয়েছে। না হলে সর্বনাশ।

মানি ফুঁপিয়ে কাঁদল দিদিকে জড়িয়ে। আর ঠেলাঠেলি, তুই কেন দিদি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলি,— এই দিদিরে, তুই কেন, কেন! দরজা বন্ধ করলে মাথা কুটে মরব বলে দিচ্ছি। বাবাতো এককামের নানির কাছে যাবে। সব সাফ হয়ে যাবে দেখবি! ভালো হয়ে যাবি। আসলে

এতটা কথা মানি বলতে জানে না। টের পেয়ে সেও গুম মেরে গেছিল। ধানির ফিসফিস কথাবার্তা—দেবীদা ছাড়া কেউ না। আসুক ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

তা হতেই পারে। মিলে যাত্রা দেখতে গেলে, দিদি একা বাড়ি ছিল। পুজোর দিনে শহরে ঠাকুর দেখতে গেলে দিদি একা বাড়ি ছিল। ফাঁকে ফোকরে ইঁদুর বাদুড় ঘরে ঢুকে গেছে। দিদি কিছু বলছে না বাবা গুম মেরে গেছে—মাঝেমাঝে একখানই কথা, বিষম বিপাকে পড়েছি হে।

তা সংসারে কন্যের বাপ হওয়াটা বড় দায় হে। এই একখান কথাও ত্রিভুবনে লঙ্কা কাণ্ড—কন্যেব জমিতে বীজ ফেলে তুই উধাও হলি। হারামির বাচ্চা। দেখি নাগাল পাই কি না।

গোপনে গোপনে সাফ করাব চেষ্টা, এক সকালে মাখন দুটো শেকড় এনে দিল ধানিকে। বলল, পাঁচ ক্রোশ হেঁটে গেছি হেঁটে এসেছি। নির্ঘাত পাতের কথা বলে দিয়েছে।

— ধানি বলল, শুধু বেটে খাওযালেই হবে।

—সঙ্গে নিরসিন্দাব পাতাব রস।

— আব কী।

—আব ত কিছু বলেনি।

সব গোপনে গোপনে, বাড়িগুলি ফাঁকা ফাঁকা বলে বক্ষা, প্রথম থেকেই গোপন রাখা গেছিল, কিন্তু শেযে আব পাবা যাযনি।

— এই দিদি বসটা খেযে নে।

ছানি পাশ ফিবে দেখছিল ধানিকে। হাতে কাচেব গেলাস নীল বঙেব রস। ছানির চোখ সাদা ধূসব, মুখ শুকনো, গলা টিপে আত্মহত্যাব চেষ্টা কবার সময মনে হযেছে, পেটে তাব আবাদ, সে মবে গেলে আবাদ নষ্ট। পাবেনি।

—এই দিদি ওঠ না।

ছানি শাড়িব আঁচলে মুখ ঢেকে বেখেছে।

—দিদি!

বাইবে বসে আছে মাখন কুণ্ডু।—নচ্ছার, কুলটা মেয়ে, বংশেব মুখে কালি দিলি! তুই মরে যা। মবে যা। সবই মনে মনে- -ত্রিসংসাবে তাব আর কে আছে? এই তিনটে কন্যে, কিছু হাঁস কবুতব, গোযাল গোরু বাছুর, জমি জমা—চাষা মানুষেব যা হয় লেপ্টে থাকার স্বভাব, এই তিন কন্যে নিযে সে লেপ্টে ছিল।—ছানিরে তুই একী সর্বনাশ করলি রে!

—দিদি ওঠ। খা। বাবা চিল্লোচ্ছে।

সহসা ছানি উঠে বসল, গ্লাসটা কেড়ে নিল ধানির হাত থেকে। তারপর উঠোনে ছুঁড়ে মারল। শেযে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। মাখন কুণ্ডু ভাবল, উঠে গিয়ে মেয়ে চুল ধরে টেনে আনে। আছড়ে পিছড়ে পেট থেকে পিছলে বের করে আনে এই কুলাঙ্গার ইতরটাকে। হাতের কাছে না পেয়ে দাঁত নিশপিশ করছে। যেন বেটা ভূত হয়ে উবে গেল। তাবপরই মনে মনে এক কথা, বিষম বিপাকে পড়েছি হে!

মাথায় চড়াৎ করে দেবী ঠাকুর এ-ভাবে হেগে দিয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি। বামুনের ব্যাটা তুই, আমার কন্যের এত বড় সর্বনাশ করলি। তা পঞ্চায়েতে গেলে হয়।

কে বলল পাশ থেকে, তুমি পাগল মাখন।

—আপনি কে গুরুঠাকুর?

[illegible]

[illegible] দেখতে পাচ্ছ না।

—এ আপনি আমার মাথার দিব্যি। তা বলেন, কী করব।

॥

মাখন খুঁজে দেখতে বের হয়ে গেল। সেই যে বের হয়ে গেল আর ফিরল না।

তারপর দিন যায়।

ছানি এক রাতে দেখে দেবী ঠাকুর হাজির।

ছানি বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে।

দেবী ঠাকুর বলল, এখান থেকে চলে যেতে হবে।

—কেন!

সবই গোপনে। রাতের গভীরে টোকা। ধানি ভেবেছিল, বাবা ফিরে এসেছে, দরজা খুলে দেখে বাবা না, দেবীদা।

ধানি প্রায় চাপা আর্তনাদ করে উঠেছিল, দিদি, দেবীদা!

ছানির পুষ্ট শরীর দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় কিছুটা রোগা হয়ে গেছে। তবু স্তন বেশ পুষ্টই আছে। এবং দেখামাত্র লোক এবং সংক্রামক ব্যাধির মতো শরীর অবশ হতে থাকলে দেবী ঠাকুর শিয়রে বসে পড়ল।

ধানি বলল, বাবা তোমায় খুঁজতে গেছে। মাস হয়ে গেল ফিরে আসছে না। বলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

ছানি পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ঘরে লণ্ঠন জ্বালা। কথা বলছে না।

ধানি বলল, এই দেবীদা দিদি না কেমন হয়ে গেছে। কারো সঙ্গে রা করে না।

দেবীর চারপাশে সতর্ক নজর। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, তোরা যা। আমি দেখছি কথা কয় কি না।

ধানি মানি ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বেশি রাতে পাশের বাড়ির পিসি এসে শোয়। আজ বারণ করে দিতে হয়। দাদা এসেছে। তোমার শুতে হবে না পিসি।

ঘর থেকে দু বোন বের হয়ে গেলেই ছানি বলেছিল, তুমি আসবে জানতাম।

সেই জানাজানি দুজনে রাতে ফের এক প্রস্থ ভালো করে হয়ে গেল। শরীরে গরম ধরলে আর সব অচল পয়সা। গরম মরে গেলে ছানি বাপের জন্য সে রাতে চোখের জল ফেলল। বাবা আর ফিরবে না আমার এমন বলে ভ্যাক করে ধানির মতো কিছুক্ষণ কেঁদেও নিল। দেবী ঠাকুর বুঝ প্রবোধ দিল। রাত থাকতে বের হয়ে পড়তে হবে। কাকপক্ষী টের যেন না পায়।

পরদিন সকালে দুই বোন উঠে দেখল, ঘর ফাঁকা। দরজায় শেকল তোলা।

বাপ গেল, দিদিও গেল।

শকুন উড়ছে।

শকুনের চোখ বড় তীক্ষ্ণ। সে শুধু উপরে উড়ে—গন্ধ শুঁকে বেড়ায়।

দুই বোন গলা জড়াজড়ি করে কাঁদল। প্রতিবেশীরা বলল, তোর দাদাকে খবর দে।

—দাদা আর আসবে না।

তা না আসতেই পারে। ছোঁড়ারই বা কী দোষ। বোনের এত বড় কলঙ্ক মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছে। বাপ নিখোঁজ। বোনটাও।

—কোথায় গেল।

দু বোন বলল, জানি না।

তবে জানে না বললে মিছে কথা বলা হবে।

নলহাটির ডাকবাংলোয় দেবী ঠাকুর কাজ পেয়েছে। চাপরাশির কাজ। দিদিকে নিয়ে সেখানেই তবে তুলেছে। কেবল রাতে বলেছিল, আমি যে নলহাটিতে আছি বলিস না।

দেবী ঠাকুরের বাবার মুদি দোকান বাজারে। পুত্রের প্রতি কোনোদিনই আবেগ বোধ করেনি। নষ্ট মেয়েছেলে তিনটের পেছনে দু-হাতে টাকা উড়িয়েছে। দোকান ফেল মারতে বসেছিল—সময়মতো রশি টেনে ধরেছে বলে রক্ষা। সেই থেকে দেবী ঠাকুর পলাতক।

বাড়ি জমিজমা চাষ আবাদ হাঁস কবুতব দুই বোন সামলায়। দুটো পেট। ধানি শাড়ি পরে। মানি ফ্রক। গাছপালার মতো শরীরে ডালপালা মেলছে। মুখে লাবণ্য, শাড়ি পরলে সুন্দরী ধানি, আলতা পরে মেলায় যায়। মানি ঘর ঝাঁট দেয়—দুধ দুইয়ে দিয়ে যায় নরহরি, আবাদ দেখে সুখো মিএগ—পুরুষ মানুষ এ-কামে সে-কামে বাড়িতে আসেই। নরহরি দুধ দুইয়ে নড়তে চায় না।—এক কাপ চা হবেনি ধানি?

—হবে না। বোসো না। কী কাজকর্ম ফেলে এয়েছ?

—আর বলিস না, বসার কী সময় আছে, টেনে এক ক্রোশ রাস্তা যেতে হবে।

নবহবি একা মানুষ। বিধবা পিসি নিয়ে সংসার। আচার্য বামুন। কাকচরিত্র জানে। গলায় তুলসিব মালা। দুধ দুয়ে ফের বসে, এক গেলাস দুধ পায়। বাকি দুধ রোজ। দু-বোনের কপালে দুধ বড় জোটে না।

নবহবিই বলেছিল, মাখনদা গেছে নৈঋত কোণে। বুঝলে অগস্ত্য যাত্রা। ওই যাত্রায় বের হলে ফেবা যায় না।

মানি ফ্রক গুটিয়ে বসলে মাখনেব মতো সাদা উরু দেখা যায়। বসেও। এই একটা লোভ আছে —তা বয়স একটু বেশি তার। ধানি শাড়ি পরে আলতা পায়ে দিলে দেবী জগদ্ধাত্রী। সে শুধু তাকিয়ে থাকে তখন। বলে তোমার বাবা বুঝলে ধানী একজন পুণ্যবান মানুষ। তা তিনি এখন সাধু সন্নেসী হয়ে গেছেন।

—তুমি দেখতে পাও। ধানি ভাবল, কাকচরিত জানে, বলতেই পারে।

—চোখ বুজলে, কে কোথায় আছে টের পাই।

—আমার দিদি কী করছে।

—ও একখান বারান্দা বুঝলে লম্বা। সামনে মাঠ। চারপাশে গাছপালা। ফুলের গাছ। সূর্যমুখী, গাঁদা, দোপাটি, বেলফুল। নানা গাছ। তোমার দিদির বাচ্চাটা বসে আছে। দিদি তোমার বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছে।

—কোথায় আছে বলতে পারো? কোন্‌দিকে?

—এই তোমার উত্তর পশ্চিমে কোণে। কী ঠিক না?

কী ঠিক না কথায় সায় দিতে পারে না মানি। দেবীদা নলহাটির কোথায় কোন্ ডাকবাংলোর চাপরাশি এটুকু শুধু জানে। নলহাটি কতদূর জানে না। কোন্‌দিকে জানে না।

কী করে যেতে হয় জানে না। খবর নেবে কাকে দিয়ে—এমনও মনে হয়। সংসারে দিদিটার কথা উঠলে নিজেরাও ছোট হয়ে যায়। শুধু গুম মেরে থাকা। বাবার জন্য ধানি মানি আর

অপেক্ষায় থাকে না। সুখো মিঞার এক কথা, বড়া ভাইর মাথায় আল্লার গজব নেমে এয়েছে। পথের টানে বের হয়ে গেল।

তারা এই পথের টানটা কী জানে না। থানা পুলিশে খবর দেবার লোক নেই। শুধু কেউ পথেঘাটে দেখা হলে এক প্রশ্ন, কী রে দিদি ফিরল? তোর বাবা।

ধানির আজকাল মনে হয়, এ-সব বলে শুধু লোক তামাশা দেখছে। নরহরিদাকে ধানি না পেরে একদিন বলল, মুখে পোকা পড়বে।

—কার মুখে। কী হল?

—আবার কার। আমরা নষ্ট মেয়ে বলে।

—তা বলবে। গার্জিয়ান না থাকলে বলে। এত করে বললাম, পিস্নিরে নিয়ে এসে তুলি, আমি থাকি, সুখো মিঞা বরগা করে, চাষ আবাদ করলে দেখবি কত ফলে। আমি একাই একশ। গার্জিয়ান না থাকলে শকুন ওড়ে।

কথাটা মন্দ মনে হয়নি ধানির।

শকুন উড়ছে। টাউনে ভালোবাসা ছবি চলছে। ধানি গেছিল শোভাদির সঙ্গে। শোভাদির বর ভালো মানুষ বুঝেই গেছিল। শোভাদিকে রিকশায় তুলে দিয়ে তার সঙ্গে হেঁটে ফিরেছিল। এক রিকশায় চারজন ধরবে না, শোভাদি তার জা। দুটো রিকশা একসঙ্গে—কত টাকা, ধানির কট কট করছিল—সে বলেছিল হেঁটেই মেরে দেব। তা সাঁঝ লেগে যাবে, লাগুক। শোভাদির বর বলেছিল সে না হয় আমি যাচ্ছি সঙ্গে। রিকশায় ওরা চলে গেলে বর মানুষটি বলল, টাউনে এলে, চা খাবে না।

—দেরি হয়ে যাবে। মানিটা একা।

আরে আবার কবে আসব।

লোভ তারও শরীরে আছে। কেমন যেন ঝিম ধরা জীবনে, একটু নেশা, রাত হয়ে গেছিল ফিরতে। রেলগুমটি পার হয়ে পঞ্চানন তলার রাস্তায় বলল, চল কারবালা দিয়ে সোজা মেরে দি। তা রাস্তা সংক্ষেপ হয়, ঝোপ জঙ্গল আছে, সেই ঝোপ জঙ্গলে ঢুকতেই হাত ধরে টানাটানি। গার্জিয়ান নেই বলেই এত সাহস।

মাথার উপরে শকুন উড়ছে।

ধানি বলল, সেই ভালো। পিসিকে এনে তোল। পাশের ঘরটায় থাকলে শকুন সব ভেগে যাবে।

ভেগে গেল ঠিক—তবে নরহরি ছেড়ে দেবার পাত্র না। জমিজমার লোভে এক রাতে ধানির হাত ধরে বলল, দেখলি তো। কী ফসল তোদের ঘরে তুলে দিয়েছি। নরহরিকে ঘাঁটাতে কে সাহস করে।

ধানি জানে, লোকটার কাগচরিত্র জানা। সে কী বুঝে ফেলেছে বছরখানেক যেতে না যেতেই টান ধরে গেছে। গলায় তুলসীর মালা, শুধু মালা বদল করে ক'জন বোষ্টম বোষ্টমীকে খাওয়ালেই কাজ সারা।

ধানির গলায় তুলসীর মালা উঠে গেল।

মানি এখন একা শোয়। কী ছিল, কী হয়ে গেল। জমি জমা নতুন সেটেলমেন্টে নরহরি নিজের নামে করিয়ে নিল। যে মালিক সে নেই, ক্যাম্প অফিসে গিয়ে এদিক ওদিক পয়সা দিয়ে

অধিকটা দিদির নামে, বাকিটা তার নামে লিখিয়ে বলল, আমি কারো বাড়াভাতে নজর দিই না। কারো পয়সা ছুঁই না। মাখন কুণ্ডুর নাতি ভোগ করবে জমি। বংশ রক্ষা না হোক, কন্যের পক্ষে বংশধর জমি ভোগ করবে। মাখন কাকার কত কষ্টের উপার্জন। একটা পয়সা হাত থেকে খসত না। দিন নেই রাত নেই খেটে খেটে মানুষটা কম রেখে যায়নি। তা শকুনে খাবে, হয়।

নরহরির যে কাগচরিত্র জানা, মানি সেটা বুঝেছিল, দিদি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করতেই। লোকটার তেজের কাছে মানি কাত। সে যেন ইচ্ছে করলে সত্যি বলতে পারে, তার বাপ আছে না মরে গেছে বলতে পারে। কুণ্ডুমশাইর নাতি হবে নরহরি আগেই গাওনা গেয়েছে।

মানি এক সকালে উঠে মুখ গোমড়া করে বসে আছে। বাজারে যাবে নরহরি। ছেলেটা তার কাঁধ থেকে নামছে না। সকাল বেলা, বেশ রোদ উঠেছে, শীতও জাঁকিয়ে পড়েছে। আর এ-সময় মানি গোমড়া মুখে বসে আছে দেখতেই বলল, আরে আমিতো আছি শকুন উড়ে দেখুক না।

মানি বলল, একটা কথা রাখবে নরহরিদা!

—এই সক্কালে তোর আবার কী কথা।

—না বলছিলাম, তোমাব তো কাগচরিত্র জানা, বলো না, বাবা এখন কোথায় আছে?

নরহরি ট্যারচা চোখে দেখল মানিকে। ডুরে শাড়ি পরে উঠোনের কোনায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে। সে যে বড় রসিকজন। এমন একটা গানের কলি গলায় ভেসে উঠল। বলল, বলব। তবে বসতে হবে। হুট করে সব বলা যায় না। রাতে জায়গা পবিত্র করে রাখবি—বসব।

এই পবিত্র করে রাখবি কথাটাতে মানির মনে শিহরন খেলে গেল। সে পবিত্র করেই রেখেছিল।

সকালে ধানি বলল, রাতে টের পেলে?

মানি বলল, কী জানি? জানি না।

ধানি বলল, একা ঘরে উনি কাগচরিত্র নিয়ে বসেছিলেন। ছেলেটাকে বুকের দুধ খাওয়াতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম—আমার আর জাগা হল না। সকালে উঠে দেখি তুই নিজেই কখন উঠে ঘর দোর লেপতে শুরু করেছিস। কী বলল?

মানির এক কথা, কি জানি! তোমার সোয়ামি বোষ্টম মানুষ, তারে আমি ঠিক বুঝি না। জিগাও না কী কয় দ্যাখো।

লোকটা সকালেই গোরু বাছুর নিয়ে মাঠে বের হয়ে গেছে। ফিরলে বলল, বাবার খবর পেলে। কালতো বসলে।

—বাবার খবরে আর কাজ কী? মানি আর বাবার খবর জানতে চায় না।

ধানি বলল, তাহলে বাবা আমার নেই? কাল পবিত্র জায়গায় বসে কী টের পেলে বল।

—বললাম মানিকে, তোর বাবা পথের টানে পড়ে গেছে। ফিরছে না।

—আর কী বললে?

—বললাম, তোর বাবা সবার ঠিকানায় গেছে।

—এখানে এসেছিল?

—ঘুরে গেছে।

—গাঁয়ে এসে বাড়ি না ঢুকে চলে গেল।

নরহরি হাসল। বসে আছে বারান্দায়। আসন পেতে। কোলে মাখন কুণ্ডুর নাতি। বংশধর। কন্যের পক্ষের। বলল, নাতির মুখ দেখে গেছে।

—বুবলার মুখ দেখে গেল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখল। রাস্তায় নিয়ে গেছিল মানি কোলে করে। লোকটা বলল নলহাটির রাস্তা চেনো।

—নলহাটি?

আরে হ্যাঁ। ওই রাস্তার খোঁজে গিয়ে দেখল, সবাই যে যার মতো বেঁচে আছে। সে কে? এই ভাবটা উদয় হতেই বিবাগী। সবারেই এক কথা কয়।

—কী কথা!

—রাস্তাটা কোন্‌দিকে। নলহাটির রাস্তার খোঁজ আর পায়নি।

—তবে যে বললে, সব দেখে গেল?

—এখন মাথায় অন্য পোকা। কারা এরা?

বষ্টুম মানুষের কথায় রহস্য—ধানি পাশে বসে শুনছে।

—এই ধর না, বড় পুত্র কাঁচরাপাড়ায় বাড়ি করে বউ নিয়ে সুখেই আছে। ছানি বছর না ঘুরতেই পেটে আর একখান। বাপের কথা কে মনে রেখেছে বল। মানি এতদিন অবুঝ ছিল। বলে হাই তুলল একটা। জমি জমা পেলে, ফনী ধরের বেটা রাজি। সেটাই শুধালাম মানিকে। মানি রাজি।

—কিন্তু বাবা গেল কোথায়? কী দেখলে পবিত্র জায়গায় বসে?

কেমন গম্ভীর গলা নরহরির। চুল কোঁকড়ানো চোখ জবাফুলের মতো লাল—রাত্রি জাগরণ গেছে হতেই পারে—কালো ধুমসো চেহারার মধ্যবয়সি মানুষ। কাগচরিত্র আর ঝোলা ছিল সম্বল। মানুষ ঠকিয়ে, করকোষ্ঠী বিচার করে পয়সা—সেই পয়সা থেকে বউ, জমি, বংশধর। ওই পর্যন্ত সে বোঝে। শরীর তার এমন খেলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার জন্য জমি জমা, গাই বাছুর, হাঁস কবুতর ছানি ধানি মানি লাগে—আর রহস্য এক ঘরে উদয়, অন্যঘর ফাঁকা।—তোদের বাপের শেষে অন্য রহস্য। দেখল, সবাই ত ভালোই আছে। সে না থাকলে সংসার অচল এই বিশ্বাসটা গেল মরে। সে বাড়তি মানুষ। নলহাটির খোঁজে যেতে যেতে পথের টানে ঘাটে অঘাটে কুখাদ্য খেয়ে মরে পড়ে থাকল বালির চরায়। শকুনে চোখ উপড়ে খেল। শেষে থানা পুলিশ, মর্গ—এই আর কী? মানুষের জীবন। জীবনের আর একখানা কাগচরিত্র। সব গরমে হয় বুঝলি না। গরম মরে গেলে কিছু থাকে না। তখন বালির চরায় মরা লাশ।

তারপর একেবারে চুপ নরহরি। চোখ বুজে আছে। আসন পিঁড়ি। সোজা, লম্বমান দেহ, যেন ইচ্ছে করলেই জ্যোতি বের করতে পারে। বহু দূর থেকে কথা বলার মতো সতর্ক বাণী—শকুন উড়ছে।

আবার সতর্ক বাণী, বুঝলি ধানি মানি, নলহাটি যাবার রাস্তা কেউ কেউ খুঁজে পায় কেউ পায় না। খুঁজতে গেলেই আউল বাউল হয়ে যেতে হয়। মরে যেতে হয়। শকুনে তার চোখ উপড়ে খায়।

দিনশেষে

বুদ্ধদেব গুহ

আগে জায়গাটি একেবারেই অন্যরকম ছিল। শ্রীমতী শিশুকালে অথবা প্রথম কৈশোরে বাবার সঙ্গে এসেছিলেন একবার। শাহারানপুর। নামটা অনেক বছর অবধি কানে লেগে ছিল। লাইট রেলওয়ে ছিল। গলুমামা, ডিরেক্টর অফ ওয়াগন এক্সচেঞ্জ পদ থেকে রিটায়ার করার পর এই লাইট রেলওয়েতেই হালকা চাকরি নিয়ে ছিলেন বেশ কিছু বছর। নিউ দিল্লি রেলস্টেশনের একেবারে পাশেই ছিল 'ডিরেক্টর অফ ওয়াগন এক্সচেঞ্জ'-এর অফিস। ভারতের বিভিন্ন এলাকার রেলপথের কাকে কত ওয়াগন দেওয়া হবে, কোথায় কত ওয়াগন পড়ে আছে এই সবের হিসেব থাকত মস্তবড় ঘরের দেওয়াল জুড়ে। রেল-বোর্ডের সদস্যরা এবং প্রত্যেক এলাকার জেনারেল ম্যানেজারেরা আসতেন ওখানে। মিটিং বসত। ডিরেক্টর অফ ওয়াগন এক্সচেঞ্জ পদাধিকার বলে, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনফারেন্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সেক্রেটারিও ছিলেন।

সে সব অনেক দিনের কথা হয়ে গেল। স্মৃতি এখন কুয়াশারই মতো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। গলুমামাও চলে গেছেন আজ কত বছর হল। মামিমা গেছেন তারও আগে। জীবনের শেষে যে এই শাহারানপুরেই এসে শ্রীমতীকে আস্তানা গাড়তে হবে তা তখন কি ভেবেছিলেন।

আশ্চর্য! এই সব পুরোনো দিনের কথা চলে-যাওয়া মানুষের কথা, ফেলে-আসা জায়গা, অনুষঙ্গর কথা, কেন যে বারবার দিনশেষেই মনে পড়ে! বড় নাতনি সুপা বাংলাতে খুবই ভালো। কবিতা-টবিতাও লেখে মাঝেমধ্যে। ওই বলেছিল একদিন, ওই সময়টুকুকে কী বলে জানো দিদা?

কি বলে? গোধুলি? সায়াহ্নকাল? প্রদোষ?

ওসব তো আছেই। অন্য একটি নামও আছে। তুমি তো শোনোওইনি।

শ্রীমতী চোখ থেকে স্টিলের ফ্রেমের চশমাটি খুলে, সাদা মাড়িবিহীন ইস্তিরিবিহীন শাড়ির খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, আমি আর কীই-বা জানিরে মেয়ে! তা বলবি, কি বলবি না তাই বল?

অর্যমা। পারলে না তো তুমি বলতে।

সেটা আবার কী শব্দ? বানান কি?

বললামই তো অর্যমা।

মানে কি?

বললাম যে! দিন আর রাতের মধ্যবর্তী ফালিটুকু। সূর্যর নামাবলির একটি টুকরো আর কী!

যত উদ্ভট্ট শব্দ তুই জোগাড়ও করতে পারিস বটে।

সুপা হেসে বলল, এই করেই তো যে কোনো ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয় দিদা। কত বিদেশি শব্দ এসে চুপিসাড়ে ঢুকে পড়ে অন্য ভাষায়। যে ভাষা তাদের গ্রহণ করে তারা নিজেদের অজানতে নিজেকেই সমৃদ্ধ করে।

হবেও না।

শ্রীমতী বললেন।

এমনই একটি বয়সে এবং মানসিকতাতে এসে পৌঁছেছেন এখন যে 'সমৃদ্ধি' শব্দটির আর বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই তাঁর কাছে। এমনকী ভিতরে ভিতরে এই শব্দটি সম্বন্ধে এক তীব্র অনীহাও বোধ করেন তিনি ইদানীং। 'সুন্দর পরিণতি, সমৃদ্ধি' এসব শব্দে বিশ্বাস তাঁর ভেঙে গেছে যৌবনাবস্থাতেই। সে সব অনেক কথা। ভাবতেও ভালো লাগে না। তবে তাঁর চোখকে, মানসিকতাকে যে তাঁর জীবনই বদলে দিয়ে গেছে তাও তিনি ভালোই বোঝেন। বলারও নেই কাউকে কিছুই। বিধিলিপি!

চললাম দিদা।

হঠাৎই বলল সুপা।

কোথায়?

ব্যাডমিন্টন খেলব।

যা।

সুপা চলে গেলে, চশমাটি নাকে লাগিয়ে বারান্দাতে বসে দিন ও রাতের মধ্যবর্তী ফালিটুকুর দিকেই চেয়ে রইলেন শ্রীমতী। কারখানার চোঙা দেখা যাচ্ছে। দূরে। এদিকে রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার। জামাই হিমঘ্ন এই কারখানাতেই কাজ করে। সাদামাঠা কাজই ছিল। আস্তে আস্তে উন্নতি করছে। নামে কারখানা কিন্তু তৈরি হয় নানারকম দুগ্ধজাত জিনিস। পাউডার মিল্ক, কনডেন্সড মিল্ক, পানির, দই, ঘি ইত্যাদি। পাশে কফি ও চকোলেটের কারখানাও আছে। দিনে নাকি প্রায় এক কোটি টাকার শুধু দুধই কেনে হিমঘ্নদের কোম্পানি। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা, রাজস্থান, দিল্লি এবং হরিয়ানা থেকে বিরাট বিরাট রেফ্রিজারেটেড ভ্যানে করে দুধ আসে। প্রথম প্রথম এসে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারতেন না শ্রীমতী। এখন আর বিস্মিত হন না। আসলে, বার্ধক্যের এই দোষ। মস্ত দোষ। বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে যাওয়ার পর জীবনে আনন্দ বলতে আর কিছুই থাকে না বোধহয়।

সুপা চলে যাওয়াতে শ্রীমতী খুশিই হলেন। দিনশেষের এই ক্ষণটিই তাঁর পুরোপুরি নিজস্ব। এই ফালিটুকুই তাঁর একান্ত সময়। এ ছাড়া আর কিছুমাত্রই নেই। সন্ধের আলো জ্বলে উঠলেই হয় তাঁকে রান্নাঘরে যেতে হবে, আর যদি মণি যায় রান্নাঘরে; কদাচিৎ যায়, তাহলে ওঁকে ছোট্‌কুকে নিয়ে পড়াতে বসাতে হবে। ছেলেটা ভালো হল না। জানেন না পরে পরিবর্তন আসবে কিনা!

তারপর প্রহরের পর প্রহর কাটবে। রান্নার পাট চুকবে। খাওয়া-দাওয়ার পাটও চুকবে। জামাই মেয়ে শোবার ঘরে গিয়ে দরজা দেবে। শ্রীমতী ছোট্‌কুকে নিয়ে শোন। সুপা শোয় আলাদা ঘরে। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো ওঁর এই সুন্দরী, বুদ্ধিমতী নাতনিটি বিশেষই প্রিয় শ্রীমতীর। ওর সঙ্গেই যা একটু গল্পগুজব। মণি এখানে একটা বাংলা স্কুল করেছে। যদিও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট তেরো। তবু তাদের বাংলা পড়িয়ে ও বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির অতি দ্রুত অপসৃয়মান অস্তিত্বকে বাংলা থেকে বহুদূর উত্তরপ্রদেশের এই কারখানার মধ্যে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। অবাঙালি মালিক এ বাবদে অনুদানও দেন। উনি বলেন, বাংলা ভাষা মহৎ ভাষা। বাঙালিরা খুবই বুদ্ধিমান। কিন্তু ফাঁকিবাজ।

স্কুল ছাড়াও নানারকম সামাজিক কাজকর্মও করতে হয়। সকাল আটটা থেকে সন্ধে ছ'টা অবধিই সে ব্যস্ত। মণি বাড়ির কাজ তাই বিশেষ করতেই পারে না। রঘুবীর বলে একটি দশ

বছরের ছেলে আছে। সেই শ্রীমতীর একমাত্র সহায়ক। নইলে সূর্য ওঠা থেকে সূর্যাস্ত অবধি এই সমস্ত সংসারের সবকিছু দায়িত্ব তাঁরই একার।

কখনও কখনও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে যে করে না এমনও নয়। কিন্তু পালানোর জায়গা যে নেই। যাঁদের কোথাওই পালিয়ে যাবার জায়গা নেই তাঁরা দৌড়োতে পারেন হয়তো, দ্রুত পায়ে ছুটে যেতে পারেন দূর-দুরান্তরে হারিয়ে যাবার পণ করে, কিন্তু তাঁদের লুকোনোর জায়গা বলতে সত্যি সত্যিই কিছু থাকে না। এমন মন্দভাগ্য যাঁরা তাঁরাই এই নির্মম সত্যর কথা জানেন।

পাঁচটার ভোঁ বাজতেই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। শিফ্‌ট বদল হবে। শিরীষ গাছেদের ইউক্যালিপ্টাস গাছের ছায়াদের আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই এখন। অন্ধকারে তারা একাকার হয়ে গেছে একটু আগে।

কালীপুজোর পর থেকেই বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। আলো জ্বলে উঠেছে ঘরে ঘরে, পথে, কারখানাব আনাচেকানাচে। হিমঘ্ন স্কুটারে করে বাড়ি ফেরে। শুনতে পাচ্ছেন যে কোম্পানি থেকে তাকে একটি মারুতি গাড়ি দেবে শিগগিরিই। দিলেই ভালো। জামাই বড় ভালোমানুষ। নিজের মা হারিয়েছিল ছেলেবেলায়, তাই শ্রীমতীকে নিজের মায়ের মতোই দেখে। বরং মণিরই একটু গোলমাল আছে। সুন্দরী, ভালো কথা বলে, সেতাব বাজাতে পারে, এই সব কারণেও হিমঘ্নকে একটু হেলা-ফেলাই করে। অন্য দু-একজন বিবাহিত পুরুষেরও চোখ আছে ওর ওপরে। সেটা মণি বেশ জানে এবং উপভোগ করে। এসব দোষ শ্রীমতীর ছিল না কখনও। মা এরকম, মেয়ে অন্যরকম। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর স্বামীই যে সব এবং একমাত্র তাঁরা এই জানতেন। তবে একথা ঠিক যে, সারাজীবন ভালোবাসা তেমন করে পাননি বলেই ওই বোধটির প্রতি বড়ই কাঙালপনা আছে শ্রীমতীর। হিমঘ্নব মতো স্বামীব ভালোবাসার অবহেলা তিনি সহ্য করতে পারেন না। অথচ করণীয় তো কিছুই নেই। নিজেদের সমস্যার সব সমাধানই নিজেরাই করা যায় কিন্তু পুত্র-কন্যাজনিত সমস্যাতে শুধু দুঃখিতই হওয়া যেতে পারে, তার প্রতিবিধানের শক্তি তো থাকে না।

শ্রীমতীর হাঁটুতে, হাতে, কোমরেও বড় ব্যথা। শীতে আজকাল বড়ই কষ্ট পান বাতে। হিমঘ্ন ছোট টিউব আর শিশিতে পাওয়া যায় এমন ওষুধ, মলম এবং তেল মাঝে মাঝে নিয়ে আসে। কোমরে হাতে ও হাঁটুতে মেখে উনুনের পাশে বসে থাকলে বেশ আরাম পান। কখনও কখনও হট-ওয়াটার ব্যাগ দিয়েও সেঁক নেন ব্যথার জায়গায়। ওষুধটার নাম 'সেনসুর'। ফল ভালো হয় বটে কিন্তু দামও অনেক। হিমঘ্নর মুখ দেখেই বুঝতে পারেন শ্রীমতী। একদিন বলেও ছিলেন, আর এনো না বাবা। হিমঘ্ন তাতে বলেছিল, আপনি তো মা আমার। আপনি চোখের সামনে কষ্ট পাচ্ছেন আর আমাকে বেশি দামের কারণে ওষুধ আনতে মানা করবেন সে কি করে হবে মা? আমার উপরে কোনোই কি দাবি নেই আপনার?

শ্রীমতী চুপ করে হিমঘ্নর দিকে চেয়ে থাকেন। যে-সব জামাই শাশুড়িকে মা সম্বোধন করেন তাঁদের সকলেই যে শাশুড়িকে মাতৃরূপে দেখেন এমন তো নয়!

ছেলেদেরই মতো জামাইদেরও অনেক রকম হয়। কিন্তু হিমঘ্নর 'মা' ডাকে কোনো মিথ্যে নেই। শেষ জীবনে জামাই-এর ঘাড়ে এসে পড়লেন বলে প্রথম প্রথম বড় কুণ্ঠিত, লজ্জিত হয়ে থাকতেন শ্রীমতী। এখন সেই ভাবটা কেটে গেছে, মুখ্যত হিমঘ্নরই গুণে। শ্রীমতী জানেন, মণিই, মেজাজ গরম থাকলে, কখনও সখনও অপমানকর কথা বলে দেয়। আর ঠিক তখনই পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় শ্রীমতীর, দূরে, বহুদূরে।

কিন্তু....।

২

সকলেরই খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। সব বাতিও নিভে গেছে বাড়ির। শ্রীমতীর পাশে ছোট্কু ঘুমোচ্ছে। একটি ছোট্ট টেবল-লাইট জ্বেলে নিয়ে শ্রীমতী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "মানবজমিন" উপন্যাসটি নিয়ে বসেছেন। কাল রাতে যতটুকু পড়েছিলেন, সেখানে একটি ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতা গুঁজে রেখেছিলেন। এই লেখকের লেখা খুব ভালোবাসেন শ্রীমতী। এঁর লেখার মধ্যে কিছু একটা আছে যা সমসাময়িক অন্য কারো মধ্যেই নেই। বড় বিধুর হয়ে যায় মন শীর্ষেন্দুর লেখা পড়তে পড়তে। সবে পাতাটি খুলেছেন এমন সময় হঠাৎ পাশের কোয়ার্টারের কেষ্টবাবুর ক্যাসেট-প্লেয়ার বেজে উঠল। অখিলবন্ধু ঘোষের গান "পিয়াল শাখার ফাঁকে ফাঁকে একফালি চাঁদ বাঁকা ওই তুমি আমি দুজনাতে বাসার জেগে রই"।

কেষ্টবাবুর বয়স শ্রীমতীর মতোই হবে। স্ত্রী-বিয়োগের পর তাঁর মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। ভাগনে মদনের কাছে থাকেন। সংসারে আর কেউই নেই। মদনের মতো মামাগত প্রাণ ছেলে আজকাল বড় দেখাই যায় না।

ওই সব গান শুনলে বড় স্মৃতিদংশিত হয়ে ওঠেন শ্রীমতী এই শাহারানপুরে বসে। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের দক্ষিণ কলকাতার একটি নির্জন মধ্যবিত্ত পাড়া যেন বুকের মধ্যে উঠে আসে। দুবছরের আদুরি সন্তানের মতো। মানুষ এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গেলে যেমন উদ্বাস্তু হয় তেমন এক শহর ছেড়ে অন্য শহরে গেলেও হয়, এক পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় গেলেও। এই ছেড়ে যাওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে যে কী গভীর কষ্ট তা শ্রীমতী ভালো করেই জানেন।

বইটা খোলাই পড়ে থাকে। মন উদাস হয়ে যায়। কেষ্টবাবুর ক্যাসেট-প্লেয়ারে একের পর এক গান বাজতে থাকে। সুধীরলাল চক্রবর্তীর, ধনঞ্জয় ভট্টাচায্যির, রবীন মজুমদারের, উৎপলা সেনের, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। "ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে, তোমারে করেছে রানি"।

আরও কত গান।

জানালার কাছে সরে এসে দাঁড়ান শ্রীমতী। কেষ্টবাবু আর শ্রীমতীদের জগৎ হিমঘ্ন-মণি-সুপা-মদনদের কাছে সম্পূর্ণই অপরিচিত। তবু গান এমনই জিনিস যে তা কখনই পুরোনো হয় না। যাঁদের কানে সুর আছে, সুরে গাওয়া যে কোনো গানই তাঁদের মুহূর্তমধ্যে হরিণ-হরিণীর মতো তিরবিদ্ধ করতে পারে। ভালো গানের কোনো বয়স নেই। বয়স হয় না।

কলকাতার কথা, মোঘলসরাই-এর ট্রেন ইন্সপেক্টর পরাণবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ার আগে তাঁর কুমারী জীবনের কথা, মধুপুরের অশেষ সচ্ছলতার মধ্যে থেকে হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হয়ে অসচ্ছলতার দংশনের অনভ্যস্ততার মধ্য দিয়ে এসে অভ্যস্ত হওয়ার সেই সব অস্বস্তিকর দিনগুলির কথা মনে ভিড় করে আসে।

তবে কি শুধু কষ্টই ছিল? না। তা নয়। সুখ বা দুঃখ কোনোটিই অবিমিশ্র তো নয়। কখনও কখনও হয়তো একে অন্যকে চেপে থাকে, আড়াল করে রাখে। তবে নাড়লে-চাড়লেও চোখে পড়ে তা। অনুভূত হয়। জীবনের প্রায় শেষে পৌঁছে এ কথা বুঝতে পারেন শ্রীমতী।

সুপা একটি পত্রিকা এনে দিয়েছিল। কলকাতা থেকে বেরোয়। সম্ভবত পাক্ষিক। বলেছিল,

তোমার বোনপো একটা লেখা লিখছে, দ্যাখো দিদা। তাতে তোমাদের সময়ের অনেক কথা আছে।

শ্রীমতীর মাসতুতো দিদির ছেলে ন্যাপা এখন নামকরা লেখক। ভাগলপুরে থাকত রিনি দিদিরা। জামাইবাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। ন্যাপাকে নিয়ে তখন ওঁদের সকলেরই গর্ব। কিন্তু দেখাশোনা নেই প্রায় চল্লিশ বছর। সুপা বলে চিনবেনই না তোমাকে তিনি। আমাদের তো চোখেই দেখেননি। মাকেই দেখেননি আর আমাকে। তাছাড়া মানুষে একটু একটু নাম করে ফেললে আর সাধারণ আত্মীয়দের চেনেন না। দোষও হয়তো দেওয়া যায় না। ব্যস্তও তো হয় পড়েন খুবই।

মণি বলে, বড়লোক হয়েছে। শুনি, যোধপুর পার্কে থাকে। বাড়ি-গাড়ি করেছে। এখন শাহারানপুরেব শ্রীমতী মাসীমার খবর নিয়ে বা তাঁকে স্বীকার করেই বা তার লাভ কি?

শীর্ষেন্দুর "মানবজমিন" বড় গভীর বই। হেলাফেলায় তা পড়া যায় না, পড়া উচিতও নয়। লাইব্রেরি থেকে আনা বই না হলে শ্রীমতী দুতিন মাস ধরে রয়েসয়েই ও বই পড়তেন। মনটা কেষ্টবাবুর গানে বড়ই বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। উনি বই বন্ধ করে ওই পত্রিকাটি তুলে নিলেন। ন্যাপার লেখাটি পড়ে শ্রীমতীর বুকটা ধক করে উঠল।

ন্যাপা লিখেছে : "সেই কচি বয়সে প্রেম কাকে বলে তা আমি জানতাম না। তবে মেজমামাকে হঠাৎ হঠাৎ বড় জেঠিদের বাড়িতে দেখতাম। শ্রীমতী মাসি, বড় জেঠির ছোট বোন খুব হাসতেন। সুন্দরী ছিলেন খুব। কোনো কোনোদিন ছাতে ওঁদের দুজনকে গল্প করতে দেখতাম। নইলে উনি অন্য সময়ে ভীষণ রাগি আর রাশভারি ছিলেন। কথায় কথায় ঘুসি মেরে লোকের নাক ফাটিয়ে দিতেন। পাড়ার লোকে বলতো ঘেটো গুন্ডা। মেজমামার বয়সই বা কত ছিল তখন? বাইশ তেইশ।

কানাঘুষোয় শুনলাম যে মা-বাবার আপত্তির কারণেই মেজমামা আর শ্রীমতী মাসির বিয়ে হওয়াটা সম্ভব নয়। আমরা বসু আর বড় জেঠিমারাও বসু রায়। এক পদবি এক গোত্র, অতএব বিয়ে নাকি হতেই পারে না।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি মেজমামা খাটের ওপর শুয়ে ফুলে কাঁদছেন। যে ঘেটো গুন্ডা কথায় কথায় অন্য মানুষের নাক ফাটিয়ে দেন অবলীলায় ঘুষি মেরে, সেই মানুষকে কোন অজানা কষ্ট, কোন্ বেদনা এমন ক্লিষ্ট ও ব্যথাতুর করতে পারে তা ভেবে কোনো কূলকিনারাই পেলাম না। বড়ই কষ্ট হল আমার দেখে। কী সে এমন কষ্ট যার দংশন এমন বেদনাহীন?

সেই যে শ্রীমতী মাসির সঙ্গে বিয়ে হল না, মেজমামা তাই আজীবন অকৃতদার রইলেন। শ্রীমতী মাসিকে কোনোদিনই ভোলা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। জানি না শ্রীমতী মাসি এখন কোথায় থাকেন? কেমন আছেন? আমরা শুনেছিলাম, রেলে কোনো কর্মচারীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে তিনি চলে গেছেন দূরের কোনো বড় জংশানে।

আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই যেত রেলগাড়ি। লক্ষ্মীকান্তপুর, জয়নগর, ক্যানিং এবং ডায়মন্ড-হারবারের গাড়ি। রেলগাড়ি গেলেই, মেজমামা যদি বাড়ি থাকতেন সেই সময়ে, তাহলে একদৃষ্টে সেদিকেই চেয়ে থাকতেন। কখনও গান গাইতেন : "মোর অনেক দিনের আশা আমি বলব কানে কানে", কখনও বা গাইতেন, "দিয়ে গেনু বসন্তের গানখানি"। অথবা "চৈত্র দিনের ঝরাপাতার পথে"। "ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি।" পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া, "ওরে আয়। আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায়।"

মেজমামা কোথাও গান শেখেননি কোনোদিনও। সিনেমাতে শুনে বা রেকর্ড শুনেই তিনি গান তুলে নিতে পারতেন। গলায় অসাধারণ দরদ ছিল। স্বরলিপির ওপরে সুর বোলানো আর গানের মধ্যে যে অনেকই তফাত তা ওই অল্পবয়সেই মেজমামার গান শুনেই আমি বুঝেছিলাম। তাছাড়া দ্রুতগামী ট্রেনের দিকে চেয়ে গাওয়া লোহার চাকার শব্দে মাড়িয়ে যাওয়া সেই সব গান তো ঠিক গান ছিল না, ছিল শ্রীমতী মাসির প্রতি নৈবেদ্যও। অর্ঘ্যকুসুম। শরতের ভোরের শিউলি। বসন্তের সকালবেলার আলোর মতো, হাওয়ার মতো ভালো। কিন্তু বড়ই স্বল্পস্থায়ী। বিরহী যক্ষের প্রেমের বার্তা বইতে মেঘ আর মেজমামার হারানো প্রেমের বার্তা উদ্দিষ্ট হত জোরে-ছোটা রেলগাড়ির প্রতি। যদি তারা সেই বার্তা বয়ে নিয়ে যায়।

অকৃতদার মেজমামা বহু বছর পরে যেদিন হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাকে চলে গেলেন : সেদিন আমরাই তাকে চন্দন-টন্দন দিয়ে সাজিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে কেওড়াতলায় নিয়ে গেলাম। দাদারা কাউকেই প্রায় খবর দেয়নি। কেন দেয়নি তা জানি না। খুবই তাড়াতাড়ি তার শেষকৃত্য হল।

আমার মনে হয়েছিল, শ্রীমতী মাসিমাকে একবার যদি খবর দেওয়া যেত! কিন্তু তিনি কোথায় যে থাকেন তা পর্যন্ত জানি না। খবরটা দিই বা কি করে!"

এই অবধি পড়েই শ্রীমতী থামলেন।

বুকের মধ্যে এক অব্যক্ত কষ্টবোধ করলেন। বুকের গভীর থেকে "আঃ" করে একটি আর্ত চিৎকার উঠে এল। কিছুতেই তাকে চাপতে পারলেন না। মিতভাষী নিচুস্বরে কথা-বলা শ্রীমতী বুঝতেই পারেননি যে চিৎকারটি এমন জোর হয়ে যাবে। মণি তাদের শোবার ঘরের দরজা খুলে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, কি হল মা?

দরজা খোলো। দরজা খোলো। শ্রীমতী ভিতর থেকেই লজ্জায় অধোবদন হয়ে বললেন কিছু হয়নি। শো গিয়ে তুই। স্বপ্ন দেখেছিলাম। খুব খারাপ স্বপ্ন।

এরকম বিধ্বস্ত অবস্থাতে মেয়ের সামনে বেরুবার কোনোই ইচ্ছা ছিল না শ্রীমতীর। জামাই হিমঘ্নও নিশ্চয়ই জেগে গেছে। ভারী লজ্জা পেলেন উনি।

মণি বলল বিরক্তির গলায়।

এ আবার কি উদ্ভট স্বপ্ন, ছোট্কু জেগে গেছে?

শ্রীমতী বললেন, না, না, ও ঘুমুচ্ছে।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে কুঁজো থেকে গড়িয়ে জল খেলেন দু-তিন গ্লাস ওই ঠান্ডাতেও।

মণি চলে গেলে, কিছুক্ষণ পরে, যথাসম্ভব কম শব্দ করে নিজের তোরঙ্গটি খাটের তলা থেকে বের করে খুব ভালো করে খুঁজতে লাগলেন চামড়ার মোটা ঠিকানার বইটি। ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। তবু কত মানুষের কত দিনের সব ঠিকানা লেখা তাতে। অনেক মানুষই আর নেই। যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগও নেই। কিন্তু ঠিকানাগুলির দিকে চাইলে কত মুখ কত সুখ এখনও ঝলমল করে ওঠে। কতগুলো বছর যে কেটে গেছে গিরিডির, মধুপুরের, কলকাতার, দেওঘরের। খুঁজতে খুঁজতে পেলেন যতীন জামাইবাবুর কলকাতার ঠিকানাটা। ওই বাড়িতেই ন্যাপা এবং ন্যাপার বোন লতার বিয়ে হয়েছিল। ন্যাপার বিয়ের সময়ে তাঁর ভাসুরঝির বিয়ের জন্যে কলকাতায় গেছিলেন বলে ন্যাপার বিয়েতেও থাকতে পেরেছিলেন। সে বাড়ির ঠিকানাটা লেখা ছিল যদিও। ন্যাপার নতুন বাড়ির ঠিকানা ওঁর কাছে নেই।

তখনি একটা পোস্টকার্ড নিয়ে বসলেন। কলম ছিল না, তাই পেন্সিলেই লিখলেন।

স্নেহের বাবা ন্যাপা,

তুমি আমাকে চিনতে পারবে কিনা জানি না এত বছর পরে। আমি তোমার শ্রীমতী মাসি। 'লিখন' কাগজে তোমার লেখা পড়লাম। আমার নাতনি সুপা একটি সংখ্যাই নিয়ে এসেছিল। তোমার মেজমামা কবে চলে গেলেন? কি হয়েছিল তাঁর? যদি জানাও তো ভালো হয়।

তোমাকে অনেক কথা বলার ছিল। এ চিঠির জবাব যদি দাও তোমার ঠিকানা জানিয়ে তবেই তা সম্ভব হবে। তোমার ঠিকানা জানিয়ো।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

আঃ ইতি শ্রীমতী মাসিমা।

আমার ঠিকানা :

Mrs. S. Ghosh Dastidar

C/o. Mr. H. Bose, Qtr B II

Indiana Spices and Food Ltd.

P. O. Saharanpur, U. P.

চিঠি লেখা শেষ করে আবারও একবার জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন উনি। কেষ্টবাবু এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধহয়। মদনের আজ বোধহয় নাইট ডিউটি। কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেষ্টবাবু জেগে থাকলেও বা কী! মানুষ-মানুষীর জীবনে একটা সময় আসে যখন দিনরাত এবং সময়ের সব হোঁস চলে যায়। শ্রীমতীরও যাবে। উনি জানেন।

পথের মার্করি ভেপার ল্যাম্পের বাদামি আলো গাছগাছালি, বাড়ি ঘর, পথ, বাগান সবকিছুকেই একধরনের বাদামি অপার্থিবতাতে ভরে দিয়েছে যেন। এমন গভীর রাতেই ফিসফিস করে শিশির পড়ার শব্দে জানালায় দাঁড়িয়ে ফেলে আসা জীবন, ফেলে আসা প্রায় ভুলে যাওয়া ভালোবাসার জনকে মনে করা যায়। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। ঘোরা যামিনী। অথচ মার্করি ভেপারের আলোর জন্যে তারাও দেখা যায় না। কাছে আলোর রোশনাই বলেই আলোর পরিধির বাইরে অন্ধকার আরো অনেক ভারী।

শ্রীমতী ভাবছিলেন, তাঁর নিজের আকাশও তারাহীন। কৃষ্ণা চতুর্থী নয়, অমাবস্যা; ঘোরা। ন্যাপাকে লেখা পোস্টকার্ডটিতে ঠিকানা লিখে বারবার পেনসিল দিয়ে নাম-ঠিকানাটা বোলাতে লাগলেন। তারপরই ভাবলেন, এই চিঠি কি পোস্টকার্ড-এ লেখা ঠিক হবে? যতীন জামাইবাবুর ছেলে-বউমারা, অন্যান্যরা, আত্মীয়রা কি মনে করবেন। অন্যের বিধবা, মৃত হলেও, অকৃতদার পরপুরুষের খোঁজ করছেন এই অপরাধ তো খুনের অপরাধেরও বাড়া। টিটকিরি দেবে হয়তো ওরা। কেউ হয়তো তার ঠিকানা জেনে যাওয়াতে মণির কাছে চিঠিও লিখতে পারেন। তাহলে মণি হয়তো বাড়ি থেকে তাঁকে তাড়িয়েই দেবে। জামাই হিমাদ্রিও বা কী মনে করবে?

নাঃ। এ চিঠি পোস্টকার্ডে লেখা যাবে না।

এ কথা ভেবেই পোস্টকার্ডটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লেন। তারপর ছোট্‌কুর স্কুলের খাতা থেকে চৌর্যবৃত্তি করে দুটি পাতা এমনভাবে ছিঁড়লেন যাতে ছোট্‌কুর স্কুলের দিদিমণি অথবা মণি বুঝতে না পারে। তারপর নতুন করে চিঠি লিখতে বসলেন।

এই চিঠিটা খুব বড় হয়ে গেল। লেখা শেষ হলে, বারবার পড়লেন চিঠিটা। প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেছে। কোথায় চলে গেল মানুষটি কে জানে! কি এমন ভালোবাসতো যে সারাজীবন

বিয়ে না করে অভিমানে এতদিন একা কাটিয়ে অভিমানেই চলে গেল। এ কেমন ভালোবাসা! নিজেরও বিয়ে হয়েছিল, ছেলেমেয়ে, বউ, জামাই। চারধারেই তো কত প্রেম-করা বিয়েও দেখেন। মণিও তো প্রেম করেই বিয়ে করেছিল। কিন্তু কই? সেই সব বিয়ের মধ্যেও তো বিশেষ কিছু দেখেন না। কোন্ অপার রহস্য ও দুর্জ্ঞেয় ভালোবাসা বুকে করে একটা মানুষ চল্লিশটা বছর শুধু এই হতভাগিনী শ্রীমতীকে মনে করে কাটিয়ে গেল? কী এমন যোগ্যতা ছিল তাঁর? কী এমন রূপগুণ?

শ্রীমতী আবারও উঠলেন। ওই চিঠিটিকেও কুচিকুচি করে ছিঁড়লেন। তারপর জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঘুমন্ত, নিস্তব্ধ, শিশিরপড়া রাতের দিকে চেয়ে বড় বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন শ্রীমতী। ঠিক বুঝতে পারলেন না, উনি জিতলেন না হারলেন! ঘেটো বসু তাঁকে এত বড় সম্মান দিয়ে তাঁকেই বড় করে গেলেন, না নিজেকে?

ঠিক করলেন ন্যাপা-ট্যাপাকে চিঠিফিটি লিখে যা এত বছর নিভৃতে ছিল বুকের ভিতরে তাঁরই নিজস্ব হয়ে; তাকে আর বাইরে আনবেন না।

বাগানের এপিঠে আলো, ওপিঠে অন্ধকার। অন্ধকারের ওপিঠ থেকে একটি তক্ষক বলে উঠলো, ঠিক! ঠিক! ঠিক!

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আমার ছেলে অন্তু—মহা শয়তান ছেলে—ছাদ থেকে আমাকে ডাকছিল। চেয়ে দেখি আলসে থেকে ঝুঁকে সে বাইরের দিকে বাড়ানো হাত নাচিয়ে বলছে, 'বাবা, বৃষ্টিং পততি।' মিটমিটে ডান্‌-এর মত হাসছিল—খানিকটা ইয়ার্কির ভাব। কখন মেঘ করেছে আমি টের পাইনি। সারা দুপুরে ঝুলবারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে থেকে থেকে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন দেখি সামান্য বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নিচু মেঘ। গলির মুখের রাস্তা থেকে কুয়াশার মতো ভাপ উঠে আসছে। অন্তু ঝুঁকে আমাদের দেখছিল। বললাম, 'ওখানে কি করছ তুমি?' তেমনি ঠাট্টার মতো করে বলল, 'ঘুড়ি ওড়াচ্ছি।' সন্দেহ হল ও আমাকে নিয়ে খেলছে। বললাম, 'নেমে এসো।' উত্তর দিল না। তেমনি হাসছিল। অন্তুর ছাদে যাওয়া বারণ। এটা পুরোনো বাড়ি—আলসেগুলো তেমন জোরালো নয়—তা ছাড়া বৃষ্টিতে এখন সবকিছুই খুব পিছল। কিন্তু যেদিকে বারণ, অন্তু সব-সময়ে ঠিক সেই দিকে চলে যাবে। আমি দেখছি, ওকে ঠেকানো যায় না। প্রায় আপনমনে বললাম, 'তবে থাকো। তোমার জ্বর হবে।' ও এবার শব্দ করে হাসল, 'তুমি ঘুমোচ্ছিলে। আমি দেখলাম তোমার নাল গড়াচ্ছে।' অন্তুর মাথার উপর মেঘ বড় উজ্জ্বল। তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল বলে আমি খবরের কাগজে চোখ আড়াল করে ওর দিকে দেখলাম, 'অন্তু, নেমে এসো বলছি। কথা কানে যাচ্ছে!' ও গম্ভীর মুখ করে আলসের ধার থেকে মুখ লুকিয়ে বলে, 'আমি তো বলে এসেছি।' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কাকে!' ওর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়, 'তোমাকে।' আমি ইজিচেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে গিয়েও থমকে গেলাম। মনে পড়ল না, আধোঘুমের ভিতরে আমি ওকে যেতে বলেছিলাম কিনা। নিজেকে আমার ঘোর সন্দেহ হয়। হতাশ হয়ে আমি আবার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসি। মুহূর্তের মধ্যেই বৃষ্টির জোর বাড়ল। অন্তুর পায়ের শব্দ শোনা গেল—ছাদময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অন্তুর জন্য নয়—প্রতিভার কথা ভেবে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রতিভা অফিস থেকে এসে যদি শোনে—অন্তু ছাদে গিয়েছিল—ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকাবে, দু'-একটা বাঁকা কথা বলতে পারে। কিন্তু রাস্তা থেকে ধোঁয়ার মতো ভাপ ঝুলবারান্দায় উঠে আসছিল, আমার পায়ের কাছে চূর্ণ বৃষ্টির ছাট, জলকণা ও ভারী বাতাস আস্তে আস্তে আমার মাথার ভিতরে জট পাকিয়ে দিল। চোখের পাতায় ঘুমের আঁশ ঝুলে আছে—নাকি বৃষ্টি! চোখ বুজতে মুহূর্তেই ঘুম ও স্বপ্ন আমাকে টেনে নেয়। দেখি, প্রবল বৃষ্টির ভেতর অন্তুর মুখ আলসে থেকে ঝুলে আছে। মাথা মুখ ধুয়ে জল পড়ছে। আমি ওর দিকে চেয়ে হাসলাম। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম রাস্তায় কেউ নেই, বাড়ি-গুলোর জানলা বন্ধ। আমি অন্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'অন্তু, দ্যাখো তো কার্নিশটা কি খুব পিছল?' ও একটু হেসে কার্নিশে হাত বুলিয়ে বলল, 'খুব। কেন?' আমি হাসিঠাট্টার ভাব বজায় রেখে বলি, 'আমি ছেলেবেলায় কার্নিশের ওপর কত হেঁটেছি। প্রথম প্রথম ভয় করে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা খুব সোজা—'। ও তেমনি সকৌতুকে আমাকে দেখছিল। উত্তর দিল না। আমি কোনোক্রমে উত্তেজনা চেপে রেখে বললাম 'তুমি পারো?' ও কথা না বলে মাথা

ঝাঁকিয়ে জানাল—পারবে। বললাম 'তোমাকে একটা প্রাইজ দেবো, যদি উঠতে পারো।' অন্তু খুব জোরে হেসে উঠল, 'পাগল। মা টের পেলে—'। আমি খুব হতাশ হলাম। অন্তু জানে, আমি প্রতিভাকে একটু ভয় করি। অন্তু এমন অনেক কিছু জানে বলে আমার সন্দেহ হয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ সন্দেহ হয়, ও ওর নকল হাসির আড়ালে ভ্রু কুঁচকে ভেবে দেখবার চেষ্টা করছে—ওর মা ও বাবার সম্পর্ক কতখানি আন্তরিক। সন্দেহ হয়—অন্তুকে আমার খুব সন্দেহ হয়। খানিকক্ষণ আমাকে দেখে নিয়ে অন্তু হঠাৎ বলল, 'বাবা, দ্যাখো—'। তাকিয়ে দেখি, অন্তু হাল্কা শরীরে টপ করে আলসের ওপর উঠল। 'শাবাশ—' চাপা গলায় বললাম। ঝাপসা বৃষ্টির মধ্য দিয়েও দেখা গেল অন্তু চারতলার কার্নিশের ওপর দিয়ে হাঁটছে—টালমাটাল ওর শরীর, দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দেওয়া—মুখে সেই ঠাট্টার হাসি। একেবারে কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল ও, একটা পা শূন্যে বাড়িয়ে দিয়ে অন্তু হঠাৎ মুখ ফেরাল। আমি অত বৃষ্টির ভিতরেও ওর অসম্ভব গম্ভীর মুখ দেখতে পাই। ও বলল, 'বাবা', একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে একটা আঙুল তুলে আমাকে নির্দেশ করে বলল, 'তুমি...একটা পাগল...।' সেই মুহূর্তেই হাওয়া এসে ওকে ভাসিয়ে নিতে পারত, বৃষ্টি ধুয়ে দিতে পারত ওকে। কিন্তু ও নিজেই লাফ দিল। বাইরের দিকে নয়, ছাদে লাফিয়ে পড়ল অন্তু। ওর হা হা হাসির শব্দ সারা ছাদময় ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনে আমি হিম হয়ে গেলাম।

অসম্ভব ঘাম ও গরমের ভিতর ঘুম ভাঙতেই টের পাই অন্ধকার হয়ে এল। প্রতিভা অফিস থেকে ফিরেছে, শাড়ি বদলে এখন আঁচল দিয়ে মুখ মুছছে, এক্ষুনি বাথরুমে যাবে। এই সময়ে আমি প্রতিভাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি। এই সময়ে ও খুব শান্তভাবে কথা বলে। স্নান করে ও যথানিয়মে রান্নাঘরে যাবে। বেচারা!

অন্তু কোথায় থাকতে পারে আমি মনে মনে খুঁজে দেখছিলাম। ঝুঁকে দেখলাম রাস্তায় নেই। আমি ঘরে এলাম। প্রতিভা সঙ্গে সঙ্গে খাট ছেড়ে উঠল, তোয়ালে আর সাবান তুলে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। খাটের ওপর ওর ব্যাগ-ট্যাগ ছড়ানো রয়েছে। দেখি অফিস-লাইব্রেরি থেকে ও একটা বাংলা বই এনেছে—উপন্যাস। প্রতিভা বইটই পড়ে না—সময়ও পায় না। এটা আমার জন্য। বেশ মোটা বই—মনে হল, হালকা বিষয় নিয়ে লেখা। এমন মোটা ও হালকা বই আমার পছন্দ—অনেকদিন ধরে পড়া যায়, আর মনের ওপর তেমন চাপ পড়ে না। আমি পত্রিকায় রাহাজানি, সুখ-দুঃখ, পলিটিক্সের খবর বাদ দিই, সিনেমার পাতা রোজ পড়ি। তেমন বেলেল্লা হালকা ধরনের ছবি হলে আমি মাঝে মাঝে প্রতিভাকে অন্তুকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাই। না, ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিতে পারে এমন কোনো কিছুই আমি আর চাই না।

প্রতিভা স্নান সেরে এসে দেয়ালে ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'অন্তুকে তুমি একটু সামলে রেখো। আজকেও ছাদে গিয়েছিল।'

'কই!'

'গিয়েছিল। বলল, তুমি যেতে বলেছ। আমি ওকে ভিতরের বারান্দায় নিলডাউন করে রেখেছি।'

আমি হাসলাম, 'আমি ছাদে যেতে বলিনি তো।'

'কি জানি, বলছিল তো।' প্রতিভা ভ্রু কোঁচকায় 'হয়ত—তুমি অন্যমনস্ক ছিলে।'

আমি একটু ভেবে দেখবার ভান করি। যেন কিছু একটা মনে পড়বে আমার। নিজেকে আমার ঘোর সন্দেহ হয়।

'আর ফিরে এসে দেখি—' প্রতিভা গালের ওপর একটা ব্রণকে টিপে দিতে দিতে বলল, 'ওপরের বারান্দার রেলিঙে দাঁড়িয়ে নিচের তলায় থুথু ফেলছে। ঠিক সান্যালদের চৌবাচ্চার ওপর। ওরা দেখতে পেলে—' প্রতিভা নিস্পৃহভাবে পাউডারের পাফ তুলে নিল। 'অন্তু?'

'তা ছাড়া আবার কে!' বলে বোধ হয় সন্দেহ হওয়াতে ও হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তুমি হাসছ?' পরমুহূর্তেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের ছায়ার দিকে তাকাল। চেয়ে চেয়ে দেখি আধ-ভেজা ঘাড়ে গলায় ব্লাউজের ফাঁকে পাউডার ছড়াচ্ছে। হঠাৎ ধীর গলায় কেটে কেটে বলল, 'এসব স্বভাব ভালো নয়।' ওর ভ্রূ কোঁচকানো। হয়তো চশমা ছাড়া দেখতে ওর অসুবিধে হয়। একজোড়া চশমা প্রতিভার ছিল। ওর চোখ ভালো নয়। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর থেকে ও চশমা পরা ছেড়ে দিয়েছে। আমি ওকে আজকাল তেমন লক্ষ্য করি না—কে জানে হয়তো, চশমায় ওকে একটু বুড়ো বুড়ো দেখায়।

তা হোক। প্রতিভাকে আমি সুন্দর দেখি—অন্তত এখন দেখছি। ধোয়া মোছা কপালের ওপর এখন ও মনোযোগ দিয়ে সিঁদুরের টিপ বসিয়ে দিচ্ছে। ঘাড়টা নোয়ানো, পিঠ বাঁকা, দুটো চোখ আয়নার ভিতরে জ্বলজ্বল করছে। সিঁথিতে সিঁদুর দিল ও। ওর এই সব ছেলেমানুষী অভ্যাস আমি পছন্দ করি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জোর নিশ্বাস ছাড়ল প্রতিভা। একটু হেসে বলল, 'দুপুরে খুব ঘুমিয়েছ তো? চোখমুখ ফুলে গেছে।' উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে প্রায় একই স্বরে বলল, 'অফিসে আজ ওরা তোমার কথা বলছিল।' 'কি রকম?'

'এই যেমন, তুমি সোশ্যালে একবার ক্যারিকেচার করেছিলে আমায় নিয়ে—আমাকে বলোনি।' ও বিছানার ওপর থেকে ওর ছড়ানো ব্যাগ-ট্যাগ কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'ক্যারিকেচারটা আমায় একবার দেখাবে?'

আমি হেসে বললাম, 'আর কিছু বলেনি?'

'বলছিল।' হাসি সামলে ভ্রূ কোঁচকাল প্রতিভা, 'সে অনেক কথা। সব মনে থাকে?' প্রায় একই রকম অনুচ্চ স্বরে অন্তুকে ডাকল প্রতিভা। '...ঘরে এসো।'

অন্তু ঘরে আসতেই ওর হাসিটা আমার চোখে পড়ল। দেখে কে বলবে যে, ঘণ্টাখানেক ও নিলডাউন হয়ে ছিল! কোনো শারীরিক কষ্টের চিহ্ন ও চোখে-মুখে কোথাও ছিল না। আমার মনে হয় ওকে শাসন-টাসন করে কোনো লাভ নেই। ওর ইস্কুলের মাস্টাররাও পারেনি। ওর বয়স মাত্র দশ—কিন্তু এই বয়সেই অন্যান্য ছেলেকে নষ্ট করে দিচ্ছে সন্দেহে ওকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রতিভার সন্দেহ ছিল যে, স্কুলটাই ওকে নষ্ট করছে। কিন্তু আমার মনে হয়, অন্তুর এসবে কিছু আসে যায় না। নিজের ভালোমন্দ সে নিজেই বুঝতে শিখেছে।

প্রতিভা অন্তুকে ডেকে ওর কানে কানে কোনো কথা বলল, তারপর রান্নাঘরের দিকে চলে গেল প্রতিভা। অন্তু আমার দিকে চেয়ে হাসল, 'বৃষ্টি থেমে গেছে বাবা!'

আমি ওর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বললাম, 'হুঁ।'

'মা বলল, তোমাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে।' ওর হাসিটা একটু বেঁকে গেল— 'অত বসে থাকলে তোমার বাত ধরে যাবে।'

কোমরে হাত রেখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে হাসির কোনো চিহ্ন নেই। তাই মুখের হাসিটা হঠাৎ নকল বলে মনে হয়। বোধহয় ও সবসময়ে একইরকম হাসে—কিন্তু আমার কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়ে যায়।

কিছুক্ষণ আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম—চোখে চোখ রেখে। তারপর অন্তু দেওয়ালের হুক-এ ঝোলানো তার শার্ট পেড়ে নিয়ে মাথা গলাতে গলাতে বলল, 'দুপুরবেলা আমি ছাদ থেকে ঠিক যেন টেলিফোনের শব্দ পেলাম।' শার্টের বুক চিরে ওর রুক্ষ চুলওয়ালা মাথাটা বেরিয়ে এল— 'আর মনে হল তুমি একা কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছ।'

আমাদের টেলিফোন নেই। আশেপাশে কোথাও নেই। কিন্তু মনে হয় অন্তু ঠিক বলছে—দুপুরে আমিও টেলিফোন বেজে যাওয়ার শব্দ শুনেছি। ঠিক জানি না—আবছাভাবে মনে পড়ে, আমি হাতের খবরের কাগজটা মুড়ে এক হাতে নিয়ে ঘরে এসে অন্য হাতে অন্যমনস্কের মতো টেলিফোন তুলে কারো সাথে কথা বলেছি!

অন্তু হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বলল, 'আজ তুমি আবার পাগলামি করছিলে বাবা।'

'না, অন্তু—' আমি প্রাণপণে দুপুর বেলার কথা মনে করবার চেষ্টা করে বললাম, 'কিন্তু টেলিফোনের শব্দ...?'

'তুমি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলে।'

আমার মনে পড়ল না। বললাম, 'মনে পড়ে না তো। বোধ হয় না।'

'তবে মা দিয়ে রেখেছিল। ঠিক তিনটের সময় তোমাকে নতুন ওষুধটা দেওয়ার কথা ছিল। আমি ভুলে গেছি।' শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, 'তুমি মাকে বলে দেবে না তো!'

'ঠিক আছে।'

'আমিও বলব না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে অন্তু—' আমি কথা চাপা দেওয়ার জন্য বলি, 'কিন্তু তুমি চলেছ কোথায়?'

'দোকানে। এলাচ কিনে আনব।'

আমার ঘোর সন্দেহ হয়, অন্তু ঠিক আমার দলে নয়। আবছাভাবে হঠাৎ মনে হয়, আমাদের তিনজনের ভিতরে একটা অদৃশ্য জোট বাঁধবার চেষ্টা আছে। ঠিক ধরাছোঁয়া যায় না, কিন্তু বোঝা যায়। প্রতিভা আর অন্তু সবসময়েই এক দলে, আমি আলাদা। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল করে মনে হয়, আমি আর অন্তু এক দলে, প্রতিভা আলাদা; কিংবা আমি আর প্রতিভা একদলে, অন্তু আলাদা।

অন্তু বেরিয়ে গেলে আমি আবার বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসি। একা। এ জায়গাটা বেশ ঠান্ডা। আবছা অন্ধকার। দুপুরবেলা আমি কার সঙ্গে কথা বলছি—মনে পড়ল না। আমি আবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করি।

আজকাল আমি ভাবনা চিন্তা করবার অনেক সময় পাই। ঠিক ন'মাস আগে আমার একটা অসুখ হয়েছিল। তেমন কিছু নয়—কয়েকদিন খুব জ্বর হয়ে সেরে গেল। কিন্তু সেই অসুখটার ভিতরে কোনো কারসাজি ছিল, যা আমি এখনো বুঝতে পারি না—কেননা, তারপর একদিন অফিসে গিয়ে দেখি আমাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কেন—আমি ভেবে পেলাম না। কেউ কিছু বলতে পারল না—ইউনিয়ন থেকে কোনো হইচই হল না—ঠিক এক মাস পরে আমার চাকরি গেল। আমি তাতে খুব দুঃখিত হইনি। চিঠিতে লেখা ছিল, আমাকে আর কাজের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হচ্ছে না। সে কথা আমিও স্বীকার করি। বরাবরই আমি চাকরির অনুপযুক্ত ছিলাম—আমি জানি। কর্তৃপক্ষ সেটা এতকাল টের পাননি কেন—এই প্রশ্ন করে ও ধন্যবাদ

জানিয়ে আমি আমার ওপরওয়ালাদের একটা চিঠি দিই—কখনো যার উত্তর পাওয়া যায়নি। আমার চাকরি গেলে সেই একই ফার্মে প্রতিভা চাকরি পেল। কি করে প্রতিভা কাণ্ডটা করল—নাকি ওপরওয়ালাদের দয়া—তা আমার একদম জানা নেই। আমি জানতে চাইও না। এই জেনে সুখে আছি যে, আমাকে আর চাকরি করতে হচ্ছে না—কোনো কাজ দেওয়া হচ্ছে না আমাকে। এমন সম্মানজনক অবসর-যাপনের জন্য—সত্যি কথা বলি—একটা গোপন ইচ্ছা আমার বরাবর ছিল।

আমাদের ছেলেবেলার কলকাতায় জিওল হালদারকে দেখেছি এই রকম অবসর যাপন করতে। যতদূর মনে হয়, জিওল হালদারের চেষ্টা ছিল কি করে বৃক্ষের মতো রাগে ও বিরাগে সমান বিকারহীন থাকা যায়। আমিও ভেবে দেখছি এমনভাবে আত্মপরবোধ লুপ্ত করে দেওয়া যায় কি, যখন প্রতিভার জন্য, অন্তুর জন্য, নিজের জন্য আর কিছুই করবার ইচ্ছে থাকে না। এই রকম বোধ থেকেই কি কেউ কেউ সন্ন্যাস নিয়েছিল—সংসার ছেড়ে গিয়েছিল কেউ কেউ?

জিওল হালদারের লৌকিক নাম ছিল গীতার বাবা। আমাদের ছেলেবেলার এই গীতাকে একদিন যারা স্কুল থেকে ফেরার পথে চুরি করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, এক রাত্রির পর তারা পরম বৈরাগ্যের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়মের কাছে মাঠে তাকে ফেলে যায়। এই ঘটনার পর গীতা নিউমোনিয়া হয়ে মারা গেল। গীতা মারা গেলে গীতার বাবা জিওল হালদার এই ব্যাপারে তার কি করণীয় ছিল, কর্তব্য ছিল, তা রাস্তার লোককে ধরে ধরে জিজ্ঞেস করে বেড়াল। এইভাবে গীতার গল্পটা চারদিকে ছড়িয়ে যায়। তারপর একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরল জিওল হালদার, শাবল আর কোদাল নিয়ে গম্ভীরভাবে নিজের বাড়ির উঠানে একটা গর্ত খুঁড়ল, তার ওপর লতাপাতার ছাউনি দিল রোদ-জল আটকাবার জন্য, তারপর একদিন সেই গর্তের ভিতরে ঢুকে গেল গীতার বাবা। ছেলেবেলার সেই গুহার অন্ধকার ও রহস্য আমাকে খুব টানত। কিন্তু গুহার ঠিক মুখের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকত 'সীতু'--জিওল হালদারের বছর ছয়েকের মেয়ে—আমাদের পথ আটকে বলত, 'ভিতরে যাওয়া বারণ'।

'কেন?'

ফিক করে হেসে বলত, 'বাবা যে ন্যাংটো।'

আধপাগল জিওল হালদারের সেই গুহার কাছে আমি মাঝে মাঝে গেছি। কখনো দেখা হয়নি—ওখানটা কেমন? অন্ধকারে জিওল হালদারকে দেখা যেত না—মাঝে মধ্যে তার গলা পাওয়া যেত। আমি জিওল হালদারকে কখনো কখনো জিজ্ঞেস করেছি, 'ওখানটা কেমন, ভয় করে না?' উত্তর পাওয়া যেত, 'বেশ বাবা, বেশ জায়গা এটা।' 'আপনি কি ধ্যান করছেন?' 'না বাবা, আমি বিকারহীন হওয়ার চেষ্টা করছি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সহজ বৃক্ষের মতো প্রাকৃতিক হতে পারে কিনা দেখছি। কেননা প্রকৃতি বিকারহীন ও উদাসীন, তার কোথাও এতটুকু আবেগ নেই।' ছেলেবেলায় দেখা সেই গুহা আমাকে এখনো মাঝে মাঝে টেনে ধরে। জিওল হালদারের সেই অন্ধকার ও অবসর কতকাল আমার মাথায় বাসা বেঁধে ছিল। আমি এখনো সেই গুহা খুঁজে পাইনি, না সেই অন্ধকার, না সেই অবসর। এ কি সহজে পাওয়া যায়।

ঘরের ভিতর থেকে একটা মানুষের ছায়া বারান্দায় আমার পায়ের কাছে পড়েছিল। আমি প্রথমটা লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ চোখ পড়তেই চমকে উঠে দেখি—প্রতিভা। বললাম 'কি হল?'

'কিছু না।' ও বলল, 'আমি শুনছিলাম তুমি আপনমনে কি যেন বলছ!' অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাল প্রতিভা।

আমি বাধো বাধো গলায় বললাম, 'কি বলছিলাম?'

'কি জানি। জিওল হালদার না কি যেন।' ও বলল, 'অন্ধকার না অবসর কি যেন বলছিলে!'

আমি হাসলাম। প্রতিভা আমার কাছে এসে বলল, 'আমি বলি কি, তুমি অত ভেবো না। বরং মাঝে মাঝে ঘুরে-টুরে এসো।' ও খুব সহৃদয়ভাবে বলল, 'অন্তুকে নিয়ে মাঝে মাঝে পড়াতে বোসো।'

আমি উঠে পড়লাম।

আমি আর অন্তু পাশাপাশি খেতে বসতে প্রতিভা মাঝে মাঝে এটা ওটা আনতে রান্নাঘরে যাচ্ছিল। তারই এক ফাঁকে অন্তু বলল, 'বাবা, আমি টেলিফোনের কথাটা মাকে বলে দিইনি।'

'ঠিক আছে।' আমি সন্তর্পণে বললাম, 'তুমি শুনেছ আমি কার সঙ্গে কথা বলছিলাম?'

'হ্যাঁ-অ্যা!' অন্তু হাসল, 'আমি দেখলাম তুমি টেবিল থেকে তোমার ফাউন্টেন পেনটা তুলে নিয়ে ঠিক ফোনের মতো কানের কাছে ধরে রন্টু না কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলে।'

রন্টু! কতকাল এই নামে আমাকে কেউ ডাকেনি। রন্টু! হঠাৎ আনন্দে আমি কানায কানায় ভরে উঠলাম। এ আমার ডাক নাম। আমার ছেলেবেলার নাম।

অন্তু আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, 'আমিও মাঝে মাঝে তোমাব মতো টেলিফোনে কথা বলি।'

'কার সঙ্গে?'

অন্তু সকৌতুকে হেসে বলল, 'কারো সঙ্গেই নয। ওপাশে কাউকে ভেবে নিই। ঠিক তোমাব মতো।'

আমি হেসে উঠলাম। অন্তু হেসে উঠল। প্রতিভা দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল। পর মুহূর্তে হেসে বলল, 'কি হচ্ছে তোমাদের? এত আনন্দ কিসের!'

অন্তু আমার দিকে তাকাল। আমি তাকালাম ওর দিকে। অন্তু দু'হাত ওপর দিকে ছুঁড়ে বলে উঠল, 'উঃ, আমার পেট ভরে গেছে, মা। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

আমি খাটের ওপর আলাদা শুই। অন্তু আর প্রতিভা মেঝের বিছানায় আলাদা শোয়। গত ন'মাস এই রকম চলে আসছে। আমি প্রতিভাকে ডাকি না। কাছে ডাকি না। ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে আমি নিঃসাড়ে পড়ে থাকি। ঘুমের ভান করি। ঘুম আসে না। আর ঘরের সেই অন্ধকার জুড়ে আমার ছেলেবেলার বান ডেকে যায়। আশ্চর্য! একি প্রত্নতাত্ত্বিক—যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু মূল্যবান, সব সেই ছেলেবেলায়। যতো বুড়ো হচ্ছি আমি ততই ছেলেবেলার অর্থ জানছি, আরো জানতে চাইছি। আমি কি বড় হয়ে আর নতুন কিছুই শিখিনি, যা কিছু শিখেছিলাম—সব সেই ছেলেবেলায়? তাই মনে হয় আমি মাঝে মাঝে অলীক টেলিফোন বেজে ওঠবার শব্দ শুনি। দেয়ালের ভিতরে, কিংবা জানলার শার্সিতে লুকোনো গোপন টেপরেকর্ডার হঠাৎ কথা বলতে শুরু করে। অন্ধকারে বুকের ভিতরে কড় কড় করে টেলিফোন আমাকে ডাক দেয়, 'রন্টু, রন্টু, এই যে—'; আমি পাগলের মতো উঠে বসি, হাত বাড়াই, অদৃশ্য অলীক টেলিফোন তুলে নিই, আমার স্বয়ংক্রিয় ঠোঁট কথা বলে যায়, 'এই যে, রন্টু, এই যে—।'

না, আমার প্রতিভাকে প্রয়োজন বলে মনে হয় না। এমন অনেক কিছুকেই প্রয়োজনহীন

বলে মনে হয়। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমাদের গলির মুখেই ছিল বুড়ো অল্লুর দর্জির দোকান। সেখানে ছড় ছড় করে চারটে ভাঙা মেশিন চলত। বুড়ো অল্লু বসত মেঝের মাদুরের ওপর—নামাজ পড়বার মতো পবিত্র ভঙ্গিতে। উলটো দিকেই ছিল একটা হাজামাজা পুকুর। সেখানে গাড়োয়ান আর গয়লারা তাদের গোরু-মোষ চান করাত। 'এই এক ফোঁড়...এই আর এক ফোঁড়...' বুড়ো অল্লু হাত-সেলাই করতে করতে বলত, 'দে তো সাজ্জাদ, একটা বিড়ি...।' সাজ্জাদ বিড়িটা অল্লুর ঠোঁটে লাগিয়ে দিলেই অল্লু বলত, 'রমজান ধরিয়ে দে...!' এই সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে চাঁদির চশমার ওপর দিয়ে অল্লু পুকুরের দিকে তাকিয়ে দেখত। কতদিনের সেই পুকুর! কতদিনের সেই বুড়ো অল্লু। আমরা যেতাম রঙিন কাপড়ের টুকরো কুড়িয়ে আনতে। সুতো ফুরিয়ে যাওয়া কাঠের রিল, ভাঙা ছুঁচ—এই সব খুঁজে দেখতাম। হঠাৎ বুড়ো অল্লু, 'ধর... ধর...' বলে চেঁচিয়ে উঠলে আমরা পালাতাম। অল্লু ফোকলা মুখে হেসে উঠত হঠাৎ। আস্তে আস্তে ক্রমশ সেই রঙিন কাপড়ের টুকরো, কাঠের রিল, ভাঙা ছুঁচ আমার কাছে প্রয়োজনহীন হয়ে গেছে—যেমন সেগুলো প্রয়োজনহীন ছিল বুড়ো অল্লুর কাছে। ভেবে পাই না, আমি কখনো এত বড়ো, এত বুড়ো হবো কি যখন সেই রঙিন কাপড়ের টুকরোর মতো, কাঠের রিল ও ভাঙা ছুঁচের মতো সব—সব কিছুকেই—অন্তুকে, প্রতিভাকে, আমার চলে-যাওয়া চাকরিকে প্রয়োজনহীন বলে মনে হবে?... ভালোবাসার ছিল, ভয়ের ও রহস্যের ছিল আমাব ছেলেবেলা। কত তুচ্ছকেই প্রয়োজন ছিল আমার!

অনেক রাতে হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে শুনি এক্কাগাড়ির আওয়াজ। অনেক দূর পর্যন্ত সেই আওয়াজ শোনা গেল, নিশুতি রাত চিরে চলেছে। ক্রমশ সেই আওয়াজ আমার মাথার ভিতরে গভীর থেকে গভীরে চলে গেল। প্রতিভা ঠিকই সন্দেহ করে—আমি ঠিক স্বাভাবিক নই। আমিও সন্দেহ করি, বড়ো সন্দেহ করি আমাকে।

অসুখের পর থেকেই আমার ভিতরে কয়েকটা ছোটখাটো ভাঙচুর হয়ে গেছে—আমি টের পাই। ব্যাপারটা আমি প্রথম বুঝতে পারি অসুখের পর একদিন। কাকে যেন চিঠি লিখবার ছিল! পোস্ট অফিসে গিয়ে আমি পোস্টকার্ড কিনলাম, তারপর চিঠি লিখবার জন্য স্ট্যান্ডের ওপর হেলান বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটা লিখলাম। তখনো সব কিছু ঠিকঠাক স্বাভাবিক ছিল। যতদূর মনে পড়ে, আমার ডান হাতে কলমটা ছিল, বাঁ হাতে ছিল পোস্টকার্ড। চিঠিটা পড়তে পড়তে ডাকবাক্সের কাছে এসে মুখ তুলেই সেই ঘোর লাল রঙের ডাকবাক্স, সার্জেন্টদের মতো কালো টুপি পরা, তার নিচে কালো হাঁ-এর মতো গর্ত দেখে—আমি স্পষ্ট টের পেলাম আমার ভিতরে কি একটা গোলমাল হয়ে গেল। আমার এক হাতে কলম ছিল, অন্য হাতে পোস্টকার্ড—দু হাতে দুটো জিনিস। কিন্তু আমি কোন্‌টা ডাকবাক্সে ফেলবার জন্য এসেছি কিছুতেই ঠিক করা গেল না। কোন্‌টা কি—এই বাক্সের সঙ্গে কোন্‌টার সম্পর্ক রয়েছে ভেবে না পেয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, অল্প পরেই এই ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে যাবে। কিন্তু কাটল না—আমি কলম ও পোস্টকার্ড—দুটো জিনিসের কোনোটাকেই চিনি বলে মনে হল না। ভাবছিলাম কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করা যায় কিনা, 'মশাই, দেখুন তো আমার দু'হাতে দুটো জিনিস—এর মধ্যে কোন্‌টা ও বাক্সে ফেলা উচিত।' কেউ পাছে আমার এই অবস্থাটা লক্ষ্য করে এই ভয়ে আমি লটারি করে—একটা হাত তুলে ডাকবাক্সে জিনিসটা ফেলে দিলাম।

এর ফলে আমাকে ভুগতে হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে তারপর অনেকক্ষণ ওই ডাকবাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে পিয়োনের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম আমি। চেনা পিয়োন ছিল, জিজ্ঞেস করল, 'কি করে পড়ল?' আমি বানিয়ে বললাম, 'দুটোই এক হাতে ধরা ছিল, চিঠিটা ফেলতে গিয়ে হাত ফসকে—' পিয়োনটা আর কিছু বলল না, ডাকবাক্স খুলে, কলমটা পেয়ে দিয়ে দিল। আমার সেই কালো কলমটা—যেটা আমি মাঝে মাঝে টেলিফোনের মতো ব্যবহার করি—অন্তু দেখেছে।

এ রকম কেন হয়, কেন হচ্ছে? মাঝে মাঝে সব কিছু একাকার হয়ে যায়। কাচের গ্লাস, টেবিল ও দেয়ালের পার্থক্য কিছুক্ষণের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়। কোন্‌টা কি, কোন্‌টা কেন—আমি বুঝে উঠি না। বুঝে উঠতে পারি না দামিনী ঝির সঙ্গে প্রতিভার পার্থক্য কোথায়! ভয় হয় ভিড়ের থেকে যদি চিনে বার করতে হয়, আমি কিছুতেই প্রতিভাকে, অন্তুকে আলাদা করে বলে দিতে পারব না, 'এই আমার বউ প্রতিভা, এই আমার ছেলে অন্তু।'

এই আমার বউ প্রতিভা, এই আমার ছেলে অন্তু! আমি অন্ধকারে হেসে উঠি। নিজেকে আমাব পাকা ঘুঘুর মতো মনে হয়—সব জানেশোনে, অথচ ভান করে।

পরদিন কি উপলক্ষে যেন ছুটি ছিল। আমি জানতাম না। প্রতিভার গড়িমসি ভাব দেখে বুঝতে পারলাম। আশ্চর্য, আগে সব ছুটির দিন আমার মুখস্থ ছিল। আজ ছুটি কেন—ভেবে পেলাম না।

ছুটির দিনে প্রতিভা ঘরে থাকলে আমি ঘুমোই না, ছোটখাটো কাজ করি, দাড়ি কামাই, বই পড়ি কিংবা ঘরময় পায়চারি করি। প্রতিভা সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়ল। কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনবে, আর সময় পেলে সিনেমায় যেতে পারে—অফিসেব কোনো বান্ধবীব সঙ্গে, সেই রকম কথা হয়ে আছে।

আমি প্রতিভাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার সময় লক্ষ করলাম অন্তু একটা চেয়ারের সঙ্গে লাঠি কাঠি বেঁধে কি একটা তৈরি করছে। আমাকে দেখে বলল, 'বাবা, আমি টেবিল-ঘড়িটা একবারটি নেবো,' একটু চোরা হাসি হেসে বলল, 'খুব সাবধানে নেবো, ভাঙবো না। নেবো?'

আমি ওর তৈরি করা জিনিসটা দেখছিলাম, 'কি এটা!'

'টাইম মেশিন।' অন্তু উত্তর দিল।

'কি হবে এটা দিয়ে?'

ও লঘু ঠাট্টার সুরে বলল, 'এটাতে চড়ে আমি আমার বুড়ো বয়সটা দেখে আসবো।' বলেই ঘরের দিকে দৌড় লাগাল অন্তু। ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'ঘড়িটা নিচ্ছি কিন্তু, বাবা!'

'আমি অন্যমনস্কের মতো বললাম, 'ভেঙো না।' তারপর আস্তে আস্তে ঝুল-বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসলাম, হাতে প্রতিভার আনা মোটা উপন্যাসটা ছিল। কয়েক পাতা পড়ে দেখা গেল একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, নানা সামাজিক কারণে এবং দারিদ্র্য ইত্যাদি দুঃখের ভেতর দিয়ে গল্পটা শুরু হয়েছে। আমার ঘুম পেয়ে গেল। আমি যদি ভালোবাসতে চাই কখনো, তবে প্রতিভাকেই ভালোবাসার চেষ্টা করে দেখব। যদি দশ মিনিটের জন্যও ভালোবাসতে পারি, তবে কেন সেই দশ মিনিটই আমার সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট নয়। দশ মিনিট—মাত্র দশ মিনিট কেন যথেষ্ট নয় এই নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে করতে

একদিন আমরা সবাই বিবাহহীন সমাজে পৌঁছে যাবো। ভার নেই, দায় নেই—সহজিয়া সেই দশ মিনিটের শুদ্ধ ভালোবাসার জন্যে পৃথিবীর সবাই অপেক্ষা করে আছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ডাক শুনি, 'রন্টু, এই যে, রন্টু—'। আপাদমস্তক ভয়ংকর চমকে উঠে ঘুমচোখে চেয়ে দেখি বাচ্চা রন্টু বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ধড়ফড় করে উঠবার চেষ্টা করে বলি, 'রন্টু... কি করে এলে?'

একটা হাত তুলে ও বলল, 'চেয়ে দ্যাখো।'

'কি?'

'টাইম মেশিন।' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল রন্টু। আমি দুহাতে চোখ রগড়ে ঘুম ছাড়িয়ে দেখলাম—অন্তু। অন্তু হাসিমুখে বলল, 'তুমি ভয় পেয়েছিলে, বাবা?'

'না।' আমি হাসলাম, ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম, 'তোমার মেশিনটা তৈরি হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ—অ্যাঁ।' অন্তু বলল, 'আমি একটা টেলিফোনও তৈরি করেছি। দ্যাখো—', চেয়ে দেখি দুটো দুটো চারটে দেশলাইয়ের খোল, অনেকটা সুতো জড়ানো। অন্তু বলল, 'আজ তোমার সঙ্গে কথা বলব বাবা, তুমি এখানে থাকবে, আমি থাকব ছাদে।'

'বেশ তো।' আমি হেসে বললাম।

'তুমি মাঝে মাঝে রন্টু না কার সঙ্গে কথা বলো! আজ আমি হবো সেই রন্টু—' অন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আর তুমি কি হবে বাবা?'

বলতে গিয়েও আমি বললাম না। অন্তু জানে না, রন্টু আমারই ডাক নাম। সামলে নিয়ে বললাম, 'আমাকেও রন্টু বলে ডেকো।'

'আচ্ছা! আজ মজা হবে।' তারপর তাড়াহুড়ো করে আমাকে ওর টেলিফোন সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিল, 'এখানে একজোড়া টেলিফোন আছে। আমি যেটা দিয়ে কথা বলব তুমি সেটাতে শুনবে, আর তুমি যেটাতে কথা বলবে সেটাতে আমি শুনব। ভুল কোরো না যেন।'

'না।' আমি মাথা নেড়ে জানালাম।

'আমার সুতো কম, ঘরের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।' অন্তু সুতো খুলতে খুলতে বলল, 'বরং তুমি এপাশ দিয়ে আলসের ওপারে খোল দুটো ছুঁড়ে দাও। আমি ছাদে গিয়ে ধরব।'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

অন্তু ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে আবার পিছু ফিরে বলল, 'ও দুটো ছুঁড়ে দাও বাবা।' বলে চলে গেল। আমি দেশলাইয়ের সুতো-বাঁধা খোল দুটো আলসের ওপারে ছুঁড়ে দিলাম, ঠক করে সে দুটো ছাদের শানের ওপর পড়ল।

অন্তু ঘরের ভিতর দিয়ে বারান্দায় যাবে, তারপর সিঁড়ি ভেঙে ছাদের ওপর উঠবে। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা না করে দেশলাইয়ের একটা খোল—যেটা কানে দেওয়ার—সেটা কানে চেপে ধরলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে কার ধীর গম্ভীর গলা ভেসে এল, রন্টু, এই যে রন্টু—খুব ক্লান্ত স্বর—এ তো আমার অন্তু নয়! রোমকূপ শিউড়ে উঠল, তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যেতে লাগল মাথার ভিতর দিয়ে। এ কি রন্টু? না কি অন্তুর এই টেলিফোন আমারই গলার স্বর আমাকে ফেরত দিচ্ছে? পর মুহূর্তেই স্রোতের মতো সেই স্বর আমাকে আক্রমণ করে, 'রন্টু, হ্যালো রন্টু—'

আমি কেঁপে উঠি, কাঁপা গলায় বলি, 'এই যে এখানে আমি—'।

'তুমি সেই পাগল রন্টু তো—প্রতিভা যার বউ—অন্তু যার ছেলে?'

'আমিই সে। আমি সেই রন্টু। আমি অন্তুর বাবা। প্রতিভার স্বামী।'

'তবে?' প্রশ্ন ভেসে এল।

'তবে কি? তবে কি?'

'তুমি ভেবেছিলে এরা কেউ তোমার নয়? কোনো কিছুতেই তোমার আর প্রয়োজন নেই?'

'কিন্তু—' আমি স্খলিত স্বরে ব্যাগ্রভাবে বলি, 'এরা ছাড়া কি আমার পরিচয় আমি জানি না।'

'তুমি যা চেয়েছিলে তোমাকে তাই দেওয়া হল— সেই অবসর আর সেই অন্ধকার তুমি পাবে।'

ফোন কেটে গেল।

হতচকিত আমি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে নিলাম। আরো ধীর, আরো দুঃখী ও শান্ত হয়ে গেলাম আমি।

অন্তু দুড়দাড় সিঁড়ি ভেঙে এল— 'তুমি আমার কথা শুনতে পাওনি বাবা?'

'পেয়েছি।' আমি ধীর গলায় বলি।

'তবে তুমি কি সব উলটো পালটা বলছিলে! আমার কথার জবাব দিলে না!'

আমি ওকে কাছে টেনে আনলাম। হাত কেঁপে গেল। কিছুই বললাম না আমি। জানি, ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি এমন কোনো ভাষা আমার জানা নেই। আমি জানি না, এখন আর আমার কথা কেউ কখনো বুঝবে কি না!

না, আমি আর ফিরে যেতে পারি না।

খগেনবাবুর পড়শী

নবনীতা দেব সেন

বড্ড জ্বালাতন করেন দেবু মজুমদার। একদম পছন্দ নয় ওঁকে খগেনবাবুর। রোজ ভোরবেলা রাস্তার ধারের দাওয়ায় বসে বাংলা খবরের কাগজটা পড়া খগেনবাবুর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। বাসি লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে, দাঁতন করতে করতে। টাট্‌কা নিমের দাঁতন দিয়ে। নিজের গাছের দাঁতন। নিজের দাঁত। নিজের দাওয়া। নিজের পয়সায় কেনা কাগজ। তোর তাতে কী? কিন্তু না দেবুবাবুর সহ্য হবে না।

তিনি গিলেকরা পাঞ্জাবী গায় দিয়ে, কোঁচকানো ধুতি পরে, অ্যালসেশিয়ান কুকুরের চেন ধরে বেড়াতে যাবেন, আর পথে দাঁড়িয়ে পড়ে ডেকে বলবেন—'ওখানা কি একটা কাগজ হল মশাই? অ্যাঁ, খগেনবাবু? পড়তে হলে, হ্যাঁ, পড়ুন স্টেটস্‌ম্যান। ইংরিজি কাগজেই যা কিছু খবর থাকে। বাংলা কাগজে কেবল যত আজেবাজে গসিপ্।' খগেনবাবুর আজকাল, বেশ কিছুদিন হল, দেববাবুর চালিয়াতি আর সহ্য হয় না। হ্যাঁ, খগেনবাবু স্টেট্‌সম্যানও পড়েন—তবে সেটা চা খেয়ে ওঠে। এই বাংলা কাগজটা বহুকাল পড়ছেন। কত শত শত নতুন বাংলা কাগজ উঠেছে, তাও এখানা ছাড়তে পারেননি। এর নামে দেবুবাবুর নিন্দে উনি সইতে পারেন না। কিন্তু মুখে বলেন না কিছু। দেবুবাবুকে বলে লাভ নেই। উনি অন্যের কথায় কান দেন না। নিজের কণ্ঠস্বরটাই তাঁর কানে সবচেয়ে মিষ্টি লাগে। খগেনবাবু এই তিরিশ বছর ধরে সেটা দেখছেন। তিনিও দেবুবাবুকে মনে মনে গ্রাহ্য করেন না। হোক না তাঁর চারতলা প্রাসাদ। খগেনবাবুর ভারী বয়ে গেল। তাছাড়া দেবুবাবুর ওই অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকেও তাঁর পছন্দ হয় না। খেরে শেয়ালের মতো লেজ, খ্যাঁকশেয়ালের মতো মুখ, আর বাঘের মতো গলা। ওর বাদামী চোখ-দুটোও কেমন হাসিহাসি, ঠাট্টা ঠাট্টা, খগেনবাবুর মতো লোককে ওর হিংস্রতার যোগ্য বলেও ও মনে করে না। রোজ ওঁর বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্টটাতে একটা ঠ্যাং তুলে হিসি করে যায়। দেবুবাবু কোথায় চেন টেনে সরিয়ে নেবেন, তা নয়, তিনি বরং দাঁড়িয়ে যান। কুকুরের এই অসামাজিক আচরণকে আহ্লাদেপনা করে প্রশ্রয় দেন।

নাঃ খগেনবাবু কিছুই বলতে পারেন না। এটাই খগেনবাবুর মুশকিল। তিনি বেজায় ভদ্রলোক। পরনে লুঙ্গি, হাতাওলা ফর্সা গেঞ্জি, হাতে নিমের দাঁতন, বসে আছেন লাল সিমেন্টের চকচকে মসৃণ দাওয়াতে, পা ঝুলিয়ে। পায়ে বিদ্যেসাগরী চটি, মাথায় অল্প-অল্প টাক, চোখে মোটা কাচের চশমা। খুব নিরীহ ভালোমানুষ। পাড়াশুদ্ধ সবাই সেটা জানে। গিন্নিটি বরং অনেক বেশি শক্তপোক্ত, পাড়ার লোকে তাঁকে একটু সমঝে চলে। কিন্তু দেবুবাবুর সঙ্গে গিন্নিমার তো দেখা হয় না। তিনি তখন থাকেন পুজোর ঘরে।

দেবুবাবুর কুকুর হাঁটানোর গ্রীষ্মের পোশাক এটা। আর শীতের পোশাক অন্য। খগেনবাবুরও।

খগেনবাবুর তখন পরণে থাকে মোটা খদ্দরের পাজামা, গিন্নির হাতেবোনা সোয়েটারের ওপরে নস্যি রঙের আলোয়ান, পায়ে উলের মোজার ওপর এই বিদ্যাসাগরী চটিটাই।

আর দেবুবাবু? একেবারে ফিটফাট সাহেব। জুতো-মোজা কোট-প্যান্ট শার্ট সোয়েটার মাফলার। মাথায় একখানা কাশ্মীরী টুপি পর্যন্ত। বেশি ঠাণ্ডা পড়লে, একটা কমলা রঙের বাঁদুরে টুপি পরতে খগেনবাবুকে বাধ্য করেন গিন্নি, কেননা খগেনবাবুর টাকে চট করে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি বেধে যায়। ওই বাঁদুরে টুপিটা পরলে আর রক্ষে নেই। দেবুবাবু তাঁকে খ্যাপাবেনই।

—'কী মশাই? ব্যাপার কী? অমরনাথ যাচ্ছেন বুঝি? হিমালয় ভ্রমণে বেরুচ্ছেন? ও বস্তুটি তো কলকাতায় ইস্তেমাল করবার জন্যে তৈরি হয়নি, ও হচ্ছে খাঁটি হিমালয়ান উইন্টারের জন্যে। তা, কবে যাচ্ছেন?'

খগেনবাবুও মনে মনে বলেন—

—'আপনি কি লন্ডনে যাচ্ছেন? আপনার পোশাকও কলকাতার জন্যে তৈরি হয়নি, ও খাঁটি ব্রিটিশ ওয়েদারের জন্যে।' কিন্তু ওই মনে মনেই। মুখে কেবল মৃদু মৃদু হাসেন। দেবুবাবুকে বলে লাভ নেই। উনি কানে তুলবেন না। অন্যের কথা উনি শোনেন না। চারতলা বাড়িতে থাকেন, গেটে একটা ড্রাইভার আর একটা দারোয়ান বসে থাকে। দুজনে খৈনি খায়। সামনে একখানা গাড়ি সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকে। আরেকটা সারাদিন নাতি নাতনীদের ইস্কুলে, কলেজে নিয়ে যাচ্ছে আর নিয়ে আসছে। আর দেবুবাবুর মেয়েকে আর মিসেসকে নিউমার্কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আর নিয়ে আসছে। আর দেবুবাবু দিনের বেলা কোথাও যান না। তাঁর ব্যবসার অফিস বাড়িতেই। কিন্তু তিনি বিকেলে গাড়ি চড়ে, কুকুর নিয়ে বোধহয় গড়ের মাঠের দিকে কোথাও হাওয়া খেতে যান। মিসেসকেও মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে যান। মিসেস গেলে, সঙ্গে তাঁর খুদে নাতনীটাও যায়, আয়া শুদ্ধ। খগেনবাবুর গিন্নির সঙ্গে দেবুবাবুর গিন্নির ভাবসাব নেই। যদিও পাশাপাশি বাড়ি। দেবুবাবুর উঁচু বাড়িতে বাগান নেই। খগেনবাবুদের দেড়তলা, পুরনো দিনের বাড়ি। তাতে বাঁধানো উঠোন আছে। সামনে ছোট্ট ফুলের বাগান আছে। পেছনে বেশ খানিকটা জমি আছে। খগেনবাবুর বাবার গাছের শখ ছিল, নিম, আম, লিচু, পেয়ারা, জামরুল, কাঁঠাল—অনেকরকমের ফলের গাছ লাগিয়েছিলেন। কলাবাগানও আছে ছোট্ট একটু। গিন্নিমা কাকাভোরে উঠে সামনের ফুলবাগান থেকে পুজোর ফুল তোলেন। না, পাড়ার ছেলেরা ঢুকতে পারে না। উঁচু উঁচু বর্শার ফলার মতন লোহার রড লাগানো বেড়া আছে। রাস্তা দেখা যায় দিব্যি ফাঁক দিয়ে, কিন্তু পেরিয়ে ঢোকা যায় না। খগেনবাবুর গিন্নিও দেবুবাবুদের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। ওঁদের বাড়িটা ছিল দোতলা, দেখতে দেখতে চারতলা হল। দেবুবাবুদের মাত্র সাড়ে তিনকাঠা জমিতে ওই বিশাল প্রাসাদ। কথায় বলে, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। দেবুবাবুই তার প্রমাণ। আর খগেনবাবুদের ফলের বাগানটাই ন'কাঠা জমিতে। উঠোনবাগান এইসব করে, বাড়িটা মাত্রই দেড়তলা বানিয়ে গেছেন খগেনবাবুর বাবা। খগেনবাবু কেরানীর চাকরী করে বাড়ি বাড়াতে পারেননি। দরকারও হয়নি। তাঁর মাত্র একটা ছেলে, একটা মেয়ে। বিয়ে-থা হয়ে গেছে। তাদের নিজেদের ঘরদোর সবই আছে। কিন্তু এখানে এলে থাকবার জায়গা যথেষ্ট। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে তো অফিসের ফ্ল্যাটে বউ নিয়ে চলে গেছে। মেয়ের সল্টলেকে শ্বশুরের নিজের বাড়ি। দেবুবাবুর ছেলে নেই। দুই মেয়েরই বিয়ে হয়েছে। নাতি-নাতনী হয়েছে। বড় জামাই-মেয়ে এখানেই থাকে। তাদের

ছেলেমেয়ে তিনটি। দেবুবাবুর বাড়িতে দিবারাত্র ঝিনচাক রণবাদ্য বাজছে। খগেনবাবু রেডিও, তাঁর গিন্নি টিভি দিয়ে সে আওয়াজ আটকাতে পারেন না। দেবুবাবুর মার্বেল বসানো সাদা বাড়িটাকে খগেনবাবুর ইঁটের লাল বাড়ির পাশে একদম বেমানান বলে মনে হয় খগেনবাবুর। এই পুরনো পাড়ায় এই গলির মধ্যে না হয়ে ওটাকে অন্য কোথাও মানাতো ভালো।

দিন তো সমান যায় না। খগেনবাবুর গিন্নি হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে মারা গেলেন। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, ধরা পড়তে না পড়তেই খতম। খগেনবাবু সদ্য রিটায়ার করেছেন। গিন্নির সঙ্গে নতুন করে ভাব হচ্ছিল তাঁর। ঠিক এই সময়ে গিন্নির চলে যাওয়াটা খগেনবাবুকে ভয়ানক একটা ধাক্কা দিল।

প্রথম প্রথম পাড়াব লোকে রোজ বোজ আসা-যাওয়া করতো। মেয়ে এসে কাছে রইল কিছুদিন। ছেলে-বউমাও এসে রইল কিছুদিন। দুজনেই তারপরে পালা করে খগেনবাবুকে তাদের কাছে নিয়ে গেল কদিন। কিন্তু খগেনবাবুর এই চিরকেলে বাড়িটা ছেড়ে অন্যত্র বেশিদিন মন টেকে না। খগেনবাবু ঠাকুর ঘরটার দিকে তাকাতে পারেন না। রোজ ঝগড়া হতো এই নিয়ে।

'এত বেশিক্ষণ ধরে পুজো করবার কী দরকার?' গিন্নির যত সময় কাটে পুজো করে, টিভি দেখে, আব যমুনাব ওপর খবরদারি করে। রান্নাবান্না করতে যমুনা আছে বিশ বছর। ঘরসংসার সেই দ্যাখে, খগেনবাবুর কোনো অসুবিধা নেই। গিন্নি থাকতেও তাঁর দিনের রুটিন যেটি ছিল, গিন্নি না থাকতেও তাঁর দিনের রুটিন ঠিক সেইটি আছে। মোটামুটি নাওয়া-খাওয়া পোশাক আশাকের অসুবিধা নেই। সেবাযত্নটা 'বাবা' 'বাবা' করে যমুনা যথেষ্ট করে। বাংলাদেশ থেকে এসেছিল সেই ১৫/১৬ বছর বয়সে। বরটা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল একটা মেয়ে হবার পরেই। সেই মেয়েও বড় হয়েছে এখানেই। জবা এখন থাকে তাঁর ছেলে বৌমার কাছে, বালিগঞ্জে। স্কুল ফাইনাল পাশ কবেছে জবা। বউমাকে পাত্র খুঁজতে বলেছেন খগেনবাবু। বউমা গা করে বলে মনে হয় না। পডবে একদিন ঝামেলায় তখন বুঝবে। এখন স্বার্থপরতা করে বিয়ে দিচ্ছে না। গিন্নি থাকলে ঠিকই ওর একটা ব্যবস্থা করতেন।

খগেনবাবু এখনও কাগজ নিয়ে, দাঁতন নিয়ে বসেন দালানে। বাগানভর্তি হয়ে বেল, জুঁই, জবা, করবী ফুটে থাকে। আগে এই ফুলগুলো উনি দেখতে পেতেন না। যমুনা একটু বেলায় ফুল তোলে। তার রান্নাঘরের কাজকর্ম থাকে। ফুলগুলো দেখতে দেখতে খগেনবাবুর চোখ জ্বালা করে।

একটা নতুন ব্যাপার হয়েছে, দেবুবাবু আজকাল প্রায়ই এসে খগেনবাবুর সঙ্গে গল্প সল্প করেন।—'কী মশাই, আজকের জবর খবরটা দেখেছেন? ঠনঠনেতে ডবলমার্ডার?'

—'কী মশাই? দেখেছেন? দিল্লির মস্‌নদ তো টলোমলো।'

—যাই বলুন মশাই, দিল্লি বম্বেতে যেমন রোজ রোজ খুন-খারাপি হচ্ছে কলকাতা তার চেয়ে অনেক Safe'—এমনকি মাঝে মাঝে বিকেলবেলাতেও এসে বসেন বাইরের ঘরে। যমুনাকে বলেন এক কাপ চা করে দিতে। গিন্নির মৃত্যুতে পাড়ার লোকেরা এসেছে, চলে গেছে, ছেলে-মেয়েরাও এসেছে, চলে গেছে। দেবুবাবুই যা যাতায়াতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। খগেনবাবুর আজকাল দেবুবাবুকে একটু একটু সহ্য হতে শুরু করেছে। হঠাৎ বড়লোকের অমন একটু হয়। ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

কিন্তু গিন্নির থাকা আর না থাকাতে এমনি আকাশ পাতাল তফাৎ হবে জীবনে, সেটা খগেনবাবু ভাবতে পারেননি। এমনকি দেবুবাবুকেও সহ্য হয়ে যাবে! একটু কৃতজ্ঞতাবোধও যেন গোপনে জন্মাচ্ছে। উনি অন্তত চেষ্টা তো করেন খগেনবাবুর সঙ্গে সময় কাটাতে। ওঁর ব্যবসা এখন প্রধানত জামাইরা দ্যাখে, বড়জামাই এ বাড়িতেই থাকে; ছোট দ্যাখে বম্বের অফিস। দেবুবাবুর ব্যবসা খুব জমে উঠেছে। প্রোমোটার তো? বাঙালি প্রোমোটার আর কটা আছে? দেবুবাবুর জামাই শ্বশুরের বিজনেসের অনেক উন্নতি করে দিয়েছে। সৌরভ বুদ্ধিমান ছেলে, প্রচুর গায়ে খেটে পরিশ্রমও করতে পারে। দেবুবাবু আজকাল মাঝে মাঝে ব্যবসার গল্পও করেন খগেনবাবুর কাছে। গাঙ্গুলী'দের বস্তিটা কিনে নিয়েছেন দেবুবাবু, সেখানে দশতলা বাড়ি তৈরি হতো, এখন হঠাৎ সরকার অত উঁচু বাড়ি বেআইনী করে মস্ত লোকসান করে দিয়েছে! সবাই কি আর কুন্দলিয়া হতো? গাঙ্গুলীদের বসতবাড়িটাও কেনার কথা চলছে, বাড়িটা কর্নার প্লট, দুটো মুখ আছে। ওখানে বাড়ি তুলতে পারলে আয় দেবে। খগেনবাবুর বাড়িটা কর্নারপ্লট না হলেও প্রায় একই সুবিধা আছে ওটারও। লাগোয়া জমিটা একদম পিছনের গলি পর্যন্ত ছড়ানো। গাঙ্গুলীদের বাড়ির একটা মুখ গলিতে, আরেকটা মুখ বড় রাস্তায়। খগেনবাবুও ইচ্ছে করলে একটা খিড়কির দরজা করতে পারতেন পেছনের রাস্তায়।—দেবুবাবুর কথাবার্তা খগেনবাবুর যে শুনতে খুব ভালো লাগে না তা নয়। খগেনবাবু আদার ব্যাপারী, দেবুবাবুর জাহাজের খবরে তাঁর কী কাজ? তবু শোনেন। সময় তো কাটে। একটা অচেনা রহস্যময় জগতের ঝলক দেখতে পান। কিন্তু লোকসান মুনাফা, ব্যবসা-বাণিজ্য, এসবের ভাষা তাঁর নতুন করে আর শিখতে ইচ্ছে করে না। তবু চুপচাপ শুনে যান খগেনবাবু। বিনা মন্তব্যে। দেবুবাবুও জানেন এসব বিষয়ে খগেনবাবুর বলবার কিছু নেই। কিছুই বলবার নেই বটে, কিন্তু শুনতে শুনতে খগেনবাবুর মনে বিরক্তির উৎপাদন হতে থাকে। শরীরে অ্যাড্রিনালিনের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, মাথার মধ্যে বিজ বিজ করে রাগ জমতে থাকে। অথচ খগেনবাবুর। তিনি সংযত প্রকৃতির মানুষ। এই যে দেবুবাবুর অ্যালসেশিয়ানটা। ও খগেনবাবুর দিকে সমানে ঠাট্টা-ঠাট্টা চোখে তাকিয়ে থাকে, আর তামাশা করে ল্যাজ নাচায়। সেটাও তো খগেনবাবুর একেবারেই পছন্দ হয় না। আর বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্টটাতে প্রত্যেকদিন ইয়ে করা, —সেটাই কি তিনি মনে মনে সহ্য করতে পারেন? পারেন না। কিন্তু সেইসব অপছন্দের কথা কি খগেনবাবু প্রকাশ করেছেন কোনোদিন? করেননি। তেমনি, দেবুবাবুর ব্যবসাপাতির গল্পেও খগেনবাবুর নিতান্ত অরুচি। গল্প করতে করতে দেবুবাবু যখন খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তখন খগেনবাবু মনে মনে কানের সুইচটা অফ করে দিয়ে গিন্নির কথা ভাবেন।

এই বিকেলের দিকটায় গিন্নি রোজ গা ধুয়ে চুলটি বেঁধে, কপালে বড় করে সিঁদুরটিপটি এঁকে পাটভাঙা শাড়ি পরে, একবাটি মুড়ি মাখা, কি দুটি চিঁড়ে ভাজা, কি একটু সুজির মোহনভোগ—কিছু না হোক দুটো বেগুনী আর নাড়ু দিয়েই হাল্কা একটু জলখাবার করে দিতেন খগেনবাবুকে। আপিস থেকে এসে জলখাবার খাওয়ার অভ্যেস ছিল তো? রিটায়ারের পরেও সেই মতই চলছিল। আর নিজেও এক গেলাস চা নিয়ে পাশে এসে বসতেন এই সময়টায়। আঁচলের চাবীর মৃদু রিনরিন শব্দ থেকেই টের পাওয়া যেত, চা জলখাবার আসছে। খাটের ওপর পা তুলে বসে কর্তাগিন্নির বিকেল-বেলার চা-পর্ব। সামনের জানলাটার পাশ দিয়ে মোটা যুঁইফুলের লতাটা উঠে

গেছে, সুগন্ধে ঘর ভরে যায়। অবশ্য এখন যুঁই ফুলের সময় নয়, গিন্নির বড় প্রিয়ফুল। গন্ধে গন্ধে একসময়ে বাগানে ছায়া ঘনিয়ে আসে, টুক করে সুয্যি ডুবে যায়।

এই সময়ে গিন্নি শশব্যস্ত হয়ে ছাদে উঠে যেতেন ঠাকুরঘরে। সন্ধ্যে দিতে হবে না? খগেনবাবুদের এত সুন্দর বাঁধানো উঠোন, তুলসীতলাটা কিন্তু ছাদের ওপরে। ঠিক ঠাকুরঘরের সামনে। এটা ওঁর মায়ের ব্যবস্থা। উঠোনে যেই টিউবওয়েল বসানো হল মার মনে হলো তুলসীতলা ছাদে ট্রান্সফার করা দরকার। খগেনবাবুর গিন্নি তাঁর মায়ের নিয়মকানুন বজায় রেখেছিলেন। পুজো আহ্নিক সন্ধ্যে দেওয়া। বউমা তাদের ফ্ল্যাটবাড়িতে কী করে, কিছু করে কিনা, খগেনবাবুর জানা নেই। আর যমুনাই এখন এ বাড়িতে ঠাকুরঘরে ফুলজল দেয়। সন্ধ্যে দেয়। খগেনবাবুর ঠাকুরঘরে অ্যালার্জি। ওটা গিন্নির ডিপার্টমেন্ট। গিন্নি এত কম কথার মানুষ ছিলেন যে খগেনবাবুর এখন মাঝে মাঝে মনে হয় গিন্নির সঙ্গে তাঁর বুঝি ভালো করে চেনাশোনাই হয়নি। খগেনবাবু নিজেও চুপচাপ মানুষ, কথা বেশি বলেন না। সংসারের প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ছাড়া তাদের মধ্যে খুব একটা কথা হতো কি? ওই ছেলে, মেয়েদের কথা। খগেনবাবুই মাঝে মাঝে এটা ওটা বলতেন, কথা বলবার লোক বলতে তো এখন বাড়িতে কেবল গিন্নিই ছিলেন। গিন্নি মন দিয়ে খগেনবাবুর কথাগুলো শুনতেন। কখনও হয়তো কিছু বলতেন না। পরনিন্দা পরচর্চা গিন্নির স্বভাবে ছিল না, বিনা দরকারে কথা বলাও না। কিন্তু মুখে সবসময় একটা হাসি লেগে থাকতো। গিন্নির এই হঠাৎ চলে যাওয়াটার জন্যে খগেনবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। প্রস্তুতির সময় পাননি।

দেবুবাবু যতক্ষণ তাঁর জামাইয়ের প্রোমোটারির গল্প করেন, খগেনবাবু অন্যমনস্ক চোখে সদ্য দেয়ালে টাঙানো বাঁধানো ছবিটার দিকে চেয়ে থাকেন। ঘোমটা দেওয়া, সামান্য হাসি ছুঁয়ে আছে মুখে। যমুনা রোজ সকালে বাগান থেকে তোলা ফুলে একটা মালা গেঁথে পরিয়ে দেয়। হাজার হোক মেয়েটা অকৃতজ্ঞ নয়। গিন্নি ওর মেয়ে জবার বিয়ের জন্যে হাল্কা কিছু গয়না গড়িয়ে রেখে গেছেন। জবাটা খুব কাজের মেয়ে। সেটাই হয়েছ মুস্কিল। বউমা ওর বিয়ের জন্যে গা করছে না মোটে। খগেনবাবু স্বার্থপরতাটা টের পান ঠিকই কিন্তু ছেলেকে ভরসা করে যে মুখে কিছু বলবেন, সে সাহস তাঁর নেই। গিন্নি থাকলে ঠিক ম্যানেজ করতেন। কথা কম বললে কি হবে, কাজে যেটা করার গিন্নি সেটা ঠিকই করে ফেলতেন। প্রায় চল্লিশ বছরের কাছাকাছি তো ঘর করা হোলো, অথচ—! এখন মাঝে মাঝেই কেমন মাথার মধ্যেটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে খগেনবাবুর। চাকরি-বাকরি নিয়েই সময়টা চলে গেল। দুজনে ঠিক চেনাশুনো সবটা হবার আগেই যেন গিন্নি হঠাৎ উবে গেলেন। ঠিকঠাক ভাবটা জমতে শুরু হয়েছিল। এইসবে, এই রিটায়ার করবার পরে।

হঠাৎ দেবুবাবুর একটা কথায় খগেনবাবুর কানখাড়া হয়ে গেল। '—ছেলেমেয়েরা কেউই তো আর আপনার এই নোনাধরা বাড়িতে বসবাস করতে আসবে না মশাই! বরং বুড়ো বয়সে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম করে বাঁচুন, খগেনবাবু পেছনের বাগানটাতেই কতখানি জমি পড়ে আছে বলুন তো? শান বাঁধানো উঠোন রয়েছে ভেতরে, সামনেও এই বাগানটুকু আছে, আপনার এখানে মোট জমি কতটা হবে। বাড়িটাড়ি সুদ্ধু? কাঠা দশেক তো হবেই না?'

খগেনবাবু অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, 'বাগান উঠোন মিলিয়ে ওদিকে ছ'কাঠা, আর বাড়িটা আমাদের ছোট্টই, সামনের এই জমিটুকুসুদ্ধ সোয়া দু'কাঠার মতন হবে—'

'—সব মিলিয়ে তাহলে সোয়া আট কাঠা? ওরে বাব্বা, ভবানীপুরে পাতালরেল স্টেশনের কাছেই এই এতখানি জমি? এ আপনি সোনার খনির ওপরে বসে আছেন মশাই, সোনার খনি।' খগেনবাবুর অবোধ চোখে তাকিয়ে থাকা দেখে দেবুবাবু আরও উৎসাহে বলতে থাকেন—'রাজার হালে থাকতে পারবেন বুঝলেন, রাজার হালে। এই জমির এখন দর কতো জানেন?' খগেনবাবু মাথা নাড়েন। জানেন না। জেনে দরকারও নেই তাঁর। দেবুবাবু এখন উঠে গেলেই পারেন। পৈত্রিক ভিটে বেচে রাজার হালে থাকার কোনো ইচ্ছে নেই খগেনবাবুর। এখনও তাঁর হাল কিন্তু ভিখিরির মতন নয়। পেনশনের টাকায় তাঁর শেষ ক'টা দিন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। রানী কোথায়, কিসের লোভে রাজা হবেন হঠাৎ বুড়ো বয়সে? তাঁর ছেলে-বউ আছে, মেয়ে-জামাই আছে, নাতি হয়েছে, যমুনাটা আছে, তার মেয়েটা আছে—অন্তত মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের অভাব হবে না ওদের কোনোদিন। দেবুবাবুর বাকি কথাগুলো আর খগেনবাবুর কানে ঢোকে না।

কিন্তু দেবুবাবু হাল ছাড়লেন না।

তাঁর যাতায়াত বেড়েই যেতে লাগলো। এবার আর শুধু হাতে নয়। কখনো ল্যাংড়া আম নিয়ে আসছেন, কখনো লিচু নিয়ে, কিছু না হোক এক ভাঁড় রসগোল্লা হাতে করে হাজির হচ্ছেন। এ এক নতুন উৎপাত—খগেনবাবু খুবই সঙ্কুচিত বোধ করছেন। এবং ততোধিক বিরক্ত। এসবে খুশি কেবল যমুনা। কিন্তু যমুনাকে কিছু বুঝিয়ে বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, আর দেবুবাবুকে বারণ করার ক্ষমতাও খগেনবাবুকে দেননি ভগবান।

বড়লোকের বড়লোকী চালের সঙ্গে তাল রেখে চলবার ইচ্ছে নেই খগেনবাবুর, ক্ষমতা থাক না থাক। একদিন বিকেলে দেবুবাবু এলেন, সঙ্গে বড় জামাইটিকে নিয়ে। একদম শরীরটা ভালো ছিল না খগেনবাবুর সেদিন। গায়ে বেশ জ্বর। যমুনা জোর করে শুইয়ে রেখেছে। কিন্তু বেচারী যমুনার সাধ্যি কি জামাই-শ্বশুরকে আটকাবে? সে তক্ষুণি বেরুচ্ছিল বার্লি কিনতে। দরজার খিলটি লাগিয়ে, তাঁরা সোজা শোবার ঘরে ঢুকে এলেন, জুতো পায়ে মসমসিয়ে। দোকানে যাবার মুখে, অত্যন্ত বিরক্ত হলেও, যমুনা কিছুই বলতে পারলে না। গিন্নিমা থাকলে এটা সম্ভব হত না। কথা তিনি কম বলতেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছেটা ফেলতে পারত না কেউই। তাঁর মৃত্যুর দিনে ছাড়া, এই শোবার ঘরে ডাক্তার ভিন্ন পাড়ার পুরুষ মানুষদের কাউকে কখনো ঢুকতে দেখা যায়নি। লোকজন সবাই বসতো হয় ওই বাইরের দালানে, নয় মাঝের ঘরে। ওইটেই বাইরের ঘর। শোবার ঘরে গিন্নির এলাকা। সেখানে বাইরে পুরুষমানুষদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু, আজ শ্বশুর-জামাই শোবার ঘরে ঢুকে এলেন, খগেনবাবুকে দেখতে।

দেবুবাবু বললেন-- 'খগেনবাবু, আপনার শরীরটা যদিও আজ ভালো নেই। কিন্তু আপনাকে একটা সুখবর দিতে না এসেই পারলাম না, সৌরভ বলছে আপনার এই গলির মধ্যেকার বাড়ি জমিরই বাজারদর এখন নাকি আট লাখ থেকে দশ লাখ পর্যন্ত উঠতে পারে। সৌরভ তার চেয়েও বেশি দিতে রাজী। আপনি ছেলেমেয়ের জন্য দুটো চোদ্দশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট রেখে দিতে পারবেন, তা ছাড়াও দশলাখ ক্যাশ হাতে পাবেন। চার/ছয় ভাগ। চার আপনি ডিক্লেয়ার করবেন, ক্যাপিটাল গেন আর ছয় ব্ল্যাকে। এমন অফার সত্যিই আর পাবেন না। সৌরভ তার লোকজন নিয়েই এসেছে, আপনি একটু মত দিলেই ওরা জমিটা মেপে দেখে, ঠিকঠাক দরদাম বলে দিতে পারবে। ওরা বাইরের বাগান, দালান আর বাইরের ঘরটা মাপছে। এবারে আপনাদের

শোবার ঘর তিনটে, রান্নাঘর, বাথরুম, ভেতরের দালান এসবগুলো মাপবে। আর ছাদের ওপরে কী কী আছে বলুন তো? ঠাকুরঘর, ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘর, আর ওই চিলেকুঠুরী? এই তো? সেখানেও যাবে। যমুনা আসুক। নিয়েও যাবেখন সঙ্গে করে। তাড়া নেই কিছু।

আপনি যদি তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যান, সামনের বছর এমনি সময়ে আপনার ছেলেমেয়ের ঝকঝকে নতুন ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশ হয়ে যাবে। আর ভেবে দেখুন এসব ছাড়াও দশলাখ টাকা ব্যাঙ্কে রেখে আপনি গাড়ি-ড্রাইভার রেখে, এয়ারকন্ডিশনার চালিয়ে আরাম করে জীবনের শেষ কটা দিন নিশ্চিন্তে, রাজার হালে কাটিয়ে যেতে পারবেন—এ হল সাবালক্ষ্মী'—

—খগেনবাবুর হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরুলো,

—'দাঁড়ান-গিন্নিকে আগে জিজ্ঞেস করে নিই। বসতবাড়ি বলে কথা। ভিটেমাটি বিক্রি করে দেবার আগে তো একটু কর্তাগিন্নিতে পরামর্শ করা দরকার।'

হাহা হেসে উঠে দেবুবাবু বললেন-—

—'কী যে বলেন খগেনবাবু। আজ মিসেস চক্রবর্তী থাকলে কি আর আপনাকে বিরক্ত করতুম? এতখানি জায়গা নিয়ে এরকম ফেলাছড়া হচ্ছে, একখানা ঘরে একা একা পড়ে আছেন—সেইজন্যেই তো—'

-–'কে বললে, একা একা পড়ে আছি?' খগেনবাবু শুনতে পেলেন তিনি স্পষ্ট বলছেন।

—'মোটেই একা একা পড়ে নেই। আমার গিন্নি না পেরেছেন তাঁর ঠাকুরঘরের মায়া কাটাতে, না তাঁর বুড়ো কণ্ডাটির। এই তো একটু পরেই তিনি নামবেন, ছাদে সন্ধ্যে দিয়ে যান—কেন, আপনারা শুনতে পান না? আমার গিন্নির টিপিক্যাল শাঁখের আওয়াজ? শুধু কি তাই? আবার নিজের হাতে প্রসাদটুকুও দেওয়া চাই! কথায় বলে না, 'স্বভাব যায় না মলে?' এই তো সূয্যি পাটে নেমেছে, গিন্নি এক্ষুণি সন্ধ্যে দিয়ে দেবেন, দু'খানা বাতাসা অন্তত মুখে দিয়ে যান, এতবড় সুখবরটা আনলেন' বলতে না বলতেই ঠাকুরঘরে শাঁখ বেজে উঠল। একবার দু'বার তিনবার, সাড়ে তিনবার। দেবুবাবুর সঙ্গে সঙ্গে খগেনবাবু নিজেও চমকে উঠলেন। সৌরভ জামাই বললো— 'যমুনা ফিরলো কখন? ওকে দরজা খুলে দিলে কে?'

—'যমুনা তো ফেরেনি?' খগেনবাবু শুনতে পেলেন, তিনিই উত্তর দিচ্ছেন—

—'যমুনা বার্লি কিনে একটু বাজার করে ফিরবে। দু'কাপ চা তো? সে আমার গিন্নিই করে দেবেন খন।'

এইসময়ে খগেনবাবুর সেই অতিপরিচিত শব্দ, আঁচলের চাবির গোছার আর হাতের চুড়ি নোয়ার ঝিন্‌ঝিন্ স্পষ্ট শোনা গেল। দেবুবাবুর ঘাড়ের ঠিক পিছনে। চমকে উঠে পেছন ফিরতেই দেবুবাবু দেখলেন দেয়ালের গা থেকে ভেসে বেরিয়ে এলেন স্বচ্ছ কাচের মতন খগেনবাবুর গিন্নি। গা ধুয়ে চুলটি বেঁধেছেন, পরনে পাটভাঙা লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি, কপালে বড় করে সিঁদুর টিপটি পরেছেন, খগেনবাবুর শরীর ভেদ করে ভাসতে ভাসতে তিনি সৌরভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, হাতে ঝকঝকে রেকাবীতে প্রসাদী বাতাসা, সপ্রতিভ হাসিখুশি মুখ। ঘরটা যুঁইফুলের সুগন্ধে ভরে উঠল।

দেবুবাবু আর সৌরভ যখন পাগলের মতন সদর দরজাটা খুলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু খিলটা খুঁজে পাচ্ছেন না, ঠিক তক্ষুণি জোরে কড়া নাড়লো কেউ, আর খিলটাও দেখতে পাওয়া গেল।

[illegible] খুলেই শ্বশুর-জামাই হুড়মুড় করে দৌড়ে রাস্তায় [illegible] নিয়ে ঘরে ঢুকে, যমুনা হাঁ করে ওঁদের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

[illegible]র ছেলে আর জামাই এখন প্রোমোটারের ব্যবসায় নেমেছে। প্রথম এক্সপেরিমেন্টটা করছে খগেনবাবুর পেছনের ফলবাগানের জমিটাতে। একুশটা ফ্ল্যাট হবে, বাড়ি ওঠার আগেই দশ থেকে চোদ্দো লাখে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ফ্ল্যাটগুলো । না, খগেনবাবু কোনো আপত্তি করেননি। 'প্রসাদী অ্যাপার্টমেন্টস'-এর সদর গেট ওপাশে বড় রাস্তাতে হচ্ছে। খগেনবাবুর দেড়তলা বাড়িতে হাত পড়েনি। তিনি এখনও তেমনি গলির দিকে দাওয়ায় বসে দাঁতন করেন। সামনের ছোট্ট বাগান থেকে আসা যুঁইফুলের গন্ধে শোবার ঘর ভেসে যায়। যমুনা ছাদে উঠে তুলসীতলায় সন্ধ্যে দেয়। ও হ্যাঁ, জবার বিয়েটাও যমুনা ঠিক করে ফেলেছে, ওই ঠিকেদারদের মধ্যেই একজন অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে।

সমরেশ মজুমদার

ট্রাঙ্গুলার পার্কের সামনে অবনীভূষণ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। আশেপাশের দোকানগুলো বন্ধ আছে। যে দোকানটায় ও তড়কা রুটি খায় সেটাও ঝাঁপ টেনে দিচ্ছে, চেয়ারগুলো টেবিলের ওপর পা তুলে শোয়ানো। অতএব আজ রাত্রে খাওয়া হলো না। অবনীভূষণ অবশ্য খাওয়ার জন্যে তেমন কোনো কিছু বোধ করছিল না। একটু আগেই শেষ বাসটা গড়িয়াহাটের দিকে গেছে সেটা থেকেই নামলো অবনী।

বসন্ত রায় এখন চুপচাপ। ফুটপাত ধরে হাঁটছিল অবনী। আর একটা দিন কাটলো। কলেজ স্ট্রিট থেকে রাত দশটায় বেরিয়ে হেঁটে নন্দন রোড। তারপর এই শেষ বাস-এর ভিড়ে মিলেমিশে আসায় একটাও পয়সা খরচ হলো না। অবশ্য দশ পয়সার রিস্ক ছিল। ওটা নিতেই হয়। কাঁহাতক আর হাঁটা যায়। রাসবিহারীর মোড় থেকে এই তিনটে স্টপেজ অবশ্যই ফাউ।

আর একটা দিন কাটলো, অথচ কিছুই হলো না। পরমেশটার কথা বুলি হয়ে যাচ্ছে ইদানীং। ওকে আর বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু না করেও উপায় নেই। লাইনে নাম ডাক আছে। মোটর সাইকেলটা কভার করেছে সম্প্রতি। আজকের অপারেশনে পরমেশ ওকে এড়িয়ে গেল। ঠিক হ্যায়! অবনী চারমিনারটা ছুঁড়ে ফেললো। এই সময় ও কুকুরগুলোর ডাক শুনতে পেলো। কশো কুকুর আছে এ পাড়ায়? শালারা রোজ রাত্রে ওকে দ্যাখে, অথচ। অবনীর চারপাশে কোনো লোকজন নেই অথচ সম্মিলিত সারমেয় চিৎকার ওকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ করলো। এ পাড়ায় কোনো নেড়ি কুত্তা নেই। দামি কুকুরগুলো যারা চিৎকার করছে তারা কেউ রাস্তায় বেরুবে না। কিন্তু অরুণদার কাছে রিপোর্ট হয়ে যেতে পারে। তাহলে এখানকার আস্তানা থাউজেন্ড ভোল্ট হয়ে যাবে। প্রথমদিন অরুণদা বলেছিল, 'এখানে আসতে চাও, আমার আপত্তি নেই। আমার অফিস দশটা টু আটটা। এই টাইমটা অ্যাভয়েড করবে। আর ওপরের ফ্ল্যাটের বাড়িওয়ালা যেন কোনো কমপ্লেন না করে।' বাংলায় এম. এ দেবার পর অরুণদার সঙ্গে আলাপ। তখন দু' একটা গল্প লিখতো অবনী। আর অরুণদা একটা কাগজ করতো। বাস। অরুণদার এই অফিসটা শালা সি. আই-এর টাকায় চলে। কালচারাল ব্যাপার সব। মারো ঝাড়ু। অরুণদা অবশ্য ওকে স্নেহ ট্নেহ করে। এম. এ-র পর তিনটে বছর ফিউজ হয়ে গেল। অরুণদা কি চেষ্টা করলে একটা চাকরি দিতে পারতো না? আজ দেড়মাস এখানে আছে অরুণদার সঙ্গে দেখাই হয় না। অবশ্য এখন আর চাকরির জন্যে ওর কোনো নোলা নেই। কারণ বয়সটা থাউজেন্ড হর্স পাওয়ার নিয়ে ছুটছে। এজ লিমিট বার।

অরুণদার অফিসের সামনে ছোট বাগান। লম্বা লোহার গেট। ওপরে বাড়িওয়ালার ফ্ল্যাট। অবনী দেখলো গেট বন্ধ। দশটায় তালা পড়ে। একবার চারপাশে চোখ বোলালো ও কোনো মানুষ বা রাউন্ডের পুলিসের মুখ দেখতে পেলো না। খাঁজে খাঁজে পা রেখে ও লোহার গেটটার ওপর উঠতেই বাড়িওয়ালার কুকুরটা হাঁউমাউ করে উঠলো। অবনী ধীরে সুস্থে নেমে বাগানটা পেরিয়ে অরুণদার দেওয়া ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে অফিসের দরজা খুললো। আশেপাশে সমস্ত

বাড়ির আলো নেবানো। এ পাড়ার লোকগুলো তাড়াতাড়ি বিছানায় যায়, আর তিন প্রহর রাত্রে যারা ফেরে তাদের গাড়ি আছে।

বিরাট হল ঘর। দেয়ালে দামি দামি ছবি। এ সব ছবির মানে বুঝতে পারে কি করে লোকে অবনীর বোধগম্য হয় না। ডিম লাইটটা জ্বালালো ও। অনেকগুলো ঘর। সব ঘরেই ছবি, ম্যাগাজিন। অবনী জামাপ্যান্ট ছেড়ে বাথরুমে গেল। সারাদিন ধরে হাঁটাহাঁটি। গেঞ্জি আন্ডারওয়্যারে বোঁটকা গন্ধ ছাড়ছে। দারুণ বাথরুম। মোজায়েক করা, শাওয়ার বাথটব সব আছে। অবনী বিবস্ত্র হয়ে শাওযার খুলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর অরুণদার মার্গো সোপ দিয়ে গেঞ্জি আন্ডারওয়ার কাচতে শুরু করলো।

এখন রাত একটা। মেঝেতে শব্দ হচ্ছে গেঞ্জি কাচার। সাবানটায় ভালো ফেনা হয় না। শব্দটা একটু আস্তে করার চেষ্টা করলো সে। দারুণ ফোর্সে শাওয়ার থেকে জল পড়ে। আগে যে মেসটায় সে ছিল সেখানে কল দিয়ে বাচ্চা ছেলেব পেচ্ছাপের থেকেও সরু জল পড়তো। বড়লোকদের কেতাই আলাদা।

স্নানটান সেরে অফিস ঘরে এসে দুটো টেবিল জোড়া দিয়ে স্টোর রুমের কোণায গোঁজা বিছানাটা নিয়ে এসে ভালো করে পাতলো। এখন একটু খিদে খিদে পাচ্ছে। অবনী আর একটা চারমিনার ধরালো। ধরিয়ে অরুণদার বসার ঘরটায় ঢুকলো। দারুণ সাজানো। এই ঘরটা রাস্তার দিকে। কাচের জানলা দিয়ে বাইরের আলো ঢোকে। অবনী অরুণদার রিভলভিং চেযারে বসে দুটো পা ছড়িয়ে দিলো টেবিলের ওপর। টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া একটা চিরকুট। অবনী পড়লো, 'টেলিফোনটা অফিসের জন্য।' তার মানে? এটা কি অবনীকে উদ্দেশ্য করে। কি বলতে চায় অরুণদা! শালা ফরেন মানি নিয়ে অফিস, তার ফুটুনি! খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠলো অবনী। একবার ভাবলো অরুণটার বাড়িতে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে এ ভাবে ইনসাল্ট করাব কারণটা কি। ও রিসিভার তুলে ডায়াল করলো। রিং হচ্ছে ওপাশে। কেউ ধরছে না। এখন রাত কটা? দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালো অবনী, একটা কুড়ি। নিশ্চয়ই অরুণদা ঘুমোচ্ছে। ওর বউটা যা মুটকি। রিং হচ্ছে। অবনী চারমিনার টানতে টানতে শুনলো ওপাশে কেউ এসে রিসিভার তুললো। মেয়েলি গলা। ঘুম জড়ানো। 'হ্যালো, হ্যালো।'

অবনী দুবার হ্যালো শুনে বললো, 'কাল সকালেই যেন মালটা আসে, বুঝলেন!'

'মাল! কিসের মাল!' ভদ্রমহিলার অবাক গলা।

'রসগোল্লা। এটা কি কে সি দাশের দোকান নয়?'

'রং নাম্বার।' বলে ঘটাং করে লাইন কেটে দিলেন ভদ্রমহিলা। অবনী প্রাণ খুলে কিছুক্ষণ হাসলো তারপর আবার রিসিভার তুললো। কাকে ডায়াল করা যায়! কোনো নাম না পেয়ে এমনি কয়েকটা নাম্বার ঘোরালো ও। এবার বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একটি হেঁড়ে গলা ধরলো, 'হ্যালো।'

অবনী বললো, 'ইয়েস, আপনার স্ত্রী কোথায়?'

ওপারের গলায় বিস্ময়, 'স্ত্রী, কেন বলুন তো?'

'দরকার, জরুরি দরকার। লালবাজার থেকে বলছি।'

'লালবাজার? ও-ও তো বাপের বাড়িতে।'

'না সেখানে নেই।'

'নেই মানে?'

'আপনি ইমিডিয়েটলি ডাফরিন হসপিট্যালে চলে যান। সিরিয়াস অবস্থা। হারি প্লিজ।' অবনী ফোনটা কেটে দিলো। অবনী আন্দাজ করলো লোকটা এখনই ডাফরিনে ছুটবে। এবং গিয়ে দেখবে এটা একটা বাচ্চা হবার হাসপাতাল। লোকটার মুখের চেহারাটা তখন কেমন হবে? হো হো করে হাসতে হাসতে অবনী উঠতেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। একি হলো। অবনীর দু'চোখে বিস্ময। এতো বাত্রে কোনোদিন ফোন আসেনি তো। নাকি ওর মতো কোনো পার্টি মাজাকি কবছে। বিসিভাব তুললো ও, 'হ্যালো।'

'হ্যালো, আপনি কি করছেন কি?' গলাব স্বব কডা।

'মানে?'

'মানে এতো বাত্রে মেঝেতে কি আওযাজ কবছেন? আপনার মনে বাখা উচিত এটা ভদ্রলোকেব বাড়ি, আমি কমপ্লেন কববো।' ওধাবে গলা উত্তেজিত।

শালা বাড়িওযালা। অবনী একটু ঘাবড়ে গেল। তাবপব কাটা কাটা গলায় বললো, 'আপনি কি ড্রাঙ্ক?'

'মানে?'

'বং নাম্বাব।' ফোনটা নামিযে বেখে পা টিপে টিপে এসে টেবিলের ওপব শুয়ে পড়লো অবনী। আঃ। আবাম। আব একটা দিন কাটলো অবনীভূযণেব। আগামীকাল কিছু বিজনেস আছে। নাটে নাটে লাগলে বাড়িওযালার থোড়াই কেযাব। মনে মনে গুন গুন করতে লাগলো, 'শালাব চামড়ায বানাবো ঢাক, তেবে কেটে তাক।' অবনীভূষণ উল্টোডাঙার তিন নম্বর লাল বাড়িটায পবমেশকে পেযে গেল অবনী। কাল বাত্রে খাওযা হযনি কিছু। আজ ঘুম থেকে উঠেই স্নানটান সেবে বেবিযে পড়েছে। বেবোবাব সময গেটে বাড়িওয়ালাব সঙ্গে দেখা। লেক থেকে চেনবাঁধা কুকুবকে নিযে বেড়িয়ে ফিবছে। অবনী মুখোমুখি হতেই হেসে বললো, 'ভালো আছেন মেসোমশাই।' ভদ্রলোক দুটো ভ্রু কুঁচকে ভেতবে ঢুকে গেলেন। অবনী মনে মনে একটা সুন্দব খিস্তি কবে নিলো। তাবপব পাঞ্জাবিব দোকানটায় পেট পুবে খেয়ে উল্টোডাঙায় চলে এলো, পবমেশকে ধবতে। এখন ওব পকেট খালি। পবমেশকে এখানেই পেযে গেল।

পবমেশ টেবিলেব ওপব উপুড় হয়ে লিখছিল, অবনীকে দেখে সরিয়ে নিলো কাগজপত্র। এই বাড়িটাব মালিক মাড়োযাবি। বহুত ব্যবসা আছে। নিচে কাঠের আড়ত। পবমেশ ওকে দেখে বাঁ চোখ কুঁচকে কি ভাবলো তাবপর বললো, 'যাক্ ভালোই হযেছে তুই এসে পড়েছিস।'

অবনী একটা চেয়াব টেনে নিলো, 'কালকে তুই শালা আমাকে বাতেলা দিলি কেন?'

'বাতেলা? তোকে! ধুৎ, ধুৎ, ওসব ফালতু কাজ তুই করবি কেন? আমি তো তোকে জানি।' পবমেশ হাসলো।

'কাজটা কি ছিল?'

'ওই আর কি। থ্রি-বি রুটের একটা স্টেট হাম্পু করতে হলো।'

'কত মাল ছেড়েছে?'

'দুই। পাঁচটা সাকরেদ ছিল। হাতে কিছু থাকে না দিয়ে-থুয়ে।' পরমেশ নির্বিকার। মনে মনে অবনী পরমেশকে জরিপ করলো। হাতে কিছু না রাখার মাল পরমেশ নয়। শালা। কোনো রিস্ক ছিল না কাজটায়। আলিপুরের মোড়ে বাস থামিয়ে দুটো আওয়াজ দিলেই প্যাসেঞ্জাররা

[illegible] উপুড় করে ট্যাঙ্কের মুখটা খুলে দিয়ে দেশলাই ছুঁড়ে দেওয়া। ব্যস। [illegible] পার স্টেটবাস দুহাজার। পুলিশ আসার অগেই পরমেশ নিশ্চয়ই [illegible] চালাচ্ছিল। একটা স্টেট বাস পুড়লে দুহাজার খরচ, আসবে হাজার গুণ। আরও [illegible] প্রাইভেটের পারমিট পাবে সিংজি। শালা। অবনী দেখলো টেবিলের ওপর খবরের কাগজের ফার্স্ট পেজে পোড়া বাসের ছবি।

[illegible] বললো, 'আছিস ভালো। কিছু ছাড়ো এবার।'

'কত?'

'পাঁচ।'

'অসম্ভব। দুশো দিতে পারি। অ্যাডভান্স।' পকেট থেকে টাকা বের করলো পরমেশ।

'আজকের অপারেশনটার জন্যে। ভালো দাঁও আছে। আমি ভেবে দেখলাম তোকে নিয়েই করবো। তেওয়ারিকে ও মাল আমি নিতে দেবো না।' অবনীর সামনে দুটো একশো টাকার নোট রাখলো পরমেশ।

'কাজটা কী? অবনী টাকাটা পকেটে রাখলো।

'তেওয়ারি তিন নম্বরের লাইনে আজ রাত্রে যাবে। কেন যাবে খবর পাইনি। এমনি যাবার মাল ও নয়। এ সব ব্যাপার লিক হলে অবনী—।' পরমেশ থামলো হঠাৎ।

'বলতে হবে না।' হাসলো অবনী, 'ওয়াগনের ব্যাপার নাকি গুরু।'

'না ওসব ব্যাপার না। তুই এক কাজ কর। একটা মাল ডেলিভারি আছে। আমিই যেতাম, তুই এসেছিস, ভালো হয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে ঠিক দশটায় গ্লোবের সামনে যাবি তেওয়ারির লোক থাকবে ওখানে। বাঁ হাতে রুমাল জড়ানো। তোকে দেখে রুমালটা খুলবে, আর বাঁধবে। মালটা দিয়ে চলে আসবি।'

'তেওয়ারির লোক?'

'হ্যাঁ বস্। তেওয়ারি আমার বহুদিনের দোস্ত।' বলে পরমেশ টেবিলের নিচ থেকে ছোট এয়ার ব্যাগটা বের করে অবনীর সামনে রাখলো। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পাঁচ মাথার মোড়ে কফি হাউসের সামনে চলে আসিস।'

এয়ার ব্যাগটা নিয়ে অবনী ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায় গ্লোবের সামনে পৌঁছোলো। এখন এ দিকটায় বেশি লোকজন নেই। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে ও গ্লোবের কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বেশ ভারী ব্যাগটা। ট্যাক্সিতে আসতে আসতে ও খুলে দেখেছে অন্তত গোটা কুড়ি গ্রেনেড আছে। কোথা থেকে যে পায় পরমেশ। আর এই সব অস্ত্র ও তেওয়ারির হাতে তুলে দিচ্ছে যে তেওয়ারিকে আজ রাত্রে প্রয়োজন হলেই হাপিস করে দেবে পরমেশ, তাজ্জব ব্যাপার সব। এইজন্যই পরমেশকে গুরু বলতে ইচ্ছে করে।

অবনী চোখ রাখছিল রুমাল বাঁধা হাতে কেউ আসছে কি না। মিনিট তিনেক কাটলো। শালা এ অবস্থায় যদি পুলিশ ধরে নির্ঘাত তিন বছর জেল। 'মারাত্মক অস্ত্রসহ সমাজবিরোধী গ্রেপ্তার' খবরের কাগজের হেডিং হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে তো পরমেশই ওকে এখন ধরিয়ে দিতে পারে। একটু ঘাম জমলো ওর শরীরে। ঠিক এই সময় ওর চোখে পড়লো একটি ডাঁসা মেয়ে গ্লোবের ভেতরে ঢুকলো। বাঁ হাতের কব্জিতে রুমাল বাঁধা। ও একটু অবাক হলো। এই মেয়েটা কি তেওয়ারির লোক? ইমপসিবল, হতেই পারে না। মেয়েটা রুমাল খুলছে আর বাঁধছে। এক

একবার এদিক-ওদিকে দেখছে। তেওয়ারির রিক্রুট তো দারুণ জিনিস। অবনী এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। তারপর ফিসফিস করে বললো, 'চলুন'।

কপালে ভাঁজ ফেললো মেয়েটি 'মানে'?

'তেওয়ারি?' অবনী আস্তে করে কথাটা ছেড়ে দিলো।

মেয়েটি হাসলো, 'হ্যাঁ, দিন।'

এখানেই নেবেন? চলুন না কোথাও বসা যাক।' অবনী উদার হলো।

মেয়েটি হাসলো, 'আমার শুধু নিয়ে যাবার কথাই ছিল কিন্তু।'

'আমার শুধু দেবার। একটু অবাধ্য হই না। আপত্তি আছে?'

'বেশ চলুন। কোথায় বসবেন?'

অবনী মেয়েটিকে নিয়ে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকলো। সলিড স্বাস্থ্য মেয়েটির। কথাবার্তা চটপটে। অবনীর পাশে বসলো ও। অবনী একটা হাত মেয়েটির পেছনে চেয়ারের হাতলে রেখে জিজ্ঞাসা করলো, 'কদ্দিন লাইনে?'

'লাইনে?' মেয়েটি চোখ তুলে দেখলো অবনীকে, 'ও, তিন মাস।'

সব শালাই তাই বলে। মনে মনে ভাবলো অবনী।

'ভালো লাগে?' অবনী গাঢ় করতে চাইলো গলার স্বর।

'এই আরম্ভ করলেন তো। সেদিন এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ পেছনে ঘুরে আলাপ করলেন। শুরুতেই আমি বললাম, দেখুন আমি কিন্তু প্রফেশনাল। শুনেই ভদ্রলোক চম্পট।'

'বাঃ তিনমাসেই বেশ কথা শিখে গেছেন তো। এরপর কত মাস কত হাজার মাস চলে যাবে দেখতে দেখতে।'

'মোটেই না। আমি বেশিদিন এ কাজ করবো না।'

'কি নাম?' 'বীথি।'

'আসল নামটা!' 'বীথি!'

অবনী একটা হাত এবার বীথির কাঁধে রাখলো। বীথি জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনার নাম?'

অবনী হেসে পর্দা সরিয়ে বেয়ারাকে ডাকলো, খাবার বললো, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, 'পরমেশ।'

'ও আপনি?' মেয়েটির চোখ চকচকে হলো। 'আপনার কথা তেওয়ারির কাছে শুনেছি।'

অবনীর হাত মেয়েটির গলায় নেমে এলো। টগবগে স্বাস্থ্য মেয়েটির। অবনীর খুব ইচ্ছে হলো মেয়েটার বুক ছুঁয়ে দ্যাখে।

'তুমি প্রফেশনাল না!'

'কেন?' মেয়েটি হাসলো।

'কত নাও?'

'কেন যাবেন?'

'যদি যাই।'

'বেশ তো মালটা ডেলিভারি দিয়েই ফ্রি।'

একটু আদর করলো অবনী, 'কত নাও?'

'পঁচিশ, আর ঘর ভাড়া পনেরো। পুলিশের ঝামেলা নেই। যাবেন?'

'উম্‌ম্‌ আগে একটু গরম হই।'

'বাব্বা।'

'থাকো কোথায়?'

'টালিগঞ্জে। বাড়ি ছিল পাকিস্তানে।'

'আবার পাকিস্তান কেন? উম্‌ম্‌। বাবা আছে?'

'হুঁ।' মেয়েটি অবনীর কোলের কাছে সিটিয়ে এলো। গদগদে ভাব। অবনীর মনে হচ্ছিলো ও মরে যাবে।

'তোমার মা দারুণ দেখতে না?'

'অ্যাঁ আবার মেয়েকে ছেড়ে মাকে কেন?'

'উম্‌ম্‌ তোমাকে দেখে। দারুণ দেখতে তুমি। দারুন জিনিস। উম্‌ম্‌। তোমার বাবা আছে তাহলে। কি করে। উম্‌।'

'বাবা। মেয়েটি হাসলো, 'বাবা রাস্তায় রাস্তায় হাঁকে চা-ই-ই সি-ট্‌ কা-পড় চাই-ই-ই। প্রায় অবিকল বৃদ্ধের গলা নকল করে মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো। থতোমতো খেয়ে গেল অবনী। বেয়ারাটা ছুটে এসে পর্দা ফাঁক করে দেখে সরে গেল। আর অবনীর পা থেকে মাথা অবধি চিৎকারটা পাক খেতে লাগলো। ওর মনে হলো একজন বৃদ্ধ কাঁধে শস্তা ছিট কাপড় ফেলে হাতে একটা লোহার শিক নিয়ে রোদজ্বালা দুপুরে গলিতে গলিতে ঘুরছে আর কুঁজো শরীর বাঁকিয়ে চিৎকার করছে, ছিট কাপড় চাই। আর তার মেয়ে ওর পাশে বসে গদগদে শরীরে বলছে 'চাই-মাংস-চাই।'

মেয়েটির চোখে বিস্ময়, 'কি হলো!'

'কিছু না।' অবনী বললো, কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ওর সমস্ত শরীর গুটিয়ে আসছিল, হঠাৎ ও বললো, 'চলুন উঠে পড়ি।'

'কেন খাবেন না?'

'না। ভালো লাগছে না।'

'আমার সঙ্গে যাবেন তো!'

'আজ থাক।'

অবনী হাসলো, 'আজ বোধহয় আর গরম হবে না।'

মেয়েটি অবাক চোখে কিছুক্ষণ দেখলো তারপর ব্যাগটা তুলে নিলো। অবনী বললো, 'সাবধানে যাবেন। ওতে কি আছে জানেন না বোধহয়।' মেয়েটি কোনো কথা না বলে গটগট করে বেরিয়ে গেল। অবনী বেয়ারাকে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখলো মেয়েটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে এমনভাবে যাচ্ছে যাতে যে কোনো মুহূর্তেই কারোর সঙ্গে ওর ধাক্কা লেগে যেতে পারে। আর তারপরেই অবনী কিছুক্ষণ বিস্ফোরক বয়ে নিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে দেখলো। হঠাৎ তার মনে হলো ব্যাপারটা খুব ছেলেমানুষি হয়ে গেল। তার ক্রিয়াকাণ্ডের পেছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পেলো না। শালা সব মানুষই তো ফিরিওয়ালা। তা নিয়ে ন্যাকামো করার কি আছে। অবনী দুচোখ দিয়ে মেয়েটাকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু মেয়েটাকে আর দেখা গেল না। অবনীর খুব আপশোশ হলো, নিজেকে জুতোতে ইচ্ছে করলো ওর।

সোদপুরের একটু আগে যেখানে রেল-লাইনটা বাঁক নিয়েছে, সেখানটায় মোটর সাইকেল

থামালো পরমেশ। সারাটা রাস্তা পরমেশ সমানে খিস্তি করেছে অবনীকে। বহুৎ দেরি করে এসেছে ও কফিহাউসে। অবনী বোঝাতে চেয়েছে ওর কোনো দোষ নেই। দুপুর থেকে সারা কলকাতা জুড়ে বোমাবাজি। ট্রাম বন্ধ। ট্যাক্সি আসতে চায় না। কিন্তু পরমেশ অবনীর মুখে হুইস্কির গন্ধ পেয়েই খিস্তি করতে শুরু করলো। বলেছে, শালা তোকে টাকা দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবনী স্বীকার করেছে, হ্যাঁ আজ দুপুরে ও চার পেগ মাত্র খেয়েছে ব্লু ফক্সে বসে। সেটা এমন কিছুই নয়। কিন্তু পরমেশ এখনও গরম। বি. টি রোড ধরে আসতে আসতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। খুব জোরে চালাচ্ছিল পরমেশ। পেছনের সিটে বসে ঘাম ছুটে গিয়েছিল অবনীর। পরমেশ টাইট প্যান্ট আর গেঞ্জি শার্ট পরেছে। দুটোই কালো। ভালো মানিয়েছে। সেন্ট মেখেছে নাকি। দারুণ গন্ধ ছাড়ছে। গলায় সোনার চেনটা চিকচিক করছে। শালা।

এখান থেকে স্টেশনে হেঁটে যেতে হবে। ঠিক স্টেশনে নয়। তার আগেই ইয়ার্ড। লম্বা কয়েকটা মালগাড়ি সব সময়েই সেখানে পড়ে থাকে। এসব জায়গা ওদের জানা। মোটর সাইকেল একটা দোকানের সামনে রেখে পরমেশ দোকানদারকে কি যেন বললো ফিসফিস করে। তারপর ওরা হাঁটতে লাগলো। একটু এগিয়ে পরমেশ পকেট থেকে একটা গ্রেনেড বের করে অবনীকে দিলো, 'এটা রেখে দে। দরকার না হলে ইউজ করিস না' অবনী গ্রেনেডটা পকেটে রেখে দিলো। ওরা নিঃশব্দে হাঁটছিল। ছোট একটা কালভার্ট পেরিয়ে এলো এরা। এদিকে জনবসতি নেই বললেই হয়। ওরা রেললাইন থেকে দূরত্ব বাঁচিয়ে হাঁটছিল। পরমেশ কথা বলছে না এখন। মাঝে মাঝে নজর বুলিয়ে নিচ্ছে চারধারে। এদিকটায় ছোট জঙ্গল মতন। এরপরেই ইয়ার্ড। ওরা একটা বড়ো নর্দমা পেরিয়ে এলো। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ওরা রেললাইন ধরে হাঁটতে লাগলো এবার। দারুণ জোনাকি জ্বলছে চারধারে। অন্ধকারটা তাই একটু পাতলা। হাওয়া দিচ্ছে মৃদু মৃদু। পরমেশ দাঁড়ালো একটা ঢালু জায়গা দেখে। তারপর বললো, 'অবনী তুই এখানে শুয়ে পড়। শিস দিলে গুঁড়ি মেরে উঠে আসবি।' বলে ও রেললাইনের পাশ ঘেঁষে অন্ধকারে চলে গেল। আসবার সময় পাখি পড়া করে ও অবনীকে বুঝিয়েছে কি কি করতে হবে। মোটা টাকার ব্যাপার। অবনী শুয়ে পড়লো খোয়া বিছানো মাটিতে।

পকেটে হাত দিয়ে অবনী গ্রেনেডটার অস্তিত্ব অনুভব করলো। একটা মাত্র গ্রেনেড ওর সঙ্গে। পরমেশ ইচ্ছে করেই ওকে বোধহয় বেশি কিছু দিতে চায়নি। পরমেশের কাছে রিভলভারটা নিশ্চয়ই আছে। সব জায়গায় শালা বেইমানি। একটা আলাদা দল করবে যে পরমেশকে ছেড়ে তারও উপায় নেই। পার্টির ব্যানারে না গেলে আজকাল লাইন বন্ধ। এম. এ পাশ করার পর, বেকারির দিনগুলোতে পরমেশ তাকে হাত ধরে বাঁচার রাস্তা দেখিয়েছে। তবু শালা ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তেওয়ারির সঙ্গে পরমেশের দোস্তি আছে এ কথা সবাই জানে। তেওয়ারি পেটো গ্রেনেড সাপ্লাই করে। ওর স্টক শর্ট পড়ে গিয়েছিল বলে পরমেশের কাছ থেকে কিছু মাল আজ কিনলো ও। তেওয়ারিটা শালা এক নম্বরের হারামি?

অবনী চিত হয়ে শুলো। আকাশ ভরা তারা। উঃ কত যে তারা আকাশে। দারুণ লাগে দেখতে। অবনীর মনে পড়লো। ছেলেবেলায় তমলুকে ওদের বাড়ির উঠোনে বসে ও তারা গুনবার চেষ্টা করতো। বাবার কথা মনে পড়লো। তিনমাস আগে চিঠি পেয়েছিল, 'এম. এ পাশ করিয়া এখন অবধি একটি চাকুরি জোটাইতে পারিলাম না।'

অবনী হাসলো।

পর পর দুটো লোকাল ট্রেন চলে গেল। মাটিতে কাঁপন অনুভব করলো সে। ঠিক সময় শিস শুনতে পেলো অবনী। মাথা তুলে দেখলো। সমস্ত জায়গাটা অন্ধকার। গুঁড়ি মেরে জঙ্গলটার পাশে গিয়ে বসলো ও। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। একটা মাত্র গ্রেনেড। ছোট ছোট কয়েকটা ঝোপ এখানে। পরমেশের গলা শুনতে পেলো ও। ফিসফিস করে ডাকছে, 'এদিকে আয় বাঁ দিকে।

অবনী বাঁ দিকে সরে এলো। পরমেশ হাঁটু গেড়ে বসে কি যেন দেখছে। অবনী দেখবার চেষ্টা করলো। সামনে ফাঁকা রেললাইন। ইয়ার্ডে মালগাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ অন্ধকারে কিছু নড়তে দেখলো সে। মূর্তি দুটো স্পষ্ট হলো। আর একটু পরে ও বুঝতে পারলো ওদের মধ্যে একজন তেওয়ারি। ওরা উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। পরমেশ চাপা স্বরে কি একটা বললো। তারপর এগিয়ে গেল গুঁড়ি মেরে। এখন অবনীকে একটু বাঁদিক দিয়ে পরমেশকে ফলো করতে হবে। পরমেশ আচমকা ফায়ার করবে। করে মাল হাতাবে। থলিটা নিয়েই অবনীকে দেবে। অবনী সেই মাল নিয়ে বাঁ দিক দিয়ে ছুটবে। পরমেশ ডানদিক দিয়ে ঘুরে মোটর সাইকেলের কাছে ফিরে যাবে। অবনী যেমন করেই হোক মালটা নিয়ে ডানলপ ব্রিজের তলায় পরমেশের জন্যে ঘণ্টাখানেক বাদে অপেক্ষা করবে। এই নির্দেশ। কিন্তু মালটা কি হতে পারে? পরমেশ খবর পাইনি বললেও অবনীর দৃঢ় বিশ্বাস পরমেশ সব নাড়ি-নক্ষত্র জানে। অবনী আরও কয়েক পা এগোল। তেওয়ারিরা মালগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। একটা টর্চ জ্বললো দূর অন্ধকারে। সম্ভবত রেল-পুলিশ।

পরমেশ এগিয়ে যাচ্ছিলো গুঁড়ি মেরে। হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতা খান খান করে পর পর তিনটে ফায়ারিং হলো। সঙ্গে সঙ্গে দুটো গ্রেনেড অবনীর ডান দিকে ফাটলো। জায়গাটা মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠলো। অন্ধকারটা যেন ঝলসে গেল। আর সেই স্বল্প আলোয় অবনী দেখলো পরমেশ মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। দূরে স্টেশনের দিকে হইচই শুরু হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। কারা যেন দুপদাপ করে ছুটে বেরিয়ে গেল অবনীর পাশ ঘেঁষে। অবনী হতভম্ব হয়ে পড়েছিল প্রথমটায়। তারপর দৌড়ে পরমেশের দিকে এগিয়ে গেল। রেললাইনের ওপর পরমেশ পড়ে আছে। বাঁ হাতটা উড়ে গেছে। প্যান্টটা পুড়ে গেছে। ফিকে জোনাকির আলোয় অবনী দেখলো পরমেশের সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। আচমকা গুলি এবং গ্রেনেড খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অবনী হাঁটু গেড়ে বসে পরমেশকে চিত করে শুইয়ে দিলো। পরমেশের ঠোঁট কাঁপছে। বুকে হাত দিলো অবনী। ভিজে গরম রক্ত হাতে লাগলো। অবনী কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। ওকে এখান থেকে কি করে সরানো যায়। পরমেশকে বাঁচানো দরকার। অবনীর কান্না পাচ্ছিলো।

স্টেশনের দিকে চিৎকারটা বাড়ছে। মুহুর্মুহু টর্চ জ্বলছে। পরমেশ গোঙাচ্ছে। কানটা মুখের কাছে নিয়ে গেল অবনী। 'শা-লা-সা-জা-নো—বেইমানি—', অবনী শুনলো। অবনীর বলতে ইচ্ছে করলো, 'গুরু আমি আছি। তেওয়ারিকে আমি জবাব দেবো।' অবনী পরমেশকে তুলতে চেষ্টা করলো। অসম্ভব এতো ভারী শরীর নিয়ে অবনী এক পা হাঁটতে পারবে না। কারা যেন, সম্ভবত রেল পুলিশের দল টর্চ জ্বালিয়ে ছুটে আসছে দেখতে পেল অবনী। দু তিনবার রাইফেলের আওয়াজ করলো পুলিশগুলো। ওরা এগিয়ে আসছে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ—? অবনী উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ঘুরে পরমেশকে শেষবার দেখলো। আর সেই সময় ওর নজরে পড়লো পরমেশের গলার সোনার চেনটা চিকচিক করছে অন্ধকারে। অবনী পরমেশের মাথার কাছে এগিয়ে এসে এক ঝটকায় ছিঁড়ে নিলো হারটা।

রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। চটচট করছে। ছেঁড়ার সময় পরমেশের মাথাটা ঝাঁকুনি খেলো। অবনী পরমেশের খোলা চোখের সাদা মণি অন্ধকারেও দেখতে পেলো।

পুলিশগুলো প্রায় এগিয়ে এসেছে। অবনী ছুটতে আরম্ভ করলো এবার। তিন চারটে রাইফেলের গুলি ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ ওর মনে হলো পরমেশটা যদি না মরে যায়, যদি হাসপাতালে চাঙ্গা হয়ে ও সব ফাঁস করে দেয়—অবনীর নামটা-ও। বেইমান কাকে বললো? অবনীকে? হার ছেঁড়ার সময় পরমেশের চোখ খোলা ছিল। অবনী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর পকেট থেকে পরমেশের দেওয়া গ্রেনেডটা বের করে পরমেশের রক্তাক্ত শরীরটা যে দিকে শুয়ে আছে সেইদিকে ছুঁড়ে দিলো। প্রচণ্ড শব্দে গ্রেনেডটা ফাটলো। অবনীর শব্দটা ভালো লাগলো।

অবনী আবার দৌড়োতে লাগল। পুলিশগুলো এগিয়ে আসছে। ফায়ারিং হচ্ছে ও সেই বিরাট নর্দমার কাছে এসে পড়লো। রক্তাক্ত হারটা কোথায় রাখবে ভেবে না পেয়ে মুখে পুরে নিয়ে অবনী নর্দমার মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। নর্দমার নোংরা পচা স্রোতে অবনী ভেসে যাচ্ছিল। এই পাঁক এবং পূতিগন্ধে অবনী এক সেকেন্ডও থাকতে পারতো না, কিন্তু পরমেশের রক্তমাখা হারের নোনতা স্বাদ ওর জিভ মুখ শরীরকে একটা আলাদা জগতে নিয়ে যাচ্ছিল। বেঁচে থাকার জন্যে দারুণ লোভে অবনী বুঝতে পারছিল যে এই নর্দমার স্রোতেই ও সবচেয়ে নিরাপদ। ০

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

লোকটা শেষ পর্যন্ত বাড়িতেও চলে এল। অনেক চেষ্টা করেও আটকে রাখতে পারল না অরুণা।

নাইট ডিউটি থেকে ফিরে সবে তখন একটু শুয়েছে। চোখ জুড়ে তখনও নিদ্রাহীন রাতের অবসন্নতা। এ অবসন্নতায় ঘুম পায়; আসে না সহজে। শরীর-ভাঙা ক্লান্তি চোখের পাতায় লেগে থাকে অনেকক্ষণ। বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে অরুণা টের পায় সব কিছুই। সংসারের প্রতিটি ক্রন্দন শুনতে পায়। ঠিকে ঝি মশলা করছে। শব্দ করে বালতি রাখল মেঝেতে। তুলি বাথরুম থেকে বেরোল। মাছের ঝোলটা রেঁধে এবার তৈরি হবে কলেজ যাওয়ার জন্য। নাকে-মুখে দুমুঠো গুঁজে নেবে। অরুণার নাইট থাকলে মেয়েটার এ-সময় খুব পরিশ্রম যায়। ইদানীং মা একেবারে কিছুই করতে পারে না। বাতের ব্যথায় শয্যাশায়ী প্রায়। বয়সও হয়েছে অনেক। কান গেছে। চোখেও দেখে না ভালো। তবু তো আছে। আলগা একটা নিরাপত্তার মতন। অরুণা বাড়ি থাকে না যখন, তুলি যখন বাড়িতে একা। এটুকুই যা সান্ত্বনা। এবার একটা রাতদিনের লোকের ব্যবস্থা করতেই হবে। খরচা একটু বাড়বে, বাড়ুক। সংসার সামলাতে গিয়ে মেয়েটার লেখাপড়ার বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে যেই একটু পাশ ফিরেছে অরুণা অমনি কলিংবেলের তীক্ষ্ণ ডাক গোটা বাড়ি জুড়ে।

—মা তোমাকে একটা লোক খুঁজছে।

অরুণা ঘুরে তাকাল।—কে?

—জানি না। খুব জরুরি দরকার বলল। তুলি ঘরে ঢুকে পড়ার টেবিলের দিকে গেল। বই খাতা গোছাচ্ছে,—অদ্ভুত চেহারা। হাড়গিলে টাইপের। এমন খোঁচ খোঁচা দাড়ি। নোংরা ছেঁড়া জামাপ্যান্ট। বুড়ো মতন। বলতে বলতে বিছানার পাশে এল,—দেখলেই ভয় করে। আমি বাবা...

অরুণা ধড়ফড় করে উঠে বসেছে। মেয়েরা কথা শেষ হওয়ার আগেই,—তুই অমনি দরজা খুলে দিয়ে চলে এলি? আক্কেলটা কি তোর?

—কি করবে? চুরি? অত সোজা নয়। তুলি নিশ্চিন্ত মনে চিরুনি টানল চুলে।

—তাছাড়া ——————— আছে না ঘরে?

অরুণা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল খাট থেকে। কত বড় চুরি হয়ে যেতে পারে তা যদি বুঝত তুলি! দরজার সামনে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। মেয়েকে বলবে এখন ঘর থেকে না বেরোতে? থাক। কী দরকার। অন্য কেউও তো হতে পারে। ভেতরের জামা পরা নেই। শরীর আলুথালু একেবারে। পলকে গুছিয়ে নিল নিজেকে। বড় করে শ্বাস টানল। মন বলছে সে। সে-ই। ত্বরিত পায়ে পার হল বাইরের ঘর আর শোবার ঘরের মাঝের জায়গাটুকু। দরজায় পৌঁছে গলা থেকে আপনা-আপনি ছিটকে এল শব্দগুলো, —তোমাকে আমি এখানে আসতে বারণ

করেছিলাম না? লোকটা ঘরে ঢোকেনি। বারান্দাতেও না। বারান্দার ওপারে গ্রিলের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ঝুলিয়ে। ঝুঁকে দাঁড়ানোর জন্যই বোধহয় লম্বা কুঁজোটে দেহ আরও বেশি ন্যুব্জ। কোটরাগত চোখ। তামাটে কপালে সময়ের অসংখ্য গলিঘুঁজি। উচ্ছৃঙ্খলতা ছাপ ফেলেছে শরীরের সর্বত্র। চুয়ান্নতেই চুয়াত্তুরে বুড়ো যেন। মাথাভরা আধ পাকা চুল রুক্ষ বিধ্বস্ত।

অরুণা চকিতে একবার দেখে নিল চৌকিতে শোওয়া মাকে। ছোট্ট শরীর গুটিয়ে-মুটিয়ে নিশ্চল পড়ে রয়েছে। জানলার দিকে মুখ। এখনও টের পায়নি কিছুই। পিছন ফিরেও দেখে নিল একবার। তুলি শোবার ঘরেই। কেউ কিছু বোঝার আগে লোকটাকে তাড়াতে হবে। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল প্রাণপণে। সামলানো কি যায়। রাগে মাথা দপদপ করছে। দ্রুত বারান্দায় এসে দাঁতে দাঁত ঘষল,—এখানে কি জন্যে এসেছ?

লোকটা মাথা তুলল। এক হাতে আঁকড়ে ধরেছে গ্রিলের দরজা। বুড়ো ভেড়ার মতো ঘোলাটে চোখ পিটপিট করে উঠল বারকয়েক।

— তোমার হাসপাতালে কাল গিয়েছিলাম। পরশুও। শুনলাম নাইট চলছে। তাই...

—তাই এখানে চলে আসতে হবে? তোমার সাহস তো কম না!

—আসতাম না, বিশ্বাস করো। নেহাত নিরুপায় হয়ে...

—কী দরকার? অরুণার গলা কঠিন আরও। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প, —কী চাই? টাকা?

লোকটা ঢোঁক গিলল, —খুব দরকার। সত্যি বলছি। গোটা কুড়ি অন্তত যদি দাও...

টাকা দিলেই লোকটা এক্ষুনি গিয়ে বোতল খুলে বসবে। অরুণা জানে। এরকমই দশা হয়েছে এখন। মেজাজ গেছে। দাপট গেছে। যৌবনের সব অহংকার তুবড়ে গেছে সময়ের কামড় খেয়ে। আজকাল এরকমই উপোসি বেড়ালের মতো ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায় দিন রাত। আকণ্ঠ গিলে পড়ে থাকে অস্থানে কুস্থানে। স্বভাব যাবে কোথায়। অরুণার কাছে গিয়ে হাত পাতে নির্লজ্জের মতো—দুদিন ধরে কিছু খাইনি। সত্যি। এবারটা দাও।

দেয় অরুণা। সব জেনেও। না দিয়ে উপায় নেই যে। পুরোনো লজ্জা ঢাকার। সম্মান বাঁচানোর। পাঁচজনের হাত থেকে। এক সময় ঝুরঝুরে ধ্বংসস্তূপ থেকে কী কষ্টেই না মাথা তুলতে হয়েছে একটু একটু করে। মেয়েটা তখন কতটুকুই-বা। সাড়ে-তিন কি চার সবে। একরত্তি শিশুটা ছাড়া মাথার ওপর ছেঁড়া ছাতার মতন পাশে শুধু একজনই। মা। দুজনেই সম্বলহীন। সমান নিঃসহায়। সেখান থেকে লড়াই করে এই অবধি পৌঁছোনো। তিলে তিলে ট্রেনি নার্স থেকে সিনিয়ার সিস্টার। যৌবন থেকে যৌবনপ্রান্ত।

পুরোনো বন্ধুরা বলে, লোকটাকে অ্যালাও করিস কেন তুই? ঘাড় ধরে বার করে দিতে পারিস না? কিসের ভয় তোর?

ভয় সর্বত্রই। নতুন করে সব কিছু হারানোর ভয়। যদি আবার বাড়িতে নতুন করে হাজির হয়! মেয়ে বড় হয়ে গেছে। তার থেকে টাকা পেলেই বিদায় হয়ে যায় যখন...। ভুল ধারণা। দুর্ভাগ্য যদি তাড়া করে যে কোনোভাবেই আটকানো যায় না তাকে।

অরুণার ইচ্ছে হল মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় লোকটার। তারপর যদি...! ভাবতে গিয়েই দম বন্ধ হয়ে আসছে। যথাসম্ভব গলা নিচু রাখার চেষ্টা করল, তবু রাগ হিসহিসিয়ে উঠছে স্বরে। রাগ না ঘৃণা? নাকি...?

—এবারকার মতো দিচ্ছি। মনে রেখো, বাড়িতে আর কোনোদিন আসার চেষ্টা করবে না।

অনেকবার বলা একই কথা। লোকটাও মাথা নাড়ল। ঘর থেকে প্রায় একছুটে গিয়ে টাকা নিয়ে এল অরুণা, —যাও। আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবে না এখানে।

ফিরে যাচ্ছে লোকটা। রোদ মাড়িয়ে আঁকা বাঁকা পায়ে ইট-ঢাকা কাঁচা নর্দমাটা পার হল। রাস্তায় উঠেছে। মোড় পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর অরুণা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ফেললই। টানতে পারল না নতুন করে। দরজা টেনে পেছন ফিরতেই সামনে তুলি। অবাক বিস্ময়ে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। —কে মা?

অরুণা বলার চেষ্টা করল, কেউ না। শব্দ এল না গলায়।

দুই

বাস থেকে নেমে তুলি দেখল, লোকটা আজও দাঁড়িয়ে আছে। পাশের পান-দোকানটার সামনে। ল্যাম্পপোস্টের নিচে। রোজ এভাবেই এসে দাঁড়িয়ে থাকে। যতক্ষণ না তুলি ফেরে কলেজ থেকে। একভাবে। কথা না বললে নিজে থেকে ডাকবেও না। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকবে শুধু। থাকগে। আজ আর এগিয়ে গিয়ে কথা বলবে না তুলি। মনস্থির করে কয়েক পা এগোলো রাস্তা ধরে। গিয়েও ফিরে এসেছে। পায়ে পায়ে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল, —কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?

লোকটার ঢুলুঢুলু চোখ হেসে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। চাহনিতে বোঝা যায় বেশ দুপাত্র চড়েছে দুপুরেই। কড়া স্পিরিটের গন্ধ বেরোচ্ছে।

তুলির ভুরু জড়ো হল। কাঁধের ওপর স্বচ্ছ উড়নিটাকে টানল অকারণে, —শুনুন, এভাবে এসে রোজ দাঁড়িয়ে থাকবেন না। বাজে দেখায়।

হাসি মিলিয়ে গেল। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তুলির গা শিরশির করে উঠল। এ লোকটা তার বাবা! জন্মদাতা! ভাবতেই গলার কাছে বিশ্রী কষ্ট ডেলা পাকায়। কেন এমন হয়! লোকটার ওপর কোনো মায়া থাকা উচিত নয়। মা ঠিকই বলে। লম্পট চরিত্রহীন একটা। নিজের ফুর্তির জন্য বউ-মেয়েকে অসহায় ফেলে চলে গিয়েছিল। এখনও আসে নিজের দরকারেই। এখনও বিন্দুমাত্র টান নেই কারুর ওপরেই। তুলির ওপরেও না। তবু তুলির কষ্ট হয় এভাবে লোকটাকে ভিখিরির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে। কিংবা মা যখন চিৎকার করে গালিগালাজ করে তখন। পরশুদিন তো মারতে বাকি রেখেছিল মা, লোকটা তখন এমন মাতাল যে কথা বলা দূরে থাক, চোখ খুলে তাকাতেও পারছিল না ভালোভাবে। কেন যে এত মদ খায়! এই আধমরা শরীরেও! এক এক সময় তুলির মনে হয় লোকটার হয়তো অনেক দুঃখ জমে আছে বুকে। পুরোনো ভুলগুলোর প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

চায় কি!

তুলি আবার প্রশ্ন করল। উল্টোদিকের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংটার দিকে চোখ রেখেই,—খাওয়া হয়েছে?

ডিগডিগে মাথা দুদিকে নড়ল বার কয়েক। মুখ অল্প হাঁ। তুলি একটু ভেবে নিল। ওপারের মিষ্টির দোকানটা খোলা আছে। একটু এগোলে সারদা কেবিনও। লোকজন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে দেখবে। তার থেকে বরং...। লোকটার লালচে চোখে চোখ রাখল তুলি, —আসুন। মা আসার আগে চলে যাবেন কিন্তু।

তুলি আগে আগে হাঁটছে। লোকটা পিছনে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসছে পায়ে পায়ে।

আকাশে রং বদলাচ্ছে সূর্য। দুধারের দোকানপাট খুলছে এক এক করে। হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে নজর রাখছিল তুলি। রাস্তায় লোক যদিও বেশি নেই, তবু পথচলতি মানুষেরা থমকে দেখছে একবার করে। টলমলে নেশাখোরের সঙ্গে অষ্টাদশী তুলি। একটু গতি বাড়িয়ে তুলি দূরত্ব বেশি করে নিল। মোড়ের বড় মুদি দোকানের দোকানদারটা গলা বাড়িয়ে তাদেরই রোজ দেখে। ক্রমশ কৌতূহল বাড়ছে অনেকেরই। পাড়া প্রতিবেশীর। চেনা পরিজনের। এদিকের কারুর সঙ্গেই তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠেনি। বলতে গেলে তারা একরকম নতুন বাসিন্দা এ অঞ্চলের। শ্যামবাজারের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে এই তো সবে দেড় বছর এসেছে মল্লিকপুরে। বাড়ির বাইরেটা এখনও প্লাস্টার করে উঠতে পারেনি মা। ছাদ এখনও ন্যাড়া। তুলি বড় রাস্তা ছেড়ে সরু রাস্তায় ঢুকল। এদিক-ওদিকে এখনও বাড়ি উঠছে মাঝে মাঝেই। কলকাতা থেকে একটু দূর হলেও জায়গাটা মোটামুটি সুন্দর। এখনও অনেক গাছপালা আছে। মাঝে মাঝে পুকুরও। ছাদে উঠলে হাওয়ায় ভেসে যায় শরীর। ওই লোকটা যদি ঠিক থাকত আরও সুন্দর কোনো জায়গায় থাকতে পারত তারা। কথাটা ভাবতেই হুড়হুড় করে একগাদা প্রশ্ন এসে গেল মনে। লোকটা কি কাজকর্ম করত কিছু! নাকি চিরকাল এমন বাউন্ডুলে! কোনোদিন কি ভালোবাসত তুলিকে? আদর করেছে কোলে নিয়ে? প্রশ্নগুলোর সঙ্গে দুম করে অভিমান ঢুকে পড়েছে মনে। মাঝরাস্তায় তুলি দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। দুর্বল পায়ে গুটি গুটি হাঁটছে। টলতে টলতে কাছে এল। তুলি তাকাল স্থির দৃষ্টিতে, --আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

লোকটা ঘাড় কাত করল। কথা বিশেষ বলে না কোনো সময়েই।

হঠাৎ আপনি আমাদের কাছে আসা শুরু করেছেন কেন?

প্রশ্নটা কি মা'র মতো হয়ে গেল? লোকটার মাথা ঝুলে গেছে নিমেষে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। নাহ্। এ লোক সমস্ত বোধ-বুদ্ধির বাইরে। রাগ নয়, অভিমানও নয়, এর ওপর শুধুই দয়া আসা উচিত। তুলি বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল আবার, —আসুন।

তিন

সিঁড়িতে পা রেখেই অরুণা টের পেল আজও তুলি নিয়ে এসেছে লোকটাকে। ছোট ছোট দু-ধাপ সিঁড়ির মাথায় গ্রিলঘেরা বারান্দা। বারান্দার মাঝ-বরাবর বাইরের ঘরের দরজা। দরজার দুদিকে ছেতরে পড়ে তার দুপাটি চপ্পল। গোড়ালি-খাওয়া, ধুলোকাদা মাখা। মুহূর্তে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল অরুণার। কলিং বেল না টিপে গ্রিলের দরজাটাকে ঝাঁকাল সজোরে।

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পর্দার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে তুলি। ভরাট যৌবন উড়নিবিহীন সালোয়ার কামিজে যথারীতি উদ্ধত। চোখ-মুখে নির্বিকার ভঙ্গি। অরুণার চোখ দপদপ করে উঠল, —আজ আবার নিয়ে এসেছিস?

—আমি আনিনি। নিজেই এসেছে।

তুলির নির্লিপ্ত জবাবে স্পষ্ট অবজ্ঞার ভাব। পরিষ্কার বোঝা যায়, মিথ্যা কথা বলছে। অরুণার চোয়াল শক্ত হল। এভাবে চলতে পারে না। আজ একটা বিহিত হওয়া দরকার। দরজায়, গ্রিলে, চটিতে অধৈর্য কিছু শব্দ বাজিয়ে দুমদাম ঢুকে এল ঘরে। লোকটার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল, —আবার এসেছ তুমি? নির্লজ্জ, বেহায়া কোথাকার।

লোকটা চুপ। বেতের সোফার এক কোণে জড়সড় বসে রয়েছে। বুড়ো শকুনের মতো

মুখখানা তোবড়ানো দেখাচ্ছে আরও। গলার দুখানা শির ফুলে রয়েছে উৎকট ভাবে। আধময়লা শার্টের কলার আধফাটা। ইস্তিরিবিহীন। পরনের প্যান্টখানাও সেরকমই জীর্ণ।

অরুণার তীক্ষ্ণ চোখ মানুষটাকে ছেড়ে পাক খেল গোটা ঘরে। লোকটার পাশে রাখা তেপায়া টেবিলে খালি প্লেট পরে রয়েছে একখানা। জলের গ্লাসও। নজর সেদিকে যেতেই লোকটা সংকুচিতভাবে বলে উঠেছে, —খুব খিদে পেয়েছিল। তুলি তাই......

—খিদে মিটেছে তো? বেরোও এবার।

—তোমার সঙ্গে কথা ছিল একটা।

—আমার শোনার সময় নেই।

অরুণা ভেতরের দরজার দিকে এগোল। দেখা না গেলেও আবছা বোঝা যায় পর্দার ওপাশে তুলি দাঁড়িয়ে আছে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল আচমকা। বুকের বাঁদিকে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। তুলি বড় বেশি স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে লোকটার সম্পর্কে। রক্তের টান যাবে কোথায়? রক্তের টান? না নিজেরই ভাঙা কপাল? যে-মেয়েকে এত কষ্ট করে বড় করে তোলা, সে'ও পর হয়ে গেল। ওই লোকটার মতোই। অরুণার চোখে জল এসে যাচ্ছিল, ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল জোর করে।

সেই ফাঁকে বেহায়া লোকটা বলে উঠল, —কয়েকটা টাকার দরকার ছিল।

অরুণা চকিতে ফিরে গেছে লোকটার সামনে। ভেতরকার সমস্ত রাগ, ক্ষোভ, হিংসা, যন্ত্রণা ফেটে পড়েছে একসঙ্গে, —এক পয়সাও তোমাকে আমি আর দেব না, বুঝেছ' একটা বাক্যের পর গলা চড়েছে আরও—কী ভেবেছ আমাকে তুমি, অ্যাঁ? আমার মুখের রক্ত তোলা পয়সায় তুমি ফুর্তি মেরে যাবে এভাবে? ...আবার নতুন করে সংসার ভাঙতে এসেছ আমার?...শয়তান। বলতে বলতে গলা কেঁপে যাচ্ছে। বিচিত্র সব স্বর ছিটকে আসছে গলা থেকে, —মেয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুমি মদ খাও, লজ্জা করে না তোমার? ...বুড়ো হয়ে চিতায় উঠতে চলেছ... ছিছি...রাস্তায় বেহেড হয়ে পড়ে থাকো রোজ?... তোমার লজ্জা না থাকতে পারে, আমার আছে। তোমার জন্য কোথাও মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছে...পাড়ায়, হাসপাতালে...

অরুণার উঁচু গলা ভেঙে এল ক্রমে। লোকটা তখনও নিরুত্তর। ধরা পড়া আসামির মতো যথারীতি ঘাড় ঝুলিয়ে ফেলেছে। অরুণা আরও সামনে এগিয়ে গেছে লোকটার, —শেষ জীবনটাও শান্তিতে বাঁচতে দেবে না আমাকে? একটু শান্তি দাও। দয়া করো...

—দাও, দাও বললেই কি শান্তি পাওয়া যায়? কোনোদিন পেয়েছে কেউ? অরুণার কথা শেষ হবার আগেই ঘরে ঢুকে পড়েছে তুলি। অরুণাকে থমকে দিয়ে বলে উঠল।

—উঠুন তো আপনি। অনেক হয়েছে। বলেই ফিরে তাকিয়েছে মায়ের দিকে।

—শুধু বাবার জন্য নয়। তোমার জন্যও চারদিকে মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠছে, বুঝেছ! এখন বুঝতে পারছি কেন তোমাকে ছেড়ে বাবা...

—কী? কী বললি? তীব্র বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠেছে অরুণা।

—ঠিকই বলছি। একটা অসুস্থ লোকের ওপর অত্যাচার করতে তোমার লজ্জা করে না? অরুণা হতবাক। অরুণা স্তম্ভিত। এ-ও শুনতে বাকি ছিল তবে! নিজেরই মেয়ের কাছ থেকে!

—এত বড় কথাটা আমাকে বলতে পারলি তুই? আমি অত্যাচার করি?

—করো। করো। তুলির চোখ ঘুরছে অশান্তভাবে। আজ ফয়সালা করে ছাড়বেই। ঘরের

মধ্যে চঞ্চল পায়ে পাক খেল কয়েকবার, —কবে একজন কী অন্যায় করেছে তার শোধ তুলতে তাকে তুমি মেরে ফেলবে এভাবে? একটু একটু করে?

—আমি মেরে ফেলছি?

—ফেলছই তো। হাসপাতাল থেকে মদের পয়সা দিয়ে বিদায় করে দিতে লোকটাকে। কিসের জন্য? কেন গোপন করেছিলে আমার কাছে?

—সে তো তোর জন্যই। তোদের জন্য।

—বাজে কথা। তুমি আসলে বাঁচতে দিতে চাও না লোকটাকে। এখনও নিজেদের কাছে রাখলে ভালো করে তোলা যায়। একটু ভদ্র ব্যবহার করলে...

—চুপ। আর একটা কথা শুনতে চাই না। অরুণা রুখে ওঠার সুযোগ পেয়েছে এতক্ষণে। মেয়ে নয়, বুঝি কোনো অচেনা প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ লেগেছে হঠাৎ।

—বড় বড় কথা বলছিস, কতটুকু জানিস এই লোকটার সম্পর্কে? তোর দিদাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ...

—আমার কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। যা বোঝার বুঝে গেছি। তুলি গলা নামিয়ে ফেলল সহসা, —তুমিও ঠিক কাজ করছ না, মা।

—যা করছি বেশ করছি।

—না। তুলির গলা আরও নিচে নামল। নিচু স্বরে মোক্ষম শব্দগুলোকে ছুঁড়ল এবার বিষাক্ত বাণের মতো, —বেশ, তা এতই যখন ঘেন্না, মাথায় সিঁদুর দিয়ে রেখেছ কেন ঢঙ করে? সতী সাজার জন্যে? নাকি সাজগোজের জন্যে? শাঁখা লোহা কেন রেখেছ হাতে? ডিভোর্স করোনি কেন? নাকি টিকিয়ে রেখে যন্ত্রণা দিতে চেয়েছ মানুষটাকে?

যাকে নিয়ে এত বাদ-বিবাদ মায়ে-মেয়েতে, সে কিন্তু দিব্যি বসে বিকারহীন। নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে সব কথা। নিশ্চয়ই খুশি হচ্ছে। অরুণার মাথা জ্বলে উঠল নতুন করে। শরীরের কোষে কোষে বুঝি আগুন লেগে গেছে। একটা একটা করে হাত থেকে টান মেরে খুলে ফেলল শাঁখা, লোহা। ছুঁড়ে ফেলে দিল জানলার বাইরে। আঁচল তুলে ঘষে ঘষে মুছে ফেলল সিঁদুর। কপাল থেকে। সিঁথি থেকে। —এই নে শান্তি? এবার শান্তি হয়েছে তোদের? বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছে হাউ হাউ করে। চোদ্দো বছর পর।

চার

কিছুতেই ঘুম আসছিল না তুলির। আসবেও না বোধহয়। অন্ধকারে মাথা তুলে একবার দিদিমাকে দেখার চেষ্টা করল। দেখা যাচ্ছে না। তবে ঘুমন্ত নিশ্বাসের শব্দগুলো শোনা যায় পরিষ্কার। না। সন্ধেবেলা দিদা কিছুই বুঝতে পারেনি। এরকমই নিশ্চিন্ত পড়েছিল বিছানায়। তুলিও যদি দিদার মতো হয়ে যেতে পারত! বধির। দৃষ্টিহীন। অনেক কষ্ট থেকে মুক্তি পেত তাহলে। ভাবতে ভাবতে বিছানায় উঠে বসল তুলি। রাত্রির নৈঃশব্দ্যে গোটা বাড়ি আকণ্ঠ ডুবে আছে। ফ্যানের হাওয়া কাটার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই কোথাও। কিছুক্ষণ কান পেতে রইল তুলি। ও ঘরের একটু শব্দও যদি শুনতে পায়। মা কি কাঁদছে এখনও? জীবনে কোনোদিন মা'কে ওভাবে কাঁদতে দেখেনি তুলি। না জানি কত আঘাত পেয়েছে মনে। তুলির বুকটা হুহু করে উঠল। ভীষণ অপরাধী লাগছে নিজেকে। ওই লোকটা, হ্যাঁ, ওই লোকটাই তো

সংসারের শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে তাদের। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। কেন যে লোকটার হয়ে ওভাবে বলে ফেলল তুলি। রাগের মাথায়। মা কাঁদতে কাঁদতে বলছিল,—ওই এখন বড় হয়ে গেল তোর কাছে? আমার থেকেও?

কক্ষনো না। ওই লোকটা কেউ নয় তুলির। শুধু রাস্তার মাতাল একটা। নেশাখোর বুড়ো ভিখিরি। ওরকম লোককে করুণাই করা যায় মাত্র। তুলি তো তাই করতে চেয়েছিল। মাঝখান থেকে সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল হঠাৎ। মশারি তুলে বিছানার বাইরে বেরিয়ে এল তুলি। লোকটা চলে যাওয়ার পর থেকে ও-ঘরের চৌকিতেই শুয়ে আছে মা। জল পর্যন্ত দেয়নি মুখে।

অন্ধকারেই পা টিপে টিপে পৌঁছে গেল বাইরের ঘরে। পর্দা সরাতেই তুলির হৃৎপিণ্ড নিথর। মা নেই বিছানায়। জানলা দিয়ে ল্যাম্পপোস্টের আলো এসে একাই গড়িয়ে আছে ফাঁকা বিছানায়। বাইরে যাওয়ার দরজা হাট করে খোলা। নিশ্বাস বন্ধ করে তুলি দৌড়ে গেল বারান্দায়। গ্রিলের দরজার তালাও খোলা। মা চলে গেছে। উদভ্রান্তের মতো সিঁড়ি দিয়ে তুলি নেমে গেল খানিকটা। ফিরে এসে বসে পড়ল সিঁড়িতে। আকাশ পৃথিবী আলো অন্ধকার সব চরকির মতো দুলতে শুরু করেছে চোখের সামনে। নিমেষে সব শূন্য হয়ে গেল। তুলি কাঁপতে লাগল থরথর করে।

ঠিক তখনই আচমকা কানে এসে ধাক্কা মেরেছে শব্দটা। হালকা কিন্তু স্পষ্ট। কে যেন চলাফেরা করছে গলিতে। বেড়াল? ইঁদুর? নাকি...? তুলি কান খাড়া করে রইল। আবার শব্দ হল। আবারও। ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল একসময়।

নোংরা সরু কাঁচা গলিতে রাত্রির অন্ধকারে বসে নর্দমা ঘাঁটছে মা। দু'হাতে। আধো-আলো আধো-অন্ধকারে মাকে কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছে। ঘেঁটে ঘেঁটে কাদামাখা শাঁখার টুকরো তুলল একটা। লম্বা নর্দমা হাতড়ে ধীরে ধীরে সব কটা ভাঙা অংশ তুলে বাঁ হাতের মুঠোয় চেপে রেখেছে প্রাণপণে। হাতে-পায়ে নোংরা কাদা মেখে গভীর রাতে কি কুড়োয় মা? একা একা? শুধুই শাঁখার টুকরো! লোহা! সাজের জিনিস! সংস্কার!

কক্ষনো না। তুলির দু-চোখ বেয়ে এতক্ষণ পর কান্না নেমে এল অঝোরে।

উজ্জ্বলকুমার দাস

'ছুটি' শব্দটা আমার জীবন থেকে বহুদিন আগেই ছুটি নিয়েছে। গতকাল তোমার আর্ট এগজিভিশানের সমালোচনা বেরিয়েছিল একটা নাম করা কাগজে। তাই কিছুতেই আর তোমার ছবি দেখার লোভটা সামলাতে পারলাম না।

রবিবার বিকেল। বেরিয়ে পড়লাম তোমার আর্ট এগজিভিশান দেখতে। নন্দন চত্বর পেরিয়ে চুপি চুপি ঢুকে পড়লাম অ্যাকাডেমির সাউথ গ্যালারিতে। ঢুকবার আগে গ্রামের বউদের মতো একটা বড় ঘোমটাও দিয়ে নিয়েছিলাম, তুমি যেন আমাকে চিনতে না পারো।

অ্যাকাডেমির সাউথ গ্যালারিতে ঢুকে তোমার আঁকা ছবিগুলো দেখে আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। তোমার এবারেরও ছবির বিষয় নারী।

তোমাব আঁকা প্রতিটি ক্যানভাসে আমার প্রথম জীবনের বিভিন্ন ছোটখাটো মুহূর্তগুলো তুলির টানে অসম্ভব বকমেব জীবন্ত হয়ে উঠেছে। একটা ছবিতে আমাব শরীরের সর্বাঙ্গ ঢাকা আটপৌরে তাঁতের শাড়ির ওঠাপড়ার মধ্যে এক পরমা গৌরী ছড়িয়ে দিয়ে তাতে দিয়েছ অমোঘ ইশারা আর আর্দ্র আমন্ত্রণ।

বাড়ি ফিরে এলাম, ভালোবাসার পবিতৃপ্তি নিয়ে। আমাকে নিয়ে তোমার আঁকা ছবিগুলো আমাকে যেন আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এখনও আমি যে তোমার জীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে বয়েছি, তার প্রমাণ মেলে তোমার আঁকা ছবিতে, তোমার ভালোবাসার তুলির স্পর্শে ক্যানভাসগুলো দেখে।

আমার মনের অতলন্ত তল ছুঁয়ে বুদ্‌বুদ্‌ কেটে ওঠা আমার দীর্ঘশ্বাসগুলো মিলিয়ে যায় কবেকার সেই পরিচিত পরিচয়। তার খবর হয়তো আজ আর কেউ রাখে না। জল কিংবা গভীরতা বা অন্য কোনও মানুষজন।

কিন্তু তবুও এক আশ্চর্য টান! মনের জ্বালায় সেই পুবোনো অস্থির দিনগুলো আতস বাজির মতো পুড়ে নিঃশ্বেস হয়ে যায়।

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপও হয়েছিল ওই অ্যাকাডেমির সাউথ গ্যালারিতে। তুমি সবে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেছ। আর সেটা ছিল তোমার জীবনের প্রথম আর্ট এগজিভিশন।

আমি নন্দনে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ছবি দেখতে গিয়ে হঠাৎ করে সেদিন অ্যাকাডেমির সাউথ গ্যালারিতে ঢুকে পড়েছিলাম।

তোমার আঁকা ছবিগুলো দেখে সেদিন আমার খুব ভালো লেগেছিল। তোমার সেই সিরিজের তুমি নাম রেখেছিলে—'মাই ভিউজ'। এই সিরিজের আটটি ছবিতে নারী স্বত্ত্বার সঙ্গে সমাজের মিথস্ক্রিয়ার অবচেতন রূপ ধরা পড়েছিল। কোনও ছবিতে জলের অতলে কাগজের নৌকোর সন্ধানে এক নারী, কোথাও বা এক নীলাভ নারীর সপ্নিল চোখের চারপাশে ভাসমান বুদ্‌বুদ্‌, কোথাও বা রক্তলাল পটভূমিতে নারীর অবস্থান, তার স্বপ্ন, আশা, ঘৃণা আর ভালোবাসার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল বারবার। তোমার সবকটি ছবির কম্পোজিশানগুলিতে ছিল নারীর মনন

ও নারীর স্বপ্নের কান্না। এক নারীর সূচীকার্যে কীভাবে ধরা পড়েছে আকাশের চাঁদ তারারা তা দেখে আমি সেদিন ভীষণ মুগ্ধ

আর ছিল নীলে বাঁধানো সাদা পটভূমিতে দুটি পাখির ছবি। পাখি দুটি দেখে আমার সেদিন মনে হয়েছিল নারী যেন তার সামাজিক শৃঙ্খল ভেঙে নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলায় ভেসে

তোমার ছবিগুলো দেখে সেদিন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে বড্ড ইচ্ছে হয়েছিল। তারপর তোমার সঙ্গে নিজেই যেচে গিয়ে আলাপ করেছিলাম। তুমি আমাকে একটা সুন্দর ভিজিটিং কার্ড দিয়েছিলে। যাতে লেখা ছিল তোমার বাড়ির ঠিকানা আর ফোন নম্বর।

বাড়ি ফিরে আসি। রাতের বেলায় যখন আমাদের বাড়ির সব ঘরের এক এক করে আলো নিভে যায়, সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন স্বপ্নের কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে তোমাকে আমি বার বার ছুঁতে চাই। তোমাকে যত ছুঁতে চাই, তুমি তত দূরে চলে যাও, আর আমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভাবি তোমাকে একবার ফোন করি। ফোনের কাছে গিয়ে আমার হাতটা কেন যেন কেঁপে ওঠে। বার বার শুধু মনে হয়, তুমি যদি কিছু মনে কর।

আর একবার চেষ্টা করলাম, তখনও পারলাম না। তার পরের বার সাহস করে তোমাকে ফোনটা করেই ফেললাম। তুমি নিজেই সেদিন ফোনটা ধরেছিলে। কিন্তু এ প্রান্ত থেকে আমার নামটা ছাড়া আমি আর কিছুই বলতে পারলাম না।

তারপর দিন আবার ফোন করলাম। সেদিন অবশ্য তোমার সঙ্গে আমার দুচারটে কথা হয়েছিল। আলোচনার বেশিরভাগ অংশই ছিল তোমার ছবি। সেদিন নিজের মনেব কথা আমি তোমাকে কিছুতেই বলতে পারিনি।

এভাবে ফোনে ফোনে বেশ কিছুদিন চলল তোমার আমার কিছু সংলাপ। যা আমাদের জীবন-নাটকের প্রথম দৃশ্যের কিছু খণ্ড চিত্র।

তারপর আমাদের আবার দেখা হল। তারপর আবার...., তারপর আবার...। এরপর থেকে প্রায় নিয়মিত হয়ে গিয়েছিল।

অনুভব, তুমি তখনও আমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারতে না। আর তোমার প্রতি আমি আমার থেকেও বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। কারণ অবশ্য জানি না। তোমার কী দেখে যে আমি আমার সমস্ত বাঁধন শিথিল করে তোমার জন্য অপেক্ষা করতাম তা আমি নিজেও জানি না। তুমি নিজেও হয়তো জানতে না, আমার মন তোমার ভালোবাসা পেতে চায়। আসলে ভালোবাসা ব্যাপারটা সব সময়ই বড় আপেক্ষিক।

একদিন তুমি আমাকে মডেল করে আমার একটা সুন্দর ছবি এঁকে আমাকে উপহার দিয়েছিলে। আর তার ওপর ছোট্ট একটা কোণে তুমি যে আমাকে ভালোবাস তার বহিঃপ্রকাশ করেছিলে।

দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের আরও একটা বছর কেটে গেল। আমরা দু'জনে আরও কাছাকাছি এসে গেলাম। দু'জন দু'জনকে ছেড়ে কিছুতেই আর থাকতে পারছিলাম না।

তারপর আমার বাড়ির অমতেই আমরা দু'জন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিলাম। তারপর দিন কয়েক পর তোমাদের বরানগরের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম।

আমাদের বিয়ের ক'দিন পরেই তোমার বেশ কয়েকটা ছবি বিক্রি হয়েছিল। চারদিক থেকে

তোমার ছবির খুব প্রশংসা হয়েছিল। সেই সময় হঠাৎ করে একটা ম্যাগাজিনের আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে চাকরিও পেয়ে গিয়েছিলে। আমি তোমাকে নিয়ে ভীষণ গর্ব অনুভব করতাম।

বিয়ের পরের বছরেই আমাদের দু'জনের জীবনের মাঝখানে এক নতুন অতিথি আসে। আমাদের বড় আদরের সন্তান। তার নাম তুমিই রেখেছিলে অভিষেক। তোমার নামের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে মিল রেখে।

তারপর আমরা বেশ ভালোই ছিলাম। তুমি যা রোজগার করতে তা দিয়ে কোনওরকমে আমাদের সংসাব চলে যাচ্ছিল। হয়তো আমাদের সংসারে বিশাল স্বচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু ভীষণ শান্তি ছিল। যা আজকের যুগে ভীষণ দুর্লভ।

কিছুদিনেব মধ্যেই তুমি অনেক কিছু স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিলে। একটা ভালো ফ্ল্যাট, নিজের একটা স্টুডিও, একটা ফোর হুইলার, আরও অনেক কিছু।

কিন্তু তোমাব এই স্বপ্ন পূরণেব জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা কিন্তু তুমি সেইসময় বোজগার করতে পাবতে না। ধীরে ধীরে তোমার ভিতরে আমার প্রতি রাগ জন্মাতে শুরু করল। ছোটখাটো বিষয নিয়ে আমাব সঙ্গে তুমি নানারকম অশান্তি করতে শুরু কবে দিলে। আমি সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে যেতাম।

আসলে কি জানো, প্রথম জীবনে অর্থ নিয়ে কোনও নারী বা পুরুষই ভাবনা-চিন্তা করে না। তাবপব প্রেম যখন ব্যবহার কবতে করতে দৈনন্দিন জীবনের একটা কর্তব্যবোধের মধ্যে এসে পড়ে, তখন আর সেই আকর্ষণ অনুভূত হয় না।

তাবপর তুমি একদিন নিজের মুখেই বললে, আমাকে চাকরি করবার জন্য। আমি কাগজের একটা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্তও করে দিলাম। চাকরিটা হয়েও গেল। একটা ছোট্ট কোম্পানিতে। আমি নিমবাজি হলেও তোমাব স্বপ্নের কথা ভেবে চাকরিটা নিয়ে নিয়েছিলাম। কারণ তুমিই বলেছিলে, কলকাতা শহবে নিজেব বাড়ি ছেড়ে একটু ভদ্রভাবে বাঁচতে গেলে দু'জনের উপার্জন কবাটা খুবই জরুবি। এই সত্যটা আমিও উপলব্ধি করেছিলাম।

চাকরিতে যেতে হত সকাল ন'টার মধ্যে। অভিষেককে সামলে, ঘরের সবকিছু সেরে চাকরিতে যেতে প্রায়ই আমার দেরি হয়ে যেত। তাই প্রথম মাসের মাইনেটা দিয়ে ওরা আমাকে ছাড়িযে দিল।

আমার চাকরিটা চলে যাওয়াতে তুমি সেদিন আমাকে অনেক অনেক কথা বলেছিলে। আমি নাকি কোনও চাকরিই করতে পারব না। আমি তোমার ওপর নির্ভর করেই সারাটা জীবন বেঁচে থাকব। অর্থাৎ আমি এক পরজীবী নারী।

সমাজের আদিযুগে অর্থাৎ সতীদাহর যুগ থেকেই অধিকাংশ নারীই কিন্তু ঘরকুনো। অর্থাৎ পুরুষশাসিত তথা ব্রাহ্মণ সমাজ সম্পত্তি ও স্বার্থসিদ্ধির দায়ে সমস্ত নারী সমাজকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বিভিন্ন মনীষিদের আবির্ভাব ও নারী জাগরণের ফলে নারী ধীরে ধীরে শিখেছিল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

তারপর অনেক যুগ কেটে গেছে। নারী তবুও সেই ঘরকুনো পরজীবিতাজ্ঞান কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কোনও নারী সংসারে, স্বামীর অধীনে থাকলেই, সে পরাধীন নয়। যে নারী যে ভাবে সংসারকে দেখে, ঘর করে। তার কাছে সংসার ও সাংসারিক মূল্যবোধ সেইরকম।

তবুও কোনও এক জায়গায় এত যুগের অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিত মেয়েরা মাঝে মাঝে একটা পরাধীনতা অনুভব করে।

আসলে কোনও নারীই কিন্তু কারও অধীনে নয়, ইচ্ছে করলেই সে সমাজটাকে ভাঙতে পারে, কিন্তু সমাজটা ভাঙাই বড় কঠিন কাজ।

তারপর তুমি একদিন এমন কথা বললে যে, আমি আমার সন্তানকে নিয়ে তোমার বাড়ি থেকে চলে আসতে বাধ্য হলাম।

তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে যে, আমার বাড়িতে উঠব, সে মুখও আমার ছিল না। সেদিন উঠেছিলাম আমার এক বন্ধুর বাড়িতে।

তারপর তুমি আমাকে অনেকবারই অনুরোধ করেছিলে তোমার কাছে ফিরে যেতে, কিন্তু আমি যাইনি। মনে মনে ভেবে ছিলাম আমার পরজীবিতার গ্লানি যে করেই হোক জীবন থেকে মুছে দেবো।

এরপর একদিন একটা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে সল্টলেকের সেক্টার ফাইভে একটা বিদেশি আই টি কোম্পানিতে মোটা মাইনের চাকরিও পেয়ে গেলাম।

তুমি শুনলে আজ খুব অবাক হবে সেই আমি এখন সকাল সাড়ে আটটায় টনটনে নার্ভে নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে সাড়ে ন'টাব মধ্যে অফিসে ঢুকে পড়ি। তারপর মাথায় শুধু আইডিয়াব বন্যা। অনেক রাত পর্যন্ত, আর তার সঙ্গে কীবোর্ডের ঝড। ওসব সরকারি চাকরদের স্টাইলে মশা মেবে পরচর্চার কামান দেগে খোশ গপ্পো করে ফাইলেব ফসিল ফাঁদার গপ্পো নয়। এ হল সেক্টার ফাইভ। গ্লোবাল খেল। লাগ ভেলকি লাগ বলে রূদ্ধশ্বাসে মাথা নিচু করে শুধু কাজ করে যাওয়া।

আজকাল প্রায়ই কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত তিনটে বেজে যায়। পরদিন সক্কালেই আবার সঠিক সময়ে অফিস। না গিয়ে আমার কোনও উপায় নেই। এ হল গ্লোবালজাল। আমাব কাজ আটকালো মানে, সারা পৃথিবীতে একসঙ্গে হোঁচট।

আয়োনেস্কোর একটা বিখ্যাত নাটক ছিল না, যার নাম 'রাইনোসেরস'। তাতে খামখেয়ালি 'ভাল্লাগেনা' টাইপের সেই বেরেঞ্জারকে তার পাক্কা পেশাদার বন্ধু জাঁ বলেছিলেন, 'আমি চাই—উইল টু অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান এমপ্লয়ি?' সেটাই এখন আমাদের কর্মসংস্কৃতির মূলমন্ত্র।

আর সত্যি কথা বলতে কী—'সবকিছু ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও' বলে উত্তেজিত হয়ে নীল আকাশের দিকে হাত মুঠো করে ছুঁড়ে কী লাভ!

আমরা কার কাছে আমাদের অভাব অভিযোগ জানাবো? প্রজেক্ট ম্যানেজার? না সি ই ও? তার কাজ আর আমার কাজ মিলে তবে একটা প্রজেক্ট সম্পূর্ণ হয়। তারপর সেটা পাঠানো হয়। এর মধ্যে আমরা একজন যদি ফাঁকি দিই, তাহলে সেই সম্মিলিত আউট পুটের খেলায় আমাদের কলকাতা ব্রাঞ্চের নাম খারাপ! তাহলে আমরা কার কাছে জবাবদিহি চাইব? কখনও মনে মনে ভাবি বিল গেটস, না কি? কিন্তু চাইব কেন?

তখনই একটা ঝোড়ো হাওয়া পুরোনো দিনের অ্যালবামের পাতাগুলো এক এক করে উল্টে যায় আমার মনের ব্যালকনিতে।

অনুভব, আজ চোখ বুজলেই দেখি কত মুখ। এক রাশ চেনা মুখের মিছিল। এই মুখগুলো একটা সময় আমাকে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে রেখে ছিল। তাদের মধ্যে কাউকে আমি ভালোবাসতাম। কেউ ছিল আমার পরমবন্ধু। কাউকে আবার শ্রদ্ধা করতাম। কাউকে আবার ভয়ও পেতাম। কারোর কাছে আমি ছিলাম কৃতজ্ঞ।

কিন্তু এই চেনা মুখগুলো একসময় ধীরে ধীরে আমার কাছে কেমন অচেনা হয়ে উঠেছিল। অনেক নতুন অবয়ব এসে হাজির হয়েছিল আমার চারপাশে। তখন মনে মনে ভাবতে শুরু করেছিলাম—এরাই কি আমার আপনজন?

তাই এখন মনে মনে ভাবি, সেদিন তোমার অপমান সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে এসে ভালোই করেছিলাম।

আমাদের মতো যুবক-যুবতীদের কাছে এই সেক্টার ফাইভ এক অপূর্ব সুযোগ নিয়ে এসেছে। মোহরের মতো কর্মসংস্থান এখানে ঝরে পড়ছে। যদি না পোষায় সরে যাও। কোটি কোটি হাত এই কাজ করতে উন্মুখ হয়ে আছে।

মাঝে মাঝে মনে মনে ভাবি এরা একটা দারুণ বুদ্ধি ফেঁদেছে। ওদের দিতে হচ্ছে নিজের দেশের মাইনের তেরো-চৌদ্দ ভাগের এক ভাগ। যা আমাদের কাছে চোখ ধাঁধানি। আর মনে মনে এই ভেবে শান্তি পাচ্ছি যে অন্যদের পেছনে ফেলে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেলাম। অষ্টঅঙ্গ ব্র্যান্ডবিকশিত।

আমার কাছে প্রতিটি দিনই নতুন দিন। শুধু এগিয়ে যাওয়ার দিন। কখনও কখনও অবশ্য ক্লান্ত হয়ে পড়ি। মনে হয় আবার সেই পুরোনো দিনটাতে ফিরে যাই। তাই আজ সেই নিঃসঙ্গ বিকেলটাকে বড় খুঁজে পেতে ইচ্ছে করে অনুভব। কতদিন পুকুর দেখিনি, যার শরীরে সবুজ আঁচল। কার্নিশ দেওয়া বিশাল ছাদে উঠে কতদিন সূর্যাস্ত দেখিনি। সন্ধের সময় ঠাকুরের আসনের সামনে শাঁখ বাজাইনি। সব কিছু আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে।

আমি কিন্তু একজন মধ্যবিত্ত ছাপোষা বাঙালি গৃহবধূর মতো বুকে অনেক যন্ত্রণা, হতাশা, দুঃখ নিয়ে, হরেকরকম ম্যানিয়া, সংস্কার, অনেক সংযম, আর অনেক স্বপ্ন নিয়ে একটা ছোট্ট পৃথিবী গড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা পারিনি।

অনুভব, আমার সেই নিঃসঙ্গ বিকেলটা তোমার কাছে রয়ে গেছে কি? তুমি আমাকে ফেরত পাঠাতে পারবে?

কিন্তু হঠাৎ করে কে যেন আমাকে মনে করিয়ে দেয় সেক্টর ফাইভের কথা। যেখানে কাটে আমাদের মতো মানুষদের জাগরণের সিংহভাগ। আইটি এবং কলসেন্টার। আমাদের শ্রমের উদ্ভাসিত উল্লাস। আমাদের মতো ছেলেমেয়েরা অল্প বয়স থেকেই পেতে শুরু করেছে দশ-বিশ হাজার টাকা মাইনে। মনে মনে ভাবি—বাঙালির স্বপ্ন সত্যি হল। 'পঁচিশেই ফ্ল্যাট গাড়ি।'

এই ক'বছর চাকরি করে আমারও একটা বারোশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট, বিদেশি মডেলের গাড়ি হয়েছে।

কিন্তু অনুভব, কী হবে? এসব তো আমি কোনওদিন চাইনি। আমি চেয়েছিলাম শুধু তোমাকে নিয়ে একটা ভালোবাসার জীবন। কিন্তু এজীবন শুধু দৌড়ের। শুধু দৌড় আর দৌড়। আমি এখন কতক্ষণই বা বাড়িতে থাকি? বরং অফিসটাই আমার বাড়ি। এখানে শুধু আমার নিজস্ব কোনও টুথব্রাশ নেই।

একটা সময় ছিল, এখানে পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করলেই, সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমেরিকায় সেটল হত। এ যে তার চেয়েও অদ্ভুতুড়ে হল। আমি যে নিজভূমে থেকেও যে পরবাসী হয়ে গেলাম।

আমার ছেলে অভিষেকের সঙ্গে শুধু ফোনেই কথা হয়। শনি-রবিবার ছাড়া ওকে আমি

কোনওদিন জাগা অবস্থায় দেখি না। আমি অফিস থেকে ওকে বারবার ফোন করি। সব হতাশাকে শুকনো পাতার মতো সরিয়ে যখন রাতে বাড়ি ফিরি, তখন অভিষেক ঘুমোয়। ওর মাথায় আলতো চুমো দিয়ে বলি, হয়তো তোর জন্যই এখনও আমি বেঁচে আছি।

অথচ একই শহর, একই বাড়ি, একই ঘর। তাহলে কি এই শহরের ভিতরেই তৈরি হচ্ছে আর একটা নতুন শহর? অন্য স্পেস? তার রীতি রকম চলন-বলন সবই অন্যরকম। সেটাই কি গ্লোবাল? যার আওতায় পড়ে আমাদের সমস্ত সম্পর্কের বুনট এলোমেলো ও ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে? আমরা কি অন্যত্র হয়ে যাচ্ছি? একেবারে অন্য?

উইকএন্ড। শব্দটা আমার জীবনের পাতায় বড়ই বেমানান। শ্রমের খোঁয়াবি কাটতে কাটতে শনিবার বিকেল। রবিবার একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা। রবিবারের এক চিলতে রোদ্দুর আমার ঘরের মেঝেতে কাটিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু আমার উইকএন্ড কর্পূরের মতো ফুরিয়ে যায়। আবার সোমবার। ওয়ার্ক ডে।

জীবন থেকে হারিয়ে গেছে আত্মীয়-স্বজন, পুরোনো সব বন্ধু-বান্ধবীরা। কোনও সময় নেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার। তাই সহকর্মীরাই আমার একমাত্র বন্ধু। যাওয়ার জায়গা একমাত্র স্বভূমি। যাওয়ার সময় শুধু এক্সটেনডেড লাঞ্চ। আমার জন্য নামটা খুব সিগনিফিক্যান্ট। যাতে মনে পড়ে যায় নিজের জায়গাতেই আছি, নিজ লোকালয়ে। শুধু লোক আর আলয় দুটোই আমার জীবন থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে।

অনুভব, তুমি তো জানো, গ্রীষ্মের দুপুর ছিল আমার কাছে খুব প্রিয়। বুক খালি করা কাকের ডাক দুপুরকে আরও ব্যাথাতুর করে তুলত। এখন একটা নির্জন দুপুর আজ আর খুঁজে পাই না।

ছাদের অ্যানটেনায় কাক বসে ডাকত। বরানগরের তোমাদের বাড়ির গলি দিয়ে বাসনওয়ালা চলে যেত ঠং ঠং করে বাসন বাজাতে বাজাতে। পিছনে পিছনে বাসনের ঝুড়ি নিয়ে যেত তার মুটে মজুর।

রাস্তা খাঁ-খাঁ। দুপুর দেড়টায় রেডিওতে বাজত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর। হয়তো অশোকতরু গাইছেন—'ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে পাখি যা উড়ে যা—।' তোমাদের বাড়ির লম্বা বারান্দায় কাঠের রেলিঙে ঝুলত আমার ভেজা শাড়ি। টপ্ টপ্ করে নিচের রকে তা থেকে জল পড়তো। আমাদের ঘরে পুরনো আমলের ডিসি ফ্যানটা বিরাট মাথা নিয়ে ঘর-ঘর শব্দ করে একটানা ঘুরতো। আমি জানলা খুলে পর্দা নামিয়ে দিবানিদ্রায় মগ্ন হতাম।

বিকেল হলে সুন্দর করে সেজে তোমার আসার অপেক্ষায় বারান্দার রেলিঙে দাঁড়িয়ে থাকতাম আমি।

সেই মুহূর্তগুলো আজও আমি মাঝে মাঝে খুঁজি। কিন্তু সেই মুহূর্তগুলো সাদ্দামের তেলের চেয়েও বড় দামি। শকুন্তলার সেই আংটির মতো মাছের পেট থেকে যদি একবার ফিরে পাওয়া যেত। তাহলে বেশ হত। তাই না! কিন্তু সেই নিরুদ্দিষ্ট সেই মুহূর্তকে আর কোনওদিন হয়তো ফিরে পাওয়া যাবে না।

এমন অলসতা গায়ে মেখে একসময় জীবন কাটিয়েছি; একথা ভাবতেই কেমন জানি লাগে। মনে হয় যেন সবটাই স্বপ্ন।

কেন না আজ আমার এক অন্য জীবন। সব পাখি ঘরে আসুক গে, আমি অতন্দ্র তাকিয়ে দিনরাত কীবোর্ডে ঝড় তুলি। যে করেই হোক, আমাকে আরও

অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে কারও দিকে তাকালে চলবে না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবী কাউকে চিনলে চলবে না।

আপনজনকে যদি আমরা আপন বলে চিনতে না শিখি, তাহলে কোথায় দূরে কার কী হল, কে কী হারাল, এই সংবেদনে সাড়া দেওয়ার ভাষা আর আমরা জানব কি? তাহলে কী শুধু নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখবো। বাইরের পৃথিবীর দরজা সপাটে বন্ধ করে দিয়ে খালি 'মাথার ভিতর ঘর।' ঘরের ভিতর ঘর। ঘরের ভিতর একা একা ঘর করি।

কত কষ্টে কত শতাব্দীর শ্রমে প্রাপ্ত সম্পর্কের একটা বিশেষ ধরন, গড়ন, যত্ন-আত্তি, পাশে থাকার অঙ্গিকার শুধু সময়ের অভাবে নিঃসাড়ে খুলে নিচে পড়ে যাবে?

অনুভব, তুমি হয়তো মনে মনে ভাবছো—আমি বড্ড বেশি ভাবালু হয়ে পড়েছি, তাই না! গতকাল আমার প্রজেক্ট ম্যানেজার সুদেষ্ণা বলছিল, 'আই অ্যাম গোয়িং অন থার্টি সিক্স, মাই হাজব্যান্ড ফরটি প্লাস অ্যান্ড উই আর নট ইয়েট রেডি টু প্ল্যান ফর আওয়ার ফার্স্ট চাইল্ড।' কথাটা শুনে আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেছি।

অনুভব, জীবন এখন দৌড়চ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে মানুষ এখন শুধুই উপরের দিকে উঠতে চাইছে। সেই 'সীমাবদ্ধ'-র জামাইবাবুর মতো। কিন্তু এই আরোহনের শেষ কোথায়?

রাজপথ দিয়ে শুধুই ছুটে চলেছে হু হু করে নিত্য-নতুন মডেলের বিদেশি গাড়ি। টিভি, ভিসিআর, মিউজিক সিস্টেমে গান চলছে— 'মেরা প্যান্ট ভি সেক্সি, জুতা ভি সেক্সি।' স্কচ, হুইস্কি, ককটেল, মিনিস্কার্ট' জিন্স। ডিপ্লোম্যাসি। সৌজন্যের সুগার কোটিং দিয়ে স্বার্থান্বেষী প্রতিযোগিতা। অহঙ্কারকে এরা বলে আত্মবিশ্বাস। অসততাকে বলা হয় বাস্তববোধ। এ কোন চোরাবালিতে আমরা আজকের যুগের মানুষেরা ডুবে যাচ্ছি।

আজকের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে কি সত্যি আমরা পিছিয়ে যাব। পিছিয়ে পড়ি না, সামনের দিকে এগিয়েই বা লাভ কী! আমার তো মনে হয় এতে অনেক ক্ষতি। আজকে বেশির ভাগ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। কারও সঙ্গে কারও কোনও সৎ ভাব নেই। নেই কোনও ভালোবাসার বন্ধন। একটাই শুধু জিনিস আছে তা হল—দেওয়া-নেওয়া। যাকে আজকে অনেকেই ইংরেজিতে বলে থাকেন— 'গিভ অ্যান্ড টেক' পলিসি। কিন্তু সব সম্পর্কই কি এই 'গিভ অ্যান্ড টেক' পলিসিতে বেঁচে থাকতে পারে? পারে না। সেইজন্যই চারদিকে এত ভাঙন।

তোমার আমার সম্পর্কও দেখলে না কিছুতেই বাঁচানো গেল না, শুধু মাত্র তোমার চাওয়ার পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে গেল বলে, আর আমার দেওয়ার ক্ষমতা তখন একেবারেই ছিল না বলে।

কিন্তু আজ আমার সব কিছু দিয়ে তোমাকে পেতে বড্ড ইচ্ছে করে। আমি শুধু তোমাকে পেতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা অনুভব, তোমার কি আমাকে পেতে ইচ্ছে করে না? তাহলে আমাকে না দেখে আছো কী করে? যদি আমাকে ভালোবেসে থাক, তাহলে কি একবারও ইচ্ছে করে না, আমার কাছে আসতে? কী অদ্ভুত মানুষ তুমি? কী রকম নিরাকার বিমূর্ত ভালোবাসায় বিশ্বাসী তুমি!

লেখক পরিচিতি

• **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** • জন্ম ১৮৬১। মৃত্যু ১৯৪১। সাহিত্যের যে শাখায় তিনি হাত দিয়েছেন, সেখানেই সোনা ফলেছে। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যের সেরা সম্মান 'নোবেল' পুরস্কারে ভূষিত হন। অজস্র গ্রন্থ। সবগুলিই কম-বেশি উল্লেখযোগ্য। সেইসব গ্রন্থের কয়েকটি—সোনার তরী, পুনশ্চ, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা, খাপছাড়া, ডাকঘর, মুক্তধারা, সাহিত্যের স্বরূপ প্রভৃতি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় • জন্ম ১৮৭৩। মৃত্যু ১৯৩২। রবীন্দ্রনাথের কালের সুখ্যাত কথাশিল্পী। পেশায় ছিলেন আইনজীবী। সম্পাদনা করেছেন 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা। উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ—দেশী ও বিলাতী, নবকথা, ষোড়শী, গল্পাঞ্জলি, নূতন বউ, জামাতা বাবাজী প্রভৃতি। অনেকগুলি উপন্যাসও রচনা করেছেন। যেমন—রমাসুন্দরী, নবীন সন্ন্যাসী, জীবনের মূল্য। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।

• **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** • জন্ম ১৮৭৬। মৃত্যু ১৯৩৮। সম্পাদনা করেছেন মাসিক 'যমুনা' পত্রিকা। কয়েকটি স্মরণীয় গ্রন্থ—পথের দাবী, দেবদাস, দত্তা, বিন্দুর ছেলে, পল্লীসমাজ, বিরাজ বউ, শ্রীকান্ত, মেজদিদি ও রামের সুমতি। 'পথের দাবী' গ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে।

• **রাজশেখর বসু** • জন্ম ১৮৮০। মৃত্যু ১৯৬০। কর্মজীবনে ছিলেন রসায়নবিদ, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের পরিচালক। 'পরশুরাম' নামের আড়ালে রচনা করেছেন হাস্যরসে ভরপুর, গল্প-উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—গড্ডালিকা, হনুমানের স্বপ্ন, কজ্জলী ও কৃষ্ণকলি। রসসাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি রামায়ণ-মহাভারতে গদ্য-অনুবাদ করেছেন। 'চলন্তিকা' তাঁর অমর কীর্তি। পেয়েছেন আকাদেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কার।

জগদীশ গুপ্ত • জন্ম ১৮৮৬। মৃত্যু ১৯৫৭। কর্মসূত্রে সিউড়ী ও বোলপুর আদালতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীকালে নতুন ধারার কথাসাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কালিকলম, কল্লোল ও বিজলী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। প্রকাশিত গল্প-গ্রন্থ—বিনোদিনী, মেঘাবৃত, অশনি ও উদয় লেখা। দুলালের দোলা, নিষেধের পটভূমিকায় ও লঘুগুরু তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

• **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়** • জন্ম ১৮৯৪। মৃত্যু ১৯৫০। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পথের পাঁচালী। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ—আরণ্যক, অপরাজিত, আদর্শ হিন্দু হোটেল, চাঁদের পাহাড়, ইচ্ছামতী প্রভৃতি শেষোক্ত গ্রন্থটির জন্য মৃত্যুর পর রবীন্দ্র পুরস্কার পান। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও রয়েছে অনেকগুলি ডায়েরিধর্মী রচনা। যেমন, অভিযাত্রিক, স্মৃতির লেখা, তৃণাঙ্কুর, উর্মিমুখর প্রভৃতি।

• **বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়** • জন্ম ১৮৯৪। মৃত্যু ১৯৮৭। নানা ধরনের গল্প উপন্যাস লিখেছেন। হাস্যরস পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর নীলাঙ্গুরীয় উপন্যাসটি ও বরযাত্রী গল্প গ্রন্থটি একদা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—স্বর্গাদপি গরীয়সী, দুয়ার হতে অদূরে, পোনুর চিঠি প্রভৃতি। পেয়েছেন দেশিকোত্তম ও রবীন্দ্র পুরস্কার। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. লিট. উপাধিতে ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দেশিকোত্তম উপাধিতে সম্মানিত করেছে।

• **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়** • জন্ম ১৮৯৮। মৃত্যু ১৯৭১। উত্তর-শরৎচন্দ্র যুগের অন্যতম কথাশিল্পী। রাঢ়ভূমির বহু বাস্তব সত্য আশ্চর্য দক্ষতায় সাহিত্য করে তুলেছেন। কয়েকটি স্মরণীয় গ্রন্থ—গণদেবতা, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, ধাত্রীদেবতা, সন্দীপন পাঠশালা, কবি প্রভৃতি। রবীন্দ্র, জ্ঞানপীঠ ও আকাদেমি

পুরস্কার ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগৎতারিণী পদক ও ভারত সরকারের পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

• **বনফুল** * জন্ম ১৮৯৯। মৃত্যু ১৯৭৯। বনফুল নামটি ছদ্মনাম। আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। চিকিৎসক-জীবনের গোড়ার দিকে রচনা করেন তৃণখণ্ড উপন্যাসটি। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—অগ্নীশ্বর, ডানা ও হাটে বাজারে। তাঁর অধিকাংশ গল্পই আকারে ছোটো। কিন্তু গভীর চিন্তা-ভাবনায় সমৃদ্ধ। রবীন্দ্র পুরস্কার ছাড়াও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট. উপাধিতে সম্মানিত হয়েছেন।

• **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়** * জন্ম ১৮৯৯। মৃত্যু ১৯৭৬। গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। বহু ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাসও রচনা করেছেন। এই পর্যায়ভুক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে গৌরমল্লার ও তুঙ্গভদ্রার তীরে উল্লেখযোগ্য। ব্যোমকেশ বক্সী অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। তাঁর গোয়েন্দা-সাহিত্য পাঠক মহলে প্রভূত সমাদৃত। ছোটোদেব জন্যও লিখেছেন। সদাশিবের গল্পগুলি ছোটোদের অত্যন্ত প্রিয়। রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় * জন্ম ১৯০১। মৃত্যু ১৯৭৬। প্রথম জীবনে লিখতেন কবিতা। পরে গল্প-উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—কয়লা-কুঠির দেশে, বধূববণ, ডাক্তাব, ঝড়ো হাওয়া, সারারাত, অপরূপা প্রভৃতি। চলচ্চিত্রেব সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তৎকালে তাঁর পরিচালনায় একাধিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

শিবরাম চক্রবর্তী * জন্ম ১৯০৩। মৃত্যু ১৯৮০। প্রথম জীবনে মূলত কবিতা লিখতেন। 'চুম্বন' ও 'মানুষ' প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। পরবর্তীকালে হাস্যরসাত্মক গল্প-উপন্যাসে খ্যাতি অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—বাড়ি থেকে পালিয়ে, মন্টুর মাস্টার, যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন, বাঁজার করার হাজার ঠ্যালা, নাক দিয়ে নাকাল। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ঈশ্বব পৃথিবী ভালোবাসা' ও বাজনৈতিক-চিন্তাপ্রসূত 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেবী' তাঁব উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

• **প্রমথনাথ বিশী** * জন্ম ১৯০১। মৃত্যু ১৯৮৫। অধ্যাপনা করতেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সমালোচনামূলক সাহিত্যের পাশাপাশি গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক সবই প্রায় লিখেছেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—লালকেল্লা, কেশবতী প্রভৃতি। রবীন্দ্র-কাব্য প্রবাহ, রবীন্দ্র-নাট্য প্রবাহ ও রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত * জন্ম ১৯০৩। মৃত্যু ১৯৭৬। কল্লোলযুগের লেখক। সেই যুগের বিবরণ রয়েছে তাঁর 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থটিতে। 'উত্তরায়ণ' গ্রন্থের জন্য লাভ করেন রবীন্দ্র পুরস্কার। গল্প-উপন্যাস-কবিতা ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—ইন্দ্রাণী, রূপসী রাত্রি, প্রিয়া ও পৃথিবী প্রভৃতি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র * জন্ম ১৯০৪। মৃত্যু ১৯৮৯। কাব্য-সাহিত্যে, গদ্য-সাহিত্যে দু' ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেছেন। বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছেন আকাদেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—প্রথমা, ফেরারী ফৌজ, পাঁক, মিছিল, আগামীকাল, হানাবাড়ি, বেনামী বন্দর, হট্টমালার দেশে প্রভৃতি।

• **সতীনাথ ভাদুড়ী** * জন্ম ১৯০৬। মৃত্যু ১৯৬৫। পরাধীন ভারতবর্ষে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভাগলপুর জেলে বেশ কিছুকাল আটক ছিলেন। এই পটভূমিতেই লেখেন 'জাগরী' উপন্যাসটি। জাগরী রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—চিত্রগুপ্তের ফাইল, ঢোড়াইচরিত মানুষ।

• **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়** * জন্ম ১৯০৮। মৃত্যু ১৯৫৬। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে হঠাৎ লিখে ফেলেন জীবনের প্রথম গল্প। পাঠান 'বিচিত্রা'-য়। ছাপাও হয়। এরপর এক এক করে বিস্তর লিখেছেন। লেখাই

ছিল জীবিকা। উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়—দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা, জননী, স্বাধীনতার স্বাদ প্রভৃতি। রয়েছে কয়েকটি গল্পগ্রন্থ। যেমন, প্রাগৈতিহাসিক, আজ কাল পরশুর গল্প, ছোটো বকুলপুরের যাত্রী।

বুদ্ধদেব বসু * জন্ম ১৯০৮। মৃত্যু ১৯৭৪। লিখেছেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কাব্যনাটক। ১৯৬৭ সালে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্যনাটকের জন্য পেয়েছেন আকাদেমি পুরস্কার। ১৯৭৪ সালে পেয়েছেন মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার, 'স্বাগত-বিদায়' কাব্যগ্রন্থের জন্য। পেশায় ছিলেন অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—বন্দীর বন্দনা, শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর, গোলাপ কেন কালো, তিথিডোর। সম্পাদনা করেছেন 'কবিতা' পত্রিকা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র * ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই লেখালিখি শুরু করেছিলেন। সম্পাদনা করেছিলেন 'কথাসাহিত্য' নামে একটি পত্রিকা। ১৯৯৪ সালে মৃত্যু হয়। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : রাই জাগো, কান্তাপ্রেস, কলকাতার কাছেই প্রভৃতি।

লীলা মজুমদার * ১৯০৮ সালে কলকাতায় জন্ম। 'সন্দেশ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদিকা। ছোটদের জন্য ও বড়দের জন্য বহু গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। পেয়েছেন অনেক পুরস্কার। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : হলদে পাখির পালক, পদি পিসির বর্মি বাক্স, খেরোর খাতা প্রভৃতি।

সুবোধ ঘোষ * জন্ম ১৯০৯। মৃত্যু ১৯৮০। বাসের কন্ডাক্টার হিসাবে কর্মজীবনের সূচনা। নিরলস সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শেষে সাংবাদিক-জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—পরশুরামের কুঠার, ফসিল, তিলাঞ্জলি, ভারত প্রেমকথা প্রভৃতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছে।

আশাপূর্ণা দেবী * জন্ম ১৯০৯। মৃত্যু ১৯৯৫। ভারতীয় সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত। এছাড়াও আকাদেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সুবর্ণলতা, বকুলকথা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, বলয়গ্রাস, নেপথ্য নায়িকা প্রভৃতি।

বিমল মিত্র * জন্ম ১৯১২। মৃত্যু ১৯৯১। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায় অনূদিত হয়েছেন। আসামী হাজির, কড়ি দিয়ে কিনলাম, পতি পরম গুরুর মতো অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস লিখেছেন। পাঁচশোর বেশি ছোটোগল্প, শতাধিক তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী * জন্ম ১৯১২। মৃত্যু ১৯৮২। প্রথম উপন্যাস সূর্যমুখী। গল্প-লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি। উল্লেখযোগ্য গল্প-গ্রন্থ—শালিক কি চড়াই। অন্যান্য গ্রন্থ—বারো ঘর এক উঠান, মীরার দুপুর, প্রেমের চেয়ে বড়, বন্ধু পত্নী প্রভৃতি।

কমলকুমার মজুমদার * জন্ম ১৯১৫। মৃত্যু ১৯৭৯। অন্যধারার লেখক। অন্তর্জলি যাত্রা, খেলার পৃথিবী, পিঞ্জরে বসিয়া সুখ তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। নিম অন্নপূর্ণা, গোলাপসুন্দরী বা শ্যাম নৌকার মতো বহু স্মরণীয় গল্প লিখেছেন। চিত্রাঅঙ্কনেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আইকম বাইকম' ছড়া সংকলনটির চিত্রাঙ্কন তিনি নিজেই করেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র * জন্ম ১৯১৭। মৃত্যু ১৯৭৫। পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। শতাধিক তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—চেনা মহল, তিনদিন তিনরাত্রি, আত্মকথা, অসমতল। তাঁর একাধিক গল্প-উপন্যাস চিত্রায়িত হয়েছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার * জন্ম ১৯১৮। মৃত্যু ২০০১। অন্য ধারার কথাশিল্পী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—গড় শ্রীখণ্ড, চাঁদ বেনে, নয়নতারা, রাজনগর, মধু সাধুখাঁ প্রভৃতি। আকাদেমি ও বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় * জন্ম ১৯১৮। মৃত্যু ১৯৭০। অধ্যাপনা করতেন। কথাসাহিত্যে তাঁর বিপুল অবদান। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি—উপনিবেশ, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, মন্ত্রমুখর, মহানন্দা, স্বর্ণসীতা, লালমাটি।

ছোটোদের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। টেনিদার গল্পগুলি ছোটোদের অত্যন্ত প্রিয়। প্রবন্ধ-সাহিত্যেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

• **বিমল কর** * জন্ম ১৯২১। মৃত্যু ২০০৩। 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। গল্পের নাম 'বরফ সাহেবের মেয়ে'। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও নাটক লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—কাচঘর, আঙুরলতা, প্রেমশশী প্রভৃতি। 'অসময়' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন আকাদেমি পুরস্কার। ছোটোদের জন্যও অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন।

• **শক্তিপদ রাজগুরু** * ১৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মূলত উপন্যাসিক। তাঁর বহু লেখা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : মেঘে ঢাকা তারা, অবরুদ্ধ নগরী প্রভৃতি।

• **সমরেশ বসু** * জন্ম ১৯২৪। মৃত্যু ১৯৮৮। ১৯৪৬ সালের শারদীয় পরিচয়ে তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব' প্রকাশিত হয়। কালকূট ছদ্মনামে অনেক স্মরণীয় লেখা লিখেছেন। যেমন, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ও শাম্ব। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—গঙ্গা, বি.টি. রোডের ধারে, যুগ যুগ জিয়ো, শ্রীমতী কাফে ও নয়নপুরের মাটি। গোগোলকে নিয়ে লেখা গল্পগুলি ছোটোদের মহলে সমাদৃত হয়েছে।

• **রমাপদ চৌধুরী** * জন্ম ১৯২২। আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় বিভাগে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—লালবাঈ, বনপলাশির পদাবলী, বাড়ি বদলে যায়, খারিজ, পরাজিত সম্রাট, যেখানে দাঁড়িয়ে, অরণ্য আদিম। আকাদেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন।

• **মহাশ্বেতা দেবী** * জন্ম ১৯২৬। অধ্যাপনা করতেন। সুসাহিত্যিক মণীশ ঘটকের কন্যা। ধুলো-মাটি মাখা আদিবাসী মানুষজনের কথা তাঁর গল্প-উপন্যাসে বার বার ঘুরে-ফিরে আসে। ম্যাগসেসাই ও আকাদেমিসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অরণ্যের অধিকার, হাজার চুরাশির মা. নটী, প্রেমতারা, ইঁটের পরে ইঁট, ছয়ই ডিসেম্বর, বীরসামুণ্ডা, সিধু কানুর ডাকে প্রভৃতি।

• **সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ** * জন্ম ১৯৩০। পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অলীক মানুষ, অনুসন্ধান, আগুনের চারপাশে, কাগজে রক্তের দাগ, বিষাক্ত সুন্দর ফুল প্রভৃতি। তাঁর গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার-ধর্মী গল্প-উপন্যাসগুলি কিশোর-পাঠক মহলে সমাদৃত। ভুয়ালকা, বঙ্কিম ও আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

• **মতি নন্দী** * জন্ম ১৯৩১। সাংবাদিকতা করতেন। আনন্দ ও আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। গল্প-উপন্যাস রচনার পাশাপাশি নিরলসভাবে ক্রীড়া সাহিত্যের চর্চা করে চলেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—গোলাপবাগান, চতুর্থ সিমানা, ছায়া, দলবদলের আগে, সহদেবের তাজমহল প্রভৃতি।

• **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়** * জন্ম ১৯৩৪। পেশায় সাংবাদিক। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু, পরে সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ। 'কৃত্তিবাস' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—একা এবং কয়েকজন, যুগলবন্দী, হঠাৎ নীবার জন্য, নবীন যৌবন, মহাপৃথিবী, প্রথম আলো, শ্যামসাহেব। ছোটোদের জন্যও নিয়মিত লেখেন। পেয়েছেন আকাদেমি, আনন্দ, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম পুরস্কার।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় * জন্ম ১৯৩৪। প্রথম জীবনে সরকারি চাকরি করতেন, পরে সাংবাদিকতা। সরস-সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অগ্নিসংকেত, আকাশ-পাতাল, তৃতীয় ব্যক্তি, পেয়ালা পিরিচ, বুনো ওল আর বাঘা তেতুল, মাপা হাসি চাপা কান্না, রশেবশে, লোটা-কম্বল, রুকু সুকু প্রভৃতি।

• **প্রফুল্ল রায়** * জন্ম ১৯৩৪। পেশায় সাংবাদিকতা। এক সময়ে যুগান্তরের রবিবাসরীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। পেয়েছেন আকাদেমি, বঙ্কিম ও ভুয়ালকা পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—আকাশের নীচে মানুষ, আমাকে দেখুন, কেয়াপাতার নৌকা, ধর্মান্তর, ক্রান্তিকাল, মানুষের জন্য, যুদ্ধযাত্রা।

• **অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়** * জন্ম ১৯৩৪। প্রথম জীবনে কাজ করেছেন জাহাজে, কিছুকাল শিক্ষকতা, পরে যোগ দেন সাংবাদিকতায়। আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অলৌকিক জলযান, ঈশ্বরের বাগান, ঝিনুকের নৌকা, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, পঞ্চাশটি গল্প সমুদ্রে বুনো ফুলের গন্ধ প্রভৃতি।

বুদ্ধদেব গুহ * জন্ম ১৯৩৫। পেশায় চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অদল বদল, কোয়েলের কাছে, নগ্ন নির্জন, পঞ্চপ্রদীপ, শালডুংরি, হলুদ বসন্ত, মহুয়ার চিঠি, প্রভৃতি। তাঁর লেখা ঋজুদা-কাহিনী কিশোর-পাঠক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। আনন্দ, শরৎ ও শিরোমণি পুরস্কার পেয়েছেন।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় * জন্ম ১৯৩৫। স্কুল শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা। পরে যোগ দেন সাংবাদিকতায়। আকাদেমি, আনন্দ ও বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—কাপুরুষ, দূরবীন, নয়নশ্যামা, মানবজমিন, পার্থিব প্রভৃতি। ছোটোদের জন্যও অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন।

নবনীতা দেব সেন * জন্ম ১৯৩৮। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। লিখেছেন গল্প-কবিতা-ভ্রমণকাহিনী-প্রবন্ধ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অন্য দ্বীপ, গল্পগুজব, প্রবাসে দৈবের বশে, শ্রেষ্ঠ কবিতা তিন ভুবনের পারে, সমুদ্রের সন্ন্যাসিনী, নবনীতা, ভালোবাসা কারে কয়, শব্দ পরে টাপুরটুপুর প্রভৃতি আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

সমরেশ মজুমদার * জন্ম ১৯৪১। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—আকাশ না পাতাল, অহংকার, এখনো সময় আছে, খুনখারাপি, গর্ভধারিণী, জলের নিচে প্রথম প্রেম, প্রভৃতি। 'কালবেলা' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন আকাদেমি পুরস্কার।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য * জন্ম ১৯৫০। পেশা সরকারি চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অদ্ভুত আঁধার এক, অন্য বসন্ত, কাছের মানুষ, দশটি উপন্যাস দহন, আমি রাই কিশোরী প্রভৃতি। শৈলজানন্দ পুরস্কার পেয়েছেন

উজ্জ্বলকুমার দাস * জন্ম ১৯৬৩ সালে। কলকাতায়। ছোটোবেলা থেকেই লেখালিখি শুরু করেন। একসময় আনন্দবাজার পত্রিকা, আনন্দমেলা, সানন্দা-তে বহু নিবন্ধ লিখেছেন। বই সম্পাদনা করেছেন তিনশোরও বেশি। পেয়েছেন অজস্র পুরস্কার। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : টাইটানিক, জুঁইফুলের দোলনা প্রভৃতি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাজশেখর বসু

জগদীশ গুপ্ত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বনফুল

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শিবরাম চক্রবর্তী

প্রমথনাথ বিশী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

...ণ ভাদুড়ী

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

কমলকুমার মজুমদার

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অমিয়ভূষণ মজুমদার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিমল কর

শক্তিপদ রাজগুরু

সমরেশ বসু

রমাপদ চৌধুরী

মহাশ্বেতা দেবী

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মতী নন্দী

সুনীল গঙ্গোপাধ্...

সঞ্জীব চট্টো...